সমরেশ মজুমদার

অগ্নিরথ



অগ্নিরথ

সমরেশ মজুমদার



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৩৭১

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও চয়নিকা প্রেস, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

অ গ্নি র থ

১

'এই তোমার দেশ। তোমার সকল অস্তিত্বের পেছনে এই দেশের নানাবিধ দান বিরাজমান। তুমি যদি অকৃতজ্ঞ সন্তান হও তা হলে এই দেশকে তুমি উপেক্ষা করিবে। ইহার অমর্যাদায় তোমার মনে কোনও আলোড়ন হইবে না। যে সমস্ত শহিদ তাঁহাদের প্রাণ এই দেশ-জননীর শৃঙ্খলমোচন করিবার জন্যে উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা শুধু শিহরিয়া উঠিবেন। তোমার জননী, জন্মভূমির সেবা করা তোমার অবশ্যই কর্তব্য। যদি মানুষ হও তা হলে স্বদেশভূমিকে ক্লেদমুক্ত করো।'

এই ক্লেদমুক্ত শব্দটিতে আটকে গেল সায়ন। ক্লেদ মানে কী ? ভারতবর্ষের শরীরে কী ক্লেদ জমেছে যা মুক্ত করার জন্যে এখানে আবেদন করা হয়েছে। আটচল্লিশ পাতার বইটি বাঁধানো নয়, ছাপাও যত্নে হয়নি। বইটির নাম স্বদেশভূমি, লেখক শ্রীযুক্ত বনবিহারী মাইতি। মেদিনীপুরের ঠিকানাটা ছাপা হয়েছে দ্বিতীয় পাতায়।

এই তোমার দেশ। সায়ন তাকাল জানলার বাইরে। এখন দুপুরবেলা। অনেক দূরে পাহাড়ের মাথায় মাথায়, খাঁজে খাঁজে কুয়াশা লেগে রয়েছে কি নেই। কিন্তু আর কিছুক্ষণ পরে, সূর্য পশ্চিমে ঢললেই পৃথিবীর নিঃশ্বাসগুলো কুয়াশা হয়ে যাবে। তখন নীচের খাদ থেকে সাপের ফণার মতো কুয়াশারা ওপরে উঠে আসবে। কিন্তু এখন আকাশ কী নীল ! মায়ের একটা এমন রঙের শাড়ি আছে।

মায়ের কথা মনে আসলেই আগে মন খারাপ হয়ে যেত। খুব কান্না পেত তখন। আর একটু কান্নাকাটি করলেই শরীর খারাপ হয়ে যেত। ডাক্তার আঙ্কল খুব রাগ করতেন তখন। বলতেন মানুষ ছাড়া পৃথিবীর কোনও প্রাণী এভাবে নিজের ক্ষতি করে না। এটাও এক ধরনের আত্মহত্যা। নিজের শরীর ভেঙে পড়বে জেনেও কান্নাকাটি করা বোকামি। কিন্তু তবু কান্না আসে। এই ঘরে তার মায়ের একটা বিশাল ছবি বাঁধানো আছে। চট করে মনে হয় মা-ই বসে হাসছে। চব্বিশ বাই বারো ইঞ্চির ছবি টাঙানোর পর সায়নের অনেক কিছু সহজ হয়ে গেছে। কেবলই মনে হয় কলকাতায় নয়, মা এই ঘরে তার সঙ্গেই আছে।

একটা হিমবাতাস আলতো বয়ে গেল। যদিও তার শরীরে হালকা পুলওভার রয়েছে তবু ঠাণ্ডা লাগানো বারণ। এখন অবশ্য এখানে দিনের বেলায় তেমন শীত পড়ে না। বৃষ্টিও কম হয়। হলে অবশ্য ভারী পুলওভার লাগে। এই মাস দেড়-দুই। তারপর বর্ষার সময় তো বটেই, শীতেও জানলা খুলে রাখা যায় না। কী শীত, কী শীত ! পাহাড়, গাছপালাগুলো তখন অন্যরকম হয়ে যায়। এই ছবির মতো পাহাড়, আকাশ, গাছপালা মিলে যে প্রকৃতি সেটা তার দেশ ? আর কলকাতার বাড়ির জানলা থেকে শুধু ইটকাঠের বাড়ি ছড়ানো যে শহর ছিল সেটাও তার ? তাই। মাথার ওপর হিমালয়, পায়ের তলায় সমুদ্র এমন একটা বর্ণনা কোন গানে শুনেছিল সে ? সেই মেঘালয় থেকে কন্যাকুমারী আমার দেশ। আমার সমস্ত অস্তিত্বের পেছনে এই দেশের নানান ধরনের দান রয়েছে ? সায়নের মনে পড়ে গেল আনন্দমঠের কথা। হেনাকাকিমা তাকে পড়িয়েছিল। খুব ভাল লেগেছিল তার। হেনাকাকিমা অবশ্য বলেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের এই বই যদিও বিপ্লবীরা পবিত্র গ্রন্থ বলে মনে করতেন কিন্তু তিনি লিখেছিলেন সেই সময়কার ব্রিটিশদের প্রশংসা করতে। তাদের মন রাখতে। বেশিক্ষণ তর্ক করার সুযোগ হয়নি কিন্তু সায়নের মনে হত সেই সব দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা কি মূর্খ ? হেনাকাকিমা যা জানে তা তাঁরা বুঝতে পারেননি ? আনন্দমঠ পড়ে তার নিজের তো মনে হয়েছে ওই একই কথা। হেনাকাকিমাকে সে বুঝতে পারে না। সন্ধে-নামা বাড়ির ছাদে ওর সঙ্গে দেখা হত। মুখ গম্ভীর ছিল একদিন। প্রশ্নটা তুলতে গিয়েও তাই সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'কী হয়েছে

তোমার ?'

'তোর শরীর আজ কেমন আছে ?'

'ভাল।'

'আমার মন ভাল নেই।'

'কেন ?'

'আমার নামটাই আমার শত্রু।'

'ও কি ! তোমার তো ফুলের নামে নাম।'

'হ্যাঁ। কিন্তু মালতী টগর চামেলি নয়, হেনা। কজন চেনে হেনাকে ? অ্যাঁ ?'

চোখ ঘুরিয়ে রাগ প্রকাশ করে হেনাকাকিমা ছাদ ছেড়ে দুপদাপ শব্দে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে।

ঘরের দরজায় শব্দ হল। সায়ন তাকিয়ে দেখল নির্মাল্য দাঁড়িয়ে আছে বাইরে যাওয়ার পোশাকে। এক ঘরে দুজন, এ ঘরে তার সঙ্গী নির্মাল্য। অন্তত ছয় বছরের ছোট নির্মাল্য আজ চলে যাবে কলকাতায়।

'চিঠি দেবে তো ? কেয়ার অব লিখতে ভুলবে না। কেয়ার অব মানিকলাল দত্ত।'

'নিশ্চয়ই দেব।' বুক ভারী হয়ে গেল সায়নের। দেড় বছর ওরা এক ঘরে রয়েছে। এর মধ্যে যতবার নির্মাল্য অসুস্থ হয়েছে সেই তুলনায় সে হয়েছে খুবই কম। কিন্তু যখনই হয়েছে তখনই নির্মাল্য তার পাশে বসে থেকেছে অনেকক্ষণ। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে।

নির্মাল্য বলল, 'চিঠি লিখে যদি উত্তর না পাও—!'

'উত্তর পাব না কেন ?'

'বা রে ? আমি না থাকলে কে উত্তর দেবে ?'

'ধ্যাৎ। ডাক্তার আঙ্কল তো বলেছে সব নিয়ম মেনে চললে আমরা অনেক অনেক বছর বেঁচে থাকব। বেঁচে থেকে আমাদের কত কাজ করতে হবে, মনে নেই ?'

'কী জানি ? কলকাতায় গিয়ে কী হবে ! মোটে তো দুটো ঘর। মা বাবা দুজনেই চাকরি করে, আমাকে সারাদিন একা থাকতে হবে।' খাটে বসে দু হাতে মুখ ঢাকল নির্মাল্য।

'এই কাঁদবি না। ডাক্তার আঙ্কল জানলে খুব রাগ করবে। তোকে কাঁদতে দেখলে আমিও কেঁদে ফেলব। খুব মন খারাপ করছে, না ?'

কথা না বলে মাথা নেড়েই হ্যাঁ বলল নির্মাল্য।

'আমারও করছিল। তাই আমি মনটাকে ফেরাবার জন্যে এই বইটা পড়ছিলাম। তোর মনে আছে ? ডাক্তার আঙ্কলের লাইব্রেরিতে পড়ে ছিল বইটা।' সায়ন দেখাল।

মুখ থেকে হাত সরাল নির্মাল্য, 'এখান থেকে চলে গেলে আমি মরে যাব।'

অসহায় চোখে তাকাল সায়ন। নির্মাল্যের ব্যাপারে সে কিছুই করতে পারে না। ওকে ওর বাবা এসে নিয়ে যাবেন শোনামাত্র সে ছুটে গিয়েছিল মাসখানেক আগে ডাক্তার আঙ্কলের চেম্বারে। এ বাড়ির একতলায় লনের পাশেই ওঁর চেম্বার। ডাক্তার আঙ্কল কথা দিয়েছিলেন নির্মাল্যর বাবাকে বুঝিয়ে লিখবেন যাতে তিনি ছেলেকে ফেরত নিয়ে না যান। লিখেছেন, কিন্তু কাজ হয়নি। আজ সকালে নির্দিষ্ট পরিকল্পনামতো উনি এসেছিলেন। ছেলেকে আদর করে বুঝিয়েছেন। একটু বাদে এসে নিয়ে যাবেন।

নির্মাল্য বলল, 'আমার একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না।'

সায়ন বলল, 'ডাক্তার আঙ্কল বললেন আর একবার চেষ্টা করবেন। তোর বাবা এলে আবার বোঝাবেন। তখন সব্বাই যদি গিয়ে তোর বাবাকে বলি ?'

'কিস্যু হবে না, খুব বাজে লোক।' মুখ বিকৃত করল নির্মাল্য।

ভীষণ খারাপ লাগল শুনতে। নির্মাল্যকে কখনও সে ওইভাবে কথা বলতে শোনেনি। নিজের বাবা সম্পর্কে বলা কখনওই উচিত নয়। হয়তো নিয়ে যাচ্ছে বলে রাগ হয়েছে তাই বলে—। সায়ন দেখল বড়বাহাদুর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, 'ডাকদারবাবু বোলাতা হ্যায়। চলো।'

'ওর বাবা এসে গেছেন ?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ।' একটু আগে ছোটবাহাদুর এসে নির্মাল্যর স্যুটকেস বেডিং নীচে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছে, এখন বড়বাহাদুর ওর কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে। সায়ন পাশাপাশি। এখন শরীর অনেক ভাল। ডাক্তার আঙ্কল সারাদিনে দুবার ওপর নীচ করার অনুমতি দিয়েছেন। যদিও সেটা দুয়ের বেশি হয়ে যাচ্ছে রোজ। হোক, তাতে তো শরীরে কোনও কষ্ট তৈরি হচ্ছে না!

চেম্বারের কাছাকাছি পৌঁছে বড়বাহাদুর থেমে গেল। ইশারা করে চেম্বার দেখিয়ে দিল। নির্মাল্যর হাত ধরে কয়েক পা এগোতেই একটা বেশ রাগী গলা কানে এল, 'আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমাকে বারংবার একই অনুরোধ করছেন কেন ? আমি আমার ছেলেকে আপনার কাছে দিয়েছিলাম, ডক্টর দত্ত সুপারিশ করেছিলেন বলেই দিয়েছিলাম, এতদিন রেখেছি, প্রতি মাসে ঠিক সময়ে টাকা পাঠিয়েছি। ট্রিটমেন্টের এক্সট্রা বিলগুলো মিটিয়ে দিয়েছি। দিইনি ? তবে ? সেই আমি যখন ওকে ফেরত নিয়ে যেতে চাইছি তার পেছনে কারণ আছে ডাক্তার। আপনি সেটা বুঝতে পারছেন না কেন ? ওয়েল, আমি আর ওর ট্রিটমেন্টের খরচ চালাতে পারছি না। কিছু স্বার্থসন্ধানী লোক একটা সাজানো কেস খাড়া করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে আমি নাকি মোটা টাকা ঘুষ নিই। ডিপার্টমেন্ট সাসপেন্ড করেছে। এই কেস টিকবে না, আই নো দ্যাট, কিন্তু যতক্ষণ কেস চলবে ততক্ষণ আমার রোজগারের অবস্থাটা একবার ভাবুন। ঘুষ! আরে মশাই, এখন কে ঘুষ নেয় না ? নিচ্ছে না ? দিল্লিতে বোফর্স, হাওলা, সুখরাম, মিসেস ঘোষ, বড় বড় রথী মহারথীরা সবাই তো নিচ্ছে। আমি তো চুনোপুঁটি একটা অফিসার। আমি নিতে না চাইলেও জোর করে টাকা দিয়ে যায় কেন ? যারা ঘুষ নিচ্ছে তারা যদি খারাপ লোক হয় তাহলে যারা ঘুষ দেয় তারা কী ? তাদের শাস্তি হয় না কেন ? যে কোনও ট্রেন ছাড়ার আগে দেখবেন, প্ল্যাটফর্মে টিকিট চেকারের পেছন পেছন একদঙ্গল লোক সিট কিংবা বার্থের জন্য ঘুরছে। ওরাই বলছে একটা বার্থ দিন আপনাকে পঞ্চাশটা টাকা দেব। এটা অন্যায় নয় ? যাক গে! আমার পক্ষে এই খরচ চালানো সম্ভব না। বলতে পারেন, ছেলেটার জীবন বলে ব্যাপার, জমানো টাকা ছিল না ? আছে। নিশ্চয়ই আছে। এখন আমার বিরুদ্ধে এনকোয়ারি হচ্ছে। আমি কোথায় কত সরিয়েছি তার হদিস নিচ্ছে। ছেলেকে টাকা পাঠাতে হলে গোপন ফান্ডে হাত দিতে হবে আর তা হলেই ওরা টের পেয়ে যেতে পারে। এমনিতেই ওরা লক্ষ করছে আমি ছেলের খরচের টাকা কীভাবে মেটাচ্ছি। বুঝতে পারছেন আমার অবস্থাটা ?'

'আমার কিছু বলার নেই। যা ভাল মনে করবেন তাই করুন। আমার পক্ষে যদি সম্ভব হত তা হলে বলতাম, থাক ও এখানে। কিন্তু—।'

'না না। আপনি অনেক করেছেন। আর নতুন করে ঋণী হতে চাই না।'

'মিস্টার দত্ত। এই খামে নির্মাল্য সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য রয়েছে। ওর কী ট্রিটমেন্ট হয়েছে, কী ধরনের হওয়া উচিত, সব। আপনি কাকে দিয়ে ওর চিকিৎসা করাবেন জানি না তবু আমি ডক্টর দত্তকে একটা চিঠি লিখে আমার সাজেশন জানিয়েছি। যদি মনে করেন আপনি আবার ওকে এখানে এনে রাখতে চান তা হলে দ্বিধা না করে নিয়ে আসবেন। আপনি তো জানেন, শুধু শরীর নয়, এখানে ওদের মনের চিকিৎসাও হয়। ভয় হচ্ছে সেটা এখন ওর ক্ষেত্রে ব্যাহত হবে। ঠিক আছে, ওই তো ও এসে গেছে। চলুন, আপনাদের আমি স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।' ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন।

সায়ন দেখল মধ্যবয়সী সেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন তাদের সামনে। নির্মাল্যর দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি, 'বাঃ, বেশ ভাল দেখাচ্ছে তোকে। ভাল হয়ে যাচ্ছিস, বুঝলি ?'

'আমি কলকাতায় যাব না!' জেদি গলায় বলল নির্মাল্য।

সায়ন লক্ষ করল নির্মাল্যর বাবার মুখ কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেল, 'সে কী ? কেন ?'

'আমি কলকাতায় গেলে মরে যাব। আমার চিকিৎসা ওখানে হবে না বলেই তো তোমরা আমাকে এখানে এনেছিলে। কি না ?' বেশ জোরে জোরে জিজ্ঞাসা করল নির্মাল্য।

'হ্যাঁ। কিন্তু কলকাতাতেও এখন কত ভাল চিকিৎসা বেরিয়ে গেছে। তা ছাড়া তুমি তোমার

মায়ের কথা একটু ভাব। তোমার মা তোমাকে না দেখে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কেবলই চিন্তা করে তোমাকে নিয়ে। তাই মায়ের কাছে থেকে চিকিৎসা করালে দুজনেরই লাভ, তাই না?' ভদ্রলোক ছেলের সামনে হাঁটু মুড়ে বসলেন। বসে কাঁধে হাত রাখলেন। হঠাৎই সায়নের মনে হল লোকটা যা নয় তাই করছে। অর্থাৎ এই হাসি, সুন্দর কথাগুলো, বসার আন্তরিক ভঙ্গি, এসবই বাজে। খুব বাজে লোক শব্দ তিনটেকে এখন খুব খারাপ বলে মনে হল না। সে দ্রুত পা চালিয়ে জিপের পাশে দাঁড়ানো ডাক্তারের কাছে গেল। তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ডাক্তার ওর কাঁধে হাত রাখলেন, 'কিছু করার নেই সায়ন। উনি যদি ওঁর ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান তা হলে সে অধিকার ওঁর আছে। আসুন, মিস্টার দত্ত। আপনাদের দেরি হয়ে যেতে পারে।'

এবার নির্মাল্যর বাবা সোজা হলেন, 'একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলেই তো হত।'

'না। খবর পেলে স্টেশন থেকে তুলে আনার যেমন রীতি আমরা মেনে চলি তেমনই কোনও পেশেন্ট চলে যাওয়ার সময় আমরা তার সঙ্গী হই, যতটা পারি।' হাত নাড়লেন ডাক্তার, 'উঠে বসুন। এসো নির্মাল্য। দেখি তোমার হাতখানা দাও।'

হাত বাড়িয়ে নির্মাল্যর হাত ধরতেই কী মনে হওয়ায় নাড়ি পরীক্ষা করলেন। তারপর পকেট থেকে স্টেথো বের করে বুক পিঠ পরীক্ষা করে জিভ দেখাতে বললেন। সেটা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ স্টুল পরিষ্কার হয়নি বলনি কেন?'

নির্মাল্য দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তার ওকে কোলে তুলে গাড়ির সিটে বসিয়ে দিতেই সায়ন বলল, 'আচ্ছা, আমি সঙ্গে যেতে পারি?'

'তুমি গেলে যে আর সবাই যেতে চাইবে!'

'না। আমি তো ওর রুমমেট, আমার দাবি আগে। সবাই জানে।'

'ওয়েল। তা হলে রুমমেটের পাশে উঠে বোসো। মিস্টার দত্ত, আপনাকে তা হলে পেছনে বসতে হয়। কষ্ট হবে একটু, এখন তো নীচে নামার পথ, সামনে ঝুঁকে থাকতে হবে।'

জিপ ঘেরা চত্বর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়তেই সমস্ত পৃথিবীটা ঝকঝক করে উঠল। এত সোনারুপো মেশানো আলো, এত নীল মাথার ওপর, কত সবুজ চারপাশে রেখে পৃথিবীর সেরা চিত্রকর মানুষকে কীরকম বিহ্বল করে মজা দেখেন, আচমকা ব্রেক কষলেন ডাক্তার, 'নির্মাল্যবাবু তাকিয়ে দ্যাখো। এর নাম পৃথিবী।'

সঙ্গে সঙ্গে সায়ন বলল, 'এই আমার দেশ। আমার জন্মভূমি।'

পেছন থেকে হেঁড়ে গলায় মিস্টার দত্ত বললেন, 'না হে। এ সব অঞ্চলে এলে আমার কিছুতেই বাংলা বাংলা বলে মনে হয় না। মনে হয় বিদেশে এসেছি।'

ডাক্তার বললেন, 'বাঃ। আপনি কলকাতায় ফিরে না গিয়ে সুভাষ ঘিষিং-এর কাছে চলে যান, পাবলিসিটি অফিসারের চাকরি পেয়ে যেতে পারেন। এই জায়গাটার নাম ভারতবর্ষ। আজ নয়, ভারতবর্ষের কনসেপ্ট তৈরি হওয়ার সময় থেকেই জায়গাটার ভৌগোলিক অস্তিত্ব ভারতবর্ষের মধ্যেই। এখানে যাঁরা মূল বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা আজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেছেন। কিন্তু সেটাই তো ভারতীয় দর্শন। দিবে আর নিবে মেলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে। বাংলাদেশ পশ্চিমবাংলার জীবনের সঙ্গে এখানকার মিল না পেলেই বিদেশ হয়ে গেল? তা হলে তো পঞ্জাবে গেলে আপনার বিদেশ বলে মনে হবে। গোয়া তো আরও।'

গাড়ি চালাতে চালাতে কথাগুলো বলছিলেন ডাক্তার। তাঁর এই একটানা বক্তৃতায় কোনও ফাঁক খুঁজে না পেয়ে চুপ করে বসেছিলেন মিস্টার দত্ত। নীচে নামছে জিপ ঘুরে ঘুরে। ফলে পেছনের চাপ এসে পড়ছে সামনে।

এই সময় নির্মাল্য বলল, 'আমার কপাল খারাপ।'

এত নিচু স্বরে বলল যে সায়নেরই প্রথমে শুনতে অসুবিধে হল। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'আমি ভেবেছিলাম আজ ঠিক নাক দিয়ে রক্ত বের হবে। রক্ত বের হলে নিশ্চয়ই যাওয়া হবে না। গত মাসে এইদিন এক ফোঁটা বেরিয়ে ছিল। তার আগের রাত্রে আমি খাইনি, মনে আছে।

সেইজন্যে গত রাত্রেও আমি খাইনি। অথচ রক্ত বের হল না।' নির্মাল্যের কথা শেষ হওয়ামাত্র সায়ন ওর হাত জড়িয়ে ধরল। এক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে আসা মানে জীবন থেকে কতগুলো বছর মুছে ফেলা। এ কথা তাকে কেউ বলেনি, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। নির্মাল্য বয়সে অনেক ছোট হলেও এতদিনে তো ওর বোঝা উচিত ছিল এ কথা।

স্টেশনটা ছোট। সমতল থেকে কখনও ট্রেন আসে কখনও আসে না। অবশ্য দার্জিলিং-এর ট্রেন দিনে দুবার এখানে নেমে আসে, ফিরে যায়। গাড়ি থেকে নামামাত্র ডাক্তারবাবুকে ঘিরে ধরল কয়েকজন। তাদের অসুখ বিসুখের কথা বলতে লাগল হাতের কাছে পেয়ে। নির্মাল্যের বাবা জিনিসপত্র নামিয়ে সায়নের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'কি ? ভাল আছ ?'

'ওকে নিয়ে যেতেই হবে ?' সায়ন শক্ত গলায় প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ বাবা। আমার পক্ষে যা অসম্ভব তা আমি করব কী করে। তোমরা ছোট্ট এ সব কথা ঠিক বুঝবে না। হ্যাঁ রে, হাঁটতে পারবি ?'

নির্মাল্য উত্তর দিল না। মানিকলাল দত্ত জিনিসপত্র নিয়ে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে বাধা দিলেন ডাক্তার, 'ও কী করছেন ? কোথায় যাচ্ছেন ?'

'প্ল্যাটফর্মে।'

'সে কী ? ট্রেনে যাবেন কেন ? আর আজ ট্রেন খুব লেট করে আসছে। এন জি পি-তে গিয়ে মেল ট্রেন পাবেন না। শেয়ারের ট্যাক্সিতে যান।' তিনি হাত নাড়তেই ওপাশ থেকে একটা ট্যাক্সি এগিয়ে এল। ড্রাইভার ডাক্তারকে চেনে। হেসে নমস্কার করে দরজা খুলে দিল। মানিকলাল মালপত্র ডিকিতে রাখতে গেলেন। নির্মাল্য উঠে বসল গাড়িতে। সায়ন চট করে তার পাশের জানলায় চলে এল, 'মিছিমিছি রক্ত খরচ করবে কেন ? মনে নেই, ডাক্তার আঙ্কল বলেছেন আমাদের এক ফোঁটা রক্ত এই দেশকে আরও সুন্দর করতে পারে ?'

সায়ন চোখ বন্ধ করল।

ধীরে ধীরে শেয়ারের ট্যাক্সিটায় লোক ভরে গেল। ডাক্তার এগিয়ে এসে নির্মাল্যের মাথায় হাত রাখলেন, 'ভাল থাকিস বাবা।'

নির্মাল্য কিছু বলল না। সে তার চোখ খুলল না। সায়ন আবিষ্কার করল তার নিজের চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ছে। ট্যাক্সিটা চলে গেল।

কাঁধে হাত পড়ল, ডাক্তার আঙ্কল তাকে জড়িয়ে ধরেছেন, 'শক্ত হও। শরীর খারাপ লাগছে ?'

'আমি ভাল আছি'। ওইরকম ক্ষীণকায় তরুণের কণ্ঠস্বর এত ভরাট কী করে হয় তা বিজ্ঞানই জানে। ছেলেটার কথাবার্তায় মাঝে মাঝে ব্যক্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে, প্রথম দিন থেকেই ডাক্তার সেটা লক্ষ করেছিলেন। তিনি বললেন, 'গুড। তুমি তা হলে জিপে কিছুক্ষণ বসে থাকো, আমি একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি। ক্যুরিয়ার সার্ভিসে আজ জরুরি ওষুধগুলো না এলে—।' ডাক্তার অন্যমনস্ক হয়ে চলে গেলেন। মানুষটার যাওয়া দেখল সায়ন। ওঁকে তার বড় ভাল লাগে।

সায়ন জিপের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সামনে অলস ভঙ্গিতে পাহাড়ি মানুষেরা গল্প করছে। ট্যাক্সিওয়ালা, তাদের দালালেরা, মালবইয়ে কিছু মানুষের সঙ্গে বেড়াতে আসা লোকজনও আছে। এই জায়গাটা চমৎকার পাহাড়ি, শীতের সময় প্রচণ্ড শীত পড়ে কিন্তু সায়ন জানে না কেন পর্যটকরা এখানে ভিড় জমাতে পছন্দ করে না। তারা উঠে যায় দার্জিলিং-এ অথবা ওপাশের কালিম্পং অথবা গ্যাংটকে। এই যে স্টেশন চত্বর, এখানে বাসগুলো থামে কিছুক্ষণের জন্যে, যাত্রীরা নেমে চা খেয়ে নেয়, কুয়াশা দেখে আবার গাড়িতে চড়ে বসে। কিন্তু সায়নের জায়গাটা বেশ ভাল লাগে। কেমন ঘুমঘুম, ছবির মতো।

'এই যে সাহেব।'

গলাটা কানে যেতে মুখ ফেরাল সায়ন। ম্যাথুজ। ওদের নিরাময় থেকে একটু ওপরে ম্যাথুজের দোকান। দোকানটায় গোরুর মাংস বিক্রি হয়। সেই অর্থে ম্যাথুজ কসাই। কিন্তু কসাই বললে যে চেহারা চোখের সামনে আসে তার সঙ্গে ম্যাথুজের কোনও মিল নেই। মাঝারি উচ্চতার রোগা লোকটির বয়স তিরিশের ধারেকাছে হবে। পরনে প্যান্ট কোট, গলায় মাফলার আর মুখে খানিকটা

দাড়ি।

'ডাকদার সাহেব কোথায় ?'

'কাজে গিয়েছেন। তুমি ?'

'দোকানে মাল নেই। ভাবলাম নীচে নেমে বাজারটা দেখে আসি। তুমি দুদিন আসনি। কী হল, তবিয়ত খারাপ ?' ম্যাথুজ ওর পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

'না। একটা বই পড়ছিলাম।'

'কী বই ? ডিটেকটিভ থ্রিলার ?'

'নাঃ। অন্য বই। আচ্ছা ম্যাথুজ, তুমি বই পড়তে পারো ?'

'পারব না কেন ? ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিলাম আমি। কিন্তু টাইম পাই না।'

'টাইম পাও না ? তোমার দোকানে তো আধঘণ্টা পরে পরে একজন খদ্দের আসে। বেশির ভাগ সময় তো ঝাঁপ বন্ধ রাখ।' প্রতিবাদ করল সায়ন।

'ঠিক। তখন আমি পাথরটার ওপর বসে পাহাড় দেখি। একদিন তোমাকে দেখাব। এতরকম গল্প তখন চোখের সামনে, ছেড়ে দাও। চা খাবে ?'

'না। আমার খাওয়া-দাওয়া সব নিয়মমতো।'

'ও হ্যাঁ। যাই, দারু খেয়ে আসি।'

'দারু খেতে তোমার ভাল লাগে ?'

'হ্যাঁ লাগে। মিথ্যে কথা কেন বলব ?' হাসল ম্যাথুজ। তার দাঁত লালচে।

'তুমি আবার গোরু আনতে কবে যাবে ?'

'বুধবার।'

'আমার খুব ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে নেপালে যেতে।'

ম্যাথুজ সায়নের মাথাটা স্পর্শ করেই ছেড়ে দিল, 'বহুত কষ্ট। তোমার শরীর ঠিক না হলে যেতে পারবে না। আমি যাই ট্রাকের ওপর বসে, ফিরি গোরু নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, তুমি তা পারবে কেন ? আচ্ছা, যদি কোনওদিন গাড়ি জোগাড় করতে পারি তা হলে তোমাকে নিয়ে যাব। যেখানে গোরুদের হাট বসে সেখানে একটা মন্দির আছে। খাঁটি মন্দির।'

'কীসের মন্দির ? কোন ঠাকুরের ?'

'শিব। আচ্ছা, চলি।' ম্যাথুজ এগিয়ে গেল।

অদ্ভুত ব্যাপার। সায়ন ম্যাথুজকে পেছন থেকে দেখল। ওরা তিন ভাই। বড় ভাই এখানকার কম্প্যুটার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। স্যুট এবং টাই পরে হাতে ছড়ি নিয়ে হাঁটেন। মেজ ভাই জাহাজে চাকরি করে, ওয়্যারলেস অপারেটর। ছুটির সময় আসে। গত মাসে আবার জাহাজে ফিরে গিয়েছে। সেই সময় বিকেলবেলায় ম্যাথুজের দোকানের পাশে এক হাত উঁচু ইটের পাঁচিলের ওপর তিন ভাই পাশাপাশি বসে গল্প করে সিগারেট খেত। গ্রামের অন্য লোকজনও তখন সেখানে এসে খানিকটা আড্ডা মেরে গেছে। ডাক্তার আঙ্কলের সঙ্গে ওই পথ দিয়ে হাঁটার সময় সে কয়েক মাস আগে প্রথম দেখেছিল। ডাক্তারকে দেখে তিনজনই উঠে দাঁড়িয়ে গুড আফটারনুন গুড আফটারনুন বলেছিল। ডাক্তার আঙ্কল ওঁদের খবরাখবর নিয়েছিলেন। এই সময় একজন মোটামতো বৃদ্ধ মানুষ ওপর থেকে নেমে এসে বললেন, 'যিশু তোমার মঙ্গল করুন ডাক্তার। শরীর কেমন আছে ?'

ডাক্তার আঙ্কল হাসলেন, 'ভাল। কিন্তু আপনিই একজন মাত্র লোক যিনি আমার শরীরের খবর নিয়ে থাকেন। কেন বলুন তো ?'

বৃদ্ধের হাসিটি চমৎকার। 'দ্যাখো, এই যে আমরা বেঁচে আছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি এ সবই যিশুর লীলা। তাঁর ইচ্ছে। তা প্রয়োজনের সময় তো ওঁকে পাওয়া যায় না। আমাদের শরীরটাকে ঠিকঠাক রাখার দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন তোমাদের। তাই তোমরা ঠিক থাকলে আমি, আমরা ঠিক থাকব। এটি কে ? একদম রাজকুমারের মতো দেখতে।' হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধ সায়নের কাঁধ জড়িয়ে ধরল।

'এর নাম শ্রীমান সায়ন রায়। খুব ভাল ছেলে। সায়ন, এঁদের নমস্কার করো।'

সায়ন হাত জোড় করতেই বৃদ্ধ হাত টেনে নিল হাতে, 'যিশু তোমার মঙ্গল করুন।'

ফেরার সময় ডাক্তার আঙ্কল ওই তিন ভাই-এর কথা বলেছিলেন। তিনজনই অসম জীবনযাপন করেন। রোজগারও আলাদা আলাদা। কিন্তু কাজের বাইরে নিজেদের সম্পর্ক অটুট রেখেছেন। কসাই-এর কাজ করে বলে ছোট ভাইকে কেউ ঘৃণা করে এড়িয়ে যান না। ডাক্তার আঙ্কল বলেছিলেন, 'কোনও কাজই ছোট নয়। বিদেশে গেলে ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখতে পাবে। এই আমরা, বাঙালিরাই শুধু মিথ্যে অহংকার আর ঠুঁটো দম্ভ নিয়ে নিজের চারপাশে একটার পর একটা দেওয়াল তুলে গিয়েছি। আমাদের তুলনায় এরা অনেক এগিয়ে।'

তবু, ম্যাথুজ কেন গোরু কেটে সেই মাংস বিক্রি করে ? গোরু হল হিন্দুদের কাছে পবিত্র প্রাণী, অনেকে মা বলে পুজো করে। যে লোক গোরু কাটে তাকে শত্রু বলে মনে করা উচিত। জমে ওঠা এই সব প্রশ্ন সায়ন করেছিল ডাক্তার আঙ্কলকে।

শুনে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, 'ম্যাথুজকে দেখে খুব খারাপ লোক বলে মনে হল ?'

'না। সাধারণত কসাইরা খালি গায়ে লুঙ্গি পরে ছুরি হাতে নিয়ে বসে থাকে।'

'ও সেরকম ছিল না। তাই তো। আচ্ছা, গোরু একটি প্রাণীর নাম। তার নিজস্ব কোনও বিশেষ ক্ষমতা নেই যা শ্রদ্ধা পেতে পারে। গৃহপালিত পশুর মধ্যে একমাত্র সে বেশি দুধ দিতে পারে। তাকে আমাদের প্রয়োজন। মোষেরও দুধ হয়, সেটা কাজেও লাগে কিন্তু গোরুকে পুজো করতে হবে কেন ? তা হলে ছাগলের দুধ অসুস্থ মানুষের উপকারী জেনেও তাকে পুজো না করে তার স্বজাতির মাংস খাওয়া হচ্ছে কেন ? নিজের মাকে খেতে না দিয়ে সেবা না করে গোরুকে ঘটা করে পুজো দেয় যে জাতি তার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকাও সায়ন। স্রেফ রেষারেষি করার জন্যে হিন্দুরা গোরুকে মা বানিয়ে ফেলেছে। আর মজার কথা কী জানো ? ওই ম্যাথুজের সঙ্গে কথা বলে দেখবে, সে গোরু কিনতে যায় পাশের হিন্দু রাষ্ট্র নেপালে। সায়ন, সবসময় মনে রাখবে মানুষের চেয়ে পবিত্র মানুষের কাছে আর কেউ নেই।'

এ সব অনেকদিন আগের কথা। এখন ম্যাথুজের সঙ্গে সায়নের ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। ওর ব্যবসার নানান গল্প তার জানা। ম্যাথুজ এই ব্যবসাটা আর বেশিদিন করবে না। তার আর পোষাচ্ছে না। নেপাল থেকে গোরু নিয়ে বর্ডার পেরিয়ে চোরাপথে একদিন একরাত হেঁটে তবে এখানে পৌঁছোতে হয়। পথে গোরু হারিয়ে গেলে বা অন্য কিছু হলে সবটাই ক্ষতি। আর এই গ্রামটির মানুষজনের আর্থিক অবস্থা এত ভাল নয় যে সে দাম বাড়িয়ে দেবে মাংসের। অথচ গোরুর দাম বেশি দিতে হচ্ছে, পথে পুলিশকেও টাকা দিতে হয়। এতে কোনও লাভ নেই। তা ছাড়া যে মেয়েটির সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়ার কথা সে-ও চাপ দিচ্ছে অন্য কাজ করার জন্যে। মুশকিল হল, সে ব্যবসা বন্ধ করলে এই গ্রামের মানুষগুলোর মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। মুরগি বা খাসির মাংস কিনে খাওয়ার ক্ষমতা কজনের আছে! সিদ্ধান্তটা সে ওই কারণে নিতে পারছে না।

এই সময় স্টেশনের লাগোয়া ম্যাগাজিন আর কাগজের স্টলটা খোলা হল। নানান রঙের মলাটের সিনেমার কাগজই বেশি। স্টলটার ওপরে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ছবি। এই ছবিটিকে এর আগেও স্টলে দেখেছে সায়ন। আজ হঠাৎ কৌতূহল হল। এগিয়ে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, ওই ছবিটা টাঙিয়েছেন কেন ?'

দোকানদার বোধ হয় এক সময় রেলে চাকরি করতেন। এখনও কালো কোট পরে থাকেন ধুতির ওপর। মাথা জুড়ে চকচকে টাক। নস্যি নিতে নিতে মাথা নাড়লেন, 'নট ফর সেল। বিক্রির জন্য নহে। ইচ্ছে হয়েছে তাই টাঙিয়েছি।'

'ও। রোজ দেখি তাই বললাম।'

'ছবিটা কার জানো ? লাস্ট বাঙালি। তারপর আর বাঙালি নেই। বিধান রায় অবশ্য ছিলেন কিছুটা কিন্তু বটগাছ আর নিমগাছ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র আমার নেতা। নো, আমি ফরোয়ার্ড ব্লক করি না, নো পলিটিক্স। উনি আমার নেতা কারণ উনি বাঙালির নেতা। ইংরেজ ওঁকে মারতে চেয়েছিল, জাপানিরা ওঁর ছাই দেখিয়েছে, কিন্তু তিনি মারা যাননি। যে কোনও মুহূর্তে ফিরে এসে ডাক দেবেন, "দিল্লি চলো"।' লোকটি চোখ বন্ধ করে বলে যাচ্ছিলেন এক সুরে, 'আমরা যাওয়ার

জন্য তৈরি। আমি তো বটেই।'

ওপাশে দাঁড়ানো একজন নেপালি ভদ্রলোক শব্দ করে হাসলেন, 'বেঁচে থাকলে ওঁর বয়স নিরানব্বুই হবে। কোনও চান্স নেই দাসবাবু।'

দাসবাবু চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন লোকটিকে, 'মূর্খ! নীরদ সি চৌধুরীর নাম শুনেছেন ? লেখক। অক্সফোর্ডে থাকেন। এখনও দেশ পত্রিকায় লিখে যাচ্ছেন। নেতাজির সমসাময়িক। তিনি যদি পারেন, তা হলে নেতাজি পারবেন না কেন ? হোয়াই ? জবাব দিন। আমি বলছি নেতাজি বেঁচে আছেন। শৌলমারির সাধু নন, নেতাজি ইজ নেতাজি। কী দেব ভাই ?' নতুন খদ্দেরের দিকে তাকালেন দাসবাবু।

'আপনাকে প্লেবয় ম্যাগাজিন আনিয়ে রাখতে অ্যাডভান্স করেছিলাম।' একটি ছিপছিপে স্মার্ট অনেকটা ড্যানির মতো দেখতে নেপালি ছেলে সামনে দাঁড়াল।

'ইয়েস। এনেছি। আজই এসেছে। আরও কুড়িটা টাকা লাগবে ভাই। কালোবাজারে দাম বেশি।' আড়াল থেকে সন্তর্পণে একটা প্যাকেট বের করে দাসবাবু ছেলেটির হাতে দিতেই সে কুড়িটা টাকা পেমেন্ট করল।

ডাক্তার কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পায়নি সায়ন, এবার কাঁধে হাত পড়তেই সে একটু চমকে গেল। ডাক্তার বললেন, 'চলো, ফেরা যাক।' গাড়ির দিকে হাঁটার সময় সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, প্লেবয় পত্রিকা কালোবাজারে বিক্রি হয় কেন ?'

২

ডাক্তার আঙ্কলকে আজ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'শখের জিনিস না পেলে মানুষ পাগল হয়ে ওঠে। তখন বেশি দাম দিয়ে পেতে চায়! এই ধরো যারা খুব সিগারেট খায় তারা যদি শোনে বাজারের কোনও দোকানে সিগারেট নেই, তখন তাদের কী অবস্থা হবে। যেখানে পাবে সেখান থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে ছুটবে। প্লেবয় ম্যাগাজিনকে অনেকেই পছন্দ করেন না, যাঁরা করেন তাঁরা বেশি দাম দিয়ে কিনতে চান হাতের কাছে না পেলে।'

'কেন ?'

ডাক্তার আঙ্কল সায়নের দিকে তাকালেন, 'তোমার বয়স তো আঠারো হয়ে গেছে, তাই না ?'

'হ্যাঁ। আমি এখন উনিশ।'

'তাহলে বলা যায়। ওই কাগজে নগ্ন মেয়েদের ছবি ছাপা হয় একটু বেশিমাত্রায়।'

'কেন ? এটা তো খুব অন্যায়। মেয়েরা আপত্তি করে না ?'

'পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত জায়গা সায়ন। তোমার আমার কাছে যা অন্যায় বলে মনে হবে তা অনেকের কাছে স্বাভাবিক ঘটনা।' ডাক্তার আঙ্কল গাড়ির দরজা খুলে ধরেন।

'কিন্তু মেয়েদের নগ্ন ছবি দেখার জন্যে বেশি দাম দিয়ে প্লেবয় পত্রিকা কিনতে হবে ?'

'যারা দেখে তারা নিশ্চয়ই দেখে আনন্দ পায়। ইতিহাসে বিকৃত রুচির নানান ধরনের মানুষের কথা বলা হয়েছে। রোম যখন আগুনে পুড়ছিল নিরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। সেটাও তো এক ধরনের বিকৃত রুচি। তাই না ?'

গাড়িতে উঠে বসে সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'যেসব মেয়েদের ছবি ছাপা হয় তাদের বয়স কি খুব অল্প ?'

'অল্প কেন হবে ? ইউরোপ আমেরিকায় প্রচুর মহিলা প্রফেশনাল মডেল হিসেবে কাজ করেন। আর পাঁচটা চাকরি-বাকরির মতো এটাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করেন তাঁরা।'

'কিন্তু এই সব মেয়েরা নিশ্চয়ই কারও মা নয় ?'

ডাক্তার এবার সায়নের দিকে তাকালেন, 'সত্যি কথা শুনলে তুমি কষ্ট পাবে সায়ন।'

সায়ন ধীরে ধীরে মুখ সরিয়ে নিল জানলায়। ডাক্তার গাড়ি চালু করলেন। সায়নের চোখের সামনে থেকে এই পাহাড়ি স্টেশন এলাকা মুছে গিয়ে মায়ের মুখ ভেসে উঠল। তার মায়ের নগ্ন শরীরের ছবি কেউ তুলছে সে ভাবতেই পারে না। অসম্ভব, তেমন অবস্থা কখনওই আসতে পারে না। তার মা যখন এইরকম তখন পৃথিবীর কিছু কিছু মায়েরা কেন আলাদা হবে!

চড়াই ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ গাড়িটা থেমে যেতেই কানে এল, 'যিশু তোমাদের মঙ্গল করুন। গুড আফটারনুন ডাকদার সাব। গুড আফটারনুন মাই ইয়ং ফ্রেন্ড।'

ডাক্তার গাড়ি থামালেন, 'গুড আফটারনুন মিস্টার ব্রাউন। উঠে আসুন।'

দরজা খুলে দিতে পেছনের সিটে উঠে বসলেন বৃদ্ধ। দীর্ঘকায়, মোটাসোটা শরীর নিয়ে ওপরে উঠতে যে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল তা মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। নিশ্বাস একটু স্বাভাবিক হতে হাসলেন, 'অনেক ধন্যবাদ। যিশুর এমনই মহিমা ঠিক সময়ে কাউকে না কাউকে সাহায্যের জন্যে পাঠিয়ে দেন।'

গাড়ি চালাতে চালাতে ডাক্তার বললেন, 'আপনার যখন ওপর-নীচ করতে এত কষ্ট হয় তখন এটা করেন কেন?'

ব্রাউন মাথা নাড়লেন, 'আরে আমি কি করি! আমাকে করিয়ে ছাড়ে। আমাদের ডাক্তার গোমসের বাড়িতে মিটিং ছিল। সমাজসেবী সংঘের মিটিং। না বললে ওরা ভাবে আমি এড়িয়ে যাচ্ছি। অবশ্য ওরা কাজ খারাপ করছে না। একটু দাঁড়াতে পারবেন ডাক্তার!'

শোনামাত্র ডাক্তার ব্রেক কষলেন। রাস্তাটা এখানে খানিকটা সমান। গাড়ির দরজা খুলে ব্রাউন নীচে নেমে সামনে তাকালেন। সেখানে একটা দোতলা অসম্পূর্ণ বাড়ি। বাড়িটির গায়ে কালো দাগ, জানলা দরজা নেই।

ব্রাউন বললেন, 'মন খারাপ হয়ে যায় ওই বাড়িটা দেখলে।'

ডাক্তার বললেন, 'শুনেছি বাড়িটা সরকার নিয়ে নেবে। এভাবে পড়ে থাকার চেয়ে সরকার যদি কোনও ভাল কাজে লাগায় তাহলে মানুষের উপকার হয়।'

'নিশ্চয়ই। ফাদারকে বলেছিলাম চার্চ থেকে অ্যাপ্রোচ করতে। কিন্তু তারও তো অনেক অসুবিধে।'

ব্রাউন কথা বলতে বলতে আবার গাড়িতে উঠে পড়লেন। সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বাড়িটার চেহারা এরকম কেন? পোড়া পোড়া দাগ।'

ব্রাউন বললেন, 'ইয়েস মাই সন, বাড়িটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

'পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। বাড়ির মালিক মিস্টার মুখার্জি কলকাতার মানুষ। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময় কিছু মানুষের মনে হল মিস্টার মুখার্জি পাহাড়ের লোক না হয়েও এখানে অত সুন্দর বাড়ি কেন করছেন? বাড়িটা তখন প্রায় তৈরি। সে সময় দার্জিলিং জেলার প্রায় সব সরকারি বাংলো, ট্যুরিস্ট বাংলো পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে প্রতিবাদ জানানোর নিদর্শন হিসেবে। কিছু লোক ওই সুযোগ নিয়ে বাড়িটা আগুনে জ্বালিয়ে দিল। একটি নেপালি ছেলে বাধা দিতে গিয়েছিল। বেচারা আগুনে পুড়ে মারা যায়। সেই থেকে বাড়িটা ওই অবস্থায় পড়ে আছে।' ব্রাউন ধীরে ধীরে বলছিলেন।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'যে মারা গেল, সে কে?'

'ওই যে বললাম স্থানীয় মানুষ। নেপালি। তার মনে হয়েছিল কাজটা ভাল হচ্ছে না। প্রতিবাদ করা দরকার। এরকম এখনও কারও কারও মনে হয় বলেই পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকাটা কিছুটা সহজ হয়ে যায়।'

সায়ন পেছন ফিরে ব্রাউনের মুখটা দেখল। মানুষটাকে তার খুব ভাল লেগে গেল। 'কিন্তু সেই নেপালি ছেলেটি, কী নাম তার?' সে ব্রাউনকে জিজ্ঞাসা করল।

ব্রাউন বলল, 'ওর নাম ছিল পবন, পবন বাহাদুর।'

তখন দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। সূর্যদেব চলে গেছেন পশ্চিমের পাহাড়ে। হঠাৎ একটি বাঁক ঘুরে ডাক্তার গাড়ি থামালেন, 'দ্যাখো, সায়ন। অস্ত যেতে এখনও বেশ দেরি এবং অস্তসূর্যের ছবি আঁকা

হয়ে যাচ্ছে আকাশে, পাহাড়ে, গাছপালায়।'

অপূর্ব সেই দৃশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখছিল সায়ন। তাদের নিরাময়ের জানলা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় কিন্তু এমন চারপাশ নরম আলোয় আলোকিত ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। ব্রাউন বললেন, 'কী দেখছ মাই সন।'

'কী সুন্দর!'

'যা সুন্দর তাই ঈশ্বর। আমরা সবাই ঈশ্বরদর্শন করছি।'

ডাক্তার হাসলেন, 'সে কী মিস্টার ব্রাউন! আপনি তো যিশুর সেবক!'

'ঠিকই ডাক্তার। যিশুও তো এই ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছোনোর ক্ষমতা আমাদের নেই বলেই যিশু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।'

মিস্টার ব্রাউনের বাড়ি নিরাময় ছাড়িয়ে সামান্য ওপরে। ডাক্তার তাঁকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চাইলেও তিনি রাজি হলেন না। বললেন, 'এই একশো গজ রাস্তায় আমার জন্য কেউ কেউ অপেক্ষা করছে ডাক্তার। তাদের বঞ্চিত করা ঠিক কাজ হবে না।'

নিরাময়ের গেটে মিস্টার ব্রাউনের সঙ্গে সায়ন নেমে পড়ল। ডাক্তার গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাবার আগে বললেন, 'তুমি মিনিট কুড়ি বাইরে থাকতে পারো তবে বেশি ওপরে উঠো না। মনে রেখো, মিনিট কুড়ি।'

নিরাময় থেকে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে ওপরে যে উঠেছে তা একেবারে খাড়াই নয়। এই পথে হাঁটতে তেমন অসুবিধে হয় না সায়নের। এখন বাতাসের দাঁত আরও একটু ধারালো হয়েছে। মিস্টার ব্রাউনের সঙ্গে কয়েক পা হাঁটতেই একটা কালো কুকুর ছুটে এসে লেজ নাড়তে লাগল প্রবলভাবে। মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'নো, নো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক নইলে কিছুই দেব না।' দুবার বলতেই কুকুরটা স্থির হয়ে গেল। মিস্টার ব্রাউন পকেট থেকে একটা দিশি বিস্কুটের দু টুকরো বের করে কুকুরটাকে দিতেই সে খপখপ করে তুলে নিয়ে উল্টো দিকে দৌড়ে চলে গেল। কয়েক পা হাঁটতেই দেখা গেল আর একজন দাঁড়িয়ে আছে, এটির রং সাদা। মিস্টার ব্রাউনকে দেখে সে পা মুড়ে বসে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল। মিস্টার ব্রাউন হাসলেন, 'ওকে আগে বিস্কুট দিইনি বলে—, হ্যালো হোয়াইটি। কাম হিয়ার।'

কুকুরটি নড়ল না। সায়ন দেখল মিস্টার ব্রাউন হোয়াইটির কাছে গিয়ে অনেক সাধ্যসাধনা করে শেষপর্যন্ত ওর মান ভাঙালেন। কুকুরটি বিস্কুট খাওয়া শুরু করলে ফিরে এসে বললেন, 'এই এরা হল আমার বন্ধু। আমি তো একা থাকি, রাত্রে ওরা আমাকে সঙ্গ দেয়।'

'আপনি একা থাকেন?'

'ইয়েস মাই সন। আমার তিন ছেলে। তিনজনই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। একজন আছে শিলিগুড়িতে। সে একটা বড় নার্সারি স্কুল চালায়। দ্বিতীয়জন বোম্বেতে। জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি করে। আর ছোটটা চার্চে আছে। এখন সিমলায়। ও ধর্মযাজক। আমার স্ত্রী মারা গিয়েছেন অনেকদিন হল। তখন আমি জাহাজে। অস্ট্রেলিয়া থেকে আসার সময় ভারত মহাসাগরে খবরটা পাই।' মাথা নাড়লেন মিস্টার ব্রাউন, 'ওই যে বাড়িটা দেখছ ওটা আমার স্ত্রী তৈরি করেছিলেন। জাহাজ থেকে আমি টাকা পাঠাতাম আর তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে একটু একটু করে বানিয়েছিলেন। আমাকে ছেলেরা তাদের কাছে থাকতে বলেছিল। কিন্তু এই বাড়ির মায়া আমি ছাড়তে পারি না। ও নেই, কিন্তু ওই বাড়িতে থাকলে আই ক্যান ফিল হার।' কথা বলতে বলতে ওপর থেকে নেমে আসা এক দম্পতির দিকে হাত তুলে বললেন, 'যিশু তোমাদের মঙ্গল করুন।'

ভদ্রলোক খুব কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে নেমে গেলেন।

হঠাৎ সায়ন বলে ফেলল, 'আপনাকে আমার ভাল লাগছে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ মাই সন। এভাবে আজকাল কেউ ভাল লাগার কথা বলে না। তোমার সঙ্গে আজ আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল, এখন থেকে আমরা অনেক গল্প করতে পারব।'

এই সময় একটি মেয়েকে নীচ থেকে উঠে আসতে দেখা গেল। মেয়েটিকে সায়ন এর আগে বেশ কয়েকবার দেখেছে। ছিপছিপে শরীরে জিনস আর পুলওভারে চমৎকার মানিয়েছে। মেয়েটির

ফরসা মুখে কিঞ্চিৎ মেচেতার ছোপ রয়েছে। ওকে এগিয়ে আসতে দেখে মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'গুড আফটারনুন সিমি। বাজারে গিয়েছিলে ?'

ব্যাগ হাতবদল করে সিমি মাথা নাড়ল। এবং একই সঙ্গে ঠোঁট টিপে ধরল। মিস্টার ব্রাউন সেটা লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার ? কোনও গোলমাল হয়েছে।'

একটা বড় নিশ্বাস ফেলে সিমি বলল, 'নাঃ।'

ওরা কথা বলছিল নেপালিতে কিন্তু তা বুঝতে সায়নের কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। বড় এবং ছোটবাহাদুরের কল্যাণে নেপালি কথা সে অনেকটাই বুঝতে পারে। সায়নের মনে হল সিমির মনে খুব দুঃখ আছে। দুঃখী মেয়েদের মুখ ওরকম হয়। অন্তত মায়ের মুখ তো হতই।

'চিঠি আসেনি ?'

'নাঃ। না আসুক। আমার কী ? আমি রোজ রোজ ক্যুরিয়ার অফিস আর পোস্ট অফিস করতে পারব না। আমি ঠিক করেছি এখন থেকে আমার মতো থাকব। এখানে একটা দোকান খুলব। ব্যস। পেটের ধান্দা মিটে গেলে আর কিছু চাই না আমি।' বেশ জোরের সঙ্গে কথা বলল সিমি।

মিস্টার ব্রাউন মাথা নাড়লেন, 'এ তো খুব ভাল কথা। তবে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত।'

'আর কতদিন অপেক্ষা করব ? শেষ চিঠি একজন লিখেছে নয় মাস আগে আর একজন সাত মাস। তারপর আর বাবুদের কোনও পাত্তা নেই। আমি কি ফ্যালনা !' রেগে গেল সিমি।

মিস্টার ব্রাউন হাসলেন, 'দ্যাখো, সব ঠিক হয়ে যাবে। যিশু নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল করবেন। ওহো, এতক্ষণ মনেই ছিল না। একে চেনো ? এ আমার ইয়ং ফ্রেন্ড।'

সিমি মাথা নাড়ল, 'দেখেছি। নিরাময়ে থাকে তো, তাই না ?' প্রশ্নটা সায়নের উদ্দেশে।

সায়ন বলল, 'হ্যাঁ। আমার নাম সায়ন, সায়ন রায়।'

'আমি সিমি।' সাদা দাঁত ঝকমকিয়ে উঠল সিমির মুখে।

আলো কমে যাচ্ছিল দ্রুত। সায়ন মিস্টার ব্রাউনের দিকে তাকাল, 'এবার আমি যাই ?'

মিস্টার ব্রাউন ব্যস্ত হলেন, 'ও ইয়েস। তোমার এবার ফিরে যাওয়া উচিত। আমি সঙ্গে যাব ?'

'না না।' লজ্জা পেল সায়ন।

'তাহলে এবার তোমাকে আমার বাড়িতে দেখতে পাব নিশ্চয়ই।'

'ডাক্তার আঙ্কল যদি অনুমতি দেন।'

'নিশ্চয়ই দেবেন। হি ইজ এ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন। আর একটা কথা', মিস্টার ব্রাউন এগিয়ে এলেন কাছে, 'তুমি পৃথিবীতে কাকে বেশি ভালবাস ? তোমাদের কোন দেবতাকে ?'

মাথা নাড়ল সায়ন, 'দেবতা-টেবতা না, আমি আমার মাকে সবচেয়ে ভালবাসি।'

'গুড। তাহলে তিনিই তোমার দেবতা। রোজ রাত্রে ঘুমোবার আগে তাঁর মুখ মনে করবে আর ভোরবেলায় ঘুম ভাঙামাত্র তাঁর কথা একটু ভাববে। ব্যস, দেখবে তোমার সব অসুখ সেরে যাবে।'

শুনে খুব তৃপ্তি পেল সায়ন। সামান্য ঢালু রাস্তা বেয়ে ফিরতে ফিরতে সে খাদ থেকে কুয়াশাদের ওপরে উঠে আসার তোড়জোড় দেখতে পেল। এখন ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে। পৃথিবীটা কী মায়াময় হয়ে উঠেছে। মায়াময় শব্দটি তো শুরু হচ্ছে মা দিয়ে। মা এখন কী করছে ? সে চারপাশে তাকাল। খোলা আকাশ, নীল পাহাড় আর মরে যাওয়া সূর্যের আলো দেখতে দেখতে হঠাৎ তার কান্না এল। অনেক কষ্টে তার শরীর জুড়ে ছড়িয়ে যাওয়া কান্নাটাকে সে থামাল। ডাক্তার আঙ্কল বলেছেন, চোখের জল রক্তের চেয়ে দামি।

সায়ন মাথা নাড়ল। আমার শরীরে রক্ত কমে যাচ্ছিল। ডাক্তার আঙ্কলের চেষ্টায় আমি যখন হেঁটে বেড়াচ্ছি তখন নিশ্চয়ই কিছুটা রক্ত হয়েছে শরীরে। সেই রক্তের চেয়ে যদি চোখের জল দামি হয় তাহলে তা শরীরে রেখে দেওয়াই উচিত। হঠাৎ নির্মাল্যর কথা মনে এল। নির্মাল্য কি এতক্ষণে শিলিগুড়িতে পৌঁছে গিয়েছে ! আজ তাকে নির্মাল্যকে ছাড়াই একলা থাকতে হবে ঘরে।

মিস্টার ব্রাউনের বাড়িটা দোতলা কিন্তু তার বৈচিত্র্য আছে। পাহাড়ি পিচের পথটা ওপরে উঠে

গিয়েছে তার দোতলার বারান্দা ঘেঁষে। একতলার সামনে খানিকটা বাগান যা ভাড়াটেরা করেছে। বাড়ির তিন দিকে জঙ্গল, এবং সেই জঙ্গলে স্কোয়াশের লতাপাতা ছড়ানো। এগুলোর কোনও মালিকানা নেই, যার ইচ্ছে সে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে এই অঞ্চলের গরিব মানুষগুলো ভাতের সঙ্গে স্কোয়াশের তরকারি খেয়ে দিব্যি বেঁচে আছে।

মিস্টার ব্রাউনের অবশ্য মাংস না পেলে খাওয়ার ইচ্ছে চলে যায়। এটা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যেস। একটু ওপরে ম্যাথুজের মাংসের দোকান রয়েছে। কিন্তু দোকানটা কাল থেকে বন্ধ বলে আজ বেশি দাম দিয়ে মুরগি কিনতে হয়েছে। ম্যাথুজ যখন নেপালে গোরু কিনতে যায় তখন দোকান বন্ধ রাখে একটা দিন। ম্যাথুজ যে সেটা করতে যায়নি তা জেনেছেন ব্রাউন। জেনে ভেবেছিলেন ওর খবর নিতে যাবেন। কিন্তু আজ ওই মিটিংটার জন্যে সময় পাননি।

রাস্তা থেকে দোতলার বারান্দায় লোহার গেট খুলতেই কুকুরটা চলে এল সামনে। ব্রাউন ডাকলেন, 'ভুটো !' বাদামি রঙের পাহাড়ি কুকুরটা ঝুলে থাকা লোমের ফাঁক দিয়ে তাকে একবার দেখল। দেখে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। ব্রাউন হাসলেন, চিকেনের টুকরো ভুটোর একদম পছন্দ নয় ! কুকুরটার খাওয়ার অভ্যেস তিনিই খারাপ করে দিয়েছেন। ওর সলিড মাংস চাই।

একদা স্বাস্থ্য ভাল ছিল ব্রাউনের। নেপালিদের তুলনায় তিনি বেশ বেশি লম্বা, চেহারাও ভারী। ইদানীং মেদ জমেছে শরীরে। সত্তর বছর বয়সটা তো কম নয় ! স্ত্রী বেঁচে থাকতে প্রায়ই বলত মদ খাওয়াটা এবার ছাড়ো। নইলে মদ তোমাকে খেয়ে নেবে।

জাহাজে চাকরি করার সুবাদে পৃথিবীর অনেক দেশের মদ তিনি খেয়েছেন। তিরিশ বছর ধরে সমুদ্রে ভেসে ভেসে অভ্যেসটা পাকা হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ মদই, তার বেশি কিছু নয়। অন্য নাবিকরা যখন কোনও বন্দরে নামামাত্র মেয়েমানুষের কাছে ছুটত তখন তিনি চার্চে যেতেন। চার্চে গিয়ে যিশুকে বলতেন মদ খেতে আমার এত ভাল লাগে কেন ? যদি ভালই লাগে তাহলে সেটা ছাড়তে হবে কেন ? এই সব প্রশ্ন-ট্রশ্ন করলে মন হালকা হয়ে যেত। অন্যায়বোধটা আর তেমন তীক্ষ্ণ থাকত না। কিন্তু এটা ঠিক, দামি দামি মদ খেয়ে যে সুখ হত না তা এখানকার পাহাড়ি মদ খেয়ে হয়।

ব্রাউন দেখলেন নবকুমারের মা আসছে হাতে ক্যান ঝুলিয়ে। ওর সঙ্গে তাঁর মাসচুক্তি করা আছে। প্রতিদিন বিকেলে এক ক্যান ঘরে-তৈরি মদ দিয়ে যায় বুড়ি। মাস গেলে টাকা নেয়। ব্রাউন তাড়াতাড়ি দরজা খুললেন। সুন্দর সাজানো বসার ঘর। বাঁ দিকের ঘরটা উপাসনার। ভেতরে দুটো শোওয়ার ঘর, কিচেন আর টয়লেট। টেবিলের ওপর ধোওয়া বোতলগুলো রাখা ছিল। নবকুমারের মা কোনও কথা না বলে ক্যান থেকে মদ বোতলে ঢেলে দিল। সাড়ে তিনটে বোতলের রং পালটে গেলে নবকুমারের মা বলল, 'সামনের মাসে তিরিশ টাকা বেশি দিতে হবে।

ব্রাউন মাথা চুলকালেন, 'আবার দাম বাড়াচ্ছ ?'

'আমি বাড়াচ্ছি, না সরকার বাড়াচ্ছে ?' প্রশ্ন করে উত্তরের জন্যে না দাঁড়িয়ে বুড়ি যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে গেল।

এই সময় কুঁই কুঁই ডাক শুনে দেখলেন ভুটো লেজ নাড়ছে। ব্রাউন হাসলেন, 'ব্যাটা ভুটো, তোরও দেখছি নেশা হয়ে গেছে !'

এই সময় রাস্তা থেকে গলা ভেসে এল, 'যিশু কা বড়াই।'

ব্রাউন সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'যিশু কা বড়াই।'

তারপর বারান্দায় এসে দেখলেন সুন্দর পোশাক পরে ট্যাক্সি ড্রাইভার তামাং তার বউকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছে। ব্রাউন নেপালিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?'

'ওর বোনের বাড়িতে। বোনের বাচ্চা হয়েছে।'

'বাঃ। খুব ভাল। কিন্তু ফিরতে তো রাত হবে, সঙ্গে টর্চ নিয়েছ ?'

বউটি চাদরের আড়াল থেকে টর্চ বের করে দেখিয়ে হাসল। ওরা নেমে গেল।

আকাশের আলো নিবে যাচ্ছে। কুয়াশারা তেড়েফুঁড়ে উঠে আসছে ওপরে। ব্রাউন দরজা বন্ধ করে প্রার্থনার ঘরে ঢুকলেন। যিশুর মূর্তির সামনে বসে মোমবাতি জ্বাললেন। এই মূর্তিটা তিনি

কিনেছিলেন অনেক বছর আগে লিভারপুল থেকে। যিশু তাকিয়ে আছেন। সেই দৃষ্টির সামনে পৃথিবীর কোনও অন্ধকার আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ব্রাউন চোখ বন্ধ করলেন। যিশুর মুখখানা, ওই চাহনি মনে করতেই সমস্ত জগৎসংসার মুছে গেল মন থেকে। প্রায় মিনিট দশেক এক অপার্থিব আনন্দে ভেসে গেলেন তিনি। তারপর ভুটোর ডাক কানে যেতেই চোখ খুললেন তিনি। প্রার্থনায় বসলেই ভুটো ওইভাবে ডাকবে। প্রথম প্রথম বিরক্ত হয়েছিলেন। পরে মনে হয়েছে, এও বোধহয় প্রভুর ইচ্ছা। দশ মিনিটের বেশি তাঁকে বসতে দিতে তিনি রাজি নন।

দরজার বাইরে আসতেই ভুটো লেজ নাড়তে লাগল প্রবলভাবে। এই বাড়ির প্রায় সব ঘরেই কুকুরটির যাতায়াত অবাধ শুধু এই প্রার্থনার ঘরের দরজা কখনও সে ডিঙোয় না। হাত ধুয়ে কিচেনে চলে এলেন তিনি। মাংস নেই কিন্তু একটু কিমার তরকারি পড়েছিল সেটাই গ্যাসে গরম করে নিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে এলেন। না, ম্যাথুজের খবর কাল সকালেই নিতে হবে। আচমকা মাংসের দোকান বন্ধ করল কেন ?

বিছানার সামনে বেতের আরাম-চেয়ারের পাশে ডিশ রাখলেন ব্রাউন। গ্লাস এবং বোতল নিয়ে এলেন। তারপর উল্টোদিকের ঘরের টিভিটা চালু করলেন। আরাম চেয়ারে বসে গ্লাস ভর্তি করতেই ভুটো কুঁই কুঁই করে উঠল। চুমুক দেওয়ার আগে প্রিয় কুকুরের দিকে তাকালেন, 'সরি ভুটো ! মাংস নেই। একটু কিমা তোকে দিতে পারি। প্লেট নিয়ে আয়।'

বলামাত্র ঘরের কোণে পড়ে থাকা প্লাস্টিকের প্লেটটা মুখে করে নিয়ে এল ভুটো। ব্রাউন নিচু হয়ে তার ওপর দু চামচ কিমার তরকারি ঢেলে দিলেন।

বড় ভাল বানায় বুড়ি। কত দেশ ঘুরলেন এরকম জিনিস কখনও খাননি। বউ বলত, ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে ভাল হত। দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে তিনি তাকালেন। বড় ভাল ছিল বউটা। এই যে বাড়িটা, তিনি বসে আছেন, এ ওই বউ-এর জন্যে। জাহাজ থেকে টাকা পাঠাতেন আর তাই দিয়ে ছেলেমেয়ে মানুষ করা থেকে এই বাড়ি বানানো সব ওই বউ করেছে। ভাল মানুষদের যিশু তাড়াতাড়ি কাছে ডেকে নেন। তার মানে, তিনি খারাপ মানুষ। মনে আছে একবার ডারবানে তাঁকে ক্যাথলিক আর প্রটেস্ট্যান্টদের মারপিটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তিনি প্রাণ বাঁচাতে কখনও ক্যাথলিক কখনও প্রটেস্ট্যান্ট হয়েছিলেন। ভাল লোক হলে তাঁর প্রাণ হয়তো সেদিনই বেরিয়ে যেত। বেরিয়ে যিশুর কাছে কি যেত ? কিন্তু মা মেরি না থাকলে যিশু পৃথিবীতে আসতেন কী করে ? কে বড় এ নিয়ে যারা বড়াই করে তাদের সঙ্গী না হওয়া কি খারাপ লোকের কাজ ! মদ খেতে খেতে ব্রাউন নিজের মুখে হাত বোলালেন। জীবনে কুকর্ম অনেক করেছেন। সারাজীবন মদ খেয়েছেন প্রচুর। জুয়ো খেলেছেন। অন্য জাহাজিদের পাল্লায় পড়ে দু-একবার ক্যাবারে দেখতে গিয়েছিলেন ইউরোপে। দেখে ভাল লাগেনি। মেয়েমানুষের বস্ত্রহীন শরীর দেখে রাতের পর রাত যারা উল্লসিত হয় তাদের কীরকম নির্বোধ বলে মনে হয় তাঁর। গঠনের সামান্য তারতম্য ছাড়া যিশু তো তাদের আলাদা করেনি। একজনকে পরিপূর্ণ মনে দেখার পর আর আকাঙ্ক্ষা কী করে থাকে ?

টিভিতে জ্যোতি বসুকে দেখাচ্ছে। খবর হচ্ছে। জ্যোতি বসু বলছেন পাহাড়ে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছে। ওদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু পৃথক রাজ্যের দাবি কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না।

ব্রাউন মাথা নাড়লেন। কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এর চেয়ে ভাল কিছু বলতে পারেন না। হয়তো এই বক্তব্যের প্রতিবাদে আগামীকাল দার্জিলিং জেলায় বন্‌ধ ডাকা হবে। একনাগাড়ে দু-তিন মাস বন্‌ধের অভিজ্ঞতা যাদের হয়ে গেছে এক-দু দিনের বন্‌ধ তাদের নতুন কোনও অসুবিধে তৈরি করে না।

দরজায় শব্দ হল। এখন তাঁর কাছে কারও আসার কথা নয়। মাঝে মাঝে ডক্টর তামাং তাঁর রুগি দেখতে এ পাহাড়ে আসেন। ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এক গ্লাস খেয়ে নেমে যান। কিন্তু ডক্টর এলে তো তাঁর গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যেত আর ভুটোও চুপচাপ বসে থাকত না। তিনি উঠতেই ভুটো লেজ নাড়তে নাড়তে দরজার দিকে ছুটল। বাইরের আলো জ্বেলে দরজা খুলতেই সিমি বলে উঠল, 'তাড়াতাড়ি করো, ঠাণ্ডায় মরে যাচ্ছি। উঃ কী ঠাণ্ডা আজকে !'

দ্রুত ভেতরে ঢুকে মেয়েটা জিজ্ঞাসা করল, 'মাল খাচ্ছিলে বুঝি ?'

সিমির হাতে একটা বড় টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি। উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে বলল, 'নাও। মা পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'কী আছে ওতে ?'

'খাসির মাংস। বাপ কিনে এনেছে।' ব্রাউনের হাতে বাটি ধরিয়ে দিয়ে সে ছুটল শোওয়ার ঘরে, টিভির সামনে। তারপর তার চিৎকার শোনা গেল, 'ধুস, এসব কী দেখছ!' কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হিন্দি ছবির উত্তেজক গান কানে এল ব্রাউনের। তিনি কিচেনের দিকে পা বাড়াতেই ভুটো তাঁর সামনে দু পায়ে ভর রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্রাউন হাসলেন, 'সাবাস বেটা, বাটির মুখ ঢাকা তবু গন্ধ পেয়ে গেছিস! ঢাকনা খুলে দেখলেন, একজনের পক্ষে একটু বেশি মাংস পাঠিয়েছে সিমির মা। ওই মহিলা তাঁর স্ত্রীর বান্ধবী ছিলেন। মাথা নাড়লেন ব্রাউন। তারপর ভুটোকে তার প্রাপ্য মাংস দিয়ে শোওয়ার ঘরে এসে বসলেন। টিভিতে তখন প্রচণ্ড বেগে শরীর নাচিয়ে চলেছে একটি মেয়ে। তার পোশাকও খুব সংক্ষিপ্ত। সিমি বসে আছে বিছানার ওপর। তার চোখ ওই দৃশ্য গিলছে।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়ে হয়ে মেয়েদের শরীর দেখানো নাচ দেখতে তোর ভাল লাগে ?' মেয়েটিকে তিনি এযাবৎকাল তুমি বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু আজ নিজের অজান্তেই তাঁর মুখ থেকে তুই বের হল।

'বাঃ, দেখার জিনিস দেখব না কেন ? আমাদের টিভিতে কেব্‌ল নেই। মা কিছুতেই নেবে না। দিনের বেলায় এলে মা কিছু বলে না। রাত্রে যেখানে দেখতে যাব মা না বলে দেবে। আমাকে এক গ্লাস দাও না, চটপট!' হাত বাড়াল সিমি।

'তুই মদ খাবি ?'

'হুঁ। খুব ঠাণ্ডা লাগছে। এক গ্লাস দাও। তুমি তো রোজ গ্লাসের পর গ্লাস খাচ্ছ। খারাপ লাগলে নিশ্চয়ই খেতে না। দাও, দাও, বেশিক্ষণ এখানে থাকা যাবে না। জলদি!' আবদার চোখেমুখে এঁকে ফেলল সিমি। ব্রাউনের প্রথমে মজা লাগছিল। তারপর বিরক্তি থেকে রাগ এল। কিন্তু তবু তিনি হাসলেন, 'আমার নিজের পায়ে কুড়োল মারার শখ হয়নি। তোকে মদ খাওয়ালে তোর মা আর কখনও আমাকে খাবার পাঠাবে না।'

'ইস! মা জানতেই পারবে না।'

'মেয়েরা মদের গন্ধ কুকুরের মতো টের পায়।'

'এই, তুমি মাকে কুকুর বললে ?'

কথা বলার ভঙ্গিতে হো হো করে হেসে উঠলেন ব্রাউন। সেই সময় টিভির পর্দায় নৃত্য এবং সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত করে পুরুষের শরীরে উপুড় হয়ে নারীটি নিজেকে ঢেঁকির মতো ব্যবহার করছিল। সিমির চোখ বিস্ফারিত হয়ে সেই দৃশ্যে এঁটে গেছে। ব্রাউন মেয়েটিকে দেখলেন। তাঁর নাতনির থেকে সামান্য বড়। কিন্তু—।

এবার দৃশ্যটি পাল্টে যেতেই মাথা নেড়ে সিমি তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল। অদ্ভুত বোকা বোকা হাসি। ব্রাউন বললেন, 'এবার তুই বিয়ে করে ফ্যাল।'

এক বুক বাতাস নাকমুখ দিয়ে বের করে সিমি বলল, 'কাকে করব ? এখানে কোনও ছেলে আছে নাকি ? সবার ধান্দা একবার আমার শরীরকে ঠুকরে কেটে পড়ার।'

'তোর বয়ফ্রেন্ডরা কি আর ফিরবে না ?'

'কী জানি! আমেরিকায় মেয়েরা তো আমাদের থেকেও ফরসা, তাই না ?'

'আবার কালো মেয়েও রয়েছে সেখানে।'

'তবে ? না, কালোর দিকে ওরা তাকাবে না। ফরসা মেয়ে পেলে আমার কথা কি ওদের মনে থাকবে ? না থাকুক। আমি ঠিক করেছি আর চিঠি এসেছে কি না দেখতে যাব না। এই মোড়ের মাথায় দোকান করব। চাল ডাল আটা—, আমার দোকান থেকে কিনবে তো ?'

'নিশ্চয়ই কিনব। কিন্তু ওসবের দোকান করে কী লাভ হবে ? এই পাহাড়ে অন্তত পাঁচটা ওরকম

দোকান আছে। তুই অন্য কিছু ভাব।'

'কী ভাবব ?'

ব্রাউন চোখ বন্ধ করলেন, 'তুই মাংসের দোকান কর।'

'মাংস !'

'হ্যাঁ। আমি ম্যাথুজের সঙ্গে কথা বলব। ওর ওখানে প্রচুর জায়গা আছে।'

'কিন্তু মাংস বিক্রি করতে হলে রক্ত দেখতে হবে যে। আমি রক্ত সহ্য করতে পারি না। উঃ।' মাথা দোলাতে লাগল সিমি।

'সহ্য করতে পারি না বললে চলবে কেন ? মাংস খাওয়ার সময় তো রক্তের কথা মনে থাকে না, থাকে ? তবে ! নিজে না কাটতে পারিস লোক রাখবি। সে আড়ালে কাটবে। এখানে তো ম্যাথুজের ছাড়া আর কোনও দোকান নেই। দেখবি হু হু করে চলবে। দু বছরের মধ্যে আমেরিকায় যাওয়ার ভাড়া পেয়ে যাবি।'

'সত্যি বলছ ?' সিমি খাট থেকে নেমে দাঁড়াল, 'দেখো, কথা বলে দেখো। ম্যাথুজ তো আমার সঙ্গে কথাই বলে না। লোকটা কসাই না সন্ন্যাসী তাই আমি ঠিক বুঝতে পারি না।' সিমি চলে গেল। ভুটো গেল ওর পিছু পিছু। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে এল। ব্রাউন মাংসের টুকরো চামচে তুলে মুখে পুরল। ইস, নুন হয়নি একটুও। এই শীতের মধ্যে চেয়ারের আরাম ছেড়ে নুন আনতে যেতে হবে !

এখানে ভোর হয় ছটার পরে। রোদ ওঠে তার এক ঘণ্টা বাদে। চারপাশের কাছের পাহাড়গুলো শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে থম মেরে থাকে যতক্ষণ সূর্যের দেখা না মেলে। ব্রাউনের ঘুম ভেঙে যায় চারটের পরেই। পাঁচ ঘণ্টার বেশি বিছানায় থাকতে পারেন না তিনি। তখন চারপাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোথাও কোনও শব্দ নেই। ঘুমন্ত ভুটো বিরক্ত চোখে তার মনিবকে বাথরুমে যেতে দেখে। পরিষ্কার হয়ে প্রার্থনার ঘরে যান ব্রাউন।

ঘুম ভাঙার আগে তিনি আজ অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন। আকাশ থেকে একটি নক্ষত্র দলছুট হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। দূর মহাকাশ আলোয় মাখামাখি। আর একটি নক্ষত্রের সঙ্গে তার প্রবল সংঘর্ষ হতে সে ছিটকে হারিয়ে গেল কোথাও। কিন্তু তার শরীরের একটি খণ্ড ধীরে ধীরে নেমে আসছিল পৃথিবীর দিকে। একে কি উল্কাপাত বলে ! জাহাজে চাকরি করার সময় মাঝসমুদ্রে গভীর রাতে ব্রাউন অনেক উল্কাপাত দেখেছেন। কিন্তু তার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। ব্রাউন দেখলেন নক্ষত্রের খণ্ডটি ক্রমশ গোলাকার হয়ে ছোট হয়ে আসছে। তারপর তাদের এই পাহাড়ের ওপর চলে এসে ধীরে ধীরে নেমে গেল 'নিরাময়'-এর ওপর। নিরাময় তখন গভীর ঘুমে শান্ত। ব্রাউন প্রথমে ভেবেছিলেন নক্ষত্রখণ্ডটি নিরাময়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অঙ্গার করে দেবে। কিন্তু তার বদলে তিনি চেয়ে দেখলেন অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে 'নিরাময়'-এর বাড়িটিকে। এমন কী ওর সামনে যেসব শৌখিন গাছগাছালি ডাক্তার পুঁতেছিলেন তাদের এখন দারুণ সজীব দেখাচ্ছে।

এর পরেই ঘুম ভেঙে গেল। এ কীরকম স্বপ্ন ? প্রার্থনার ঘরে যিশুর মূর্তির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। প্রভু যখন জন্মেছিলেন তখন নক্ষত্র পথ চিনিয়ে দিয়েছিল। নিরাময়ে কেউ জন্মাতে আসে না। রক্তের রোগ যাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী করে দেয় তাদের আরাম দিতে ডাক্তার ওই সেবাকেন্দ্র করেছেন। তাহলে ওই আলোকিত আকাশের মায়া ওই বাড়িতে গেল কেন ! ব্রাউন শিহরিত হলেন। যিশুর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি অদ্ভুত নাড়া খেলেন। হ্যাঁ, ওই চিবুকের সঙ্গে অদ্ভুত মিল। আর সেই মিলটা খুঁজে পেতেই যিশুর মুখের বদলে ওই মুখ মনে ভেসে উঠছে। ব্রাউন খুব উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। নিজেকে শান্ত করার জন্য তিনি যিশুকে ডাকতে লাগলেন।

তারপর এক সময় অন্ধকার সরে গেল পৃথিবীর শরীর থেকে। সারারাত হিমে ভেজা পাহাড়ের গাছগুলো, রাস্তাটা এখন ছায়ামাখা, স্থির। সমস্ত শরীর গরম কাপড়ে ঢেকে, মাথায় টুপি, গলায় মাফলার জড়িয়ে ব্রাউন বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। নীচে নিরাময় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে

এই পাহাড়ের বাসিন্দাদের মতো নিরাময়ের মানুষদের ঘুম ভাঙেনি। ব্রাউন রাস্তায় নেমে এলেন। ভুটো তাঁর পেছন পেছন কয়েক পা এসে দাঁড়িয়ে গেল।

ধীরে ধীরে নিরাময়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন ব্রাউন। আশ্চর্য! বাড়িটাকে আজ একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে। গির্জার সামনে দাঁড়ালে মনে যে অনুভূতি আসে ঠিক সেইরকম বোধ হচ্ছে। একটা বাচ্চা ইউক্যালিপটাসের গাছ যাকে গতকালও ভাল করে নজরে পড়ত না আজ তাকেও কী গর্বিত দেখাচ্ছে। তাহলে কি তাঁর দেখা স্বপ্নটা শুধুই স্বপ্ন ছিল না। নিরাময়ের গেট বন্ধ। বাড়ির সব কটা জানলা এখনও রাতের রেশ নিয়ে রয়েছে। এই সময় ডাকাডাকি করা অন্যায় হবে। আর ডাকাডাকি করে লোক জাগিয়ে তিনি কী বলতে পারেন! যুক্তি প্রবল হলে আবেগ সঙ্কুচিত হয়। তবু ব্রাউন দাঁড়িয়েছিলেন। এই সময় দেখতে পেলেন কালো অলেস্টার, মাথায় টুপি হাতে ব্রিফকেস নিয়ে ফাদার জোসেফ উঠে আসছেন। খুব ধীরে ধীরে হাঁটছেন ভদ্রলোক। ব্রাউন চিৎকার করলেন, 'গুড মর্নিং ফাদার। যিশু কা বড়াই।'

'গুড মর্নিং। যিশু কা বড়াই। ভাল আছ মিস্টার ব্রাউন?'

'আমি? আমি তো কখনও খারাপ থাকি না। তা আপনি এই কাকভোরে কোত্থেকে আসছেন? খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে।' ব্রাউন কাছাকাছি হলেন।

'ওই একটু। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা একটুও ঘুমোতে পারিনি। ঠিক হয়ে যাবে।'

'কোনও খারাপ খবর ফাদার?'

'হ্যাঁ। পরশু নিমা বাহাদুরের মা প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বেচারারা এত গরিব যে ট্যাক্সি জোগাড় করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার অবস্থা নেই। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সটাও খারাপ। পরশু সারারাত তাঁর পাশে থাকতে হয়েছিল। সকালে জ্বর কমতেই আমি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করি। দিনের বেলায় তো চার্চে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ কম। আবার গত রাত্রে খবর এল মিস্টার রায়ের অবস্থা খুব খারাপ।'

'মিস্টার রায়? ঝোরার পাশে দোতলা বাড়ি?'

'হ্যাঁ। উনি তো ইদানীং এখানে থাকতেন না। তবে আমাদের চার্চের জন্য একসময় অনেক করেছেন। রাত এগারোটা নাগাদ ওখানে যাই। ডাক্তার তামাংও ছিলেন। তিনি বললেন কিছু করার নেই। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। মিস্টার রায়ের জ্ঞান ছিল। তিনি আমাকে প্রেয়ার করতে বললেন ওঁর জন্যে। আমার ব্যাগে কিছু ওষুধ ছিল। ডক্টর তামাং চলে গেলে আমি তার একটা দিতে চাইলাম। কিন্তু মিস্টার রায় জেদ ধরলেন তিনি আর ওষুধ খাবেন না। লক্ষণ যা ছিল তাতে ওষুধ কোনও কাজ করত না বলেই মনে হয়। ওঁর পাশে বসে প্রে করতে আরম্ভ করলাম। ঠিক ভোর পৌনে চারটের সময় তিনি চলে গেলেন। এখন অনেক কাজ বাকি। বুঝতেই পারছেন— !' ফাদার জোসেফ হাসলেন।

'কখন বললেন? ভোর পৌনে চারটের সময়?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'না। কিছু নয়।' হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ব্রাউন। ঠিক ওই সময় তিনি স্বপ্নটা দেখেছিলেন। মিস্টার রায় যদি পুণ্যবান মানুষ হন তাহলে নক্ষত্রটা ওপর থেকে নীচে নেমে আসবে কেন? তার তো নীচ থেকে ওপরে চলে যাওয়ার কথা।

এই সময় 'গুড মর্নিং' শব্দটা কানে আসতেই ওঁরা দুজন ঘুরে দেখলেন নিরাময়ের গেট খুলে ডাক্তার বেরিয়ে আসছেন মর্নিং ওয়াকের পোশাকে।

ওঁরা দুজনেই একসঙ্গে 'গুড মর্নিং' বললেন।

ডাক্তার কাছে এসে হাসলেন, 'আমার কী সৌভাগ্য! ভোরবেলায় আপনাদের মতো দুজন মানুষকে দেখতে পেলাম।'

ব্রাউন বললেন, 'নীচে ঝোরার পাশে মিস্টার রায় বলে এক ভদ্রলোক থাকতেন। আজ ভোরে তিনি মারা গিয়েছেন। ফাদার সারারাত তাঁর পাশে ছিলেন।'

'ও হো। তাই নাকি! মিস্টার রায়কে আমি দু-একবার দেখেছি। কিন্তু উনি তো শুনেছি

কলকাতায় থাকতেন। খারাপ লাগছে শুনে, খুব খারাপ লাগছে।'

ফাদার বললেন, 'তাহলে আমি এবার যাই ?'

ব্রাউন বললেন, 'দাঁড়ান। ডক্টর, একটা আবদার করতে পারি ?'

ডাক্তার হেসে ফেললেন, 'স্বচ্ছন্দে।'

'আমার বাড়িতে এসে একটু চা পান করুন।'

'এ কী কথা ? আমার নিরাময়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা, আগে আমার এখানে আসুন তারপর না হয় আপনার ওখানে যাওয়া যাবে। আসুন আসুন।' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ডাক্তার। হাত বাড়িয়ে ভেতরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

ফাদার জোসেফের ইচ্ছে ছিল না। চার্চে তাঁর প্রচুর কাজ বাকি। কিন্তু মিস্টার ব্রাউনের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। অফিসঘরে তাঁদের বসিয়ে ডাক্তার ভেতরে চলে গেলে ব্রাউন উৎসুক চোখে চারপাশে তাকালেন। সামনে একচিলতে সমতল জমি, তার ওপারে দোতলা বাড়িটিতে রুগিরা থাকে। বেশির ভাগেরই বয়স দশ থেকে কুড়ির মধ্যে। ব্রাউন ফাদার জোসেফের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফাদার, এখানে এসে আপনার অন্য কোনওরকম অনুভূতি হচ্ছে কি ? একটু আলাদা !'

ফাদার বিস্মিত হলেন, 'না তো !' তারপর মনে পড়ে যাওয়ায় বললেন, 'ও, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, তা তো হয়ই। এতগুলো ছেলেমেয়ে ওই দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত আর ডাক্তার তাদের বাঁচিয়ে রাখার কী চেষ্টাই না করে চলেছেন ! এখানে এলে মন যেমন খারাপ হয় আবার ভালও লাগে। বাড়িতে থাকলে ওরা কেউ এতদিন বাঁচত না। প্রথম যখন ডাক্তার আমার কাছে অ্যাপ্রোচ করেন তখন একটু অবাক হয়েছিলাম। উনি শিলিগুড়ি বা দার্জিলিং-এর ব্লাড ব্যাঙ্কের ওপর ভরসা না করে সরাসরি ফ্রেশ ব্লাড চান তাঁর পেশেন্টদের জন্যে। আজ প্রায় একশোজন মানুষ তাদের বিভিন্ন গ্রুপের রক্ত দিয়ে ডাক্তারকে চিকিৎসায় সাহায্য করছেন, এও তো ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় সম্ভব হয়েছে।'

ব্রাউন মাথা নাড়লেন। এসব তথ্য তিনি জানেন। এ নিয়ে একসময় বিরুদ্ধপ্রচারও হয়েছিল। বাঙালি ডাক্তার নেপালিদের রক্ত শুষে নিতে চাইছে। সেইসময় যারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। কিন্তু আজ ফাদারের কাছে তিনি অন্য কথা আশা করেছিলেন। এ কথা ঠিক সাধারণ মানুষের থেকে ফাদার জোসেফ অনেক বেশি ঈশ্বরনিবেদিত মানুষ। যিশুর অপার কৃপা ওঁর ওপর বর্ষিত হয়েছে। কোনও সমস্যা নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করলে মন কীরকম ভাল হয়ে যায়। তা সে-ই মানুষের আলাদা অনুভূতি থাকবে না ? স্বপ্নে দেখা নক্ষত্রের খণ্ড এই নিরাময়ের ওপর নেমে এসেছিল। ওটা স্বপ্ন হলেও এই বাড়িটার গায়ে জ্যোতি ছড়িয়ে দিল কে ? একটুও কি আলাদা মনে হচ্ছে না ? এটা জানবার জন্যেই তিনি গায়ে পড়ে চায়ের কথা তুলেছিলেন।

ডাক্তার একটা ট্রেতে তিন কাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে এলেন।

ফাদার বললেন, 'আমরা একটা অন্যায় করলাম। আপনার মর্নিং ওয়াকে বাধা পড়ল।'

চায়ের কাপ হাতে হাতে তুলে দিয়ে ডাক্তার বললেন, 'অন্যায় কেন হবে। ঠিক আছে।'

'না ডাক্তার। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব জীবনযাত্রা আছে। ভোরবেলায় নিত্য হেঁটে আপনি শুধু শরীরকে সুস্থ রাখেন না মনেরও আরাম পান। দেখবেন আজ সারাদিন ধরে অস্বস্তি কাজ করবে, না হাঁটার জন্য। বরং চা খেয়ে আপনি একটু ঘুরে আসুন।'

ডাক্তার হাসলেন। এবার ব্রাউন প্রশ্নটা না করে পারলেন না, 'আচ্ছা ডাক্তার, আজ সকালে এই নিরাময়ের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে না চারপাশ বেশ উজ্জ্বল, ঝকঝকে ?'

ডাক্তার তাকালেন বাড়িটার দিকে, 'অনেকদিন পর আজ ভোরবেলায় চমৎকার আলো ছড়িয়েছে বলে আপনার কাছে উজ্জ্বল মনে হচ্ছে মিস্টার ব্রাউন। কিন্তু এই বাড়ির বাসিন্দাদের শরীর যদি এমনই আলোকিত হত তাহলে আমি বেশি খুশি হতাম। গত রাতে একটি মেয়ের অবস্থা খারাপ হয়েছিল। তখনই তাকে রক্ত দিতে হয়েছে।'

ফাদার জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাতে কাকে পেলেন ?'

ডাক্তার বললেন, 'ঘটনাচক্রে আমার গ্রুপের সঙ্গে ওর গ্রুপ মিলে গিয়েছিল। আর আমিও গত ছয়

মাসে রক্ত দিইনি। তাই কাল কোনও সমস্যা হয়নি।'

ফাদার জোসেফ চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন, 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন এই প্রার্থনা। আচ্ছা— !'

ব্রাউন বললেন, 'এক মিনিট। ডাক্তার, গতকাল বিকেলে যে ছেলেটির সঙ্গে আপনি শহর থেকে ফিরছিলেন, কী নাম যেন, ও হ্যাঁ, সায়ন, সে কি এখনও ঘুমোচ্ছে ?'

ডাক্তার অবাক হলেন, 'কেন বলুন তো !'

'তাকে আমি একবার দেখতে পারি কি ? অবশ্য যদি তার ঘুম ভেঙে থাকে— ।'

'ঘুম নিশ্চয়ই ভেঙেছে। সুস্থ থাকলে সায়নের এখন পড়াশুনার সময়। আপনি কি বাড়িতে থাকবেন ? তা হলে ওর পড়াশুনা হয়ে গেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলতে পারি।'

'না না তার দরকার নেই। আমিই না হয় পরে একবার আসব।' ব্রাউন ফাদারের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ডাক্তার পেছন পেছন আসছিলেন।

ফাদার বললেন, 'বাঃ। আপনার এখানে প্রচুর ফুল ফুটেছে তো ' ডাক্তার গ্রান্ডিফ্লোরা গাছটির দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন, 'কী আশ্চর্য ! গতকাল পর্যন্ত গাছটায় কোনও ফুল ছিল না। কুঁড়ি থাকলেও নজর দিইনি। আজ একসঙ্গে এত ফুল—প্রকৃতির মরজি বোঝা মুশকিল।'

ব্রাউন কথাগুলো শুনতে শুনতে উত্তেজিত হলেন। স্বপ্নটির কথা এঁদের বলা যাচ্ছে না কিন্তু এই ফুল ফোটা তো সেই স্বপ্নের প্রতিক্রিয়াতে হতে পারে ! তিনি বাড়িটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'ডাক্তার, সায়নের পড়াশুনা কি এত জরুরি যে, তাকে একবার দেখা যাবে না ?'

ডাক্তার খুব অবাক হয়ে গেলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো !'

'আমি ঠিক বোঝাতে পারব না।'

'খুব জরুরি প্রয়োজন না থাকলে নিয়মটা না ভাঙাই উচিত মিস্টার ব্রাউন।'

'বেশ। চলুন ফাদার।'

ওঁরা দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। ফাদার জোসেফ জিজ্ঞাসা করলেন, 'সায়নকে আপনার দেখতে চাওয়ার পেছনে কোনও কারণ আছে মিস্টার ব্রাউন ?'

'না, তেমন কিছু নয়। আমি বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।'

ফাদার জোসেফ আর একটু এগিয়ে বললেন, 'আপনার ভুটো কীরকম উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে দেখুন।'

দেখা গেল ব্রাউনের বাড়ির সামনে ভুটো মুখ তুলে বসে আছে। ব্রাউন মাথা নাড়লেন, 'ভুলেও ভাববেন না আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওর গার্ল ফ্রেন্ডের আসার সময় হয়েছে। দুদিন সে আসেনি। ম্যাথুজের কুকুর। সে এলে ম্যাথুজ মাংস কাটবে। মাংস কাটা হলে ভুটো জানে তার খাওয়া-দাওয়া ভাল হবে। একদম সরল হিসেব।'

ফাদার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় একটা মারুতি তীব্রবেগে নীচ থেকে উঠে আসতে আসতে সশব্দে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে পড়ল।

৩

ব্রাউন এবং ফাদার দুর্ঘটনা দেখার ধাক্কা কাটিয়ে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলেন গাড়িটার কাছে। চিৎকার এবং গোঙানি ভেসে আসছে কাত হয়ে থাকা গাড়ির ভেতর থেকে। যেহেতু গাড়িটা মারুতি তাই ওঁরা টেনে হিঁচড়ে সেটাকে সোজা করতে পারলেন। ড্রাইভার অজ্ঞান হয়ে গেল, প্রচুর রক্ত বের হচ্ছে তার শরীর থেকে। পেছনে বসা মেয়েটি সিটের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে উঃ আঃ করে যাচ্ছে। তারও মাথা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। চেষ্টা করেও ওঁরা দুজন দরজা খুলতে পারলেন না। ধাক্কা লাগায় গাড়িটার শরীর এমনভাবে তুবড়ে গেছে যে দরজা খোলা যাচ্ছে

না। এই সময় বড়বাহাদুর ছুটে এল। পাথর তুলে কাচ ভেঙে ভেতর থেকে চাপ দিয়ে কোনওরকমে ওপাশের দরজা খুলে ফেলল সে। ফাদার বললেন, 'এদের এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।' বড়বাহাদুরের চিৎকার কানে যেতে নিরাময় থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ডাক্তারবাবু। ব্যাপারটা বুঝেই তিনি ভেতরে চলে গেলেন। আহতদের বাইরে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর গাড়ি নিয়ে চলে এলেন পাশে। ফাদার বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার। ড্রাইভার একটু বেশি রকমের আহত হয়েছে, ওদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আসি চলুন।'

দুজনকে গাড়ির পেছনের আসনে তোলা হলে ব্রাউন বললেন, 'ফাদার, আপনি খুবই ক্লান্ত, আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন, আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে।'

ফাদার হাসলেন, 'না না। এই কাজটা অনেক বেশি জরুরি। আপনি বরং এদের বাড়িতে খবরটা পৌঁছে দিন।'

গাড়িটা আর দাঁড়াল না। এবং তখন ব্রাউনের খেয়াল হল ড্রাইভারকে তিনি চেনেন না। এই অঞ্চলের গাড়িও নয়। তিনি বড়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদের তুমি চিনতে পেরেছ ?'

বড়বাহাদুর মাথা নাড়ল, 'মনে হচ্ছে দার্জিলিং-এর গাড়ি। মাঝে মাঝে এই রাস্তা দিয়ে ওপরে উঠে যায় বিকেলবেলায়। যখন যায় তখন খালি থাকে। ফেরার সময় ওই মেয়েটাকে পেছনে বসে থাকতে দেখেছি।'

'কোথায় যায় ? কোন বাড়িতে ?'

'কোঅপারেটিভ দোকানের পাশ দিয়ে যে রাস্তা পাহাড়চূড়ায় চলে গিয়েছে সেখানে মনে হয় ভাড়া থাকে ওরা। বেশি দিন আসেনি। প্রধানের বাড়ি।'

ব্রাউন মনে করতে পারলেন। নিমা প্রধান এককালে গাড়ি চালাত। সেটা করতে করতে ট্যাক্সির মালিক হল। শিলিগুড়ি দার্জিলিং রুটে সিজনে প্রচুর পয়সা। তা থেকে আরও ট্যাক্সি। এখন বাস আর লরির মালিক হয়েছে। টমসনবুড়ির বাড়িটা কিনে নিয়ে নতুন করে সাজিয়েছিল থাকবে বলে। শেষ পর্যন্ত মত বদলে শিলিগুড়ির সেবক রোডে বাড়ি করে চলে গিয়েছে। মাস পাঁচেক হল ওই বাড়িতে ভাড়াটে এসেছে। ব্রাউন খবর পেয়েছিলেন ভাড়াটে পরিবার কারও সঙ্গে মেশে না। জিনিসপত্র এবং জীবনযাপনের ধরন দেখে বোঝা যায় টাকাপয়সা রয়েছে। ম্যাথুজের দোকানে যাতায়াতের পথে ওপাড়ার লোকজন এসব গল্প করে যায়। ভাসা ভাসা কানে আসে ব্রাউনের। পরিবারটি ক্রিশ্চান হওয়া সত্ত্বেও চার্চে যায় না বলে অনেকের অনুযোগ আছে। ব্রাউন এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি। যদি কেউ তার নিজের মতো বেঁচে থাকতে চায় তা হলে নাক গলানো অনুচিত।

ব্রাউন ওপরে ওঠার জন্যে হাঁটতে শুরু করতেই নিরাময়ের দরজায় সায়নকে দেখতে পেলেন। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'গুড মর্নিং, মাই বয়।'

'গুড মর্নিং।' সায়ন একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাকসিডেন্টে কেউ মারা যায়নি তো ! আমাকে ছোটবাহাদুর বলল— !'

'নো মাই বয়। কেউ মারা যায়নি। তবে একজন গুরুতর আহত হয়েছে। তোমার পড়াশুনো হয়ে গেল ?' ব্রাউন কথা বলতে বলতে গত রাতের স্বপ্নটার কথা ভাবছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নজর চলে গেল সায়নের চিবুকের দিকে। শিহরিত হলেন তিনি। এই বৃদ্ধ বয়সেও লোমকূপ ফুলে উঠল। শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল।

'অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে শোনার পর আর পড়তে ইচ্ছে করছে না। কী করে হল ?'

'গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট দুটো কারণে হয়। যন্ত্রপাতি আচমকা খারাপ হয়ে গেলে অথবা ড্রাইভারের নিয়ম না মেনে চালানোর কারণে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টাই কারণ। অত বিশ্রী জোরে গাড়িটা উঠে আসছিল। আচ্ছা, আমি চলি, ওদের বাড়ির লোক এখনও জানে না, খবরটা দিয়ে আসা দরকার।'

ব্রাউন পা বাড়াতেই সায়ন এগিয়ে এল, 'আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই তা হলে কি আপত্তি করবেন ?'

খুশি হলেন ব্রাউন, 'না-না। আমার আপত্তি থাকবে কেন ? তবে ডাক্তার যেন মনে না করেন তুমি ডিসিপ্লিন ভেঙেছ।'

মুখে কিছু না বলে একগাল হেসে মাথা নাড়ল সায়ন। তারপর দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। ওর ছোটার ভঙ্গি দেখে আশ্বস্ত হলেন ব্রাউন। ছেলেটা নিশ্চয়ই সেরে উঠেছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বেরিয়ে এল সায়ন, 'বড়বাহাদুরকে বলে এলাম।' কয়েক পা হেঁটে সে নিশ্বাস নিল শব্দ করে, 'আঃ! কী ভাল!'

ব্রাউন আড়চোখে তাকালেন ছেলেটার দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল রাত্রে তোমার ঘুম কী রকম হয়েছিল?'

'ঘুম? কাল আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।'

'স্বপ্ন? কখন? ভোরের দিকে?' ব্রাউন উত্তেজিত হলেন।

'কখন বলতে পারব না, নির্মাল্যকে স্বপ্নে দেখলাম। ও খুব মন খারাপ করে বসে আছে। আমি অনেক ডাকলাম, সাড়া দিল না।'

'নির্মাল্য কে?'

'এখানে থাকত। আমরা খুব বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। ওর বাবা ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন।'

'ও কি সুস্থ হয়ে ফিরে গেছে?'

'নাঃ।'

একটু হতাশ হলেন ব্রাউন। নক্ষত্রের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা আলোকখণ্ড যা নিরাময়ের ওপর নেমে এসেছিল তাঁর স্বপ্নে তার সঙ্গে সায়নের দেখা স্বপ্নের কোনও মিল নেই।

ওপরে ওঠার সময় ব্রাউন খুব শ্লথ হয়ে যান। তাঁর বয়স হয়েছে। সামান্য ঝুঁকি বিপদ ডেকে আনতে পারে। তা ছাড়া সায়নের কথা মনে রাখতে হচ্ছে তাঁকে। বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন ভুটো তখনও একাই বসে আছে। তাঁকে দেখতে পেয়ে একবার ছোট্ট করে ডাকল। ডেকে ভেতরে চলে গেল।

সায়ন বলল, 'কুকুরটা সবসময় ছাড়া থাকে?'

'হ্যাঁ। ও কোথাও যায় না। গার্ল ফ্রেন্ড ওর কাছে আসে।'

সায়ন হেসে ফেলে। কুকুরের গার্ল ফ্রেন্ড আছে ভাবলেই কী রকম লাগে। তারপরই মনে হল ইংরেজি শব্দটায় তো কোনও ভুল নেই। হাসির কী আছে।

ম্যাথুজের দোকান আজও বন্ধ। অতএব তার দোকানের পাশে নিচু পাঁচিলে কোনও আড্ডা জমেনি। ওপর থেকে দুজন বয়স্কা মহিলা নামছিলেন। তাঁদের একজন কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'যিশু কা বড়াই।'

সঙ্গে সঙ্গে ব্রাউন একই শব্দ উচ্চারণ করলেন।

দ্বিতীয় মহিলা বললেন, 'আপনার শরীর কেমন আছে?'

ব্রাউন বললেন, 'একদম ঠিক আছি। এভাবে ঠিক থাকতে থাকতে যদি যিশু আমাকে টেনে নেন তা হলে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ থাকবে না।'

মহিলা দুজন একসঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন। ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা এই সাতসকালে সেজেগুজে কোথায় চললে তোমরা?'

মহিলারা প্রতিবাদ করলেন একসঙ্গে। প্রথমজন বললেন, 'ওমা, কোথায় সেজেছি আমরা? একে কি সাজ বলে? তিনধারিয়া যাচ্ছি। ওখানকার স্কুলে শুনছি আয়া নেবে। দেখি চেষ্টা করে।'

'তিনধারিয়া? সেন্ট টমাস স্কুল?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানকার প্রিন্সিপালকে আমার কথা বলবে। উনি আমাকে চেনেন।'

'উঃ, কী ভাল হল।' মহিলারা খুশি হয়ে নেমে গেলেন।

ব্রাউনকে কয়েক পা যেতে না-যেতেই দাঁড়াতে হচ্ছে। ওপর থেকে যারা নামছে তারা তো বটেই, রাস্তার একপাশের বাড়িগুলোর বারান্দায় দাঁড়ানো কোনও না কোনও মানুষ আগ বাড়িয়ে কথা বলছে। সায়ন দেখল ব্রাউন এঁদের সব খবর রাখেন। এবং কথা বলার সময় এমন গলায় বলছেন যে তাঁকে ওদের ঘরের লোক বলে মনে হচ্ছে। এভাবে থেমে থেমে ওঠায় সায়নের ভাল

লাগছিল।

কোঅপারেটিভ স্টোর্স তখনও খোলেনি। অনেকটা চড়াই ভেঙে ব্রাউন এখন একটু হাঁপাচ্ছিলেন। সায়ন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে লজ্জা পেলেন। ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'বয়স কাউকে রেহাই দেয় না। যে পথটা আমি একদমে স্বচ্ছন্দে উঠে আসতাম সেই পথ ধীরেসুস্থে এলেও শরীর ঠিক নিতে পারছে না এখন। আমার ইঞ্জিনের শক্তি কমে গিয়েছে বেশ বুঝতে পারছি। চলো।'

একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বাড়িটা দেখিয়ে দিল। বাড়িটা ছিমছাম। একপাশে স্কোয়াশের ঝোপে স্কোয়াশ ঝুলছে, অন্য দিকে ফুলের বাগান। ব্রাউন এগিয়ে গিয়ে দরজার ফ্রেমে লাগানো বোতাম টিপলেন। সায়ন দেখল দুটো হনুমান স্কোয়াশের ঝোপ থেকে লাফিয়ে ওপাশে চলে গেল।

দরজা খুললেন একজন প্রৌঢ়া মহিলা। পোশাক এবং মুখচোখে বেশ সম্ভ্রান্ত ভাব।

ব্রাউন বললেন, 'আমি ব্রাউন। নীচে থাকি। আপনার নামটা—?'

'মিসেস ডিসুজা।'

'ওয়েল, মিসেস ডিসুজা, আপনার কোনও মেয়ে কি বাড়ির বাইরে গিয়েছে?'

'সেই খবরে আপনার কী প্রয়োজন? আমি চাই না কেউ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে খোঁজখবরে আগ্রহী হয়।' মিসেস ডিসুজা কঠিন মুখে বললেন।

'আপনার আপত্তি থাকলে কারও আগ্রহ দেখানো উচিত নয়। কিন্তু আমি নিরুপায় হয়ে এসেছি। মেয়েটি ঠিক আপনারই এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। দু-একজন বলল সে এ-বাড়িতে থাকে তাই খবরটা দিতে আসতে হয়েছে।'

এবার সন্দেহের চোখে তাকালেন ভদ্রমহিলা, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'একটু আগে নীচের নিরাময় আরোগ্য নিকেতনের সামনে একটি লাল মারুতি অ্যাকসিডেন্ট করেছে। ড্রাইভারটির অবস্থা ভাল নয়। পেছনে যে মেয়েটি বসেছিল তার আঘাত বেশি নয়। আপনার মেয়ের কি মারুতি গাড়িতে আসার কথা ছিল?'

এবার মহিলার চেহারা পাল্টে গেল। আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় আছে ওরা? আমার মেয়ে, মানে, ও গাড়িতে আসে কখনও ফিয়াট কখনও মারুতিতে। দাঁড়ান প্লিজ, আমি ফোন করে দেখি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে ভদ্রমহিলা ছুটে এলেন, 'কোথায় আছে ও?'

'ওদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু—?'

'আমার মেয়ে দার্জিলিং থেকে মারুতি গাড়িতে ফিরছিল। মাই গড, এখন কী হবে? আমি কী করি?' অস্থির হয়ে উঠলেন প্রৌঢ়া।

'আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। যদি ও আপনার মেয়ে হয় তা হলে তেমন কোনও বিপদ হয়নি: ওদের নিয়ে ডক্টর এবং ফাদার হাসপাতালে গিয়েছেন। আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি মিসেস ডিসুজা। আপনি তৈরি হয়ে নিন। কোঅপারেটিভ স্টোর্সের পাশে স্টিফেন থাকে। ওর ট্যাক্সি আছে। আমি বলে দিচ্ছি আপনার কাছে আসতে। আপনি হাসপাতালে চলে যান।'

'আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি। সময় নষ্ট করতে চাই না আমি।' প্রৌঢ়া কথাগুলো যখন বলছেন তখন আর একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল পেছনে। ব্রাউনের মনে হল এই মেয়েটি মারুতি গাড়িতে বসা মেয়েটির থেকে অনেক বেশি সুন্দরী। জিনস আর শার্ট পরে থাকলেও সৌন্দর্য উথলে পড়ছে।

মেয়েটি বলল, 'মামি, আমি তোমার সঙ্গে যাব?'

'না। তুমি বাড়িতে থাকো সোনা। আমি এখনই আসছি।' প্রৌঢ়া আবার ভেতরে ছুটে গেলেন। ব্রাউন হাসলেন, 'তোমার নাম কী খুকি?'

মেয়েটির কপালে ভাঁজ পড়ল, 'জুলি ডিসুজা। দিদির সেন্স ছিল না?'

'ছিল। কিন্তু সে এত নার্ভাস ছিল যে কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। দ্যাখো, আমি এখনও

জানি না সে তোমার দিদি কিনা। কিন্তু এটা বলতে হবে যিশু তাকে রক্ষা করেছেন।' ব্রাউন বললেন।

'এর মধ্যে যিশু এল কী করে?'

'মানে?'

'অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। যদি বেঁচে যায় তা হলে বুঝতে হবে বেশি আঘাত লাগেনি। লাগলে বাঁচত না। যিশু কবে মারা গিয়েছেন। তাঁর পক্ষে এতদিন পরে এসে সব কাজ ফেলে দিদিকে বাঁচাতে যাওয়ার কথা কল্পনা করা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? তাঁর অত দায়িত্ব থাকলে তো তিনি অ্যাকসিডেন্টটাই হতে দিতেন না।' মেয়েটির গলায় কীরকম ঠাট্টা ফুটে উঠল।

ব্রাউন হাসলেন, 'বাঃ! তোমার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল। আজ এখন তো ঠিক পরিস্থিতি নয়, তোমার যদি সময় হয় আমার কাছে এসো। নীচের রাস্তায় মিস্টার ব্রাউনের বাড়ি বললে যে-কেউ দেখিয়ে দেবে।'

ইতিমধ্যে প্রৌঢ়া বেরিয়ে এলেন। তিনি পোশাক বদলেছেন এবং হাতে ব্যাগ নিয়েছেন। সায়ন লক্ষ করল এই মহিলার মধ্যে একটা আলাদা ছাপ রয়েছে যা এখানকার অন্য মহিলার মধ্যে নেই।

স্টিফেনকে পাওয়া গেল। সে গাড়ি বের করছিল তখন শহরের ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে যাবে বলে। তাকে বলতেই সে রাজি হয়ে গেল। হাসপাতালে পৌঁছে দিতে তিরিশ টাকা নেবে। প্রৌঢ়া পেছনে উঠে বসলে স্টিফেন বলল, 'বাবা, তোমরা সামনে বসে যাও। নামিয়ে দিচ্ছি।'

ব্রাউন মাথা নাড়লেন, 'না। ওঁর আপত্তি থাকতে পারে।'

মিসেস ডিসুজা পাথরের মতো মুখ করে বললেন, 'ঠিক আছে, বসতে পারেন।'

পাহাড়ের ওপর থেকে পাক খাওয়া রাস্তা ধরে গাড়িতে আসতে সায়নের খুব ভাল লাগে। নির্মাল্যর নাকি গা গোলায়, বমি পায়। সায়নের ওসব কিছুই হয় না। ব্রাউনের বাড়িটা দেখা যেতেই তিনি বললেন, 'এসে গিয়েছে ও।'

সায়ন দেখল ভুটোর পাশে আর একটা কুকুর চুপচাপ বসে আছে। স্টিফেন গাড়িটা থামালে ওরা নেমে পড়ল। ব্রাউন একটু ঝুঁকে বললেন, 'এই হল আমার বাড়ি। আমি আর আমার কুকুর থাকি। যদি কোনও প্রয়োজন পড়ে স্বচ্ছন্দে আমাকে খবর দেবেন। যিশু আপনার মেয়ের মঙ্গল করবেন।'

মিসেস ডিসুজা বললেন, 'ধন্যবাদ।'

গাড়িটা নেমে গেল নীচে। ভুটো এবার জোর গলায় ডেকে উঠতেই দ্বিতীয় কুকুর সুড়সুড় করে হাঁটা শুরু করল। যেন ব্রাউনকে ফিরে আসতে দেখে ভুটো ওকে চলে যেতে বলল। সায়ন বলল, 'আমি চলি।'

'যাবে? একটু ভেতরে এসো না। কফি খাবে?'

ভেতরে এল সায়ন, 'না। ডাক্তার আঙ্কল আমাকে রুটিনের বাইরে খেতে নিষেধ করেছেন। তা ছাড়া কফি আমার খুব কড়া লাগে।'

'ঠিক আছে তা হলে। এই হল আমার প্রার্থনার ঘর।' একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাউন বললেন। কাঠের মেঝের ওপর সুন্দর কার্পেট পাতা। দেওয়ালের দিকে বড় আসনের ওপর যিশুর মূর্তি। তার পায়ের কাছে মোমবাতি জ্বলছে বাতিদানে। সেই আলোয় মূর্তিটিকে অপূর্ব দেখাচ্ছে।

সায়ন বলল, 'কী ভাল।'

'তাই? তোমাকে একটা কথা বলি?'

সায়ন তাকাল বৃদ্ধের মুখের দিকে।

'যিশুর চিবুকের সঙ্গে তোমার চিবুকের মিল আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল সায়ন। তারপরই খুব লজ্জা পেল, 'যাঃ। উনি ভগবান। ভগবানের সঙ্গে কি মানুষের মিল থাকে?'

ব্রাউন বললেন, 'যিশু ভগবান নন। ভগবান হলেন সর্বশক্তিমান। যিশু তাঁর পুত্র। তিনি মহামানব। ঈশ্বরের আশীর্বাদ পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পদচিহ্ন ধরে হাঁটলে, তাঁর ছায়ায় নিজের ছায়া মিলিয়ে দিলে তাঁকে স্পর্শ করা যায়। প্রতি যুগে

মানুষ কারও না কারও মধ্যে যিশু কিংবা মা মেরিকে দেখেছে। দেখেছে বলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়নি।'

সায়নের মনে পড়ল, 'যেমন মাদার টেরেসা। তাই তো?'

ব্রাউন অবাক হয়ে তাকালেন, 'তিনি যা করছেন তার তুলনা খুব কম আছে। তবে তিনি নিজেকে মহামানবী বলে ভাবতে চান না। বলা যায়, সাধারণ মানুষ আর মহামানবের মাঝখানে যদি কোনও স্তর থাকে তা হলে তিনি সেই স্তরে আছেন।'

হঠাৎ সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার একা থাকতে খারাপ লাগে না?'

ব্রাউন মাথা নাড়লেন, 'দিনের বেলায় এই পাহাড়ের মানুষদের সঙ্গে বেশ কেটে যায়, রাত্রে মাঝে মাঝে খারাপ লাগে। তখন এই ঘরে আসি। ওঁর সামনে বসলে আমার মন ভাল হয়ে যায়। যিশু পরম করুণাময়।'

সায়ন চোখ বন্ধ করে যিশুর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকেই কল্পনা করল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ চোখের পাতায় যিশু চলে এলেন। সে খুশি হল। আর কোনওদিন যিশু তার কাছ থেকে হারিয়ে যাবেন না। কাউকে চিরকাল নিজের কাছে ধরে রাখতে সে এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। এখন চোখ বন্ধ করলেই সে মাকে দেখতে পায়।

হাসপাতালে পৌঁছোনো পর্যন্ত মেয়েটির মুখ থেকে একটিও কথা বের হয়নি। ফাদার তার ক্ষতস্থানে রুমাল বেঁধে দিয়েছিলেন। বারংবার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও সে চুপ করে ছিল। ড্রাইভারের রক্তপাত হচ্ছিল খুব। মাথার একপাশে আঘাত লেগেছে। ওর অবস্থা দেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাখতে চাইলেন না। তখনই ফার্স্ট এইড দিয়ে ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দেওয়া হল শিলিগুড়ির মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালে।

মেয়েটা মাথায় আঘাত লাগা ছাড়া পায়ে খুব চোট পেয়েছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে তাকে ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার এবং ফাদার যখন চলে আসছিলেন লোক্যাল থানার সাব-ইনসপেক্টর এলেন। যে কোনও দুর্ঘটনা এবং তা থেকে আহতদের ঘটনাগুলো পুলিশের এক্তিয়ারে পড়ে। ডাক্তার দেখলেন সাব-ইনসপেক্টরটি নতুন, আগে দেখেননি।

সাব-ইনসপেক্টর বললেন, 'আপনারা যখন আহতদের হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন তখন আপনাদের স্টেটমেন্ট নেব। একটু কোঅপারেশন চাই।'

ফাদার বললেন, 'অফিসার। আমি খুব জরুরি কাজ ফেলে এসেছি। আজ ভোরে একজন মারা গিয়েছেন। তাঁর পারলৌকিক কাজ শুরু করা দরকার।'

'এক্ষেত্রে আপনার আসা উচিত হয়নি ফাদার।' সাব-ইনসপেক্টর বললেন।

'চোখের সামনে দুর্ঘটনা ঘটলে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াটা জরুরি বলে মনে হয়েছিল। চিরকালই তাই মনে হবে। এখন এখানে আমার কিছু করার নেই। আপনাকে যদি স্টেটমেন্ট বিকেলে দিই তা হলে কি খুব অসুবিধে হবে?'

সাব-ইনসপেক্টর কাঁধ নাচালেন, 'আপনি কোনও চার্চে আছেন?'

ডাক্তার শুনছিলেন চুপচাপ। এবার বললেন, 'ফাদার। এত দেরি যখন হয়েছে আরও কয়েকটা মিনিট খরচ করলে যদি আমাদের ইয়াং অফিসার বন্ধুর কাজ হয়ে যায় তা হলে তাই করে দেওয়া যাক। অফিসার, আমি একজন ডাক্তার। এখান থেকে তিন মাইল দূরে পাহাড়ে আমার একটা নার্সিংহোম আছে। আজ সকালে চিৎকার-চেঁচামেচি কানে যেতে আমি বেরিয়ে এসে দেখি একটি মারুতি গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছে। গাড়িতে দুজন মানুষ ছিল। ড্রাইভার এবং একটি মেয়ে। ড্রাইভারের জ্ঞান ছিল না। মেয়েটি বোধহয় প্রাথমিক শকে কথা বলতে পারছিল না। আমি আমার গাড়ি বের করে ফাদারকে নিয়ে ওদের হাসপাতালে পৌঁছে দিতে এসেছি।'

'অ্যাকসিডেন্ট কীভাবে হয়েছিল?'

'আগেই বললাম চিৎকার শুনে যখন আমি নার্সিংহোমের বাইরে আসি তার আগেই অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গিয়েছিল। কীভাবে হয়েছিল দেখতে পাইনি।'

'ভিক্টিমদের পরিচয় জানেন ?'
'না। আমি জানি না।'
'হুম। ফাদার, আপনি অ্যাকসিডেন্টটা দেখেছেন ?'
'হ্যাঁ। গাড়িটা প্রচণ্ড গতিতে ওপরে উঠতে গিয়ে সামলাতে পারেনি। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে কাত হয়ে পড়ে।'
'কেউ কি গাড়িটাকে চেজ করছিল ?'
'না তো।'
'ওখানে কী করছিলেন আপনি ?'
'আমি আর মিস্টার ব্রাউন ডাক্তারের ওখান থেকে চা খেয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎই ওই দুর্ঘটনা ঘটল।'
'মিস্টার ব্রাউন কে ?'
'আমাদের ওখানকার একজন প্রবীণ মানুষ।'
'প্যাসেঞ্জারদের আপনি চেনেন ?'
'না।'
'সে কী ? আপনি একজন ফাদার। আপনার এলাকার মানুষদের না চেনা কি বিশ্বাসযোগ্য ? ভেবে বলুন।'
'যাকে চিনি না তাকে ভেবে চেনা যায় না অফিসার।'
'তাই নাকি ?'
এবার ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, 'ওয়েল, অফিসার। আপনার সঙ্গে কোঅপারেশন করা হল। এবার আমরা যাচ্ছি। একটা কথা, আমাকে আপনার থানার অফিসার ইন চার্জ ভাল করে চেনেন। দার্জিলিং জেলার পুলিশের কর্তারাও আমার পরিচিত। আপনি যেভাবে জেরা করলেন তা জানলে এরপর কোনও সাধারণ মানুষ আহতদের হাসপাতালে পৌঁছোতে আসবে না। প্লিজ নিজেকে রেক্টিফাই করার চেষ্টা করুন।'
'আপনি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন ?'
'আপনি তরুণ, এখনও— ।'
'শুনুন। আমি আপনাকে থানায় যেতে বাধ্য করতে পারি তা জানেন ?'
'কোন কারণে ?'
'আপনি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। প্রকৃত ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করছেন। আমার ওপরওয়ালার সঙ্গে পরিচয় আছে বলে হুমকি দিচ্ছেন।'
'বাঃ। চমৎকার। আচ্ছা, আপনি কি এর আগে বাঁকুড়া পুরুলিয়া বা মালদার গ্রামে ছিলেন ? বর্ধমানেও শুনেছি দিনকে রাত করে দেওয়া হয়। আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। একটা কথা মনে রাখবেন, পাহাড় সমতল নয়। ওই একই মেজাজে এখানকার মানুষদের সঙ্গে ব্যবহার করলে বিপদে পড়ে যাবেন ভাই। আচ্ছা, চলি। আসুন ফাদার।' ডাক্তারের পিছন পিছন যখন ফাদার বেরিয়ে আসছেন ঠিক তখনই মিসেস ডিসুজা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন, 'একসকিউজ মি। একটু আগে অ্যাকসিডেন্টে উন্ডেড কোনও মেয়েকে কি হসপিটালে নিয়ে আসা হয়েছে ?'
ডাক্তার বললেন, 'হ্যাঁ ম্যাডাম। আপনি ?'
মিসেস ডিসুজা বললেন, 'ও কি কথা বলতে পারছে ? নাম বলেছে ?'
ডাক্তার বললেন, 'ওর তেমন আঘাত লাগেনি। কিন্তু কথা বলছে না। আমরাই ওদের নিয়ে এসেছি। আপনি ওয়ার্ডে গিয়ে খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন।'
এই সময় অফিসার কাছে এল, 'আপনি মেয়েটির মা ?'
'যদি লিজা হয় তা হলে আমি ওর মা। ও কোথায় ?'
'এক মিনিট। শুনলেন তো শি ইজ আউট অফ ডেঞ্জার। আপনার মেয়ে একা মারুতি গাড়িতে করে কোত্থেকে আসছিল ?'

হঠাৎ ভদ্রমহিলা শক্ত হয়ে গেলেন, 'অ্যাকসিডেন্টের সঙ্গে এই প্রশ্নের কোনও কানেকশন নেই অফিসার। সে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। অ্যাকসিডেন্ট কেন হয়েছিল তা আমি জানি না। ড্রাইভার কি ড্রাঙ্ক ছিল ?'

ডাক্তার বললেন, 'না মিসেস ডিসুজা। ড্রাইভার মদ খায়নি।'

'দেন, আমি আমার মেয়ের কাছে যাচ্ছি।'

ভদ্রমহিলা ছুটে চলে যেতে অফিসার হতাশ গলায় বললেন, 'আপনারা বুঝতে পারছেন না, ঘটনাটা স্বাভাবিক নয়। হসপিটাল থেকে থানায় খবর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ফোন আসে। যে ফোন করেছিল সে পরিচয় দেয়নি। লোকটা বলেছে, মেয়েটি গতরাতে দার্জিলিং-এ ফুর্তি করে ভাড়া করা মারুতি গাড়িতে ফিরছিল। শি ইজ এ কলগার্ল।'

ফাদার বললেন, 'আপনাকে একটা কথা বুঝতে হবে অফিসার। এই মেয়েটি এবং তার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। বেচারা দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিল, আমরা হসপিটালে পৌঁছে দিয়েছি। আমাদের ভূমিকা এই পর্যন্ত। আচ্ছা—।'

ফাদার এবং ডাক্তার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন। গাড়িতে ওঠার সময় ওঁরা দেখতে পেলেন কিছু মানুষ উত্তেজিত হয়ে গেটের সামনে চিৎকার করছে। ওঁদের দেখতে পেয়ে ভিড়টা যেন ছুটে এল সামনে। উত্তেজিত কণ্ঠগুলো একসঙ্গে কথা বলায় স্পষ্ট কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত জানা গেল এরা সবাই ট্যাক্সি ড্রাইভার। ওদের একজন সহকর্মী দুর্ঘটনায় আহত হয়ে এখানে এলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব না নিয়ে কেন শিলিগুড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা তার কৈফিয়ত চাইছে।

কিছুক্ষণ কথা বলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রেহাই পেলেন ওঁরা। গাড়িতে বসে ফাদার বললেন, 'আজকাল মানুষ কত দ্রুত উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পাহাড়ে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে উত্তেজিত হওয়ার প্রবণতা আরও বেড়ে গিয়েছে।'

ডাক্তার বললেন, 'কোনও ঘটনা একা ঘটে না। সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করার জন্যে নানান প্ররোচনা দেওয়া হয়। এই যে অফিসারটির কথা ধরুন, এর কথাবার্তা তো আমাকেই উত্তেজিত করে তুলছিল। থাকগে, মিস্টার রায়ের কাজ কখন হচ্ছে ?'

'জানি না। ডক্টর তামাংকে বলেছি মিস্টার রায়ের আত্মীয়স্বজনদের খবর দিতে। মনে হয় কাল সকালের আগে কিছু করা যাবে না।'

গাড়িটা শহর ছেড়ে কিছুটা পিচের রাস্তা ধরে এগিয়ে এবার কাঁচা পথ ধরে ওপরে উঠতে লাগল। হঠাৎ ফাদার জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝে আমার মনে আসে।'

'কী ব্যাপারে ?' সামনে চোখ রেখে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনার নিরাময়ের বাসিন্দারা সবাই রক্তের অসুখে ভুগছে। ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। কলকাতা দিল্লি বোম্বের মতো বড় শহরেও এই রোগের সঙ্গে ডাক্তাররা পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছেন না বলে শুনেছি। ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে শুনলেই মনে হয় জীবন শেষ হয়ে এল। বড় শহরে থাকলে আপনি অনেক বেশি বিজ্ঞানের সাহায্য পেতেন। তা না করে এই পাহাড়ে এসে নিরাময় খুললেন কেন ?'

ডাক্তার হাসলেন, 'ফাদার। আমি দীর্ঘকাল হেমাটলজি নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি। ক্যান্সারের ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই রক্তে ক্যান্সার হলে আপনার আশঙ্কাটা খুব অস্বাভাবিক নয়। বোন ম্যারো পাল্টে দিয়ে আমরা লড়াই চালাতে পারছি এখনও। কিন্তু লড়াই করা মানে জিতে যাওয়া নয়। অনেকটা মহাভারতের অভিমন্যুর মতো অবস্থা আমাদের। আপনি অভিমন্যুর কাহিনী জানেন ফাদার ?'

'হ্যাঁ। আমি মহাভারতের সংক্ষিপ্ত ইংরেজি সংস্করণ পড়েছি।'

ডাক্তার ফাদারের মুখ ভাল করে দেখলেন। খুব কম হিন্দু পুরোহিতকে বলতে শোনা যাবে তিনি বাইবেল পড়েছেন। ডাক্তার বললেন, 'পরাজয় নিশ্চিত জেনেও আমাদের একসময় লড়ে যেতে হত। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা জানতে পারলাম অসুখটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের রুগিদের ক্ষেত্রে কোনও চিকিৎসাই কাজে দেয় না। তাদের শরীরে রক্তকণিকা এত অল্প এবং

নতুন রক্ত তৈরির ক্ষমতা না থাকায় অসুখের লক্ষণ ধরা পড়ার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা মারা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর রুগিরা অতটা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। লোহিতকণিকা কমে গেলেও শরীরে নতুন রক্ত অল্প পরিমাণে হলেও তৈরি হচ্ছে। বোন ম্যারো পাল্টে যে চিকিৎসা রয়েছে তা এদের উপকারে নিশ্চয়ই আসে। কিন্তু আসল কথা হল এইসব রুগিকে কঠোর নিয়মের মধ্যে থাকতে হয়। রক্ত তরল হয়ে নাক বা কান দিয়ে বেরিয়ে আসা মাত্রই নতুন রক্ত শরীরে দিতে হয়। সেটা দেওয়ার পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাড়িতে ফিরে যাওয়া রুগি পরিচর্যার অভাবে মারা যায়। ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়ার পর পনেরো বছর বেঁচে আছে এমন রুগির কথা আমি জানি। আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন তার উত্তরটা এবার দিই। আমার ধারণা এই পাহাড়ি শহরের আবহাওয়া আমার রুগিদের পক্ষে খুব উপকারী। এখানে ঘাম হয় না, মানুষ কাহিল হয়ে পড়ে না আবার তীব্র শীতও পড়ে না। তবু, যারা চলাফেরা করতে পারছে তাদের ইচ্ছে হলে আমি বড়দিনের সময় মাসখানেকের জন্যে বাড়িতে যেতে দিই। গতবার সেটা করে একটি ভাল ছেলেকে আমি হারিয়েছি। বাড়িতে যাওয়ার পর খেলতে খেলতে তার নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। আমার নির্দেশ অনুযায়ী তাকে নতুন রক্ত দেওয়ার কথা। আমি বলে দিয়েছিলাম নতুন রক্ত বোতলে ভরে মুখটা নীচের দিকে রেখে শিশি ফ্রিজে কয়েক ঘণ্টা রেখে দিতে। এতে লোহিতকণিকার অংশ বোতলের মুখের দিকে চলে আসবে, সাদা অংশ ওপরে। এই অবস্থায় বোতল থেকে শরীরে রক্ত দিলে আগে লোহিতকণিকা ভেতরে যাবে। কিন্তু ওখানকার ডাক্তার রক্ত নিয়েই সরাসরি রুগির শরীরে দিয়েছেলেন। ফলে সেই মিশ্রিত রক্ত রুগির শরীর নিতে পারেনি।' ডাক্তার আফসোসে মাথা নাড়লেন, 'আসলে সামান্য অজ্ঞতাই কত বড় বিপদ ডেকে আনে। আপনি জানেন কিনা জানি না, এই পাহাড়ি অঞ্চলে অন্তত দেড়শো জন মানুষ প্রয়োজন হলে তাঁদের রক্ত আমার রুগিদের দিয়ে থাকেন। হ্যাঁ, অর্থ তাঁদের দেওয়া হয় কিন্তু রক্ত দেওয়ার ইচ্ছাটাকে তো কেউ টাকা দিয়ে কিনতে পারে না। আমার এখানে অসুস্থ ছেলেমেয়েগুলো ধীরে ধীরে নিজেদের সুস্থ ভাবতে শুরু করে। মন থেকে ভয় চলে গেলে রোগ বেশ দমে যায়। আমেরিকার দুটো রিসার্চ সেন্টারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। সামনের মাসে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে প্রতিনিধি আসবেন দেখতে। ওঁরা আমার অপারেশন থিয়েটারকে আরও আধুনিক করতে চান। মুশকিল হল আমি একা। দ্বিতীয় একজন মানুষ খুঁজে পাচ্ছি না যে পাশে দাঁড়াবে আর আমি চলে গেলেও নিরাময়কে বাঁচিয়ে রাখবে। আমারও তো বয়স হচ্ছে!'

ফাদার বললেন, 'একটা বোর্ড তৈরি করছেন না কেন?'

'দেখি। আমি কোনওরকম রাজনীতি বরদাস্ত করতে পারি না। কয়েকটা মাথা এক জায়গায় হলেই ওটা যে আসবে না তা কে বলতে পারে। তবে আমি খুশি কারণ পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলো আমার কাজকে সমর্থন করেছে। জি এন এল এফ জানতে চেয়েছে চিকিৎসার ব্যাপারে আমার কতটা আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন।'

ফাদারকে চার্চের দরজায় পৌঁছে দিলেন ডাক্তার। ইতিমধ্যে দুর্ঘটনার খবর চাউর হয়ে গেছে। ওঁদের দেখে স্থানীয় মানুষজন ভিড় করে এলেন। যা ঘটেছিল তা সংক্ষেপে বলে ডাক্তার অনুরোধ করলেন ফাদারকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। ডাক্তার যখন গাড়ি ঘোরাচ্ছিলেন তখন একজন প্রৌঢ় এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন তিনি নিরাময় পর্যন্ত গাড়িতে যেতে পারেন কিনা! ডাক্তার আপত্তি না করায় প্রৌঢ় নিজেই দরজা খুলে উঠে বসলেন. 'আমার নাম নিমা তামাং। আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি দার্জিলিং-এ থাকি। ভাইপোব কাছে এসেছিলাম। মেয়েটা তাহলে মরেনি?'

'কোন মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করছেন?' ঢালু পথে সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন ডাক্তার। এরকম আচমকা প্রশ্নে ঠিক তাল রাখতে পারলেন না।

'ওই যে, সবাই বলছিল আপনাদের নিরাময়ের কাছে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে আজ। ড্রাইভার আর মেয়েটার নাকি খুব খারাপ অবস্থা?'

'ও। না, মেয়েটির তেমন কিছু হয়নি। ফাদার তো এ কথা একটু আগে বললেন।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। খুব গন্ধা ফ্যামিলির মেয়ে।'

ডাক্তার তাকালেন প্রৌঢ়ের দিকে। কিন্তু কিছু বললেন না।

'আগে ওরা দার্জিলিং-এ থাকত। ওর মায়ের দু-দুটো স্বামী। দুজনেই মাল খেয়ে টাকা চাইতে আসত। বহুত হুজ্জত হত তখন। তা ছাড়া মাঝরাতে গাড়ি এসে ওদের নামিয়ে দিত বাড়িতে। মেয়েগুলোর কথা বলছি। পাড়ার লোক খুব ক্ষেপে গিয়েছিল ওদের ওপর। তখন ওরা এখানে চলে আসে। এখান থেকে দার্জিলিং-এ যায় ব্যবসা করতে। এ ব্যবসার তো মার নেই। তবে আপনাকে বলি, মেয়েগুলোকে কী দেখছেন, যদি ওদের মাকে যৌবনে দেখতেন, আঃ, কী জিনিস ছিল।'

প্রৌঢ়ের মুখ থেকে থুতু ছিটকে বের হতেই ডাক্তার ব্রেক কষলেন, 'নেমে যান।'

'অ্যাঁ ?' প্রৌঢ় অবাক।

'আপনাকে আমি নেমে যেতে বলছি।'

লোকটা নেমে গেলেও ডাক্তারের অস্বস্তি যাচ্ছিল না। যেন কোনও নোংরা জিনিসে হাত পড়েছে, এখনই ধোয়া দরকার, এরকম অনুভূতি হচ্ছিল। বাঁক নিয়ে নিরাময়ের সামনে পৌঁছোতেই তিনি গানটা শুনতে পেলেন। নিরাময়ের উল্টোদিকের রাস্তার খাদের ধারে রেলিং ঘেঁষে গোটা সাতেক ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে গান গাইছে। হালকা রোদে পাহাড় পরিষ্কার, আকাশ তকতকে নীল। ডাক্তার লক্ষ করলেন তাঁর নিরাময়ের কয়েকজন ছাড়া স্থানীয় নেপালি বাচ্চাগুলোও গাল ফুলিয়ে গান গাইছে। ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। ভাল করে যে বাংলা বলতে পারে না সে সুরের সাহায্য পেয়ে গেয়ে যাচ্ছে আন্তরিকভাবে।

ঠিক এইসময় মোটরবাইকের আওয়াজ শোনা গেল। তারপরই ওদের দেখা গেল। দুটো বাইকে চারজন ছেলে বেশ জোরেই ওপরে উঠে আসছে। নিরাময়ের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের গান শোনামাত্র ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল বাইক দুটো। চামড়ার জ্যাকেট পরা একটা ছেলে এগিয়ে গিয়ে নেপালি ভাষায় চিৎকার করে নিষেধ করল গান গাইতে। গাইয়ের দল গান থামাল। নেপালি বাচ্চারা যেন ভয় পেল। সায়ন এগিয়ে এল, 'গান গাইতে নিষেধ করছ কেন ?'

ছেলেটি দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, 'এসব গান পাহাড়ে চলবে না। ওদের এই গান শেখাচ্ছে কে ? তুমি ? তোমাকে আমি ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি। তুমি কোথায় থাকো ? কোন বাড়ি ?'

সায়ন আঙুল তুলে 'নিরাময়' দেখিয়ে দিল।

ছেলেটা সেদিকে তাকিয়ে একটু ভাবল। তারপর এগিয়ে গিয়ে সায়নের কাঁধে হাত রাখল, তোমার ওই গানে পাহাড় কুয়াশার কথা আছে ?'

'হ্যাঁ আছে। কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়। ধূম্র পাহাড় মানে ধোঁয়ার পাহাড়। ধোঁয়া মানে ক্ষেত্রে কুয়াশা।'

'তাই নাকি ? অত বড় গানটায় ওই দুটো শব্দমাত্র ? বাকি সব তো প্লেইন ল্যান্ডের বর্ণনা। তাই া ? আমরা সেইসব গান এখানকার বাচ্চাদের শেখাতে চাই না যার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোনও ম্পর্ক নেই। বুঝলে ?' ছেলেটি ফিরে গেল বাইকে। ডাক্তার দেখলেন ওরা তাঁর গাড়ির পাশ াটিয়ে ওপরে উঠে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে নেপালি বাচ্চাগুলো দৌড়ে চলে গেল নীচের দিকে।

খুব ধীরে ধীরে গাড়িটাকে নিরাময়ের সামনে নিয়ে এলেন ডাক্তার। গাড়ি থেকে নেমে দেখলেন ায়ন তখনও ওখানে ওই ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে আছে। নিরাময়ের দুটো ছেলে তার পেছনে। কী রবে বুঝতে না পেরে তারা ধীরে ধীরে গেটের দিকে এগোতে লাগল। ডাক্তার সায়নের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'এই গান কি এখানকার মানুষের গান নয় ?'

ডাক্তার হাসলেন। 'এই গান পৃথিবীর সব দেশের মানুষ গাইতে পারে।'

'তা কী করে হবে ? মরুভূমির মানুষ কী করে গাইবে। ধনধান্যপুষ্প তো তাদের মাটিতে জন্মায় না। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দেশটিকে সেরা বলা হয়েছে। পৃথিবীর অন্য মানুষেরা তো সেটা নাও মানতে পারে।' বিচলিত দেখাচ্ছিল সায়নকে।

ডাক্তার কথা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ডাকপিওনকে দেখতে পেলেন। লোকটা ডাক্তারের কাছে এগিয়ে এসে গোটা পাঁচেক খাম দিল। ডাক্তার তার মধ্যে থেকে একটা আলাদা করে সায়নের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'তোমার চিঠি।'

খামের উপর হাতের লেখা দেখেই মুখে হাসি ফুটল সায়নের।

ডাক্তার সেটা লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুশি হয়েছ দেখছি, কার চিঠি?'

'মায়ের।'

৪

'স্নেহের সায়ন, তোমার চিঠি পেয়েছি। সেইসঙ্গে ডাক্তারবাবুর চিঠি এসেছে। তিনি তোমার বাবাকে লিখেছেন যে তোমার শরীরের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এই খবর পেয়ে আমরা খুব খুশি হয়েছি। তোমার বাবা এই বাড়ির বড়মাকে খবরটা দিলে তিনি ঠনঠনের কালীবাড়িতে পুজো দিয়েছেন। দিনরাত আমি ভগবানকে ডাকি যাতে তিনি তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেন। তোমাকে ছেড়ে আর কতকাল থাকতে হবে জানি না। সামনের মাসে তোমার বাবা যাবেন ওখানে। ইচ্ছে আছে আমিও সঙ্গে যাব। ডাক্তারবাবু যদি রাজি হন তাহলে কিছুদিনের জন্যে তোমাকে এখানে নিয়ে আসব। শুনলাম তুমি এখন রাস্তায় একাই হাঁটাহাঁটি করছ। পাহাড়ি পথ, সবসময় সাবধান থাকবে। একটুও মন খারাপ করো না। জেনো, সবসময় আমি তোমার পাশে আছি। তোমাকে ছাড়া আমরা যেরকম থাকা যায় তেমনই থাকছি। আমার বুকভরা স্নেহ-ভালবাসা নিও। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার মা।'

হঠাৎ সায়নের মনে হল, মায়ের চিঠিগুলো একরকম হয়ে যাচ্ছে। এর আগের চিঠিগুলো যা বাক্সে জমিয়ে রেখেছে, তারিখ পাল্টে দিলে প্রায় একই চিঠি হয়ে যায়। প্রথম প্রথম মা তাকে সাধুভাষায় চিঠি লিখত। স্বদেশভূমির লেখক বনবিহারী মাইতির মতো সাধুভাষায় লিখতে লিখতে চলতি শব্দ লিখে ফেলত। তুমি যদি মন খারাপ করিয়া থাকো তাহলে— ! বনবিহারীবাবুর ওই আটচল্লিশ পাতার বইতে অনেকগুলো তাহলে রয়েছে।

আচমকা বৃষ্টির শব্দ কানে আসতেই সায়ন জানলার কাছে গেল। ঠাণ্ডার জন্যে কাচের জানলা সবসময় বন্ধ থাকে। সে উঁকি মেরে দেখল ইতিমধ্যে আকাশ কালো হয়ে বৃষ্টি নেমেছে। কোনও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ে মেঘ জমলে অথবা বৃষ্টি হলে তার একদম ভাল লাগে না। সে ঘরের আলো জ্বেলে দিল। এবং তখনই নেপালি ছেলেগুলোর মুখ চোখের সামনে ভেসে এল। এখানে আসার পর এই প্রথম ছেলেগুলোকে দেখল সে। ওদের কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায় অসম্ভব রেগে আছে ওরা। এমন কি ধনধান্যপুষ্পভরা গানটিকেও সহ্য করতে পারছে না। কেন? এখানে আসার আগে সে শুনেছিল পাহাড়ে গোলমাল হচ্ছে। পাহাড়ের রাজনৈতিক নেতারা স্বাধীন গোর্খাল্যান্ড চায়। এই আন্দোলনে অনেক মানুষ মারা গিয়েছে। পশ্চিমবাংলার মধ্যে ওরা থাকতে চায় না। কিন্তু সরকার এ দাবি মেনে নিতে পারেনি। কারণ এই দাবি মানলে আরও অনেক ছোট গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের জন্যে পৃথক রাজ্য চাইবে। ফলে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত যে সমঝোতা হয়েছিল তাতে পাহাড়ে শান্তি ফিরে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থেকেও এখানকার মানুষ অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। আর এসব কারণেই বাবা তাকে এখানে পাঠাতে প্রথমে রাজি হননি। কিন্তু ডাক্তার আঙ্কল ভরসা দিয়েছিলেন। যাদের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই তাদের পাহাড়ে কোনও বিপদ হবে না। মা এবং বাবা এখানে এসে সেটা নিজের চোখে দেখেও গিয়েছেন। এতদিন এখানে সে রয়েছে কোনও ঝামেলা হয়েছে বলে শোনেনি। তবে মাঝে মাঝে ধর্মঘট হয়েছে। ওটা কলকাতাতেও হয়।

কিন্তু এই ছেলেগুলো এত বাংলাবিদ্বেষী কেন? বাঙালি তো হিন্দি ইংরেজি গান গায়। কেউ

তাদের নিষেধ করে না। নেপালিরাও হিন্দি গান গাইতে ভালবাসে। সেখানেও কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ওরা নিজেদের কথা যে বাংলা গানে নেই সেটা গাইতে দিতে রাজি নয়। কেন? গান কি অত প্ল্যান করে গাওয়া যায়?

মিস্টার ব্রাউনের মুখ মনে পড়ল তার। কী ভাল ব্যবহার করেন। একবারের জন্যে মনে হয়নি উনি বাংলাবিদ্বেষী। ওঁকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো জানা যাবে এই ছেলেদের রাগের কারণ কী। এখন এখানে থাকতে থাকতে কিছু কিছু নেপালি শব্দের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। নেপালি ভাষায় কথা বললে অনেকটাই বুঝতে পারে। বাচ্চাগুলো যেমন শব্দের মানে না বুঝে বাংলা গান গেয়ে যাচ্ছিল তারও তো উচিত নেপালি গান শিখে নেওয়া। সায়ন ঠিক করল সে নেপালি গান শিখবে। প্রথমে বড়বাহাদুরকে বলবে শেখাতে। সে না রাজি হলে ছোটবাহাদুরকে। কথাটা মনে আসামাত্র সে ঘর থেকে বের হল। অদ্ভুত একটা অস্থিরতা সমস্ত শরীরে পাক খাচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ঘেরা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝটকায় একটু কুঁকড়ে যেতেই সে ছোটবাহাদুরকে দেখতে পেল। তিনটে বাসি খবরের কাগজ নিয়ে যাচ্ছে। সায়নের মনে হল অনেকদিন কাগজ পড়া হয়নি। সে ছোটবাহাদুরকে বলল, 'বাংলা কাগজটা দেবে?'

ছোটবাহাদুর তিনটে কাগজ দেখে বিচক্ষণের মতো বাংলা কাগজ এগিয়ে দিল। সেটা নিয়ে সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নেপালি গান জানো?'

'গান?' অদ্ভুত সুন্দর হাসল ছোটবাহাদুর। তারপর মাথা নেড়ে না বলল।

'বড়বাহাদুর জানে?'

'থোড়া থোড়া'। ছোটবাহাদুর চলে গেল।

ঘরে ফিরে এল সায়ন। চেয়ার টেনে বসে টেবিলে খবরের কাগজ খুলল। প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা ভারতবর্ষের নামী মন্ত্রীকে কয়েক কোটি টাকা চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও কয়েকজন মন্ত্রী এবং আমলা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে সি-বি-আই ব্যবস্থা নিচ্ছে। পাশে মন্ত্রীর ছবি। হাসিমুখে হাত নেড়ে পুলিশ ভ্যানে উঠছেন। তিনি শাসিয়েছেন, কে দুর্নীতিগ্রস্ত নয়? আমাকে ফাঁসালে আমি সবার হাঁড়ি ভেঙে দেব।

থরথর করে কাঁপতে লাগল সায়ন। এ কী অবস্থা? ভারতবর্ষের একজন মন্ত্রী এই আচরণ করেছেন? গ্রেপ্তার হওয়ার পরও তিনি লজ্জিত নন? যে ভারতবর্ষকে স্বপ্নের দেশ হিসেবে ভেবেছিলেন শহিদরা, যাকে মা বলতে শিখিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তাকে এভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে লোভী মানুষরা মন্ত্রিত্ব দখল করে?

সায়ন চোখ বন্ধ করল। এই লোকটির বিচার হলে হয়তো টাকা দিয়ে সব কিছু সামলে নেবেন। হয়তো আবার তাঁকে ভারতবর্ষের মন্ত্রী হিসেবে দেখা যাবে। হঠাৎ শরীর খারাপ করতে লাগল সায়নের। নাকের তলায় চটচটে অনুভূতি হল। সে উঠে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখল। তারপর ধীরে ধীরে বেল টিপে বিছানায় বসে পড়ল। বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে নিরাময়ে সেই বেলের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাক্তার আঙ্কল ছুটে এলেন তার ঘরে। একপলক দেখে নিয়েই পেছনে ছুটে আসা ছোটবাহাদুরকে বললেন, 'স্ট্রেচার নিয়ে এসো।' তারপর ধবধবে সাদা রুমাল বের করে নাকের তলার রক্ত মুছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছিল? কী ভাবছিলে তুমি?' সায়ন আঙুল তুলে খবরের কাগজের হেডিং দেখিয়ে দিল।

'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা।'

সন্ধ্যা মুখার্জির গান বাজছিল শিবমন্দিরের মাথার ওপর টাঙানো লাউডস্পিকারে। হিন্দির বদলে বাংলা, জীবনমুখীর বদলে ষাট দশকের হৃদয়জুড়ানো বাংলা গান বাজালে একটা আন্তরিক আবহাওয়া তৈরি করা যায় বলে ধারণা প্রচারিত হওয়ায় সন্ধ্যা মুখার্জি বেজে যাচ্ছিলেন। এই গান এলাকার কেউ শুনছে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কেউ না থাকলেও একজন শ্রোতা মনোযোগী ছিল। সে গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আবৃত্তি করছিল। টেনে টেনে, ধীরে ধীরে।

মেয়েটির বয়স তেরো। লম্বা, ছিপছিপে, শরীরে লাল ফ্রক। সে একা ছাদের এক কোণে

দাঁড়িয়ে বিকেলের মরে আসা আলোয় পায়রাদের খুঁজছিল কবিতার শব্দ উচ্চারণ করতে করতে। ছাদটি বিশাল। একশো বছরের আগে তৈরি বাড়িটার গায়ে তেমন কোনও সংস্কার না হলেও ছাদটির জায়গায় জায়গায় রাজমিস্ত্রির হাত পড়েছে। পাঁচটি সিঁড়ি বিভিন্ন দিক দিয়ে ছাদে উঠে এসেছে। ছাদ থেকে সরাসরি ঘরে যাওয়ার দরজা আছে তিনটি। রোদ নিস্তেজ হলে, বিকেলটা যখন হাঁটু গেড়ে বসে তখন বিভিন্ন সিঁড়ি আর দরজা দিয়ে একে একে বাসিন্দাদের অনেকে উপস্থিত হয় খোলা আকাশের নীচে, এই ছাদে। সন্ধ্যা মুখার্জির গান শোনার আগ্রহ ওদের কারও নেই কিন্তু গান না বাজলে অস্বস্তি হয়। শব্দ যেন ওদের স্বাচ্ছন্দ্য দেয়। একটি কম্পিত আড়াল চারপাশে তৈরি হয়। এ বাড়ির বিভিন্ন শরিকের বউ-মেয়েরা কিছুক্ষণ প্রাণ জুড়োতে চলে আসে এখানে, এসময়। ছাদ জুড়ে যেন মেলা বসে যায়। মধ্যবয়সিনীদের চেহারা যাই হোক না কেন, গায়ের রং চোখে পড়ার মতো ফরসা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের দেখা পাওয়া যাবে না এ বাড়িতে বউ হয়ে আসা মহিলাদের মধ্যে। অবশ্য এঁদের সন্তানদের কেউ কেউ গৌরবর্ণ পায়নি। এই না-পাওয়াটা অনেকের মনে আক্ষেপের জন্ম দিয়েছে।

ছাদের একপাশে এইরকম চারজন মহিলা গল্প করছিলেন। এঁদের তিনজন বেশ স্বাস্থ্যবতী, গায়ের রং ফেটে পড়ছে। মুখচোখ মোটেই সুন্দর নয় কিন্তু একধরনের ভোঁতা সুখ সেই সুখে ছড়িয়ে আছে। চতুর্থ জন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণাঙ্গিনী, সুন্দরী, কম বয়সী। তবে তাঁর গায়ের রং তীব্র ফরসা নয়। স্বাস্থ্যবতীদের একজন বলল, 'আর পারি না ভাই। বাঙাল মেয়েদের রান্নার প্রশংসা শুনতে শুনতে কান পচে গেল। কোথায় চিতল মাছের মুঠি না কী যেন বলে খেয়ে এসেছে তার কত ব্যাখ্যান। বললাম, একটা বাঙাল মেয়েকে বিয়ে করলেই পারতে। শুনে তাঁর রাগ হয়ে গেল।'

দ্বিতীয় অর্ধাঙ্গিনী বললেন, 'শুনেছি তারা ভাল রাঁধে।'

এবার চতুর্থজন বললেন, 'এখন আর কে বাঙাল আর কে ঘটি। পঞ্চাশ বছর আগে ওসব ছিল। আর সত্যি বলতে হলে বলতে হয়, পূর্ববঙ্গের মেয়েরা এদেশে না এলে এখনও আমাদের চিকের আড়ালে থাকতে হত। লেখাপড়াও হত না।'

প্রথমজন ঠোঁট ওল্টালেন, 'কাল টিভিতে কী ছবি আছে ভাই?'

তৃতীয়জন খুক করে হাসলেন, 'মা শীতলা। আমার শাশুড়ি আসনে বসে দেখবে।'

'ধ্যেৎ। দিলে দিনটাকে নষ্ট করে। আমি কোথায় ভাবলাম উত্তরকুমারের ছবি দেবে। সেই ওগো বধূ সুন্দরী দেখার পর থেকে বুকটা থম মেরে রয়েছে।' দ্বিতীয়জন তাঁর বৃহৎ বুকে হাত রেখে চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর চোখমুখ প্রায় ভাববিহ্বল।

ক্ষীণাঙ্গিনীর নাম উর্মিলা, হেসে ফেলল, 'ওগো বধূ সুন্দরীতে উত্তমকুমার তো বাপের বয়সী। তবু তাঁকে ঘিরে এত আহ্লাদ? তোমার বর তো এখনও যুবক।'

'কোথায় সুভাষ বোস আর কোথায় পেঁয়াজের কোষ! তোমরা মুখে স্বীকার করবে না কিন্তু আমার বাবা রাখঢাক নেই। উত্তমকুমারের জন্যে আমি মরে যেতেও পারি।'

উর্মিলা আবার হাসল, 'ইস্‌স। তাই? ওঁকে যখন দাহ করছিল তখন সহমরণে যেতে পারতে!'

দ্বিতীয় রাগত ভঙ্গিতে এক ঝটকায় মুখ সরিয়ে নিয়েই স্থির হয়ে গেলেন, 'অ্যাই! এসেছে!'

সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল মেয়েটিকে। এ বাড়ির ন'বাবুর মেয়ে টুকটুকি। অষ্টমঙ্গলার পর শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আর যাওয়ার নাম করছে না। বাড়ি থেকেও বের হয় না।

তৃতীয়া বললেন, 'আমাদের কালোর মা তো ওদের বাসনও মাজে। ও বলছিল মেয়েটা নাকি বিছানায় উপুড় হয়ে দিনরাত কেঁদে চলেছে। স্বামী নেয় না।'

'নেয় না কেন?' প্রথমজন জিজ্ঞাসা করলেন।

'কী জানি। দেখতে তো খারাপ নয়।'

'দেখতে তো মাকাল ফলও সুন্দর।

'দ্যাখো, হয়তো স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। অনেক মেয়েছেলের ওসব আসে না।'

'ধ্যাৎ।'

'হ্যাঁ গো, ও আমাকে বলেছে।'

কথাগুলো হচ্ছিল নিচু গলায়। যাকে কেন্দ্র করে হচ্ছিল এদিকে পেছন ফিরে ছাদের আলসে ধরে সে নীচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পেছনে যে কয়েকটি শিশু কানামাছি খেলায় মত্ত তা যেন টেরই পাচ্ছে না।

উর্মিলা মেয়েটিকে দেখল। কত বয়স হবে ? বড় জোর পনেরো। এর মধ্যে শাড়ি পরিয়ে খোঁপা বাঁধিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। উর্মিলা বলল, 'এসব মনগড়া কল্পনা না করে সত্যি ঘটনাটা ওকে জিজ্ঞাসা করলেই তো জানা যায়।'

'না বাবা। ওর মাকে বিশ্বাস নেই। চিৎকার করে বাপের নাম উদ্ধার করে দেবে।' দ্বিতীয়জন চোখ ঘুরিয়ে জানিয়ে দিল।

'আমরা তো অন্যায় কিছু করছি না।' উর্মিলা বলল।

বাকিরা দোনামনা করেও শেষ পর্যন্ত এগোল। মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে উর্মিলা ডাকল, 'এই টুকটুকি ! কী দেখছ ?'

টুকটুকি চমকে মুখ ফিরিয়ে চারজনকে দেখে বেশ থতমত হয়ে গেল। তারপর আবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, 'কিছু না।'

'তুমি অনেকদিন পরে ছাদে এলে, আসো না কেন ?' উর্মিলা জিজ্ঞাসা করল।

টুকটুকি জবাব দিল না। ওর মাথা আরও ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর।

প্রথমজন এবার দ্বিতীয়াকে ইশারা করল। দ্বিতীয়া তৃতীয়াকে ঠেলল। এবার তৃতীয়জন হাসলেন, 'পথ চেয়ে আছ, কারও বুঝি আসার কথা আছে ভাই ?'

টুকটুকি অবাক হয়ে মুখ তুলল, 'কার ?'

'কার আবার ? এলে তো একজনই আসবে। কী যেন নাম জামাই-এর ?' দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল।

টুকটুকি মাথা নিচু করল। তৃতীয়জন বলল, 'বাহারে বুদ্ধি। ও কী করে স্বামীর নাম উচ্চারণ করবে ! তা তিনি বাইরে গিয়েছেন বুঝি ? অনেকদিন তাই এখানে আছ ?'

টুকটুকি এবারও জবাব দিল না। উর্মিলা এবার ওর বাজুতে হাত রাখল, 'তোমার খুব খারাপ লাগছে এইসব প্রশ্ন শুনতে, না ?'

'আমি কী উত্তর দেব !' গলায় কান্নার আভাস পাওয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হাত আঁচল টেনে এনে ঠোঁটে চাপা দিল। উর্মিলা দেখল তার সঙ্গী বউয়েরা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে 'যাই ভাই কাজ আছে' ইত্যাদি বলতে বলতে দ্রুত যে যার নিজের ঘরে ফিরে গেল। এ বাড়ির কয়েকটি অলিখিত আইনের মধ্যে একটি হল কেউ অন্যের সংসারের ঝামেলায় নিজেকে জড়াবে না। ওই বউয়েরা তাই সরে গেল।

উর্মিলা টুকটুকির হাত ধরল, 'মন শক্ত করো ভাই। রাগারাগি হলে কদিন বাদে ঠিক হয়ে যাবে।'

'রাগারাগি তো হয়নি।' টুকটুকি আঁচল সরাল।

'ও।' উর্মিলার মনে হল আর এগোনো অনুচিত। ওই বউদের অনুমান যদি ঠিক হয়, টুকটুকির শারীরিক গোলমালের জন্যেই ওর স্বামী যদি ওকে ত্যাগ করে তাহলে সেই ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করে ওকে লজ্জায় ফেলার অধিকার তার নেই। অথচ চট করে এখান থেকে অন্য বউদের মতো চলে যেতেও উর্মিলা পারছিল না। সে বলল, 'বিয়ের আগে তো তুমি পড়াশুনা করতে। তাই না ?'

'আমি এইটে উঠেছিলাম।' একটু অবাক হল টুকটুকি অন্যধরনের প্রশ্নে।

'আমি বলি কি, আবার পড়াশুনা শুরু করো।'

'পড়াশুনা ?'

'হ্যাঁ। পড়াশুনা করে নিজের পায়ে দাঁড়ালে দেখবে আর কেউ তোমাকে তার ইচ্ছেমতন কষ্ট দিতে পারবে না। তোমাকে অন্যের অন্যায় মেনে নিতে হবে না।'

'কিন্তু।' টুকটুকি হঠাৎ উদাস হয়ে গেল।

'কিন্তু কী ?'

'আমার যে আর পড়াশুনা ভাল লাগে না। বিয়ের জল গায়ে পড়লে সরস্বতী আর দয়া করেন

না।' সরল বিশ্বাসে কথাটা বলল টুকটুকি।

'ধ্যেৎ! কে বলেছে তোমাকে এই বাজে কথা?'

'মা। মা বাজে কথা বলবে কেন? কোন মা নিজের মেয়ের খারাপ চায়? তুমি এমন কথা বলেছ শুনলে মা খুব রাগ করবে।' টুকটুকি চোখ ঘোরাল।

উর্মিলা অস্বস্তিতে পড়ল। টুকটুকির মায়ের কণ্ঠস্বরের খ্যাতি এ বাড়িতে রয়েছে। মেয়ের কাছে খবর পেয়ে তিনি শান্ত থাকার পাত্রী নন। এটা কমলেন্দু পছন্দ করবে না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে একটু নত হতে হল, 'দূর। জেঠিমা ভুল বলবেন কেন? উনি কত জানেন! কিন্তু আমি যা বলেছি তুমি সেটা বুঝতে পারোনি। তুমি যদি বরের সঙ্গে ভালভাবে সংসার করো তাহলে আলাদা কথা কিন্তু যদি তোমাকে একা থাকতে হয় তাহলে ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজের পায়ে তো দাঁড়াতে হবে। তাই পড়াশুনা করলে সরস্বতী নিশ্চয়ই সদয় হবেন।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ তিনি আমাকে কোনওদিন ফেরত নেবেন না।'

'কেন নেবে না? নেবে না বললেই হল। বিয়ের পর স্বামীর ঘরে থাকা স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে পড়ে। তুমি চলে গেলে কার সাধ্য তোমাকে তাড়িয়ে দেয়।'

'দেবে।'

'কেন দেবে?'

'আমাতে তাঁর মন বসেনি।' আবার মুখে আঁচল তুলে কান্না সামলাল টুকটুকি। দ্রুত চলে গেল সিঁড়ির দিকে, চোখের আড়ালে। উর্মিলা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অল্পবয়সী সরল একটি মেয়েকে দেখেশুনে বিয়ে করার পর কদিন যেতে না-যেতেই সেই লোকটি বুঝে গেল তার মন বসছে না? মামার বাড়ি? উর্মিলার খুব রাগ হচ্ছিল। সে ধীরে ধীরে ফিরে এল তাদের ঘরে। দরজা ভেজানোই ছিল।

উর্মিলাকে এ বাড়ির অনেকেই ঈর্ষা করে। ভাগ্যগুণে বিয়ের আগেই তার শাশুড়ি গত হয়েছিল এবং বিয়ের দু বছরের মধ্যেই শ্বশুর মারা যায়। যেহেতু কমলেন্দুর কোনও ভাইবোন নেই তাই নিজের ইচ্ছেমতন সংসার করতে পারছে উর্মিলা, এই ব্যাপারটা এ বাড়ির অনেকেই সহজ মনে নিতে পারছে না।

কমলেন্দু খাটে শুয়েছিল পাশ ফিরে। তার হাতে বই। বই পড়াই তার একমাত্র নেশা। রোগা ফরসা ছিপছিপে মধ্যবয়সী মানুষটির সংসার চলে ডিভিডেন্ড-এর টাকায়। পিতৃপুরুষ যেসব শেয়ার কিনে গিয়েছিলেন, কোম্পানি লাভবান হওয়ায় তা থেকে ভাল ডিভিডেন্ড আসছে। বইয়ের প্রতি তার আসক্তি বউয়ের থেকে বেশি, এরকম অভিযোগ উর্মিলা প্রায়ই করে থাকে। কিন্তু এই বিশাল বাড়ির কোনও সংসারেই কমলেন্দুর মতো পড়ুয়া নেই বলে উর্মিলার মনে একটা অন্যধরনের ভাল লাগাও তৈরি হয়।

স্ত্রীকে ঢুকতে দেখে বই থেকে চোখ না সরিয়ে কমলেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কী? আজ এত তাড়াতাড়ি পি এন পি সি শেষ হয়ে গেল?'

'তাতে তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে?'

'আমার কেন অসুবিধে হবে! তাড়াতাড়ি চলে এলে তাই বলছি।'

'তুমি আজকাল বড় চিমটি-কেটে কথা বল!'

কমলেন্দু পাশ ফিরে স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'তাই?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'মেজাজ বিগড়েছে মনে হচ্ছে! কী ব্যাপার?'

উর্মিলা জানলার কাছে গেল। শিবমন্দিরের মাইকে সন্ধ্যা মুখার্জি বেজেই যাচ্ছে। সে মাথা নাড়ল, 'মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু হল মেয়েরাই।'

'একশোবার। ঘটনাটি জানতে পারি?'

'তোমার ন'জ্যাঠার মেয়ে টুকটুকি আজ ছাদে এসেছিল।'

'ন'জ্যাঠার মেয়ে?'

'কয়েক মাস আগে যার বিয়ে হয়েছিল।'

'ও ! তা বাপের বাড়ি এলে ছাদে যেতেই পারে। এতে অন্যায়টা কোথায় ?'

'আমি বলেছি সে-কথা ?'

'না বলোনি, তবে লোকে ভাবে বিকেলবেলায় মেয়েরা ছাদে উঠলে কোনও না কোনও মতলব কাজ করে। ছাদের যে দিকটা রাস্তার গায়ে সেইখানে একসময় এক মানুষ উঁচু পাঁচিল ছিল যাতে রাস্তা থেকে কেউ মেয়েদের দেখতে না পায়।'

'পাঁচিলটা ভাঙল কে ?'

'ভূমিকম্পে। আমাদের ছোটবেলায়। কিন্তু টুকটুকি ছাদে এসেছিল বলে তুমি কী যেন বলছিলে ?' কমলেন্দু বিছানায় উঠে বসে বইটা বন্ধ করল। ঊর্মিলা বইয়ের মলাটে নাম দেখতে পেল। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'। রবীন্দ্ররচনাবলি কেনেনি কমলেন্দু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্প উপন্যাস কবিতার বই আলাদা করে কিনে আলমারি ভরেছে। প্রায়ই সে রবীন্দ্রনাথ পড়ে। ওইসময় ওকে বেশ পবিত্র দেখায়।

'মেয়েটা বড় অদ্ভুত। অবশ্য ওকে একা দোষ দিয়ে লাভ নেই। বেশির ভাগ মেয়ের তো একই দশা। বিয়ের পর স্বামীর পছন্দ হয়নি, বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। বউকে আর ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। কোনও প্রতিবাদ নেই, আইনিব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে না, টুকটুকি বুকে পাথর নিয়ে বসে আছে।'

'তো কী করবে ? জোর করে স্বামীর বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকবে ?'

'তা কেন ? নিজের পায়ে দাঁড়াক।'

হেসে উঠল কমলেন্দু, 'সোজা কথা ? বি এ, এম এ পাস করে ছেলেরা ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছে না, বাজে কথা বোলো না তো।'

'তাই বলে মেয়েটার ভবিষ্যৎ কেউ ভাববে না ?'

'ভাববে ওর মা-বাবা ! তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি এ-বাড়ির অন্য পরিবারে কী ঘটছে তা নিয়ে তুমি কখনও মাথা ঘামাবে না। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো ঠিক নয়। তুমি সেই একই কাজ করতে চলেছ ! এখন যদি ন'জ্যাঠা এসে আমাকে চার্জ করে আমি কী জবাব দেব সেটা ভেবে দেখেছ ?'

'চার্জ করবেন ?'

'হ্যাঁ। তার মেয়েকে তুমি বিষিয়ে দিচ্ছ !' কমলেন্দু বই তুলে নিল।

ঊর্মিলা নিশ্বাস ফেলল, 'কী গল্প পড়ছ তুমি ?'

কমলেন্দু হেসে বলল, 'স্ত্রীর পত্র।'

ঊর্মিলা দ্রুত এগিয়ে গেল স্বামীর কাছে। হাত থেকে বইটা টেনে নিয়ে উন্মাদের মতো পেপারব্যাক বইটি ছিঁড়তে লাগল। হাঁ হাঁ করে উঠল কমলেন্দু, 'কী করছ ? আরে ? রবীন্দ্রনাথের বই ওটা। আমার ওপর রাগ করে রবীন্দ্রনাথের বই ছিঁড়ছ ?'

'তোমার ওপর রাগ করে কে বলল ? রাগ তার ওপরই কেউ করে যার কাছে আশা করা যায়। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর পত্র পড়ার কোনও যোগ্যতা তোমার নেই। মৃণালকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এই বই ছিঁড়ে ফেললাম।' দু হাতে টুকরোগুলো ওপরে ছুড়ে দিল সে। ঘরের পাখার বাতাস তা ছড়িয়ে দিল চারপাশে। কমলেন্দু কোনও শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না।

সন্ধ্যা মুখার্জির গান শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন কিশোরকুমার বাজছে। একদিন পাখি। মেয়েটি আলসেতে ঝুঁকে গান শুনছিল। হঠাৎ তার শরীরে অস্বস্তি শুরু হল। তলপেটে যে ব্যথা তার সঙ্গে সে অপরিচিত। এবং তখনই মনে হতে লাগল ইজের ভিজে গেছে। সে চারপাশে তাকাল। গল্প-করা বউয়েরা, খেলতে ব্যস্ত মেয়েদের চেহারাগুলো তার কাছে ঝাপসা হয়ে গেল। একটা তীব্র ভয় তাকে জড়িয়ে ধরতেই সে চিৎকার করে ছুটতে লাগল তাদের দরজার দিকে। সে ছুটছে না বাতাসে উড়ে যাচ্ছে সেই বোধ তার ছিল না। ছাদের ভিড়টা নিজেদের ভুলে গিয়ে ওর যাওয়াটা

দেখছিল। ঘরে ঢুকেই সে বাবাকে দেখতে পেল। জানলার পাশে চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন। সে ডুকরে উঠল, 'বাবা, মা কোথায় ?'

তৃপ্তমুখে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ? কী হয়েছে টুপুর ?'

সে চোখ বন্ধ করে চিৎকার করল, 'মা !'

'কী হল ? অমন করে চিৎকার করার কী হয়েছে ?' চায়ের কাপ রাখতে রাখতে সমরেন্দ্রনাথ কন্যার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাতেই চমকে উঠলেন। তারপর তাঁকেই চেঁচিয়ে উঠতে শোনা গেল, 'শুনছ ? এ-দিকে এসো ! তাড়াতাড়ি।'

কৃষ্ণা রান্নাঘরে ছিলেন। মেয়ের চিৎকার তাঁর কানে গেলেও গা করেননি। এবার স্বামীর গলা পেয়ে দ্রুত ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে ?'

মেয়েকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর নজর পায়ের দিকে গেল, কৃষ্ণা তৎক্ষণাৎ বললেন, 'বাথরুমে যা, বাথরুমে গিয়ে দাঁড়া, আমি আসছি।'

সমরেন্দ্রনাথ বাধা দিলেন, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে—!' তিনি কথাটা শেষ করলেন না। 'হ্যাঁ। ঠিকই।' কৃষ্ণা মাথা নাড়লেন।

'তাহলে কিছু করার আগে মায়ের সঙ্গে কথা বলো। এ ব্যাপারে এ বাড়ির কিছু রীতি আছে বলে শুনেছি। রীতি লঙ্ঘন কোরো না।' সমরেন্দ্রনাথ অন্য দিকে তাকালেন।

'মশা মারতে শেষে কামানদাগা হয়ে যাবে না তো ?' কৃষ্ণার গলায় বিরক্তি।

'হলে হবে। আমাদের কিছু করার নেই।'

যাকে নিয়ে এত কথা সে এবার বলে উঠল, 'তোমরা এসব কী বলছ ? আমার কী হয়েছে। আমি তো ইচ্ছে করে কিচ্ছু করিনি।'

'চুপ।' কৃষ্ণা ধমকে উঠল। তারপর গলা তুলে ডাকল, 'মা, এ-দিকে একটু আসবেন ? আপনার ছেলে ডাকছে।'

কৃষ্ণার কথা শেষ হতেই মেয়েটি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল, তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি যা বলছিলে আমার তাই হয়েছে, না ?'

এইসময় বৃদ্ধা সৌদামিনী দরজায় এসে দাঁড়াতেই কৃষ্ণা তাকে ঘটনাটা জানাল, সঙ্গে সঙ্গে সৌদামিনীর মুখের চেহারা বদলে গেল, 'করেছ কী বউমা ? এই অবস্থায় ওকে জড়িয়ে ধরতে দিয়েছ ? আঃ। ওকে এই ঘরে ঢুকতে দিয়েছ কেন ?

কৃষ্ণা থতমত হয়ে বললেন, 'ছেলেমানুষ তো, ঠিক বোঝানো যায়নি।'

'ছেলেমানুষ ! ওই বয়সে আমাদের সময় বাচ্চা হয়ে যেত। অ্যাই ছুঁড়ি, ছাড়, ছাড় মাকে, সরে দাঁড়া। দাঁড়া বলছি।' সৌদামিনী ধমকে উঠলেন।

'কেন ? সরে দাঁড়াব কেন ? আমি কী করেছি ?'

'আশ্চর্য ! বউমা, ওকে সরিয়ে দাও।'

কৃষ্ণা বলল, 'তুই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়া।'

গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে মেয়েটি ভয় পেল। মায়ের কাছ থেকে সরে গেল সে। এবার আর এক ধরনের বিস্ময় মেশানো ভয় তাকে আচ্ছন্ন করল।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন হল ?'

কৃষ্ণা মাথার ঘোমটা খোঁপার উপর তুলে দিয়ে বলল, 'এই তো শুনলাম।'

'ভাঁড়ার ঘরে একটা বস্তা পেতে দাও, আপাতত ওখানে বসুক। নইলে সারা পৃথিবী ছোঁয়াছুঁয়ি করে দেবে। যাও।' সৌদামিনী আদেশ দিলেন।

'আমি কেন ভাঁড়ার ঘরে যাব ? ওমা, বলো না, ভাঁড়ার ঘরে আরশুলা আছে। না, আমি কিছুতেই যাব না। আমি তো কোনও অন্যায় করিনি।' চিৎকার করে কান্না শুরু হল।

সমরেন্দ্রনাথ কয়েক পা এগিয়ে যেতে সৌদামিনী সাবধান করল, 'খবরদার খোকা, আর এগোসনি। বউমার সঙ্গে তোকেও এই অবেলায় নাইতে হবে।'

সমরেন্দ্রনাথ থমকে গেলেন। তারপর যতটা সম্ভব স্নেহ গলায় এনে খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে

বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়েছ, বুঝতে চেষ্টা করো মা ! এ বাড়ির যা নিয়ম তা তো মানতেই হবে। আমরা তো কেউ তোমার শত্রু নই। তোমার ভালর জন্যেই ঠাকুমা ভাঁড়ার ঘরে যেতে বলেছেন। যাও, কথা শোনো, লক্ষ্মী মা আমার।'

মেয়েটি অদ্ভুত চোখে তার বাবাকে দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে কতক্ষণ ওই ঘরে বসে থাকতে হবে ?'

'বেশিক্ষণ নয়। তোমার কোনও কষ্ট হবে না। আমি বলছি তুমি দেখে নিও।

কৃষ্ণা গিয়ে মেয়েকে ভাঁড়ার ঘরে বন্দী করে রেখে এলেন। সৌদামিনীর পরামর্শে শেকল তুলে দিলেন দরজায়। শেকলের শব্দে মেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ওরা আমাকে ঘরে আটকে রাখছে কেন ?' সেইসঙ্গে দরজায় শব্দ শুরু হল। কৃষ্ণা ঠোঁট কামড়ালেন কিন্তু সেইসঙ্গে সরেও এলেন।

সৌদামিনীকে এখন চিন্তিত দেখাচ্ছে। কৃষ্ণা ঘরে ঢোকামাত্র তিনি বললেন, 'এখনই চিঠি লিখে কালোর-মাকে ওপরে পাঠাও।'

'ওপরে ?'

'হ্যাঁ। উনি যা বিধান দেবেন তাই মানতে হবে। এ বাড়ির নিয়ম।'

'কী লিখব ?'

'লিখে দাও যা ঘটেছে। খুব ভক্তিভরে লিখবে। জানতে চাইবে এখন কী করণীয় ?' সৌদামিনীর গলায় বিদ্রুপ ফুটল, 'মনে হচ্ছে এ-বাড়িতে নতুন এসেছ। এর মধ্যে কতবার এমন ঘটনা ঘটেছে তোমার কানে যায়নি বউমা ? আশ্চর্য !

আঁচলের আড়ালে খাম নিয়ে কালোর-মা হনহনিয়ে হাঁটছিল, বিশাল বাড়ির পথ অনেক বাঁক নিয়ে গোলকধাঁধা হয়ে আছে, অচেনা লোকের তেমনই মনে হবে। সমরেন্দ্রনাথের অংশ যে-দিকে ঠিক তার বিপরীতে যেতে হচ্ছিল কালোর-মাকে। একতলায় নেমে চাতালের সামনে দিয়ে যেতে যেতে মা ভবানীর মূর্তির দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল সে। চাতালের শেষে উঁচু ঠাকুরমণ্ডপে মা ভবানীর মূর্তির সামনে বসে ঠাকুরমশাই এখন সন্ধ্যাবাতি দেবার আয়োজন করছেন। তাকে দাঁড়াতে দেখলেই বুড়ো ঠিক ফাইফরমাস করবে।

কালোর-মায়ের বয়স আটত্রিশ। এ-বাড়িতে কাজে এসেছিল আঠারো বছর বয়সে বাগনান থেকে। খেতে দিতে পারত না বলে স্বামী নিত না। শেষ পর্যন্ত এ-বাড়ির এক বুড়ি তাকে কাজটা পাইয়ে দিয়েছিল। তা কুড়ি বছরে অনেক জল গড়াতে দেখেছে সে এ-বাড়িতে। টিভি-তে একটা সিনেমা দুবার দেখিয়েছিল, সাহেব বিবি গোলাম। দেখে মনে হয়েছিল এ-বাড়ির সঙ্গে বেশ মিল আছে। কথাটা সে বউদিদিকে বলেছিল। কৃষ্ণা হেসে বলেছিলেন, 'মিল আছে বলে বইটা সবার ভাল লাগে। আসলে বড়লোকেরা সব একরকম হয়।'

উল্টোদিকের বাড়ির সিঁড়ি ভাঙছিল কালোর-মা। চওড়া কম, দুজন লোক পাশাপাশি উঠলে গায়ে গা ঠেকবে। এইসময় নাকে অম্বুরি তামাকের গন্ধ লাগতেই কালোর-মা দাঁড়িয়ে গেল। গন্ধ আসছে সেইসঙ্গে বিদ্যাসাগরি চটির শব্দ। একমাথা ঘোমটা টেনে পেছন ফিরেই কালোর-মা বুঝতে পারল গন্ধরাজ একেবারে পেছনে নেমে এসেছে।

'এটা আবার কে গো ? কারও বউ-মেয়ে নাকি কাজের লোক ?'

কালোর-মা জবাব দিল না। গন্ধরাজ আবার বলল, 'আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। এ-বাড়ির বউ-মেয়ে এই শাড়ি পড়বে কোন দুঃখে। ও বাছা, নামটি বলো।'

'আমি কালোর-মা।' ফিসফিসিয়ে বলল কালোর-মা।

'আই বাপ ! তাই তো। পাছা দেখেই আমার চেনা উচিত ছিল। এ-সব বয়স হওয়ার লক্ষণ। সবকটা ইন্দ্রিয় বিট্রে করছে। ওপরে যাচ্ছিস ? কার কাছে ?'

'বড়মায়ের কাছে।'

'কেন রে ? সমরেন্দ্রনাথের বাড়িতে কী ঘটল ?'

'আমরা ছোটলোক, বড়লোকের খবর জানব কী করে !'

দেখুঁ। যা, উঠে যা। তবে একটা কথা, বেনারস থেকে সরেস পান আনিয়েছি। আজ রাতের ...নায় এ... এক খিলি খেয়ে যাবি ? হ্যাঁরে কালোর-মা ?'

'অসুবিধে ...াছে।' কথাটি বলেই পাশ কাটিয়ে দ্রুত উপরে উঠতে লাগল কালোর-মা। বাঁ দিকের সিঁড়ি চলে গেছে ...ন্ধরাজের ঘরে। ডান দিকেরটা ধরল সে।

ডান দিকে সিঁড়ি একবার পাক খেয়ে যে দরজায় পৌঁছেছে সেটি বন্ধ। কালোর-মা যখন প্রথম এ-বাড়িতে পা দিয়েছিল তখন কলিং বেলের বোতাম ছিল না, কড়া নাড়তে হত।

দরজা খুলল একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা। এর পোশাক-আশাক দেখে পরিচারিকা বলে মনে হয় না। বড়মা যখন দশ বছর বয়সে এ-বাড়িতে বউ হয়ে এসেছিলেন তখন এর মা তাঁর বাপের বাড়ি থেকে সঙ্গে এসেছিল। সেই সময় এর বয়স ছিল দুই। আট বছর কাজ করার পর মা ফিরে যায় স্বামীর ঘরে, মেয়েকে পাঠিয়ে দেয় বড়মায়ের সঙ্গিনী হয়ে থাকতে। সেই দশ বছর বয়স থেকে বড়মায়ের পাশে ছায়ার মতো রয়েছে, এই দরজার বাইরে পা দিয়েছে যখন বড়মা কোথাও গিয়েছে। বিয়ে-থা হয়নি, ও চায়নি না বড়মা দেয়নি এ নিয়ে এককালে কৌতূহল ছিল। কিন্তু এ-বাড়ির পুরুষদের লকলকে চাহনি থেকে ও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল বড় মায়ের আড়ালে থেকে। বৃদ্ধার নাম আতরবালা। আতরবালা জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই ?'

'চিঠি আছে বড়মায়ের।'

'কোন তরফ ?'

'আহা, আমাকে দ্যাখোনি তুমি ! এই নাও।' চিঠি তুলে দিল কালোর-মা।

'এখানে দাঁড়াও।'

আতরবালা চিঠি নিয়ে বড় ঘর পেরিয়ে পর্দা সরিয়ে বলল, 'চিঠি এসেছে।' লম্বা গদিওয়ালা ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন বড়মা। শরীরের চামড়া কুঁচকে এলেও তার রঙের আভিজাত্য চলে যায়নি। এই ভর বিকেলে দামি শাড়ি পরে সাদা চুলে খোঁপা বেঁধে জানলা দিয়ে আকাশ দেখছিলেন তিনি। সেই অবস্থায় মৃদু গলায় ডাকলেন, 'নাতবউ, এদিকে এসো।'

ডাকামাত্র ওপাশের ঘর থেকে একটি তরুণী যাকে প্রতিমার মতো দেখতে নম্র পায়ে এগিয়ে এল, 'বলুন ঠাম্মা।'

'চিঠিটা পড়ো।'

তরুণী খাম খুলে চিঠি বের করল। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে পড়া শুরু করল, 'পরম শ্রদ্ধেয় বড়মা, শতকোটি প্রণাম নিবেদন করিয়া জানাইতেছি যে আমার পুত্র সমরেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা টুপুর ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আজ অপরাহ্ণে প্রথম রজঃদর্শন করিয়াছে। তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে আলাদা ঘরে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছি। এমন অবস্থায় আপনার আদেশের জন্য এই পত্র দাসীর মাধ্যমে পাঠাইলাম। শতকোটি প্রণাম অন্তে সৌদামিনী দেবী।'

বিশাল শরীরটি ইজিচেয়ার থেকে সামান্য তুলে বড়মা খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'পাঁজি আর চশমা।'

আতরবালা দ্রুত ছুটে গিয়ে সেই দুটি বস্তু নিয়ে এলে বৃদ্ধা চোখে চশমা এঁটে পাতা খুললেন, 'সৌদামিনীর বয়স হল এখনও ভাল করে চিঠি লিখতে শেখেনি।'

আতরবালা বলল, 'আমার মনে হয় ওঁর বউমা লিখে দিয়েছে।'

পাঁজির পাতায় চোখ রেখে বড়মা বললেন, 'হুঁঃ !'

মিনিটখানেক পড়াশুনা করে তিনি মুখ তুললেন, 'রাত দশটা বত্রিশ থেকে চল্লিশ। আতর বলে দে ওই সময় যেন ঠাকুরদালানে মেয়েটাকে নিয়ে আসে। যে অবস্থায় আছে ঠিক সেই অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে। সেইসময় এ-বাড়ির সব আলো নেবানো থাকবে। পুরুষমানুষেরা যেন তখন ঘরের বাইরে না বের হয়।'

খবরটা সব শরিকের কাছে পৌঁছোল।

নন্দিনী সোয়েটার বুনছিলেন, ওই গরমের সময়েও, হেনা ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'শুনেছ ?'

নন্দিনী মাথা নাড়লেন, 'হুঁ।'

'আশ্চর্য, শুনে চুপ করে থাকবে ? এই টি ভি-র যুগে এমন আদিম আচরণের কোনও প্রতিবাদ করবে না ? শোনার পর আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছে।' হেনা সশব্দে চেয়ার টানল।

নন্দিনী বললেন, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখ। এ বাড়ির যা নিয়ম তা এ বাড়িতে থাকলে মেনে চলতেই হবে। তোর আমার ভাগ্য ভাল যে মেয়ে নেই।'

'থাকলে তুমিও এই নিয়ম মেনে চলতে ?'

'এ বাড়ির ছেলেরা যদি মানে আমি না মেনে কী করে পার পাব !'

'উঃ। ওই বুড়িটাকে পুড়িয়ে মারা উচিত।'

'চুপ ! কথাটা কানে গেলে বুড়ি কী করবে জানিস ? তোর বরও তোকে সাপোর্ট করবে না।' গলার স্বর পাল্টালেন, 'এসব আমারও মেনে নিতে ইচ্ছে করে না হেনা। কিন্তু নিজেদের মধ্যে আড়ালে আবডালে ঝগড়াঝাটি যাই হোক না কেন, বড় মায়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও এ বাড়ির কেউ বলবে না। যাক গে, বরের চিঠি পেলি ?'

'হ্যাঁ। তোমার দেওর তো এখন সিমলের পাহাড়ে ফুর্তি করছেন।'

'আহা গেছে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে, সেখানে তোকে নিয়ে যাবে কী করে ?'

'আমি তো আমাকে নিয়ে যেতে বলিনি ! আমি বলেছিলাম পাহাড়েই যখন যাচ্ছ তখন দার্জিলিং-এ যাও। ছেলেটার সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে এসো। শুনলই না।'

'চল, তোতে আমাতে গিয়ে সায়নকে দেখে আসি।'

'যাবে ?' চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল হেনার। তার পরেই বিমর্ষ হয়ে গেল সে, 'দুর ! ও ফিরে না আসা পর্যন্ত কোথাও যাওয়া হবে না। শাশুড়ি ছিঁড়ে খাবে।'

'এখন শান্ত আছে ?'

'শান্ত ? চিতায় না ওঠা পর্যন্ত শান্ত হবে না। জীবনে তো অনেক পেয়েছেন মহিলা তবু সন্দেহ করতে ওর ভাল লাগে কেন বলো তো ? আর কাউকে না পেয়ে শ্বশুরকেই সন্দেহ করছেন আমার ব্যাপারে। ভাবতে পারো ?'

'ধ্যেৎ। কী যে বলিস ?'

'সত্যি বলছি। তুমি একদিন কথা বলে দ্যাখো। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় বিয়ে-থা না করে কুমারী হয়ে থেকে গেলে ঢের ভাল হত।' হেনা বলল।

নন্দিনী মাথা নাড়লেন, 'সেটা কী করে হবে ? আমাদের দেশে মেয়েরা বিয়ে করে না, বিয়ে করে ছেলেরা, মেয়েদের বিয়ে হয়।'

৫

চওড়া বিশাল রাজপথের গায়ে দুটো বাঘের মূর্তি রায়বাড়ির যে পূর্বপুরুষ গেটের দুপাশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি হয়তো বাঘ এবং গোরুকে এক ঘাটে জল খাওয়াতেন। এখন সেই বাঘ দুটোর পাথরের শরীরে নানান গর্ত, লেজ খসে গিয়েছে অনেকদিন। নাক বোঁচা হয়ে গেলেও উদ্ধত ভাবটি যায়নি। গেট পেরিয়ে মাটির রাস্তা। দুপাশে গাছগাছালি, একটা ডোবা যেখানে ধোপারা কাপড় কাচে। রাস্তার দিকটায় একটা বাউন্ডারি দেওয়াল এখনও খাড়া আছে বটে কিন্তু উল্টো দিকে কিছু নেই। এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা আটখানা স্ট্যাচু, আম কাঁঠাল গাছের পর রায়বাড়ি। রায়বাড়ির ছাদ থেকে পাড়ার যে অংশ দেখা যায় তা গলির ভেতর দিকটায়। সেখানে দোকানপাট রকের আড্ডা মাস্তানি সবই আছে। সেখানে উত্তেজনা চরমে উঠলে তা চলকে চলে আসে এ বাড়ির মাঠে। লিকলিকে রোগা তালপাতার সেপাই নব্বুই বছরের পাঁড়েজি তার যৌবনের লাঠি হাতে সমানে চেঁচাতে থাকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। কয়েক দশক ধরেই লোকটাকে কেউ পাত্তা দেয়

না। কিন্তু কানাঘুষোয় সবাই শুনেছে ওই পাঁড়েজি নাকি যৌবনে লাঠি হাতে আটখানা ডাকাতের লাশ ফেলে দিয়েছিল। হয়তো ওই কারণেই বিরক্ত হলেও তারা পাল্টা ঢিল ছোড়ে না।

রায়বাড়ির সংলগ্ন ছোট্ট ঘরটিতে পাঁড়েজি পড়ে আছে সত্তর বছর। পনেরো বছরে বউ মরে গেলে মনে এত শোক জমেছিল যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি। ফলে এখন উত্তরপ্রদেশের কোথায় তার আত্মীয়স্বজন বেঁচে আছে সে খবর তার জানা নেই। এখনও লোকে এ বাড়ির রাতদিনের পাহারাদার হিসেবে তাকেই ভেবে নেয়। ভাবনাটা পাঁড়েজিরও, নইলে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে আচমকা চিৎকার করে ওঠে, 'অ্যাই কৌন হ্যায় ?'

এই নিয়ে হেনা হেসে খুন হয়ে যায় যেন। নন্দিনীর বারান্দায় এলে পাঁড়েজিকে দেখা যায়। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে লাঠিতে তেল মাখাচ্ছে।

হেনা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, লোকটা এখনও লাঠিতে তেল মাখায় কেন ?'

'তোর মাথায় ভাঙবে বলে।' নন্দিনী হাসলেন।

'আমার না মানুষটাকে অদ্ভুত লাগে। রাত দুপুরে যখন ওর গলা পাই, অ্যাই কৌন হ্যায় তখন প্রশ্নটা যেন আমার বুকে বিঁধে যায়। আমি কে ? কী অসাধারণ !'

'তুই এই করে সায়নটারও বারোটা বাজিয়েছিস। রাম বললেই রামায়ণ ভাবতে বসে যায়। অথচ তোর ওই বিবেকবাবু কোনও মাইনে পায় না, তা জানিস ?'

'মাইনে পায় না ? তাহলে ওর চলে কী করে ?'

'এ ও যা পারে খেতে দেয়। আমার এখান থেকে আটখানা রুটি যায়, ডাল তরকারি বাঁধা। শুনেছি সদানন্দ হাতখরচের টাকা দেয়।'

'কী আশ্চর্য। তাহলে এখানে পড়ে আছে কেন ?'

'কোথায় যাবে ? কে আছে ওর ? এই বাড়িটার মতো অবস্থা। যতক্ষণ এখানে আছে ততক্ষণ অহঙ্কারে আছে। কেউ মুখের ওপর অশ্রদ্ধা করে কিছু বলবে না। ওই বয়সে ওটুকু আর কোথায় গেলে পাবে ও ?' নন্দিনী বললেন।

এইসময় একটা মোটরবাইকের আওয়াজ হল। কুড়ি-একুশ বছরের মোটামুটি স্বাস্থ্যবান তরুণ বাইক থেকে নামতেই পাঁড়েজি এগিয়ে গেল তার কাছে। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'আবার কী হল ? মালের টাকা তো দিয়ে দিয়েছি।'

'টাকা নিয়েছি বলে ডিউটি করব না এটা কী করে ভাবলে সদাবাবু। বড়মার হুকুম, আজ রাত দশটার পর বাড়িতে কোথাও আলো জ্বলবে না। পুরুষমানুষরা কেউ বাড়ির ভেতর যাবে না। তুমি জান না, জানিয়ে দিলাম।' পাঁড়েজি বলল।

'হঠাৎ ? কেসটা কী ?'

'আমি কী করে বলব।'

'তুমি হচ্ছ বাস্তুঘুঘু। না, ঠিক হল না, বাড়িতে পুরনো সাপ থাকলে তাকে বাস্তুসাপ বলে। তুমি তার চেয়ে বেশি। সব তোমার নখদর্পণে। এর আগে কতবার এরকম হুকুম শুনেছ। মনে করে বলো ?'

'মনের তলায় বহু ফুটো হয়ে গিয়েছে সদুবাবু। যা রাখি সব ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়। বড়মা দুঃখ পাবে এমন কাজ কোরো না, হ্যাঁ ?'

এবার হেনা শব্দ করে না হেসে পারল না।

নন্দিনী ধমক দিল, 'অ্যাই, কী করছিস ?'

হাসির শব্দ শুনে ওপরে তাকাল সদানন্দ। মুখ খুলতে গিয়েও সামলে নিল। এ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে এত দূরত্বে দাঁড়িয়ে কথা বলার চল নেই। সে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু পাঁড়েজি সেই হাসির আওয়াজ কানে যাওয়া পর্যন্ত কপালে আরও ভাঁজ ফেলে একরাশ বিরক্তি চোখে নিয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে। হেনা দেখতে দেখতে বলল, 'দ্যাখো দ্যাখো, যেন এ বাড়ির শ্বশুরমশাই। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।'

'ওভাবে বলিস না। এ বাড়ি ওর প্রাণ। সায়নের যখন প্রথম রক্ত বের হল নাক-কান দিয়ে

স্কুলের মাঠ থেকে ওই তো ওকে কোলে তুলে নিয়ে এসেছিল। অল্পবয়সে এ বাড়ির যা রীতিনীতি দেখে এসেছে তাই অনুসরণ করার কথা ভাবে।'

দরজায় শব্দ হল। হেনা যাচ্ছিল, নন্দিনী বাধা দিলেন, 'তুই বোস। কে এল আবার ?'

দরজা খুলতেই সদানন্দকে দেখা গেল, 'বিরক্ত করলাম ?'

'ওমা, মা মাসির কাছে গেলে বিরক্ত করা হয় বুঝি ?'

'ব্যাপারটা হচ্ছে, সায়নের চিঠি পেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ, ভাল আছে।'

'আমি ওদিকে যাচ্ছি। আমাকে ঠিকানা দিলে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি। পরশু রওনা হব। যদি কিছু দেওয়ার থাকে তো দিতে পারেন।'

'খুব ভাল কথা। ভেতরে আসবে না ?'

'না। একটা ভাঙা অ্যাম্বাসাডারের খবর এনেছে বাদল, এখনই যেতে হবে।'

'ও, তুমি নাকি গাড়ির ব্যবসা ভাল করছ ?'

'কী করব ? পেটে বিদ্যে নেই যে ভাল চাকরি পাব। আচ্ছা, চলি।' সদানন্দ চলে গেল। দরজা বন্ধ করে নন্দিনী বললেন, 'এ বাড়ির ছেলে বলে ওকে মনে হয় না।'

'ঠিক বলেছ। আতুসিপনা একদম নেই। এই চলো, সদানন্দ যাচ্ছে, ওর সঙ্গে গিয়ে সায়নকে দেখে আসি। কতদিন দেখা হয়নি !' হেনা নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরল।

নন্দিনী হেনার মুখ দেখলেন, 'তুই ছেলেটাকে খুব ভালবাসিস ?'

হেনা বলল, 'দুর ! তুমি ওর মা, তোমার মতো ভালবাসতে পারি আমি ?'

নন্দিনী বললেন, 'যেদিন ডাক্তার বললেন ওর লিউকোমিয়া হয়েছে সেদিন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, কী এমন পাপ করেছি যার ফলে ছেলেটাকে ভগবান এমন শাস্তি দিলেন ! তিন দিন রাতে একফোঁটা ঘুমোইনি। হঠাৎ কে যেন বলল, "তুই যদি বলিস ওকে ভালবাসিস না" তা হলে ও উঠে দাঁড়াবে ! তখন ভোরবেলা। আমি ঘুমোইনি কিন্তু জেগেও কি ছিলাম ! সোজা ঠাকুরদালানে ছুটে গেলাম। তখন তোরা কেউ ঘুম থেকে উঠিসনি। মায়ের মুখের দিকে তাকালাম। স্পষ্ট মনে হল, কথাটায় যেন মায়ের সায় আছে। খুব রাগ হয়ে গেল। বললাম, বেশ, তোমার মতো ভালবাসি না।'

হেনা বলল, 'ঠিক তিন দিন বাদে ডাক্তারবাবু বলল আপাতত বিপদ কেটে গেছে। মনে পড়ছে, তাই তো। আসলে কী জানো, ওর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমি কারও মধ্যে দেখতে পাইনি। ওকে দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়।'

'তুই চলে যা সদানন্দের সঙ্গে।'

'পাগল !'

'কেন ?'

'সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ি ঝাঁপিয়ে পড়বে। তিরিশ বছরের বেশি বড় শ্বশুরের সঙ্গে যে সম্পর্ক ভেবে নিয়ে ছুরি শানাচ্ছে সে এমন সুযোগ পেলে দু হাত তুলে নাচবে । ওই সুযোগ দেব কেন ! এখন চলো তো !'

'কোথায় ?'

'ও তরফে। উর্মিলার সঙ্গে কথা বলব। ওই ব্যাপারটার প্রতিবাদ করতে হবে না !

'ওঃ। ঠিক আছে, তোরা কথা বলে ঠিক করে আমাকে জানা—।'

'কেন ? তোমার এখন কী এমন রাজকার্য আছে ?'

'সোয়েটারটা কালকের মধ্যে শেষ করতে হবে না ? সদানন্দ যাচ্ছে— !'

'ওহো, তাই তো। আমি হাত লাগাব ?'

'না। তুই পরে একটা মাফলার বুনে দিস।'

হেনার চোখে আলো ঝিলিক দিল। সে দরজা খুলে ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে পা বাড়াল। উর্মিলার সঙ্গে তার ভাল বনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত পাল্টে সে নিজেদের দরজার দিকে এগোল। এই

বিশাল বাড়ির দোতলার ভেতরে সাপের মতো পথ চলে গেছে।

শাঁখ বাজছে। সন্ধ্যারতি শুরু হয়ে গেছে মন্দিরে। দরজা ভেজানো ছিল। সেটা ঠেলে ভেতরে পা দিতেই হেনা দেখল শ্বশুরমশাই দাবা সাজিয়ে বসে আছেন। তাকে দেখে বললেন, 'আমার একটা সমস্যা, বুঝলে বউমা। ছেলেবেলায় দাবা শিখেছিলাম ইন্ডিয়ান স্টাইলে। তা বেশিদূর তো পড়াশুনা করিনি, ইংরেজিটাও ভাল বুঝি না। তাই দাবার বই দেখে চাল শেখা আজও হল না।'

শ্বশুরমশাইয়ের কথার মধ্যেই শাশুড়ি এসে দাঁড়ালেন। লম্বা স্বাস্থ্যবতী পঞ্চাশ পার হওয়া মহিলার শরীর গহনার জন্যে বিখ্যাত হওয়া উচিত। বাঁ কোমরে আঙুল রেখে সেই হাতের কনুই দ্বিতীয় হাতে ধরে বললেন, 'রাজ্যজয় হল ?'

শ্বশুরমশাই চোখ ওপরে তুলে স্ত্রীকে দেখে বললেন, 'অ্যাঁ ?'

'তোমাকে কিছু বলিনি তো! তুমি কেন গায়ে মাখছ ? আজকাল দেখি আমি কথা বললেই তোমার গায়ে লাগছে!' শাশুড়ি চোখ ঘোরালেন, 'যাকে বলছি সে-ও তো শুনছে।'

'এত সহজে রাজ্যজয় কি করা যায় মা!' হেনা হাসার চেষ্টা করল।

'কোথায় যাওয়া হয়েছিল সেটাও জানা যাবে না ?'

'এ বাড়ির বাইরে তো যাইনি।'

শ্বশুর বললেন, 'পোশাক দেখে বুঝতে পারছ না, বউমা বাইরে যায়নি!'

'তুমি থামবে! আমাদের সময়ে এই ঘরের চৌকাঠ পার হলেই বাইরে বলা হত। এর সংসার ওর সংসারে ঘুরঘুর করে দাসীবাঁদিরা, বাড়ির বউ নয়। বুঝলে ?'

'আপনি এইভাবে কথা বলছেন কেন! সায়নের খবর নিতে গিয়েছিলাম। অত বড় অসুখ নিয়ে ছেলেটা পাহাড়ে একা রয়েছে। ওর মা-বাবার কথাও ভাবুন! ওর খরচ চালিয়ে কোনওমতে বেঁচে আছে ওরা। ওদের কাছে যাওয়া আপনার চোখে অন্যায়!'

'ন্যায়-অন্যায়ের বিধান দেওয়ার আমি কে ? সেখানে ছেলেটার বাপ ছিল না ?'

'না।'

'কে জানে! আমি তো আর দেখতে যাইনি।'

'মা, একটা কথা বলব ?'

'ঢং করে প্রশ্ন করার কী আছে ?'

'আপনি এই অকারণে সন্দেহ করা বন্ধ করুন। এটা খুব খারাপ। আচ্ছা, আপনিই ভাবুন, সায়নের মা যেখানে বসে আছেন সেখানে ওর বাবা থাকলে কী এমন পাপ কাজ আমি করতে পারতাম।'

'পুরুষমানুষকে আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব ? পাগল।'

'আপনার ছেলেও কিন্তু পুরুষমানুষ!'

'বউমা! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!'

হেনা হাসল, 'লাগল তো! আপনার কথায় অন্য মানুষের মনেও ঠিক একই রকম লাগে মা। একটু বুঝুন।' ভেতরে চলে গেল হেনা।

ঝি-এর মুখে খবর শুনে চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়তে লাগল ঊর্মিলা। তারপর সোজা পাশের ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে গম্ভীর মুখে আকাশ দেখতে থাকা কমলেন্দুকে বলল, 'এই যে, খুব তো তখন স্ত্রীর পত্র ছিঁড়েছিলাম বলে কথা বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে আছ। তোমার লজ্জা লাগে না ? মনে হয় না প্রতিবাদ করা উচিত ?'

কমলেন্দু বিরক্ত চোখে তাকাল।

ঊর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'আজ রাত্রে দশটা বত্রিশ থেকে চল্লিশ এ বাড়ির সব আলো নেভানো থাকবে। তুমি কি জানো ?'

কমলেন্দু প্রশ্ন না করে পারল না, 'কেন ?'

'প্রশ্ন তো আমি তোমাকে করছি।'

'ও। হয়তো, কে আদেশ দিয়েছে ?'

'এ বাড়ির কাঁঠালি কলা, তোমাদের বড়মা।'

'ও। তাই বলো! নিশ্চয়ই পুজোআর্চা কিছু আছে। পাঁজি দেখলেই জানতে পারবে।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই। আমিই যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'আগে টুপুরদের ওখানে, তারপর প্রয়োজন হলে তাঁর কাছে।'

'কিন্তু কী হয়েছে, বলবে তো?'

ঊর্মিলা উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এল। টুপুরদের বাড়িতে যেতে হলে তার পক্ষে ছাদ ঘুরে যাওয়াই সহজ। যদিও মূল গেট থেকে দুটো সিঁড়ি দুদিক দিয়ে ওপরে উঠেছে, যে যার এলাকায় ঢুকে পড়তে পারে সেখান দিয়ে।

সন্ধে নেমে গেলে কোনও বাড়ির বউ-ঝি আর ছাদে থাকে না। খোলা চুলে তো নয়ই, যৌবন এলে রাত নামলে ছাদে যাওয়া নিষেধ। সৌদামিনী একদিন গল্প করেছিলেন টুপুরকে, 'অনেক বদ আত্মা আছে যারা রাত নামলেই বাড়ির ছাদে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। আর মেয়েমানুষ একলা দেখলেই তার ভেতরে ঢুকে পড়ে।' ভাঁড়ার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে টুপুর দেখল ছাদ ডিঙিয়ে দ্রুত পায়ে কেউ আসছে। এই সময় ছাদে কারও থাকার কথা নয়। তাহলে সৌদামিনীর বলা সেই দুষ্ট আত্মা নাকি! গল্পটা সে শুনিয়েছিল সায়নদাকে। সায়নদা গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'তুমি একটি হাঁদা। মানুষ যখন বেঁচে থাকে তখন তার আত্মা বদ অথবা ভাল হয়। মরে গেলে আত্মাও মরে যায়। তোর ঠাকুমা রাক্ষস খোক্কসের মতো গল্প শুনিয়েছে।' কিন্তু ওসব বলার কয়েক দিনের মধ্যে শোনা গেল সায়নদার নাক আর কান দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। খুব খারাপ অসুখ। সৌদামিনী বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই কেউ ভর করেছে। যাচিয়ে নিক।'

ওপাশের দরজায় শব্দ হতে সাহস হল। আত্মারা কখনও শব্দ করে ঘরে ঢোকে না। সে এদিকের জানলা থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে? কে ওখানে?'

এবার ছায়াটা স্পষ্ট হল। ছাদের এপাশে চলে এসে ঊর্মিলা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই এখানে কী করছিস?'

টুপুর হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল ঊর্মিলাকে, 'ও, তাহলে তুমিই।'

'আমি মানে

'তুমি মানো না, এসময় ছাদে দুষ্ট আত্মারা ঘুরে বেড়ায়।'

'ও, তুই বুঝি তাদের এমনি করে যাচাই করিস? খোল দরজা।'

'আমি কেন ছুঁলাম তা তুমি জানো না!' টুপুর হাসল।

'কেন?'

'তোমাকে এখন চান করতে হবে।'

'ওঃ। যা বলছি তাই কর। দরজা খোল।'

'কী করে খুলব? আমাকে তো ওরা বন্দী করে রেখে দিয়েছে সেই বিকেল থেকে। পাঁচটা আরশুলা মেরেছি, জানো?'

'তোর তো সাহস খুব। দুষ্টুমি করেছিলি খুব?'

'না গো। কী করেছি সেটাই বুঝলাম না ভাল করে। আমার শরীর খুব খারাপ করছিল তবু শুনল না। জোর করে এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঠাকুমা নিজে হাত দেয়নি চান করতে হবে বলে, মাকে দিয়ে করিয়েছে। ঠাকুমাকেও ছুঁয়ে দেব।'

ঊর্মিলা জানলা থেকে সরে এসে ছাদের দিকের দরজায় আবার শব্দ করতে সমরেন্দ্রনাথের গলা পাওয়া গেল, 'কে? কে?'

'আমি ঊর্মিলা?'

দরজা খুলে সমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি? এদিকে, এ সময়ে?'

'বউদিদি কোথায়?'

কৃষ্ণা সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকে ঊর্মিলাকে দেখে হেসে ফেললেন, 'আরে তুমি? একী কাণ্ড! বর

ছাড়ল ? এসো এসো।'

'তুমি তোমার মেয়েকে আটকে রেখেছ বউদি ?' এক পা না এগিয়ে প্রশ্ন করতেই উর্মিলা দেখল কৃষ্ণার মুখ নীল হয়ে গেল।

'ছিঃ বউদি, ছিঃ।'

'আমাকে ছিঃ বলে লাভ নেই উর্মিলা। এ বাড়িতে আমার গুরুজনরা আছেন।'

'তুমি তাঁদের বোঝাতে পারনি ?'

'কী বোঝাব ? চাঁদ সূর্যের কথা জেনেও ঘরে ঘরে যখন গ্রহণের দিন ধোওয়া মোছা, কুলকাঁটা দেওয়া হয় তখন কাদের বোঝাতে পারি আমি ! সে ক্ষমতা আমার কোথায় ? টুপুরকে ছেড়ে রাখলে সে এ-ঘর ও-ঘর করবে, সব কিছু ছুঁয়ে ফেলবে আর সেসব জিনিস নাকি রসাতলে যাবে। তার চেয়ে ও ভেতরে থাকলে যদি পৃথিবীটা অক্ষত থাকে তা হলে ওর ভেতরে থাকাই উচিত।' একটানা বলে গেলেন কৃষ্ণা। শেষ দিকে আঁচলের কোণা ঠোঁটে উঠে গেল।

উর্মিলা সমরেন্দ্রনাথের দিকে তাকাল, 'আপনার বক্তব্যটা শুনতে পারি কি ?'

'এসব মেয়েলি ব্যাপারে আমার কোনও বক্তব্য থাকা উচিত নয়।'

'বাঃ। এটা তো এসকেপিস্টের মতো কথা বলছেন।'

'দেখুন ভাই, যদি আলোচনা করতেই হয় কমলেন্দুকে পাঠান। এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলা আমার পক্ষে বেশ ডেলিকেট হয়ে যাচ্ছে।' সমরেন্দ্রনাথ স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'রায়বাড়ির ইতিহাসে কেউ এ বিষয় নিয়ে কখনও কথা তুলেছে বলে শুনিনি। আমি মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সমরেন্দ্র ভেতরে চলে গেলে উর্মিলা বলল, 'তুমি কিছু মনে কোরো না বউদি, মেয়ে হিসেবে মেনে নিতে পারলাম না বলে চলে এসেছি।'

'ঠিকই করেছ। বোসো, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'আমি একটু অশ্বত্থামা নামের কাউকে সামনে রাখব।'

'তার মানে !'

এই সময় সৌদামিনী ঘরে এলেন, 'ওমা, তুমি ! কোন দিক দিয়ে এলে ? সদর দিয়ে তো আসনি। এলে টের পেতাম।'

'আমি ছাদ ঘুরে এসেছি জেঠিমা।'

'সে কি ! কাজটা ভাল করনি। দাঁড়াও।' সৌদামিনী এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরিষ্কার আছ তো ?'

'একদম।'

'তোমার মাথায় মন্ত্র জপে দিচ্ছি।' বাঁ হাতের কড়ে আঙুল উর্মিলার কপালে সামান্য ছুঁয়ে বিড়বিড় করে গেলেন সৌদামিনী কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'আর কক্ষনও এ কাজ করবে না। হ্যাঁ, খোকা বলছিল, তোমার নাকি কী কথা আছে ?'

'আপনি আমার এমন ক্ষতি করলেন কেন ?'

'ক্ষতি ! আমি !'

'হ্যাঁ। আজ রাত দশটা বত্রিশ থেকে চল্লিশ এ বাড়ির সব আলো নিভিয়ে দেওয়ার হুকুম হয়েছে। নিশ্চয়ই আপনার আবেদনে হয়েছে। ওই সময়ে আমার এক খুব ছেলেবেলার বান্ধবীকে টিভিতে দেখাবে। আলো নেবালে তাকে দেখতে পাব না। এটা ক্ষতি নয় ! কত বছর ওকে দেখিনি ?'

'আমি কী করব বলো ! উনি নিশ্চয়ই পাঁজিতে ওই সময় পেয়েছেন। আমি তো তাঁকে বলিনি সাড়ে দশটার পর আয়োজন করুন। তা ছাড়া উনি এ বাড়ির সব আলো নিবিয়ে দিতে বলেছেন। সাউন্ড কমিয়ে টিভি চালালে তিনি নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না যদি ভল্যুম কমানো থাকে।' সৌদামিনী হাসল, 'আইন যেমন আছে, তেমন তার ফাঁকও আছে। যাও, রাত কোরো না, এবার সামনের দরজা দিয়ে যাওয়াই ভাল।'

'আমার তো আসল কথাই বলা হল না।'

'আবার কী কথা !'

'কিছু মনে করবেন না জেঠিমা, আপনি আমার মায়ের চেয়ে বড়। কিন্তু আমিও মেয়ে, বিবাহিতা, ই আপনার খারাপ লাগলেও, আমার লাগবে না। কারণ আমার কাছে এটা কোনও অপরাধ নয়, কটা নিয়ম মাত্র। যেমন করে গাছ বড় হলে ফুল হয়, ফল হয়, আবার কারও শুধুই ফুল, ফল হয় , প্রকৃতি যে নিয়ম বেঁধে দেয় সেই বাঁধা নিয়মের একটা। আপনার কবে প্রথম পিরিয়ড য়ছিল। ঠিক কত বছর বয়সে ?'

সৌদামিনীর মুখ লাল হয়ে গেল। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন, 'তোমার তো সাহস কম য় ! এ প্রশ্ন আমাকে করছ !'

'আমি অন্যায় কোনও প্রশ্ন করিনি।'

'আমার বলতে ঘেন্না লাগছে।'

'তখন আপনাকে কী ব্যবহার করতে বলা হয়েছিল ?'

'তার মানে !'

'শাড়ির পাড় বা ছেঁড়া কাপড় ভাঁজ করে, তাই তো ?'

'হ্যাঁ। তাই নিয়ম ছিল।'

'নিয়ম না, হাতের কাছে অন্য কোনও আবিষ্কার ছিল না। ফলে মা মাসিরা কাচা কাপড় ভাঁজ রে ব্যবহার করতেন। ব্যাপারটা আদৌ স্বাস্থ্যসম্মত ছিল না। ওই আব্রু ভেদ করে বাইরের মাকাপড়ে রক্ত লেগে যাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। সেটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু বলেই তখন নিয়ম ছিল তুর কয়েকদিন মেয়েরা ঘরের বাইরে যাবে না। পুরুষের চোখের আড়ালে থাকবে। শরীর ঠাণ্ডা খতে মাছ, মাংস, ডিম অথবা মশলা দেওয়া রান্না খাবে না। একেবারে বিধবা করে রাখা হত কালে। তাই তো ?'

'সেটাই শোভন ছিল।'

'তখন। তখনকার সময় নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। আপনি নিশ্চয়ই টিভি দ্যাখেন। কাশ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিনের বিজ্ঞাপন দেখছেন তো ? আধুনিক ন্যাপকিন ব্যবহার করলে আর চটা দিনের থেকে কোনও পার্থক্য তৈরি হয় না। আজ মেয়েরা অফিসে চাকরি করছে, প্লেন লাচ্ছে। তাদেরও পিরিয়ড হয়। জেঠিমা, এইসব একটু চিন্তা করুন। ওই বাচ্চা মেয়েটাকে কটা নোংরা ঘরে বন্ধ করে আপনি ওকে কোন শিক্ষা দিচ্ছেন ? কদিন বাদেই স্কুলে ও এ বিষয়ে যা ড়বে, তার পরে আপনাকে শ্রদ্ধা করতে পারবে ?'

'বইয়ে অনেক কিছু লেখা থাকে। পাঁচ স্বামী নিয়ম মেনে এক স্ত্রীকে ভোগ করল। বাস্তবে তা ি সম্ভব ? কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না এ বাড়ির বউ হয়ে আসার পর তোমার শাশুড়ি কিছুই শখায়নি। সে না হয় বেশিদিন ঘর করতে পারেনি তোমার সঙ্গে, কিন্তু কমলেন্দু তো ালমানুষ—।'

'আপনারা আজ বড়মার কাছে যাচ্ছেন কেন ?'

'এটা নিয়ম।' সৌদামিনী জোরের সঙ্গে বললেন, 'এ বাড়ির নিয়ম।'

'আপনারা যান। আপনার বউমাকে নিয়ে যান। ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে না গেলে কী এমন হাভারত অশুদ্ধ হবে ?'

'এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলব না।'

'তা হলে আমি আজই বড়মার সঙ্গে দেখা করব।'

উর্মিলা উঠে দাঁড়াতেই কৃষ্ণা সভয়ে বলে উঠলেন, 'না। যেও না।'

'না বউদি। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

ঠিক তখনই টুপুরের চিৎকার ভেসে এল, 'মরে গেছি, মরে গেছি। উঃ, আঃ। আমাকে বাঁচাও, াঁচাও।'

কৃষ্ণা চমকে তাকালেন। উর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে ?'

সৌদামিনী বললেন, 'দ্যাখো তো বউমা। বিছে-টিছে বের হল কিনা ?'

কৃষ্ণা দ্রুত ওপাশের দরজা খুলে ফেলল, 'কী হয়েছে ? এই টুপুর ?'

ঊর্মিলা জোরে ডাকল, 'টুপুর !'

কোনও সাড়া এল না।

সৌদামিনী এবার ব্যস্ত হলেন। এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'সরো বউমা, কী করছে ও ? শুয়ে আছে নাকি ?'

কৃষ্ণা ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনই টুপুর বেরিয়ে এসে খপ্ করে সৌদামিনীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এবার তোমাকে চান করতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে চিলচিৎকার শুরু করলেন সৌদামিনী। তিনি শূন্যে হাত ছুড়ে চলেছেন। আর খিলখিল করে হেসে চলেছে টুপুর। ঊর্মিলা আর না দাঁড়িয়ে দরজা পেরিয়ে ছাদে যেতেই কৃষ্ণার গলা পেল, 'কী হচ্ছে কী ? বদমাস মেয়ে ?' চড় মারার শব্দ কানে এল। টুপুর একটাও শব্দ করল না।

ঊর্মিলা শূন্য ছাদে একা হেঁটে চলেছিল। মাথার ওপর আকাশজুড়ে কয়েক লক্ষ তারা। লক্ষ না কোটি ! কিন্তু মাঝে মাঝে, এই যেমন এই সময়, কয়েক শো বলেও মনে হচ্ছে না। সে মুখ তুলে সেই তারাদের দেখতে দেখতে হাঁটছিল। 'আজ তারায় তারায় জ্বলুক বাতি, আঁধার সরিয়ে দাও/ অন্ধকারের দুয়ার খুলে আলোয় ভুবন ভরিয়ে দাও।' গানের কথাটা এই রকম নয় কি ? হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন ? এ ভুবন কবে কোন আলো এসে ভরাবে কে জানে, তবে ঊর্মিলার মনে হল, মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু মেয়েরাই।

রাত নটা নাগাদ আতরবালা এসে জানিয়েছিল ঊর্মিলা দেখা করতে চায়। ইজিচেয়ারে শোওয়া অবস্থায় বড়মা বললেন, 'কে আতর, ঊর্মিলা কে ?'

'কমলেন্দুর স্ত্রী। বিয়ের কিছুদিন পরে তার শাশুড়ি মারা যায়। শাশুড়ি ছিলেন সত্যভামা, অমলেন্দুর স্ত্রী।'

'অ। কী চায় সে ?'

'বলছে ব্যক্তিগত।'

'কাল আসতে বল। আজ আমার মন স্থির নেই।'

'বলে দিয়েছি।'

'অ। সে চলে গিয়েছে ?'

'না গিয়ে উপায় কী ?'

'আচ্ছা ! আমি যদি বলতাম, যা, নিয়ে আয়।'

'এ হুকুম হত না।'

'কেন ?'

'তা হলে এত বছর সেবা করা বৃথা বলে মনে হত।'

বড়মা মাথা নেড়ে হাসলেন, 'নাতবউকে পাঠিয়ে দে।'

'সে ঘুমোচ্ছে।'

'এই অসময়ে ঘুমোচ্ছে কেন ?'

'আচ্ছা। যার স্বামী আমেরিকায় বসে আছে তার কি সময় অসময় জ্ঞান আছে ? আমি একটা কথা বলতে পারি ?'

'বল।'

'ওকে ওর স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দাও।'

'কেন ?'

'ওরা সুখী হবে।'

'তা হলে নাতি আর কখনও ফিরবে না।'

'সে এমনিতেও ফিরবে না। মাঝখান থেকে কচি বউটা মরবে। সে ওখানে মেমসাহেব বিয়ে

করে বসলে কিছু করা যাবে ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হল বড়মার বুকের খাঁচা থেকে। একটু সময় নিয়ে বললেন, 'নাতবউ যেতে চায় ?'

'মুখে বলে না। মনে বলে।'

'মনে যে বলে তা তুই বুঝলি কী করে ?'

'আহা, বোশেখের বিকেলে পশ্চিমে মেঘ জমলে কী হয় আর শরতের আকাশে মেঘ জমলে কী হবে তা জানতে শিক্ষে লাগে নাকি ?'

'হুম্। হয়তো ঠিক বলেছিস। কিন্তু নাতবউকে আমার সামনে এসে বলতে বল যে সে তার স্বামীর কাছে যেতে চায়।'

'একথা এ বাড়ির বউ হয়ে কখনও বলতে পারে ?'

'কেন ! পারবে না কেন !'

'বাড়ির রেওয়াজ আছে ?'

'অঃ। দেখি ভেবে দেখি। সে চলে গেলে নাতি আর এমুখো হবে না। তখন আমাকে দেখার জন্যে তুই একা থাকলি। তোরও তো বয়স হয়েছে। কিছু হয়ে গেলে আমি কার কাছে থাকব, কী নিয়ে থাকব, এসব কথা চিন্তা করতে হবে। চট করে এক কথায় ডেকে বলে দেওয়া যায়, চলে যাও !' বড়মা একটু চুপ করলেন, 'কটা বাজল ?'

'প্রায় দশটা।'

'অ্যাঁ। এখনও চুপ করে আছিস, তৈরি করে দে আমাকে। ঠাকুরদালানে যেতে হবে খেয়াল নেই ! শুধু আজেবাজে কথা।'

'এখনও অনেক দেরি আছে।'

'চুপ কর। যা বলছি তা না করে মুখে মুখে তর্ক !' বৃদ্ধা রেগে গেলেন। ঠিক দশটা নাগাদ বড়মা তৈরি। লাল বেনারসী শাড়ি পরনে, পাকা চুলের নুড়ির সঙ্গে পেছনের আঁচল ক্লিপ দিয়ে আটকে দেওয়ায় বেশ ঘোমটা ঘোমটা ভাব এসেছে। পায়ে কোনও চটি নেই কারণ তিনি ঠাকুরদালানে যাচ্ছেন। আতরবালার এক হাতে বড় মোমদান অন্য হাতে পুজোর জিনিসপত্র। মোমদানের বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আতরবালা বলল, 'তুমি আমাকে ধরে নামার সময় নামো, ওপরে ওঠার সময় আমি তোমাকে ধরব।'

'ঠিক আছে। নামতে আমি পারব। শরীরটা একটু ভারী হয়ে গেছে বলে— ! হ্যাঁ রে ঘণ্টা দিয়েছিস ? কানে এল না তো কিছু ?'

'সাড়ে দশটায় বাজবে। নিশ্চয়ই এখনও বাজেনি সাড়ে দশটা। পাঁড়েজিকে সেই কখন খবর দিয়েছি।' আতরবালা দরজার দিকে এগোল।

'আ মলো যা ! এই বুড়িকে নিয়ে যে কী করি ! তুই পাঁড়েকে খবর দিয়েছিস ? সে ব্যাটা তো এখন আফিং খেয়ে ঘুমায়। দ্যাখ, সারাবাড়ি জুড়ে আলো জ্বলছে, টিভি রেডিও চলছে। এই মচ্ছব চললে আমি নামব না।' বড়মা পাশ ফিরে দাঁড়ালেন।

আতরবালা বলল, 'আশ্চর্য। সাড়ে দশটার আগেই সবাই আলো নিভিয়ে ভূতের মতো বসে থাকবে ! তোমার কপাল ভাল, এরা বলে তোমার কথা শোনে, অন্য বাড়ির মানুষ হলে কানেই তুলত না।'

'বের করে দিতাম এ বাড়ি থেকে গলাধাক্কা দিয়ে। ভাল হয়েছে, আলাদা হয়ে আছ, এ বাড়ির শরিক কিন্তু মালিক নও। মায়ের আদেশ অমান্য করলে এ বাড়িতে থাকা চলবে না।' বড়মার কথা শেষ হওয়ামাত্র বাড়ি কাঁপিয়ে ঘণ্টা বাজতে লাগল। সেইসঙ্গে পাঁড়েজির সরু গলার চিৎকার, 'বাতি বন্দ্ কর। শান্ত হো যাও। সব কামরেমে রহ।'

আতরবালা বলল, 'চলো। আমাকে ধরে ধরে নামবে।'

এবার বড়মা কিছু বললেন না। সমস্ত আলো টুপটুপ করে নিভে গেল। শুধু আলো নয়, টিভি পর্যন্ত বন্ধ করে দিল প্রতিটি পরিবার। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আতরবালার হাতের মোমবাতির

আলোয় পথ চিনে নামছিল বড়মা। দূর থেকে দুজনকে একই দেহ মনে হচ্ছিল। যেন লাল পর্দার মাঝখানে সাদা লাইন। আতরবালা এখন থান পরেছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেই ইদানীং সে থান পরা শুরু করেছে।

ওপাশের সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে নামছিলেন সৌদামিনী। তাঁর হাতে লণ্ঠন। হাঁটতে হাঁটতে বলছিলেন, 'শক্ত হাতে ছুঁড়িটাকে ধরে রাখো বউমা। আবার বলে বোসো না তোমার হাত ছাড়িয়ে সে পালিয়েছে। পেছনে আছে তো ?'

কৃষ্ণা বললেন, 'হ্যাঁ।'

আরও পেছনে থেকে টুপুর জিজ্ঞাসা করল, 'এত রাত্রে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা ? উঃ, আমার একটুও ভাল লাগছে না, ঘুম পাচ্ছে।'

সৌদামিনী বললেন, 'রাত বারোটা পর্যন্ত অন্য দিন বকবক করার সময় ঘুম কোথায় যায় ?'

'এখন খিদে পেয়েছে !'

'অ্যাই চুপ। চুপচাপ নাম।' কৃষ্ণা ধমক দিল।

'আমার মনে হচ্ছে তোমরা আমাকে বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছ !'

দুটো আলো প্রায় একই সময়ে দুদিক থেকে নীচের তলায় এসে পৌঁছোল। সৌদামিনী ইশারায় কৃষ্ণাকে দাঁড়াতে বলে এগিয়ে গেলেন। লণ্ঠন মেঝের ওপর রেখে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন বড়মাকে, 'আমরা এসেছি।'

'আঃ। ঠাকুরদালানে এসে আমাকে প্রণাম করছ কেন ? এখানে মা-ই সব। ওঁকে প্রণাম করলেই সব করা হয়ে গেল। মেয়েকে ঠিকঠাক রেখেছিলে তো ?'

'হ্যাঁ। খবর শোনামাত্র ভাঁড়ারঘরে বন্দী করে রেখেছিলাম।'

'বন্দী করতে হল কেন ? ঘরের এককোণে বসতে বললেই তো হত।'

'আজ্ঞে, বড্ড তেজ, জেদি।'

'এই তো তেজ ভাঙার দিন শুরু হল। শরীর যত বড় হবে বুঝতে শিখবে কী থেকে কী হয়। নিয়ে এসো তাকে।' আতরবালাকে ইঙ্গিত করে ধীরে ধীরে দালানে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল মন্দিরের সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন বড়মা। আজ এটুকু নামতেই হাঁটুর ব্যথা জানান দিচ্ছে। নাতবউ-এর বাপ ডাক্তার। বিনি পয়সায় যে সব ওষুধ পায় তাই তাঁকে পাঠিয়ে দেয়। আজ মনে হচ্ছে তাতে জল মেশানো থাকে নিশ্চয়ই।

মায়ের মূর্তির সামনে পেতলের পিলসুজে মোটা সলতে পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে। আর একটু বাদেই দপ্‌ দপ্‌ করতে করতে নিভে যাবে। কিন্তু আতরবালার হাতের মোমের আলোয় মায়ের মুখ ঝকমকিয়ে উঠল। এ মূর্তি ব্যাঘ্রবাহিনী। ভয়ঙ্কর প্রাণীটিকে বশ করে পরম উদাসীন মুখে তাকিয়ে আছেন কোন সুদূরে। বাঘটি পড়ে আছে তাঁর পায়ের তলায়, যুদ্ধ করার সময় অজান্তে চুল খুলে লুটিয়ে আছে বুকেপিঠে। যুদ্ধে জয় আসামাত্র এসে যায় নিদারুণ উদাসীনতা। পাশ ফেরানো মুখ। সেই মুখে এখন মোমবাতির আলো পড়েছে।

বড়মা দু হাত জোড় করলেন, 'মা, মাগো, আর কতদিন এভাবে পড়ে থাকব মা ?'

মা মায়ের মতো রইলেন।

বড়মা এবার পেছন ফিরলেন, 'কই, সে কোথায় ?'

সৌদামিনী বলল, 'যাও বউমা, ওকে নিয়ে যাও।'

টুপুর বলল, 'না, আমি যাব না। আগে বলো, কী করবে ?'

বড়মা ধমক দিলেন, 'এই যে, তুমি ওর মা ? ওকে নিয়ে এখানে আসতে পারছ না ! এই সময়ের মধ্যে না হলে মেয়ে নষ্ট হয়ে যাবে, বুঝতে পারছ না ?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে কৃষ্ণা মেয়েকে টানতে টানতে বড়মায়ের পাশে এনে দাঁড় করালেন। বড়মা ধমকে উঠলেন, 'অ্যাই, তুই কাঁদছিস কেন ?'

তাঁর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে টুপুর থমকে গেল।

বড়মা বললেন, 'সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর মাকে।

ব্যাঘ্রবাহিনীকে প্রণাম করতে খুব ভাল লাগে টুপুরের। সে চট করে রাজি হয়ে গেল। তাকে প্রণাম করতে দেখে খুশি হয়ে বড়মা বললেন, 'মা, এই পৃথিবীতে আর একটি শরীর আজ নারী হয়েছে। এখন থেকে তার মনের পাপ শরীরের রক্ত হয়ে প্রতি মাসে বের হবে। এসব তোমারই করা মা। কিন্তু এই প্রথম দিনে সেই রক্ত নিয়ে ও তোমার কাছে এসেছে, তুমি ওর পবিত্রতা রক্ষা করো।'

প্রণাম করলেন তিনি। ওপাশে দাঁড়ানো সৌদামিনী আর কৃষ্ণাও, তাঁর অনুসরণ করল। বড়মা বললেন, 'অ্যাই ছুঁড়ি, পারবি ? পারবি মায়ের পায়ের সিঁদুর নিজের মুখে মাখতে ?'

টুপুর মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

'তা হলে ওঠ। আর সময় নেই। মেখে বল, মা আমাকে রক্ষা করো।'

টুপুর উঠল। দ্রুত বেদির পাশে চলে এসে মায়ের পায়ের সিঁদুর তুলতে গিয়েও মত পাল্টে জিজ্ঞাসা করল, 'কপাল থেকে নেব ? কপালের সিঁদুর ভাল।'

'না, যা বলছি তাই কর।'

টুপুর পা থেকে সিঁদুর তুলে নিজের গালে সামান্য লাগিয়ে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মায়ের গালেও সিঁদুর হাত লেপে দিল।'

ওপাশে সৌদামিনী চিৎকার করে উঠলেন, 'ছুঁয়ে দিল, মাকে ছুঁয়ে দিল।'

টুপুর তীব্র প্রতিবাদ করল, 'বাঃ পা ছুঁলে ছোঁয়া হয় না ? আমি দেখছিলাম, কে বেশি লম্বা, মা না আমি। বাঘের ওপর উঠলে মা বেশি লম্বা, তাই না ?'

৬

ডাক্তার আঙ্কল ইনজেকশন দিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে তুলোয় রক্ত তুলে নিচ্ছিলেন নাক এবং কান থেকে। সায়ন চুপচাপ শুয়েছিল উঁচু খাটে। এই সময়ে যা যা তাদের প্রয়োজন হয় তা এই ঘরে রয়েছে। সেগুলো চেয়ে দেখছিল সায়ন। সে সব কিছু স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছেও। শুধু শরীরের ভেতর ঢেউ-এর মতো একটা অনুভূতি তাকে খুব বিব্রত করছিল। ঢেউটা ওপরে উঠেই আবার নীচে নেমে যাচ্ছে। এবং তখনই কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হচ্ছে সে তলিয়ে যাচ্ছে। একরাশ অন্ধকার ডালপালা মেলে হাঁ করে তাকে গিলতে ছুটে আসছে কিন্তু গিলতে পারছে না। ঢেউটা আবার তাকে তুলে নিয়ে আসছে ওপরে যেখানে হালকা নীল আলো বিছানো। কে যেন গান গাইছে। কে গাইছে, কী গান, সে বুঝতে পারছে না।

বড়বাহাদুরের গলা পেল যেন, 'এসে গিয়েছে সাব।'

'বাঃ। কী যেন নাম ওর ?'

'পদমকুমার।'

'নিয়ে এসো ওকে। জলদি।'

একটু পরেই সায়ন শুনতে পেল ডাক্তার আঙ্কলের গলা, 'তোমার নাম পদমকুমার ?'

'জি।'

'তুমি জানো, কেন এখানে তোমাকে ডেকে আনা হয়েছে ?'

'জি।'

'তোমাকে কি কেউ জোর করে ধরে এনেছে ?'

'না তো।'

'তা হলে ?'

'ওই ভাই-এর জান বাঁচাতে এসেছি।'

'তুমি জান বাঁচাবে ?'

'আমি কী করে পারব ? আমার খুন ওর শরীরে গেলে জান বেঁচে যাবে।'

'তুমি আগে ওকে দেখেছ ?'

'জি।'

'কোথায় ?'

'এখানেই। আমার ছোটা ভাই ওর কাছে গানা শিখেছে।'

পদমকুমারের মুখ সায়ন দেখতে পাচ্ছিল না। ডাক্তার আঙ্কল ওকে বসতে বললেন, 'তুমি এর আগে কবে শেষবার রক্ত দিয়েছ ?'

'আমি কখনও দিইনি।'

'এই যে আমরা যখন তোমাদের ডেকে ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করিয়েছিলাম তখন তোমাদের ভয় হয়নি ?' ডাক্তার আঙ্কল সম্ভবত কাজ করতে করতে কথা বলছেন।

'না। ট্যাক্সি ড্রাইভারের লাইসেন্স পেতে হলে গ্রুপ বলতে হয়। আপনি বিনা পয়সায় করিয়ে দিচ্ছেন।'

'তুমি ট্যাক্সি চালাতে চাও ?'

'হ্যাঁ।'

'লাইসেন্স পেয়ে গেছ ?'

'নাঃ। দু হাজার টাকা ঘুষ চায়। কোথায় পাব ?'

'ঠিক আছে। আমি দেখব যাতে তোমাকে ঘুষ দিতে না হয়। প্র্যাকটিস করছ ?'

'জি।'

'দ্যাখো, পদমকুমার, তোমার কি একটুও লাগল ?'

'না।'

'শরীর খারাপ করছে ?'

'না।'

'এই দ্যাখো, এই বোতলে তোমার রক্ত নিয়েছি। একটু পরে ওই রক্ত এই ভাই-এর শরীরে আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দেব। তোমার রক্তে ও আবার শক্তি ফিরে পাবে। মনে রেখো, তুমি এই ভাইকে আজ নতুন করে জীবন দিলে। আর হ্যাঁ, তুমি যাবে না। তোমাকে খাবার দেওয়া হবে। একটু বিশ্রাম করে খেয়ে তবে যাবে। ডাক্তার আঙ্কল ফ্রিজ খুলে রক্তের বোতলটা উল্টো করে রেখে দিলেন। ঘড়ি দেখলেন। তারপর সায়নের কাছে এসে বললেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে ?'

সায়নের মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, হাসি বিবর্ণ। সে মাথা নেড়ে না বলল।

ডাক্তার আঙ্কল বললেন, 'তুমি তো অন্য সবার চেয়ে বেশি ইনটেলিজেন্ট। তাই বলি, অত ভাব কেন ? এত টেনশন হলে শরীর কি বইতে পারে !'

'আমি তো কিছুই ভাবিনি।'

'তা হলে ?'

'মন্ত্রীরা চুরির অপরাধে ধরা পড়েছে, এই খবরটা পড়েই মনে হল মানুষ কাকে ভোট দেয় ? কেন ভোট দেবে ? আর তখনই এসব শুরু হয়ে গেল।'

'মুশকিল।' ডাক্তার আঙ্কলকে মাথা নাড়তে দেখল সায়ন। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সায়ন, তুমি গান শুনবে ?'

'গান ?'

'হ্যাঁ।'

'না। আচ্ছা, আমি কখনও সমুদ্র দেখিনি। আমাকে সমুদ্র দেখাবেন ?'

'নিশ্চয়। ও হো, তোমাকে বলা হয়নি, আমি ঠিক করেছি, সামনের শীতে তোমাদের সবাইকে নিয়ে কোনও সমুদ্রের ধারে গিয়ে এক মাস থেকে আসব। কেমন ?'

'খুব ভাল হয়। শীত কবে আসবে ?'

ডাক্তার কিছু বলার আগে বড়বাহাদুর দরজায় দাঁড়াল, 'সাব !'

ডাক্তার তাকালেন। বড়বাহাদুর বলল, 'ও নিতে চাইছে না।'

'সে কী !'

'হ্যাঁ। বলছে দরকার নেই। ওমলেট মিষ্টি খেয়েছে। দুধ খায়নি।'

'ওকে ডেকে দাও।'

বড়বাহাদুর বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এল পদমকুমারকে নিয়ে। ডাক্তার তার কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমার যে রক্ত শরীর থেকে বেরিয়েছে তা বের হলে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু তুমি যে উপকার করলে তার জন্য টাকা দেওয়া নিয়ম। তুমি টাকাটা নিচ্ছ না কেন ?'

পদমকুমার মাথা নাড়ল, 'নেহি।'

'কেন ?'

'আমি খুন বিক্রি করব না।'

'বিক্রি ! তুমি ভাবছ কেন বিক্রি করছ ?'

'এই খুন আমাকে আমার মা দিয়েছিল। এটা তো আমি তৈরি করিনি। যদি এর থেকে কিছু দিলে ওই ভাই বেঁচে যায় তা হলে আমার মা খুশি হবে।'

'তোমার মা কোথায় আছেন ? বাড়িতে ?'

'জি।'

ডাক্তারের বুক নিঃশেষ করে বাতাস বেরিয়ে এল। তিনি বললেন, 'একটু দাঁড়াও।' তিনি ফ্রিজের দরজা খুলে বোতলটা দেখলেন। তিনি যা চাইছেন প্রায় সেই চেহারা নিয়েছে বোতল। মুখের দিকটায় ঘন লালচে রক্তাংশ, ওপরের দিকে সাদাটে। বোতলটা নিয়ে এসে ডাক্তার বললেন, 'দ্যাখো পদমকুমার, তোমার শরীর থেকে নেওয়া রক্ত কী রকম দু ভাগ হয়ে গিয়েছে। এই বোতলের রক্ত ওর শরীরে দেওয়া হবে। তুমি লক্ষ রাখো।' ডাক্তার বোতলটি স্ট্যান্ডে লাগিয়ে পাইপ ঠিকঠাক করে তার শেষ অংশ সায়নের হাতের বিশেষ শিরায় সূচের মাধ্যমে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর পদমকুমারকে কাছে ডেকে কাঁধে হাত রেখে সায়নকে বললেন, 'সায়ন, লুক অ্যাট হিম। ওর নাম পদমকুমার। ও তোমাকে ওর রক্ত দিয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার জন্যে। কেন দিয়েছে জানো ! তুমি ভাল হলে ওর মা খুশি হবেন। তাই, তুমি সুস্থ হলেই ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে প্রণাম করে আসবে। বুঝলে।'

সায়ন মাথা নাড়ল। তারপর যে হাতে নল নেই সেই হাত বাড়িয়ে দিল সে পদমকুমারের দিকে। পদমকুমার দু হাতে তার হাত জড়িয়ে ধরল, 'ডরো মত ভাই। যিতনা খুন লাগেগা হামলোগ দেগা। তুমকো জিনা পড়েগা।'

'কেন ?' সায়ন চোখ বড় করার চেষ্টা করল।

'তুম বহুৎ আচ্ছা গানা গাতে হো।'

সায়ন চোখ বন্ধ করল। পদমকুমার নেপালি। ওই ছেলেগুলোও নেপালি। তা হলে এরা আলাদা কথা বলছে কেন ? পদমকুমার বলেছে যত রক্ত দরকার ওরা দেবে। ও তাকে ভাই বলেছে। আঃ। সায়ন জ্ঞান হারাল।

পদমকুমার মাথা নিচু করে নিরাময় থেকে বেরিয়ে এল। রক্ত দেওয়া নিয়ে অনেকে অনেক কথা তাকে বলেছে। এই নিরাময়ের সমস্ত পেশেন্ট বাঙালি। বাঙালি পেশেন্টের জান বাঁচাতে নেপালিরা রক্ত দেবে কেন ? এই বাঙালি কারা ? জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জাতভাই। ঠিক। কিন্তু মা বলে অন্য কথা। 'যে ছেলে তোর ভাইকে অত সুন্দর গান শেখায় সে বাঙালি না নেপালি তা নিয়ে মাথা ঘামাবি না। ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি—একথা যে বলে সে তোর ভাই।' মায়ের কথা মেনে নিয়েছে পদমকুমার। এখন তার মন প্রফুল্ল। মনে হচ্ছিল জীবনে এই প্রথমবার সে কোনও ভাল কাজ করে ঘরে ফিরছে।

'যিশু কা বড়াই।'

পদমকুমার চমকে তাকাল। অন্ধকার হয়ে গেছে চারপাশ। কিন্তু সামনের বাড়ির বারান্দায়

আলো জ্বলছে। তার দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার ব্রাউন। হেসে আবার বললেন, 'যিশু কা বড়াই। কোত্থেকে আসছ ?'

পদমকুমার বলল, 'নিরাময় থেকে।'

'কেন ?'

'ওখানে একজন খুব অসুস্থ। রক্ত বের হচ্ছে। তাকে রক্ত দিতে হয়েছে। আমার রক্তের সঙ্গে তার রক্তের মিল থাকায় আমি গিয়েছিলাম।'

'কে ? কী নাম তার ?'

'সায়ন।'

'কী বললে !' ব্রাউন চমকে উঠলেন, 'আবার বলো।'

'সায়ন। বড়বাহাদুর তাই বলল। আমার ভাইও তাই বলেছে।'

ব্রাউন আর দাঁড়ালেন না। তাঁর বাড়ির দরজা খোলা রইল। কুকুরটা দু পা এগিয়ে আবার পেছনে ফিরে গেল।

পদমকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'দাজু, কোথায় যাচ্ছেন ?'

'নিরাময়ে। তুমি যাকে রক্ত দিয়ে এলে সে সাধারণ ছেলে নয়।'

'তার মানে !'

'সে ঈশ্বরের অংশ। তুমি না জেনে আজ যে কাজটা করে এলে তার জন্যে মানুষ চিরকাল তোমাকে মনে রাখবে। যিশু তোমার মঙ্গল করবেন। কিন্তু প্রার্থনা করো ওই ছেলেটা যেন আজ রাত্রে ভাল হয়ে যায়।'

ব্রাউন নিরাময়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিরাময় নিঃশব্দ। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। একটিও তারা নেই। কোনও আলো নেই আকাশে। এখন বেশ ঠাণ্ডা চারপাশে। তাড়াহুড়োয় তিনি মাথার টুপি এবং মাফলার নিয়ে আসতে পারেননি। কিন্তু এখন তাঁর শীতবোধ ছিল না। পূর্ব দিকে মুখ করে নিরাময়ের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি স্থির হয়ে প্রার্থনা করছিলেন। 'যিশু, আমি বিশ্বাস করি তুমি আমাদের সঙ্গে আছ। তোমার ইচ্ছায় প্রকৃতি চেহারা পাল্টায়, মানুষের জীবনলীলা সংঘটিত হয়। তা হলে ওই ছেলেটি এত কষ্ট পাবে কেন ? কেন সে নীরোগ জীবনের অধিকার পাবে না ? এই নিরাময়ের নামকরণ মিথ্যে করতে নিশ্চয়ই তুমি উদ্যোগ নেবে না। তুমি আলো না দেখালে যখন পৃথিবী অন্ধকার তখন আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, দয়া করো। দয়া করে ওকে সুস্থ করে তোলো।'

মিনিট পাঁচেক প্রার্থনার পর মন যখন সামান্য হালকা হল তখন গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। গেট বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু তালা পড়েনি। তাঁকে দেখে বড়বাহাদুর এগিয়ে এল, 'নমস্তে। সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সাহেব এখন পেশেন্টের সামনে থেকে উঠে আসবেন না।'

'আমি জানি। আমি বাইরে অপেক্ষা করব।'

বড়বাহাদুর গেট খুলে দিলে ব্রাউন ধীরে ধীরে প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে এলেন। বড়বাহাদুর তাঁকে দেখিয়ে দিল কোন ঘরে ডাক্তার রয়েছেন। দরজা বন্ধ কিন্তু একটুও কাউকে বিব্রত না করে ব্রাউন ঘরের বাইরে রাখা বেঞ্চিতে বসলেন। এখন মাথার ওপর ছাদ, তিনদিক ঢাকা বলে শীত কম লাগছিল। ব্রাউন চোখ বন্ধ করলেন। অবিকল সেই নাক, সেই চোখ। ভোরের আকাশ সুন্দর করে যে আলো এসে থেমেছিল এই নিরাময়ের ওপর তা কি তাঁর স্বপ্ন ছিল ! শুধু স্বপ্ন ! বন্ধ চোখের পাতায় এখন যিশুখ্রিস্ট তাঁর যাবতীয় সৌম্য-লাবণ্য নিয়ে উপস্থিত। যে চাহনিতে শুধু ভালবাসা মেশানো ক্ষমার উদারতা, যে ঠোঁটের কোণে প্রশ্রয়ের মৃদু ইঙ্গিত সেই যিশুখ্রিস্টকে মহানন্দে দেখতে লাগলেন ব্রাউন। এ দেখা, এই দেখতে পাওয়া তাঁকে এক অনির্বচনীয় সুখের উদ্যানে নিয়ে যায়। তিনি বাস্তব ভুলে যান, নিজের অস্তিত্বের কথাও মনে থাকে না।

'কী ব্যাপার, মিস্টার ব্রাউন ! এই অসময়ে ! কারও কি শরীর খারাপ ?' ডাক্তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে

প্রশ্ন করলেও ব্রাউনের মনে হল তিনি অস্পষ্ট শুনছেন। চোখের সামনে যে ছবি এতক্ষণে নির্মিত হয়েছিল তা ভেঙেচুরে উধাও। ব্রাউনের খুব কষ্ট হচ্ছিল। ডাক্তার আবার ডাকলেন, 'মিস্টার ব্রাউন!'

এবার পলকেই সব স্বচ্ছ। ব্রাউন বললেন, 'সরি, আমি—।'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

'নট অ্যাট অল। ছেলেটি কেমন আছে?'

'আপনি কি সায়নের কথা জিজ্ঞাসা করছেন?'

'হ্যাঁ। শুনলাম সে খুব অসুস্থ। রক্তপাত হচ্ছে? রক্ত দেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছেন।'

'কেমন আছে সে!'

'সম্ভবত ভাল। ঘুমোচ্ছে এখন!'

ডাক্তারের মনে পড়ল, 'আচ্ছা, আপনি তো ভোরবেলায় এসে ওর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন, তাই না?'

'ইয়েস ডক্টর।'

'কেন?'

'সেভাবে কোনও কারণ আমি বলতে পারব না। কখনও কখনও কোনও মানুষ আমাকে টানে। এখন ও যেমন টানছে। ও সুস্থ হয়ে যাবে ডক্টর?'

'ও এমন একটা অসুখের শিকার যার বিরুদ্ধে লড়াই করে বলা যায় না যে, জিতবই। আমাদের সাধ্য খুব কম কিন্তু লড়াই থেকে সরে আসব না।'

'ওঃ, ডক্টর। আপনি কোনও ডেফিনিট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন না!'

'দেওয়া যায় না মিস্টার ব্রাউন। আপনি জাহাজে ছিলেন, কাছাকাছি একটা উপমা দিলে হয়তো বুঝতে পারবেন। ধরুন বন্দর থেকে মাইল দশেক দূরে কোনও কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগায় জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হল। যখন জানা গেল জাহাজ ডুবে যাবেই তখন ক্যাপ্টেন সব যাত্রীকে লাইফজ্যাকেট পরিয়ে নৌকায় নামিয়ে দেন। কিন্তু যখন ক্যাপ্টেন বোঝেন জাহাজ ডুববেই কিন্তু একটু সময় পাওয়া যেতে পারে তখন তিনি চেষ্টা করেন দ্রুত তীরের দিকে চলে আসতে। যদি তীরে পৌঁছোবার পর জাহাজ ডোবে তাতে তাঁর বিরাট সান্ত্বনা থাকে। লিউকোমিয়ার একটা ধরনে পেশেন্ট ওই জাহাজের মতো যার আর কোনও আশা নেই, আর এক ধরনের সঙ্গে তীরের দিকে ছুটে আসা জাহাজের মিল আছে। আমরা এখন দ্বিতীয়টায় রয়েছি।'

'বুঝতে পারছি। এতক্ষণ আপনি বিজ্ঞানের কথা বললেন। কিন্তু বিজ্ঞান যেখানে থেমে যায় সেখানে এক অদৃশ্য শক্তি থাকে, শুধু হৃদয় থাকলে অনুভব করা যায়। এই অদৃশ্য শক্তি যদি কৃপা করে তা হলে অসম্ভবও "হ্যাঁ" হয়ে যায়। ডক্টর, আমি একবার ছেলেটিকে দেখতে পারি?' ব্রাউন তাকালেন।

'নিশ্চয়ই। ভেতরে যান। তবে আপনি নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবেন না।'

ব্রাউন ম্লান হেসে মাথা নাড়লেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে সেটাকে বন্ধ করলেন। সামনেই উঁচু খাটের ওপর সায়ন ঘুমোচ্ছে। এখন ওর হাতে কোনও নল লাগানো নেই। ব্রাউন ধীরে ধীরে সায়নের সামনে এস দাঁড়ালেন। ঘুমের মধ্যে ওর ঠোঁট কেঁপে উঠল। সেই নাক, সেই ঠোঁট। কিন্তু নাকের নীচে ও কী! কীসের দাগ। ব্রাউন ঝুঁকলেন এবং বুঝতে পারলেন ইতিমধ্যে দু তিন ফোঁটা রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে এসে নাকের তলায় জমা হয়েছে, গাঢ় হয়েছে এবং শক্ত হতে চলেছে। তাঁর শরীরে পেরেক পোঁতা হয়েছিল। অঝোর ধারায় রক্ত ঝরেছিল। এক সময় তিনি নীরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এই ছেলেটার গালের মতো সাদা। নাকি তাঁর মতো এই ছেলেটির গাল। ব্রাউন ভাবলেন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসে রক্তচিহ্ন দেখাবেন। কিন্তু সেই সময় সায়নের ঠোঁটে অপূর্ব এক হাসি চমকে উঠল। উঠেই স্থির হয়ে রইল। এই দৃশ্যটি দেখে ব্রাউন আর নড়লেন না। সামনের টুল টেনে বসে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

এখন তিনি প্রার্থনার ব্যাপারে সুশৃঙ্খল হতে চাইলেন। বাইবেলের যেসব লাইন তাঁর মনে আছে ব্রাউন সেগুলো আবৃত্তি করতে লাগলেন। দেখা গেল যা মনে ছিল অথচ মনে নেই বলে মনে হয়েছিল সেগুলোও চমৎকার উঠে আসছে। বাইবেল শেষ হয়ে গেলে তিনি নিজের মতো করে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

ডাক্তার নিঃশব্দে ঘরে এসে দৃশ্যটা দেখলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি তরুণের জন্যে বৃদ্ধ খ্রিস্টান নেপালি ভদ্রলোক এরকম প্রার্থনা যে করতে পারেন তা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। তাঁর মনে হল এবার মিস্টার ব্রাউনকে বিশ্রাম করতে বলা উচিত। তিনি এগিয়ে গিয়ে ব্রাউনের কাঁধে আলতো হাত রাখতেই প্রার্থনা থেমে গেল। ব্রাউন চোখ খুললেন, 'ইয়েস ডক্টর।'

'এবার আপনি বাড়ি যান। বিশ্রাম করুন।'

'আমি এখানে থাকি আপনি চাইছেন না ?'

'নট অ্যাট অল। আপনি অনেকক্ষণ প্রার্থনা করেছেন। এবার আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। বড়বাহাদুরকে বলছি আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে।'

'আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন ডক্টর !'

'কী বলছেন ! আমি আপনার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে বললাম।'

'অনেক ধন্যবাদ। আমি বেশ ভাল আছি।' ব্রাউন হাসলেন, 'ডক্টর ওর নাকের নীচ থেকে রক্ত মুছিয়ে দেওয়া দরকার।'

ডাক্তার দ্রুত এগিয়ে এলেন। সাবধানি আঙুলে তুলো নিয়ে রক্ত পরিষ্কার করলেন তিনি। তারপর কানের দিকে চোখ নিয়ে গেলেন। না, সেখানে রক্তপাত হয়নি। হাত পরিষ্কার করে এসে ডাক্তার বলেন, 'ঠিক আছে, আপনার যতক্ষণ ইচ্ছে এখানে থাকুন। আপনার জন্যে একটা ইজিচেয়ারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। যখন মনে হবে ফিরে যাবেন তখন বড়বাহাদুরকে ডেকে বলবেন।'

'ধন্যবাদ। ডক্টর আর ওকে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না ?'

'মনে হচ্ছে আজ রাত্রে হবে না।'

'যিশু আমার প্রার্থনা শুনেছেন।'

'এখন তো ও ভাল আছে। আসুন বাইরে বসে একটু কফি খাওয়া যাক।'

'ধন্যবাদ ডক্টর। আমি এখানেই থাকতে চাই।'

ইজিচেয়ার এল। ডাক্তার চলে গেলে আরাম করে বসলেন ব্রাউন। হঠাৎ মনে হল তার আচরণ আদৌ স্বাভাবিক নয়। এই ছেলেটি নিরাময়ে এসেছে নিশ্চয়ই বেশ কয়েক মাস। তাঁর বাড়ি থেকে নিরাময় আদৌ দূরে নয়। অথচ এতদিন তিনি ওকে লক্ষ করেননি। হঠাৎ আলাপ, একটু ভাল লাগা আর তারপর এই স্বপ্ন দেখা, এক লহমায় তাঁর দেখার চোখ পাল্টে দিল ! মাথা নাড়লেন ব্রাউন। যখন হয় তখন কি এভাবেই হয় ? সারাজীবন যে যিশুকে ডাকল না হঠাৎ একটি সাধারণ ঘটনা তাকে এমন পাল্টে দিল যে সে চার্চের কাজে মনপ্রাণ দিয়ে দিল।

ব্রাউন যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে সায়নের শরীরের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে, মুখ চোখ নয়। অতএব তিনি উঠলেন। গলা পর্যন্ত কম্বল টানা রয়েছে। ঘুমোচ্ছে ছেলেটা। ব্রাউন বললেন *ফিসফিস করে, 'তুমি ভাল হয়ে যাবে মাই বয়। যিশু তোমার সঙ্গে আছেন।'* এত নিচুস্বরে *কথাগুলো বললেন যে নিজের কানেই ভাল করে শুনতে পেলেন না।* ঠিক তখনই ধীরে ধীরে চোখ মেলল সায়ন। ব্রাউনের মনে হল, যেই তিনি বললেন আলো জ্বলুক সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল আলো।

সায়ন মুখ ফেরাল। তার মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটল, 'মিস্টার ব্রাউন !'

'ইয়েস মাই বয়। কথা বোলো না।'

'আপনি ভাল আছেন মিস্টার ব্রাউন ?'

চমকে উঠলেন ব্রাউন। এ কীরকম প্রশ্ন ? যে মানুষের জীবনীশক্তি একটু একটু করে কমে আসার কথা সে অন্যের কুশল জিজ্ঞাসা করছে ! ব্রাউন মাথা নাড়লেন, 'ইয়েস মাই বয়, আমি ভাল

আছি। তোমার এখন ঘুমোনো উচিত।'

'আমি তো ঘুমোচ্ছি, এখন কটা বাজে ?'

'রাত হয়েছে।'

'আপনি কেন এখনও জেগে আছেন ?' চোখ বন্ধ করল সায়ন।

আপনি কেন জেগে আছেন ! আমি কেন জেগে আছি ? আপন মনে প্রশ্নটি উচ্চারণ করলেন তিনি। সায়ন আবার ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ কী হল, ব্রাউন নিজেকে সামলাতে পারলেন না। গলা থেকে রুপোর চেনে লাগানো ক্রশটা খুলে অতি সন্তর্পণে সায়নের মাথায় ছুঁইয়ে দিয়ে বুকের ওপর রেখে দিলেন। এখন মাথা গলিয়ে পরাতে গেলে ছেলেটার ঘুম ভেঙে যাবে।

হঠাৎ তাঁর মনে হল, আর কোনও ভয় নেই। দীর্ঘকাল পরে সন্তান বাড়ি ফিরে এলে যেমন তার সম্পর্কে সব ভাবনা দূর হয়ে যায় তেমনি ওই হার সায়নের গলায় পরিয়ে দিয়ে অদ্ভুত রকমের নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন তিনি। যেন আর কোনও সমস্যা নেই। ব্রাউন হেলতে দুলতে বেরুতেই বড়বাহাদুর তাকে সেলাম করল। ব্রাউন তার হাত ধরে বললেন, 'যিশু তোমার মঙ্গল করবেন।'

কথাটা ব্রাউন খুব বলেন কিন্তু এই মুহূর্তে বড়বাহাদুর ওটা আশা করেনি। সে কিছু বলার আগেই ঠাণ্ডায় একটা সোয়েটার পরা ব্রাউন প্যাসেজ পেরিয়ে গেট খুলে রাস্তায় নামতেই অন্ধকারে কুঁই কুঁই শব্দ শুনতে পেলেন। ব্রাউন দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'ভুটো ! ভুটো নাকি ?' সঙ্গে সঙ্গে গায়ে রোমশ স্পর্শ পেয়ে তিনি হেসে ফেললেন। কুকুরটা এবার সামনে হাঁটছে বুঝতে পেরে বললেন, 'তুই আমাকে জব্দ করলি ভুটো, কী করে ভালবাসতে হয়, ভালাবাসা কাকে বলে তা তুই আমাকে শিখিয়ে দিলি। মনে হয়, যিশু তোকে আমার চেয়ে বেশি পছন্দ করেন।'

পাহাড়ে উত্তাপ ছড়াচ্ছিল।

ঘিসিং সাহেব কলকাতায় গিয়েছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে তাঁর আলোচনায় কোনও ফল পাওয়া গেল না। ঘিসিং স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, তিনি দিল্লির সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন। এই ইস্যু নিয়ে পাহাড় উত্তাল। আচমকা ধর্মঘট ডাকা হল। সমতলের কোনও গাড়ি ওপরে উঠবে না, ওপর থেকে নামবে না। মিছিল বেরিয়ে পড়ল পাহাড়ি পথগুলোতে। আজ সকালে সেইরকম মিছিল উঠে আসছিল নিরাময়ের সামনে দিয়ে। গোটা ষাটেক মানুষ জ্যোতিবাবুর মুণ্ডুপাত করতে করতে হাত ছুড়ছিল আকাশে।

সকালে সায়নকে তার ঘরে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন ডক্টর। এখন দু-তিন দিন তার বাইরে যাওয়া চলবে না। ঘরের মধ্যেই হাঁটাচলা করতে পারবে। মিছিলের চিৎকার শুনে সে জানলার কাছে গেল। এখন জানলাও খোলা যাবে না। চট করে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। সে দেখতে পেল প্রতিটি মানুষ দৃঢ় গলায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বাঙালি শোষক দূর হটো। চোখ কপালে উঠল সায়নের। বাঙালি যে শোষক শ্রেণীর মধ্যে পড়ে তা আজকের আগে তার জানা ছিল না।

মিছিলটা চলে যাওয়ার পর সে চিঠি লিখতে বসল। প্রথম চিঠি মাকে। 'তোমার চিঠি গতকাল পেয়ে গেছি। পেয়ে গেছি লিখলাম এই কারণে যে এই চিঠির জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি। আমার জন্যে তুমি একটুও চিন্তা করবে না। আমি খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠছি। গতকাল একটু রক্ত পড়েছিল কিন্তু খুব দ্রুত ঠিক হয়ে গেছে। কাল খুব মজা হয়েছে। কেউ একজন আমার গলায় ক্রশ লাগানো রুপোর চেন পরিয়ে দিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে মিস্টার ব্রাউন এসেছিলেন। তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই কি সবাই আমায় ভালবাসে ? আমি একটু ভাল হলেই তোমার কাছে চলে যাব। অবশ্য তার আগে তুমি যদি আমার কাছে আসো তা হলে দুজনে মিলে কুয়াশা, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখব, পাহাড়ি পথে হাঁটব ? আসবে মা ? বাপিকে আমার ভালবাসা দিও। আর তুমি ? তুমি আমাকে নাও। সায়ন।'

হঠাৎ সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা আবেগের ঢেউ পাক খাওয়া শুরু করতেই সায়ন সোজা হয়ে দাঁড়াল। না। কিছুতেই না। ডাক্তার আঙ্কল বারংবার বলেছেন, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না। সে আবার চেয়ারে বসে চিঠির শেষে লিখল,

'পুনশ্চ। মা গো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ? আমার রুমমেট নির্মাল্যকে ওর বাবা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন চিকিৎসার খরচ চালাতে পারবেন না বলে। তোমাদের এমনই কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো ?'

এটুকু নতুন করে লিখে সায়ন আবিষ্কার করল সেই আবেগটা আর শরীরে নেই। চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরল সে। এই খাম মা তাকে কিনে দিয়েছিলেন। হঠাৎ তার চোখের সামনে পুরো রায় বাড়িটা ভেসে উঠল। ওই বিশাল বাড়ির এর সঙ্গে ওর তেমন কোনও সুসম্পর্ক নেই। কিন্তু খুব ছেলেবেলা থেকে সায়ন সবার অন্দরে চলে যেত। হঠাৎ টুপুরের মুখ ধরা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে কাগজ নিয়ে লিখতে বসল।

'দুষ্টু টুপুর। না, হল না, মিষ্টি টুপুর। ধ্যাত তার চেয়ে বলি স্নেহের টুপুর। দ্যাখ না, এবার আমাকে তোর গুরুজন বলে মনে হচ্ছে কি না। এখানে আসার পর তোকে কোনও চিঠি দিইনি। আসার আগে তোকে বলেছিলাম অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বুড়ো আংলা, ক্ষীরের পুতুল পড়ে ফেলবি। লীলা মজুমদারের পদি পিসির বর্মি বাক্স, সুকুমার রায়ের বইটা যেন মুখস্থ হয়ে যায়। নিশ্চয়ই কিস্যু করিসনি। তবে যখের ধন হাতে পেলে না শেষ করে ছাড়বি না, তা জানি। যদি ওই বইগুলো পড়া হয়ে থাকে তা হলে তোকে, দুটো বই পড়ার অনুমতি দিচ্ছি। একটা হল বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' অন্যটা নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'কালো ভ্রমর'। প্রথমটা বুঝবি বলে মনে হয় না। আর দ্বিতীয়টা যদি কোনও মতে বুঝে ফেলিস তা হলে মুখপুড়ি পথের পাঁচালি পড়িস। আম আঁটির ভেঁপু নয়।

আমি যেখানে আছি তার সামনে সারাদিন কুয়াশা খেলা করে। এখানে কখনও গরম পড়ে না, ঘাম হয় না। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হ্যাঁ রে টুপুর, তুই বড় হয়ে কী হবি জিজ্ঞাসা করাতে একদিন বলেছিলি মানুষ হবি। রায়বাড়িতে যারা মেয়ে হয়ে জন্মায় তারা তো মেয়েমানুষ হয়ে মরে যায়। তোর উত্তর শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। খোঁজ নিয়ে দ্যাখ, আমাদের বাড়ির অত জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে কোনও মেয়ে গ্রাজুয়েট নয়। যে সব বউ এসেছে অন্য বাড়ি থেকে তারাও কলেজে ঢোকেনি। তবু হেনা কাকিমাকে আমার খুব ভাল লাগে, উর্মিলা কাকিমাকেও। তুই যদি সত্যি মানুষ হতে চাস তা হলে এদের সঙ্গে মিশিস। রায়বাড়ির প্রথম গ্রাজুয়েট মেয়ে শুধু নয়, প্রথম মেয়ে যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে এমন ভূমিকায় তোকে দেখতে চাই আমি। আর ধর, আমার যে অসুখ হয়েছে, তা যদি বাড়াবাড়ি রকমের খারাপ হয়ে যায় তা হলে তো আমি তুই কী করলি তা দেখার জন্যে থাকব না, তখন নিজের কাছে কৈফিয়ত দিস, কী করলি ? তুই যদি এখানে আসতিস তা হলে বেশ মজা হত। আসতে না পারিস চিঠি লিখতে তো পারিস। খাম যদি না পাস আমার মায়ের কাছে চিঠি লিখে পৌঁছে দিস, আমি পেয়ে যাব। স্নেহ ভালবাসা তোর জন্যেই, সানুদাদা।'

মিছিলটা উঠে আসছিল স্লোগান দিতে দিতে। সেই সঙ্গে ভুটোর চিৎকার চড়ছে সমানে। ব্রাউন তাকে বকলেন খুব। ভুটো থামতে তিনি দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। 'পাহাড় পাহাড়িদের জন্য। সমতলের মানুষ দূর হটো। জ্যোতিবাবু মুর্দাবাদ। গোর্খাল্যান্ড হবেই হবে।'

এদের অনেককেই ব্রাউন চেনেন না। নিশ্চয়ই বাইরে থেকে এসেছে। হঠাৎ তাঁর চোখ ছোট হল পদমকুমার না ! আকাশের দিকে মুঠো ছুড়ে রাগত ভঙ্গিতে স্লোগান দিচ্ছে। পদমকুমার যখন সামনে এল তখন ইশারায় কাছে ডাকলেন ব্রাউন। মুখচোখে বিরক্তি ফুটে উঠলেও ছেলেটা সরে এল মিছিল থেকে। শেষ লোকটি ওপরে চলে যাওয়ার পর ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল রক্ত দিয়ে আজ এত হাঁটাহাঁটি করছ কেন ?'

পদমকুমার বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'ওইটুকু রক্ত শরীর থেকে বের হলে কোনও অসুবিধে হয় না। আমি ভাল আছি।'

'তুমি রাজনীতি কর ?'

'না তো। পার্টির একজন বলেছে মিছিল-টিছিল করলে ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করে দিতে পারে।' পদমকুমার হাসল, 'আর এসব কথা তো ঠিক।'

'কী সব কথা ?'

'পাহাড় পাহাড়িদের জন্যে। বাজারে যাও, বেশির ভাগ দোকানদার মাড়োয়ারি, বাঙালিও আছে। এখান থেকে টাকা কামিয়ে দেশে পাঠাচ্ছে। ঠিক কি না !'

ব্রাউন বললেন, 'ঠিক। কিন্তু দোকানদারগুলো যদি না থাকত তা হলে আমরা জিনিসপত্র পেতাম কী করে ? নেপালিদের মধ্যে কেউ তো ওইরকম দোকান করতে এগিয়ে আসেনি। ঠিক কি না ?

'কেউ না কেউ তখন দোকান দিত। আমাদের মধ্যে অনেকের তো টাকা আছে।'

'টাকা থাকা এক কথা আর ব্যবসা করা অন্য কথা।'

পদমকুমারের এ সব কথা ভাল লাগছিল না। সে বললেন, 'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

ব্রাউন বলল, 'তুমি তোমার রক্ত দিয়ে কাল একটা জীবন বাঁচিয়েছ বলে আমি তোমার জন্যে যিশুর কাছে প্রার্থনা করেছি। তিনি নিশ্চয়ই তোমার আশা পূর্ণ করবেন।'

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল, অথবা ব্রাউনের কথায় একটু নাড়া খেল পদমকুমার। জিজ্ঞাসা করল, 'ওই ছেলেটা এখন কী রকম আছে ?'

'কাল মাঝরাতে দেখে এসেছি ও ভাল হয়ে উঠছে।' ব্রাউন বললেন 'আচ্ছা, ও তো পাহাড়ি নয়। তা হলে এই জায়গা থেকে ওর চলে যাওয়া উচিত, তাই না !'

পদমকুমার ব্রাউনের মুখের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল।

ব্রাউন বললেন, 'আবার তোমার রক্ত ওর শরীরে যাওয়ার পর ওকে পাহাড়ি নয় বলে ভাবতেও পারছি না। আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে যে। রাত্রে যাকে রক্ত দিয়ে বাঁচালে দিনের বেলায় তাকেই তাড়িয়ে দিতে চাইছ।' ব্রাউন তাঁর বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। পদমকুমার কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের ভূমিকা নিয়ে এবার যেন সে দ্বিধায় পড়েছে। এই সময় নীচ থেকে সশব্দে একটা মোটরবাইক উঠে এল ওপরে। পদমকুমারকে দেখে আরোহী ব্রেক কষে জিজ্ঞাসা করল, 'মিছিল কতক্ষণ আগে ওপরে গিয়েছে ?'

'এই তো একটু আগে।'

'তুমি মিছিলে যাওনি কেন ?'

'যাচ্ছিলাম।'

'পেছনে উঠে বসো। কী নাম তোমার ?'

'পদমকুমার।'

বাইক চালু করে আরোহী জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখানে থাকো ?'

'জি।'

'ওখানে ওই যে নার্সিংহোম আছে, ওখানকার একটা ছেলে বাঙালিদের গান শিখিয়ে আমাদের বাচ্চাদের ব্রেন ওয়াশ করতে চাইছে। ছেলেটাকে জানো ?'

'জি।'

'বাঃ, ভাল হল। ওকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

'কেন ?'

'কেন মানে ? আমি কী বললাম তুমি বুঝতে পারছ না ?'

'কিন্তু ও খুব অসুস্থ।'

'অসুস্থ তো গান শেখাচ্ছে কী করে ?'

'কাল রাত্রে ওর প্রাণ বাঁচাতে রক্ত দিতে হয়েছে।'

'তোমাকে কে বলল ?'

'আমিই তো আমার রক্ত ওকে দিয়েছি।'

আচমকা ব্রেক কষল আরোহী। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'নেমে যাও।'

পদমকুমার খুব ঘাবড়ে গিয়ে মাটিতে পা রাখতেই বাইকটা ওপরে উঠে গেল। এবার ওর মনে হল, কথাটা বলে সে খুব ভুল করেছে। এই লোকটা নিশ্চয়ই পার্টির ওপর তলার কেউ হবে। এ যদি আপত্তি করে তাহলে কখনওই তার ড্রাইভিং লাইসেন্স বের হবে না। পদমকুমার দৌড়োতে

লাগল। যেমন করেই হোক মিছিলের প্রথমে গিয়ে তাকে স্লোগান দিতে হবে। তাকে স্লোগান দিতে দেখলে হয়তো লোকটা একটু নরম হতে পারে।

নিরাময়ে এখন যে কজন চিকিৎসার জন্য এসেছে তাদের অবস্থা মোটামুটি ভাল। আর একটু ভাল হলেই এদের ইচ্ছে হয় বাড়ি ফিরে যেতে। সেই অবস্থায় বেশ অসহায় বোধ করেন ডাক্তার। আজ রাউন্ডে বের হয়ে প্রতিটি ঘরে ঢুকে গল্প করার সময় তিনি সায়নের ঘটনাটা বলবেন। যে ছেলেটা কাল বিকেলেও স্বাভাবিক ছিল রাত্রে তার শরীরের অবস্থা আচমকা কী রকম বদলে গিয়েছিল। ওই পরিস্থিতিতে বাড়িতে থাকলে হযতো চরম বিপদ হয়ে যেতে পারত। একটি কিশোর, যে খুব ভাল গান যায়, জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আমাদের সারাজীবন এখানেই থাকতে হবে ?'

এই প্রশ্নের কোনও জবাব ডাক্তারের জানা নেই। যতদিন সম্ভব অসুখের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে জীবনটাকে বাঁচিযে রাখা যায় ততদিনই লাভ, অবস্থাটা যখন এই পর্যায়ে আছে তখন কোনও ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সম্ভব নয়।

তবু ডাক্তার বললেন, 'না, সারাজীবন থাকতে হবে কেন ? তোমাদের মধ্যে যাদের অবস্থা ভাল তারা মাঝে মাঝে এক-দু মাসের জন্যে বাড়ি ঘুরে আসতে পার।'

ছেলেটি বলল, 'এক-দু মাস ? চিরদিন নয় ?'

'প্রথমে এক-দু মাস থেকে দ্যাখো, তারপর ধীরে ধীরে সময়টা বাড়ানো যাবে।' ডাক্তার নিজেও জানেন ওগুলো কথার কথা। তাঁর চোখের সামনে নিয়ম মেনে থাকলে তিনি রোগটাকে মাথা তুলতে দেবেন না। কিন্তু তাঁকে ভীষণ রকম দুশ্চিন্তায ফেলেছে সায়ন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঘুষ খেয়ে ধরা পড়েছেন বলে ওর আবার রক্তপাত হল ! মনের ওপর চাপ পড়লে শরীরে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যক্তিগত কোনও কারণ নয়, দেশের একটি ঘটনা ওকে যদি এভাবে নাড়া দেয় তাহলে দিনদিন সমস্যা বেড়ে যাবে।

ডাক্তার সায়নের ঘরে এলেন, 'কেমন আছ ?'

'ভাল।' সায়ন হাসল। তারপর চিঠিগুলো এগিয়ে দিল, 'পোস্ট করতে হবে।'

'মাকে লিখলে ?'

'হ্যাঁ।'

ডাক্তার ভেবেছিলেন সায়নের সঙ্গে কথা বলবেন ওর গতকালের অসুস্থতা নিয়ে। কিন্তু এখন মত পাল্টালেন। ঠিক তখনই বাইরে মোটরবাইকের আওয়াজ হল। বাইকটা এসে থামল নিরাময়ের গেটে।

৭

ছেলেটিকে ঢুকতে দেখে বড়বাহাদুর খুব অবাক হল। পাহাড়ে যারা রাজনীতি শুরু করেছিল তাদের সে জানে। সেইসব নেতাদের অনেকেই এখন বসে গেছেন। যারা এখনও ক্ষমতায় আছে তাদের চলাফেরা আগের মতো নেই। কিন্তু পরে যারা যোগ দিয়েছে তাদের চালচলন বড় বেশি উগ্র। কথাবার্তায় ভদ্রতা বেশ কম। এই ছেলেটিকে সে দেখেছে অনেকবার। সিনেমা স্টারের মতো হাঁটে, বাইক চালায়। বড়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই ?'

'ডক্টর কোথায় ?'

'ডাকদার সাহেব কাল সারারাত জেগে ছিলেন। এখন একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন।'

'ডাকো ওকে, কথা আছে।' ছেলেটা পা নাচাল।

'আপনি পরে আসলে ভাল হয়।'

'কোনটা ভাল তা আমি তোমার কাছে শিখব নাকি! আমাকে তুমি চেন না? যা বলছি তাই রো!' ছেলেটার গলা চড়ায় উঠল।

বড়বাহাদুর মাথা নাড়ল, 'আপনি পরে আসুন।'

ছেলেটা ভাবতেই পারেনি একজন নেপালি দারোয়ান তার সঙ্গে এই ব্যবহার করবে। সে চিৎকার রে শাসাতে লাগল, 'তোমাদের মতো দেশদ্রোহীদের জন্যে আমাদের এই অবস্থা। পাহাড়ের লোক য়ে তুমি বাঙালিবাবুর পা চাটছ। কিন্তু এই করে যদি ভাব পার পেয়ে যাবে তাহলে ভুল ভাবছ। ই এলাকা এখন আমার! ঝামেলা করলে লাশ ফেলে দেব আমি।'

বড়বাহাদুরও উত্তেজিত হয়ে পড়ল। সেইসময় ছোটবাহাদুর এসে তাকে সামলাবার চেষ্টা করল। ড়বাহাদুরকে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে নিতে চাইছিল সে। ঠিক তখনই ডাক্তার নেমে এলেন। দৃশ্যটা খে শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি? কী হয়েছে?'

ছেলেটা ঘুরে দাঁড়াল, পিচ্ করে থুতু ফেলল, 'এই লোকটাকে ছাড়িয়ে দিন।'

'আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি।' ডাক্তারের গলা গম্ভীর।

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম। এই লোকটা আমাকে অপমান করেছে, এ শালার এমন ম্মত যে আমাকে—।'

'এক মিনিট। তুমি তোমার বাবার বয়সী মানুষকে যে ভাষায় গালাগালি করছ তাতে তোমার সঙ্গে র ব্যাপারে কথা বলার প্রবৃত্তি আমার নেই। তুমি এখানে কী জন্যে এসেছ তা বলতে পারো।' াক্তার নিজেকে সংযত রাখছিলেন।

ছেলেটা মাথা নাচাল। স্থির চোখে একবার দেখল ডাক্তারকে। তারপর বলল, 'আপনার এই াসপাতালে কজন নেপালি পেশেন্ট আছে?'

'আমার কাছে পেশেন্ট হল একজন মানুষ। নেপালি বাঙালি বলে কিছু নেই।'

'ফালতু কথা। আপনি কোনও নেপালি পেশেন্টকে ভর্তি করেন না। গত রাতে তিনজন পশেন্ট এসেছিল আপনি ভর্তি না করে শহরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কথাটা ঠিক, না াথ্যে?'

'তুমি কে?'

ছোটবাহাদুর পরিচয়টা দিল। পার্বত্য জাতীয় পার্টির তরুণ তুর্কী নেতা। এই এলাকার দায়িত্ব ওর পর দেওয়া হয়েছে। ছেলেটা সেটা উপেক্ষা করে বলল, 'জবাব দিন।'

'আমার এখানে বিশেষ একটি অসুখে আক্রান্ত পেশেন্টদের চিকিৎসা করা হয়। অন্য অসুখের ান্যে হাসপাতাল রয়েছে। আর এটা হাসপাতাল নয়।'

'তাই নাকি! তাহলে বাইরে সেটা লিখে দেননি কেন?'

'তুমি মনে হচ্ছে নতুন এসেছ এখানে। তোমার নেতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলো। তাঁরা ামাকে এবং নিরাময়কে জানেন। ওঁরাই তোমাকে ঠিক খবর দেবেন।'

'আপনি আমাকে নেতা দেখাচ্ছেন!'

'তুমি গায়ে পড়ে ঝগড়া করছ। আর কিছু বলার আছে তোমার?'

'হ্যাঁ। আপনার এখানে থাকে একটা ছেলে পাহাড়ের বাচ্চাদের বিভ্রান্ত করছে!'

'বিভ্রান্ত করছে?'

'হ্যাঁ। তাদের ভুল গান শেখাচ্ছে। আপনারা এতদিন আমাদের দারোয়ান আর কুক বানিয়ে রখেছিলেন। ওই যে ওই লোকটা, ও কি নিজেকে মানুষ ভাবে? আপনারাই ভাবতে দেননি াতকাল। এখন পাহাড়ের মানুষ জেগে উঠেছে। তারা প্রতিবাদ করতে শিখেছে। এখন আপনি ওই ছেলেটাকে দিয়ে বাচ্চাদের ব্রেনওয়াশ করাচ্ছেন! কিন্তু এটা চলবে না। ছেলেটাকে ওর বাপ ায়ের কাছে পাঠিয়ে দিন।'

ডাক্তার হেসে ফেললেন, 'ছেলেটা কী গান শেখাচ্ছিল?'

'বাঙালিদের প্রশংসা করা গান। ও গান এখানে চলবে না।'

'তুমি কী করে ভাবলে বলা মাত্রই আমি ছেলেটাকে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব!'

'আপনাকে পাঠাতে হবে। একটু আগে শুনলাম, পাহাড়ি বাচ্চারা ওই গানের সুর গুনগুন করে গাইছে। এটা হতে দেব না।' ছেলেটি দৃঢ় গলায় বলল।

ডাক্তার এবার হাসলেন, 'বাঃ। একবার শুনেই তোমার গানের সুর মনে আছে! তাহলে সুরটা বেশ ভাল তাই না ? তোমার নাম কী হে ?'

ছেলেটা ছোটবাহাদুরের দিকে তাকাল, 'অ্যাই, আমার নাম জানা আছে ?'

ছোটবাহাদুর বলল, 'ওর নাম সামু।'

'আজকাল তোমাদের নামও কত বদলে যাচ্ছে। তা ভাই সামু, পাহাড়ে যখন প্রথম আগুন লেগেছিল তখনও কেউ আমাকে তাদের শত্রু বলে মনে করেনি। আমার এই নিরাময়ের কথা বোধহয় ঘিসিং সাহেবও জানেন। আমি যে পাহাড়ি মানুষদের শত্রু নই এটা নতুন করে কাউকে বলতে হয় না। মনে হচ্ছে তুমি ভুল বুঝেছ। এখন আমি খুব টায়ার্ড, পরে একদিন এসো, কথা বলব।'

ছেলেটি কিছু বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই মিস্টার ব্রাউনকে দেখা গেল গেট পেরিয়ে নিরাময়ে ঢুকতে। কাছে এসে মিস্টার ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি খুব চিন্তায় আছি ডাক্তার, সায়ন এখন কেমন আছে ?'

'অনেক ভাল মিস্টার ব্রাউন। তবে দুদিন ওকে ঘরেই রেস্ট নিতে হবে।'

'ওঃ। যিশু ওকে রক্ষা করুন। হঠাৎ কেন ব্লিডিং হল ?'

'একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার। মানসিক উত্তেজনা থেকে রক্তে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ওর মতো ভাবপ্রবণ ছেলের মানসিক উত্তেজনা সবসময় হতে পারে। আর তা হলে যদি রক্তপাত হয় তাহলে সামলানো মুশকিল হবে। সামু, তুমি যার সম্পর্কে অভিযোগ করতে এসেছিলে মিস্টার ব্রাউন তার সম্পর্কে কথা বলছেন !'

মিস্টার ব্রাউন অবাক হয়ে সামুকে দেখলেন, 'কী ব্যাপার! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সায়নের বিরুদ্ধে তুমি অভিযোগ করতে এসেছ ?'

সামু মিস্টার ব্রাউনকে জবাব না দিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই ছেলেটার ব্লিডিং হয়েছে ?'

'হ্যাঁ। ও যে অসুখে আক্রান্ত তাতে রক্ত বেশি তরল হয়ে গেলেই কান-নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে। সেই সময় ওদের টাটকা রক্ত দিতে হয়। তুমি শুনলে অবাক হবে কাল রাত্রে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে যে ছেলেটি সে একজন নেপালি। প্রয়োজনে আমাকে রক্ত দিয়ে সাহায্য করবে এমন অনেকেই এখানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তুমি নতুন এসেছ, এসব কথা তাই জানো না। মিস্টার ব্রাউন, সামুকে আপনি চেনেন ?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'দেখেছি। মোটরবাইকে করে যাওয়া আসা করে, তাই তো ?'

সামু মিস্টার ব্রাউনের দিকে তাকাল। এই বৃদ্ধ নেপালি ভদ্রলোকের উপস্থিতি সে যে পছন্দ করছে না তা তার চাহনিতে বোঝা গেল। কিন্তু আর কোনও কথা না বলে সে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই তার মোটরবাইকের আওয়াজ শোনা গেল।

মিস্টার ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না, ছেলেটি কী চায় ?'

ডাক্তার বললেন, 'অল্প বয়স, হাতে দায়িত্ব পেয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারছে না। সব সরষের মধ্যেই ভূত দেখছে। ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, এরকম উঠতি নেতা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।'

'নেতা! ছেলেটি এখানকার নেতা ?'

'হ্যাঁ। ওর ওপর দল এই এলাকার দায়িত্ব দিয়েছে।'

'তা দিক। কিন্তু সায়নের কোন অন্যায় ও খুঁজে বের করল ?'

'সায়ন বাচ্চাদের নিয়ে গান গায়। "ধনধান্যপুষ্পভরা" গানটা ওরা গাইছিল। বহুবছর আগে লেখা দেশাত্মবোধক গানটির সুর এবং কথা খুব সুন্দর। ছেলেটির আপত্তি ওই গান গাওয়া চলবে না, কারণ তাতে নেপালিদের কথা লেখা নেই। ও আমাকে বলল সায়নকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে কারণ ওর জন্যে এখানকার বাচ্চাদের ক্ষতি হচ্ছে।' ডাক্তার কথা বলতে বলতে কোনও রকমে হাই চাপলেন।

মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'ডক্টর, আপনার বিশ্রামের দরকার। আপনি যান, রেস্ট নিন।' তারপর তিনি গেটের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

আজকের দিনটা তেমন ঝকঝকে না হলেও বৃষ্টি নেই। আর নেই বলেই এরকম দিনে কাজ করতে আগ্রহ বাড়ে সবার। নিরাময়ের গেট থেকে বেরিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলেন মিস্টার ব্রাউন। অত্যন্ত বিরক্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। আজ তাঁর চলার ধরনও বদলে গিয়েছে। বেশ জোরেই হাঁটছিলেন তিনি। শেষ বাঁক ঘোরার সময় পেছন থেকে সিমির গলা শুনতে পেলেন মিস্টার ব্রাউন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেলেন টাইট প্যান্ট আর জ্যাকেট পরে সিমি দৌড়োতে দৌড়োতে নামছে। মিস্টার ব্রাউন একটু অপেক্ষা করতেই মেয়েটা পাশে চলে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওঃ, তুমি কানে এত কম শোন! তখন থেকে ডাকছি অথচ। এত জোরে হেঁটে কোথায় যাচ্ছ?'

মিস্টার ব্রাউন গম্ভীর গলায় বললেন, 'শহরে।'

'বাব্বা! এত জোরে হাঁটছ যে তোমাকে বুড়ো বলে মনেই হচ্ছিল না। ভালই হল, আমিও শহরে যাচ্ছি, গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।'

মিস্টার ব্রাউন চুপচাপ নীচের রাস্তায় নেমে এলেন। এই রাস্তাটা শিলিগুড়ি থেকে উঠে সোজা দার্জিলিং চলে গিয়েছে। এটাই একমাত্র পথ। সেই কবে ব্রিটিশরা পাহাড় কেটে যে পথ বানিয়েছিল তার কোনও পরিবর্তন নেই। পঞ্চাশ বছর আগে এই পথে সারা দিনে হয়তো পঞ্চাশটা গাড়ি ওপরে উঠত। এখন কয়েক হাজার যাওয়া-আসা করছে। অথচ রাস্তা চওড়া হয়নি, বিকল্প রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে না। একটা বড় পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে পড়লেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাজার গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। ভারত স্বাধীন হলেও কেউ এদিকে নজর দেয়নি। কংগ্রেস আমলে যা ছিল, বামফ্রন্টের আমলেও তাই রয়ে গিয়েছে। সুভাষ ঘিসিং ক্ষমতা পাওয়ার পর রাস্তাটার গর্ত কমেছে, কোথাও কোথাও সামান্য বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে মাত্র। কিন্তু এখনই যদি দ্বিতীয় রাস্তা তৈরি না হয় তাহলে বিপর্যয় আসতে বাধ্য। মিস্টার ব্রাউন হাঁটতে হাঁটতে এইসব ভাবছিলেন। দুপাশ দিয়ে গাড়ি যাওয়া আসা করছে। সেগুলোকে যেতে দেওয়ার জন্যে প্রায়ই সরে দাঁড়াতে হচ্ছিল। সেদিন ম্যাথুজদের বড় ভাই বলছিল, কলকাতার গঙ্গার ওপর দ্বিতীয় ব্রিজ তৈরি হয়ে গেছে। খুব সুন্দর করেছে নাকি। তৃতীয়টি বানাবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এসব শুনলে মনেই হবে পাহাড় উপেক্ষিত। ম্যাথুজ বলছিল, ওরা এখানে কয়েকদিনের জন্যে ভোগ করতে আসে কিন্তু আমাদের কাছে এখানে থাকা মানে জীবনযাপন করা। রাগ হওয়া অস্বাভাবিক কি!

না কিছুই অস্বাভাবিক নয়। এই যে পাহাড়ে আন্দোলনের পর ছোট মাপের ক্ষমতা পেয়েও পাহাড়িদের তেমন উপকার হল না, এটাও অস্বাভাবিক নয়। এরা বলছে পুরো ক্ষমতা চাই নইলে কোনও কাজ করা যাবে না, আর একদল বলছে পুরো ক্ষমতা দিলে সারা দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হবে।

'তোমার কী হয়েছে?' অনেকক্ষণ পরে সিমি প্রশ্নটা করল।

মিস্টার ব্রাউন মাথা নেড়ে নিঃশব্দে জানালেন তাঁর কিছু হয়নি।

'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। তুমি এতক্ষণ চুপচাপ থাকো না।'

এবার একটু সহজ হওয়ার চেষ্টা করলেন মিস্টার ব্রাউন, 'আমি যে বয়সে পৌঁছেছি সেই বয়সে মানুষের কিছুই হয় না। নৌকো কিংবা ভেলা পায়ের তলায় নেই, কাঠ আঁকড়ে ধরে স্রোতের টানে ভেসে চলার জীবন এখন। এই ডুবছি, এই ভাসছি, এখন কি আর কোনও কিছু হয়?'

'মোটেই না। তুমি তাহলে মদ খেতে আনন্দ পাও কেন? টিভি-র মেয়েগুলোকে দুচোখ দিয়ে গেলো কেন? ম্যাথুজের দোকান থেকে মাংস কিনে আরাম করে খাও কেন? কারণ ওসব তোমার ভাল লাগে। আর ভাল লাগলেই খারাপ লাগা থাকে। তোমার নিশ্চয়ই কোনও কিছু খুব খারাপ লেগেছে।' সিমি বলল।

মিস্টার ব্রাউন মুখ তুললেন। কিছু বলার আগেই তাঁর চোখে পড়ল বাড়িটার বারান্দায়, সিঁড়িতে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। বাড়ির ওপাশে সশব্দে পড়ছে ঝোরার জল। একটু বৃষ্টি হলেই ঝোরার শব্দ খুব বেড়ে যায়। তাঁর মনে পড়ল মিস্টার রায়ের কথা। বাড়িটা ওঁর। আশ্চর্য

ব্যাপার ! দিন দিন তাঁর হচ্ছে কী ! ফাদারের কাছে খবরটা শোনার পর ভেবেছিলেন ও-বাড়ি যাবেন কিন্তু ভাবনাটা কখন মাথা থেকে চলে গেল ? এ রকম তো তাঁর কখনও হয় না। পরিচি কোনও মানুষকে যিশু কাছে টেনে নিয়েছেন খবর পেলেই তাঁর মৃতদেহকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আস তিনি অভ্যস্ত। অবশ্য গন্তব্যস্থল যদি তাঁর পক্ষে দুর্গম বা দূরের না হয়। মিস্টার রায়ের বাড়ি আসতে তো তাঁর অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, অথচ বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন তিনি ! নিজের ও বেদম রাগ হচ্ছিল মিস্টার ব্রাউনের।

'ও কী ? তুমি ও বাড়িতে যাচ্ছ কেন ?' সিমি হাত ধরল।

'মিস্টার রায়ের বাড়িতে এত মানুষ কখনও দেখেছ ?'

'উনি মারা গিয়েছেন বলে সবাই এসেছে। আজ কবর দেওয়া হবে।'

'কোনও মানুষকে যখন যিশু আশ্রয় দেন তখন তার শরীরকে মাটির নীচে পৌঁছে দিতে সঙ্গী হ হয়।'

'কিন্তু তুমি যে বললে শহরে যাবে !'

'নিশ্চয়ই যাব। আজকাল আমার মাথা একটুও কাজ করে না। মিস্টার রায়ের কথা একদম ভু গিয়েছিলাম।'

'তুমি ওখানে গেলে শহরে যেতে পারবে না।'

'না। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি খোঁজখবর নিয়ে এসে বলছি।' মিস্টার ব্রাউন বাড়ির দি এগোলেন। সিমি দেখল বাড়িটার সামনে লোকগুলো খুব শোক শোক মুখ করে দাঁড়িয়ে নেই কেউ কেউ সিগারেট খাচ্ছে, হাসছে, গল্প করছে। এই তল্লাটে ওই একটাই বাড়ি, দুপাশে পাহাড় অ জঙ্গল। বাড়ির নীচ দিয়ে ট্রেন লাইন চলে গিয়েছে, রেল লাইন আর পিচের রাস্তায় গলাগলি রাস্তার এপাশে রেলিং-এর ওপারেই বিরাট খাদ, খাদের তলা থেকে ঢালু জমি নদী পেরিয়ে চা বাগা ঢুকে পড়েছে। বেশিরভাগ সময় ওইসব জায়গা কুয়াশায় ঢাকা থাকে। সিমি মুখ ঘুরিয়ে খা দিকে তাকাল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কান্না পেল। দুজনকে সে আজ পর্যন্ত আটটা চিঠি লিখে কিন্তু একটারও জবাব আসেনি। এই দুজনেই তাকে বলেছিল, 'তোমায় ছাড়া আমি বাঁচব না তখন বিশ্বাস হয়নি, দুজনের কাউকেই সে বিশ্বাস করেনি। দুজনেই বলত, 'আমাদের ম একজনকে তুমি বেছে নাও, যে তোমাকে পাবে না সে চুপচাপ সরে যাবে।' কিন্তু মুশকিল হয়েছি তার পক্ষে, কাউকেই সে বাছতে পারেনি। সে কখনও একজনের সঙ্গে সিনেমায় যায়নি, য গিয়েছে দুজনই সঙ্গে থেকেছে। সন্ধের মুখে পাহাড়ের কোণে একজনের সঙ্গে দেখা করেনি। অ সেটা করার জন্যে কত কাকুতি মিনতি ছিল। হ্যাঁ, আলাদা দেখা হয়েছে এই রাস্তায়, নিরাম সামনে। তারপর ওরা দুজনেই যখন বিদেশে চলে গেল তখন বলেছিল, 'যেতে ইচ্ছে করছে তোমাকে ছেড়ে। গিয়ে একটু গুছিয়ে নিয়েই তোমাকে চিঠি লিখব। তখন মন ঠিক করে চ এসো।' ওখানে পৌঁছেই দুজনে আলাদা করে চিঠি দিয়েছিল। দুটো ঠিকানা আলাদা। সেই প্র আর সেই শেষ। তারপর থেকে সে চিঠি দিয়ে চলেছে অথচ উত্তর নেই। না, এখনও সে মন ি করতে পারেনি। পারেনি বলেই ভেবে রেখেছে যে তাকে প্রথম চিঠি দেবে তাকেই সে ভবিষ্য সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করবে। অথচ কতদিন হয়ে গেল। এখন সবাই চাপ দিচ্ছে বিয়ের জন্যে বাড়ির লোকজন তো বটেই, শহরের আর এখানকার ছেলেগুলো দিনরাত ফুসুর ফুসুর প্রেমের ক বলছে। অথচ সে মাথা ঠিক রেখে অপেক্ষাই করে যাচ্ছে। সে খোঁজ নিয়ে দেখেছে শুধু তাকে ন ওরা নিজের বাপ-মাকেও চিঠি লেখে না। হ্যাঁ, এইটে তাকে বেশ স্বস্তি দিয়েছে। মনে হয়েছে, চি না দেওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। দু চোখ উপচে জল গড়িয়ে এল গালে। খা তলা থেকে কুয়াশারা দল বেঁধে ওপরে উঠে আসতে লাগল। বুকের ভেতরটা টনটন করতে লা তার। যদি টাকা থাকত, কেউ যদি তাকে অন্তত প্লেন ভাড়ার টাকাটা দিত তাহলে তিন দিনের জ গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসত, এখনও তার জন্যে ওদের ইচ্ছে আছে কিনা ! এইসময় হর্ন বাজ পেছনে। ঝটপট চোখের জল মুছে উদাস চোখে সে তাকাতেই দেখতে পেল সোনাদার ট্যা ড্রাইভার প্রাণকুমার ট্যাক্সিতে বসে হাসছে, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? শহরে ?'

সিমি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।
'উঠে এসো। আমিও শহরে যাচ্ছি। তোমাকে আর হাঁটতে হবে না।'
সিমি মাথা নাড়ল, 'না। তুমি চলে যাও।'
'কেন ? আমি কি খারাপ লোক ?' প্রাণকুমার জিজ্ঞাসা করল।
'আমার সঙ্গে লোক আছেন।'
'লোক !' প্রাণকুমার চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে হাসল, 'কথাটা কি ঠিক হল ?'
'উনি ওই বাড়িতে গিয়েছেন !'
'ও। তা আমার গাড়ি তো খালিই যাচ্ছে। তোমরা দুজনেই যেতে পারো।'
'উনি কখন আসবেন আমি জানি না। তোমার দেরি হয়ে যাবে।'
প্রাণকুমার কথা না বলে গাড়ি থেকে নেমে রেলিং-এর কাছে চলে এসে বলল, 'তুমি একটু রোগা হয়ে গিয়েছ !'
সিমির খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রাণকুমার তার সঙ্গে দেখা হলেই কথা বলে কিন্তু যারা তাকে প্রেম নিবেদন করে তাদের দলে ওকে ফেলা যাবে না। কিন্তু মুখে প্রেমের কথা না বললেও ব্যবহারে ও ওইরকম একটা কিছু বোঝায়। সেটা বুঝেও কিছু বলা যায় না। প্রাণকুমারের কথার জবাব না দিয়ে সিমি আবার খাদের দিকে তাকাল। নীচের কুয়াশারা এখন অনেক ওপরে উঠে এসেছে।
'তুমি এখন কোনও কাজ করছ ?'
'না।'
'কাজ করার ইচ্ছে আছে ?'
সিমি তাকাল। প্রাণকুমার বলল, 'শহরে একটা গার্লস হোস্টেল খুলছি আমরা। বাড়ি নেওয়া হয়ে গিয়েছে। মোট ছটা ঘর। এখানকার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে কলকাতা দিল্লির বাচ্চাগুলো ভর্তি হয়। অনেকেই হোস্টেল পায় না। কিছুদিন কষ্ট করে আবার পালিয়ে যায়। ভাল হোস্টেলের খুব ডিম্যান্ড এখানে।'
'গার্লস হোস্টেল ?'
'হ্যাঁ। তবে জুনিয়ার গার্লস। সিনিয়ার মেয়েদের সামলানো খুব ঝামেলার ব্যাপার।' প্রাণকুমার হাসল। সহজ হাসি।
'তুমি ড্রাইভারি ছেড়ে দিয়ে হোস্টেল চালাবে ?'
'না। আমাদের এক বুড়ো মামা আছে। সে বাজারহাট করবে। কিন্তু বাচ্চাদের দেখাশোনা, পড়ানোর ব্যবস্থা, আর সব কাজের জন্যে একজন মহিলা দরকার। তুমি যদি কাজটা কর তাহলে দাদাদের বলে দেখতে পারি।' প্রাণকুমার বলল।
এতক্ষণ নিজেকে নির্লিপ্ত রাখার চেষ্টা করছিল সিমি। কিন্তু এরকম একটা প্রস্তাব শুনে মনে হল কাজটা পেলে তার খুব উপকার হয়। শুধু টাকা নয়, সময় কেটে যাবে তার। তবু, এত লোক থাকতে তাকে কেন প্রস্তাব দিচ্ছে প্রাণকুমার !
সে হাসল। 'এইভাবে দেখা না হলে তুমি কি আমাকে প্রস্তাব দিতে ?'
'না। দিতাম না। সত্যি বলতে কি, দাদা চেয়েছিল কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাচ্চাদের ব্যাপারে ট্রেনিং আছে এমন কাউকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে। কিন্তু তারা যে টাকা চাইবে সেটার কথাও ভাবতে হচ্ছিল। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে অন্য কাউকে বলতাম। শোনো, আমরা খাওয়া থাকা ছাড়া মাসে দেড় হাজারের বেশি এখন দেব না।'
'থাকা মানে ?'
'বাঃ। অতগুলো বাচ্চা ওখানে কার ভরসায় থাকবে !'
'তার মানে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হবে ?'
'প্রায় তাই। তবে ওরা স্কুলে গেলে তুমি ছুটি পাবে।'
'শনিবার রবিবার নেই ?'
'না। কিন্তু বছরে বেশ কয়েকমাস টানা ছুটি পাচ্ছ ওদের স্কুল বন্ধ থাকলে। সেটা কোনও

চাকরিতে পাবে না।'

ঠিক ওই সময় সিমি মিস্টার ব্রাউনকে দেখল রাস্তা পার হচ্ছেন। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রাণকুমার তাকাল। মিস্টার ব্রাউন কাছে এসে বললেন, 'ওরা এখনও অপেক্ষা করবে। চলো, আমরা শহর থেকে ঘুরে আসি।'

প্রাণকুমার বলল, 'নমস্কার। আমার নাম প্রাণকুমার। সিমিকে আমি চিনি। আমিও শহরে যাচ্ছি, আপনারা আমার গাড়িতে যেতে পারেন।'

মিস্টার ব্রাউন সিমির দিকে তাকালেন। সিমি কোনও কথা বলল না।

মিস্টার ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হে ? আমরা কি গাড়িতে যাব ?'

সিমি একটু দ্বিধা নিয়ে গাড়ির দিকে এগোল।

সিমি পেছনে বসল, মিস্টার ব্রাউন প্রাণকুমারের পাশে। মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'শহরে যেতে এখনও কষ্ট হয় না। ঢালু রাস্তায় প্রায় গড়িয়েই চলে যাই। কষ্ট হয় ফেরার সময়। পা যেন আর শরীরের ওজন টানতে পারে না।'

'আপনারা কখন ফিরবেন ?'

পেছন থেকে সিমি বলল, 'দেরি হবে।'

গাড়ি যাচ্ছিল গড়িয়ে গড়িয়ে। মাঝে মাঝেই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিচ্ছিল প্রাণকুমার। বাঁক ঘুরতে ঘুরতে একসময় শহর এসে গেল। এখনও ডান দিকে খাদ বাঁ দিকে ঘরবাড়ি। খাদের শেষে চা বাগানের দিকে পথ নেমে গেছে। হঠাৎ গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্রাণকুমার আঙুল তুলে দেখাল, 'ওই বাড়িটা।'

বাঁ দিকের পাহাড়ের দুটো ধাপ নিয়ে যে বাড়িটা দাঁড়িয়ে তাতে মিস্ত্রিরা কাজ করছে। মিস্টার ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা মিস্টার লামার বাড়ি না ?'

'ছিল। আমরা কিনে নিয়েছি। এই বাড়িতেই হোস্টেল করব।'

'হোস্টেল !'

'হ্যাঁ। বাচ্চা মেয়েদের জন্যে।'

'তুমি কোথায় থাকো ?'

'সোনাদায়।'

'ওখান থেকে এসে হোস্টেল দেখাশোনা করবে ?'

'না-না। লোকজন থাকবে। ওদের কেয়ারটেকার হওয়ার চাকরিটা সিমিকে অফার করেছি। ও না হ্যাঁ কিছুই বলছে না।' প্রাণকুমার হাসল।

'তাই নাকি !' মিস্টার ব্রাউন খুশি হলেন, 'এ তো খুব ভাল খবর। সিমিকে খুব মানাবে। কবে থেকে শুরু করছ ?'

'মাসখানেকের মধ্যেই।'

'তা এখন বোর্ডার পাবে ?'

'পাব। স্কুলগুলোতে নোটিস টাঙিয়ে দিয়েছি। তা ছাড়া বাজারের ভার্মার দোকানে বলেছি। ওর দোকানে তো সব গার্জেনরা আসে বাচ্চাদের জিনিসপত্র কিনতে। ও বলেছে এখনই বারোটা স্টুডেন্ট দেবে।'

'বাঃ। তা সিমি মাইনে পাবে কত ?'

'এখন পনেরোশো। প্লাস খাওয়া থাকা।'

'গ্র্যান্ড ব্যাপার। একটু আগে আমার মন খুব খারাপ ছিল, এই খবর শোনার পর এখন বেশ ভাল লাগছে।'

সিমি বলল, 'আমরা তাহলে এখানে নেমে যাই ?'

'না-না। চলো বাজারের সামনে পৌঁছে দিয়ে আসছি।' প্রাণকুমার গাড়ি চালু করল। বাজারের হই হল্লা, বাসস্ট্যান্ডের ভিড় কাটিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, 'আমি ওই বাড়িতে কিছুক্ষণ থাকব। ফেরার সময় যদি আমার গাড়ি দেখতে পান তাহলে আপনাকে কষ্ট করতে হবে

" '

মিস্টার ব্রাউন মাথা নেড়ে গাড়ি থেকে নামলেন। সিমি দরজা খুলতেই প্রাণকুমার বলল, 'আমি আবার পরশুদিন এই সময়ে ওই বাড়িতে আসব। তোমার সিদ্ধান্তটা সেদিনই জানাতে হবে নইলে অন্য লোক খুঁজতে দেরি হয়ে যাবে।'

সামান্য মাথা নেড়ে সিমি মিস্টার ব্রাউনের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। একটু এগিয়ে গিয়ে মিস্টার ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলো, 'কী ব্যাপার! ছেলেটা কি খারাপ?'

'না তো!' সিমি জবাব দিল।

'তাহলে তোমার মতো চুলবুলে মেয়ে এমন বোবা হয়ে যাবে কেন?'

সিমি হাসল। মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'এমন ভাল চাকরি পাওয়া খুব ভাগ্যের ব্যাপার।'

'দেখি। ভাবছি।'

'ভাববার কী আছে?'

'এত লোক থাকতে আমাকে ও চাকরি দিচ্ছে কেন? আমার তো কোনও অভিজ্ঞতা নেই। হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে যেতেই চাকরি দিতে চাইল!'

'সব কাজ তো মানুষ ভেবেচিন্তে করে না। হয়তো তোমাকে ওর ভাল লাগে।'

'আমি তো ওইটাই চাই না।'

'বাঃ। কারও তোমাকে ভাল লাগা মানে এই নয় যে তাকেও তোমার ভাল লাগতে হবে। ঠিক আছে, কোথায় যাবে তুমি?'

'কাজ আছে।'

'আমি পার্টির অফিসে যাচ্ছি। ঠিক একঘণ্টা পরে এখানে চলে এসো। ওই ভার্মার দোকানের সামনে যে আগে আসবে অপেক্ষা করবে।' কথাগুলো বলে মিস্টার ব্রাউন চলে গেলেন। সিমি দাঁড়িয়ে থাকল একটু। তারপর উল্টোদিকে পা বাড়াতেই একটা মোটর সাইকেল একেবারে খাদের পাশে চলে এসে বলল, 'হাই!'

সিমি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

'সে কী! ভগবান তোমাকে বলেনি আমি কী চাই?'

'সরে যাও। নইলে এমন মার খাওয়াব যে আর বাইক চালাতে হবে না।'

'চালাব না। অনেকেই তো চালায় না।' ছেলেটা হাসল।

সিমি একটু পিছিয়ে রাস্তা পার হল হনহনিয়ে। তার মেজাজ একদম খিঁচড়ে গিয়েছিল। এদের বাড় দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। মুশকিল হল, এরা কোনও অশ্লীল শব্দ বলে না, গায়ে হাত দেয় না। তা করলে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেত। নালিশ করলে বলবে আমি কিছুই করিনি। এখানকার মহিলা সমিতি খুব শক্তিশালী। কিছু না করলে তারা ব্যবস্থা নেবে কী করে!

সরু সিঁড়ি দিয়ে ওপরের রাস্তায় চলে এল সিমি। সামনেই পোস্ট অফিস। চিঠির সন্ধানে প্রায়ই যেতে যেতে এখন বেশ সঙ্কোচ হয় তার। ওরা নিশ্চয়ই তাকে খুব ফালতু ভাবে। এতদিন ধরে মেয়েটা চিঠি চিঠি করে হেদিয়ে মরছে অথচ যার চিঠি আসার কথা সে একটা শব্দও লিখছে না। এখন তাই পিওনদের ঘরে যায় না। টেলিফোনের কাউন্টারে গিয়ে লাইন দেয়। যতক্ষণ সুযোগ না আসে লক্ষ করে চেনা পিওনকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা। যদি সামনে কেউ না থাকে রিসিভার তুলে দার্জিলিং-এ সুভাষ ঘিসিং-এর নাম্বার ঘোরায়। এই নাম্বার সবসময় এনগেজড থাকে বলে ভরসা। অপেক্ষা করার ভান করে পরের লোককে লাইন ছেড়ে দেয়। আজ এসব করতে হল না। পোস্ট অফিসের সামনেই পিওনের সঙ্গে দেখা। লোকটা একগাল হেসে বলল, 'না, আজও আপনার চিঠি আসেনি।'

সিমি কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলল, 'আমি চিঠির জন্যে আসিনি।'

লোকটা একটু চুপসে গিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। বড় বড় পা ফেলে পোস্ট অফিসে ঢুকে পড়ল সিমি। তারপরই শরীর কেমন অসাড় হয়ে গেল। আজ আর ফোন করার দরকার নেই।

'সিমি!'

ডাক শুনে পেছন ফিরতেই সে মিসেস অ্যান্টনিকে দেখতে পেল। সাদা শাড়ি সাদা জামা, হাতে ব্যাগ নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। সে এগিয়ে যেতে মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'কাল কুমারের চিঠি এসেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল সিমি। চোখের সামনে কুমারের ঝকঝকে মুখটা ভেসে উঠল। কুমারের একটা গজদাঁত আছে। ও বলত, আমেরিকায় গিয়ে অপারেশন করিয়ে দাঁতটাকে ঠিক করে নেবে। কিন্তু এতে আপত্তি ছিল সিমির। তাই শুনে পাভেল বলত, ইস্ ; আমার কেন গজদাঁত হল না। শেষপর্যন্ত কুমারের চিঠি এসেছে! একমুখ হাসি নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'বাঃ। কেমন আছে ওরা?'

'ওরা? পাভেলের কথা কিছু লেখেনি।'

'ও।' বুক কাঁপছিল সিমির।

'এই চিঠি না লিখলেই ও ভাল করত। কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি। আজ মনে হল, মিথ্যে ওর জন্যে ভাবছি। যে কখনও ফিরে আসতে চায় না সে কী করবে তা নিয়ে কেন আমি ভাবব?' মিসেস অ্যান্টনির গলায় একটুও আবেগ নেই।

'কী হয়েছে ওর?'

মিসেস অ্যান্টনি সিমির মুখের দিকে তাকালেন। তারপর ব্যাগ খুলে একটা সুন্দর এয়ারোগ্রাম বের করে এগিয়ে দিলেন, 'তুমি পড়তে পারো।'

খামের ওপর নাম দেখে সিমি বলল, 'এ আপনার চিঠি।'

'তা হোক। আমিই তো পড়তে বলছি।'

ভাঁজ খুলল সিমি। ইংরেজিতে লেখা। 'মা, আশাকরি তুমি ভাল আছ। আমি এখানে এসে পায়ের তলায় মাটি খুঁজতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে যোগাযোগ রাখতে পারিনি। অনেক কষ্ট করার পর শিকাগোতে ট্যাক্সি চালাবার অনুমতি পেয়েছি। এতে রোজ একশো ডলারের মতো আয় হয়। একটা ছোট ফ্ল্যাটও নিয়েছি। মুশকিল হল, ট্যুরিস্ট ভিসায় কানাডা হয়ে এখানে আসার জন্যে আমার কাছে আমেরিকায় থাকার বৈধ কাগজ ছিল না। এখানকার বিভিন্ন স্টেটের নিয়ম আলাদা বলে আমার বিরুদ্ধে কেস চললেও জামিনে আছি এবং কাজ করার পারমিট পেয়েছি। কিন্তু কেসে হেরে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আমি দেশে ফিরে যেতে চাই না। দেশ আমাকে কিছু দেয়নি। আমার পাসপোর্ট অনুযায়ী আমি একজন ভারতীয়। অথচ নিজেকে ভারতীয় মনে করার কোনও কারণ দেখতে পাইনি। বারংবার আন্দোলন এবং ধর্মঘট করে যে ক্ষমতা আদায় করা হয়েছে তা নেহাতই সান্ত্বনা পুরস্কার। তাতে পাহাড়িদের অভাব ঘুচবে না, সম্মানও বাড়বে না। আমি আমেরিকাতেই থাকতে চাই। এখানে থাকার এবং নাগরিকত্ব পাওয়ার একমাত্র উপায় কোনও আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করা। ভালবেসে কোনও আমেরিকান মেয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি। কিন্তু ডলার দিলে এদেশে কাগুজে বউ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে অনেক কড়াকড়ি হওয়ায় সেইসব বউরা দিন পনেরো স্বামীর ঘর করতেও রাজি হয়েছে। এর জন্যে অবশ্য অনেক ডলার খরচ হবে। তা হোক। আজ আমি বিয়ে করছি। তোমার বউমার নাম মার্থা। অবশ্য নাগরিকত্ব পাওয়ার পরই সে আমাকে ডিভোর্স করবে। এদেশে এইসব ব্যাপারে কেউ আক্ষেপ করে না। আমি দেশে যাব আমেরিকান নাগরিক হিসেবে। মার্থার দাবি মিটিয়ে আমার হাতে এখনই ডলার থাকছে না। কিন্তু এই পর্ব চুকে গেলে আমি তোমাকে টাকা পাঠাব। মনে রেখো, আমি যদি মাসে দুশো ডলার পাঠাই তাহলে তোমার কাছে সেটা সাত হাজার দুশো টাকা হয়ে যাবে।

আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। আমি ভাল আছি। কুমার।'

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল সিমির। তার হাত কাঁপছিল। মিসেস অ্যান্টনি তার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নিলেন। সেটাকে ভাঁজ করে ব্যাগে রেখে আর একটা কাগজ বের করলেন, 'আমি আজ ওকে যে চিঠি পোস্ট করেছি এটা তার কপি। এটাও পড়ে দ্যাখো।'

সিমির মাথা কাজ করছিল না। আর কিছু পড়ার আগ্রহও তার ছিল না। তবু নিতে হল,

কুমার। তোমার চিঠির উত্তর লেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দুটো কথা বলার জন্যে লিখতে বাধ্য হচ্ছি। আমি যে দেশে জন্মেছি, বড় হয়েছি, মারা যাব, তার নাম ভারতবর্ষ। আমাদের সবার সমস্যা আছে কিন্তু ভারতবর্ষের বিরাটত্বকে অপমান করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এখানে যে আন্দোলন হয়েছে তাতে কখনও বলা হয়নি ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়া হবে। তোমার সেকথা মনে হয় না যখন, তখন আমেরিকান হয়েও এদেশে আসার অধিকার তোমার নেই। আর এতদিন পর্যন্ত আমি এক টাকাকে এক টাকাই মনে করে এসেছি। যেভাবেই হোক সেই টাকা জোগাড় করে বেঁচে আছি। ডলারের স্বপ্ন দেখার বাসনা আমার নেই। তোমার পাঠানো ডলার গ্রহণ করার আগে আমার যেন মৃত্যু হয় এই প্রার্থনা করছি। মিসেস সি. অ্যান্টনি।'

সিমি কেঁদে ফেলল।

মিসেস এ্যান্টনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাঁদছ কেন ?'

'আপনি এই চিঠি লিখলেন ?' চোখের জল মোছার চেষ্টা করল সিমি।

কাগজটা ফেরত নিয়ে মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'আমি কখনও কোনও আপস করিনি সিমি। আমার স্বামী চলে যাওয়ার পর বেশ অর্থাভাবে আছি। ওকে চিঠিটা লিখতে যে খরচ হল সেটাও এখন আমার পক্ষে বিলাসিতা। এতদিন আশায় ছিলাম ছেলে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। এখন অমন ছেলেকে জন্ম দিয়েছিলাম বলে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। এই চিঠি না লিখলে আমি আরও ছোট হয়ে যেতাম। সেটা আরও লজ্জার।'

সিমি মিসেস অ্যান্টনির হাত ধরল, 'আপনি খুব ভাল !'

মিসেস অ্যান্টনি মাথা নাড়লেন, 'তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত ?'

'না। কেন ?'

'তাহলে একসঙ্গে বাড়ির দিকে যেতাম।'

সিমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। দুজনে পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। মিসেস অ্যান্টনির চিঠিটা সিমিকে এমন আচ্ছন্ন করেছিল যে সে অন্য কিছু ভাবতেই পারছিল না। যে কুমারের জন্যে তার এতকালের প্রতীক্ষা তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেও সেই আঘাতটা যেন তেমন করে এখন বাজছে না। কেবলই মনে হচ্ছে কত শক্ত মন হলে মিসেস অ্যান্টনির মতো ওই চিঠি লেখা যায় ! হঠাৎ নিজেকে খুব বোকা বলে মনে হতে লাগল তার। কার জন্যে সে এতকাল অপেক্ষা করেছে ! যে মাকে ওই চিঠি লিখতে পারে, নাগরিক হতে চাওয়ার লোভে যে টাকা দিয়ে বিদেশিনীকে মিথ্যে বিয়ে করতে পারে, তার জন্যে ! পরক্ষণেই মনে হল সে তো শুধু কুমারের চিঠির জন্যে অপেক্ষা করেনি। পাভেলও ছিল। ওদের দুজনের কাউকেই তো সে ভালবাসার কথা বলেনি। সত্যি কি ও কাউকে ভালবেসেছিল ? যে শুনবে সে জানতে চাইবে ভাল না বাসলে কেন রোজ চিঠির সন্ধানে এত দূরে আসত ? জবাবটা নিজেরই জানা নেই। দুজনকে কি একসঙ্গে ভালবাসা যায় ? সে যদি কুমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত আগে নিয়ে পাভেলকে বাতিল করত তাহলে আজ কোথায় দাঁড়াত ? আর পাভেল ? সে-ও তো আমেরিকায় গিয়েছে, তারও ভূমিকা এই একই হতে পারে ! পুরুষদের কাছে হৃদয় নিয়ে কোনও আকাঙ্ক্ষা একমাত্র নির্বোধ মেয়েরাই করে থাকে।

'তুমি খুব কষ্ট পেলে, না ?' মিসেস অ্যান্টনি নিচু গলায় বললেন।

সিমি একবার তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিল।

'আমি জানতাম তুমি পাভেলের সঙ্গে জড়িয়ে গেছ। কিন্তু পাভেলের মা বলেছেন তুমি কুমারের জন্যে অপেক্ষা করছ।'

'আমি কারও জন্যে অপেক্ষা করছি না।'

'খুশি হলাম। কিন্তু কুমারের চিঠি পড়ার সময় তোমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, হাত কাঁপছিল। শোনো, অপেক্ষা তার জন্যে করা উচিত যে মর্যাদা দেবে। মুশকিল হল, কে যে দেবে কে দেবে না তা বোঝা খুব দুরূহ।'

ওরা বাজারের কাছে চলে আসতেই সিমি দেখতে পেল প্রাণকুমার বাড়ি তৈরির সরঞ্জামের দোকানে ঢুকছে। সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে গেল।

মিসেস অ্যান্টনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল ?'

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই। বলো।'

'আপনি চাকরি করবেন ?'

'চাকরি ?' হেসে উঠলেন মিসেস অ্যান্টনি, 'আমাকে কে চাকরি দেবে ? আমার কি চাকরি করা বয়স বা যোগ্যতা আছে ?'

'আছে। আপনি এখনও শক্ত আছেন।'

'তাই ? কী চাকরি ?'

'আমার পরিচিত একজন বাচ্চা মেয়েদের জন্যে হোস্টেল খুলছে। তাদের দেখাশোনার জন্যে কেয়ারটেকার দরকার। খাওয়া থাকা আর দেড় হাজার টাকা মাইনে দেবে এখন।'

'থাকতে হবে ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু স্কুলের তো অনেক ছুটি, তখন ছুটি পাওয়া যাবে।'

মিসেস অ্যান্টনির মুখে নরম আলো ছড়ানো, 'কিন্তু আমাকে কি পছন্দ হবে ?'

'নিশ্চয়ই হবে।'

'তাহলে খুব ভাল হয়। এখন সময় কাটতে চায় না, খুব একা লাগে।'

'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

রাস্তা পেরিয়ে দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রাণকুমার বাইরে বেরিয়ে এল। সিমিকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে ! কী ব্যাপার !'

'এঁর নাম মিসেস অ্যান্টনি। আমার খুব পরিচিত।'

প্রাণকুমার নমস্কার করতে মিসেস অ্যান্টনিও হাত জোড় করলেন।

'তুমি কেয়ারটেকার খুঁজছিলে, উনি কাজটা খুব ভাল করতে পারবেন।'

প্রাণকুমার বেশ অবাক হয়ে সিমির দিকে তাকাল। তারপর মিসেস অ্যান্টনিকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাচ্চাদের ব্যাপারে আপনার কোনও অভিজ্ঞতা আছে ?'

'মা হিসেবে যতটুকু থাকা উচিত ততটুকু আছে।'

'কিন্তু ওদের পড়ানো— !'

'আমার ছেলেকেও আমিই পড়িয়েছি।'

'বেশ। সিমি যখন বলছে তখন আমার আপত্তি নেই। আপনি কালই সোনাদায় আসুন। সোনাদা বাজারে আমার নাম বললে যে কেউ বাড়ি দেখিয়ে দেবে। থ্যাঙ্ক ইউ সিমি।' প্রাণকুমার চলে গেল।

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব জানি না। কিন্তু ওর নাম কী ?'

সিমি বলল, 'প্রাণকুমার। কিন্তু একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি এখনই বাড়ি যেতে পারছি না। আমাকে একজনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।'

৮

ঘরভর্তি বিভিন্ন বয়সের মানুষ হাসিঠাট্টায় সময় কাটাচ্ছে। মিস্টার ব্রাউনকে ওরা যে চেয়ার দিয়েছিল সেটি অনেকক্ষণ দখল করে রেখেছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। দলের সেক্রেটারি এখন পার্টি অফিসে আসেননি বলে তাঁকে জানানো হয়েছে। ঘরের বাইরেও বেশ কিছু লোক সম্ভবত তাঁরই সাক্ষাৎপ্রার্থী। তাদের কার কী প্রয়োজন তা জেনে নিয়ে উঠতি নেতারা আশ্বাস দিয়ে কাজটা করিয়ে দেবে বলে। একই ভাবে তাঁর কাছেও এসেছিল একজন। তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'কোনও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমি এখানে আসিনি। আমার যা বলার তা সেক্রেটারি

ছাড়া কাউকে বলা যাবে না।'

এদের অনেকেই তাঁকে চেনে। তাঁর তল্লাটের বয়স্ক মানুষই শুধু নয়, সেখানকার সাধারণ মানুষ তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, এ খবরও তাদের জানা। তাই চেয়ার বরাদ্দ হয়েছিল তাঁর ভাগ্যে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। সিমিকে তিনি বলেছেন অপেক্ষা করতে। সেই সময়টাও এসে যাচ্ছে। অথচ কথা না বলে এত দূরে এসে তিনি ফিরে যান কী করে! অবশ্য এখান থেকে বেরিয়ে সিমিকে বলে আসা যায় বাড়িতে ফিরে যেতে কিন্তু সেই ফাঁকে যদি সেক্রেটারি পার্টি অফিস ছুঁয়ে বেরিয়ে যান? খুব অস্বস্তিতে পড়েছিলেন মিস্টার ব্রাউন।

এখানে যেসব আলোচনা চলছে তা শুনতেও তাঁর ভাল লাগছে না। পাহাড়ি নয় এমন বাড়ির মালিকরা যারা দীর্ঘদিন এখানে থাকে না, বছরের বেশির ভাগ সময় যাদের বাড়ি তালাবন্দী থাকে তার তালিকা তৈরি হয়েছে। প্রথমে ওই সব বাড়ির মালিকদের বলা হবে বিক্রি করে দিতে। বাড়ির বয়স এবং অঞ্চল বুঝে দাম ঠিক করে দেবে পার্টি। যাঁরা বিক্রি করতে রাজি হবেন না তাঁদের সম্পর্কে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা পরে ঠিক করা হবে। তবে প্রথম পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই নিতে চাইছে পার্টি। মিস্টার ব্রাউন অবাক হয়ে শুনলেন ইতিমধ্যে এই সব মাঝারি নেতারা কে কোন বাড়ি নেবে তা ঠিক করে ফেলেছেন। যে বাড়ির দাম তিন লাখ টাকার কম নয় তার জন্যে তিরিশ হাজার টাকা দিতে এক নেতা রাজি নন। তাঁদের পাড়ায় যেতে মিস্টার মুখার্জির যে পুড়ে যাওয়া বাড়িটি রয়েছে, আন্দোলনের সময় যাকে বাঁচাতে একটি নেপালি ছেলে জীবন দিয়েছিল সেই বাড়িটির দাম ঠিক হয়েছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। যে নেবে বলে ঠিক করেছে তার যুক্তি হল ওটা বাসস্ট্যান্ড থেকে অনেক দূরে, বাড়ির জানলা দরজা পুড়ে গিয়েছে। সব কিছু নতুন করে লাগাতে হবে, রং করতে হবে, প্রচুর খরচ হবে। পাঁচ হাজার টাকা যে দেওয়া হবে তাই অনেক বেশি।

হঠাৎ মিস্টার ব্রাউনের মনে পড়ল ঝোরার এপাশে, শহরের শেষে যে সুন্দর বাড়িটি সবার চোখে পড়ে, যেখানে দার্জিলিং থেকে বড় বড় নেতারা মালিক এলেই আমন্ত্রিত হন তিনি রাজস্থানের মানুষ। বছরে দুবার দশ দিনের জন্যে আসেন। কিছুক্ষণ উশখুশ করে মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

সব কটি মুখ একসঙ্গে তাঁর দিকে ফিরল। মিস্টার ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের পাহাড়ে যাওয়ার সময় যে ঝোরা পড়ে তার আগে একটা সুন্দর বাড়ি সারা বছর তালাবন্দী থাকে। বাড়ির মালিক রাজস্থানের লোক। ওই বাড়ির দাম কি ঠিক হয়েছে?'

মিস্টার ব্রাউন দেখলেন ঘরের সবাই এ বার যেদিকে তাকাল সেখানে দুজন দ্বিতীয় সারির নেতা বসে আছেন। তাঁদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আগরওয়ালা সাহেবের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করছেন? না, ওটাকে চিহ্নিত করা হয়নি।'

'কেন?'

'কারণ ওটা খালি বাড়ি নয়। আগরওয়ালা সাহেব নিজে না পারলেও তাঁর পরিবারের লোকজন প্রতি মাসেই ওই বাড়িতে এসে থাকেন।'

'কথাটা সম্ভবত ঠিক নয়। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই নয়।'

'এর বেশি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমাদের নেতারা অনেক ভেবেচিন্তে কোন বাড়ি তালিকায় থাকবে সেটা ঠিক করেছেন।'

'তাহলে নেতাদের আমার প্রস্তাবের কথা বলুন। ওই বাড়ির জন্যে চল্লিশ হাজার দিতে পারি। প্রত্যেকে যা দিচ্ছেন তার চেয়ে আমি নিশ্চয়ই কম দিচ্ছি না।'

মিস্টার ব্রাউনের কথা শেষ হওয়ামাত্র অনেকেই হো হো করে হাসতে লাগল। দ্বিতীয় জন এবার উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে টেবিল ঠুকতে লাগলেন, 'স্টপ স্টপ। এটা পার্টি অফিস। চায়ের দোকান না। আর শুনুন মশাই, কোন বাড়ি তালিকায় থাকবে কোনটা থাকবে না সেই কৈফিয়ত আপনাকে আমরা দিতে বাধ্য নই।'

'কেন?' খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন ব্রাউন।

লোকটা উত্তেজিত ছিল কিন্তু এমন প্রশ্ন আশা করেনি। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। তখন প্রথম

জন বলল, 'প্রত্যেক দলের মতো আমাদেরও নিজস্ব নিয়ম আছে।'

'কিন্তু আমি কি দলের বাইরে। প্রতি মাসে নিয়মিত চাঁদা দিই।'

ঠিক সেই সময় দলবল নিয়ে জিপ থেকে নেমে এলেন সেক্রেটারি। দরজায় দাঁড়িয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, 'আজ দেখছি খুব ভিড়।' তারপর ঘরের ভেতর মানুষের করে দেওয়া রাস্তায় হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মিস্টার ব্রাউন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সেক্রেটারি সাহেব!'

ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'ওয়েল! মিস্টার ব্রাউন। কেমন আছেন?'

'আমি সবসময় ভাল থাকি।'

'তাহলে এখানে?'

'এখানে এলে বুঝতে হবে মানুষটি খারাপ আছে?'

'নট দ্যাট। প্রয়োজন ছাড়া কেউ কি অত দূর থেকে এখানে আসে!'

'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'ব্যক্তিগত?' সেক্রেটারি প্রশ্ন করা মাত্র দ্বিতীয় নেতাটি বলে উঠলেন, 'আমাদের খালিবাড়ি স্কিমে যে আগরওয়ালা সাহেবের বাড়ি পড়ছে না এটা উনি মানতে চাইছেন না। চল্লিশ হাজার টাকা অফার দিয়েছেন।'

সেক্রেটারির মুখ-চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, 'আপনি বাড়ি কিনতে এসেছেন!'

মিস্টার ব্রাউন মাথা নাড়লেন, 'না। সে জন্যে আসিনি। আমার আপনার সঙ্গে অন্য কথা আছে। আর সেটা ব্যক্তিগত নয়।'

'এদের সামনে বলতে অসুবিধে হবে?'

'আমার হবে না। আপনার হবে কি না জানি না।'

সেক্রেটারির চোখ আরও ছোট হল, 'ঠিক আছে, ভেতরে আসুন।'

মিস্টার ব্রাউন এগোলেন। সেক্রেটারিকে অনুসরণ করে যাওয়ার সময় লক্ষ করলেন প্রতিটি চোখ বিস্মিত হয়ে তাঁকে দেখছে। পাশের দরজা দিয়ে চমৎকার সাজানো কাচের বড় বড় জানলায় ঘেরা ঘরটিতে ঢুকেই চারপাশে নীল পাহাড় চোখে পড়ল। দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘা এখন সাদা, তার চারপাশে সাদা মেঘের জঙ্গল। কাচ ঢাকা বড় টেবিলের ওপাশে গদিওয়ালা ঘোরানো চেয়ারে বসে সেক্রেটারি বললেন, 'বসুন।'

এপাশের চেয়ার টেনে বসলেন মিস্টার ব্রাউন। একটু ভাবলেন, কীভাবে শুরু করবেন।

সেক্রেটারি বললেন, 'বলুন।'

মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'দেখুন, আমার অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে। এই পাহাড়েই আমার জন্ম, এখানেই মরতে চাই। পাহাড়ের মানুষদের আন্দোলনে আমি শরীরের কারণে অংশ নিতে পারিনি বটে কিন্তু আন্দোলনের মূল কারণকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

সেক্রেটারি একটা কলম তুলে নিলেন, 'মূল কারণ বলতে— ?'

'পাহাড়ের মানুষ বঞ্চিত।'

'আপনার সমস্যাটা কী? অনেকেই অপেক্ষা করছেন বুঝতেই পারছেন।'

'আমার বাড়ির পাশে নিরাময় নামে একটি নার্সিংহোম আছে। ওকে ঠিক নার্সিংহোম বলা যায় কিনা তা আমি জানি না। রক্তে হেমোগ্লোবিন কমে গিয়ে যে মারাত্মক অসুখ হয় তার চিকিৎসা করা হয় ওখানে। যারা ওখানে থাকে তাদের বয়স খুবই কম। আমি—।'

'আমি ব্যাপারটা জানি। ওখানকার ডাক্তারকে আমরা শ্রদ্ধা করি।'

'ওই নিরাময়ের একটি ছেলে, ছেলেটি বাঙালি, কথা বললেই মনে হয় যিশুর আশীর্বাদ ওর সঙ্গে আছে। এ রকম প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা ছেলেকে তিনি কেন ওই রোগ দিলেন এই ধন্দ আমার আছে। এই ছেলেটি যেহেতু বাঙালি তাই সে বাংলা গান গায়। আমাদের ওখানকার পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা ওকে ভালবাসে। ও যা গায় তাতে ছেলেরা গলা মেলাতে চেষ্টা করে। এটা কি অপরাধ?'

'এখন পর্যন্ত সেটা মনে হচ্ছে না। তারপর?'

'আমাদের এলাকায় আপনার দলের ভারপ্রাপ্ত একটা ছেলে নতুন এসেছে। সে এবং তার সঙ্গীরা

বাইকে চেপে যাওয়াআসা করে। ছেলেটি স্থানীয় নয় বলে তাকে আমি চিনি না, সে-ও আমাকে জানে না। সায়নের গান শুনে তার মনে হয়েছে সে পাহাড়ি ছেলেমেয়ের মন বিষাক্ত করে তুলছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ডাক্তারকে নির্দেশ দিয়েছে সায়নকে তার বাবা-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে।'

'আচ্ছা! কী গান সে শুনেছে?'

'আমি ঠিক ডিটেলসে জানি না। তবে দেশাত্মবোধক গান বলে মনে হয়।'

'কোন দেশের দেশাত্মবোধক গান?'

'একটি ভারতীয় ছেলে কোন দেশের দেশাত্মবোধক গান গাইতে পারে?'

সেক্রেটারি বোতাম টিপলেন। একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। সেক্রেটারি তাকে বললেন, 'গুরুংকে ডেকে আনো। জলদি।'

ছেলেটি বেরিয়ে গেল। মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'ওই রোগে যারা আক্রান্ত তাদের জীবন যে কোনও মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতে পারে। ডাক্তার চেষ্টা করছেন একটা স্থিতাবস্থায় নিয়ে আসতে। আপনার নেতার চাপে যদি সায়নকে চলে যেতে হয় তার আয়ু আর কতদিন থাকবে তা যিশুই জানেন।'

'আপনি কি জানেন লিডারের নির্দেশে ওই ডাক্তারকে আমরা সাহায্য করেছি।'

'না, আমি জানি না।'

'ওঁর পেশেন্টদের বাঁচাতে নাকি ফ্রেশ ব্লাড দরকার হয়। আমরা ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে একটা প্যানেল করে দিয়েছি। যখন যে গ্রুপের রক্ত দরকার পড়বে ওঁর তা পেতে অসুবিধে হবে না।' সেক্রেটারি এমন ভঙ্গিতে হাসলেন যেন পৃথিবীর শেষ উপকারটা তিনি করে ফেলেছেন।

'ইয়েস বস।' দরজা ঠেলে ঢুকল ছেলেটি।

টিভিতে হিন্দি সিনেমা দ্যাখেন মিস্টার ব্রাউন। অমরীশ পুরীর সাকরেদরা এই ভঙ্গিতে হুকুমের জন্যে এসে দাঁড়ায়। মিস্টার ব্রাউনকে দেখে অবাক হল ছেলেটি।

'এঁকে চেন।' সেক্রেটারি জানতে চাইলেন।

'আজ সকালে দেখেছি।'

'ও। ইনি আমাদের ওয়েল উইশার। এঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে তোমার কাজ করতে সুবিধে হবে। হ্যাঁ, নিরাময় নিয়ে তোমার কী প্রব্লেম হয়েছিল?'

'ওটা একটা গোলমেলে জায়গা।'

'কারণ।'

'ওখানকার একটা ছেলে এমন একটা ইন্ডিয়ান গান পাহাড়ি বাচ্চাদের শেখাচ্ছে যা আমাদের নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। বাচ্চাদের ব্রেন ওয়াশড হয়ে যাবে।'

'কী রকম?'

'গানটায় শুধু প্লেন বেঙ্গলের বর্ণনা আর সেটাই নাকি বেস্ট কান্ট্রি।'

সেক্রেটারি মিস্টার ব্রাউনের দিকে তাকালেন।

মিস্টার ব্রাউন হাসলেন, 'আমরা কোন দেশে আছি?'

'মানে?' সেক্রেটারির মঙ্গোলিয়ান চোখ প্রায় বন্ধ।

'এটা তো ইন্ডিয়া। আমরা তো ইন্ডিয়ার মধ্যে থেকেই ভালভাবে বাঁচতে চাই। লিডার তো সেই কথা বলেছেন। তাই না?' মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'অথচ এই ছেলেটি গানটাকে ইন্ডিয়ান গান বলল কেন বুঝতে পারছি না।'

ছেলেটি এবার গলা চড়াল, 'আপনার লজ্জা করছে না, পাহাড়ি হিসেবে যে গানে পাহাড়ের মানুষের কথা নেই সেটাকে সাপোর্ট করছেন?'

'তাহলে আমাদের জাতীয়সঙ্গীত গাওয়াই উচিত নয়। ওখানে এই দার্জিলিং-এর পাহাড়িদের কথা একবারও বলা হয়নি। অথচ আমাদের লিডার ওই গান চলাকালীন মাথা নিচু করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আপনারাও তাই করেন, করেন না? কিছু মনে করবেন না, সরষের মধ্যে যারা ভূত দেখতে চায় তাদের হাতে ক্ষমতা গেলে সেই গল্পের বানরের হাতে মাছি মারতে তলোয়ার তুলে

দেবার মতো অবস্থা হবে। আমাদের পাহাড়ে এখন অনেক কাজ। সে সব ফেলে দিয়ে একটা যুবক মোটরবাইকে চেপে ডাক্তারকে শাসাচ্ছে লিউকোমিয়া পেশেন্টকে বাড়িতে ফেরত পাঠাবার জন্যে, এর চেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা আর কী হতে পারে!'

ছেলেটি বলল, 'আপনি ভুল কমপ্লেন করছেন। ছেলেটি ওই রকম অসুস্থ জানার পর আমি আর কিছু না বলে ফিরে এসেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারি বললেন, 'তাই নাকি! তা হলে সব মিটে গিয়েছে। আপনি খামোকা এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এত দূরে এলেন মিস্টার ব্রাউন। যাক, এরপর কিছু হলে তুমি মিস্টার ব্রাউনের সঙ্গে কথা বলে নেবে।'

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বাড়ির ওপরে যে কসাইখানা আছে সেটা বন্ধ কেন?'

'আমার বাড়ি তুমি চেন?'

'হ্যাঁ। আমি খোঁজ নিয়েছি।'

'হুঁ। বন্ধ কেন আমি কী করে বলব?'

'লোকটা পার্টি ফান্ডে কোনও ডোনেশন দিচ্ছে না অথচ ভাল কামাই করছে। ওকে ওয়ার্নিং দেবার পরই ও দোকান বন্ধ করে দিল।'

'ম্যাথুজ তো শহরেই ঘুরে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারো।' মিস্টার ব্রাউন উঠলেন, 'অনেক ধন্যবাদ সেক্রেটারি সাহেব। আমি কদিন বাদে দার্জিলিং-এ যাব। তখন যদি লিডারের সঙ্গে দেখা হয় তা হলে তাঁকে বলব আপনি খুব সহযোগিতা করেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারি উঠে দাঁড়ালেন, 'এনি প্রব্লেম, আপনাকে আসতে হবে না। জাস্ট একটা ফোন করবেন। আরে, আরে, আপনাকে চা অফার করা হয়নি।'

'আমি এই সময় চা খাই না। এগারোটা বেজে গেলেই আমার দারু দরকার।'

মিস্টার ব্রাউনের কথায় হো হো করে হাসলেন সেক্রেটারি, 'সেটার ব্যবস্থাও হতে পারে। আপনি সামনের বারে চলে যান, আমার গেস্ট।'

'ওখানে তো আমার জিনিস পাওয়া যাবে না। আমারটা ঘরে তৈরি হয়।'

'সে কী! বাইরে গেলে কী করেন।'

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন মিস্টার ব্রাউন। তারপর বললেন, 'চাকরি থেকে অবসর নেবার পর তো একবারই বাইরে গিয়েছিলাম। সেবার আমার স্ত্রী সঙ্গে ছিল। এয়ারপোর্টে ওরা সার্চ করে পাঁচটা বোতল বের করল। ওটা নিয়ে যাওয়া নাকি বেআইনি। বিলিতি মদ নিয়ে গেলে ওদের আপত্তি নেই, ঘরের জিনিস নেওয়া চলবে না। আমার অসুবিধে হবে বলে স্ত্রী নিয়েছিলেন সঙ্গে।'

'তো কী করলেন?'

'কী আর করব। চারদিন ছিলাম। এক ফোঁটা মদ খাইনি। আচ্ছা, গুডবাই। যিশু আপনাদের মঙ্গল করুন।' মিস্টার ব্রাউন বেরিয়ে এলেন। এতক্ষণ কথা বলে তাঁর মনের জ্বালা সামান্য জুড়োলেও তিনি বুঝতে পারছিলেন না ওরা তাঁর কথা ঠিক কতটা বুঝতে পেরেছে। এই সময় অফিসের সামনে একটা জিপ এসে থামল। সেখানে একটি ছেলে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সঙ্গীরা চেঁচাতে চেঁচাতে ভেতরে ঢুকল, 'লামার দলের লোকজন মেরেছে। সেক্রেটারি কোথায়?'

মিস্টার ব্রাউন এগিয়ে চললেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেটা এখন কতটা অটুট আছে? পাহাড়িরা আজ তিনটে দলে বিভক্ত। এর ওপর কংগ্রেস আর সি পি এম তো রয়েছেই! কিন্তু যারা ক্ষমতায় রয়েছে তারা যদি ঠিক পথে না চলে তা হলে সেই রক্ত ঝরানো আন্দোলনের মূল্য থাকবে না।

মিস্টার ব্রাউন ওদের দেখতে পেলেন। সিমি বলল, 'ওঃ, আমরা ভাবছিলাম চলে যাব!'

'সেটাই ঠিক হত। আমি যে তোমাদের খবর দেব সেই সুযোগ পাচ্ছিলাম না।' মিস্টার ব্রাউন মাথা নাড়লেন, 'কেমন আছেন মিসেস অ্যান্টনি?'

মিসেস অ্যান্টনি বলল, 'ভাল। আপনি?'

'আমি তো কখনও খারাপ থাকি না, তবে আজ—। ছেড়ে দিন ও কথা। আপনারা কি বাড়ির

দিকে ফিরবেন ? তা হলে হাঁটা শুরু করা যেতে পারে।'

তিনজনে শহরের ব্যস্ত এলাকা ছাড়িয়ে এলে মিস্টার ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ছেলের খবর পেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ।' মিসেস অ্যান্টনি নিচু গলায় বললেন।

মিস্টার ব্রাউন উচ্ছ্বসিত হলেন, 'বাঃ, খুব ভাল।'

'ও আমেরিকায় থাকবে বলে সেখানকার একটি মেয়েকে বিয়ে করছে।'

'সে কী !' থমকে তাকালেন মিস্টার ব্রাউন সিমির দিকে। সিমি মুখ ফিরিয়ে নিল। বুকের ভেতরটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল মিস্টার ব্রাউনের।

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে কে কী রকম হবে তা আগে থেকে আন্দাজ করা যায় না। আমি মা হিসেবে নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু দীর্ঘদিন ও দূরে চলে যাওয়াতে আমার একটা উপকার হয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মানুষ বড় হলে সে তার নিজের মতো চলতে শুরু করে। আপনি ওর শৈশব বাল্যকালে যা শিখিয়েছেন সেই পথই যে ধরবে এমন কোনও কথা নেই। জীবজন্তুদের বাচ্চারা নিজের খাবার খুঁজে নিতে শিখলেই মায়ের সঙ্গ ত্যাগ করে। ঈশ্বর মানুষকে কষ্ট দেবার জন্যে তাদের মনে স্নেহ ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে বড় হয়ে সন্তান অন্য পথে গেলে মানুষ কষ্ট পায়। কিন্তু ওকে ছেড়ে থাকতে থাকতে আমার মন নির্লিপ্ত হতে শিখেছে। তাই ও এখন কী করছে না করছে তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

মিস্টার ব্রাউন কিছু বললেন না। তাঁর সন্তানরা যে যেখানেই থাকুক নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। ওরা টাকাও পাঠাতে চায়। যখন আসে অনেক কিছু নিয়ে আসে। কিন্তু তিনি একা থাকতেই ভালবাসেন। ওরা যে যার মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে এতেই তিনি খুশি। কিন্তু মিসেস অ্যান্টনির কথাগুলো তাঁর মনে ধরল। ভাগ্য তাঁকে ওই অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করায়নি, করালে তাঁকেও একই কথা বলতে হত। কিন্তু সিমির কী হবে ? এই মেয়েটা তো একদম ভেঙে পড়বে !

ওঁরা চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'সিমি, আমার মনে হচ্ছে কাজটা তোমারই করা উচিত !'

সিমি বলল, 'এ আবার কী ! কথা হয়ে গেল— !'

'আমার তো বয়স হয়েছে। যেমন করে হোক ঠিক চলে যাবে। তোমার সামনে এখন অনেক জীবন, তোমারই কাজটা দরকার।' মিসেস অ্যান্টনি বললেন।

'আপনি শুরু করুন। যদি ভাল না লাগে তখন দেখা যাবে।' সিমি বলল।

মিস্টার ব্রাউন খুব অবাক হয়ে গেলেন। নিজে চাকরি না করে সিমি মিসেস অ্যান্টনিকে ওটা করতে বলছে ? মেয়েটির প্রতি শ্রদ্ধা হল তাঁর। মুখে কিছু বললেন না।

রাস্তাটা চড়াই। মিস্টার ব্রাউন একটানা উঠতে পারেন না। মাঝে মাঝেই থামতে হচ্ছিল তাঁকে। ওরাও ওঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। পেছনে পাহাড়, সামনে গাছ। খাদ থেকে উঠে আসা গাছগুলো বেশ ঝাঁকড়া। রাস্তাটা সারাক্ষণ ছায়া মেলে রয়েছে। মিসেস অ্যান্টনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'অনেক দিন থেকে ভাবছিলাম আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। এই একা থাকতে আপনার অসুবিধে হয় না ?'

মিস্টার ব্রাউন হাসলেন, 'আমি তো একা থাকি না।'

'সে কী ! আপনার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর— !'

'হ্যাঁ, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর কিছুদিন খুব নিঃসঙ্গ লাগছিল। এখন এলাকার সমস্ত মানুষ আমার সঙ্গে আছে। এই যে মেয়েটা, এ দুবেলা আমার কাছে আসে, খাবার দিয়ে যায়। দিন ভর সময়টা যে কীভাবে কেটে যায় আমি টেরই পাই না। তারপর টিভি আছে। আর সেই সঙ্গে আছেন যিশু। তাঁর কথা ভাবতে শুরু করলে একাকিত্ব ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি ছেলে, তার নাম সায়ন।' হাসলেন মিস্টার ব্রাউন।

'সায়ন ? সে কে ?' মিসেস অ্যান্টনি কৌতূহলী হলেন।

'আমার বাড়ির নীচে নিরাময় বলে যে স্যানেটোরিয়াম আছে ও সেখানে থাকে। খুবই অসুস্থ।

কিন্তু ওর কাছাকাছি এলেই আপনি বুঝতে পারবেন যিশুর আশীর্বাদ ও পেয়েছে। অদ্ভুত আনন্দ বুকে ছড়িয়ে পড়ে।'

'তাই!' খুব অবাক হলেন মিসেস অ্যান্টনি।

'হ্যাঁ। অতএব আমার একা থাকার সুযোগই নেই।'

'অসুখ-বিসুখ হলে?'

'ওসব এখন হবে না। যখন হবে তখন বিছানা থেকে সোজা কফিনে চড়ে মাটির তলায় চলে যাব।' হো হো করে হাসলেন মিস্টার ব্রাউন যেন খুব মজার কথা বললেন। তার পরই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কী অবস্থা?'

আবার হাঁটা শুরু করলেন মিসেস অ্যান্টনি। বললেন, 'আমার কথা নাই বা শুনলেন!'

ঝোরার পাশে এসে বিদায় নিলেন মিসেস অ্যান্টনি। এখান থেকে তাঁকে ডান দিক দিয়ে ওপরে উঠতে হবে। যাওয়ার আগে সিমির হাত ধরে অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন। আবার চলতে শুরু করলে মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'যিশু তোমাকে আশীর্বাদ করছেন।'

'দরকার নেই আমার ওই আশীর্বাদে, যা চোখে দেখা যায় না, অনুভবও করা যায় না। যিশু যিশু তারাই করে যাদের জীবন থেকে কিছু পাওয়ার থাকে না।' বেশ রাগত গলায় বলল সিমি। বলে গাছের দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল।

'কিন্তু তুমি তো যিশুকে ভালবাস। ঠিক কি না?'

'ভালবাসি আমি অনেক কিছু। যাদের ভালবাসি সব সময় তাদের মাথায় করে রাখতে হবে! আর যে মানুষটাকে মেরে ফেলা হয়েছে প্রায় দু হাজার বছর আগে তাঁর কাজকে আমি শ্রদ্ধা করি, তাঁর উপদেশ আমার ভাল লাগে। কিন্তু তিনি এখন কোত্থেকে এসে আমার আশীর্বাদ করবেন!' সিমি রীতিমতো চিৎকার করল।

'তোমার মন বিক্ষিপ্ত, তাই এ কথা বলছ!' মিস্টার ব্রাউন বললেন।

সিমি বলল, 'হ্যাঁ, আমার মন বিক্ষিপ্ত। নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে আমার। কিন্তু যে কথাগুলো বললাম তা কি মিথ্যে? যুক্তি দিয়ে বোঝান!'

মিস্টার ব্রাউন একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে দাঁড়ালেন। বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, 'তুমি যা বলছ তা যে সত্যি নয় সেটা তোমার অজানা নয়। যাদের তোমার পছন্দ ছিল তারা কতদিন আগে আমেরিকায় চলে গিয়েছে, যোগাযোগ রাখছে না জেনেও তুমি তাদের অস্তিত্ব অনুভব করোনি! তাদের কথা ভেবে তুমি অন্য কোনও ছেলেকে দূরে সরিয়ে দাওনি? তাদের একজনের মা ক্রমশ নিজেকে নিরাসক্ত করে ফেলেছেন কিন্তু তুমি কি পেরেছিলে? পারোনি।'

'আশ্চর্য! দুটো এক ব্যাপার হল? ওরা জলজ্যান্ত বেঁচে আছে।'

'তোমার মনে হচ্ছিল তারা বেঁচে আছে। এমন তো হতে পারত ওরা মারা গিয়েছিল, এখানে খবর পৌঁছোয়নি। সে ক্ষেত্রে ওরা তোমার কাছে বেঁচে থাকত এবং ওদের কথা ভেবে তুমি নিজের জীবনযাপন এইভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে যেতে। যিশুর শরীরের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তিনি তো শরীরসর্বস্ব মানুষ নন। তিনি পরম করুণাময়ের সন্তান। মানুষের হৃদয়ে আলো জ্বালিয়ে দিতেই করুণাময় তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁর শরীর চলে গেলেও তাঁর সেই কাজটা কিন্তু থেমে যায়নি। তুমি যখনই তাঁর উপদেশ পড়বে তখনই মনে হবে তিনি তোমাকে স্পর্শ করে আছেন। আর এই মনে হওয়াটা তোমাকে উদ্দীপ্ত করবে, তোমাকে কাজ করতে উৎসাহিত করবে। আমি যখন যিশুর সামনে বসি তখন নিজেকে একটুও একা লাগে না। কোনও ভাল কাজ করলেই মনে হয় তাঁর দেখানো পথে হাঁটছি। এটা কি তাঁর আশীর্বাদ নয়? সন্দেহ করে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করার চেয়ে তাঁর কাছে নিজেকে নিবেদন করে দ্যাখো, মন শান্তি পাবে।' মিস্টার ব্রাউন বললেন।

'তাহলে তো আমার এখন চার্চে চলে যাওয়া উচিত।'

'দুর পাগলি! চার্চে গিয়ে তাঁকে খুঁজতে হবে কেন? আমাদের চারপাশেই তো তিনি ছড়িয়ে আছেন। তোমার নিজের যা কাজ তা করো। তোমার জীবনে যা কিছু পেতে বাকি আছে তা সংগ্রহ কর। কিন্তু অসৎ হোয়ো না। তাই বলছিলাম, এই যে তুমি মিসেস অ্যান্টনিকে তাঁর একাকিত্ব দূর

করার সুযোগ দিলে এতে শুধু তাঁর উপকার হল না, তুমি নিজেই উন্নত হলে।'

সিমি চলে গেলে মিস্টার ব্রাউন ধীরে ধীরে উঠে এসে নিরাময়ের সামনে দাঁড়ালেন। দেখলেন ম্যাথুজ বেরিয়ে আসছে। এখন দুপুর। এই সময় নিরাময়ে ঢোকা উচিত নয়। ম্যাথুজ তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'শহরে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ। তোমার খবর কী ? দাড়ি কামাওনি কেন ?'

ম্যাথুজ তার খোঁচা দাড়ি জন্মানো মুখে হাসল, 'খবর পেলাম সায়ন খুব অসুস্থ। কিন্তু ছোটবাহাদুর বলল ও এখন ঘুমোচ্ছে। দেখা হল না।'

'ছেলেটাকে মনে হচ্ছে তোমার ভাল লেগেছে!' মিস্টার ব্রাউন আবার হাঁটা শুরু করলেন। ম্যাথুজ বলল, 'হ্যাঁ, খুব শান্ত ছেলে।'

বাড়ির সামনে যেতেই ভুটো দুবার ডেকে চুপ করে গেল। তার দিকে হাত বাড়াতেই সে ছুটে এল। একটু আদর করলেন তাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মতলবটা কী বলো তো ? আমাদের মাংস না খাইয়ে কতদিন রাখবে ?'

ম্যাথুজ হাসল কিন্তু কোনও জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মিস্টার ব্রাউন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। অনেকক্ষণ বাইরে এবং সঙ্গে মহিলা থাকায় তাঁর অসুবিধে হচ্ছিল। এখন তাড়াতাড়ি টয়লেটে গেলেন। আজ বেশ দেরি হয়ে গেছে। লাঞ্চের আগে তাঁর যে কোটা সেটা শেষ করা যাবে না। ফলে রাত্রে একটু বেশি খাওয়া হয়ে যাবে। হাতমুখ ধুয়ে তিনি বাইরের ঘরে এসে দেখলেন ম্যাথুজ বসে আছে। হঠাৎ তাঁর বেশ ভাল লাগল। ম্যাথুজ খেতে চাইলে তাঁকে রাত্রে বেশি খেতে হবে না।

মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'এক মিনিট, প্লিজ।' তারপর যিশুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এই ঘরে সবসময় একটা হালকা আলো জ্বলে। কয়েক সেকেন্ড যিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি ফিরে এসে সকালে দিয়ে যাওয়া ক্যান বের করলেন, সঙ্গে দুটো গ্লাস, 'এসো, একটু খাওয়া যাক।'

ম্যাথুজের আপত্তি ছিল না। বাদামের প্যাকেট থেকে খানিকটা প্লেটে ঢেলে ওঁরা খাওয়া আরম্ভ করলেন। একটা চুমুক দিয়ে মিস্টার ব্রাউন ম্যাথুজের দিকে ভাল করে তাকালেন। বেশ কয়েকদিন দাড়ি কামায়নি। ছেলেটা ভাল। বেশিদূর পড়াশুনা করেনি ওর ভাইদের মতো। কিন্তু ব্যবহার বেশ ভাল, নিজে মাংস বিক্রির ব্যবসা করে রোজগারও ভাল করে। ওর হঠাৎ কী হল !

তিনটে চুমুক নিঃশব্দে দিয়ে ম্যাথুজ বলল, 'তখন আপনি প্রশ্ন করছিলেন না ? আমি ভাবছি মাংস বিক্রির ব্যবসাটা ছেড়ে দেব।'

'সেকী ! তা হলে এই পাহাড়ের মানুষদের মাংস জোগাবে কে ?'

'কেউ না কেউ শুরু করে দেবে।' ম্যাথুজ চতুর্থ চুমুক দিল।

'ওহো, তুমি মিছিমিছি ওদের ওপর বিরক্ত হচ্ছ !'

'কাদের ওপর ?'

'আমি শুনেছি। পার্টি থেকে তোমার কাছে চাঁদা চেয়েছে। নিশ্চয়ই মোটা টাকা চেয়েছে। আরে এসব সমস্যা তো কথা বললে মিটে যাবে। ঠিক আছে, তুমি যা দিতে পারবে বলো, আমি ওদের তাই নিতে রাজি করাব।' মিস্টার ব্রাউন সস্নেহে বললেন। ছেলেটা হেরে সরে যাক তা কখনও হয় !

ম্যাথুজ হাসল, 'না আঙ্কল। চাঁদা দেবার ভয়ে আমি ব্যবসা বন্ধ করছি না।'

'তাহলে !'

'আমার আর ভাল লাগছে না। এই যে গোরুগুলোকে নেপাল থেকে কিনে আনি, আসার পথে ওরা আমার কথা শোনে। এত দূরে আসার সময় ওদের সঙ্গে একটা ভাবও তৈরি হয়ে যায়। সেই গোরুগুলো এখানে দেখে সবাই খুশি হয় খাবার এসেছে বলে। ওদের খুন করতে প্রতিবারই আমার খুব কষ্ট হয়। ওদের শরীর থেকে মাংসের টুকরো কেটে বিক্রি করতে করতে কেবলই ওর চাহনি মনে পড়ে যায়। নিজেকে খুব ঘেন্না করতে আরম্ভ করেছি আমি। জেসাস নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবেন না।' আবার চুমুক দিল সে।

মিস্টার ব্রাউন মাথা নাড়লেন, 'গোরুর মাংস মানুষের খাদ্য। মাছ ডিম মুরগি খাসি যেমন এও তেমন। পাহাড়ের মানুষরা খুব গরিব। ওদের পক্ষে মাছ মুরগি খাসি খাওয়া রোজ সম্ভব নয়। বিফ বিক্রি করে তুমি ওদের উপকার করছ। মানুষের উপকার যে করে তার প্রতি যিশু সবসময় সদয় হন। তোমার সেন্টিমেন্টকে আমি শ্রদ্ধা করছি। কিন্তু তুমি কোনও পাপ কাজ করছ না। চিয়ার আপ মাই বয়।'

মাথা নাড়ল ম্যাথুজ, 'তা ছাড়া— !'

'ইয়েস !'

'আমার এই প্রফেশন তো সবার পছন্দ নয়।'

'কে কী পছন্দ করছে তা নিয়ে তুমি কেন মাথাব্যথা করবে ?'

এই সময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। ওটা খোলাই ছিল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সিমি, তার হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি। ঢুকেই এক মুহূর্ত দাঁড়াল, 'বাঃ বাঃ। এর মধ্যেই সঙ্গী জুটে গেছে ? অ্যাদ্দিন একা খাওয়া হচ্ছিল, তাতে বোধহয় মন ভরছিল না। এরপর তো এই বাড়ি বিনিপয়সার ভাটিখানা হয়ে যাবে।'

ঠক করে বাটিটা টেবিলে রেখে সিমি দুমদুম্ পা ফেলে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভুটো ছুটে এল ভেতরে। টেবিলের দিকে মুখ করে বসে লেজ নাড়তে লাগল।

মিস্টার ব্রাউন দেখলেন ম্যাথুজ কুঁকড়ে বসে আছে। তিনি হাসলেন, 'আরে ওর কথায় কিছু মনে করো না। ওর মনে কোনও ময়লা নেই। হয়তো কোনও কারণে রেগে ছিল সেটা এখানে প্রকাশ করে গেল ওইভাবে।'

ম্যাথুজ বলল, 'আমি, মানে, আমি ঠিক— !'

হাত নেড়ে চুপ করতে বললেন মিস্টার ব্রাউন। তারপর কৌটোর ঢাকনা খুলে ঘ্রাণ নিলেন, 'আঃ। দারুণ। মাটন।'

একটা টুকরো তুলে চেয়ার ছেড়ে উঠে ভুটোর প্লেটে দিয়ে এলেন তিনি, 'খাও। এরকম চাট না হলে খাওয়া কি জমে !'

'না না। আপনার কম পড়ে যাবে।' ম্যাথুজ বলল।

বাটির ওপর আবার ঝুঁকলেন মিস্টার ব্রাউন, 'কী ব্যাপার ! রোজ যা দেয় আজ দেখছি তার ডাবল দিয়েছে। তুমি যে আমার সঙ্গে এসেছ তা কি ও লক্ষ করেছিল ? যাক গে। একটুও কম পড়বে না। চালাও।'

খুব সঙ্কোচের সঙ্গে চামচ দিয়ে একটা টুকরো তুলে নিল ম্যাথুজ। চমৎকার রান্না হয়েছে। সে দেখল ভুটো মাংস খেয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

মাংস চিবোতে চিবোতে মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'এই যে আমরা মাংস খাচ্ছি সেটাও তো একটা প্রাণীর। তাকে মেরে কাটা হয়েছে। আমাদের কি খেতে খুব খারাপ লাগছে ? লাগছে না। তা হলে অন্যের পছন্দ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন ? অবশ্য বিশেষ কেউ যদি হয়, সেরকম কেউ এসেছে নাকি হে !'

দাড়ি থাকা সত্ত্বেও মুখের রং বদলানো লক্ষ করলেন মিস্টার ব্রাউন। ম্যাথুজ বলল, 'না, কেউ আসেনি, তবে— !'

'আরে খুলেই বলো না।

'আপনি কাউকে বলবেন না, কথা দিন। তা হলে আমি খুব লজ্জায় পড়ে যাব। আপনাকে বাবার মতো শ্রদ্ধা করি, কিছুদিন থেকেই মনে হচ্ছিল কথাটা আপনাকে বলা দরকার। কিন্তু অন্য কেউ জানলে— !' ম্যাথুজ থেমে গেল।

'কেউ জানবে না। তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পারো।'

ম্যাথুজ গ্লাস শেষ করল, 'না, আজ থাক, আমি উঠি।'

'আরে ! উঠবে মানে ? তুমি এখন চলে গেলে আমার মেজাজ নষ্ট হয়ে যাবে। মাত্র এক গ্লাস খেয়েছ। আর একটা খাও। মাংসও তো পড়ে আছে।'

ম্যাথুজ নতুন গ্লাস নিল।

একটু সময় নিয়ে মিস্টার ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে অপছন্দ করছে ? আমি চিনি ?'

'হ্যাঁ। সিমি আমাকে পছন্দ করে না আমি মাংস বিক্রি করি বলে।'

একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন মিস্টার ব্রাউন। যে মেয়েটি তার দুই প্রেমিকের জন্যে এতকাল পথ চেয়ে বসেছিল। সে ম্যাথুজের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে এ তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। এবার তাঁর রাগ হল। তিনি গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'সিমির সঙ্গে তোমার প্রেম কতদিনের ?'

আঁতকে উঠল ম্যাথুজ, 'না, না, ওসব কিছু হয়নি।'

খুব অবাক হলেন মিস্টার ব্রাউন, 'তার মানে !'

'আমার সঙ্গে ওর ওসব কোনও কথাই হয়নি !'

'তোমার সঙ্গে ঘুরতে, বেড়াতে যায়নি ?'

'না।'

'তাহলে ? তুমি কী বলতে চাইছ বুঝতে পারছি না।'

মাথা নিচু করল ম্যাথুজ, 'আমার ওকে ভাল লাগে। অনেকবার ভেবেছি কথাটা ওকে বলব, কিন্তু বলতে পারিনি। আমি জানি ওর দুজন বন্ধু ছিল। তারা এখন আমেরিকায় আছে। ও তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু অপেক্ষা করার তো একটা সীমা আছে ! ও কখনও আমার দোকানে মাংস কিনতে আসে না। ওর বাড়ির অন্যদের পাঠায়। বিকেলে যখন দোকান বন্ধ রাখি তখন দেখা হলে একটু-আধটু কথা বলে। কয়েকদিন আগে ভাবলাম সাহস করে ওকে বলেই ফেলি। দেখা হতে ওই ছোট দেওয়ালের ওপর বসতে বললাম। ও জিজ্ঞাসা করল, "কেন"? আমি বললাম, "এমনই, গল্প করব।" ও বলল, "অসম্ভব। তোমার শরীর থেকে গোরুর গন্ধ বের হবে, আমি সহ্য করতে পারব না।' ব্যাপারটা ভাবুন ! ও চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হল। আমার যাকে ভাল লাগে সে এই কাজটা পছন্দ করে না। মনটা খুব ভেঙে পড়ছিল। তারপরই কথাটা শুনলাম !'

'কী কথা ?'

'তিন দিন আগে বিকেলে নিরাময়ের সামনে দিয়ে আসছিলাম। ওখানকার তিন-চারজন ছেলের সঙ্গে সায়ন দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটাকে আমার খুব ভাল লাগে। ও একবার আমাকে বলেছিল কীভাবে গোরু কিনে আনি সঙ্গে গিয়ে দেখতে চায়। সে কথা বলতেই ও মাথা নাড়ল। বলল, "আচ্ছা ম্যাথুজ আঙ্কল, তুমি তো খুব ভাল মানুষ। তুমি অন্য কাজ করতে পারো না !" আমি অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন ?" সে বলল, "অত বড় প্রাণীকে মারতে হলে খুব নির্মম হতে হয়।" আমি আর কথা বলিনি। তারপর থেকে কথাটা আমার মাথায় ঢুকে গেল। আমি কি নির্মম ? আমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই ? যার হৃদয় নেই তাকে কোনও মেয়ে পছন্দ করবে কেন ?'

মিস্টার ব্রাউন মাথা নাড়লেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ম্যাথুজ' !

ম্যাথুজ এই পরিবর্তন দেখে অবাক হন, 'ইয়েস আঙ্কল !'

'তুমি ব্যবসাটা ছেড়ে দাও।' অদ্ভুত গলায় বললেন মিস্টার ব্রাউন।

'আপনি একটু আগে অন্য কথা বলছিলেন !'

'হুঁ। কিন্তু এখন বলছি ছেড়ে দাও। ঠিকই, তুমি না করলে আর কেউ ব্যবসাটা করবে। মানুষের অভাব থাকবে না। তুমি ট্যাক্সি চালাও, মিনিবাসের পারমিট বের করার চেষ্টা করো। কিছু না পারলে বাড়ি ভাড়া করে স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যে হোস্টেল চালু করো। কিন্তু ওই ব্যবসায় আর ফিরে যেও না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কল।' ম্যাথুজ উঠে দাঁড়াল, 'কিন্তু এই কথাগুলো আপনি সিমিকে বলবেন না। প্লিজ।' ম্যাথুজ মিস্টার ব্রাউনের হাত ধরল।

'ওঃ, নো। তুমি নিশ্চিত থাকো। কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা বলব।'

'বলুন।'

'নতুন ব্যবসা শুরু করে যখনই দেখবে আর একজনের দায়িত্ব নিতে সক্ষম হয়েছ তখনই তুমি

সিমিকে অ্যাপ্রোচ করবে। এখন ওর ভাল বন্ধুর দরকার।'

'কিন্তু ওর বন্ধুরা তো আছে!'

'যে পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে সে আর পাহাড়ের চূড়ায় ফিরে আসে না। এ নিয়ে তুমি ভেবো না। তোমার কাজ তুমি করে যাও।'

ম্যাথুজ চলে গেল। মিস্টার ব্রাউন উঠলেন না। অন্যমনস্ক হয়ে তিনি নতুন গ্লাস ভর্তি করতেই কুঁই কুঁই শব্দ শুনতে পেলেন। মুখ তুলে দেখলেন, ভুটো একা নয়, সে তার বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কুকুরটি খুব ভিতু চোখে একবার তাকে আর একবার ভুটোর বীরদর্পে লেজ নাড়া দেখছে। চোখাচোখি হতে ভুটো অদ্ভুত আওয়াজ করল। তারপর ছুটে গিয়ে নিজের প্লেট টেনে নিয়ে এল সামনে। মিস্টার ব্রাউন আর এক টুকরো মাংস ঝুঁকে পড়ে প্লেটে রাখতেই ভুটো তার বান্ধবীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বান্ধবী খুব ভয়ে ভয়ে প্রায় ছোঁ মারার ভঙ্গিতে মাংসের টুকরো মুখে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে ভুটো তাকে অনুসরণ করল।

গ্লাস শেষ করার পর মিস্টার ব্রাউন উঠে যিশুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। যিশুর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে আচমকা সায়নের মুখ মনে পড়ে গেল তাঁর। যিশুকে যখন পেরেকে পুতে ক্রুশে আটকে রাখা হয়েছিল তখন তাঁর শরীরের সমস্ত রক্ত ঝরে পড়েছিল মাটিতে। প্রবল বেদনা সত্ত্বেও তাঁর মুখের আলো নিবে যায়নি। কিন্তু নীরক্ত যিশুর শরীর পরবর্তীকালে পৃথিবীর মানুষের শ্রদ্ধা ভালবাসায় ভরে গিয়েছিল। সায়নের শরীরে রক্ত নেই। রক্ত জমলেই তা দ্রুত তরল হয়ে বেরিয়ে আসছে। অথচ ওই ছেলেটি কী সহজে ম্যাথুজকে বলল, খুন করতে গেলে মানুষকে নির্মম হতে হয়। এই কথাটা তাঁর মনে একবারও আসেনি। তিনি শুধু প্রয়োজনের কথাই ভেবেছেন। ওই ছেলের মধ্যে যিশুর আশীর্বাদ প্রবলভাবে আছে। চোখ বন্ধ করলেন মিস্টার ব্রাউন। তারপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন, 'ওঁকে তুমি দীর্ঘজীবন দাও। তুমি ইচ্ছে করলে সব কিছু সম্ভব। তোমার পৃথিবীতে ওকে বড় প্রয়োজন।'

এই সময় দরজায় শব্দ হল। মিস্টার ব্রাউন চোখ মুছে দরজায় গেলেন। জোসেফ দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা খুব ভাল কাঠের মিস্ত্রি। জোসেফ বলল, 'মিস্টার রায়ের ফিউনারাল প্রসেশন আসছে। ফাদার আপনাকে খবর দিতে বললেন।'

সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল। শহর থেকে ফেরার সময় ভাবনাটা মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে পোশাক পাল্টে বেরিয়ে এলেন। জোসেফ তখনও দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা কত দূরে?'

'নীচ থেকে উঠে আসছে।'

মিস্টার ব্রাউন জোসেফের সঙ্গে নীচে নেমে এসে নিরাময়ের সামনে দাঁড়াতেই মিছিলটাকে দেখতে পেলেন। কফিন নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। শব্দহীন ওই মিছিলের প্রথমে ফাদার আসছেন। কফিনটাকে দেখা যাচ্ছে। শুধু মিছিলের মানুষেরা নয়, সমস্ত পৃথিবী, এমনকী পাহাড় পর্যন্ত কী নিঃসঙ্গ হয়ে রয়েছে! মাথা নিচু করে অপেক্ষায় ছিলেন মিস্টার ব্রাউন। মিছিল সামনে আসতেই তিনি যোগ দিতে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলেন নিরাময়ের গেট, ওপরের জানলায় উৎসুক মুখের ভিড়। হঠাৎ তিনি আকুল হয়ে সেই মুখ খুঁজতে লাগলেন। না, সায়ন নেই দর্শকের দলে। ধীরে ধীরে মিছিলটা নিরাময় পেরিয়ে গেল। মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে মিস্টার ব্রাউনের খুব কষ্ট হল। মিস্টার রায়ের জন্যে।

৯

তখন বিকেল। কিন্তু দুপুরের পর মেঘ জমতে শুরু হওয়ায় বিকেল এগিয়ে এসেছিল অনেক আগেই। সংসারের কাজ শেষ করে মিসেস অ্যান্টনি যখন বেরিয়েছিলেন তখন তাঁর ঘড়িতে বিকেল হলেও প্রকৃতি রাতের সাজ সাজতে চলেছে। যেদিন আকাশে মেঘ থাকে না সেদিন সন্ধে হবার আগে এই পাহাড়ে একটা জোরালো হাওয়া বয়ে যায়। গাছপালা কাঁপে, পাখিরা চেঁচায়। মেঘ জমলে সেই হাওয়ার পাত্তা পাওয়া যায় না।

মিসেস অ্যান্টনি যখনই বাইরে বের হন তখনই নিজের পোশাক সম্পর্কে সচেতন থাকেন। ধবধবে সাদা চওড়া পাড় শাড়ির ঘোমটা মাথায় ক্লিপ দিয়ে আঁটা থাকে তাঁর। চোখে চশমা। একটা বড় চামড়ার ব্যাগ বুকের কাছে চেপে ধরে মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এখন অর্থের অভাব জানান দিলেও তাঁর পোশাক এবং ভঙ্গির কোনও পরিবর্তন কেউ দেখেনি।

পিচের পথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি খাদের দিকে তাকালেন। বিশাল জায়গা জুড়ে কুয়াশা জমজমাট। চা-বাগান, নদী, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওখানে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে পৃথিবীর কেউ কি খুঁজে পাবে ? স্বামীর মুখ মনে পড়ল। মানুষটি ভাল ছিলেন। ওঁর নেপালি বন্ধুবান্ধবদের থেকে বেশ আলাদা। প্রায়ই বলতেন, আমি যদি ভানুভক্তের এক কণা ক্ষমতা পেতাম তা হলে কবিতা লিখতাম। মিসেস অ্যান্টনি উৎসাহ দিয়েও একটাও লাইন লেখাতে পারেননি। অথচ মুখে মুখে কবিতার লাইন বলতেন মানুষটা। সেই লাইনটা, যিশুর ছায়া এড়িয়ে চলেন ঈশ্বর কারণ নিজের জন্যে কিছুই রাখেননি তিনি, পৃথিবীকে ধনী করে নিঃস্বতা নিয়ে যিনি এসেছেন তাকে কতক্ষণ সহ্য করা যায় ?

মিসেস অ্যান্টনি চমকে উঠেছিলেন, 'এ কী কবিতা ? তুমি ঈশ্বরকে ছোট করছ ?'

মিস্টার অ্যান্টনি হাসলেন, 'সে কী ? এই পৃথিবীটা তো ঈশ্বরের। পৃথিবীকে ধনী করলে ঈশ্বরের তো লাভ।'

কীরকম উল্টোপাল্টা কথা। এই যে বিশাল জায়গা জুড়ে কুয়াশা চাপ চাপ বসে আছে, এইরকম এক বিকেলে তিনি বললেন, 'আমাদের হাড়ের কনকনানি নিয়ে তোরা বসে থাক পায়ের তলায়, এই শীতে নৃত্যনাট্য থেকে বাঁচা যায় তা হলে।'

লোকটার সব ভাল ছিল শুধু একটাই গোলমাল। ছেলের জন্যে খুব ভাবত দিন-রাত। বললেই বলত, আশ্চর্য ! আমার পূর্বপুরুষের রক্ত যাতে ঠিকঠাক থাকে সেটা নিয়ে ভাবব না। ওঁদের প্রতি আমার কর্তব্য নেই ?

সেই ছেলে যখন জোর করে আমেরিকায় গেল তখন বললেন, 'কী কাণ্ড ! আমি ভেবেছিলাম ওরা ওকে ভিসা দেবে না। একে যুবক তার ওপর অবিবাহিত। আমেরিকানরা এইরকম লোককে অ্যাটম বোমার চেয়ে বেশি ভয় পায়।' অথচ উনিই টাকা দিয়েছিলেন। দিয়ে ভেবেছিলেন ছেলে দিল্লি থেকে ফিরে আসবে। সেই ছেলে আর এল না। পৌঁছোনোর পর একটা দু লাইনের চিঠি এসেছিল। তার উত্তরে ষাট লাইনের চিঠি লিখেছিলেন মানুষটা। স্ত্রীকে দেখিয়েছিলেন। ছেলে কবে ফিরবে, কী কাজ করছে এ সব জানতে চাওয়ার পর লিখেছিলেন, 'তোমার পূর্বপুরুষের নাম জানা উচিত।'

সাত জন পূর্বপুরুষের নাম উল্লেখ করে লিখেছিলেন, 'এদের রক্ত তোমার শরীরে আছে। এঁরা প্রত্যেকে বিয়ে করেছেন বংশের নিয়ম এবং নীতি অনুসরণ করে। তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান। রিলে রেসে যেভাবে ব্যাটন নিয়ে যাওয়া হয় তোমার ওপর দায়িত্ব এই রক্তের পবিত্রতা রক্ষা করার। তুমি যে-দেশে গিয়েছ সে-দেশে এইডস-এর প্রকোপ খুব বেশি। তোমার রক্তে যেন ওই রোগের জীবাণু না প্রবেশ করে এ ব্যাপারে সচেতন থেকো।' চিঠি পড়ে মিসেস অ্যান্টনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এ সব কথা তুমি লিখলে ?'

তিনি বলেছিলেন, 'হিন্দুদের পৃথিবীকে কোনও এক বিখ্যাত সাপ মাথায় নিয়ে রয়ে গেছে অনন্তকাল। কিন্তু মানুষের রক্তে অজস্র সাপ কিলবিল করে প্রতিক্ষণ। শৃঙ্খলা না থাকলেই তারা

ছোবল মারবেই। ওকে সেটাই লিখলাম।'

মানুষটা কি বোকা ছিলেন ? আজ এতদিন পরে সেই পুরনো প্রশ্নটা মনে আসতেই মিসেস অ্যান্টনি মাথা নাড়লেন। না, মানুষটা ভাল ছিলেন, এইটুকুই যথেষ্ট।

মিসেস অ্যান্টনি সেইখানে পৌঁছোলেন যেখান থেকে পিচের রাস্তা ছেড়ে আর একটা পথ খাড়াই ওপরে উঠে গিয়েছে। জায়গাটায় এত গাছগাছালি যে পিচের রাস্তার যাত্রীরা বুঝতেই পারে না ওপরে একটা সুন্দর পাহাড়ি গ্রাম রয়েছে।

লোকজন নামছে দেখে অবাক হলেন মিসেস অ্যান্টনি। এই পথে এত মানুষ একসঙ্গে কোনও অনুষ্ঠান না থাকলে চলাফেরা করে না। বয়স্কদের পোশাক দেখে বুঝতে পারলেন ওরা কোথায় গিয়েছিল। মনে পড়ল মিস্টার রায় নামের এক ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন বলে গতকাল কেউ বলেছিল। মিস্টার রায়কে তিনি দেখেছেন, আলাপ ছিল না।

নিরাময়ের সামনে পৌঁছে একটু দাঁড়ালেন তিনি। কুয়াশা এ দিকের পাহাড়েও। তার কিছুটা রাস্তা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি ঠিক কী কথা বলবেন ভেবে আসেননি। দুপুরে শহর থেকে ফেরার সময় মিস্টার ব্রাউনের মুখে শোনার পর থেকেই তাঁর মনে অস্বস্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল। মিস্টার ব্রাউনকে সবাই শ্রদ্ধা করে। বাজে কথা বলার লোক তিনি নন। ছেলেটি সম্পর্কে এত বড় কথা যখন বলেছেন তখন তাকে একবার না-দেখে স্থির হতে পারছিলেন না তিনি। কিন্তু এখন সমস্যায় পড়েছেন। কী করে বলবেন ছেলেটিকে তিনি দেখতে চান।

'জি।'

মিসেস অ্যান্টনি দেখলেন একটি লোক নিরাময়ের গেটে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানকার কর্মচারী। তিনি এগিয়ে গেলেন, 'আচ্ছা, ভেতরে যাওয়া যাবে ?'

ছোটবাহাদুর জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন ?'

উত্তর খুঁজে না পেয়ে মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

'আসুন।'

ওকে অনুসরণ করে মিসেস অ্যান্টনি প্যাসেজের শেষে ভিজিটার্স রুমে গিয়ে পৌঁছোলেন। তাঁকে বসতে বলে ছোটবাহাদুর চলে গেল। ঘরটির দেওয়ালে বেশ কয়েকটা পোস্টার টাঙানো। রক্তদান করার জন্যে আবেদন। পৃথিবীর কত মানুষ রক্তহীনতায় মারা যাচ্ছে তার পরিসংখ্যান। সুস্থ মানুষের শরীরে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রক্ত রয়েছে। তার কিছুটা যদি কারও জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে তা হলে দাতার কোনও ক্ষতি হয় না।

ঘরের ভেতর আলো জ্বলছিল। এই সময় ডাক্তারবাবু ঢুকলেন। নমস্কার করে জানতে চাইলেন তিনি কী প্রয়োজনে লাগতে পারেন।

মিসেস অ্যান্টনি নিজের পরিচয় দিলেন, 'আমি ঝোরার পাশে থাকি। আমার স্বামী মারা গিয়েছেন। মিস্টার অ্যান্টনি প্রতিবছর নিয়ম করে রক্তদান করতেন। অন্যকে উৎসাহিত করতেন। আপনার পেশেন্টদের জন্যে রক্তের প্রয়োজন নিশ্চয়ই হয়। আমার রক্ত কাজে লাগাতে পারলে খুশি হব।'

ডাক্তারের মুখে হাসি ফুটল, 'খুব ভাল কথা। আপনি এইভাবে এগিয়ে এসেছেন বলে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না। কিন্তু নিরাময় আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আপনি আমার অফিসঘরে আসুন। আপনার রক্ত পরীক্ষা করে কোন গ্রুপ তা জেনে নিয়ে নাম ঠিকানা লিখে রাখব।'

মিসেস অ্যান্টনি ডাক্তারকে অনুসরণ করলেন। অফিসঘরে তাঁকে বসিয়ে ডাক্তার আঙুল থেকে দুফোঁটা রক্ত পরীক্ষার জন্যে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। মিনিট কয়েক বাদে ফিরে এসে বললেন, 'আপনার রক্ত ও গ্রুপের। খুব ভাল হল।' তারপর খাতা খুলে নাম ঠিকানা জেনে লিখে রাখলেন।

মানুষটিকে ভাল লাগল মিসেস অ্যান্টনির। যে- উদ্দেশ্যে এসেছেন সেটা এখন মনে সক্রিয় ছিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই সব কাজ আপনি একা করেন ?'

ডাক্তার বললেন, 'প্রথমে এক ভদ্রলোককে রেখেছিলাম। কিন্তু তিনি নিয়মমাফিক চাকরি করতে

চয়েছিলেন। তাঁর পোষাল না। তা ছাড়া আমার পক্ষে তাঁকে মাইনে দিতে অসুবিধে হচ্ছিল।'

'আপনার ওপর চাপ পড়ছে না ?'

'অস্বীকার করব না। পড়ছে। কিন্তু একটা লোককে দুহাজার টাকা মাইনে না দিয়ে সেই টাকায় যদি আমার ছেলেদের ভাল খাবার দিতে পারি তাহলে এই চাপ মেনে নিতে আপত্তি নেই।' ডাক্তার হাসলেন, 'চা খাবেন ?'

'না।' মাথা নাড়লেন মিসেস অ্যান্টনি। একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তাঁকে।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবেন ?'

'আপনার পেশেন্টদের আমি একবার দেখতে পারি ?' মুখ তুললেন তিনি।

ডাক্তার ইতস্তত করলেন, 'সাধারণত আমি ওদের ওখানে ভিজিটার্সদের নিয়ে যেতে চাই না। ওরা তো দ্রষ্টব্য বস্তু বা প্রাণী নয়।'

'না, আমি সেইরকমভাবে দেখার কথা বলছি না। শুনেছি এদের বয়স খুব অল্প। আমিও একসময় সন্তানের মা ছিলাম— !' থমকে গেলেন মিসেস অ্যান্টনি।

'ছিলেন মানে ? আপনার সন্তান জীবিত নেই ?'

'আমার কাছে নেই। থাক, ওকথা। আচ্ছা, আমি চলি।' উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। ডাক্তার একবার তাকালেন। তারপর বললেন, 'দাঁড়ান। ঠিক আছে, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।' ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেলেন।

'যদি কোনও অসুবিধে থাকে, আমি নিশ্চয় ভাঙতে চাই না।'

ডাক্তার হাসলেন। তারপর মাথা নেড়ে অনুসরণ করতে বললেন।

এক অদ্ভুত জগৎ। আট থেকে পনেরো বছরের বাচ্চাগুলো ক্যারাম খেলছে, বই পড়ছে, কেউ বা রেডিও শুনছে। আপাত চোখে কাউকেই অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু মিসেস অ্যান্টনি লক্ষ করলেন ওদের উচ্ছলতা যেন স্বাভাবিক নয়। মুখ চোখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। ডাক্তার আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন প্রতিটি ঘরে গিয়ে। এদের মধ্যে কেউ কি সায়ন ? জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছেটাকে প্রবলভাবে দমিয়ে রাখছিলেন তিনি। মিস্টার ব্রাউন বলেছেন, ওর কাছাকাছি গেলে বোঝা যায় যিশুর আশীর্বাদ ও পেয়েছে। কথাটা যদি মিথ্যে না হয় তাহলে তো দেখামাত্রই তিনি অনুভব করবেন।

একটি বাচ্চা ছেলে এগিয়ে এল, 'তুমি কে ?'

'আমি ? আমি তোমার মাসি !' ইচ্ছে করেই বাংলা শব্দটিকে ব্যবহার করলেন তিনি। ছেলেটি তার হাত ধরল, 'সত্যি ? তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে ?'

ডাক্তার ছেলেটির চুলে আঙুল বোলালেন, 'বাবা, ওঁর তো অনেক কাজ আছে, নিজের বাড়ি আছে এখানে, সেসব ছেড়ে তোমাদের সঙ্গে থাকবেন কি করে ? তবে হ্যাঁ, আমি ওঁকে বলব সময় পেলেই এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যেতে।'

বারান্দায় বেরিয়ে এসে মিসেস অ্যান্টনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই বাচ্চাটারও কি— ?'

'হ্যাঁ। তবে ভগবানের অশেষ করুণা যে ওর শরীর রেসপন্স করছে। কিন্তু এই যে ছেলেটি একে নিয়ে আমি খুব চিন্তায় পড়েছি। ওর বাবা-মাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে।' একটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বললেন।

'ওর নাম কী ?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস অ্যান্টনি।

'অম্লান। দুদিন আগে ওর হেমারেজ হয়েছিল। সেই রক্ত বন্ধ হয়েছে। কিন্তু আমার আশংকা রক্ত ওর পেটেও পড়েছিল। খুব সামান্য, এইটেই রক্ষা। সেটা এখন দলা পাকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। সেই দলাটা ওর পায়খানা পরিষ্কার হতে দিচ্ছে না। ইমিডিয়েটলি অপারেশন করে ওটাকে বের করা দরকার।'

'অপারেশন কোথায় হবে ?'

'আমার এখানেই ব্যবস্থা আছে। তখন আমি লোক্যাল নার্স এবং অ্যানাসথেসিস্ট-এর সাহায্য ই। মুশকিল হল ওর হেমোগ্লোবিন এত কম যে বাবা-মায়ের অনুমতি ছাড়া অপারেশন করতে

আমি সাহস পাচ্ছি না। আসুন।'

ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। সেখানে একটি ছেলে শুয়ে আছে। পাশের বিছানা খালি। ডাক্তার হেসে বললেন, 'কেমন আছ অম্লান ?'

'পেটে ব্যথা।'

ডাক্তার পেট দেখলেন। একটু ফুলেছে। তারপর বললেন, 'আজ তো তোমার পায়খানা হয়েছে। দুদিন রেস্ট নাও। সব ঠিক হয়ে যাবে। এই মাসির সঙ্গে আলাপ করো।'

মিসেস অ্যান্টনি বিছানার পাশে এগিয়ে গেলেন। প্রায় সাদা দেখাচ্ছে বাচ্চাটাকে। কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা ?'

ছেলেটি বলল, 'হুঁ। মা কবে আসবে ?'

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'উনি নিশ্চয়ই রওনা হয়েছেন। তোমাব পেটে কষ্ট হচ্ছে শুনে উনি কি না এসে পারেন ? ডাক্তারবাবু বললেন সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি একটু সহ্য করো বাবা !'

'আমি আর পারছি না। কতদিন স্কুলে যাইনি। আমার বন্ধুরা আর চিঠি দেয় না।'

'যখন ভাল হয়ে যাবে তখন ওদের খুব বোকো।'

ডাক্তার বললেন, 'আমি একটু পরে আবার আসছি অম্লান। আসুন মিসেস অ্যান্টনি।' বাইরে বেরিয়ে এসে মিসেস অ্যান্টনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও বাঁচবে তো ?'

ডাক্তার বললেন, 'চেষ্টা করতেই হবে। তবে সব কিছু ওর বিরুদ্ধে যাচ্ছে।'

হঠাৎ শব্দ করে কেঁদে ফেললেন মিসেস অ্যান্টনি। তাঁর শরীর কাঁপছিল, চোখে আঁচল।

ডাক্তার কড়া গলায় বললেন, 'স্টপ ইট। আমি ওদের কান্নার শব্দ শোনাতে চাই না।'

মুহূর্তে স্থির হয়ে গেলেন মিসেস অ্যান্টনি। একটু সময় নিয়ে চোখ মুছে বললেন, 'আমি দুঃখিত, আর এমন হবে না।'

হাঁটতে শুরু করে ডাক্তার বললেন, 'আমরা যদি ভেঙে পড়ি তাহলে এরা কী করবে ?'

মিসেস অ্যান্টনি দেখলেন একটি তরুণ বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল, 'ঠিক আছি।'। ডাক্তার বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি বাইরে যাওয়ার জন্যে ছটফট করছ। কিন্তু আরও দুদিন যাক। ওহো, তোমার মা-বাবার আসার কথা ছিল না ?'

'হ্যাঁ। তাইতো জানতাম।'

'খুব ধমকে দিয়ে চিঠি লিখে ফ্যালো। আলাপ করিয়ে দিই, ইনি মিসেস অ্যান্টনি। শহরে যাওয়ার পথে একটা ঝোরা পড়ে, তার কাছে থাকেন। ইনি নিজে এসে বলেছেন ব্লাড ডোনেট করতে চান।'

'থ্যাঙ্ক ইউ মিসেস অ্যান্টনি। আপনি খুব ভাল মানুষ।' সায়ন হাসল।

ডাক্তার বললেন, 'এর নাম সায়ন।'

'আপনি বলার আগে বুঝতে পেরেছি।' মিসেস অ্যান্টনি একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

'কী করে ? আপনি কি আমাকে আগে দেখেছেন ?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল।

'না দেখিনি। তবে শুনেছি। মিস্টার ব্রাউন বলেছেন।'

'ও। উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

ডাক্তারের মনে পড়ল, 'বলতে ভুলে গিয়েছি, তুমি যখন খুব অসুস্থ ছিলে তখন মিস্টার ব্রাউন এসে খোঁজখবর নিয়েছেন !'

ডাক্তার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'আমি একটু ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

ডাক্তার তাকালেন। তারপর বললেন, 'স্বচ্ছন্দে।'

ডাক্তার বেরিয়ে গেলে মিসেস অ্যান্টনি ঘরে ঢুকতেই সায়ন চেয়ার এগিয়ে দিল। মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'আহা, তুমি কেন করছ। তুমি বোসো।'

সায়ন বসলে মিসেস অ্যান্টনি চেয়ারে বসে তাকালেন, 'এই জায়গাটাকে কেমন লাগছে ?'

'খুব ভাল। এখানকার মানুষরা খুব ভাল। আচ্ছা, আপনার বাড়ি কি অনেক দূরে ?'

'না। তবে বেশ ওঠানামা করতে হয়।'

'এখানে আসার পর আমি ওই দিকে যাইনি।'

'ডাক্তারবাবু অনুমতি দিলে তোমাকে নিয়ে যাব। আমি তো একা থাকি।'

'আপনি একা থাকেন?'

'হ্যাঁ। আমার স্বামী মারা গিয়েছেন।'

'একা থাকতে নিশ্চয়ই ভাল লাগে না?'

'কার লাগে বলো?'

'লাগে। মিস্টার ব্রাউনকে আপনি চেনেন? ও। উনি কিন্তু একা ভালই আছেন। সবসময় যিশুর কথা ভাবেন বলে বোধহয় সঙ্গীর অভাব টের পান না।'

'তার মানে তুমি বলছ যিশুর কথা ভাবলে একাকিত্ব চলে যায়?'

'আপনি যাকে ভালবাসেন তার কথা ভাবলেই দেখবেন সময় কেটে যায়। এই যে আমি এখানে আছি, আমি সবসময় মায়ের কথা ভাবি।'

'কষ্ট হয় না?'

'হয়। তবে মনে হয় মা-ও তো আমার কথা ভাবছে।'

'যিশু যে আমার কথা ভাববেন তা বুঝব কী করে?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে, ধরুন, খুব ভাল গান শুনলে মনে আনন্দ হয়। খুব সুন্দর সকাল এলে মন ভাল হয়ে যায়। তেমনি আপনি যদি কোনও মহামানুষের কথা ভাবেন, তাঁর বাণী পড়েন আর তা পড়ে যদি আনন্দ হয় তাহলে দেখবেন আর একা বলে মনে হচ্ছে না।' সায়ন হাসল। এই প্রৌঢ়ার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছিল তার।

'কিন্তু আমার যে উল্টোটা হয়।'

'কীরকম?'

'কোনও ভাল গান শুনলে বা সুন্দর দৃশ্য দেখলেই মনে হয় আর কাউকে ডেকে আনি। তারও আমার মতো ভাল লাগুক।'

'আপনার মন খুব ভাল তাই এরকম ভাবেন।' বলতে বলতে সায়ন চোখ ছোট করল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনার কনুই-এর কাছে কী হয়েছে?'

'ও কিছু নয়।' মিসেস অ্যান্টনি আঁচলে হাত আড়াল করলেন।

'কিন্তু— !'

'এটা এক ধরনের অ্যাল্যার্জি।'

'ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'না—, সেরে যাবে।'

সায়ন উঠল। তার টেবিলের ওপর রাখা একটা বাক্স খুলে কিছু খুঁজল। তারপর বলল, 'এইটে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। আঁচলটা সরান।'

'কী আশ্চর্য!' মিসেস অ্যান্টনি অস্বস্তিতে পড়লেন।

'বাঃ। অসুখ হলে তার চিকিৎসা করানো উচিত। এই মলমটা কয়েকবার লাগালে ওটা মিলিয়ে যাবে। আঁচলটা সরান।'

আপত্তি টিকল না। আঁচল সরাতে সায়ন টিউব থেকে সাদা মলম বের করে মিসেস অ্যান্টনির কনুই-এর পাশে লাগিয়ে দিল। আঙুলের স্পর্শ পেতেই ভদ্রমহিলা চোখ বন্ধ করলেন। তার মনে হচ্ছিল, মলম নয়, ওই আঙুলের স্পর্শ তার সমস্ত ক্ষত সারিয়ে দিচ্ছে।

'এই মলমটা আপনি রেখে দিন।'

'কী আশ্চর্য! এটা তোমার জিনিস, আমি নেব কেন?'

'আমার তো কোনও কাজে লাগছে না। কলকাতা থেকে আসার সময় মা সবরকম ওষুধ ওই প্যাকেটে দিয়েছিল। আপনার অ্যালার্জি সেরে গেলে না হয় আমাকে দিয়ে যাবেন।' সায়ন বলল।

'তুমি হাতটা ধুয়ে নাও।'

'ঠিক বলেছেন। আমার শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম।' ঘরের মধ্যে রাখা একটা বালতি

থেকে জল নিয়ে হাতে সাবান মেখে বেডপ্যানের মধ্যে হাতধোওয়া জল ফেলল সে।

এই সময় বড়বাহাদুর দরজায় এসে দাঁড়াল, 'ডাক্তারসাহেব ডাকছেন।'

মিসেস অ্যান্টনি উঠে দাঁড়ালেন, 'আচ্ছা সায়ন, তুমি কি খ্রিস্টান?'

'না তো! আমি হিন্দু। কথাটা ঠিক বললাম না। আমার বাবা-মা হিন্দু তাই ওদের ধর্মই আমার ধর্ম। কেন বলুন তো?'

'তুমি তোমাদের যে ভগবান, দুর্গা কালী শিবকে পুজো কর?'

সায়ন হাসল, 'আমার মা করেন। আমি তাঁর বিশ্বাসকে অমর্যাদা করি না। আমি বিবেকানন্দের ভক্ত। তাঁর কথাই আমার মন্ত্র।'

'বিবেকানন্দ? ও হ্যাঁ, কিন্তু তিনি তো ভগবান নন!'

'ভগবান মানে কী?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল।

বড়বাহাদুর বলল, 'আপনি আর কথা বলবেন না, ডাক্তারবাবু রাগ করবেন।'

সায়ন হাসল, 'আপনার সঙ্গে পরে এ বিষয়ে কথা বলব। কেমন?'

'নিশ্চয়ই।' মিসেস অ্যান্টনি সায়নের সামনে এগিয়ে গেলেন, 'তুমি আমার ছেলের থেকেও ছোট। তোমাকে একটু স্পর্শ করছি।' তিনি তাঁর ডান হাত সায়নের বুকে রাখলেন। তারপর বড়বাহাদুরকে পেছনে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হনহন করে হেঁটে নীচে নেমে অফিসঘরে পৌঁছে দেখলেন ডাক্তার কিছু লিখছেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে ডাক্তার বললেন, 'আমি খুব দুঃখিত মিসেস অ্যান্টনি। আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম কারণ এখন সায়নের এত বেশি কথা বলা উচিত নয়। কদিন আগে ওর ব্লিডিং হয়েছিল। তা ছাড়া সন্ধে হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ি পথে আপনাকে যেতে হবে।'

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'আমি কি বসতে পারি?'

ডাক্তার অবাক হলেন, 'অবশ্যই।'

মিসেস অ্যান্টনি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। আবার ব্যাগ বন্ধ করলেন। তারপর সরাসরি ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা আবেদন আছে।'

'বলুন।'

'আমি এই নিরাময়ের কর্মী হতে চাই।'

ডাক্তারের কপালে ভাঁজ পড়ল। কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন তিনি, 'আপনি যদি একটু বিশদে বলেন তা হলে বুঝতে সুবিধে হবে।'

'আমার যেটুকু পড়াশুনা আছে তাতে আপনার অফিসের কাজ ঠিকঠাক চালিয়ে নিতে পারব বলে আশা করি। আপনি আমাকে সুযোগ দেবেন?'

ডাক্তার হাসলেন, 'সরি, মিসেস অ্যান্টনি। নিরাময়ের পক্ষে এক হাজার টাকার বেশি এই কাজের জন্যে কাউকে মাইনে দেবার সঙ্গতি নেই। আর ওই টাকা কাউকে অফার করা সম্ভব নয় বলে—।'

মিসেস অ্যান্টনি হাত তুলতেই ডাক্তার থামলেন। মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'আমি হাজার টাকাতেই এই কাজ করতে রাজি।'

'আপনি কি ভেবে চিন্তে বলছেন?' ডাক্তার বিস্মিত।

'হ্যাঁ। আমি খুব একা। একমাত্র ছেলে বেঁচে থাকলেও আমার কাছে মৃত। আমার স্বামী যে টাকা রেখে গেছেন, তা খুবই সামান্য, তার সঙ্গে এই এক হাজার পেলে খাওয়া-পরার কোনও অসুবিধে হবে না। কিন্তু আপনার নিরাময়ের এই বাচ্চাদের একটুও উপকারে যদি আসি তা হলে বাকি জীবনটায় বেঁচে থাকতে আমার ভাল লাগবে।' মিসেস অ্যান্টনি আন্তরিকভাবে কথাগুলো বললেন।

ডাক্তার এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কবে থেকে জয়েন করতে চান?'

'আগামীকাল থেকে।'

'বেশ। তাই হবে। আপনি আগামীকাল সকাল দশটায় আসবেন। আমি আপনাকে কী করতে হবে তা বুঝিয়ে দেব।'

মিসেস অ্যান্টনি উঠে দাঁড়াতেই ছোটবাহাদুর দরজায় এসে দাঁড়াল, 'সাহেব, একটা গাড়ি এসেছে। ট্যাক্সি।'

'কে এসেছে?'

'বলল, ওদের ছেলে এখানে থাকে। কিন্তু আমি বললাম এখন দেখা করার নিয়ম নেই।'

'ছেলেটির নাম কী?'

'আমি জিজ্ঞাসা করিনি।'

'ওঁদের নিয়ে এসো।'

ছোটবাহাদুর বেরিয়ে গেলে ডাক্তার বললেন, 'মিসেস অ্যান্টনি, আপনি, যদি সম্ভব হয়, আর একটু অপেক্ষা করে যান।'

'আমার কোনও তাড়া নেই ডাক্তার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। আপনার সঙ্গে আমি লোক দিয়ে দেব। এই অন্ধকারে আপনাকে একা যেতে হবে না।'

ছোটবাহাদুরের সঙ্গে যে দুজন ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা অফিসঘরে এলেন তাঁদের দেখে অবাক হয়ে গেলেন ডাক্তার। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আরে আপনারা? এইসময় কীভাবে এলেন?'

'শিলিগুড়ি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি।' ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'অম্লান কেমন আছে? ওর অবস্থা কী খুলে বলুন।'

'আপনারা আগে বসুন।' ছোটবাহাদুরকে ডাক্তার বললেন চা আনার জন্যে।

ভদ্রলোক হাত তুলে বললেন, 'না। আমরা এখানে চা খেতে আসিনি। আপনার টেলিগ্রামে লিখেছেন কন্ডিশন ক্রিটিক্যাল, সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার জন্যে আমাদের এখানে আসা দরকার। আগে ওর কথা শুনতে চাই।'

এবার ভদ্রমহিলা বললেন, 'আগে আমি আমার ছেলেকে দেখতে চাই।'

ডাক্তার বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখবেন। যদিও এখন তার সময় নয় তবু স্পেশাল কেস হিসেবে আমি আপনাকে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, আমি আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম কারণ ফোনে কলকাতার লাইন পাওয়া খুব মুশকিল ব্যাপার। অম্লান এখানে এসেছে ছয় মাস আগে। ধীরে ধীরে ও বেশ ইমপ্রুভ করছিল। এক্ষেত্রে নর্মাল আচরণকেই আমরা ইমপ্রুভমেন্ট বলে থাকি। হঠাৎ কয়েকদিন আগে ওর ব্লিডিং হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্তরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। রক্ত দেওয়ার পর ও কিছুটা সুস্থ হয়, কিন্তু কমপ্লেন করতে থাকে পেটে ব্যথা হচ্ছে। যে-পরিমাণ স্টুল হওয়া দরকার তার খুব অল্পই হচ্ছে এবং সেটা পারগেটিভ দিলে। ওর এক্সরে প্লেট বের করে আলো জ্বাললেন, 'দেখুন, একটা ডেলা মতন বস্তু ওর পেটে আটকে আছে। এইটেই ওর স্টুলকে স্বাভাবিকভাবে বের হতে দিচ্ছে না।'

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কী? টিউমার?'

'না। রাতারাতি এই সাইজের টিউমার হতে পারে না।' ডাক্তার প্লেটটাকে বড় খামে ঢুকিয়ে রাখলেন, 'যখন হেমারেজ হয়েছিল তখন নাক এবং কান ছাড়া পেটেও তা পড়ে। এবং সেই রক্ত জমে গিয়ে ওই চেহারা নিয়েছে। যেহেতু ওর আকার বেশ বড় তাই স্টুলের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারছে না। যে-কোনও মুহূর্তে ওটা যদি বৃহদন্ত্রের মুখে চলে আসে তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওর স্টুল একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে এবং পেট ফুলে উঠবে। সেই অবস্থা আমাদের কাম্য নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা চিৎকার করে উঠলেন, 'তার মানে ও বাঁচবে না?'

'ম্যাডাম, এই কথাটা একেবারেই মাথায় আনবেন না।'

'আপনি তো তাই বলছেন।' ভদ্রমহিলা স্বামীর দিকে ফিরলেন, 'কী লাভ হল ওকে এখানে পাঠিয়ে? তোমাকে আমি পইপই করে বলেছিলাম ও আমার কাছ থাক, আমি ওর সেবা করব। তুমি শুনলে না। এত টাকা খরচ করছ ছেলে মেরে ফেলবে বলে? ও, ভগবান!' ভদ্রমহিলা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

এবার ভদ্রলোক বললেন, 'ডক্টর, আমার ছেলের অসুখের ব্যাপারটা আমি জানি। ডক্টর দত্ত বলেছিলেন আপনার এখানে থাকলে ওর উপকার হবে। ওকে যখন নিয়ে এসেছিলাম তখন আপনি আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন, ওর যা কন্ডিশন বেশ কয়েক বছরের মধ্যে ভয়ের কিছু হবে না। কিন্তু এ আপনি কী করলেন?'

ডাক্তার বললেন, 'এটা নিছকই দুর্ঘটনা। আগে থেকে এর আন্দাজ পাওয়া কি যায়? তা ছাড়া

আপনারা এত আপসেট হচ্ছেন কেন? ও তো ভাল হয়ে যাবে।'

'ভাল হয়ে যাবে?' ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসলেন।

'নিশ্চয়ই। একটা ছোট অপারেশন করা দরকার। ওই বস্তুটিকে বের করে নিলে ওর কোনও সমস্যা থাকবে না। আমি সেই জন্যেই আপনাদের ডেকেছি। গোলমাল হল, আপনারা জানেন ওর রক্তে হিমোগ্লোবিন কম। আমি চেষ্টা করি যাতে মিনিমাম নর্মাল পয়েন্টে ওটাকে রাখা যায়। এ লড়াই-এ কখনও হারি, কখনও জিতি। এরকম অবস্থায় অপারেশন করা বেশ ঝুঁকির কাজ। প্রচুর রক্ত দরকার এবং পোস্ট-অপারেশন পিরিয়ডের অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা টেনশনে থাকতে হবে। কিন্তু এখন ওই অপারেশন করা ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা খোলা নেই।'

'আপনি বললেন ও বেঁচে যাবে!'

'হ্যাঁ। ওকে বাঁচাতে গেলে এই ঝুঁকিটা নিতে হবে। আমি অপারেশন করব আপনাদের লিখিত অনুমতি পেলেই। রক্তের জন্যে আপনাদের চিন্তা করতে হবে না।'

ডাক্তার কথাগুলো বলামাত্র ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'না, কক্ষনও না। এইরকম গেঁয়ো পাহাড়ি জায়গায় আমার ছেলের অপারেশন আমি কিছুতেই করাব না। কোনও আধুনিক ব্যবস্থা আছে এখানে? আমরা ওকে এখনই কলকাতায় নিয়ে যাব।'

'এখনই কলকাতায় নিয়ে যাবেন?' ডাক্তারের মুখে ছায়া ঘনাল।

'হ্যাঁ। আমরা ওকে নিয়ে এখনই শিলিগুড়ি চলে যাব। কাল ওখান থেকে প্লেন ধরব।'

'আপনারা আমার ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না?'

'না। আর নয়। নিয়ে আসুন ওকে।' ভদ্রমহিলা রীতিমতো উত্তেজিত।

এবার ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর শরীরের কন্ডিশন কীরকম? নিয়ে যাওয়া যাবে?'

'মনে হয় অসুবিধে হবে না।'

'তা হলে নিয়ে আসুন। বুঝতেই পারছেন, আমরা ভাল জায়গায় অপারেশন করাতে চাইব যাতে কোনও বিপদ না ঘটে।' ভদ্রলোকের গলার স্বর একটু নরম।

এবার দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন, 'আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। আজকাল স্টোন রে দিয়ে গলিয়ে দেওয়া জলভাত হয়ে গেছে। পেট কেটে অপারেশন না করে ওই অবস্ট্যাকল গলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এতে কোনও ঝুঁকি থাকবে না। আর সেই জন্যে কলকাতায় যাওয়া ওর প্রয়োজন।'

অম্লানের বাবা চমকে তাকালেন, 'এটা সম্ভব?'

'আমার তো তাই মনে হয়। কলকাতায় আমার পরিচিত ডাক্তার আছেন যিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। আপনি একদম চিন্তা করবেন না।'

ডাক্তার বললেন, 'আপনারা নিয়ে যেতে চাইলে আমার কিছু বলার নেই। তবে এই রাত্রে, ওয়েদারও ভাল নয়, এখন না গিয়ে কাল সকালে গেলে স্বচ্ছন্দে প্লেন ধরতে পারবেন। আপনার আজ রাত্রে এখানে থাকুন না।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'না। আমরা আজই যাব। শিলিগুড়ি বড় শহর। ওখানে আমার দিদি থাকেন। তেমন কিছু হলে তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাওয়া যাবে।'

মিসেস অ্যান্টনি চুপচাপ শুনছিলেন। তাঁর যদিও মনে হচ্ছিল উত্তেজিত হওয়া সত্ত্বেও এঁরা যা বলছেন তার মধ্যে যুক্তি আছে কিন্তু ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর খারাপ লাগছিল। ভদ্রলোককে যেন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। এর মধ্যে কথা বলা তাঁর পক্ষে শোভন নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে উঠে বাড়ি ফিরে যেতেও তিনি পারছেন না। রাত নামলেও তিনি অপেক্ষা করবেন বলে ঠিক করলেন।

ডাক্তার বললেন, 'আপনারা এই ফর্মে সই করুন। কোনও পেশেন্টকে নিয়ে যেতে হলে গার্জেনকে সইটা করতে হয়।'

ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে সই করে দিলে ডাক্তার উঠে পড়লেন। কোনও কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর যাওয়া দেখলেন সবাই, কেউ কথা বললেন না। শুধু ভদ্রমহিলা এমনভাবে আঁচল টানলেন যে মনে হল তিনি যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন। মিসেস অ্যান্টনি কিছুক্ষণ দেখলেন

এঁদের। তারপর কথা না বলে পারলেন না, 'ভাই, আজ আমি আপনাদের ছেলের সঙ্গে কথা বলেছি। ও খুব ভাল ছেলে। আপনারা তো ওর বাবা-মা, সবচেয়ে বেশি আপনজন, ওকে একটু কষ্ট কম দিন না।'

দ্বিতীয় ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি?'

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন মিসেস অ্যান্টনি, 'আমি কেউ নই এখানকার। কাছেই থাকি। নিজের দরকারে এসেছিলাম। আপনার যা বলছেন তাতে যুক্তি আছে। কিন্তু অম্লানকে যদি কাল এখান থেকে নিয়ে যান তা হলে বিকেলের মধ্যে কলকাতার ডাক্তার ওকে দেখতে পারে। এ সময় ওকে নাড়াচাড়া যত কম করা যায় তত ভাল।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন, 'ওঁর কথায় যুক্তি আছে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি এই মৃত্যুকূপে ওকে আর এক মিনিটও রাখতে চাই না। অনেক শিক্ষা হয়ে গেছে, আর নয়।'

'মৃত্যুকূপ?' মিসেস অ্যান্টনি শিউরে উঠলেন।

'নয়তো কী?'

'আপনি খুব ভুল কথা বলছেন বোন। যাক গে, আপনাকে অনুরোধ ডাক্তারবাবুর সামনে ওই কথা উচ্চারণ করবেন না। ওঁকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি।'

'আমরা মানে?'

'এই পাহাড়ের মানুষরা।'

ভদ্রমহিলা স্বামীর দিকে তাকিয়ে কাঁধ নাচালেন, 'দেখলে তো। উনি পাহাড়িদের হাত করে কেমন ব্যবসা করছেন!'

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন, 'আহ, দিদি!'

'চুপ কর। এত জায়গা থাকতে এখানে স্যানেটারিয়াম করেছেন কেন? কারণ এখানকার লোকজন অশিক্ষিত, যা বোঝাবে তাই বুঝবে।'

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'এই অশিক্ষিত লোকরা কিন্তু একটা কাণ্ড করেছে। সংগ্রাম করে নিজেদের অধিকার অনেকটা আদায় করতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলার একজন মিউনিসিপ্যাল চেয়্যারম্যান মিস্টার ঘিসিং-এর মতো ক্ষমতা পেয়েছে বলুন? পশ্চিমবঙ্গের অনেক মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন না, কিন্তু উনি পারেন। আমরা কিন্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই রয়েছি। আপনাকে অনুরোধ এসব কথা উচ্চারণ করবেন না, সাধারণ মানুষ শুনতে পেলে পাহাড় ছেড়ে যাওয়া আপনাদের পক্ষে একটু অসুবিধে হবে।'

ভদ্রমহিলার স্বামী বললেন, 'আপনি কিছু মনে করবেন না। ছেলের চিন্তায় ওর মাথার ঠিক নেই, কী বলতে কী বলে ফেলেছে!'

'আমি ঠিকই বলেছি। নেপালিরা ভাল যুদ্ধ করে, দারোয়ান হয় আর রাঁধে। এর বেশি আমি কোনওদিন শুনিনি।'

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'আপনি বাঙালি, তাই তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'আজ থেকে আটশো বছর আগে বাঙালি বলে কোনও জাতি ছিল না। তিনশো বছর আগে আপনার বাংলায় কেউ লিখত না। আর পৃথিবীর চোখে এখন বাংলা বাংলাদেশিদের মাতৃভাষা, জাতীয়ভাষা, আপনাদের নয়। এ প্রসঙ্গ থাক, আপনারা যদি আজ এখানে থাকেন তা হলে ডাক্তারবাবুকে নিষেধ করতে হয়। নইলে উনি অম্লানকে নামিয়ে আনবেন।' মিসেস অ্যান্টনি উঠে দাঁড়ালেন।

এবার ভদ্রমহিলার স্বামী বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা কাল সকালেই ওকে নিয়ে যাব। ডাক্তারবাবুকে কি এটা বলা যেতে পারে?'

মিসেস অ্যান্টনি বাইরে বেরিয়ে ছোটবাহাদুরকে দেখে খবরটা দিতে বললেন। ছোটবাহাদুর ছুটল। কয়েক মিনিট বাদে ডাক্তারবাবু নেমে এলেন। এসে বললেন, 'আপনারা সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করেছেন বলে

খুব ভাল হল। আজ অম্লান এখান থেকে যেতে চাইছে না। আপনারা ইচ্ছে হলে দেখা করে আসতে পারেন।'

ছোটবাহাদুর ওঁদের ওপরে নিয়ে গেল।

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'আমি যাই।'

'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনার অনেক দেরি হয়ে গেল।' ডাক্তার গলা তুললেন, 'বড়বাহাদুর। এদিকে এসো।'

'ও থাক না।'

'না। ও আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

বড়বাহাদুরের আসার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে মিসেস অ্যান্টনি না বলে পারলেন না, 'ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেবেন না ডাক্তার।'

'কোন ব্যাপারটা?'

'অম্লানের—।'

'ও। দেখুন, ওঁদের ছেলে ওঁরা নিয়ে যাবেন এতে আমার আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু ওরা এইভাবে চলে গেলে আমি হেরে যাই। এতগুলো যুদ্ধ আমি একসঙ্গে লড়ছি। আমি তো চাইব প্রতিটি যুদ্ধে জিতব। ভগবান যদি আমাকে হারান তা হলে মন খারাপ হবে, কিন্তু গ্লানি আসবে না। কিন্তু এঁরা তো আমাকে লড়াই করার সুযোগ দিলেন না। ওই যে, ও এসে গিয়েছে। বড়বাহাদুর, তুমি এঁকে এঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। টর্চ নিয়ে যেয়ো। তা হলে ওই কথা রইল মিসেস অ্যান্টনি, কাল থেকে আপনার সাহায্য নিরাময় পাচ্ছে!'

'আমি সকালেই চলে আসব।' মিসেস অ্যান্টনি বড়বাহাদুরের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধেবেলা থেকে একটু বেশি পান করায় মিস্টার ব্রাউনের সামান্য নেশা হয়েছিল। সন্ধে থেকে ভেবেছেন নিজের জন্যে কিছু খাবার বানিয়ে নেবেন কিন্তু উঠব উঠব করেও টিভির সামনে থেকে উঠতে ইচ্ছে হয়নি। এখন ঠিক করলেন আর খাওয়ার ঝামেলা করবেন না, দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বেন। বেচারা ভুটোর আজ রাত্রে খাওয়া জুটবে না। তখনই মনে পড়ল, ফ্রিজে সকালের মাংসটা পড়ে আছে। কিন্তু ওটা গরম করতে ইচ্ছে করছে না। ভুটো যদি ঠাণ্ডা মাংস খায়, তো খাক। এই সময় বাইরের লোহার গেট খোলার আওয়াজ হল। তারপর দরজাটা শব্দ করল। মিস্টার ব্রাউন তাকিয়ে দেখলেন সিমি ঢুকছে খাবার নিয়ে।

সিমি জিজ্ঞাসা করল, 'রান্না হয়নি তো?'

'ইচ্ছে করছে না।'

'সেটা জানতাম। এতটা মদ সাবাড় না করলে তো চলছিল না। কেন, নতুন মদের সঙ্গী আর একটু থাকল না? তা হলে তো এই রাত্রে নেশা হত না। মা দিয়েছে, দয়া করে খেয়ে নেওয়া হোক।'

সিমিই ডাইনিং টেবিলে সব সাজিয়ে দিল । মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'তুই খুব ভাল মেয়ে। আর জন্মে নিশ্চয়ই আমার কেউ ছিলি।'

'বাব্বা। হঠাৎ? একটা কাণ্ড হয়েছে।'

'কী কাণ্ড?' খেতে শুরু করলেন মিস্টার ব্রাউন।

'আজ সন্ধের পরে মিসেস অ্যান্টনি এসে বলে গেলেন চাকরিটা তিনি করতে পারছেন না। কাল থেকে নিরাময়ে যোগ দিচ্ছেন উনি।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। সঙ্গে নিরাময়ের লোক ছিল। বলার সময় খুব খুশি দেখাচ্ছিল ওঁকে। এর মানে দাঁড়াল এই, কাজটা আমাকেই করতে হবে।'

'ভালই তো।'

'আমি একটু বেইজ্জত হলাম।'

'তা হোক।'

'কী কথা। নেশা হলে কথা ঠিক থাকে না।'

খাওয়া শেষ করলেন মিস্টার ব্রাউন। তারপর হাতমুখ ধুয়ে বললেন, 'এত রাত্রে একা যেতে পারবি?'

'এলাম না?'

'না আসাই ভাল। সিমি, তুই বিয়ে করবি?'

'না।' মাথা নাড়ল সে।

'তুই বিয়ে করলে আমি খুব খুশি হব।'

'না।' মাথা নাড়ল সিমি, এবার আরও জোরে, 'আমি কাউকে ঠকাতে পারব না।' বলে বাসন নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

১০

গত কয়েকদিনে প্রচুর উপদেশ শুনেছে টুপুর। খানিকটা দূরত্বে বসে সৌদামিনী তাকে মেয়েমানুষ করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম দিকে টুপুর প্রতিবাদ করত। তর্ক তুলত। কিন্তু শেষের দিকে আর কিছুই বলত না। ওই ছোট্ট ঘরে, যখন ঘুম আসত না, তখন গম্ভীর হয়ে বসে থাকত। তার বাইরের জগৎ দেখার একমাত্র উপায় হল জানলাটা। সেদিকে তাকালে শুধু এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদ বা দেওয়াল দেখা যায়। শব্দ অবশ্য অবিরত কানে আসে। যেমন আজ সকাল থেকেই সুমন চ্যাটার্জির গলা শুনতে পাচ্ছে। সৌদামিনী অবশ্য বলেছেন প্রথমবার বলেই তাকে এই কদিন বন্দী হয়ে থাকতে হবে। তারপর নিয়ম মেনে চললেই হবে। তাঁদের সময়ে প্রতি মাসে থাকতে হত। এই সময় টুপুরকে মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ রসুন খেতে দেওয়া হচ্ছে না। এগুলো ছাড়া তার খাওয়ার অভ্যেস এতকাল তৈরি হয়নি। প্রাথমিক প্রতিবাদ গ্রাহ্য না হওয়ায় সে এটাকেও মেনে নিয়েছে।

তাকে খাবার দিতেন কৃষ্ণা। মায়ের মুখের দিকে তাকালেই টুপুর বুঝতে পারে এই ব্যবস্থা উনি মেনে নিতে পারছেন না। সে সরাসরি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমাকেও দিমা এইরকম বন্দী করে রেখেছিল?'

কৃষ্ণা মাথা নেড়েছিলেন, 'না। আমাদের বাড়িতে এসব ব্যাপার কেউ ভাবতেও পারত না।' কৃষ্ণা নিচু গলায় কথাগুলো বলেছিলেন।

'তাহলে?'

'এ বাড়িতে যে নিয়ম রয়েছে তা না মেনে উপায় নেই।'

'তুমি প্রতিবাদ করছ না কেন?'

মেয়ের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে কৃষ্ণা উঠে গিয়েছিলেন। পরে সমরেন্দ্রনাথকে একা পেয়ে ভেঙে পড়লেন তিনি, 'আমি আর পারছি না।'

সমরেন্দ্রনাথ অবাক হলেন, 'আবার কী হল?'

কৃষ্ণা বললেন, 'তুমি কিছু বুঝতে পারছ না? তোমার একটুও খারাপ লাগছে না? ওইটুকুনি মেয়েকে তোমার মা জ্ঞান দিচ্ছেন, ওই বয়সে নাকি এককালে এ দেশের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত, স্বামীর ঘর করত তারা!'

সমরেন্দ্রনাথ মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

কৃষ্ণা আরও উত্তপ্ত হলেন, 'ওকে ওইভাবে বন্দী করে রাখতে ভাল লাগছে?'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'বন্দী করে আমি রাখিনি, তোমরা রেখেছ।'

'আমরা? তার মানে তুমি বলছ আমিও রেখেছি!' অবাক হয়ে গেলেন কৃষ্ণা। কথাগুলো বলে

হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন স্বামীর দিকে।

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'হ্যাঁ। এই পুরো ব্যবস্থাটার তুমিও একটা অংশ। মা যা করছেন তা তাঁর অশিক্ষা অথবা এই বংশের পুরনো প্রথাকে অনুসরণ করার জন্যেই করে চলেছেন। মাথার ওপর ওই ওল্ড লেডি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন উনি অন্য কিছু ভাবতে পারবেন না। লোকে ব্যাপারটাকে যতই অবাস্তব বলুক কিছু করার নেই। ইংলন্ডের রাজপ্রাসাদে এখনও গত শতাব্দীর নিয়মকানুন চলে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের কোনও মিল নেই, কিন্তু ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে সবাই সেই নিয়মকানুন মেনে নিয়েছে। নেয়নি ?'

কৃষ্ণা কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তুমিও এই ব্যবস্থার সঙ্গী বলেছি কারণ তোমার মনেও পাপবোধ আছে।'

'আমার মনে ?'

'হ্যাঁ। প্রাকৃতিক নিয়মে যখন তোমার শরীরে অস্বস্তি আসে তখন নিজেকে গুটিয়ে ফেল কেন ? পৃথিবীর সব কাজ তখন করতে পারছ অথচ পুজোর কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নাও কেন ? তুমি তখন নিজেকে অশুদ্ধ বলে মনে করো কেন ?'

কৃষ্ণা মুখ ফেরালেন, 'ওটা সংস্কার।'

'বাঃ, তা হলে মাকে সমালোচনা করা তোমাকে মানায় না। তোমার জ্বর সর্দি পেটে ব্যথা হলে স্বচ্ছন্দে বলতে পারো কিন্তু ওই ব্যাপার হলেই রাখঢাক শুরু হয়ে যায়। চোরের মতো লুকিয়ে রাখো। কেন ? এতে লজ্জা অথবা অন্যায়বোধ কেন আসবে ? কাগজে খবর পড়ো না ? অলিম্পিকে মেয়েরা ওই অবস্থায় দৌড়ে পদক জিতছে ! যে-ব্যাপারটায় তোমাদের কোনও হাত নেই, যেটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সেটা নিয়ে কথা বলতে গেলে তোমাদের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যায়। যে কোনও শুভ কাজে হাত লাগাতে নিজেরাই পারো না। তাই তুমিও মায়ের ওই সংস্কারের একটা অংশ ছাড়া আর কিছু নয়।' সমরেন্দ্রনাথ উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন।

এই সময় দরজায় শব্দ হতে সৌদামিনীর গলা পাওয়া গেল, 'কে ?'

দরজা খোলার আওয়াজ হল। একটি বালক কণ্ঠ শোনা গেল, 'টুপুরের চিঠি। ও কোথায় ?'

'কে দিয়েছে চিঠি ?' সৌদামিনীর গলা।

'সানুদার মা দিতে বলল।'

'ঠিক আছে। আমাকে দে।' দরজা বন্ধ করার পর সৌদামিনী ঘরের বাইরে থেকে ডাকলেন, 'বউমা !'

চোখ মুছে কৃষ্ণা এগিয়ে গেলেন দরজায়।

সৌদামিনী বললেন, 'মেয়ে বড় হয়েছে। এইভাবে হুটহাট ওর কাছে চিঠি আসতে দিলে খাল কেটে কুমির ঢোকাবে।'

কৃষ্ণা বললেন, 'মা, এটা তো সায়নের চিঠি।'

'তাতে সাতখুন মাপ হয়ে গেল ? সে কি ওর নিজের মায়ের পেটের দাদা ? কী লিখেছে পড়ে তবে ওকে দিও।' সৌদামিনী চলে গেলেন।

কৃষ্ণা চিঠি নিয়ে কয়েক পা ফিরে এসে স্বামীর দিকে তাকালেন। সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'খোলা চিঠি না খামে করে পাঠিয়েছে ?'

'খোলা।'

'ওকে দিয়ে দাও।'

'খামে করে এলে বুঝি মায়ের হুকুম পালন করতে ?'

'না। চিঠিটা খামে করে পাঠালে আমাদের লেটার বক্সে থাকত, ওর মায়ের কাছে যেত না। সেইটে জানতে প্রশ্ন করেছিলাম। অন্যের চিঠি বাধ্য না হলে আমি পড়া পছন্দ করি না। আর যে লিখেছে তাকে তো আমরা সবাই জানি !'

মৃদু হেসে কৃষ্ণা ততক্ষণে চিঠি পড়তে শুরু করে দিয়েছেন। হঠাৎ তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল।

তারপর মাথা নেড়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন, 'রায়বাড়িতে যারা মেয়ে হয়ে জন্মায় তারা তো মেয়েমানুষ হয়ে মরে যায়। তোর উত্তর শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। খোঁজ নিয়ে দ্যাখ, আমাদের বাড়ির অত জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে কোনও মেয়ে গ্র্যাজুয়েট নয়। যেসব বউ এসেছে অন্য বাড়ি থেকে তারাও কলেজে ঢোকেনি... ! রায়বাড়ির প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে শুধু নয়, প্রথম মেয়ে যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে এমন ভূমিকায় তোকে দেখতে চাই আমি।'

কৃষ্ণা থামলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মা জানলে এই চিঠি কি ওকে দিতে বলবেন ? আমি জানি উনি দিতে দেবেন না।' কৃষ্ণা আর দাঁড়ালেন না। সোজা ছোটঘরের দরজা খুলে দেখলেন মেয়ে মেঝেয় পাতা বিছানায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে ভেবে চলে আসছিলেন এই সময় টুপুর ডাকল, 'মা !'

কৃষ্ণা ফিরলেন, তারপর নিঃশব্দে চিঠি এগিয়ে দিলেন।

'আমি ধরব ?'

কৃষ্ণা জবাব দিলেন না। টুপুর বলল, 'ওটা ছুঁলে তোমাকে স্নান করতে হবে ?'

'না।'

ঝট করে উঠে বসে কাগজটা নিয়ে তিতির হাসল, 'আমি শুনতে পেয়েছি। এটা সানুদার চিঠি, না ?' প্রশ্ন করেই সে পড়তে লাগল। দরজায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণা মেয়ের মুখ দেখতে লাগলেন। ধীরে ধীরে অদ্ভুত একটা আলো ফুটে উঠল মেয়ের মুখে। নিজের মেয়ের এই রূপ কখনও দেখেননি কৃষ্ণা। পড়া শেষ করে টুপুর বলল, 'সানুদাদা খুব ভাল, তাই না মা ?'

কৃষ্ণা বললেন, 'হুঁ।'

'সানুদাদা ভাল হবে না মা ?'

'ভগবান যা করেন তাই হবে।'

'ভগবান ছেলে না মেয়ে ?'

'তার মানে ?'

'তোমরা নীচে যে মা ভবানীর মূর্তি আছে তাকে ভগবান বল। মা ভবানী তো মেয়ে। আবার শিবঠাকুরও তো ভগবান। তিনি ছেলে।'

'এ সব ভগবানের নানান রূপ।'

টুপুর হেসে ফেলল।

'হাসছিস কেন ?'

'আগের ক্লাসে একটা কবিতা পড়েছিলাম, বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

কৃষ্ণা জবাব দিলেন না। দরজা ভেজিয়ে চলে এলেন। আজ তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল এই মেয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে না। তিনি মনে মনে বললেন, তাই হোক। তিনি যা পারেননি, তাঁর মতো মেয়েরা যা পারেননি, টুপুর যদি তা পারে— !

সকাল নটা। রোগা লম্বা বছর একুশের এক শ্যামলা যুবক হেলতে-দুলতে গেট পেরিয়ে রায়বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল। পাঁড়েজিকে দেখতে পেয়ে ছেলেটা দাঁড়াল, 'এই যে পাঁড়েজি, একটু খইনি ছাড়বে ?'

পাঁড়েজি মুখ ঘুরিয়ে নিল। ভঙ্গিটা দেখে ছেলেটা শব্দ করে হাসল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি মাদার তেরেসার নাম শুনেছ ?'

'না।'

ছেলেটা মাথা নেড়ে হাঁটতে লাগল। ওকে দেখেই বোঝা যায় রায়বাড়ির কেউ নয়। গায়ের রং বা মুখের গড়নে তফাতটা স্পষ্ট। সদরদরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে জানলা খুলে দিল সে।

এ ঘরের আসবাব সেকেলে। ঘরের মাঝখানে দামি কাঠের গোলটেবিল এবং তার চারপাশে

অনেকগুলো চেয়ার। ছেলেটির হাতে অনেকগুলো খবরের কাগজ ছিল। সেগুলো টেবিলে রেখে আরাম করে বসল চেয়ারে। প্রথম কাগজের হেডলাইন সে আগেই পড়েছিল। এবার খবরগুলো পড়তে লাগল।

'এসে গিয়েছিস ?' সদানন্দ ঘরে ঢুকল।

ছেলেটা চোখ তুলল, 'কাল কটার সময় ঘুমিয়েছিস ?'

'কেন ?' সদানন্দ চেয়ারে বসে একটা কাগজ টানল, 'নতুন খবর কিছু আছে ?'

'আমি তোকে ফোন করেছিলাম। তোর বাড়ির কেউ বলল ঘুমিয়ে পড়েছিস। নটার সময় খবর পেলাম বিটি রোডে একটা হেভি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। কাল রাত্রেই গেলে কাজ হত। এতক্ষণে কোনও না কোনও মাল ইন করে গেছে।'

'তোর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে বাদল। গিয়ে দেখবি উনিশশো ষাটের অ্যাম্বাসাডার। সারাতে পঁচিশ যাবে বিক্রি করলে পনেরোও পাবি না।'

'তাই ? ধর, গাড়িটা টাটা সুমো। মালিক অ্যাকসিডেন্টে মরে গেছে। একটু ড্যামেজও হয়েছে গাড়ি। তা হলে ?' বাদল চোখ বন্ধ করল।

'তুই স্বপ্ন দেখ। তোর উচিত ছিল ডায়নার অ্যাকসিডেন্টের খবর পাওয়া মাত্র প্যারিসে চলে যাওয়া। মার্সিডিজটাকে কবজা করতে পারতিস তা হলে।' সদানন্দ হাসল।

'বিশ্বাস কর, ভেবেছিলাম। কিন্তু তারপরে বিবিসিতে গাড়িটার যা চেহারা দেখলাম তাতে— আর ওখান থেকে এ দেশে আনা যেত না। ইম্পোর্টেড গাড়ির হেভি ট্যাক্স। আর ফরাসি জানি না বলে ওদেশে পার্টি পাকড়াতে পারব না। নে সার্চ কর।'

দুজনে খবরের কাগজ নিয়ে বসে গেল। মিনিট কুড়ি বাদে বাদল চেঁচিয়ে উঠল, 'আই বাস। গুরু মিল গয়া, এস্টিম।'

'এস্টিম ?' সদানন্দ বলে উঠল।

'হ্যাঁ। নামখানার রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট। চল পানসি বেলঘরিয়া।'

সদানন্দ উঠে দাঁড়াল। মিনিটখানেকের মধ্যেই তার মোটরবাইক রায়বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। পেছনে বাদল। মোটরবাইকের আওয়াজে সায়নের বাবা জানালায় এসে ওদের আড়ালে চলে যেতে দেখলেন। নিজের মনে বললেন, 'এই যন্ত্রটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারি না। যে কোনও সময় অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।'

নন্দিনী খামের মুখে আঠা বোলাচ্ছিলেন, বললেন, 'ওরকম করে বোলো না। এ বাড়ির ছেলে হয়ে খেটেখুটে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে তো।'

'কেন ? আমি কি অন্যের পায়ে দাঁড়িয়ে আছি ?'

'আঃ, তোমার কথা কে বলছে! তোমাদের সময় অন্যরকম ছিল।'

'এমনভাবে কথা বলছ যেন অনেক বয়স হয়ে গেছে আমার। আই অ্যাম জাস্ট ফর্টি ফাইভ। আমার চেয়ে রেখা বয়সে বড়।'

'ঠিক আছে বাবা, মানলাম তুমি এখনও যুবক। কাল সদানন্দ এসেছিল। ও দার্জিলিং-এ যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করছিল সানুকে কিছু পৌঁছে দিতে হবে কি না।'

'দার্জিলিং যাচ্ছে কেন ?'

'তা আমি কী করে জানব ? আমরা খোকাকে লিখেছিলাম সামনের মাসে যাব। তুমি তো আজ পর্যন্ত টিকিট কাটলে না। ভাবছি নতুন বোনা সোয়েটার সদানন্দর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব।' নন্দিনী চলে যাচ্ছিলেন।

সায়নের বাবা একটু অন্যমনস্ক হলেন, স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবসার কথা বলা পুরুষমানুষের শোভা পায় না। না হলে তিনি বলতেন অনেক টাকার বিল আটকে আছে।

কলকাতার যানবাহনকে পাশ কাটিয়ে সদানন্দের মোটরবাইক বেহালা ছাড়িয়ে ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে ছুটে যাচ্ছিল। তার পেছনে বসে বাদল একটার পর একটা দেশাত্মবোধক গান গেয়ে

যাচ্ছিল। সদানন্দ মুখ না ফিরিয়ে গলা তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা কী গুরু ? হঠাৎ এসব গান ?'

'স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর চলে গেল, তাই সেলিব্রেট করছি !'

'চলে যাওয়ার পর ?'

'তাই তো করে। দাঁত পড়ে যাওয়ার পর লোকে দাঁত নিয়ে আফসোস করে। মাদার তেরেসা বেঁচেছিলেন যখন তখন কটা বাঙালি তাঁকে দেখতে যেত, সাহায্য করত ? মরে যাওয়ার পর বলতে লাগল, 'যাঃ, কলকাতার শেষ গর্ব চলে গেল !'

'কিন্তু সমাধির দিন হেভি গ্যাঞ্জাম হয়েছিল।'

'গুড বাই ক্যালকাটা। আমরা কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি।' বদল বলল।

'দুর। কলকাতা এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। কয়েক বছর বাদে ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপও কলকাতা হয়ে যাবে। এস্টিমটা পাব ?' সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'আলবত। আমার ডান পা নাচছে।'

'সত্যি ?' খুশি হল সদানন্দ। বাদলের ডান পা নাচা একটা শুভচিহ্ন। এর আগের কেসেও ওর ডান পা নেচেছিল, কাজটাও হয়েছিল।

বাদলের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব সেই ক্লাস থ্রি থেকে। মেট্রোপলিটনে পড়ত ওরা। বাদলের বাবার রোজগার বেশি ছিল না। পাস করে দুজনেই সিটিতে ভর্তি হয়েছিল। এই সময় একদিন বাদল বলল, 'আচ্ছা, আমরা পড়াশুনার চেষ্টা করছি কেন ?'

সদানন্দ অবাক হয়েছিল, 'চেষ্টা করছি মানে ?'

'তা নয় তো কী ? আমার তো পড়তে একটুও ইচ্ছে হয় না। কারণ খুব সিরিয়াসলি পড়লেও আমি দারুণ রেজাল্ট করতে পারব না। সেই এলেম আমার নেই। কোনওমতে পাস করে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হবে, কেউ চাকরি দেবে না।'

বাদল হাসল, 'এখন প্রায় তিন লক্ষ ছেলেমেয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে ধরে নে সাড়ে সাত হাজার ছেলেমেয়ে দারুণ রেজাল্ট করল। এই সাড়ে সাত হাজার চাকরি পাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। তা হলে সাধারণ ছাত্রের কপালে যা লেখা আছে সেটা পড়ে নেওয়াই ভাল। তাই না ? বি.এ- এম.এ পড়ে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।'

'তা হলে আমরা কী করব ?' সদানন্দ ধন্দে পড়েছিল।

'ব্যবসা করব।'

'ব্যবসা ?'

'ইয়েস গুরু। মাল্লু কামানোই যখন আসল ব্যাপার তখন এখন থেকে সেই ধান্দায় নেমে পড়া যাক।'

'কিন্তু মা চাইছে আমি যেন অন্তত গ্র্যাজুয়েট হই। আমাদের বংশে কোনও গ্র্যাজুয়েট নেই।'

'যাচ্চলে ! মাকে গিয়ে বল, আগেকার দিনে গ্র্যাজুয়েট হলে লোকে গর্ব করে বলত, এখন বললে পাবলিক হাসবে।'

'কিন্তু কীসের ব্যবসা করবি ?'

'গাড়ির চাকার।'

'সেকী রে ?'

'যাদের গাড়ি আছে তাদের জিজ্ঞাসা করব চাকা রিসোলিং করাতে চান কি না। নতুন চাকা কিনতে যা লাগবে তার ওয়ান থার্ডে যদি পুরনো চাকা নতুনের মতো করে দেওয়া যায় তা হলে প্রচুর পার্টি রাজি হবে। আমার জানা একটা কারখানায় ওটা করিয়ে আনব। মিনিমাম পঞ্চাশ টাকা পার চাকা লাভ থাকবে।'

'কিন্তু লোকে আমাদের চাকা দেবে কেন ?'

'বাঃ, এমনি দোকানে যা নেয় তার থেকে কমে কাজটা করে দেব।'

'কিন্তু আমাদের তো দোকান নেই। যদি ভাবে চাকা নিয়ে আর ফেরত না দিই !'

'সেটা একটা পয়েন্ট। তার জন্যে কার্ড ছাপাতে হবে।'

'কার্ড ?'

'হ্যাঁ। তোর আর আমার নামে। তোর বাড়ির ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দেব। যদি কেউ সন্দেহ করে তাহলে বলব ফোন করে খবর নিতে। আমাদের যা-কিছু ইনভেস্টমেন্ট তা শুধু কার্ড ছাপার জন্যেই লাগবে। নাম দিবি এস বি এন্টারপ্রাইজ। সদানন্দ বাদল। শুধু তোর মাকে বলবি ওই নামে ফোন এলে যেন স্বীকার করে।'

কার্ড ছাপা হল! ছাপার খরচ সদানন্দই দিল। তারপর বাদলের অভিযান শুরু হল। প্রথম প্রথম সদানন্দ ওর সঙ্গে যেত। সকালবেলায় বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করানো দেখলেই সে আগে চাকা পরীক্ষা করত। চাকা প্লেইন হয়ে এসেছে দেখলেই সোজা মালিককে প্রস্তাব দিত রিসোলিং-এর।. বেশির ভাগই বলত তাদের জানা জায়গা আছে, সেখান থেকে করাবে। কেউ কেউ বলতে লাগল, যদ্দিন না চাকা ফেরত দিচ্ছেন তদ্দিন একটা চাকা দিয়ে যান। স্টেপনি হিসেবে রাখব। কিন্তু কেউ কার্ড নিয়ে মাথা ঘামাল না।

বাদল হাল ছাড়ল না। সদানন্দ তার সঙ্গে দরজায় দরজায় ঘোর বন্ধ করলেও সে সেই কারখানা থেকে দুটো চাকা ভাড়া নিয়ে অর্ডার সংগ্রহ করতে লাগল। এর ফলে সপ্তাহে সে চারটে রিসোলিং-এর কাজ পেতে লাগল। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়ে মাসে ছয়শো টাকা এল। তিনশো করে দুজন। এতে বাদল এত খুশি হল যে ওরা দুপুরে আমেনিয়ায় গেল লাঞ্চ করতে। চিকেন চাপ আর তন্দুরি রুটির অর্ডার দিয়ে বাদল বলল, 'এই ছয়শো টাকা হল শুরু। এটা ছয় হাজার হবে, ছয় লক্ষ হয়ে যাবে একদিন। শুধু খেটে যেতে হবে বন্ধু।'

সদানন্দ বলেছিল, 'কিন্তু এভাবে দরজায় দরজায় ঘুরতে ভাল লাগে ?'

'সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ, মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভদের দেখিস না ? ওরাও তো একই কাজ করে। কিন্তু ওরা মাইনে পায়, মালিক নয়। আমরা আমাদের মালিক। এই যে গতকাল যে গাড়িটাকে দেখে ঢুকলাম তার মালিক মরে গিয়েছে। ডাক্তার ছিল। ডাক্তারের স্ত্রী বললেন, আমার আর গাড়ির দরকার নেই, বিক্রি করে দিতে চাই। কম্প্যুটার নাম্বার মারুতি ভ্যান। ডাক্তারের গাড়ি বলে কম চলেছে কিন্তু একটা চাকা রিসোলিং করালে ভাল হয়।'

'করাল কেন ?'

'বললাম, ওটা করালে বেশি দাম পাবেন বিক্রি করার সময়।' হাসল বাদল। সে বুঝতে পারছিল সদানন্দ এত কথার পরেও ঠিক উৎসাহিত হচ্ছে না।

'ভ্যানটার দাম কত ?' পাশের টেবিলে খেতে খেতে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

'অ্যাঁ ?' বাদল চমকে গেল।

'আমি একটা মারুতি ভ্যান খুঁজছি। আপনি বলছিলেন বিক্রি আছে।'

'আছে। একদম টিপটপ কন্ডিশন। ডাক্তারের গাড়ি।'

'সেটা শুনেই ইন্টারেস্টেড হয়েছি। কোন সালের ?'

'নাইনটিন নাইনটি। ডব্লু বি জিরো টু।

'কত দাম ?'

'এক লাখ চাইছে।'

'আট বছরের পুরনো গাড়ি এক লাখ ? কী বলছেন ?'

'দেখলেই বুঝবেন। নতুন গাড়ির চেয়ে বেটার। আর এখন নতুন গাড়ির দাম কত জানেন ? অর্ধেক লাগছে না।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'আপনারা এই লাইনের লোক নন দেখছি। এখন মারুতির দাম পড়ে গেছে।'

সেই গাড়ি সেদিনই বিক্রি হয়ে গেল পঁচাশি হাজার টাকায়। ভদ্রলোক গাড়ির মালিককে আশি হাজার দিলেন এবং বের হবার সময় বাদলের হাতে পঞ্চাশটা একশো টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'যে ব্যবসাই করুন সেটা ভালভাবে জেনে করবেন। আপনারা নতুন বলে এটা আপনাদের দিলাম। গাড়িটা আমি নিজের জন্যে নিচ্ছি না। এক লাখ দেবে এমন খদ্দের আমার রেডি আছে।'

পাঁচ হাজার পেয়েও বাদলের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গাড়ি বিক্রির ব্যবসাটা জানে না বলেই মন খারাপ। সে সদানন্দকে বলেছিল, 'টাকাটা তুই রেখে দে যত্ন করে। এখন থেকে আর রিসোলিং-এর ব্যবসা করব না। এক মাস ধরে গ্যারেজে গ্যারেজে ঘুরব আমরা। এ ব্যবসার নাড়িনক্ষত্র আগে জেনে নিতে হবে।'

পাঁচ হাজার টাকা ওদের তীব্রভাবে উৎসাহিত করেছিল। পার্ক সার্কাসের গ্যারাজ, মল্লিকবাজার এবং খালধারের গ্যারাজগুলোতে বিভিন্ন মিস্ত্রির সঙ্গে কথা বলে ওদের ধারণা হল এই ব্যবসা বিনা মূলধনে করলে লাভ থাকবে না। শুধু দালালি করলে লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে নেবে। অর্থাৎ মওকা বুঝি গাড়ি কিনতে এবং দাম পেলে বিক্রি করতে হবে। অন্তত এক লক্ষ টাকা চাই। বাদলের পক্ষে এই টাকা স্বপ্নেও পাওয়া সম্ভব নয়। সদানন্দ মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে সুদে টাকাটা জোগাড় করতেই ওদের অফিসঘর রোজ সকালে দালালে ভরে গেল। গাড়ি বিক্রির দালাল। এরা খোঁজ নিয়ে আসত অমুক জায়গায় অমুক গাড়ি বিক্রি আছে। পছন্দ হলে বাদল সদানন্দ ছুটে যেত দেখতে। তেমন বুঝলে মিস্ত্রি দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে দরাদরি করত। পুরনো অ্যাম্বাসাডার পঁচিশে কিনে তিরিশে বিক্রি করতে লাগল ওরা। ইংরেজি কাগজে গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখে খোঁজ নিতে যেত। শেষ পর্যন্ত নিজেরাই বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করল। এস বি এন্টারপ্রাইজ এই করে করে দাঁড়িয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। এখনই ওদের বছর গেলে লাখ আড়াই টাকা আসছে। সুদ সমেত মায়ের টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছে সদানন্দ। পুরনো গাড়ির চেয়ে অ্যাকসিডেন্ট হওয়া গাড়ি কেনা অনেক বেশি লাভজনক। এরকম একটা কারবার করে বাইক কিনে ফেলতে পেরেছে ওরা।

ডায়মন্ড হারবার ছাড়িয়ে নামখানার রাস্তায় পড়ে সদানন্দ বলল, 'ঠিক কোথায় অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল তা বের করতে কালঘাম ছুটে যাবে।'

'যেখানেই দেখবি পাবলিক জাবর কাটছে সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবি।'

'কাল অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে আর আজ পাবলিক জাবর কাটবে ?'

'পাবলিকের আর কোনও কাজ নেই।'

দূর থেকেই দেখতে পেল ওরা। রাস্তার একপাশে গাছের গায়ে যে গাড়িটা আটকে আছে তাকে কেন্দ্র করে তখনও ভিড়। সদানন্দ বাইক থামাতে ভিড়টা তাদের দিকে তাকাল। দু-তিনজন এগিয়ে এল, 'মেয়েটা মরে গেছে ?'

'কোন মেয়ে ?' সদানন্দ অবাক।

'ও। আপনারা এদের কেউ নন ?'

বাদল ঝটপট উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। কিন্তু গাড়িতে মেয়ে ছিল নাকি ?'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বেশ গর্বের সঙ্গে জনতাকে শোনাল : 'কী ? আমি ঠিক বলেছিলাম কি না। লোকটা মেয়েটাকে নিয়ে ফূর্তি করতে বকখালি যাচ্ছিল। তিরিশ বছরের আইবুড়ো মেয়ে, সিঁদুর-শাঁখা নেই, বউ হতেই পারে না।'

দ্বিতীয় লোকটি বলল, 'আপনাদের কেউ হয় না ?'

বাদল ততক্ষণে বাইক থেকে নেমে গাড়ির কাছে চলে গিয়েছে। একদম নতুন এস্টিম গাড়ি। ড্রাইভারের দিকের দরজা গাছের ধাক্কায় ভেতরে ঢুকে গেছে। আর তার ফলে স্টিয়ারিং বসে গেছে সিটে। এরকম দুর্ঘটনা ঘটলে চালকের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম। কিন্তু বাদল সেটা নিয়ে ভাবছিল না। ইঞ্জিন যদি তেমন ক্ষতিগ্রস্ত না-ও হয় তবু হাজার চল্লিশেক চলে যাবে গাড়িটাকে নতুন চেহারায় ফিরিয়ে আনতে।

বাদল জিজ্ঞাসা করল, 'থানা কোনদিকে ?'

লোকজন উৎসাহিত হয়ে রাস্তা বলে দিল। এরই মধ্যে ওরা জেনে গেল ড্রাইভার মরে গেলেও তার সঙ্গিনীকে আহত অবস্থায় ডায়মন্ড হারবারের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বাইক চালু হলে সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কী বুঝলি ?'

'নতুন এস্টিমের এই মডেলটার দাম পাঁচ লাখ টাকার একটু বেশি। কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড হলে তিনের বেশি দাম পাওয়া মুশকিল। চল্লিশ হাজার খরচ আছে। ওটা একটু কমতেও পারে। তার

মানে দুই সওয়া দুই-এ যদি ম্যানেজ করা যায় তা হলে ট্রাই নেওয়া যেতে পারে। মাসখানেকের মধ্যে পঞ্চাশ ষাট প্লাস হয়ে যাবে।'

'আছিস ভাল ! অ্যাকসিডেন্টের গাড়ি শুনলে কোন পার্টি নেবে ?'

'বলার কী দরকার ?'

'ব্লু-বুক থেকেই মালিকের খবর জানা যাবে।'

'আগে থেকে মন খারাপ করে দিচ্ছিস কেন ? এত দূর যখন এলাম তখন আর একটু চেষ্টা করতে দোষ কী।'

থানায় গিয়ে খোঁজ করতেই হইচই পড়ে গেল, 'এসে গেছে, এসে গেছে।'

একজন এস আই ধমকে উঠলেন, 'আশ্চর্য ! কাল রাত্রে খবর পাঠানো হয়েছে, কাগজেও নিউজ বেরিয়েছে তবু কলকাতা থেকে এইটুকু আসতে এত দেরি করলেন ?'

সদানন্দ আমতা আমতা করল, 'মানে, ঠিক— !'

'সুজিত সেন আপনাদের কে হতেন ?'

'কিছু হতেন না, মানে, আমরা ওঁকে চিনতাম না।' বাদল বলল।

'সে কী ? তা হলে এসেছেন কেন ?'

বাদল সদানন্দের দিকে তাকাল। তার মন বলছিল এই এস আই-এর যা চেহারা এবং কথাবার্তা তাকে এস্টিম গাড়ির সন্ধানে এসেছে বলা ঠিক হবে না। সে বলল, 'আসলে ওদের একটা এস্টিম আছে। সেটা নিয়ে ওর মাসতুতো দাদা বেড়াতে বেরিয়েছিল কিন্তু কাল ফিরে যায়নি। কাগজে খবরটা পড়ে ভয় হল, তাই— !'

'তার নাম কী ?'

'কানুদা, কানুদা বলে ডাকি।'

'না মশাই। এখানে যে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে তার ড্রাইভার ছিলেন সুজিত সেন। লাইসেন্স পাওয়া গিয়েছে। ওঁর সঙ্গে যে মহিলা ছিলেন তার নাম সুতপা মিত্র। ভদ্রমহিলা যে অফিসে চাকরি করতেন তার আইডেনটিটি কার্ড ব্যাগে ছিল। আর এই খবর সুজিতবাবুর বাড়িতে পাঠানো হয়েছে অথচ তাঁর আত্মীয়স্বজন কেউ এখন পর্যন্ত এলেন না।'

'সুজিতবাবুর বডি কোথায় ?'

'ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে।'

'আমরা তো কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি, যদি ওঁর ঠিকানাটা দেন তা হলে সেখানে গিয়ে বলে আসতে পারি আসার জন্যে।' বাদল বিনীত গলায় বলল।

এস আই ঠিকানা দিয়ে দিতেই ওরা ছুটল। খানিকটা যাওয়ার পর বাদল বলল, 'পুলিশের কাছে গেলেই ওরা এমন হাবভাব করে যে মনে হয় অন্যায় করেছি।'

'আমার তো খুব ভয় করছিল !'

'ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছুই নয়। বড়মামার কাছে শুনেছি আগেকার পুলিশ নাকি আরও ফেরোসাস ছিল। বাঘের ঠাকুরদা। যাক গে, সোজা হাসপাতালে চল।'

'হাসপাতালে কেন ? ঠিকানাটা পেয়ে গেছিস তো !'

'লেটেস্ট খবর নিয়ে যাই। এই সুজিত সেন এখন স্বর্গে বসে আছে, সুতপা মিত্র যদি তার সঙ্গে না যায় তা হলে জানতে হবে ওদের সম্পর্ক কী ?'

'হয়তো প্রেম-ট্রেম করত, ভালবাসত।'

'সেটা অন্যায় নয়। তবু খবরটা— !'

ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে এসে জানা গেল সুজিত সেনের শরীর মর্গে চলে গেছে কিন্তু সুতপা মিত্রের কন্ডিশন খুব খারাপ হয়েছে, তাকে এখনই কলকাতার বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার অথচ উদ্যোগ নেওয়ার মতো কেউ নেই।

ঠিকানা জোগাড় করে ওরা কলকাতায় রওনা হল। সদানন্দ বলল, 'কেসটা কী বল তো ? এত বড় অ্যাকসিডেন্ট হল অথচ বাড়ির লোকজন আসছে না কেন ?'

'হয় কেউ নেই, নয় কেস জন্ডিস।'

'আমার মনে হচ্ছে আমাদের আসাটা বৃথা হয়ে যাবে।'

'তা জানি না। কিন্তু গাড়িটার জন্যে চিন্তা হচ্ছে। একটা কনস্টেবল পর্যন্ত ওখানে পাহারা দিচ্ছে না। যদি পাবলিক সাফ না করে দেয় তা হলে পড়ে থাকলে এমনিতেই নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা পাই বা নাই পাই সেটা বড় কথা নয় কিন্তু একটা গাড়ি যদি ওইভাবে ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে খুব দুঃখের ব্যাপার হবে।' বাদলকে শোকগ্রস্ত দেখাচ্ছিল।

কলকাতায় ফিরে এসে ওরা প্রথমে সুতপা মিত্রের ঠিকানায় গেল। বেলেঘাটার সেই বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালেন যে ভদ্রমহিলা তাঁকে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছিল। অদ্ভুত গলায় বললেন, 'আমি কী করব বলুন! আমার হাজব্যান্ড এখন কলকাতায় নেই। মেয়েছেলে হয়ে আমি তো কিছুই করতে পারি না।'

বাদল বলল, 'উনি আপনার কে হন?'

'ননদ। ডিভোর্স করে এ বাড়িতে ছিল। চাকরি করত, টাকা দিত, আমার হাজব্যান্ডের নিজের বোন বলে আপত্তি করিনি।'

'কিন্তু এখনই ওঁর চিকিৎসার দরকার। ডায়মন্ড হারবার থেকে কলকাতায় না আনলে উনি বাঁচবেন না। আর কোনও পুরুষ আত্মীয় নেই আপনাদের?'

'না। এই যে শুনলাম মরে গেছে!'

'কে বলল?'

'থানা থেকে লোক এসেছিল।' ভদ্রমহিলাকে এবার বিভ্রান্ত দেখাল।

'না মরে যাননি। উনি তো চাকরি করেন। মরে গেলে যা হবার তা হবে। কিন্তু আপনারা কিছু করলেন না অথচ উনি বেঁচে গেলেন, তা হলে তো উনি কোনও সম্পর্ক রাখবেন না আপনাদের সঙ্গে। ক্ষতিটা বুঝতে পারছেন?' বাদল জিজ্ঞাসা করল।

'সত্যি বলছেন, মরেনি?'

'আমরা ওখান থেকেই আসছি।'

ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন। ওরা কী করবে যখন বুঝতে পারছে না তখন পাজামার ওপর পাঞ্জাবি চাপাতে চাপাতে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, 'কোন হাসপাতালে আছে সুতপা?'

'ডায়মন্ড হারবারে।'

'এখান থেকে কীভাবে যাব? ট্রেন না বাস, কোনটায় তাড়াতাড়ি হবে?'

'বাসেই চলে যান, এসপ্লানেড থেকে ছাড়ে।'

ভদ্রলোক ভেতরের দিকে মুখ করে বললেন, 'শুনছ? আমি যাচ্ছি। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।' ভদ্রলোক হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এবার ভদ্রমহিলা এলেন দরজা বন্ধ করতে।

বাদল জিজ্ঞাসা করল, 'উনি?'

'আমার হাজব্যান্ড।' দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

দুই বন্ধু হকচকিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। বাদল মাথা নাড়ল, 'দুর শালা।'

বাইকের দিকে এগোতে এগোতে সদানন্দ হতভম্ব গলায় বলল, 'কী ব্যাপার রে!'

'জানি না। তবে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।' বাদল বলল।

'তুই?'

বাইকের পেছনে উঠে বসে বাদল বলল, 'আমি কখনও বিয়ে করব না।'

স্টার্ট না দিয়ে সদানন্দ মুখ ফেরাল, 'কেন?'

'বউকে দিয়ে এত মিথ্যে কথা বলাতে পারব না।'

সুজিত সেনের বাড়িতে গিয়ে দেখল দরজায় তালা ঝুলছে। প্রতিবেশীরা জানালেন, অ্যাকসিডেন্টের খবর তাঁরা পেয়েছেন। পুলিশ এসেছিল। সুজিত সেনের স্ত্রী বছর খানেক আগে

তাঁর মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন। তিনি যে টেলিফোন নাম্বার দিয়ে গিয়েছিলেন সেটা পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেশীরা উৎসুক ছিল সুজিত সেনের সঙ্গিনীর ব্যাপারে খবর পেতে। ভদ্রমহিলা এখনও বেঁচে আছেন জেনে একজন মন্তব্য করল, 'ইস্, কপালে দুঃখ আছে।'

বাদল মিসেস সেনের টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করে সদানন্দকে বলল, 'এবার ফিরে চল।'

খানিকটা দূরে এসে একটা টেলিফোন বুথ দেখে দাঁড়াতে বলল বাদল। বাইক দাঁড় করিয়ে সদানন্দ বলল, 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বাদল।'

'কেন ?'

'আফটার অল ভদ্রমহিলার স্বামী মারা গিয়েছেন। নিশ্চয়ই এখন ওঁর মনের অবস্থা ভাল নয়। তুই এ সময় ফোন করে কী করবি ?'

'আমি অন্য কারণে ফোন করছি।' বাদল বুথে ঢুকে গেল। ভিড় ছিল না, নাম্বার ঘোরাতেই রিং হল। কয়েক সেকেন্ড বাদে একজন মহিলার গলার স্বর শোনা গেল। বাদল বলল, 'নমস্কার। আমি মিসেস সেনের সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

'বলুন।'

'আমি জানি এই মুহূর্তে আপনি গভীর শোকের মধ্যে আছেন। তা সত্ত্বেও কিছু বাস্তব ঘটনাকে তো অস্বীকার করা যায় না। আপনার স্বামীর দামি গাড়ি অ্যাকসিডেন্টের জায়গায় পড়ে আছে। ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে খবর দেওয়া এবং পুলিশকে অনুরোধ করে থানায় ওটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা এখনই করা দরকার।'

'আপনি কে কথা বলছেন ?'

'আমি একটা স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা থেকে বলছি।'

'দেখুন আমি ওসব ব্যাপারে একটুও ইন্টারেস্টেড নই। ঠিক আছে ?'

'কিন্তু আপনি তো আপনার স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ?'

'আমি আপনার কাছে জবাব দিতে বাধ্য নই।' লাইন কেটে দিলেন ভদ্রমহিলা।

দুই বন্ধু এসবের মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না। যার অত দামি গাড়ি আছে তার সম্পত্তির পরিমাণ নিশ্চয়ই কম নয়। অথচ ডিভোর্সি না হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রমহিলা সেই সম্পত্তির ব্যাপারে নিরাসক্ত হয়ে গেছেন। স্বামীর সঙ্গে অন্য মহিলার ঘনিষ্ঠতা তাঁকে বাপের বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল কিন্তু তিনি আদালতে যাননি। যদি এই দুর্ঘটনায় সুজিত সেনের সঙ্গে কোনও মহিলা না থাকতেন তা হলে কি তিনি এই গলায় কথা বলতেন ?

সদানন্দ বলল, 'মেয়েটার অবস্থা ভাব ! ও চিরকাল জানবে কার অ্যাকসিডেন্টে মারা যাওয়ার সময় বাবার সঙ্গে একজন মহিলা ছিল !'

বাদল বলল, 'তুই ভুল করছিস। ও যখন বড় হবে তখন এখনকার পাতি সেন্টিমেন্টগুলো থাকবে না। ও ভাবতে চেষ্টা করবে বাবার সঙ্গে কেন মা ছাড়া অন্য মহিলা ছিল ! কিংবা এ নিয়ে ভাববেই না।'

সদানন্দ বলল, 'আর কার কী পরিবর্তন হবে জানি না কিন্তু আমাদের রায়বাড়ির ছেলেমেয়েরা কিন্তু এখনকার মতো একই কথা ভাববে।'

'জোর দিয়ে বলতে পারিস না। আমি ভাবছি দুটো কথা। গাড়িটার কী হবে ? আর ওই যে মহিলা সুতপা মিত্র, উনি নিশ্চয়ই সুজিত সেনকে ভালবাসেন। যদি বেঁচে যান তাহলে উনি কী পাবেন ? ওঁর তো কোনও দোষ নেই। বিদেশ হলে উনি হয়তো ক্ষতিপূরণ চাইতে পারতেন। কুড়ি বছর পরে হলে সেটা হয়তো এ দেশেও সম্ভব হত।' বাদল যেন নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছিল।

রায়বাড়ির গেট পেরিয়ে বাঁ দিকে শ্বেতপাথরের মূর্তিগুলোকে রেখে বাইকটাকে সিঁড়ির সামনে দাঁড় করাতেই একজন বৃদ্ধকে দেখা গেল এগিয়ে আসতে।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে সদানন্দ।'

'বলুন জেঠামশাই।'

'কথাটা শুধু তোমাকেই বলতে চাই।'

বাইক থেকে নেমে পড়েছিল বাদল। বলল, 'আমি অফিসঘরে বসছি।'

সে চলে গেলে বৃদ্ধ বললেন, 'শুনেছি তুমি ব্যবসা করছ। এ ব্যাপারে আমাদের নিশ্চয়ই আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেউ চাকরি করেনি কখনও, যে ব্যবসা করেছে সে সম্মানের সঙ্গেই তা করে এসেছে। কিন্তু তুমি এটা কী করছ ?'

'কেন ?'

'প্রতিদিন রায়বাড়িতে নিচু শ্রেণীর দালালরা আসছে যাচ্ছে। এখানে-ওখানে পোড়া বিড়ি ফেলছে। শুনলাম গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা করছ। কিন্তু ওই লোকগুলোর নিত্য আসাযাওয়ায় এ বাড়ির সম্ভ্রম নষ্ট হতে বসেছে। অনেকেই বলছিল এ ব্যাপারে বড়মায়ের সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু আমি নিষেধ করেছি। বড়মাকে নিশ্চয়ই জানো। তিনি আমাদের অল্প বয়সে বলতেন, বাইরের বন্ধুদের গেটের বাইরে রেখে আসবে। কারণ তারা তোমার বন্ধু হতে পারে না। বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। তিনি নিশ্চয়ই দালাল দূরের কথা, ওই যে ছেলেটি ভেতরে গেল তার আসাযাওয়া পছন্দ করবেন না। তাই, তুমি ব্যাপারটা ভেবে অন্য কিছু করার যাতে চেষ্টা কর তাই তোমাকে এত কথা বললাম।'

সদানন্দের চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, 'ঠিক আছে, আমি বড়মায়ের সঙ্গে কথা বলব। আর কিছু বলার আছে আপনার ?'

'হ্যাঁ। আজ সন্ধ্যায় মা ভবানীর চাতালে মিটিং ডাকা হয়েছে।'

'মিটিং ?'

'হ্যাঁ। আমরা তো সবাই এই বাড়িতে বাস করছি, বাড়িটার সমস্যা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাই না। মিটিং ওই বিষয়ে।'

সদানন্দ ভেতরে ঢুকে অফিসঘরে এল। সেখানে তখন বাদল আবার খবরের কাগজ নিয়ে বসে গেছে। সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তোর খিদে পায়নি ?'

'জব্বর। কিন্তু কাজ না হলে বাইরে বেরিয়ে কিছু খাব না বলে ভেবেছিলাম।'

'তুই কাগজ দ্যাখ, আমি আসছি।'

সদানন্দ ওপরে উঠে তাদের কাজের লোককে বলল দুজনের মতো খাবার নীচে পাঠিয়ে দিতে। তারপর সোজা চলে এল ওপরে।

দরজা খুলল আতরবালা। সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'বড়মা কোথায় ?'

'বিশ্রাম করছেন।'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সদানন্দ। ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন বড়মা। বিরক্ত হয়ে তাকাতেই সদানন্দ বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

'কী ব্যাপার ? এ রকম হুটহাট চলে এলে ভেতরে ?'

'আপনি আমাদের সবার বড়মা, মায়ের কাছে তো আসাই যায়।'

'বোসো।'

সদানন্দ বসল, 'আমি একটা ব্যবসা করার চেষ্টা করছি। একতলায় আমাদের ভাগে যে ঘর পড়েছে সেখানে অফিস করেছি। ব্যবসার কাজে লোকজন আসে। এতে আপনার আপত্তি আছে ?'

বড়মা কথাগুলো শুনতে শুনতে যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ যেন সদানন্দকে সর্বাঙ্গে দেখছিল। একটু চুপ করে থেকে তিনি অন্যরকম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাউকে দিয়ে তোমার ঠিকুজিটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে ?'

সদানন্দ হকচকিয়ে গেল। বৃদ্ধার মুখ গম্ভীর। বয়সের আঁচড়ে সেই মুখের অনেকটাই ক্ষতবিক্ষত কিন্তু গলার স্বর দৃঢ়তা হারায়নি, মুখে গাম্ভীর্য অটুট। সে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হবে ?'

'তোমার বয়সে ঠিকুজি দিয়ে কী হয় তা যদি না বুঝতে পার!' কথা শেষ না করে বৃদ্ধা কাঁধ ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে বসতে চেষ্টা করলেন, 'তোমার মাকে বললেই হবে। তাকে গিয়ে বলো।'

'আপনি যদি আমার বিয়ের কথা ভাবেন তাহলে ঠিকুজি নিয়ে কোনও কাজ হবে না। এই মুহূর্তে আমার ওসব চিন্তা নেই।'

'তোমার চিন্তা নেই ? তোমাকে চিন্তা করতে কেউ বলেছে নাকি ? এই বাড়িতে আমি, আমরা চিন্তা করি, আমাদের বয়সে এলে তোমরা করবে। যাও। বেশি কথা বলতে আজকাল আর ভাল লাগে না।' বড়মা কথাগুলো বলতে বলতে হাত নাড়তেই আতরবালা এগিয়ে এল দু পা। যেন সদানন্দ বেরিয়ে গেলেই সে দরজা বন্ধ করে দেবে।

সদানন্দ সেই আগ্রহ দেখাল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি পরিশ্রম করছি। আমাদের জন্যে বরাদ্দ ঘর থেকে ব্যবসা করছি, এ ব্যাপারে আপনার কোনও আপত্তি নেই তো ? যদিও আমি কোনও অন্যায় করছি না তবু আপনার মতামত নেওয়া জরুরি বলেই জানতে চাইছি।'

বড়মা বললেন, 'এ বাড়ির বাবুরা এককালে ব্যবসা করত। বউ হয়ে এসে শুনেছি এদের জাহাজের ব্যবসা ছিল। একবার আমার শ্বশুরমশাইয়েরর বাবা সাহেবদের কাছ থেকে একটা জাহাজ ভাড়া নিয়েছিলেন। সেই জাহাজে লবঙ্গ দারুচিনি আসছিল। হল কী, গঙ্গায় ঢোকার সময় কীসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজটা ডুবে যায়। ইনি তখন সাহেবদের কাছ থেকে নামমাত্র টাকায় ডোবা জাহাজ কিনে নেন। সেই জাহাজ তোলার পর দেখা গেল বাক্সভর্তি রানির টাকা। সেই টাকা তুলে এনে এ বাড়ির ছাদে শুকোনো হয়েছিল। দশটা লোক পাহারা দিত যাতে ওই টাকা না উড়ে যায়। সে যে কত টাকা তার ঠিক হিসেব নেই। যারা পাহারায় ছিল তারা যা চুরি করেছে তাতেই দেশে ফিরে গিয়ে বড় বড় বাড়ি তুলেছে। ওই হল ব্যবসা। কত দূরদৃষ্টি থাকলে তবে লোকে ডুবোজাহাজ কেনে। সেই থেকে এ বাড়ির ছেলেরা ব্যবসা করে আসছে। চাকর হওয়ার জন্যে কেউ এ বাড়িতে জন্মায় না। তাই বলে ভিখিরিদের গায়ে গা মিলিয়ে ব্যবসা করার মতো নীচে কেউ নামেনি।'

এত বড় বক্তৃতা শোনার পর সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আমি সেটা করছি বলে আপনার মনে হচ্ছে ?'

'তুমি কী করছ তা আমি জানব কী করে ? আমি কি এই ঘর থেকে বের হই ? তবে পাঁচজনে যদি বলে তবে তারা তো দেখেশুনেই বলে।'

সদানন্দ ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, 'পাঁচজন প্ল্যান করে ছাগলকে কুকুর বলেছিল। আমি আশা করব সেই বোকা বামুনের মতো আপনি ভুল করবেন না।'

নমস্কার করে সদানন্দ বেরিয়ে এল। একটু উত্তেজিত বলে সে অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ ঘোরানো সিঁড়ির বাঁকে পৌঁছোতেই নিজের নাম শুনতে পেয়ে ফিরে তাকাল। এ বাড়ির গন্ধরাজ দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দরজায়। পরনে কাজ করা পাঞ্জাবি আর দামি লুঙ্গি। এ বাড়িতে কেউ লুঙ্গি পরে না, ইনি ব্যতিক্রম।

'ঝামেলায় পড়েছ মনে হচ্ছে ?' গন্ধরাজ হাসলেন।

'না। বলুন।'

'মুখে না বললে কী হবে, মুখ অন্য কথা বলছে। আমি তোমার বাবার বয়সী। তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। তুমি যদি সমুদ্রের ধারে যাও, দেখবে একের পর এক ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ছে। সেই ঢেউয়ের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইলে তুমি বেদম আছাড় খাবে, হাত-পা ভাঙতে পারে। কিন্তু ঢেউ যখন মাথার কাছে আসবে তখন ডুব দাও, ঢেউ মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তোমার কিস্যু হবে না।' গন্ধরাজ আবার হাসলেন, 'উপেক্ষা করো, এসব উপেক্ষা করো।'

কথাটা মনে ধরল সদানন্দর। কে কী বলছে তা কানে না নিলেই হল। সে অন্যায় করছে না,

কারও অনুগ্রহ চাইছে না, অতএব নিজে যা ভাল মনে করছে তা করতে অসুবিধে কোথায় ?

'আপনি কি কিছু বলবেন ?'

'তুমি তো গাড়ি কেনাবেচা কর। টাকার দরকার হয় না ?'

'তার মানে ?'

'ব্যবসা করতে গেলে তো টাকার দরকার হয়। সে রকম হলে কী কর ?'

'আমাদের যতটুকু ক্ষমতা তার মধ্যেই কাজ করি।'

'এই জন্যে বাঙালির কিছু হল না। ক্ষমতার বাইরে গিয়ে ক্ষমতাকে ধরতে হবে হে। ব্যবসা বাড়াও। আরও গাড়ি কিনে বিক্রি করো।'

সদানন্দ হাসল, 'টাকা পাব কোথায় ?'

'হ্যাঁ। এতক্ষণে ঠিক প্রশ্নটা করলে। টাকা পেতে হলে টাকা দিতে হয়। তোমার যদি টাকার দরকার হয়, তা ধর হাজার পঞ্চাশেক, আমি ধার দিতে পারি। থ্রি পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট পার মান্থ। দু মাসে তুমি ফিফটি পার্সেন্ট লাভ করলে আমাকে সিক্স পার্সেন্ট দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। অনেস্ট প্রপোজাল। মাথায় রেখো।' গন্ধরাজ ঘুরে দাঁড়ালেন।

সদানন্দ তড়িঘড়ি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার শর্তগুলো যদি বলেন ?'

গন্ধরাজ মাথা দোলালেন, 'ব্যবসা করছ যখন তখন ব্যবসায়ীর মতো কথা বলো। খুড়ো-ভাইপোর সম্পর্ক সেখানে অচল। দরকার যখন পড়বে খবর দিও, তোমার ওই নতুন আপিসে গিয়ে শর্তগুলো বলব।' গন্ধরাজ চলে গেলেন।

সদানন্দ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এই লোকটি এই বাড়ির মানুষদের থেকে একটু আলাদা। সবাই যেমন ওঁকে এড়িয়ে চলে উনিও কারও সঙ্গে মেশেন না। বিয়ে করেননি, সন্ধের পর ঘরে বসে নেশা করেন, একা থাকেন এবং প্রায়ই ওঁর কাছে যেসব কাজের মেয়ে কাজ করে তারা চাকরি ছেড়ে দেয়। রবিবারে রবিবারে গন্ধরাজকে ঝি খুঁজতে রাস্তায় বের হতে দেখা যায়। এই নিয়ে যেমন হাসাহাসি তেমন ঘেন্নাও আছে। কিন্তু লোকটাকে আজ খারাপ লাগল না সদানন্দর। অযৌক্তিক কথা কিছু বলেনি।

'তোর চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।' ঘরে ঢোকামাত্র বাদল বলল।

সদানন্দ দেখল বাদলের সামনে খালি চায়ের কাপ আর ডিশ। তার চায়ের কাপ প্লেট দিয়ে ঢাকা। পাশের ডিশে গোটা চারেক কচুরি এবং তরকারি। চেয়ার টেনে বসে দ্রুত সেগুলো গলায় চালান করে দিতে দিতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'বাদল, একটা উপকার করবি ?'

'কবে করিনি ?' বাদল একটা সিগারেট বের করে দু-আঙুলে মাথা টানতে লাগল।

'তোর জানাশোনা ভাল জ্যোতিষী আছে যে ঠিকুজি বানাতে পারে।'

'সর্বনাশ। না, নেই।'

'তাহলে আর হল না।'

'দুর ! জানাশোনা করে নিতে কতক্ষণ। কেসটা কী ?'

'আমার একটা ঠিকুজি বানাতে হবে।'

'তোর ? ছেলেবেলায় কেউ করায়নি ?'

'করিয়েছিল। সেইটে ফেলে দিয়ে নতুনটা রাখতে হবে।'

'খুলে বল। নিজেকে টিউব লাইট বলে মনে হচ্ছে।' বাদল খুব গম্ভীর মুখে বলল, 'মেয়েদের ঠিকুজি চেঞ্জ করা হয় বলে শুনেছি, ছেলেদের এই প্রথম শুনলাম।'

সদানন্দ বলল, 'আমি তোর সঙ্গে ইয়ার্কি মারছি না বাদল। আমার এমন একটা ঠিকুজি করতে হবে যাতে মনে হবে আমার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। সাতাশ-আঠাশ বছরে ভয়ঙ্কর অ্যাকসিডেন্ট হবে, বেঁচে গেলে তিরিশ বছরে অবধারিত মৃত্যু। মরার আগে যা-কিছু বিষয়সম্পত্তি আছে তা জুয়ো খেলে উড়িয়ে দেব। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তার বিধবা না হয়ে উপায় নেই।'

বাদল খানিকক্ষণ চেয়েছিল সদানন্দের মুখের দিকে। এবার তার মুখ হাসি হাসি হল, 'বুঝেছি। হয়ে যাবে।'

'কী বুঝেছিস ?'

'তোর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে কিন্তু তুই সেটা চাইছিস না। কী কপাল তোর, এই বয়সেই পাবলিক বিয়ের সম্বন্ধ করছে আর আমার দিকে কোনও মেয়ে ভুল করেও তাকায় না। কিন্তু গুরু, অরিজিন্যাল ঠিকুজিটা দাও, নকল করতে হলে ওটার হেল্প লাগবে।'

'ঠিক পারবি তো ?'

'তুই ভাবিস না, অ্যাকসিডেন্ট কী, তোর এইডস হবার সম্ভাবনা আছে এমন কথাও লিখিয়ে নেব।'

'ইয়ার্কি মারিস না, আমার জন্মাবার সময় এইডসের নাম কেউ শোনেনি।' কথাটা বলেই সদানন্দ দেখল দরজায় একজন এসে দাঁড়িয়েছেন। ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন, আসুন ফুলকাকু। কোনও দরকার আছে ?'

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করলেন, 'হ্যাঁ, মানে, তোমার কাকিমার কাছে শুনতে পেলাম তুমি দার্জিলিং যাচ্ছ ?'

সদানন্দ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, ওই ব্যবসার ব্যাপারেই—!'

ভদ্রলোক বললেন, 'আসলে আমরা সায়নকে লিখেছিলাম ওকে দেখতে যাব। কিন্তু এখানে এত ঝামেলায় পড়েছি যে সময় বের করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলছিলাম কী—!

ভদ্রলোককে থামতে দেখে সদানন্দ বলল, 'আমি তো কাকিমাকে বলেছি যদি কিছু দেওয়ার থাকে আমাকে দিলে পৌঁছে দেব। ওকে দেখতে আমারও খুব ইচ্ছে করছে। আমার সঙ্গে বেশ ভাব ছিল।'

'তোমার টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে ?'

'না। আমি রকেট বাসে যাব।'

'রকেট বাসে— ? খুব কষ্ট হবে না ?'

বাদল এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল, এবার বলে উঠল, 'আমাদের কষ্ট হবে না।'

'না, আমি ভাবছিলাম, তোমার কাকিমাকে যদি সঙ্গে পাঠানো যায় !'

'অসম্ভব।' সদানন্দ মাথা নাড়ল, 'ওঁর খুব কষ্ট হবে।'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে দরজা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে সদানন্দ বলল, 'এ বাড়ির লোকজন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে।'

বাদল ভ্রূ কোঁচকাল 'কী ব্যাপার ?'

সদানন্দ বলল, 'বুঝতে পারছি না। এ বাড়ির ইতিহাসে এরকম ঘটনার কথা কেউ শোনেনি। যতই বয়সে বড় হোক, কাকিমা তো যাকে বলে বুড়ি হয়ে যায়নি। আমার সঙ্গে যাচ্ছেন জানলে এ বাড়িতে প্রলয় হয়ে যাবে।'

বাদল বলল, 'কিছু মনে করিস না, তোদের এই বাড়িটা এখনও মধ্যযুগে বাস করছে। সমস্ত কলকাতার থেকে আলাদা।'

'ঠিকই। শুধু আমাদের এই বাড়ি নয়, যাদের সঙ্গে আমাদের বিয়ে-থা হয় সেই কয়েকটা বাড়িরও একই দশা। আর জ্ঞাতিদের মধ্যে যারা আজকের আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়েছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা হয় না। কাকিমা না গেলেও সায়নকে দেখে আসব।' সদানন্দ বলল।

'ব্লাড ক্যানসার হলে মানুষ বাঁচে না, ও কিন্তু এখনও লড়ে যাচ্ছে।'

'হুঁ। ওর লড়াই মানে ফুলকাকুর শেষ হয়ে যাওয়া। যাক গে, তুই আজই আমার ঠিকুজির ব্যবস্থা কর। বাইরে যাওয়ার আগে ডুপ্লিকেটটা মায়ের আলমারিতে রেখে যাব। তুই একটু ওয়েট কর, আমি অরিজিন্যালটা নিয়ে আসছি।' সদানন্দ বেরিয়ে গেল।

পাঁচদিন বন্দী থাকার পর টুপুর স্নান করে যখন শোওয়ার ঘরে এল তখন সমরেন্দ্রনাথের মনে হল মেয়েটার মুখের চেহারা বদলে গিয়েছে। সেই ছটফটে চপল স্বভাবের মেয়েটা এখন বড় বেশি

গম্ভীর। স্কুলে খবর দেওয়া ছিল না। মুক্তির পর যখন সমরেন্দ্রনাথ ওকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন টুপুরের ব্যাগে তাঁর লেখা অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিতি মকুবের জন্যে আবেদনপত্র রয়েছে। ওদের স্কুলে বড় কড়াকড়ি। অকারণে ছুটি নেওয়া প্রিন্সিপ্যাল পছন্দ করেন না। সৌদামিনী উদাস গলায় বলেছিলেন, 'কী হয়েছিল তা কাউকে বলার দরকার নেই। বলবে শরীর খারাপ হয়েছিল। মেয়েরা ওই কথা বললে সবাই বুঝে নেয়।'

সাতসকালে সমরেন্দ্রনাথ মেয়েকে নিয়ে নীচে নেমে এলেন। এখন টুপুরের পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম, হাতে বইয়ের ব্যাগ। কদিন আগে স্কুল থেকে ফেরার সময় দুটো স্ট্র্যাপ দুই কাঁধে ঢুকিয়ে ব্যাগটাকে পিঠে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল বলে সৌদামিনী খুব বকেছিলেন। বকুনির কারণটা কিন্তু তিনি স্পষ্ট করেননি। টুপুর জানতে চাইলে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'এ মেয়ের কী হবে ?'

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সমরেন্দ্রনাথ পাঁড়েজিকে দেখতে পেলেন, হাতে একটা কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার ?'

পাঁড়েজি কাগজ এগিয়ে দিতে সমরেন্দ্রনাথ পড়লেন, 'এতদ্দ্বারা এই বাড়ির সমস্ত শরিককে জানানো হইতেছে যে বাড়ি সংক্রান্ত কিছু সমস্যা উদ্ভূত হওয়ায় এবং তাহা সমাধানের জন্যে আজ বেলা বারোটায় মায়ের মন্দিরে একটি জরুরি সভার আয়োজন হইয়াছে। প্রতিটি পরিবারের কর্তাদের সেই সভায় উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইতেছে।' নীচে ন'বাবুর সই। এই বাড়ির ট্যাক্স বা ওই জাতীয় বিষয় দেখাশোনার দায়িত্ব ন'বাবুর ওপর দেওয়া আছে। সমরেন্দ্রনাথ ভেবে পেলেন না হঠাৎ এমন কী সমস্যা দেখা দিল যে আজই সভা ডাকতে হচ্ছে ?

কাগজটা ফেরত দিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই পেছন থেকে ডাক ভেসে এল, 'এই টুপুর !'

সমরেন্দ্রনাথ দেখলেন মেয়ে পেছন ফিরল এবং তার মুখে এখন হাসি ফুটেছে। বাইক চালু করে সদানন্দ পাশে এসে দাঁড়াল, 'কদিন দেখতে পাইনি কেন ? তোর স্কুলের বাস দাঁড়াচ্ছে আর চলে যাচ্ছে।'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, স্কুল কামাই হয়ে গেল। অসুস্থ হয়েছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে টুপুর বলল, 'শরীর খারাপ হয়েছিল।'

সদানন্দ বলল, 'এই, আজ আমি দার্জিলিং যাচ্ছি। তোর জন্যে কী নিয়ে আসব বল। বলে ফ্যাল।'

সমরেন্দ্রনাথ সঙ্কুচিত হলেন, 'না, না, ওসবের কী দরকার।'

টুপুর জিজ্ঞাসা করল, 'দাদাভাই, দার্জিলিং-এর কাছেই সানুদা থাকে, তাই না ?'

সদানন্দ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ রে। আমি ওর কাছেও যাব।'

'সত্যি ?' চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল টুপুরের। তারপর ব্যাগ খুলে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল, 'এই চিঠিটা সানুদাকে দিয়ে দেবে ?'

'নিশ্চয়ই।' সদানন্দ কাগজটা নিল।

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'সদু, ওর বাস চলে যাবে, আমরা যাচ্ছি।'

'আজ আমি ওকে স্কুলে পৌঁছে দেব ?'

'তুমি ? না-না। স্কুলের বাস তো আসছে। চল।' সমরেন্দ্রনাথ এগিয়ে গেলে টুপুর বাধ্য হল তাঁকে অনুসরণ করতে। কয়েক পা হাঁটার পর সমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি চিঠিটা কখন লিখলে ?'

'কালকে।'

'হঠাৎ সানুকে চিঠি লিখলে ?'

'সানুদা আমাকে চিঠি দিয়েছিল।'

'ও হ্যাঁ। তা চিঠি পোস্ট না করে ব্যাগে নিয়ে বেরিয়েছিল কেন ? ওটা কাউকে দিয়ে পোস্ট করানো উচিত ছিল।'

টুপুর জবাব দিল না। চিঠিটা সে ব্যাগে রেখেছে আজ। তারপর আর খেয়াল ছিল না। কিন্তু বাবার কথা শুনে তার মনে হচ্ছিল সদুদাকে চিঠিটা পৌঁছে দিতে বলাটা পছন্দ হয়নি।

সমরেন্দ্রনাথের অস্বস্তি তবুও গেল না। বাসস্টপে পৌঁছে তিনি বললেন, 'তুমি এখনও বড় হওনি। কতগুলো জিনিস এই সময় শেখা দরকার। যেমন ধর, কোনও চিঠি লিখলে মা বা আমাকে পড়িয়ে দেখে নেবে ভুল হয়েছে কি না।'

'মা তো পড়েছে। কোনও ভুল ছিল না।'

'অ।' সমরেন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

স্কুলবাসে ওঠামাত্র চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। টুপুরদের ক্লাসের পাঁচটা মেয়ে ওই বাসে যায়। বেশ কয়েকদিন পরে ওকে দেখতে পেয়ে বন্ধুরা হইহই করতে লাগল। সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল রে তোর ? একদম বলাকওয়া নেই ডুব মারলি ? কোথাও চলে যেতে হয়েছিল ?'

অঙ্গনা চোখ ঘোরাল, 'তুই নিশ্চয়ই তোর সেই সানুদার কাছে গিয়েছিলি! এখন কেমন আছে রে ?'

টুপুর গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি কোথাও যাইনি।'

'তাহলে ? কামাই করলি কেন ?'

'আমার ইচ্ছে।' সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।

বন্ধুরা কথাটা পছন্দ করল না। এই সময় বাসটা গতি কমিয়ে দিল আর একটি মেয়েকে তোলার জন্যে। তখনই মুঠো পাকানো কাগজটা জানলা দিয়ে বাসের ভেতর আছড়ে পড়ল। সুভদ্রা অঙ্গনারা প্রসঙ্গ ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাগজটার জন্যে।

এই সময় ক্লাস নাইনের একটি মেয়ে সিট ছেড়ে এগিয়ে এসে হাত বাড়াল, 'কাগজটা দেখি!' অঙ্গনা সেটা তুলে ধরতে মেয়েটি গম্ভীর মুখ নিয়ে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। জায়গায় ফিরে এসে অঙ্গনা ফিসফিস করে বলল, 'একটা লাইন আমি দেখে ফেলেছি, জানিস ?'

সুভদ্রা চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী ?'

'কাউকে বলবি না ? প্রমিজ ?'

'প্রমিজ।'

'আই লাভ ইউ !'

টুপুর দেখল অঙ্গনার মুখটাকে এখন একদম অচেনা মনে হচ্ছে।

রোলকলের পরই ক্লাসটিচার মিসেস দত্ত টুপুরকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কদিন অ্যাবসেন্ট হয়েছিলে কেন ?'

টুপুর ঠাকুমার গলায় বলল, 'আমার শরীর খারাপ হয়েছিল।'

'অ্যাপ্লিকেশন এনেছ ?'

ঘাড় নেড়ে সমরেন্দ্রনাথের লেখা চিঠি ব্যাগ থেকে বের করে এনে সে মিসেস দত্তের হাতে দিল। সেটায় চোখ বুলিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছিল তোমার ? জ্বর না পেটখারাপ ?'

'ওসব কিছু হয়নি।'

'ডাক্তার দেখেছে ?'

'না।'

'আশ্চর্য! তোমার বাবা লিখেছেন সিরিয়াস ইলনেস। অথচ তোমাকে কোনও ডাক্তার দেখানো হয়নি ? নিশ্চয়ই তুমি বাবা-মায়ের সঙ্গে স্কুল কামাই করে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলে! সত্যি কথা বলো!' মিসেস দত্ত বেশ জোরে জোরে কথাগুলো বললেন।

'আমি কোথাও বেড়াতে যাইনি।' টুপুর প্রতিবাদ করল।

'আই কান্ট অ্যাকসেপ্ট দিস অ্যাপ্লিকেশন। এখন বছরের শেষ দিক। কদিন বাদেই পরীক্ষা। এটা তো কর্পোরেশনের স্কুল নয় যে যা ইচ্ছে তাই করবে। আমি ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখতে চাই। নইলে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। কালই ওটা নিয়ে আসবে।'

এই সময় সুভদ্রা বলে উঠল, 'ওকে তো কোনও ডাক্তার দেখেনি তাহলে সার্টিফিকেট কী করে পাবে।'

'এটা ওর বাবার হেডেক। মেয়েকে ভাল স্কুলে পড়াতে হলে মিনিমাম ডিসিপ্লিন মানতেই হবে। যাও, আজ নিজের সিটে বোসো।'

টুপুর মিসেস দত্তের দিকে তাকাল, 'ঠাকুমা বলেছিল আপনাকে বলতে যে আমার শরীর খারাপ হয়েছিল। মেয়েরা ওই কথা বললে সবাই বুঝে নেয় কী হয়েছিল!'

মিসেস দত্ত হাঁ হয়ে চেয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর বললেন, 'মাই গড! তোমার পিরিয়ড হয়েছিল?'

টুপুর শব্দটা এর মধ্যে মায়ের মুখে শুনে ফেলেছে। এই একই শব্দের অন্য অর্থ সে জানে। অতএব নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

মিসেস দত্ত কাগজটা তুলে ধরে বললেন, 'অথচ তোমার বাবা লিখেছেন তোমার ভয়ঙ্কর অসুখ হয়েছিল। এবারই প্রথম হল নাকি?'

আবার মাথা নাড়ল টুপুর।

'তা আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তুমি বললে না কেন?'

'আমাকে শরীর খারাপ হয়েছে বলতে বলেছিল।'

'হ্যাঁ, শরীর নিশ্চয়ই একটু খারাপ লাগে কিন্তু এর পরে আর কখনও কামাই কোরো না। মেয়েদের এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।'

'আমাকে ওরা পাঁচ দিন আটকে রেখেছিল।' টুপুর বলল।

'আটকে রেখেছিল? তার মানে?'

টুপুর ঘটনাটা বলতেই সমস্ত ক্লাস জুড়ে যে আওয়াজটা পাক খেল সেটা শুনতে তার খুব ভাল লাগল। মিসেস দত্ত উত্তেজিত হলেন, 'আশ্চর্য। এ সব প্রিমিটিভ ব্যাপার এই কলকাতায় এখনও চলে? এর প্রতিবাদ করা দরকার। আমি তোমার বাবাকে লিখব সামনের বার থেকে নিতান্ত বাধ্য না হলে ওই সময় যেন তোমার স্কুল কামাই না হয়। যাও বোসো।'

টুপুর নিজের সিটে ফিরে গেলেও ভদ্রমহিলা স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। ক্লাসের মেয়েরা এখন তার দিকে তাকাচ্ছে। সুভদ্রা ফিসফিস করে বলল, 'তোকে বন্দী করে রেখেছিল কেন?'

'কী জানি! হয়তো ছুঁয়ে ফেলব বলে।'

মিসেস দত্ত বললেন, 'ব্যাপারটা তোমাদের জানা দরকার। আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ বেশ কিছু কুসংস্কার লালন করেন। যেমন ধর, চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের আগে খাবারদাবার শেষ করে কুলের কাঁটা ছড়িয়ে রাখা হয়। গ্রহণের পর আগের রান্না খাওয়া হয় না। একসময় মানুষ অজ্ঞতা থেকে কল্পনা করত রাহু চাঁদ বা সূর্যকে গ্রাস করছে। গ্রাস করলে তারা এঁটো হয়ে যায়। এখন মানুষ চাঁদে হাঁটছে, চাঁদের পাথর নিয়ে এসেছে পৃথিবীতে তবু অনেকেই ওই কাণ্ডটি করে যাচ্ছেন। এরকম কাউকে করতে দেখলে তোমরা বুঝিয়ে বলবে গ্রহণ ব্যাপারটা কী। তোমরা জানো তো?'

সমস্ত ক্লাস একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ।'

'গুড। আমরা গরম দেশের মানুষ। মেয়েদের শরীর যখন বিবর্তিত হয় তখন তার মধ্যে নানান পরিবর্তন আসে। পৃথিবীর সমস্ত মেয়ে তখন নারী হয়ে ওঠে যখন তার শরীর থেকে প্রতি মাসে রক্তক্ষরণ হয়। প্রকৃতি তাকে নারীত্ব দিচ্ছে যাতে পরবর্তী প্রজন্ম আসতে পারে। এটা একটা সিস্টেম। শরীর তার বাড়তি আবর্জনা ড্রেনেজ সিস্টেমের সাহায্যে বাইরে বের করে দেয়। এটা কোনও অসুখ নয় যে সংক্রামক রোগ ভেবে আলাদা করে রাখা হবে। একমাত্র রক্তপাত ছাড়া অন্য দিনের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। নিজেকে তোমরা কখনওই অপবিত্র বলে মনে করবে না।'

একটি মেয়ে বলে উঠল, 'আমার মা তখন ঠাকুরঘরে ঢোকেন না।'

মিসেস দত্ত বললেন, 'উনি ভুল করেন। ওঁকে তুমি বোঝাবে যে ওই সময় তিনি একটুও অপবিত্র হন না। মনে পাপ না থাকলে পরিষ্কার পোশাকে উনি যা স্বাভাবিক তাই করতে পারেন। আমাদের মা-মাসিরা তাঁদের অন্ধ ভাবনা থেকে এমন আবহাওয়া তৈরি করেছিলেন যে পিরিয়ড হওয়া মেয়েদের পাপ, লজ্জাজনক ব্যাপার। একটা সময় ছিল যখন ওই সময়ে মেয়েরা একটু অসহায় হয়ে পড়ত। রক্তপাত আটকানোর আধুনিক ব্যবস্থা ছিল না। তাই তারা নিজেদের আড়ালে রাখতে

চাইত। কিন্তু এখন তো সে-সমস্যা নেই। মেয়েরা ওই অবস্থার শারীরিক সমস্যাকে অতিক্রম করে অলিম্পিক দৌড়েও অংশ নিচ্ছে। এই যে কথাগুলো তোমাদের বললাম, কেন বললাম তা জানো ? কারণ তোমরা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে ওঁদের অন্ধত্ব দূর করবে। কখনও অন্যায়, কুসংস্কার, মেনে নেবে না। তুমি ছুটির পরে আমার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যেও।'

এ-বাড়ির অনেক বাবুর ঘুম দেরিতে ভাঙে। মায়ের মন্দিরের সামনে পাতা সতরঞ্জিতে বসা কিছু মুখে এখনও ঘুমের আমেজ রয়ে গিয়েছে যদিও ঘড়িতে ঠিক বারোটা বাজে। সবাই এসে যাওয়ার পর ন'বাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'তোমাদের সবাইকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি। প্রথমেই বলে নিচ্ছি, আমার পক্ষে আর দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। আমার অনেক সমস্যা, এবার তোমাদের মধ্যে কেউ এই দায়িত্ব নিক।'

সমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্যে কি আজ আমাদের এখানে ডাকা হয়েছে ?'

ন'বাবু বললেন, 'না। সেই বিষয়ে পরে আসছি। আগে এই ব্যাপারটার একটা বিহিত করা হোক।'

কমলেন্দু বলল, 'ন'কাকা, আপনি আগে বড় সমস্যাটার কথা বলুন।'

ফুলবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। কমলেন্দু ঠিক বলেছে।'

ন'বাবু একটু আশাহত হলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, শেষেই না হয় আলোচনা করা যাবে। হ্যাঁ। তোমরা সবাই জানো, আমাদের এই বাড়িটার বয়স অনেক হয়েছে। শেষবার কবে হোয়াইট ওয়াশ করা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই অনেকের মনে নেই। পুরনো বাড়ির যা হয় তাই হয়েছে। আমার ঘরে জল পড়ে। বাইরের দেওয়ালে বড় চিড় ধরেছে। এখনই মেরামত না করলে খুব শিগ্‌গির বাড়ি নিয়ে বিপদে পড়তে হবে।'

সদানন্দ সবার পেছনে চুপচাপ বসেছিল। তার পরিবারের একমাত্র পুরুষ হিসেবে এই সভায় তাকে আসতে হয়েছে। যেহেতু সামনে কাকা জ্যেঠারা বসে আছেন তাই তার মুখ খোলার সুযোগ হয় না। অথচ না এসেও উপায় নেই। সদানন্দ কথা না বলে পারল না, 'পশ্চিম দিকের দেওয়ালে দুটো বড় গাছ বেড়ে চলেছে।'

ন'বাবু সদানন্দর দিকে তাকালেন, 'হ্যাঁ। গাছ দুটোকে তুলে ফেললে না কেন ?'

'বাঃ, সিঁড়ি ছাড়া ওখানে আমি পৌঁছোব কী করে ?' সদানন্দ বলতেই কয়েকজন হেসে উঠল।

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'কথাগুলো মিথ্যে নয়। বাড়িটার অবস্থা বেশ খারাপ। কিন্তু এত বড় বাড়ি মেরামত করার জন্যে যে প্রচুর টাকার দরকার।'

গন্ধরাজ চুপচাপ ছিলেন এক পাশে। এবার বললেন, 'এই প্রচুরটা কত তা আমরা জানি না। একজন কন্ট্রাক্টরকে ডেকে বাজেট দিতে বললেই হয়।'

ফুলবাবু বললেন, 'লাখ আটেকের মতো বাজেট দেবে।'

গন্ধরাজ বললেন, 'কাজটা যারা করে তাদের মুখ থেকেই শোনা ভাল।'

ন'বাবু বললেন, 'আমার বড় শ্যালকের ভায়রাভাই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি একদিন আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁকে ব্যাপারটা বলতে তিনি বলেছেন আগামী পঁচিশ-তিরিশ বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত হতে গেলে লাখ সাতেক লাগবে। আর যদি প্যাচ ওয়ার্ক করানো হয় তাহলে তিন লাখেই ম্যানেজ করা যাবে।'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তিন লাখ ?'

কমলেন্দু বলল, 'তিনের চেয়ে সাত লাখ খরচ করে নিশ্চিন্ত হওয়াই ভাল।'

'সাত লাখ কোত্থেকে আসবে ?' ন'বাবু বললেন, 'মেয়ের বিয়ের পর এখনই আমার পক্ষে বেশি টাকা বের করা সম্ভব নয়।'

ফুলবাবু বললেন, 'সাত লাখ হলে মাপাপিছু প্রায় সত্তর হাজার পড়বে। অসম্ভব। তার চেয়ে প্যাচ ওয়ার্ক হলে কোনওমতে তিরিশ দিলে চলে যায়।'

গন্ধরাজ বললেন, 'এসব তো হাওয়ার ওপর কথা বলা হচ্ছে। ন'বাবুর শালার ভায়রাভাই একবার দেখেই ঠিকঠাক বলে দেবেন এটা ভাবা যায় না। আরও দু-চার জায়গায় খোঁজখবর নেওয়া হোক। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমি একা মানুষ। বয়সও হচ্ছে। পঁচিশ বছর তো অনেক দূর। আর সবাই স্ত্রীছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করছে। বাড়ির ব্যাপারে তাদের স্বার্থ আমার চেয়ে অনেক বেশি। তাই যা খরচ হবে তা সমান ভাগ করে আমার ওপর চাপালে ঠিক কাজ হবে ?'

প্রশ্নটা শুনেই কেউ কিছু বলল না। গন্ধরাজ একা থাকেন। নেশাভাঙ করেন। সবাই তাঁকে এড়িয়ে যায়। বস্তুত কাজের মেয়ের ওপর নির্ভর করে থাকেন গন্ধরাজ। এবং এই নিয়ে অনেক ফিসফিসানি এ-বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে।

ফুলবাবু বললেন, 'কথাটা ঠিক হলেও মনে রাখতে হবে এ-বাড়ির ভিত অনুযায়ী আমরা সবাই আলাদা আলাদা ইউনিট। বাড়ির ট্যাক্স সবাই সমানভাবে দিয়ে থাকি। বাড়ি মেরামতির ক্ষেত্রেও সেটা হওয়া উচিত।'

গন্ধরাজ বললেন, 'কিন্তু এ ব্যাপারে আমি একটা উপায় বলতে পারি সেটা করলে কাউকে পকেট থেকে কিছু বের করতে হবে না।'

ন'বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম ?'

এখন সবাই মুখ ঘুরিয়ে গন্ধরাজের দিকে তাকিয়ে।

গন্ধরাজ বললেন, 'এককালে এ-বাড়ির সামনে বাগান ছিল। বাগানে শ্বেতপাথরের পরীদের গায়ে আলো ফেলা হত। এখন বাগান নেই। আলো নেই। ন্যাড়া মাঠের ওপর পরীগুলো পড়ে আছে অযত্নে। দিনের বেলায় কাক হাগছে ওদের ওপর। আর আমাদের কারও যখন সময় নেই ওদের দেখাশোনা করার তখন খামোকা রেখে কী হবে ? বিক্রি করে দিলেই তো হয় !'

সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন উঠল। সবাই নিচু স্বরে কথা বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ন'বাবু বললেন, 'প্রস্তাবটা মন্দ নয়। পাঁড়েজি পাহারা দেয় বলে মূর্তিগুলো এখনও টিকে আছে। ওভাবে ফেলে রাখার কোনও মানে হয় না। কিন্তু কথা হল, ওগুলো বিক্রি করলে কী আর পাওয়া যাবে। শ্বেতপাথরের আর দাম কী !'

ফুলবাবু বললেন, 'এখন মানুষ নিজের জন্যেই মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজে হিমসিম হচ্ছে, পরী কিনে রাখবে কোথায় ? এ কোনও প্রস্তাবই না।'

কমলেন্দু মাথা নাড়ল, 'আমার খুবই খারাপ লাগছে মূর্তিগুলোকে বিক্রি করার কথা ভাবতে। কিন্তু আপনারা যা বলছেন সেটা ঠিক নয়। এই পরীগুলোকে বিলেত থেকে জাহাজে করে আনা হয়েছিল। ঘষামাজা করলে আগের অবস্থায় নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। এর গড়ন ভঙ্গি শিল্প হিসেবে উঁচু দরের। এদের তো মার্বেলওয়ালার কাছে বিক্রি করা হবে না যে শ্বেতপাথরের দাম পাব। বিদেশের মিউজিয়ামে এদের দাম অনেক। যারা কিউরিও হিসেবে কিনবে তারাও মোটা টাকা দেবে। সেদিন কাগজে পড়ছিলাম বিহারের এক জমিদার এরকম একটা পরীকে বিক্রি করেছেন পাঁচ হাজার ডলারে।'

গন্ধরাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডলার ? টাকায় কত হবে ?'

'এক লাখ আশি হাজারের মতো।' কমলেন্দু চটপট জবাব দিল।

'বাপস। তাহলে আমাদের যে কটা আছে তা বিক্রি করলে আর কোনও অসুবিধে হওয়ার কথাই নয়।' গন্ধরাজ গর্বিত ভঙ্গিতে তাকালেন।

সদানন্দ হাত তুলল।

ন'বাবু খুশি-খুশি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সদু, কিছু বলবে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সরকার এ দেশ থেকে বিদেশে মূর্তি এক্সপোর্ট করার ব্যাপারে নাকি খুব কড়াকড়ি করেছে। বাদল বলছিল।'

ফুলবাবু বললেন, 'আঃ। ওগুলো ঠাকুরদেবতার মূর্তির ব্যাপারে। তা কমলেন্দু তুমিই উদ্যোগ নাও। এই লাইনের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তাড়াতাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করো।'

সদানন্দ বলল, 'তাহলে মাঠ হয়ে অতখানি জমি যে পড়ে আছে, কোনও কাজে লাগছে না, এখন

তো অনেক দাম, বিক্রি করে দিলেই হয়।'

মুখ দেখে মনের কথা বুঝে নিল সদানন্দ, কারও কথাটা ভাল লাগেনি।

ন'বাবু বললেন, 'যে-চিন্তা আমরা করতে পছন্দ করি না তা তোমার মাথায় এল কী করে ? অভাব আছে বলে ঘরের সোনা জমি বিক্রি করব ? এ-বাড়ির একটা ঐতিহ্য আছে সেটা ভুলে যাচ্ছ কী করে ?'

'আশ্চর্য ! মাঠটা কোনও কাজে লাগছে না। মেয়েরা ছাদে ভিড় জমায় কিন্তু ওই মাঠে গিয়ে খেলে না। ছেলেদের ফুটবল ক্রিকেট খেলতে নিষেধ করা আছে কারণ মূর্তিগুলো নষ্ট হতে পারে। সেই সমস্যা যখন থাকবে না তখন খেলার মতো কোনও ছেলে এ-বাড়িতে থাকবে না। তাই বলেছিলাম— !'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমরা আজকালকার ছেলে। নতুন ধরনের ব্যবসা করো। তোমাদের কাছে বাপঠাকুরদার ঐতিহ্যের চেয়ে যেনতেন প্রকারেণ সমস্যার সমাধান করতে চাওয়াই স্বাভাবিক। তবে তোমার জেনে রাখা ভাল, শরিক ভাগাভাগি হওয়ার সময় ওই মাঠটাকে টানা হয়নি। ওটার দায়িত্ব বড়মায়ের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তাঁর অনুমতি ছাড়া ওই জমি নিয়ে কিছু করা যাবে না। কী, আমি ঠিক বললাম তো ?' ন'বাবুর দিকে তাকিয়ে শেষ প্রশ্নটা করতেই তিনি মাথা নাড়লেন, ঠিক।

সদানন্দ বলল, 'তাহলে তো সমস্যা বাড়ল।'

ন'বাবুর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'কী রকম ?'

'পুকুর যার শুধু জল তার নয়, মাছও তার। তাই তো ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে ওই মাঠের বুকে বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে থাকা পরীদের বিক্রি করতে গেলেও বড়মায়ের অনুমতির প্রয়োজন হওয়া উচিত।'

সঙ্গে সঙ্গে গন্ধরাজের মুখ শক্ত হয়ে গেল। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছতেই সুন্দর গন্ধ বাতাসে ভাসতে লাগল, 'মাছ জলে জন্মায় তাই পুকুরের মালিকের হক থাকে। কিন্তু ওই মূর্তিগুলো ওখানে মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়ায়নি। বিদেশ থেকে এনে বসানো হয়েছিল। জমির মালিকানার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'এ কথা তো সত্যি, আমাদের প্রত্যেক পরিবারের আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমরা বড়মায়ের কথা মেনে চলি। তিনি আমাদের মাথার ওপরে আছেন। মূর্তিগুলো বিক্রি করার ব্যাপারে ওঁকে একটু জানিয়ে রাখলেই হবে।'

ন'বাবু বললেন, 'জানিয়ে রাখলে মানে ?'

'যাতে উনি না ভাবেন আমরা ওঁকে অস্বীকার করছি।'

গন্ধরাজ উঠে দাঁড়ালেন, 'ঠিক আছে, আর কিছু বলার নেই। কী হল আপনি নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেবেন। কমলেন্দু, তুমি জাপানি ক্লায়েন্ট খোঁজ করো। পত্রিকায় পড়েছি ওরা পয়সা বেশি দেয়।'

সমরেন্দ্রনাথ হাসল, 'না কাকা, পয়সা দেবে আরবের শেখরা। জাপানিদের পয়সা হয়তো বেশি কিন্তু বড্ড কৃপণ হয়। ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে মাথা ঘামায় কিন্তু শিল্প নিয়ে চিন্তা করে না।'

ফুলবাবু বললেন, 'তাহলে আজ বিকেলেই বড়মায়ের কাছে যাওয়া যাক।'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'সবার যাওয়ার দরকার নেই। দু-তিনজন গেলেই হবে।'

গন্ধরাজ বললেন, 'যারাই যাবে সদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যেও। মনে হয় ওঁকে উনি স্নেহ করবেন। পিতৃহারা তো !'

ন'বাবু বললেন, 'সেটা তো কমলেন্দুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।'

'না। এক হল না। সদানন্দ বিয়ে করেনি। কমলেন্দুর বিয়ে হয়েছে তার মায়ের পছন্দ অনুযায়ী।'

সদানন্দ উঠে দাঁড়াল, 'কিন্তু আজ তো আমি থাকছি না। ব্যবসার কাজে দার্জিলিং যাচ্ছি।'

ন'বাবু বললেন, 'ব্যবসা ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'গাড়ির ব্যবসা ?'

'সবই তো জানেন। দার্জিলিং-এ মারুতি ভ্যানের ডিম্যান্ড বেশি, মারুতি কার, অ্যাম্বাসাডার তমন চলে না। আমরা ওই ধরনের গাড়ি সস্তায় পেয়ে যেতে পারি।' সদানন্দ সরল গলায় লল।

ন'বাবু বললেন, 'সদানন্দ, তোমার এই ব্যবসা নিয়ে কথা উঠেছে।'

'কী রকম ?'

'আমাদের বংশে কেউ চাকরি করেনি। ব্যবসা করেছে। কিন্তু সেই ব্যবসা সবাই সম্ভ্রমের সঙ্গে রেছে। তোমার কাছে যেসব লোক আসে তারা আগে এই বাড়ির গেট ডিঙোতে সাহস করত না। ইসব ছোটলোকদের সঙ্গে তোমার মাখামাখি আমরা পছন্দ করি না।' ন'বাবু বললেন।

'আপনাদের কী করে মনে হল ওরা ছোটলোক ?'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'চেহারা দেখেই বোঝা যায়। নিচুতলার দালাল শ্রেণীর লোক সবাই।'

সদানন্দ হাসল, 'দেখুন, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এই উনিশশো আটানব্বুই যখন গায়ের কাছে খনও আপনারা আঠারোশো আটানব্বুইতে বাস করেন। মনে হওয়াটা যে মিথ্যে নয় তা এখন মাণিত হল। আমি চুরিচামারি করি না, খেটে খাই। বাপঠাকুরদার রেখে যাওয়া ব্যবসার ডিম ংগ্রহ করে বেঁচে থাকি না। যাদের আপনারা ছোটলোক বলছেন তারা আমাকে খবর দেয়। আর ই লোকগুলো ভদ্রলোকের মুখোশ পরা শিক্ষিত মানুষের চেয়ে অনেক বেশি জেনুইন। দয়া করে াপনারা এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না।' কথাগুলো বলে সদানন্দ উঠে চলে গেল।

১২

বড়মা তাঁর ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন। তাঁর কোমরের পাশে হালকা গরম জলের ব্যাগ। ঘাড়ের ীচে বালিশ। আতরবালা চুলে চিরুনি বুলিয়ে কাঁধের শাড়ির ব্রোচ ঠিক করে দিল। বড়মা জিজ্ঞাসা রলেন, 'কজন ?'

আতরবালা বলল, 'তিনজন।'

'হঠাৎ ? উদ্দেশ্য কিছু বলেছে ?'

'না। জরুরি দরকার।'

'হুম্। সদুর মা আসতে চেয়েছে ?'

'হ্যাঁ। আমি খবর দিয়েছিলাম। বলেছেন বিকেলে আসবেন।'

'এইসময় যেন এসে না পড়ে! ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে কথার সময় তার থাকা ঠিক নয়। এলে ও ঘরে বসাস।' শরীরটাকে নাড়িয়ে যেন রক্ত চলাচল ঠিক করলেন বৃদ্ধা 'নাতবউ কী করছে ?'

'টিভি দেখছে।'

'যা, এবার ডাক ওদের।' বালিশটাকে পিঠের নীচে নামিয়ে ঋজু ভঙ্গিতে বসার চেষ্টা করলেন বড়মা। আতরবালা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। ন'বাবু, সমরেন্দ্রনাথ এবং কমলেন্দু ভেতরে ঢুকে নমস্কার করল।

ওই একই ভঙ্গিতে বড়মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার ?'

ন'বাবুরা সামনের চেয়ারে বসলেন, 'আপনাকে একটু বিরক্ত করছি- !'

বড়মা জবাব দিলেন না। গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইলেন।

ন'বাবু বললেন, 'আমাদের এই বাড়িটার কোনও সংস্কার দীর্ঘদিন করা হয়নি। ছাদ ফেটে

গিয়েছে, পলেস্তারা খসেছে, গাছও গজিয়েছে। বারান্দাগুলোতেও ফাটল ধরেছে। এখনই মেরামত না করলে আর বাসযোগ্য থাকবে না।'

আতরবালা দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিল, বলে উঠল, 'আমাদের ওই ঘরটার দেওয়াল ফেটে গিয়েছে। ভয় লাগে খুব।'

বড়মা বললে 'কথা হচ্ছে আমাদের মধ্যে। আতর, তুই তোর কাজে যা।' আতরবালা সুড়ুত করে বেরিয়ে গেল।

ন'বাবু মাথা নিচু করে বললেন, "মুশকিল হল, নড়বড়ে বাড়ির মেরামতিতে প্রচুর টাকার দরকার। আমাদের পক্ষে তা জোগাড় করা অসম্ভব ব্যাপার।'

'তোমরা কি আমার কাছে টাকা চাইতে এসেছ ?'

সমরেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, 'না-না-না, আপনি আমাদের মাথার উপরে আছেন। আছেন বলে এখনও ভরসা পাই। আপনার অনুমতি ছাড়া তো আমরা কোনও কাজ করি না। একটা পথ বের হয়েছে, সেই পথে চললে কারও উপর চাপ পড়বে না অথচ বাড়িটা বেঁচে যাবে।'

'বাড়িটা যখন রক্ষা পাবে তখন আর ইতস্তত করছ কেন ?'

'না, আপনার অনুমতি পেলেই কথাবার্তা শুরু করা যেতে পারে।'

'কী সেটা !' বড়মা তিনজনকেই দেখলেন।

সমরেন্দ্রনাথ কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। তিনি কমলেন্দুকে ইশারা করলেন বলার জন্যে। কমলেন্দু নড়েচড়ে বসল। এই বৃদ্ধা মহিলা তাঁর কাছে বিস্ময়। কমলেন্দুর অবসর কাটে গল্পের বই পড়ে। এ রকম চরিত্রের কথা সেখানেই পাওয়া যেতে পারে বলে তার ধারণা। বৃদ্ধা এবার তার দিকে তাকিয়ে আছেন। কমলেন্দু বলল, 'বাড়ির সামনে আর বাগান'টাগান তো নেই। হুটহাট লোকজন ঢুকে যায়। পাঁড়েজির পক্ষে এই বয়সে সবসময় পাহারা দেওয়াও সম্ভব নয়। আপনি নিশ্চয়ই এসব কথা জানেন !'

'না, জানি না। যতক্ষণ ওর শরীরে প্রাণ আছে কর্তব্য থেকে সরবে না বলেই জানি।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে শরীরের তো বয়স হচ্ছে। ইচ্ছে থাকলেও পেরে ওঠে না। বাগান এখন মাঠ হয়ে গিয়েছে। আর ওই মাঠে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে মূর্তিগুলো।'

'মূর্তিগুলো ?'

'হ্যা, পরীর মূর্তিগুলো। শ্যাওলা পড়ে দাগ ধরে গিয়েছে, পাখিরা নোংরা করছে। তাই সবাই মিলে ঠিক করেছি ওগুলোকে যখন রক্ষণাবেক্ষণ করা যাচ্ছে না, তখন বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকায় বাড়ি সারিয়ে নেব।' কমলেন্দু বুঝিয়ে বলল।

'সবাই মিলে যখন ঠিক করা হয়েছে তখন আমার কাছে আসার কী দরকার !'

ন'বাবু বললেন, 'আপনি মাথার ওপরে আছেন। আপনার অনুমতি ছাড়া তো কোনও কাজ করা হয় না।'

'সবাই মিলে ঠিক করার আগে সেটা খেয়াল হয়নি ?'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আসলে নিজেরা আলোচনা না করে তো আসা যায় না।'

বড়মা সট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তাঁর কুঁচকে যাওয়া চামড়ায় একটু কাঁপন লাগল। কয়েক সেকেন্ড ওইভাবে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই পরীদের বয়স কত তোমরা জানো ? তোমরা কি জানো ওরা সবাই একসঙ্গে আসেনি। কর্তামশাই-এর ঠাকুরদা এক এক বছর এক একজনকে এনেছিলেন। ওদের এমনভাবে বসানো হয়েছিল যাতে তিনি তাঁর দোতলার ঘরের জানলা থেকে প্রত্যেকের মুখ দেখতে পান। কর্তামশাই-এর ঠাকুমা ওদের বলতেন সতীন।' বড়মা আবার চুপ করলেন। এরা তিনজন অপেক্ষা করছিল। আগ বাড়িয়ে কেউ কথা বলতে চাইছিল না।

শেষ পর্যন্ত বড়মা বললেন, 'ওই জমিটা বোধহয় ভাগ হয়নি, না ?'

ন'বাবু বললেন, 'আজ্ঞে না। ওটা আপনার নামেই আছে।'

'দ্যাখো, আমি যখন সেই বারো বছর বয়সে এই বাড়ির বউ হয়ে এসেছিলাম তখন থেকে এদের বাড়ির মানুষ হিসেবেই জেনে এসেছি। তোমাদের হয়তো ওদের সম্পর্কে সেরকম দুর্বলতা নেই।

মজার কথা হল, ছেলেরা আশেপাশে থাকলে আমরা ওই পরীদের দিকে তাকাতে পারতাম না। ওদের কারও উদ্ধত ভঙ্গি, কারও লজ্জায় নুয়ে পড়া, কারও উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকা আমরা দেখতাম জ্যোৎস্না রাত্রে জানলার এপাশে দাঁড়িয়ে। যারা ওদের বানিয়েছিল তারা শরীরে বেশি জামাকাপড় রাখেনি। কর্তামশাই-এর ঠাকুরদা বলতেন মানুষ তার সব কুমন ওখানে রেখে বাড়িতে ঢুকবে যেমন কোনারকের মন্দিরে ঢোকে। তা এখন তোমাদের সব গেছে। থাকার মধ্যে রয়েছে এই বাড়ি আর ওই মূর্তিগুলো।'

ন'বাবু বললেন, 'বুঝতেই পারছি, আপনার খারাপ লাগছে।'

বড়মা বললেন, 'আমার খারাপ লাগায় তোমাদের কী এসে গেল! তোমার মেয়ে তো এখন তোমার কাছেই আছে। তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কী সব গোলমাল হয়েছে বলে কে যেন বলছিল। তা তাকে তো কদিন বাদে তোমাদের দায় বলে মনে হতে পারে। ওরকম মেয়ে ঘরে থাকলে আদর পায় না। তোমার অবর্তমানে তার ভাইরা কি তাকে জোর করে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারবে?'

ন'বাবুর মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। মেয়ের ব্যাপার নিয়ে আর দুজন শরিকের সামনে কথা বলা তাঁর পক্ষে রীতিমতো অপমানজনক। কিন্তু নিজেকে সামলে তিনি বলতে পারলেন, 'মানুষের সঙ্গে মূর্তির তুলনা কি চলে?'

'চলে। তোমরা যাদের মূর্তি বলে দেখছ তারা আমাদের কাছে নিছক মূর্তি নয়। এ বাড়ির ঠাকুরদালান, মায়ের মূর্তি এমনকী এই দেওয়ালগুলোও আমার কাছে আত্মীয়ের মতো।' বড়মা চোখ বন্ধ করলেন।

সমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে?'

বড়মা চোখ খুললেন, 'বিষয় সম্পত্তি যখন ভাগাভাগি হয়েছিল তখন ওই মূর্তিগুলো তো বাগানে ছিল। তাই না?'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'হ্যাঁ'।'

'তাহলে মূর্তিসুদ্ধু বাগান আমার উপর অর্পণ করা হয়, তাই তো?'

ওরা কেউ জবাব দিল না। কমলেন্দুর মনে পড়ল সকালের আলোচনায় পুকুরের জল এবং পুকুরের মাছের উদাহরণটি। কিন্তু এই বৃদ্ধার কথায় তো যুক্তি আছে। এই সময় টেলিফোন বাজতে লাগল ভেতরের ঘরে। সেটা থামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, একটা রিসিভার নিয়ে আতরবালা ছুটে এল এঘরে। চাপা গলায় বলল, 'খোকা।'

বড়মা ঘড়ির দিকে তাকালেন, 'এখন তো সেখানে রাত। দে।'

রিসিভার কানে নিয়ে তিনি বললেন, 'খোকা বলছ নাকি?'

এরা তিনজন দেখল বৃদ্ধার মুখটা খুশিতে ভরে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাল আছি। এত শিগ্‌গির মরব না। হ্যাঁ সবাই ভাল আছে।' তারপর আবার ওপাশের কথা শোনা, শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে যাওয়া, 'তা সিদ্ধান্তটা কি তুমি নিজেই নিয়ে নিলে না এখান থেকে চিঠি গিয়েছে, চাপ দেওয়া হয়েছে?' আবার ওপারের কথা শোনা। তারপর বললেন, 'আমার সঙ্গে কথা না বলে যখন সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছ তখন আর লোক দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা কেন? তার বাপকে লিখে দাও, সে যা করার করে রাখবে। তুমি আমার সামনে এসে কথা বলো। আমেরিকা থেকে কথা ছুড়ে দিলে আর আমি সেটা বুঝে যাব এটা ভাবছ কেন? আমার বয়স হয়েছে। বুঝতে সময় লাগে। আতর, এটা নাতবউকে দে।' রিসিভারটা বড়মা আতরবালার দিকে উচিয়ে ধরতেই সে সেটাকে নিয়ে দ্রুত ভেতরে চলে গেল।

বৃদ্ধার চিবুক বুকের ওপর নুয়ে পড়ল। তিনজনেই বুঝতে পারছিল ফোনটা কে করেছিল! সুধীন্দ্রনাথ—এ বাড়ির একমাত্র ছেলে যে ফার্স্ট ডিভিসনে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছিল। হায়ার সেকেন্ডারিতেও তাই। যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সে চলে গিয়েছে আমেরিকায়। তার ব্যবসা করার মানসিকতা নেই। অথচ এ বাড়ির ছেলে হয়ে এখানে চাকরি করে নিয়ম ভাঙার চেয়ে বিদেশে চলে গিয়ে সে এখন খুব উন্নতি করেছে। অবশ্য এর মধ্যে ফিরে এসে তাকে বিয়ে করতে

হয়েছে বড়মার নির্দেশে। খুব ধুমধাম হয়েছিল তখন।

বড়মা মুখ তুললেন, 'এবার আমি একটু বিশ্রাম নেব।'

তিনজনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সমরেন্দ্রনাথ এবং ন'বাবু বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' ওরা তিনজন দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন। বড়মা ডাকলেন, 'শোনো!'

ওরা ঘুরে দাঁড়াল।

বড়মা বললেন, 'যে দেশে মানুষেরই কোনও দাম নেই সে দেশে পাথরের পরীর আর কত দা হবে! আমি ভেবে পাচ্ছি না!

কমলেন্দু উৎসাহিত হল। 'আপনি ঠিকই বলছেন। এ দেশে ওদের তেমন দাম হবে না। কিন্তু পরীগুলো বিদেশি। গ্রিক পুরাণের চরিত্র ধরে গড়া। ওদের বয়সও বেশ হয়েছে। বিদেশে যার কিউরিও-এর ব্যবসা করে তারা বেশি দাম দেবে।'

'কী জানি!' হাত উঠালেন বড়মা, 'আচ্ছা, এই মতলবটা তোমাদের কে দিয়েছে?'

তিনজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ন'বাবু গন্ধরাজের নামটা বলতে গিয়েও বললেন না। বড়ম যে গন্ধরাজকে অপছন্দ করেন তা এ বাড়ির সবাই জানে। তিনি বললেন, 'আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করেছি।'

'মনে হয় না।' বড়মা বললেন, 'দ্যাখো। সব তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। যার যা প্রয়োজন তা নিয়ে যাচ্ছে। আমি কেন আর যক্ষের মতো আগলে রাখি। দ্যাখো!'

ওঁরা তিনজন বেরিয়ে যেতেই আতরবালা এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। দিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'এদের কারও ঘরে কি টাকা পয়সা নেই?'

'থাকলেও সেটা পাঁচ ভূতের বাড়ির পেছনে খরচ করবে কেন? নাতবউকে ডাক।'

আতরবালা গলা নামাল, 'বকাঝকা না করাই ভাল। টেলিফোন রেখে দিয়ে কাঁদছিল।'

'কাঁদছিল? সেকী! এখন তো তার হাসার সময়। ডেকে দে।'

নাতবউ এল। চিবুক বুকের ওপর ঠেকিয়ে একপাশে দাঁড়াল। বড়মা তার মুখের দিকে তাকালেন, 'হঠাৎ কান্নাকাটি কেন?'

নাতবউ জবার দিল না।

'প্রশ্ন করে উত্তর না পেলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়।'

নাতবউ একবার তাকাল, 'ও যেতে বলছে বারবার করে। কিন্তু!'

'কিন্তু?'

'আপনাকে ফেলে আমি যাব কী করে?' কেঁদে ফেলল নাতবউ।

বড়মা বললেন, 'আতর, আমার বুকের ওষুধটা দে। শিগ্‌গির!'

একটু আগে সদানন্দ রওনা হয়েছে শিয়ালদা স্টেশনের পথে। জানলা দিয়ে তার যাওয়া দেখছিলেন নন্দিনী। সায়নের জন্যে নতুন সোয়েটার আর নারকোলের নাড়ু-র শিশি প্যাক করে দিয়েছেন সদানন্দকে। এই সময় হেনা এল।

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? এ সময়?'

'আমার আর সময় আর অসময়। কাল বাপের বাড়ি যাচ্ছি।'

'হঠাৎ।'

'তিনি চিঠি লিখেছেন ফিরতে আরও দিন দশেক দেরি হবে। শিমলের পাহাড় থেকে কুলু-মানালি যাবেন। ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। অতদিন আমি এই বন্দীশালায় থাকতে পারো না।' হেনা বলল।

'বলেছিস!'

'না বলার কী আছে। শুনে মুখ হাঁড়ি করে ফেলল!' হেনা খুব শীতল গলায় বলল, 'আমার স্বামীর মা যদি না হত তাহলে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতাম। অদ্ভুত মেয়েমানুষ।'

নন্দিনী হেনার হাত ধরল, 'তোর কষ্ট আমি বুঝি। কিন্তু এই রকম মন নিয়ে তো একসঙ্গে থাকা

যায় না। তুই উপেক্ষা কর।'

হেনা বলল, 'সে কী ? থাকা যায় না মানে ? এ বাড়ির কত বউ এর চেয়ে অনেক বেশি অত্যাচার সহ্য করে আমাদের আগে মুখ বুজে থেকে গেছে। যায়নি ? এবার ও ফিরে আসুক, আমি হেস্তনেস্ত করব। হয় মাতৃভক্ত কোলের ছেলে হয়ে থাকুক নয় প্রতিবাদ করুক। আর নয়।'

'যদি প্রথমটাই চায় ?' নন্দিনী বললেন, 'কী করবি তুই ? আমাদের না আছে পড়াশুনা না আছে নিজে কিছু করার ক্ষমতা। বাপের বাড়িতে গেলে দু-দশদিন আদর জুটবে। কিন্তু যেই বুঝবে দায় হয়ে গেছি তখন ? তাই মাথা গরম না-করে বুদ্ধি খরচ করে ম্যানেজ কর।'

'মরতে তো বাধা নেই !'

'পাগল ! এই বয়সে মরবিই যদি তো বাঁচলি কেন ? আর তুই মরলে কারও কিছু হবে ? শাশুড়ি আবার তার ছেলেকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাবে। পৃথিবীর সব কিছু ঠিকঠাক চলবে। কিন্তু আজ কী হয়েছে বল তো ?'

'যা হয়। শ্বশুর-বাবার মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। মাইগ্রেন আছে। যন্ত্রণা যখন শুরু হয় তখন কোনও ওষুধে কাজ দেয় না। ছটফট করেন। ওর ছেলে একটা চাইনিজ বাম এনে দিয়েছিল। সেটা কপালে মালিশ করলে একটু যন্ত্রণা কমে। আমি তাই ভদ্রমহিলাকে বললাম, বাবা খুব যন্ত্রণা পাচ্ছেন, একটু মলমটা মালিশ করে দিলে হয়। উনি চোখ উল্টে বললেন, কেন তার নিজের আঙুল কি ক্ষয়ে গেছে ! নাকি তোমার ইচ্ছে হচ্ছে ব্যাটাছেলের কপালে হাত বোলাবার ? বোঝ ! মুখের উপর বলে দিয়েছি, আপনার মনে এত ময়লা, বাবা যে কী করে এতকাল আপনার সঙ্গে আছেন ভেবে পাই না।

নন্দিনীর চোখ বিস্ফারিত হল, 'সর্বনাশ !'

'আমি এখন আর ওঁকে ভয় করি না।' হেনা স্পষ্ট গলায় বলল।

এই সময় ঊর্মিলা এল। তাকে দেখে নন্দিনী বলে উঠল, 'আরে ! হলটা কী ! আজ দেখছি তোমরা সবাই বিদ্রোহে নেমে পড়েছ !'

ঊর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে ?'

'এই ভর সন্ধেতে বেরিয়ে এসেছ !'

'বাঃ, আমার পাহারাওয়ালা বলতে তিনি। একটু আগে আমার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে, কথা বন্ধ। তাই চলে এলাম।' ঊর্মিলা বলল।

হেনার এসব কথা ভাল লাগছিল। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করার সুযোগ যার আছে সে তো গর্ব করে বলবেই। তিনি এখন কুলুমানালিতে।

নন্দিনী বললেন, 'পারো বটে।'

'তোমরা শোনোনি। বাগানের পরীদের বিক্রি করে দেবেন এঁরা। টাকা তুলে তাই দিয়ে বাড়ি সারাবেন ! অথচ আমার উনি দিবারাত্র সাহিত্য পড়ছেন, আকাদেমিতে নাটক দেখতে যান, ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের টিকিট কাটেন। আমি বললাম, তোমরা তো এরপর টাকার জন্যে বাড়ির বউদেরও বিক্রি করে দেবে। তুমি আর শিল্পের বড়াই কোরো না।' ঊর্মিলা বলল।

হেনা জানত না ব্যাপারটা। সবিস্ময়ে বলল, 'মূর্তি বিক্রি করবে ?'

ঊর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি শোনোনি ? তোমার শ্বশুরমশাই তো মিটিং-এ গিয়েছিলেন। শুনলাম খবরটা জানার পর পাঁড়েজি খুব ভেঙে পড়েছে।'

হেনা সুযোগ পেল, 'শ্বশুরমশাই-এর দোষ নেই। খবরটা আমাকে বলতে চাইলেও বউ-এর ভয়ে পারবেন না। কিন্তু পরীগুলো বিক্রি হয়ে যাবে ! আচ্ছা, বড়মা অনুমতি দিয়েছেন ?'

ঊর্মিলা বলল, 'প্রথমে নাকি খুব আপত্তি করেছিলেন। তারপর হঠাৎই নাকি নিমরাজি হয়েছেন।'

নন্দিনী বললেন, 'শুনলে প্রথমে খারাপ লাগে। কিন্তু এই বাড়িটাকে বাঁচানো যে বেশি দরকার। এত টাকা খরচ করার সামর্থ্য আর কজনের আছে বল। আর মূর্তিগুলোকে কেউ যত্ন করে না। চুরি হয়ে গেলেও কিছু করার নেই।'

কথাটা মনঃপূত হল না উর্মিলার। কথা ঘোরাতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি দার্জিলিং-এ গেলে না ?'

'নাঃ। যাওয়া হল না। ওঁর পক্ষে এখনই যাওয়া অসম্ভব। ছেলেটাকে চিঠি দিয়েছিলাম যাচ্ছি বলে, এত মন খারাপ লাগছে। আজ সদানন্দ গেল, ওর হাতে অনেক বুঝিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি।' নন্দিনী বলল।

হেনা জিজ্ঞাসা করল, 'যাওয়া অসম্ভব কেন ?'

'উনি ওঁর ব্যবসা নিয়ে খুব ব্যস্ত।' মুখ গম্ভীর হল নন্দিনীর।

'তাহলে চলো না, আমরাই যাই।' হেনা উৎসাহে বলল।

'আমরা ?' চমকে উঠলেন নন্দিনী।

'হ্যাঁ। কী, তুমি যাবে ?' হেনা জিজ্ঞাসা করল উর্মিলাকে।

উর্মিলার চোখমুখ ঝলমল করে উঠল, 'গেলে হয় !'

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'সঙ্গে কোনও পুরুষমানুষ থাকবে না ?'

হেনা বলল, 'দরকার কী ! আমাদের স্যুটকেস ভারি না করলেই হল। আজ মেয়েরা সারা পৃথিবীতে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমরা তিনজন দার্জিলিং-এ যেতে পারব না ?'

নন্দিনী চমকালেন, 'খুব তো সাহস দেখানো হচ্ছে ! শাশুড়ি ছাড়বে ?'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'শোন, এটা এই বাড়ির কেউ সহ্য করতে পারবে না। একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে যাবে।' নন্দিনী সাবধান করলেন।

'কী বিশ্রী কাণ্ড হবে ? গায়ে হাত তুলবে ? তেমন হলে ওকে জেলে যেতে হবে। আমার মায়ের কাছে দুটো চিঠি খামে বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। বলেছি আমি আত্মহত্যা করেছি খবর পাওয়া মাত্র থানায় গিয়ে খামদুটো তুলে দেবে।' হেনা সগর্বে বলল।

উর্মিলার মাথায় কথাটা ঢুকেছিল। সে বলল, 'আমরা যাব।'

'তুমিও রাজি ?' নন্দিনী একটু ধন্দে।

'হ্যাঁ। আমরা অন্যায় করছি না। একটা অসুস্থ ছেলেকে দেখতে যাচ্ছি। তার জন্যে কে বিশ্রী কাণ্ড করবে, সহ্য করতে পারবে না তাতে আমার কিছু এসে যায় না। দ্যাখো, আমাদের কোনও ক্ষমতাও নেই। আর পাঁচটা শিক্ষিত রোজগেরে মেয়ে যা পারে তা আমরা পারব না। তাই বলে পড়ে পড়ে মার খাব কেন ? সেই সাপের গল্প। না-কামড়াতে পারি, ফোঁস করতে দোষ কোথায় ! কবে টিকিট কাটাব বলো।'

উর্মিলা দৃঢ় গলায় জানতে চাইলে নন্দিনী বুঝলেন ব্যাপারটা সত্যি হাসিঠাট্টার মধ্যে নেই। এই বাড়ির তিন বউ একা একা ট্রেনে চেপে বাইরে যাচ্ছে, খবরটা চাউর হলেই ঝড় উঠবে। সায়নের বাবার সঙ্গে কথা না বলে তিনি কী করে এদের হ্যাঁ বলেন। সায়ন তাঁর ছেলে, তাকে দেখতে যাওয়ার জন্যে তিনি ছটফট করছেন। কিন্তু এরা যেতে চাইছে প্রতিবাদ জানাতে। এ বাড়ির দেড়শো বছরের পাপ যা ওদের ওপর চেপে বসেছে তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই, তাই সায়নকে সামনে রেখে ওই একটু ফোঁস করে ওঠা। নন্দিনী বললেন, 'বেশ তো, সবাই একসঙ্গে গেলে হয়। একটু ওঁর সঙ্গে কথা বলি।'

হেনা জিজ্ঞাসা করল, 'যদি তোমার উনি না বলেন ?'

'ছেলেকে দেখতে যাচ্ছি, উনি না বলবেন কেন ?' নন্দিনী হাসলেন।

হেনা বলল, 'তুমি কাল বাদে পরশুর টিকিট কাটো। আমি আর একদম দেরি করতে চাই না।'

সদানন্দের মা বিধবা হওয়ার পর আর চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াননি। এ বাড়ির অন্য বউরা তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করে না। তাই তিনি তাঁর নিজের সংসার এবং ঠাকুর নিয়ে পড়ে থাকেন চুপচাপ। এ বাড়িতে ব্যাঘ্রবাহিনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই যে-যার ঘরে পছন্দমতো দেবদেবীর পূজা-আর্চা করে থাকেন।

আজ সদানন্দের মাকে আসতে হয়েছে তাঁর গণ্ডি পেরিয়ে। সঙ্গে আছে কাজের মেয়েটি। সা

ন তাঁর কপাল ঢেকেছে। হাতে একটি বড় খাম।

আতরবালা দরজা খুলল, 'ওঁর শরীর খারাপ। কাগজটা আমাকেই দাও।'

সদানন্দর মা ইতস্তত করছিলেন এবং তখনই ভেতর থেকে গলা ভেসে এল, 'থাক, ভেতরে নিয়ে আয়।'

আতরবালা বিরক্ত হয়ে নিচু গলায় বলল, 'বেশি কথা বোলো না। এসো।'

বড়মা শুয়েছিলেন ইজিচেয়ারে। বললেন, 'কে ? সদুর মা ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' মাথার কাপড়টা আরও নীচে টানলেন প্রৌঢ়া।

'তোমার ছেলেকে নিয়ে নানান কথা হচ্ছে। চাকরি না-করে ব্যবসা করতে হবে বলে নীচে নামতে হবে কেন ? তার ব্যবসার সঙ্গীসাথীদের সম্পর্কে এ বাড়ির অনেকেরই আপত্তি আছে। ছেলের স্বভাব চরিত্র কী রকম ?'

'আপনার আশীর্বাদে কোনও অন্যায় করতে দেখিনি।'

'বাপ মরা ছেলে ! যতদিন ডানা ওঠেনি ততদিন তোমার কাছে ছিল। তুমি তোমার মতো করে মানুষ করেছ। কিন্তু ডানা উঠলেই মাথার ওপর আকাশ দেখতে পেয়েছে। সেখানে কী করে বেড়াচ্ছে, তার খবর কী করে রাখবে ?'

'আজ্ঞে, বোঝা যেত !'

'যেত ? ওর বাপের বেলায় তুমি বুঝেছিলে ?'

সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠলেন সদানন্দর মা। তাঁর বিবাহিত জীবনে যা ছিল অপমানের, হেরে যাওয়ার, বৈধব্যে তাই হয়ে গেল কাদা-গোলা লজ্জা। সেই লজ্জার পাঁক থেকে এ-জন্মে মুক্তি পাবেন না তিনি।

বড়মা শুয়ে শুয়েই প্রৌঢ়ার মুখের পরিবর্তন লক্ষ করলেন, 'তুমি কেন কষ্ট পাচ্ছ ? তুমি তো কোনও অন্যায় করনি ! এ বাড়ির কিছু পুরুষ ঘরের বাইরে গিয়েছিল যৌবনের নানান স্বাদ নিতে। তবে তারা রাত পোহানোর আগেই নিজের বিছানায় ফিরে আসত। তোমার স্বামীর মতো নির্বোধ ছিল না তারা। আর যে নির্বোধ তার জন্যে দুঃখ করা যেমন বোকামি, তার জন্যে লজ্জা পাওয়ারও কোনও অর্থ নেই।' বড়মা নিঃশ্বাস নিলেন, 'আমি বাপের কথা তুললাম যাতে ছেলের বেলায় এই একই ব্যাপার না ঘটে। ওকে এখন খুঁটিতে বাঁধতে হবে। পাথুরেঘাটার হরিমাধব সাহার নাতনি নাকি ডাগর হয়েছে। সুপাত্র পেলে দিতে তাদের আপত্তি নেই।'

'বিয়ে ?'

'হ্যাঁ। আকাশ থেকে পড়লে যেন। কত বয়স হয়েছে ছেলের ?'

'বাইশ।'

'তবে ? এখনকার মেয়েরা অনেক বেশি বুদ্ধিমতি, সজাগ। তোমাদের মতো নয়। তারা ঠিক স্বামীকে গোয়ালে বেঁধে রাখবে। এখন এ বাড়ির কোনও স্বামী ভোরের আগে বাড়ি ফেরে ? ফেরে না। সে-সাহসই হবে না। ঠিকুজি এনেছ ?'

খাম থেকে পুরনো কাগজটা বের করে চশমার নীচে নিয়ে এলেন বড়মা। অনেক কষ্টে পড়ে বললেন, 'সর্বনাশ !'

প্রৌঢ়া অবাক হলেন, কেন ?'

'সিংহ রাশি, রাক্ষস গণ। এরপর আর কী কী খারাপ আছে তা কে জানে। এমন ছেলেকে জামাই করতে কটা বাপ চাইবে ! না না, এ ঠিকুজি চলবে না। আর তুমিও কীরকম মা, ছেলের ক্ষতি হবে জেনেও এমন ঠিকুজি বুকে ধরে বসে আছ ? সদু কোথায় ?'

'সে দার্জিলিং-এ গিয়েছে।' প্রৌঢ়া যোগ করলেন, 'ব্যবসার কাজে।'

'সেখানে আবার তার কী ব্যবসা ? শুনেছি তো গাড়ির দালালি করে !'

'আমি ঠিক জানি না।'

বড়মা ডাকলেন, 'আতর।'

পেছনে দাঁড়ানো আতরবালা সাড়া দিল, 'হ্যাঁ।'

'পাঁড়েজিকে বল, হাতিবাগানের নকড়ি ভটচাযকে খবর দিতে। সে যেন কালই আমার সঙ্গে দেখা করে। যা।'

আতরবালা বেরিয়ে যেতেই বড়মা বললেন, 'এই ঠিকুজির কথা কেউ জানে ?'

'না। আলমারিতেই এতদিন ছিল।'

'তাহলে কাউকে জানানোর দরকার নেই। সদুর একটা ভাল ঠিকুজি করিয়ে নিচ্ছি। নকড়ি আমার বিশ্বস্ত লোক। ওটা হয়ে গেলে তোমাকে খবর দেব। ঠিক আছে, এখন তুমি যেতে পারো।' বড়মা চোখ বন্ধ করলেন।

কমলেন্দু অবাক। ঊর্মিলার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে।

ঊর্মিলার ঠোঁটে হাসি, 'তোমার মুখের ছবি তুলে রাখব ?'

কমলেন্দু শুয়ে বই পড়ছিল এতক্ষণ, এবার উঠে বসল, 'ব্যাপার কী বলো তো ?'

'সায়নকে দেখতে আমরা তিনজন যাব, সেই সঙ্গে দার্জিলিং বেড়িয়ে আসব। এর মধ্যে অন্য কোনও ব্যাপার নেই।' ঊর্মিলা বলল।

'হঠাৎ ?'

'হঠাৎ মানে ?'

'তুমি জানো না, এবাড়ির মেয়েরা একা কোথাও যায় না।'

'একা তো যাচ্ছি না। তিনজনে একসঙ্গে থাকলে একা বলা যায় ?'

'তুমি বুঝতে পারছ না। দার্জিলিং-এ যেতে ইচ্ছে করছে, বেশ তো আমার সঙ্গে চলো। কিন্তু তিনজন মহিলার যাওয়া ঠিক হবে না।'

'কেন ?'

'প্রথমত আজকাল রাস্তাঘাটে কত কী হয়ে যাচ্ছে। তারওপর পাহাড়ে গিয়ে তিনজন মহিলা হোটেলে উঠেছে জানলে বদ লোকজন পেছনে লাগবেই।'

'তারপর ?'

'তা ছাড়া, এবাড়ির পুরুষরা খবরটা হজম করতে পারবে না।'

'বদহজম হলে কী করবে ?'

'মিটিং হবে। বংশের, বাড়ির ঐতিহ্য নষ্ট হয়েছে বলে বিক্ষোভ করবে !'

'তারপর ? আমাদের বাড়িতে ঢোকা বন্ধ করে দেবে নাকি ?'

কমলেন্দুকে অসহায় দেখাল এখন। সে বলল 'ঊর্মি, প্লিজ, একটু বুঝতে চেষ্টা করো। আমি মানছি এবাড়ির সমস্ত নিয়মকানুন আধুনিক নয়। মেনে নেওয়া মুশকিল। কিন্তু নিয়ম না ভাঙলে, যেখানে অসুবিধে নেই সেখানে সেটা ভাঙার কী দরকার ?'

ঊর্মিলা বলল, 'আমরা কোনও অন্যায় করছি না।'

কমলেন্দু খাট থেকে নেমে দাঁড়াল, 'হেনার বাড়ির লোকজন জানেন ?'

'না। যাকে জানানোর কথা তিনি সিমলে ছেড়ে কুলুমানালিতে গেছেন বেড়াতে। আশ্চর্য। তোমাদের পুরুষজাত এইরকমই হয়। নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝো না। স্ত্রীকে দজ্জাল মায়ের দাঁতের তলায় ফেলে তিনি গেছেন বন্ধুদের নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ফুর্তি করতে।'

'তোমার শাশুড়ি নেই তাই জানো না, শাশুড়ি-বউ-এর সম্পর্ক প্রথমে কখনওই ভাল থাকে না। একসঙ্গে থাকতে থাকতে একসময় ঠিক হয়ে যায়।'

'তাই ? যে শাশুড়ি ছেলের বউকে সন্দেহ করে শ্বশুরের সঙ্গে প্রেম করছে বলে তাদের সম্পর্কও ঠিক হয়ে যায় ?'

কমলেন্দু কিছু বলতে পারল না। ঊর্মিলার কাছে এই কাহিনী সে আগেও শুনেছে। শুনে অবাক হয়েছে।

ঊর্মিলা বলল, 'শাশুড়িকে হেনা বলতে যাবে কেন ? কোন দুঃখে ? শ্বশুরকে বলতে পারে। তা তিনি তো শালগ্রাম শিলা, তাঁর কোনও ক্ষমতা নেই। আর যাকে বলতে পারত সে তো চিঠিতে তার

ফূর্তির কথা জানিয়েই খালাস। হেনা কাল এখান থেকে বাপের বাড়ি চলে যাবে। আর সেখান থেকেই স্টেশনে আসবে। দয়া করে এটা চাউর কোরো না।'

কমলেন্দু বলল, 'আর সায়নের মা ?'

'মা যদি অসুস্থ ছেলেকে দেখতে যেতে চায় তাহলে কোন বাবা তাকে বাধা দেবে ? তিনি নাকি ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত যে কলকাতার বাইরে যাওয়ার সময় পাচ্ছেন না। যাক গে, তুমি আমাদের একটা উপকার করবে ?'

কমলেন্দু কিছু না বলে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

উর্মিলা বলল, 'দার্জিলিং মেলে তিনটে টিকিট কেটে দেবে ? পরশু যেতে চাই।'

কমলেন্দু কাছে এল। উর্মিলার কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বলল, 'উর্মি আমি যদি তোমাদের সঙ্গে যাই তাহলে কি খুব রাগ করবে ?'

উর্মিলা দুর্বল হল। সে মাথা নাড়ল, 'ভাল লাগত। খুব ভাল লাগত। তোমার সঙ্গে আমি কখনও পাহাড়ে যাইনি। তুমি সঙ্গে থাকলে !'

'তাহলে আমি যাই ?' কমলেন্দু মুখ নামাল।

'না।' মাথা নাড়ল উর্মিলা, 'তাহলে আমি হেরে যাব।'

'বেশ। কেউ জানবে না। তোমার সঙ্গে যারা যাচ্ছে তারাও না।'

'সেকী ?'

'হ্যাঁ। আমি দূর থেকে তোমাকে দেখব। আর সুযোগ পেলে আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে। এতে আপত্তি কোরো না, প্লিজ।'

উর্মিলার মুখ চোখে খুশি উপছে পড়ল। তারপরই গম্ভীর হয়ে বলল, 'দুর। তাতে আমার আরও খারাপ লাগবে। একই শহরে থাকব অথচ তোমাকে কাছে পাব না ভাবলেই খুব কষ্ট হবে।'

কমলেন্দু ঘড়ি দেখল। এখন বেশি রাত হয়নি। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিয়ে বলল, 'একটু আসছি।'

উর্মিলা স্বামীর এইরকম আচরণে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

'এসে বলব।' কমলেন্দু পা বাড়াল !

সায়নের বাবা দরজা খুললেন। কমলেন্দুকে দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন, 'ও তুমি। এসো। কী ব্যাপার ?'

'এই এলাম একটু।'

সোফায় বসার পর সায়নের বাবা বললেন, 'বিকেলে যখন বাড়ি ফিরছিলাম তখন ন'বাবু বলছিলেন সদানন্দর ব্যবসা নিয়ে একটা মিটিং ডাকার কথা ছিল। সেটা আজ হচ্ছে না। আমি বললাম ওই ব্যাপার নিয়ে এখনই জল ঘোলা করার দরকার কী। হ্যাঁ, কিছু সাবস্ট্যান্ডার্ড লোকজন ওর কাছে আসে বটে কিন্তু তারা তো কোনও অশান্তি করেনি। দিনকাল বদলে যাচ্ছে দ্রুত। এই ব্যাপারটা যতক্ষণ পারা যায় ততক্ষণ উপেক্ষা করাই ভাল। তুমি কি ওই ব্যাপারে কথা বলতে এসেছ ?'

কমলেন্দু বলল, 'না-না। আমি আপনাদের সঙ্গে অন্য ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি। কাকিমা কোথায় ?'

নন্দিনী ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

কমলেন্দু বলল, 'কাকিমা, আমি কালিম্পং-এর দিকে একটা কাজে যাচ্ছিলাম। তা আজ উর্মিলার কাছে শুনলাম আপনারা সায়নকে দেখতে যেতে পারেন। তাই বলছিলাম কি আমিও এই সুযোগ ছাড়ি কেন ? ছেলেটাকে অনেকদিন দেখিনি।'

সায়নের বাবা বললেন, 'এ তো খুব ভাল কথা। তোমার কাকিমা এই একটু আগে ওঁদের ইচ্ছের কথা বলছিলেন। আমি বেশ সমস্যায় পড়েছিলাম। তা তুমি যদি বউমাকে নিয়ে যাও তাহলে ওদের যেতে সুবিধে হবে।'

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'উর্মিলা জানে।'

'আমি বলেছি। কিন্তু সে বলল মেয়েরা একা যাবে বলে স্থির করেছেন। কোনও পুরুষমানুষ সঙ্গে থাকবে না।' কমলেন্দু হাসল।

নন্দিনী বললেন, 'হ্যাঁ। খুব বিরক্ত হলে মেয়েরা এমন সিদ্ধান্ত নেয়।'

কমলেন্দু বলল, 'কথাটা ঠিক। কাকিমা, আমি উর্মিলার সঙ্গে কথা বলব। এখন বলুন, আমি সঙ্গে থাকলে আপনার কোনও অসুবিধে হবে কিনা। আপনাদের যেখানে যাওয়ার ইচ্ছে হবে যাবেন, আমি বাধা দেব না। সবার সব স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।'

নন্দিনী বলল 'উর্মিলার মত থাকলে আমার আপত্তি কী।'

সায়নের বাবা বলল, 'আপত্তির কথা উঠতেই পারে না। তিনের বদলে চারজন গেলে অনেক সুবিধে। খরচ কম হবে, ভরসাও বাড়বে।'

'তা কোন ক্লাসের টিকিট কাটব ?'

সায়নের বাবা বললেন, 'চারজন যখন তখন ফার্স্ট ক্লাসের চার বার্থের কুপে নেওয়াই ভাল। কিন্তু টিকিটের যা ব্যাপার, পাওয়া যাবে ?'

'আমি চেষ্টা করছি। শুধু যাওয়ার নয়, ফেরারটাও করে রাখতে হবে।'

'তাহলে টাকা পয়সা !'

কমলেন্দু উঠে দাঁড়াল, 'দাঁড়ান, আগে টিকিট কাটি। আচ্ছা, চলি।'

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে কমলেন্দু ঘোষণা করল, 'ডান। সায়নের মা রাজি হয়েছেন, আমি সঙ্গে গেলে তাঁর কোনও আপত্তি নেই।'

উর্মিলা অবাক হয়ে তাকাল। তার মুখ গম্ভীর হল, 'ও। কিন্তু তোমাকে যে একবার বড়মার কাছে যেতে হবে। তাঁর অনুমতি ছাড়া কী করে যাবে ?'

কমলেন্দু স্ত্রীর দিকে এক পলক তাকিয়ে সজোরে দরজা বন্ধ করল।

১৩

মিসেস অ্যান্টনি কাজে যোগ দেবার পর ডাক্তার যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এতদিন সব ছিল, শুধু লক্ষ্মীশ্রীর অভাব ছিল। কোন পেশেন্ট কী খাবে, কাকে কখন নিয়ম করে ওষুধ খাওয়াতে হবে এসবের দায়িত্ব ভদ্রমহিলা চটপট নিয়ে নিলেন। ডাক্তার লক্ষ করেছেন, মিসেস অ্যান্টনি সময় পেলেই সায়নের ঘরে চলে যান, তার সঙ্গে গল্প করেন। এবং তখন তাঁর চোখমুখের অভিব্যক্তিতে মুগ্ধতা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ডাক্তার এর কারণ বুঝতে পারেন না। ঠিক একই ভাবে মিস্টার ব্রাউনের আচরণ তাঁর কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়। ভদ্রলোক প্রতিদিন সকাল বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে নিরাময়ে আসেন। এসেই সায়নের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ওকে দেখার জন্যে যে উদগ্রীব হয়ে থাকেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এই ছেলেটির জন্যে ওই দুজন প্রবীণ মানুষ এত কৌতূহলী কেন তা জিজ্ঞাসা করতে অস্বস্তি হয়েছে ডাক্তারের। অম্লানকে ওর বাবা মা কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তিনি কিছুটা বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। অসুখের কাছে নয়, মানুষের বিশ্বাসের কাছে হেরে যাওয়ার বেদনা বড় মারাত্মক। এইসময় মিসেস অ্যান্টনি এসে পাশে না দাঁড়ালে তিনি ঠিক কী করতেন তা নিজেই জানেন না। যে জেদ তাঁকে এখানে এসে নিরাময় খুলতে সাহায্য করেছিল তার শেকড় একটু একটু করে আলগা হচ্ছে। মাঝে মাঝেই মনে হয় বহন করার ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি ভার তিনি কাঁধে নিয়েছেন।

আজ সকালে ডক্টর তামাং এলেন। শহরের মাঝখানে বাজারের ওপর ওঁর চেম্বারে খুব ভিড় হয়। সবসময় হাসেন ভদ্রলোক। ঘুমোনোর সময় ছাড়া কখনই উনি অ্যালকোহল ছাড়া থাকেন না। কিন্তু অ্যালকোহলের প্রতিক্রিয়া তাঁর আচরণে আজ পর্যন্ত কেউ দেখতে পায়নি। শেষ পর্যন্ত লোকে সিদ্ধান্তে এসেছে, মদ্যপানের কারণে ডক্টর তামাং-এর মুখে হাসি লেগে থাকে।

অফিসঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডক্টর তামাং বললেন, 'গুড মর্নিং ডক্টর।'

'আরে ! কী খবর ? আসুন, আসুন।' কাগজপত্র পাশে সরিয়ে দিলেন ডাক্তার।

'আমি বলি কী, ঘরে না বসে আমরা একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। অনেক দিন পরে ঝকঝকে রোদ উঠেছে।' ডাক্তার তামাং হাত বাড়ালেন।

গেটের বাইরে পৌঁছে ডাক্তার দেখলেন আকাশ আজ কী নীল ! সূর্যদেব নতুন বরের মতো সেটা দখল করে বসে আছেন। কোথাও সামান্য মেঘ নেই। মৃদু বাতাস বইছে। আশেপাশের পাহাড়গুলোকে ঝকঝকে দেখাচ্ছে। দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘার চেহারা এখন সাদাটে, বুড়ো বুড়ো।

তামাং বললেন, 'চমৎকার সকাল !'

কাছাকাছি দাঁড়াতেই ওঁর নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ পেলেন ডাক্তার।

তামাং বললেন, 'আপনার নিরাময় কেমন চলছে ?'

ডাক্তার বললেন, 'নতুন কোনও খবর নেই।'

তামাং হাসলেন, 'আপনি যা করছেন তার তুলনা নেই। কিন্তু আপনার একার পক্ষে বেশি পেশেন্টকে দেখাশোনা করা সম্ভব নয়। মনে হয় বেশ কিছু বেড খালি রয়েছে, তাই না ?'

ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

'আপনি যদি আপত্তি না করেন তাহলে আমার কিছু পেশেন্টকে আপনার এখানে রাখতে পারি। এখানকার হাসপাতালের ওপর যাদের ভরসা নেই তাদের শিলিগুড়িতে যেতে হয়। সেখানেও তারা সমস্যায় পড়ে। আপনার সবকিছু তৈরি আছে, এখানে থাকলে ওদের খুব উপকার হবে।'

তামাং বললেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার পেশেন্টরা যদি রক্তের অসুখে আক্রান্ত হন তাহলে তাঁরা স্বচ্ছন্দে এখানে আসতে পারেন।'

তামাং বললেন, 'আমি তা জানি। তেমন একজনকে আজ আপনার কাছে নিয়ে আসতে বলেছি। কিন্তু আমি এর বাইরের পেশেন্টদের কথা বলছি। এই যে বেড খালি আছে অথচ জায়গার অভাবে ওদের এখানে চিকিৎসা করা যাচ্ছে না এই খবর বেশ কিছু মানুষকে অসন্তুষ্ট করছে। আমি সেটা এড়াবার জন্যে আপনার কাছে প্রস্তাবটা করেছি। আমি কথা দিচ্ছি আমার পেশেন্টদের নিয়ে আপনাকে কোনও ঝামেলায় পড়তে হবে না। ওদের সমস্ত দায়িত্ব আমার।

'নিরাময়ে বেড খালি যাচ্ছে এই খবর কী করে পেলেন ?'

'প্রয়োজন মানুষকে কৌতূহলী করে, এটাই স্বাভাবিক।'

'কিন্তু ডাক্তার তামাং আমি একটা আদর্শ নিয়ে নিরাময় শুরু করেছিলাম, সেই আদর্শ থেকে সরে আসার কোনও কারণ এখনও দেখছি না।

তামাং মাথা নাড়লেন, 'ঠিক আছে। আপনি যখন চাইছেন না তখন এ নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। ও হ্যাঁ, যে মেয়েটিকে পাঠাচ্ছি সে অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। অনেক টনিক খাওয়ানো হয়েছে কোনও কাজ হয়নি। মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী। ওকে একটু দেখবেন। ওর বাবা মায়ের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়।'

'ঠিক আছে, ওকে আসতে বলবেন।'

ডক্টর তামাং এবার নমস্কার করলেন, 'তাহলে আমি চলি। মিস্টার ব্রাউনের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।'

ডাক্তার নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে ওঁর যাওয়া দেখলেন। তামাং-এর কথা তাঁকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিল। মাঝে মাঝেই তাঁর ওপর চাপ আসে। উঠতি কিছু রাজনীতি করা ছেলে নিরাময়কে নিয়ে নেপালি-বাঙালি সংঘাত তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওদের ওপর তলার নেতারা শক্ত হতে ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোয়নি। তামাং নিজের স্বার্থে আর একটা ইস্যু তৈরি করতে চাইছেন নাকি ?

আজ সকালে শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করছিল। জ্বর নেই, গায়ে হাতে ব্যথা, ব্রাউন বসেছিলেন

নিজের চেয়ারে। ভুটো বসেছিল তাঁর চেয়ার ঘেঁষে। মাঝে মাঝে কুকুরের মাথায় হাত বোলাচ্ছিলেন তিনি। শরীর খারাপ লাগলেই তার মন বিশ্রী হয়ে যায়। তখন এই বাড়িতে থাকতে একটুও ইচ্ছে হয় না। এই সময় বাইরের গেট খোলার আওয়াজ হতেই ভুটো উঠে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় একবার ডাকল। ব্রাউন জানেন পরিচিত মানুষ এলে ভুটো ওইরকম শব্দ করে। তখনই ডক্টর তামাং-এর গলা পাওয়া গেল, 'গুড মর্নিং মিস্টার ব্রাউন, ভেতরে আসতে পারি।'

'গুড মর্নিং। আসুন আসুন। যিশু আপনার মঙ্গল করবেন।' ব্রাউন সোজা হয়ে বসতেই তামাং দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

'আপনার যিশু বা বুদ্ধ, অথবা ভগবানের প্রতি আমার আস্থা খুব কম। কোটি কোটি মানুষের সমস্যা সামলানোর মতো কম্প্যুটার তাঁদের হাতে নেই। আমার মঙ্গল এখন আপনিই করতে পারেন।' তামাং চেয়ার টেনে বসলেন।

এধরনের কথাবার্তা আজকাল পছন্দ হয় না ব্রাউনের। কিন্তু তাঁর মনে হল ডক্টর তামাংকে যিশুই তাঁর কাছে আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ অঞ্চলে তামাং যখন আসেন তখন একবার দেখা করে যান। কিন্তু এই সকালে যখন তাঁর শরীরটা ঠিক নেই তখন ডক্টর তামাংকে পাওয়ার ব্যাপারটাকে কাকতালীয় বলে ভাবতে পারছেন না তিনি।

ব্রাউন বললেন, 'দেখুন তো, আমার শরীরটা ঠিক নেই কেন ?'

'ঠিক নেই ? কী অসুবিধে হচ্ছে ?'

'জ্বর-জ্বর ভাব কিন্তু জ্বর নেই। গায়ে হাত পায়ে বেশ ব্যথা।'

'ঠাণ্ডা লাগিয়েছেন ?'

'ইচ্ছে করে তো কিছু করিনি।'

ডক্টর তামাং উঠলেন। ব্রাউনের হাত ধরে পাল্স শুনলেন। কপালে এবং গলার নীচে আঙুল ছোঁয়ালেন। তারপর পকেট থেকে স্টেথো বের করে বুক পিঠ পরীক্ষা করলেন চুপচাপ। স্টেথো পকেটে ঢুকিয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে যেতে ব্রাউন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী মনে হচ্ছে ?'

ডক্টর তামাং তাঁর বিখ্যাত হাসিটি ঠোঁটে জড়িয়ে নিলেন, 'কাল রাত্রে কী খেয়েছেন ?'

'কাল রাত্রে ? ও হ্যাঁ, সন্ধের সময় যিশুর সামনে যেমন বসি তেমন বসেছিলাম। হঠাৎ মনে হল, এই পৃথিবীতে তিনি এক সময় ছিলেন। পৃথিবীর মাটির ওপর হেঁটে বেড়াতেন অথচ এখন নেই। নেই তবু আছেন। প্রায় দুহাজার বছর আগে যিনি চলে গিয়েছেন শরীর ছেড়ে তিনি আমার সামনে বসে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে কিরকম একটা অনুভূতি হল। মনে হল, আজ রাত্রে যদি আমি মরে যাই পৃথিবীর কটা মানুষের কাছে আমি কদিন বেঁচে থাকব ? মন খারাপ হয়ে গেল। এই যে মাদার টেরিজা চলে গেলেন, তাঁকেও তো অনেক অনেকদিন পৃথিবীর কিছু মানুষ মনে রাখবেন।' বিষণ্ণ গলায় বললেন ব্রাউন।

একটুও ম্লান না হয়ে ডক্টর তামাং বললেন, 'হিটলারকে মানুষ মনে রাখবে, চেঙ্গিস খান, তৈমুরলঙদের কেউ ভুলবে না। অর্থাৎ কেউ যাতে মনে রাখে সেইজন্যে আপনাকে এক্সট্রিমে যেতে হবে। হ্যাঁ, তারপর আপনি যিশুর ঘর থেকে বেরিয়ে কী করলেন ?'

'শুয়ে পড়লাম। ঘুম এল অনেক দেরিতে।'

'তার মানে বহুবছর পর আপনি গতরাত্রে পান করেননি। ডিনারও নয় ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে বলেছিলাম, আপনিই আমার মঙ্গল করতে পারেন। তা আপনি উঠবেন না আমি গ্লাসবোতল আনব ?'

'সে কী ? এই সাতসকালে ?'

'আপনার ওষুধ এটাই, আমারও। তার জন্যে সময়ের বিচার করার কোনও মানে হয় না। আজ ঘুম থেকে উঠে কিছু খেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ, এক কাপ চা।' ব্রাউন উঠলেন। প্রথমে ফ্রিজ খুলে মাংসের সসপ্যান বের করে গ্যাস জ্বেলে গরম করে বড় ডিশে ঢাললেন। তারপর মদ এবং গ্লাস নিয়ে গুছিয়ে বসলেন টেবিলে। তিন

চারবার চুমুক দিয়ে একটুকরো মাংস মুখে পুরে ব্রাউনের মনে হল তাঁর শরীরের অস্বস্তি অনেকটা কমেছে। ওঁর মুখের ভাব লক্ষ করে ডক্টর তামাং জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেটার ?'

'একটু।'

ডক্টর তামাং বললেন, 'মিস্টার ব্রাউন, শরীর যাতে অভ্যস্ত তাই করা উচিত। আপনি যিশুর উপাসক, উপাসনা করুন, কিন্তু তাই বলে নিজের শরীরটাকে কষ্ট দেবেন কেন ? আপনার মন এবং শরীর এক্ষেত্রে আলাদা অস্তিত্ব। মন যা চাইছে না শরীর তা চাইতে পারে।'

ব্রাউন হাসলেন, 'ডক্টর, আপনি মদ খেতে ভালবাসেন। যিশু এখনও আপনার লিভার সুস্থ রেখেছেন। কিন্তু আপনার অন্য পেশেন্টরা কী বলে ?'

'দে হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দিস। কেউ বলতে পারবে না মাতাল হয়ে আমি কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি অথবা চিকিৎসা ঠিকমতো করিনি।'

'কিন্তু এমন কোনও পেশেন্ট যদি আসে যে মদ খেয়ে লিভার নষ্ট করে ফেলেছে, আর কিছুদিন খেলে বাঁচানো যাবে না তাকে কী বলবেন ?'

'ওয়েল, তাকে জিজ্ঞাসা করব সে কী করবে ? মদ খাবে না আরও কিছুদিন বাঁচতে চাইবে ? সে যদি দুটোই চায় তাহলে বলব চিংড়িমাছ খেলে যাদের প্রচণ্ড অ্যালার্জি হয় তাদের ওটা না খাওয়া উচিত।' দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করে ঘড়ি দেখলেন ডক্টর তামাং, 'এবার উঠতে হবে।'

'আপনার গাড়ির শব্দ শুনলাম না।'

'ওটা নিরাময়ের সামনে রেখে এসেছি।'

'ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল ?'

'হ্যাঁ। ভদ্রলোককে আমি প্রস্তাব দিলাম কিন্তু উনি মানতে চাইলেন না।'

'কী প্রস্তাব ?'

'ওঁর ওখানে বেশি পেশেন্ট নেই। বেড খালি পড়ে থাকে। আমি আমার কিছু পেশেন্টকে ওখানে রাখতে চেয়েছিলাম। তাদের ট্রিটমেন্টের সব দায়িত্ব আমার। ওঁকে বেড চার্জ দেওয়া হবে। কিন্তু উনি অন্যধরনের পেশেন্ট রাখবেন না। এখন দিনকাল বদলে গেছে। এই ধরনের জেদ স্থানীয় মানুষকে উত্তপ্ত করতে পারে। একবার কেউ যদি নেপালি বাঙালি প্রসঙ্গটা এ ব্যাপারে টেনে আনে তাহলে সামলানো মুশকিল হবে। মিস্টার ব্রাউন, আপনি তো ওঁর ঘনিষ্ঠ, একটু ওঁকে বুঝিয়ে বলুন রাজি হয়ে যেতে।' ডক্টর তামাং উঠে দাঁড়ালেন।

ব্রাউন মাথা নাড়লেন, 'আমি এই কাজটা করতে পারব না।'

ডক্টর তামাং অবাক হলেন, 'কেন ?'

'প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা আছে সে কী করবে তা ঠিক করার। উনি যে কাজটা করছেন তা কজন ডাক্তার করে থাকেন ? ভদ্রলোক যে ব্যবসা করে টাকা রোজগার করতে নিরাময় খোলেননি তা সবাই জানে। ওঁর আদর্শকে শ্রদ্ধা করা উচিত বলেই আমি এমন প্রস্তাব ওঁকে দিতে পারব না।' ব্রাউন বললেন।

'কিন্তু এটা জানলে সাধারণ মানুষ খেপে যাবে।' ডক্টর তামাং বললেন, 'আমি পাবলিকের সঙ্গে দিনরাত কাজ করি। তাদের মনের ব্যাপারটা ভাল বুঝি।'

ব্রাউন উঠে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে ডক্টর তামাং-এর পাশে হেঁটে বাইরে বের হলেন। বাইরের পৃথিবী এখনও ঝকঝকে। তবে হাওয়া বইছে, স্কোয়াশ ফলগুলো দুলছে। পাহাড়ের দিকে তাকালেন ব্রাউন। তারপর বললেন, 'আর কতদিন এভাবে চলবে ডক্টর ?'

ডক্টর তামাং না বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মানে ?'

'এই সস্তা সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করার কথা বলছি।'

'কী আশ্চর্য। আপনি এই ইস্যুটাকে সস্তা সেন্টিমেন্ট বলছেন ?'

'অবশ্যই।'

'পাহাড়ের নিঃস্ব মানুষগুলোকে সমতলের মানুষরা বছরের পর বছর এক্সপ্লয়েট করেনি ? এখানে এসে এদের বুকের ওপর চেপে বসে থাকেনি ?'

'এসব কথা আন্দোলনের আগে আমরা বলতাম। এসব কথা শুনলে যে কোনও পাহাড়ির রক্ত গরম হত। সেই কারণে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। মনে করে দেখুন পুলিশের সঙ্গে তখন লড়াই করে কত তাজা প্রাণ নষ্ট হয়েছে। আমরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পি ডব্লু ডি আর ফরেস্টের বাংলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছি। লাগাতার ধর্মঘট করেছি এখানে। আবার সেই একই সময়ে সমতলে নেমে ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করেছি। শিলিগুড়ি বা কলকাতায় আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে চাইনি। তা যা হোক, সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব যে ক্ষমতা পেলেন তা এদেশের কোনও মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে চলেন আমাদের চেয়ারম্যান সেইরকম ভাবসাব দেখান। এসব তো হয়ে গেল অনেক বছর। আপনার ভাষায় যারা এককালে আমাদের বুকের ওপর চেপে বসেছিল তারা এখন হয় কেঁচোর মতো রয়েছে নয় ছেড়েছুড়ে চলে গিয়েছে। কোটি কোটি টাকার কথা শুনি। কিন্তু কী উপকার হয়েছে সাধারণ মানুষের ? তাদের জীবনযাপনের কতটুকু পরিবর্তন হল। একটাও নতুন রাস্তা, নতুন ব্যবসা, জল এবং আলোর আধুনিক ব্যবস্থা, এনি থিং ?' মাথা নাড়লেন ব্রাউন, 'কিছুদিন আগে শুধু ক্ষমতা ব্যবহারের হাতের পরিবর্তন হয়েছে। অথচ আপনারা এখনও সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন।'

ডক্টর তামাং বললেন, 'আপনি কী বলতে চান, আমরা এখন অনেক বেশি স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখিনি। নিজেদের ওপর আস্থা ফিরে পাইনি ?'

'পেয়েছেন। সাধারণ মানুষ জেনেছে উদ্ধত হয়ে সমতলের মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করলে কেউ তাকে বাধা দেবে না। আমি স্বীকার করছি এটাই স্বাভাবিক। কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোর অবস্থা দেখুন। যখনই তাদের কর্মীরা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে তখনই নেতারা উত্তেজিত করেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে। কর্মীরা ভুলে যায় তাদের নেতারা ছুটি কাটাতে লন্ডন নিউইর্য়ক যাচ্ছেন প্রতিবছর, মার্কিনদের অনুরোধ করে এদেশে এসে ব্যবসা করতে। তারা অবোধের মতো গোবধে মাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত বলে গলা ফাটিয়ে। ঠিক এই ঘটনা এখানেও ঘটছে।'

'আপনি কী বলতে চাইছেন ?'

'খুব সহজ কথা। যারা ভাল কাজ করতে চাইছে, এখানে এসে মানুষের উপকার চাইছে তারা পাহাড় না সমতলের মানুষ সেটা দেখার দরকার নেই।'

'নিরাময় এখানকার কটা মানুষের উপকার করেছে ? যারা উপকৃত হচ্ছে তারা এসেছে সমতল থেকে। আমি যাদের চিকিৎসা করি তাদের অনেকের পাঁচ টাকা ফি দেবার ক্ষমতা নেই। তাদের কেউ প্রয়োজনে ওখানে ভর্তি হতে পারবে না। ঠিক আছে, আজ আর কথা নয়, পরে না হয় বলা যাবে।' ডক্টর তামাং নেমে গেলেন।

ভাল লাগছিল না ব্রাউনের। আবার এরা একটা ভুল করতে চলেছে। কিন্তু তাঁর কিছু করার ক্ষমতা নেই। হ্যাঁ, এটা ঠিক, এই পাহাড় পাহাড়িদের। ব্রিটিশরা এসে নিজেরা আরামে থাকবে বলে এখানে রাস্তা ঘরবাড়ি করেছিল। সেই আসাটা খুব সহজ হয়নি তখন। তখন এই পাহাড়ি এলাকা ছিল সিকিমের রাজার রাজত্ব। রাজা নামগলেব আমলে ব্রিটিশরা সন্ধান পায় এই পাহাড় এবং তার সৌন্দর্যের। সেটা আঠারোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দ। ইংরেজ সেনাবাহিনী এল দখল নিতে। সিকিমের রাজার সৈন্যদের সঙ্গে তাদের লড়াই হল। সেসময় এইসব এলাকার অধিবাসী ছিল লেপচারা। গল্প আছে, সেই যুদ্ধে প্রচুর ইংরেজ সৈন্য মারা গেলেও মাত্র একজন লেপচা সৈনিক নিহত হয়। তার নাম ডুনো ব্যাপগে। ওই লড়াই-এর জন্যে ডুনো লেপচাদের নায়ক হয়ে গিয়েছে। শুকনো গাছের খোলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে বিষাক্ত তীর ছুড়ে বন্দুকধারী সেপাইদের মেরে গেছে সে একের পর এক। ডুনোর বীরত্বে লেপচারা উদ্বুদ্ধ হল। ইংরেজ সৈন্যদের তাড়িয়ে তারা নীচে নিয়ে গেল আদুপ দোলের নেতৃত্বে। হেরে গিয়েছিল লেপচারা আধুনিক অস্ত্রের কাছে। তারপর হারল নিজেদের নানান কুসংস্কারের জন্যে। আস্তে আস্তে তাদের সংখ্যা যত কমতে লাগল নেপাল থেকে আসা পাহাড়িদের সংখ্যা তত বেড়ে গেল। ইতিহাস বলে দার্জিলিং-এর পাহাড়ে নেপালিদের অবস্থান দেড়শো বছরের সামান্য বেশি। ইংরেজরা পা রেখেছিল প্রায় একই সঙ্গে। তাই মাঝে মাঝে ধন্দ

লাগে। সমতলে যেমন হাজার বছর আগে বাঙালি ছিল না তেমনি এই পাহাড়ে দুশো বছর আগে তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন না। কিন্তু এতগুলো বছর একই জায়গায় বংশ পরম্পরায় বাস করলে জায়গাটা নিজের হয়ে যায়। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে কেন একশো বছর আগে এসে বাস করছেন এমন বাঙালির অস্তিত্ব পাহাড়ে আছে। তারা কী করে পাহাড়িদের শত্রু হয়ে যাবে ?

সকালের ডাকে খারাপ খবরটা এল। বিদেশ থেকে এক্সপার্টদের যে টিমের আসার কথা ছিল তাঁরা এখনই আসতে পারবেন না। এই না পারা মানে অনেকখানি পিছিয়ে যেতে হবে তাঁকে। আর্থিক সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা যেমন ছিল তেমনি আধুনিকতম চিকিৎসাপদ্ধতির সঙ্গে সড়গড় হতে পারতেন তিনি। যা বইয়ে পড়েছেন তা হাতেকলমে করলে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায়।

অফিসে বসেছিলেন ডাক্তার। এইসময় সায়ন এল।

'কেমন আছ তুমি !' ডাক্তার হাসলেন।

'ভাল না।'

'সেকী ? কী হয়েছে ?'

'এইভাবে শুয়ে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। আচ্ছা, আমি কি কোনও কাজ কখনও করতে পারব না ?' সায়ন স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করল।

'নিশ্চয়ই পারবে।'

'কবে থেকে ?'

'একটু স্টেডি হয়ে নাও।'

'আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আমি জানি আমার দ্বারা কিছু হবে না !'

'স্টপ ইট।' চিৎকার করে উঠলেন ডাক্তার আচমকা।

সায়ন চমকে তাকাল। ডাক্তার আঙ্কলের মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'আর কখনও ওই কথা উচ্চারণ করবে না। বুঝেছ ? বলেছি তুমি আর কোনও কাজ করতে পারবে না। ম্যাজিক জনসনের নাম শুনেছ ? ভদ্রলোকের এড্‌স হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি বাস্কেটবল খেলে গেছেন। আর সেই খেলা আন্তর্জাতিক মানের। একজন ক্যানসার পেশেন্ট মোটর রেসিং-এ যোগ দিচ্ছেন। দুটো পা নেই এমন একজন কিছুদিন আগে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হয়েছেন। এদের তুলনায় তুমি তো অনেক ভাল, হাত পাওয়ালা স্বাভাবিক মানুষ। শুধু মাঝে মাঝে তোমার রক্ত একটু অসুবিধে সৃষ্টি করে। কিন্তু তাই বলে তুমি অক্ষম নও !' ডক্টর আঙ্কলের গলার স্বর শেষদিকে ধরে এসেছিল।

ঠিক সেইসময় বড়বাহাদুর এসে জানাল কয়েকজন দেখা করতে এসেছে। ডাক্তার মাথা নেড়ে নিয়ে আসতে বললেন। সায়ন উঠে দাঁড়াল। ডাক্তার বললেন, 'তুমি উঠছ কেন ? বোসো। তোমার মা-বাবার এখানে আসার কথা ছিল না ?'

সায়ন মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, লিখেছিল তো— !'

এইসময় দরজায় তিনজন এসে দাঁড়াল। একজন প্রৌঢ়া, দ্বিতীয়জন যুবক, দেখলেই বোঝা যায় একটু উদ্ধত স্বভাবের, তৃতীয়জন কৈশোর পার হওয়া তরুণী, যার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল না। ডাক্তার বললেন, 'বসুন।'

ওরা বসলে ডাক্তার মেয়েটিকে দেখলেন এক পলক। খুব শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে সে। ডাক্তার আবার বললেন, 'বলুন, কী সমস্যা ?'

প্রৌঢ়া বললেন, 'এ আমার মেয়ে। খুব অসুখে ভোগে। ডাক্তার তামাং এতদিন ওকে দেখছিলেন। উনি বললেন আপনার কাছে নিয়ে আসতে।'

ডাক্তার মেয়েটির দিকে তাকালেন, 'কী নাম তোমার ?'

মেয়েটি চোখ তুলল, 'কঙ্কাবতী।'

'বাঃ। চমৎকার নাম। সায়ন, তুমি বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পড়েছ ?'

সায়ন প্রশ্নটা শুনেই মাথা নেড়ে না বলল।

'পড়ে দেখো। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা আছে যার নায়িকা কঙ্কাবতী। সেখানে তিনি বারংবার বলেছেন, কঙ্কা শঙ্কা কোরো না। কঙ্কাবতী, তুমি শঙ্কা শব্দটার মানে জানো ?'

মাথাটা সামান্য দুলল, মেয়েটি বলল, 'ভয়।'

'বাঃ। দাও, ডক্টর তামাং-এর প্রেসক্রিপশনটা দেখি।'

প্রৌঢ়া সেটা এগিয়ে দিলেন। পড়তে পড়তে কপালে ভাঁজ পড়ল ডাক্তারের। তারপর বললেন, 'ব্লাড রিপোর্ট সঙ্গে আছে ?'

প্রৌঢ়া এবার সেগুলো দিলেন।

ভাল করে দেখে নিয়ে ডাক্তার বললেন, 'ডক্টর তামাং যা অনুমান করছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে তোমাকে এখানে কিছুদিন থাকতে হবে।'

প্রৌঢ়া বললেন, 'কিন্তু এখানে থাকতে হলে শুনেছি অনেক টাকা দিতে হয়।'

যুবক বলল, 'ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। পার্টি ঠিক করবে ওটা।'

ডাক্তার যুবককে দেখলেন, 'তুমি এদের কেউ হও ?'

যুবক বলল, 'কেন ? কেউ না হলে আমি আসতে পারি না ?'

ডাক্তার বললেন, 'আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না।'

প্রৌঢ়া বললেন, 'ও আমার পাশের বাড়িতে থাকে। দেখুন, আমি খুব গরিব। ওর বাবা নেই। মেয়েটা পড়াশুনায় খুব ভাল। অভাবের সঙ্গে লড়াই করেও পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। ও ছাড়া আমার কেউ নেই।'

যুবক বলল, 'ঠিক আছে ঠিক আছে চাচি, এসব কথা ওকে বলার কোনও দরকার নেই। আমি পার্টি অফিসে কথা বলেছি, যা খরচ হবে উনি বিল করে দিলে পার্টি বুঝে নেবে। তবে হ্যাঁ, দেখভাল যেন ঠিকঠাক হয়।'

কঙ্কাবতী উঠে দাঁড়াল, 'মা, চলো।'

প্রৌঢ়া অবাক হলেন, 'চল মানে ?'

'এইভাবে আমার চিকিৎসা করাতে আমি চাই না।'

প্রৌঢ়া একটু রাগত গলায় বললেন, 'তাহলে তুই এলি কেন ? আমার যে সামর্থ্য নেই তা তুই জানিস না। ও পার্টির সঙ্গে কথা বলেছে বলে আমি বুকে বল পেয়েছি। তোর বাবা গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে পুলিশের গুলি বুকে নিয়ে মারা গিয়েছে। পার্টি তার মেয়ের জন্যে এটুকু তো করবেই। এতে আপত্তি কেন ?'

মেয়েটি জবাব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। যুবক বলল, 'চাচি, তোমার এই মেয়ের মাথায় গোলমাল আছে। আমি সঙ্গে এসেছি এটাই ও পছন্দ করছে না।'

ডাক্তার আবার মেয়েটিকে দেখলেন, 'আমি আর একবার ওর ব্লাড পরীক্ষা করতে চাই।'

যুবক বলল, 'আরে! আপনার সামনে তো রিপোর্ট আছে, ফালতু ঝামেলা করবেন কেন ?'

ডাক্তার বললেন, 'আমার মনে হয় ওকে এখানে না নিয়ে এসে পার্টি অফিসে নিয়ে গেলে ভাল করতেন। এই ছেলেটি ওর চিকিৎসা করতে পারত সেখানে।' কথাগুলো বলেই তিনি গলার স্বর বদলালেন, 'যদি ওর ভাল চাও তো তাহলে চুপ করে বসে থাকো না পারলে বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

ছেলেটা একটু ঘাবড়ে গেল। প্রৌঢ়া তাকে ইশারা করলেন চুপ করতে। ডাক্তার বললেন, 'কঙ্কাবতী, তুমি আমার সঙ্গে একটু এসো মা।'

মা শব্দটা কানে যেতে কঙ্কাবতী মুখ ফেরাল। তারপর বিনা প্রতিবাদে সে ডাক্তারকে অনুসরণ করল। সায়ন চুপচাপ বসেছিল। যুবক প্রৌঢ়াকে বলল, 'একটু উল্টোপাল্টা করলে এই বাড়ি জ্বালিয়ে দেব চাচি। শালা, পাহাড়ে এসে বড়লোক বাঙালিদের কাছ থেকে টাকা ঝাড়ছে আর নেপালিদের পাত্তা দিচ্ছে না।'

'আপনার নাম কী ভাই ?'

প্রশ্নটা শুনে যুবক ফিরে তাকাতেই মিসেস অ্যান্টনিকে দেখতে পেল। সায়ন দেখল মিসেস

অ্যান্টনির মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

যুবক বলল, 'গণেশ।'

'আপনার কাছে কোনও প্রমাণ আছে উনি বড়লোক বাঙালিদের কাছে প্রচুর টাকা পাচ্ছেন ? জবাব দিন।' মিসেস অ্যান্টনি ডাক্তারের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'লোকে বলে।'

'তাদের নিয়ে আসতে পারবেন ?'

যুবক কাঁধ নাচাল। মুখে কিছু বলল না।

'এখানে বসে বললেন এই বাড়ি জ্বালিয়ে দেবেন। হ্যাঁ আপনারা এখন তা করতেই পারেন। কিন্তু এই বাড়ি জ্বললে আমিও পুড়ে মরব। সেটা সামলাতে পারবেন ?'

'আপনি নেপালি হয়ে একথা বলছেন ?' যুবক চাপা গলায় বলল।

'আমি মানুষ বলে বলছি। আপনি অমানুষ তাই ওইসব ভাবছেন। গণেশ, আপনার কথা আমি দার্জিলিং-এ জানাব। আপনি কেন এসেছেন এখানে ?'

এবার প্রৌঢ়া বলল, 'রাগ কোরো না দিদি। আমার মেয়ের অসুখ, ডাক্তার তামাং এখানে আসতে বলেছিলেন। আমরা খুব গরিব। এখানকার খরচের কথা ভেবে ও একটু মাথা গরম করে ফেলেছে। ভুলে যাও এসব কথা।'

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। সায়ন, তুমি কিছু মনে কোরো না। পৃথিবীর সর্বত্র এরকম কিছু উজবুক থাকে।'

এইসময় কঙ্কাবতী ফিরে এল। তাকে খুব ক্লান্ত লাগছিল। এক হাতে অন্য হাতের কনুই-এর সামনের দিকটা চেপে ধরেছিল। প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল ?'

'রক্ত নিলেন উনি।'

যুবক বলল, 'আমি বাইরে আছি।' বলে সশব্দে চেয়ার সরিয়ে বেরিয়ে গেল।

কঙ্কাবতী বলল, 'মা, তোমাকে নিষেধ করেছিলাম ওকে সঙ্গে আনতে।'

মিসেস অ্যান্টনি বলে উঠলেন, 'আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমি গতবছর চেয়ারম্যানের হাত থেকে বেস্ট পোয়েট অফ দি ইয়ার প্রাইজটা নিয়েছিলে, না ? কবিতা প্রতিযোগিতায় তুমিই তো ফার্স্ট হয়েছিলে ?'

মেয়েটি কিছু বলার আগেই তার মা বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক।'

'তোমার নাম তো কঙ্কাবতী ?'

'হ্যাঁ।' ছোট্ট করে বলল মেয়েটি।

মিসেস অ্যান্টনি একটু আগের তিক্ততা ভুলে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হলেন, 'ও সায়ন, এর সঙ্গে আলাপ করো। খুব ভাল কবিতা লিখেছিল ও। প্রাইজ নিতে গিয়ে কবিতাটা আবৃত্তি করেছিল। কী যেন লাইনটা, ও, হ্যাঁ, এত কালো মেঘ কেন এতটুকু নীল পেল না !'

সায়ন হাতজোড় করল, 'নমস্কার।'

কঙ্কাবতী যেন এতক্ষণে তার অস্তিত্ব অনুভব করল। করে বলল, 'নমস্কার।'

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'সায়ন হল, সায়ন হল—', হঠাৎ থেমে গিয়ে কিছু খুঁজে না পেয়ে বললেন, 'ওর সঙ্গে কথা বললে আমার মন ভাল হয়ে যায়।' তারপর খেয়াল হতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী হয়েছে কঙ্কাবতী ?'

'আমি ঠিক জানিনা। শরীর খারাপ লাগে। খুব দুর্বল।'

প্রৌঢ়া বললেন, 'ডাক্তার তামাং বলেছেন ওর রক্ত কমে গেছে।'

মিসেস অ্যান্টনির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সেটা সামলে তিনি বললেন, 'তুমি যাঁর কাছে এসেছ তিনি সব ঠিক করে দেবেন। কোনও ভয় নেই।'

এইসময় ডাক্তার ফিরে এলেন তাঁর ল্যাবরেটরি থেকে। চেয়ারে বসে বললেন, 'তেমন ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু আপনার মেয়েকে এখানে কিছুদিন থাকতে হবে। যদি আজই ভর্তি হয়ে যায় তাহলে ভাল হয়।'

প্রৌঢ়া কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর কী হয়েছে ?'

'প্রত্যেক মানুষের রক্তে লাল এবং সাদা কণিকা থাকে। সুস্থ মানুষের শরীরে লাল কণিকা সাধারণত তেরো বা চৌদ্দ কাউন্টিং-এ পাওয়া যায়। যখন সেটা আটের নীচে নেমে যায় তখন আমরা চিন্তিত হই। দশের নীচে নামলে অ্যানিমিক বলা হয়। রোগীর চেহারা তখনই ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আপনার মেয়ের রক্তকণিকা ছয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বিলো নর্মাল। বুঝতে পেরেছেন ?'

'তাহলে ?'

'তাহলে আবার কী ? চিকিৎসা করলে ওটা নর্মাল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আরও নেমে যায় তাহলে বিপদ। রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা তখন কমে যায়। আপনার কোনও চিন্তা নেই। এই যে সায়ন, ও যখন এখানে এসেছিল তখন ওর হেমোগ্লোবিন ছিল চারে। কিন্তু এখানে থেকে ওটা প্রায় আটে পৌঁছে গেছে। আপনাকে আবার বলছি কোনও চিন্তা নেই। আমি আছি, মিসেস অ্যান্টনি আছেন, ওর যত্নের কোনও ত্রুটি হবে না।'

প্রৌঢ়া বললেন, 'কিন্তু ডাক্তার, আমি এত টাকা কী করে দেব ?'

ডাক্তার বললেন, 'কত টাকা ?'

'আমি শুনেছি অনেক টাকা দিতে হয়।'

'হ্যাঁ। কারণ ওষুধের দাম খুব বেশি। এক একটা ইনজেকশন প্রায় হাজার টাকা পড়ে। প্রয়োজন পড়লে সেটা দিতে হয়।'

'তাহলে ?'

ডাক্তার মিসেস অ্যান্টনিকে বললেন, 'ওর নামধাম লিখে নিন। ওর মাকে দিয়ে সই করিয়ে নেবেন। চলো সায়ন আমরা কঙ্কাবতীকে নিরাময়টা ঘুরে দেখাই ততক্ষণ।' ডাক্তার উঠলেন।

প্রৌঢ়া আবার বললেন, 'কিন্তু !'

'শুনুন। রক্ত নেওয়ার সময় ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম রবীন্দ্রনাথ আর কবি ভানুভক্তের মধ্যে কে বড় কবি ? ও জবাব দিয়েছে, তুলনা হয়না। আমার বাবা আর ভগবানের মধ্যে কে বড় তা যেমন তুলনা করা যায় না। এই উত্তর যে মেয়ে দিতে পারে সে আমার মেয়ে না হয়ে পারে না। নিজের মেয়ের কাছে টাকাপয়সা নেবার কথা কেউ ভাবতে পারে ?'

ডাক্তার কথা বলা মাত্র বড়বাহাদুর এসে বলল, 'কলকাতা থেকে কয়েকজন সায়নদাদার কাছে এসেছে।'

১৪

গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল ওরা। অফিসঘর থেকে বেরিয়ে আসা সায়নকে দেখতে পেয়ে তিনজনের মুখেই হাসি ফুটল। দূরত্বটুকু জোরে হেঁটে এসে প্রথমে নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরল সায়ন। নন্দিনীর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। ছেলের শরীরটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে রইলেন কিছুক্ষণ। উর্মিলা আর কমলেন্দু হাসিমুখে দৃশ্যটি দেখছিল। সায়ন ফিসফিস করে বলল, 'শেষ পর্যন্ত তুমি এলে !'

নন্দিনী জবাব দিচ্ছিলেন না। হঠাৎ তাঁর শরীর টলতে আরম্ভ করল। একমাত্র ছেলের মঙ্গলের জন্যে যেদিন এখানে রেখে গিয়েছিলেন সেদিন অনেক কষ্টে নিজেকে শক্ত রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু এতদিন দূরে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হত মা হিসেবে কোনও কর্তব্যই তিনি করতে পারছেন না। স্বামী নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছে, ছেলের মোটামুটি ভাল থাকার খবর আসছে, ব্যস এটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। স্বামী তাঁকে বুঝিয়েছেন, যে-অসুখ ওর হয়েছে তাতে এতদিন যে বেঁচে আছে তাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ। এইসব শুনতে শুনতে একসময় মনে হয়েছিল, কত মহিলার তো সন্তান হয় না, সায়ন চলে গেলে তিনি ভেবে নেবেন তাঁরও সন্তান হয়নি। দূরত্ব মানুষকে অনেক কিছু ভুলিয়ে দিতে সাহায্য করে। সায়নের অভাব একটু একটু করে মেনে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এখন ওর

শরীরের উত্তাপ এবং গন্ধ তাঁকে একটানে অনেক বছর পিছিয়ে নিয়ে গেল। ছোট্ট সায়নের শরীর যখন তাঁর শরীরের সঙ্গে লেপ্টে থাকত সেইসব সুখের দিনের অনুভূতি সমস্ত আকাশজুড়ে ফিরে আসায় নিজেকে সামলাতে পারলেন না তিনি। সশব্দে কেঁদে উঠলেন আচমকা।

মাকে কাঁদতে দেখে একটু শক্ত হয়ে গেল সায়ন। ধীরে ধীরে মুখ তুলে দেখল কান্নার দমকে মায়ের মুখ ভেঙে চুরে যাচ্ছে। সে দু হাতে মুখ ধরল, 'মা। মাগো।'

উর্মিলা এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে। নন্দিনীর পিঠে হাত রেখে বলল, 'একী ? কী হল ? তুমি কাঁদছ কেন ?'

নন্দিনী নিজেকে শেষ পর্যন্ত সামলালেন।

এই সময় পেছন থেকে ডাক্তারের গলা ভেসে এল, 'আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন ? সায়ন, ওঁদের নিয়ে গেস্টরুমে যাও।'

সায়ন ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আমার মা। আর এঁরা হলেন— ।

কমলেন্দু কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, 'আমি সম্পর্কে সায়নের দাদা, ইনি আমার স্ত্রী। কাকিমা সায়নকে দেখতে আসছিলেন, আমরা সঙ্গে এলাম।'

'খুব ভাল হয়েছে। অফিসে একটু কাজ আছে। আপনারা গেস্টরুমে বসে কথা বলুন, আমি একটু বাদে আসছি।' ডাক্তার ফিরে গেলেন।

গেস্টরুমের চেয়ারে ওরা বসতেই উর্মিলা দৌড়ে জানলার কাছে গেল, 'দ্যাখো দ্যাখো কাকিমা, এভারেস্ট দেখা যাচ্ছে। কী সুন্দর !'

কমলেন্দু বলল, 'দুটো ভুল হল।'

'মানে ?' উর্মিলা ছেলেমানুষের মতো ঘাড় বেঁকাল।

'প্রথমত, ওটা কাঞ্চনজঙ্ঘা, এভারেস্ট নয়।'

'ও !' উর্মিলা মেনে নিয়ে আবার জানালার বাইরে তাকাল।

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'দ্বিতীয় ভুলটা কী ?'

'কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সুন্দর বলা ভুল। বলা উচিত ভয়ঙ্কর সুন্দর।' বলে হাসল কমলেন্দু, 'সুন্দর কখন ভয়ঙ্কর হয় সায়নবাবু ?'

সায়ন বলল, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বই। তুমি পড়তে দিয়েছিলে আমাকে। সুন্দরবনের রয়ালবেঙ্গল টাইগার, দারুণ সুন্দর দেখতে তেমনি ভয়ঙ্করও ।'

কমলেন্দু বলল, 'পৃথিবীতে কোনও কোনও মহিলা আছেন যাঁদের ভয়ঙ্কর সুন্দর বলা যায়। তা সেসব কথা তোকে বলা যাবে না।'

উর্মিলা রাগত চোখে স্বামীকে দেখল। তারপর সায়নকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর শরীর এখন কেমন আছে রে ?'

'ভাল।' মায়ের গা ঘেঁষে বসল সায়ন, 'আমার খুব ভাল লাগছে মা।'

নন্দিনী ছেলের হাত ধরলেন, 'তুই খুব রোগা হয়ে গিয়েছিস।'

'যাঃ। আমার ওজন বেড়েছে।'

উর্মিলা কাছে এসে বলল, 'এরকম দারুণ জায়গায় থাকলে শরীর ভাল হয়ে যায়। কী সুন্দর দৃশ্য।'

'তোমরা কখন এসেছ ?'

কমলেন্দু জবাব দিল, 'হোটেলে ব্যাগ রেখে সোজা এখানে।'

'বাবা ভাল আছে ?'

নন্দিনী বললেন, 'হ্যাঁরে। তার খুব ইচ্ছে ছিল আসার। কাজের চাপে আসতে পারল না। স্টেশনে এসেছিল পৌঁছে দিতে।'

উর্মিলা বলল, 'হেনার জন্যে ভাবনা হচ্ছে।'

সায়ন অবাক হল, 'কেন ?'

নন্দিনী বললেন, 'হেনার আসার কথা ছিল আমাদের সঙ্গে। টিকিটও কাটা হয়ে গিয়েছিল। ওর

বর তো এখন কুলুমানালিতে তাই আসতে চেয়েছিল। কথা ছিল, সোজা স্টেশনে চলে আসবে। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আগে এসে পৌঁছোয়নি।'

'কেন ?'

'জানি না রে।'

ঊর্মিলা বলল, 'শাশুড়ি নিশ্চয়ই আটকে দিয়েছে।'

কমলেন্দু বলল, 'আবার বলছি, কল্পনা করে সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না।'

'তা ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে ?' ঊর্মিলা রেগে বলল।

'শরীর খারাপ হতে পারে। আমি কল্পনা করতে রাজি নই।'

হেনার কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল সায়নের। হেনার সঙ্গ তার খুব ভাল লাগত। এমন সময় ছোটবাহাদুর দরজায় এসে দাঁড়াল, 'দো আদমি আয়া—।'

'আমার কাছে ?' সায়ন অবাক হল।

'জি। আইয়ে—।' বলে বাইরে তাকাল ছোটবাহাদুর।

ঘরে ঢুকল সদানন্দ আর বাদল। ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে ? এখানে ? কবে এলে তোমরা ?'

নন্দিনী হাসলেন, 'আজই। তুমি ?'

'আর বোলো না। খুব ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম। এখানে আসতে দেরি হয়ে গেল। কেমন আছিস তুই ? লম্বা হয়ে গিয়েছিস বলে মনে হচ্ছে ?' এগিয়ে গিয়ে সায়নের কাঁধে হাত রাখল সদানন্দ।

সায়নের খুব ভাল লাগছিল। হেনার জন্যে খারাপ হওয়া মনটা চট করে পাল্টে গেল। মন কিছুক্ষণ ধরে খারাপ হয়ে থাকলে তার শরীর খারাপ হয়ে যায়। সদানন্দকে দেখে সে অনুভব করল, বেঁচে গেল। বলল, 'ভাল আছি। তুমি কেমন আছ সদুদা।'

'ফার্স্টক্লাস। বাদলকে মনে আছে তো ?'

'বাঃ ! মনে থাকবে না ?' সায়নের মনে হল এর আগে অন্য নাম শুনেছিল।

বাদল চোখ প্রায় বুজিয়ে হাসল। তারপর পকেট থেকে একটা বড় চকোলেট বের করে বলল, 'মিষ্টিমুখ করো।'

নন্দিনী চটপট জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর চকোলেট খাওয়া বারণ নয় তো ?'

পেছন থেকে ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন, 'কোনও বারণ নেই। চকোলেট আইসক্রিম যদি এই বয়সে না খেতে পারা যায় তা হলে— যাক গে, আজ হঠাৎ সায়নবাবুর প্রচুর গেস্ট একসঙ্গে এসে গেছেন দেখছি।'

কমলেন্দু বলল, 'যা বলেছেন। কলকাতায় আমরা সবাই এক বাড়িতে থাকি।'

'আপনারা কোথায় উঠেছেন ?'

কমলেন্দু বলল, 'ট্যুরিস্ট লজে।'

বাদল বলল, 'আমরা স্টেশনের পাশে যে-হোটেলে উঠেছি তার নাম লিটল হাট। সবকিছুই সেখানে লিটল লিটল।'

'তার মানে ?' কমলেন্দু জানতে চাইল।

'খাটগুলো ছোট। ঘরও। টয়লেটে পাশ ফিরে ঢুকতে হয়। চায়ে চিনি কম দিয়েছিল। দিনের বেলায় আলো জ্বালতে হয় এবং সেটা টিমটিম করে। জলও লিটল লিটল পাওয়া যায়। নামকরণ সার্থক।'

কমলেন্দু বলল, 'চার্জও নিশ্চয়ই লিটল লিটল ?'

'পার হেড দুশো টাকা। রুম প্লাস চা। লিটলই বলতে হবে।'

ডাক্তার বললেন, 'আমার খুব খারাপ লাগছে। অনেক কিছু মাথায় ছিল। আপনারা যাঁর আসবেন তাঁদের জন্যে থাকার ব্যবস্থা করব ভেবেছিলাম। একা পেরে উঠছি না এখনও পর্যন্ত। সায়ন, একটু চায়ের কথা বলবে ?'

সায়ন মাথা নেড়ে বেরিয়ে যেতেই ডাক্তার বললেন, 'আপনার ছেলে এখানে খুব পপুলার। ওকে

বাইরে পাঠালাম যদি ওর সম্পর্কে আপনাদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তার সুযোগ দেওয়ার জন্যে।'

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কেমন আছে।'

'অনেক ভাল। ইমপ্রুভিং।'

'আপনি আমাদের ভরসা দিচ্ছেন ?'

'সরি। যখন ওকে এনেছিলেন তখনও বলেছিলাম, আমি তো ভগবান নই। তবে গত এক মাসে মাত্র একবারই ওকে রক্ত দিতে হয়েছিল। এইটে আশার কথা।'

নলিনী শঙ্কিত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের জানাননি তো !'

'এটা ওর পক্ষে খুব সাধারণ ঘটনা। কারও সামান্য জ্বর হলে কি সেটা জানানোর মতো খবর হয় ?' ডাক্তার হাসলেন।

'ও কবে ভাল হয়ে যাবে ডাক্তারবাবু ?'

ডাক্তার একমুহূর্ত স্থির চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, 'এই উত্তর একমাত্র ঈশ্বরই দিতে পারেন। তবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে ও রোজ ভাল থাকে।

এই সময় সায়ন ফিরে এল। সবাই তার দিকে এমনভাবে তাকাল যে তার অস্বস্তি হল। সায়ন হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে ?'

ডাক্তার বললেন, 'তোমাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল।'

'আমাকে নিয়ে ?'

'বাঃ, ওঁরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তোমাকে নিয়ে কথা হবে না ?'

সায়ন নন্দিনীর দিকে তাকাল, 'আমি ওনাকে বলেছি মাঝে মাঝে খুব একঘেয়ে লাগে, সময় কাটতে চায় না। এ ভাবে পড়াশুনাও হয় না। তাই আমাকে কোনও একটা কাজের দায়িত্ব দিতে।'

'তুই আবার কী কাজ করবি ?' নন্দিনী প্রতিবাদের গলায় বললেন।

'না-না। এভাবে বলবেন না। কখনও সখনও ছাড়া সায়নবাবু বেশ ফিট। আমি ওকে ইনজেকশন দেওয়া শেখাব।'

'ইনজেকশন ?' নন্দিনী অবাক।

'হ্যাঁ। আগে শিখুক তারপর জানাব ও কী করবে।'

নন্দিনী বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। ওকে কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারি ?'

'স্বচ্ছন্দে। ডিসেম্বর জানুয়ারিতে এখানে খুব শীত পড়ে। তখন ও ঘুরে আসতে পারে। প্রয়োজন হলে কী কী করতে হবে আমি লিখে দেব।'

কমলেন্দু বলল, 'ব্যস, আপনার চিন্তা দূর হল কাকিমা। আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, আপনি এখানে নিশ্চয়ই অনেকদিন আছেন, কোনও প্রবলেম হয় না ?'

'বুঝতে পারলাম না।'

'শুনেছি, মানে কাগজে পড়েছি, বাঙালিদের এরা পছন্দ করে না।'

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন, 'মানুষ মানুষকে কি কখনও অপছন্দ করে ? আপনার মনে এই ধারণা যারা তৈরি করে দিয়েছে তারা নিশ্চয়ই কয়েকটা কথা বলেনি। মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় স্বার্থপর কিছু নেতা। অথবা মানুষ যখন মানুষকে ভয় পায় তখন অপছন্দ করতে শুরু করে। দেশবিভাগের সময় যখন পূর্ববঙ্গ থেকে জলের মতো শরণার্থীরা আসতে শুরু করলো, চারধারে সমস্যা বাড়ল, তখন এদিককার বাংলার মানুষ ওঁদের অপছন্দ করলেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে এদেশে মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে খুনোখুনিতে নামানো তো পুরনো ঘটনা। এ নিয়ে ভাববেন না।'

কমলেন্দু মাথা নিচু করল।

নন্দিনী বললেন, 'আমরা তো কয়েকদিন এখানে থাকব। সায়নকে নিয়ে যেতে পারি ?'

ডাক্তার একমুহূর্ত ভাবলেন, 'আপনি এক রাতের জন্যে ওকে নিয়ে যেতে পারেন।'

ডাক্তার চলে গেলে সদানন্দ ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট আর শিশি বের করে সায়নকে দিল, 'নাও। তোমার জন্যে।'

সায়ন শিশিতে নারকেলনাড়ু দেখে খুব খুশি। প্যাকেটটা খুলতেই সোয়েটার দেখতে পেল সে। নতুন সোয়েটার। উর্মিলা বলে উঠল, 'আরে, এই সোয়েটার তো তুমি বুনছিলে কাকিমা ?'

সদানন্দ বলল, 'ঠিকই। এটা পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের কেস হয়ে গিয়েছে। উনি আমাকে দিয়েছিলেন সায়নকে পৌঁছে দিতে। আমার আগেই উনি পৌঁছে গেছেন।'

বাদল বলল, 'সায়নবাবু, শিশিটা কিন্তু আমি খুলিনি।'

সদানন্দ বলল, 'দ্যাখ মদনা, তুই চাইলেই কি আমি খুলতে দিতাম ?'

নন্দিনী হাসছিলেন এতক্ষণ। এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু মনে কোরো না, তোমার আসল নাম কী বলো তো ?'

'আমার তিনটে নাম। তিনটেই আসল।'

'কী রকম ?'

'মায়ের কাছ থেকে বাদল পেয়েছি, বাবার কাছ থেকে মদন। বাবা রেগে গেলে ওটাকে ভেঙেচুরে চেঁচাতেন, ঠাকুমা রাখলেন, খুব জমজমাট নাম, ব্রজগোপাল। ওটা স্কুলের খাতায়। ওই নামে কেউ চিনতে পারবে না আমাকে। চিঠিটা দে।' বাদল বলল।

সদানন্দর মনে পড়তেই হিপ পকেট থেকে চিঠি বের করে দিল। সায়ন সেটা খুলে পড়তেই তার মুখে হাসি ফুটল। উর্মিলা বলল, 'কার চিঠি ?'

পড়তে পড়তে সায়ন জবাব দিল, 'টুপুরের। দাঁড়াও।'

চিঠি পড়া শেষ করে সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'টুপুর তোমার কাছে আসে মা ? ও এসব কিছু লেখেনি।'

'কী লিখেছে ?'

'কী সব কথা। পড়ব ?'

সদানন্দ হাসল, 'তোর আপত্তি না থাকলে আমরা শুনতে পারি ?'

'তুমি চিঠিটা পড়োনি ?'

'উঁহু। অন্যের চিঠি ভদ্রলোক পড়ে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। পড়ছি। "সানুদাদা। তোমার চিঠি যখন পেয়েছি তখন আমি বন্ধ ঘরে ছিলাম। সেখানে জানলা দিয়ে আলো আসত, লাইটও জ্বলত কিন্তু চিঠি লেখার হুকুম ছিল না। শুনলাম সদুদা তোমার কাছে যাচ্ছে তাই এই চিঠি লিখছি।

তুমি এখন কেমন আছ ? খুব দেখতে ইচ্ছে করে তোমাকে। তুমি চিঠিতে যা যা লিখেছ তার সবই আমি করব। কিন্তু সানুদা, আমার আগে কত হাজার হাজার মেয়ে কত কত পড়াশুনা করেছে, কত বড় হয়েছে তবু মেয়েদের এত শাস্তি পেতে হয় কেন ? তাহলে পড়াশুনা করে আমিও তো তাদের মত হব।

বড়দের আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। তুমি পারো ? প্রণাম নিও—টুপুর।"

চিঠি পড়া শেষ করে সায়ন দেখল মায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে, অন্যরাও একই রকম। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার মা ? টুপুর বন্ধ ঘরে ছিল কেন ?'

উর্মিলা জবাব দিল, 'বোধহয় দুষ্টুমি করেছিল।'

বাদল বলল, 'সেকী ! বাচ্চা মেয়ে দুষ্টুমি করতেই পারে। তাই বলে ঘরে বন্দী করে রাখতে হবে ?'

নন্দিনী বললেন, 'থাক ওকথা। এখন তো সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। তুই ওকে উৎসাহ দিয়ে একটা চিঠি লিখে দিস।'

এইসময় চা এল। চায়ের গন্ধ এবং স্বাদে সবাই চমৎকৃত। কলকাতায় এত ভাল চা সবসময় পাওয়া যায় না।

'সায়ন।'

সরু গলায় নিজের নাম শুনে পেছন ফিরে সায়ন দেখল মিসেস অ্যান্টনি দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। তাঁকে খুব সঙ্কুচিত দেখাচ্ছে।

সে এগিয়ে গেল, 'বলুন।'

'তোমার মা ?'

'হ্যাঁ।' সায়ন মায়ের দিকে তাকাল, 'মা, ইনি মিসেস অ্যান্টনি। আমাদের দেখাশোনা করেন। আমাকে খুব ভালবাসেন।'

নন্দিনী কিছু বলার আগেই মিসেস অ্যান্টনি এগিয়ে এলেন সামনে, 'আপনাকে দেখার সৌভাগ্য হল বলে আমার খুব গর্ব হচ্ছে।'

একজন নেপালি প্রৌঢ়ার মুখে সুন্দর বাংলা উচ্চারণ শুনে যতটা নয় তার চেয়ে বলার ভঙ্গিতে নন্দিনী খুব লজ্জায় পড়লেন, 'সৌভাগ্য বলছেন কেন ? আপনাদের কাছে আমার ছেলেকে রেখেছি— !'

'না না।' কথা শেষ করতে দিলেন না মিসেস অ্যান্টনি, 'আমি এখানে খুব অল্পদিন হল এসেছি। কেন এসেছি জানেন ?' ভদ্রমহিলার চোখমুখ উজ্জ্বল হল।

নন্দিনী কৌতূহল নিয়ে তাকালেন। অন্য সবাই কথাগুলো উপভোগ করছিল।

'এই ছেলেটির জন্যে। ওর সামনে বলা ঠিক হচ্ছে না অবশ্য—। থাক, আপনারা কদিন তো এখানে আছেন ?'

কমলেন্দু বলল, 'হ্যাঁ।'

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'সায়ন, ডক্টর বললেন আজ তুমি মায়ের সঙ্গে হোটেলে গিয়ে থাকবে। চলো, তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিই।'

'না না। আমিই করে নিতে পারব। আচ্ছা, ওরা চলে গিয়েছে ?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল।

'কারা ? ও মেয়েটি ! হ্যাঁ। ওর মা বিকেলবেলায় ওকে নিয়ে আসবে।' মিসেস অ্যান্টনি সবাইকে নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

কমলেন্দু দূরত্ব বুঝতে না পেরে একটা মারুতি ভ্যান ভাড়া করে মহিলাদের নিয়ে এসেছিল। আসার পর মনে হয়েছিল টাকাটা ফালতু খরচ হল। এইটুকু পথ, হেঁটেই আসা যেত। কিন্তু ফেরার সময় সে খুশি হল। সায়নকে নিয়ে ওইটুকু পথও বোধহয় হেঁটে যাওয়া ঠিক হত না। আর ভ্যান বলে ছয়জন লোক দিব্যি এঁটে গেছে। ট্যুরিস্ট লজের সামনে গাড়ি ছেড়ে দিতেই বাদল বলল, 'আঃ, গ্র্যান্ড। কী দারুণ দৃশ্য ! হিন্দি সিনেমার মতন।'

ট্যুরিস্ট লজটি পাহাড়ি রাস্তার গা ঘেঁষে। ওপাশে আদিগন্ত শূন্যতা। মাঝে মাঝেই সেই শূন্যে মেঘেরা নেমে আসছে। এদের একটি লোক হেসে বলল, 'কাল এক ফিল্মকা স্যুটিং হুয়া। আমির খান ইঁহা খাড়া থা।'

খবরটা কাউকে তেমন অবাক করল না।

সদানন্দ বলল, 'তাহলে আমরা এবার যাই।'

'এখনই যাবে কী ? এসো।'

কমলেন্দু বলল, 'চলো, রেস্টুরেন্টে বসা যাক।'

উর্মিলা বলল, 'এইমাত্র তো চা খেলাম।'

'শীতের রাজ্যে এলে ঘন ঘন চা খাওয়া যায়। চলো।'

রেস্টুরেন্টটা চমৎকার। খাদের দিকটায় বড় বড় কাচের জানলা। চেয়ারে বসেও অনেকটা পাহাড় দেখা যায়। মেয়েরা চা খেলেন না। সায়নও নয়।

অনেকদিন পরে নিরাময় থেকে বেরিয়ে নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে বসে গল্প করতে খুব ভাল লাগছিল সায়নের। একঘেয়েমিটা এখন উধাও। সে মায়ের হাত ধরল পাশের চেয়ারে বসে। নন্দিনী সেটা লক্ষ করেও উদাসীন ভাব দেখিয়ে বললেন, 'দ্যাখ, দ্যাখ, মেঘগুলো যেন খরগোশের মতো দৌড়োচ্ছে।'

সায়ন বলল, 'আমি রোজ দেখি। কখনও কখনও হাতি হয়ে যায় ওরা।'

কমলেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের প্রোগ্রাম কী ?'

সদানন্দ বলল, 'কাল একটা গাড়ি ডেলিভারি পাব। নাইনটি সিক্সের ওমনি। একজন

ডাক্তারের। ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন। ভদ্রমহিলা বাঙালি ছাড়া অন্য কাউকে বিক্রি করবেন না। অথচ এখানে তো মারুতি ওমনির খুব ডিম্যান্ড। ট্যাক্সিগুলোর বেশির ভাগই তাই। নেপালিরা ওঁকে বিক্রির জন্যে চাপ দিলেও উনি রাজি হননি। আমরা গিয়ে কথা বলতে উনি রাজি হয়েছেন।'

'কত দাম পড়ল ?'

'কলকাতার থেকে সস্তা। আর জিজ্ঞাসা করবেন না। কারণ কত দামে কিনছি বললেই জানতে চাইবেন কী দামে বিক্রি করব। ব্যবসার সিক্রেট কাউকে বলা উচিত নয়।' কপট গাম্ভীর্য চোখে মুখে আনল সদানন্দ।

'মা, তোমরা দার্জিলিং যাবে না ?'

'যাব বাবা।'

'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ?'

'তুই হাঁটতে পারবি ?'

'পারব।'

'কিন্তু ডাক্তারবাবু বলেছেন এক রাতের বেশি বাইরে থাকা যাবে না।'

'হ্যাঁ ! আমরা কাল সকালে দার্জিলিং গিয়ে বিকেলে ফিরে আসব। সন্ধ্যার আগে নিরাময়ে গেলে তো ওঁর কথা অমান্য করা হবে না।'

সদানন্দ বলল, 'ঠিক। সানুকে দার্জিলিং ঘুরিয়ে নিয়ে আসুন।'

কমলেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি কী করে কলকাতায় পাঠাবে ?'

বাদল বলল, 'আমরাই চালিয়ে নিয়ে যাব। নো প্রব্লেম।'

ঊর্মিলা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এতটা পথ ?'

ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমন ভঙ্গি করে হাসল বাদল। চা খাওয়া হয়ে গেলে সায়নকে আরও দু-চারটে ভাল কথা বলে সদানন্দরা বিদায় নিল। ট্যুরিস্ট লজ থেকে বেরিয়ে নির্জন পথ দিয়ে শহরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সদানন্দ বলল, 'ডাক্তারটা মাইরি অসাধ্যসাধন করেছে।'

'কোন ডাক্তার ?'

'সানুর ডাক্তার। কলকাতা থেকে যখন এসেছিল তখন মনে হয়েছিল এক মাসও বাঁচবে না। এই কয়েকমাসের পর ওর চেহারা বেশ ভাল হয়ে উঠেছে। অথচ মৃত্যু ওর অবধারিত। একটা মানুষ, সানুর মতো ভাল ছেলে, কিছুদিনের মধ্যে মরে যাবে ভাবলেই কীরকম রাগ হয়।' গলা উঠল সদানন্দর।

'প্রত্যেককেই তো মরতে হবে।' নিচু গলায় বলল বাদল।

'জ্ঞান দিস না। ওর শরীরে মৃত্যু ওঁৎ পেতে বসে আছে। ব্লাড ক্যানসার। শুনলি না, ডাক্তার বললেন আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি।'

'সে-চেষ্টা তো উনি করছেন।'

'করছেন।' একটু চুপ করে হেঁটে সদানন্দ বলল, 'তুই ঠিক বুঝবি না।'

লিটল হাটের উল্টোদিকে অনেক দোকান। তাদের মধ্যে বার কাম রেস্টুরেন্টের সংখ্যাই বেশি। খেয়েদেয়ে ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিয়ে ডাউহিলের দিকে যাবে ওরা। ভদ্রমহিলাকে ড্রাফটটা দিয়ে আসবে।

রেস্টুরেন্টে ঢুকে বাদল বলল, 'সদু, বিয়ার খাবি ?'

'দূর ঠাণ্ডা জায়গায় কেউ বিয়ার খায় নাকি ?'

পাশের টেবিলে দুজন নেপালি বৃদ্ধ বিয়ার খাচ্ছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বাদল বলল, 'ওই তো ওরা খাচ্ছে।'

'ওরা এখানকার লোক। এটাই হয়তো গরমের সময়। তা ছাড়া বিয়ার খেয়ে ভদ্রমহিলার কাছে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'একটু খেলে বুঝতে পারবেন ?'

'কী জানি !'

ওরা রুটি মাংস খাচ্ছিল। গাড়িটা কলকাতায় নিয়ে গেলে সব খরচ বাদ দিয়ে হাজার তিরিশ লাভ

থাকবে ওদের। মাসে এরকম দুটো কেস করলেই আর চিন্তা করতে হবে না। ওরা এই নিয়ে গল্প করছিল। এইসময় কানে এল একটি ছেলে নেপালিতে কিছু চেঁচিয়ে বলল। তারপরই একটা পাম্পশু গোছের জুতো কিছু উড়ে এসে ওদের টেবিলে সশব্দে পড়ল।

চমকে মুখ তুলল দুজনেই। জলের গ্লাস গড়িয়ে গেল। অল্পের জন্য খাবারের প্লেট বেঁচে গেল। রেস্টুরেন্টের সবাই এবার ওদের দেখছে। একটি ছেলে গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে জুতোটা তুলে নিয়ে বলল, 'তুই একটা বেয়াদপ জুতো। আকাশে উড়তে তোর খুব ভাল লাগে ? অ্যাঁ ?'

বাদল উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি আমাদের টেবিলে জুতো ছুড়েছেন ? হোয়াট ইজ দিস ?'

'আমি ছুড়িনি, জুতোই উড়ে এল।' ছেলেটি এবার দাঁত বের করে হাসল।

এইসময় কাউন্টার থেকে একটি স্বাস্থ্যবান যুবক উঠে এসে ছেলেটিকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়ে বলল, 'অ্যাই, কী করছ তুমি ? আমার কাস্টমারকে ডিস্টার্ব করার কোনও রাইট নেই তোমার। যাও, বেরিয়ে যাও।'

ছেলেটা হাসল, 'আমি তো ডিস্টার্ব করিনি। আমার জুতো করেছে।'

যুবক বলল, 'আমি কিন্তু পার্টি অফিসে তোমার নামে কমপ্লেন করব।'

ছেলেটা এবার বাদলদের দিকে তাকাল, 'আমাদের রুটিতে কেউ যদি হাত বাড়ায় তাহলে সেই হাত ভেঙে দেওয়া হবে। বুঝলে ?' বলে বেরিয়ে গেল।

যুবক বলল, 'আপনারা কিছু মনে করবেন না। এরকম ঘটনা কখনও এখানে ঘটেনি। আমি ওর হয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি।'

সদানন্দ এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। বাদল উত্তর দিতে যাচ্ছে দেখে সে ওর হাত ধরে নিষেধ করে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের ওপর ও কেন রেগে গেছে ?'

'আমি ঠিক জানি না। কী সব রুটির কথা বলছিল। আপনাদের আগে পরিচয় ছিল ?' যুবক বলল। তখন অনেকেই ভিড় করে এসেছে।

সদানন্দ মাথা নাড়ল, 'না। কখনও দেখিনি ওকে। আমরা শুনেছিলাম পাহাড়ে এখন শান্তি ফিরে এসেছে। ট্যুরিস্টরা নিরাপদ। কিন্তু—।'

যুবক বলল, 'আপনারা খেয়ে নিন, প্লিজ। আমি পার্টি অফিসে খবর দিচ্ছি।'

ওরা পুরনো প্লেট ডিশ গ্লাস সরিয়ে নিয়ে নতুন খাবার দিয়ে গেল। কিন্তু আর নতুন করে খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল না দুজনেরই। ম্যানেজার যুবকটির অনেক অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সামান্য খেল ওরা। বেসিনে মুখ ধুয়ে কাউন্টারের দিকে এগোতেই দুজন লোক ঢুকল রেস্টুরেন্টে। ম্যানেজার এগিয়ে গিয়ে তাদের ঘটনাটি জানাল। সব শুনে একজন এগিয়ে এসে হাত বাড়াল, 'আমি লোকাল কমিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। সেক্রেটারি আজ দার্জিলিং-এ গিয়েছেন। আপনারা কোথায় উঠেছেন ?'

সদানন্দ বলল, 'লিটল হাটে।'

'ও। এরকম ঘটনা ঘটেছে বলে আমরাই লজ্জিত। ট্যুরিস্টদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করতে দলের স্পষ্ট নির্দেশ আছে। ছেলেটিকে আপনারা চেনেন না ?'

'না।'

'আপনারা আপনাদের হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

সদানন্দ দাম দিতে যাচ্ছিল কিন্তু ম্যানেজার কিছুতেই নিল না। বলল, 'আপনি যদি আবার খেতে আসেন তখন খুশিমনে নেব। এখন নিতে পারব না।'

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে বাদল বলল, 'চল হোটেলেই ফিরে যাই। এখন ডাউহিলে যাওয়া ঠিক হবে না।'

হোটেলের ঘরে দুটো খাটে শুয়ে ওরা ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছিল। স্থানীয় মানুষজন এমন কী পার্টির নেতার ব্যবহার খুব ভাল। তাহলে ওই ছেলেটি এমন ব্যবহার কেন করল ? ওরা কারণ খুঁজে যেটা পাচ্ছিল এবং সেটা ভাবতে একটুও ভাল লাগছিল না।

এইসময় দরজায় টোকা পড়ল। বাদল দরজা খুলে দেখল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে সেই ছেলেটি।

ভদ্রলোক বললেন, 'ক্ষমা চাও, আমি কোনও কথা শুনতে চাই না।'

ছেলেটা প্রতিবাদী চোখে তাকাল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে।'

'ঠিক আছে বললে হবে না, বলো, ক্ষমা চাইছি।'

এইসময় সদানন্দ উঠে এল, 'কিছু মনে কোরো না ভাই, তুমি কেন জুতোটা ছুড়লে তা আমরা বুঝতে পারছি না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'এ ব্যাটা বুদ্ধু, মাথা মোটা। ও মিসেস মুখার্জির গাড়ি কিনতে চায় কিন্তু বেশি দাম দেবে না। মিসেস মুখার্জির অধিকার আছে তিনি কাকে গাড়ি বিক্রি করবেন সেটা ঠিক করার। আপনারা এখানে এসে গাড়ি কিনবেন বলে ও খেপে গিয়েছে।'

সদানন্দর স্বস্তি হল, 'আপনার যদি আপত্তি থাকে তাহলে ওই গাড়ি আমরা কিনব না। কিন্তু কথাটা না বলে জুতো ছুড়লেন কেন ?'

'এটাই তো ওকে বলেছি। ক্ষমা চা।'

এবার ছেলেটি বলল, 'ঠিক আছে, অন্যায় হয়ে গিয়েছে।'

'যা ভাগ।' ভদ্রলোক বলতেই ছেলেটি চলে গেল, 'আপনারা মন থেকে মুছে ফেলুন ঘটনাটা। আচ্ছা চলি।'

ভদ্রলোক চলে গেলে বাদল বলল, 'সর্বনাশ।'

'সর্বনাশ কেন ? এ ঘটনা কলকাতাতেও ঘটে। মফস্বলে গাড়ি কিনতে গেলে সেখানে যদি কারও ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে সেও এই একই কাজ করতে পারে। বিকেল হয়ে গিয়েছে, চল।'

'কোথায় ?'

'ডাউহিলে।'

'যাবি ?'

'হ্যাঁ। আর একটু সময় যাক। যাওয়ার সময় হোটেলের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে যাব।' সদানন্দ হাসল।

'সেকী ? রাত্রে থাকব কোথায় ?'

'গাড়িতে।'

সন্ধের পরে মিসেস মুখার্জির বাড়িতে দুটো ব্যাগ নিয়ে হাজির হল ওরা। ভদ্রমহিলা অবাক। বললেন, 'তোমরা রাত্রে গাড়ি নিয়ে যাবে ?'

'হ্যাঁ।'

'পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালাবার অভিজ্ঞতা আছে ?'

'নেই। তাতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

কাগজপত্রে সইসাবুদ হবার পর ড্রাফট দিয়ে ওরা গাড়িতে উঠল। সদানন্দর ভয় ছিল পর্যাপ্ত পেট্রল নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু ইঞ্জিন চালু করে খুশি হল সে। ডাউহিলের রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি নীচে নামাতে নামাতে সে বেশ স্বচ্ছন্দ হল। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হলে স্টেশনের সামনে পৌঁছোতেই হবে। ওরা যখন স্টেশনে পৌঁছোল তখন গাড়ির ভিড় নেই। কিছু লোক গুলতানি করছে। ওরা দ্রুত শিলিগুড়ির দিকে বাঁক নিল। এবং সেইসময় বাদল ছেলেটিকে দেখতে পেল। অবাক হয়ে ওদের দেখছে। সেকথা বলতে সদানন্দ স্পিড বাড়াল। বাদল চেঁচিয়ে উঠল, 'সদু, ওদের হাতে মার খাওয়া ঢের ভাল কিন্তু অ্যাকসিডেন্টে মরতে চাই না। আস্তে চালা।'

সদানন্দ প্রথম বাঁকটা পার হল, 'আমার ওপর তোর কোনও আস্থা নেই রে ? মাই ডিয়ার মদনা ?'

১৫

ওরা বিকেলবেলায় একটু বেরিয়ে এল। একটু এগোলেই একটা ঝোরা অনেক ওপর থেকে সশব্দে নেমে আসছে। উর্মিলা লক্ষ করল ঝোরার নীচে পথের পাশে একটি মেরির মূর্তির সামনে কেউ বা কারা মোমবাতি জ্বেলে গিয়েছে এর মধ্যে। ওই দারুণ নির্জন জায়গায় জল পড়ার শব্দ, হাওয়ার আওয়াজ আর ঝিঁঝির ডাক মিলেমিশে অপূর্ব কনসার্ট তৈরি করেছে। আর সেই কনসার্ট যেন মেরির প্রতি শ্রদ্ধায় উৎসর্গীকৃত। মেরির মুখের ভঙ্গিটি বড় সুন্দর। পৃথিবীর সব মা যেন তাঁদের স্নেহ নিয়ে ওই ভঙ্গিতে একত্রিত। হঠাৎ উর্মিলা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অনেক দিন বিয়ে হয়ে গেল তার। অর্থের প্রাচুর্য না থাকলেও অভাব নেই। স্বামীও রীতিমতো ভদ্রলোক। কিন্তু এখনও সন্তান এল না। কলকাতার গাইনিদের দেখিয়ে দেখিয়ে সে ক্লান্ত। সবাই ভরসা দিচ্ছেন কিন্তু—। না তার যিশুর মতো সন্তান চাই না। একজন সাধারণ মানুষ যদি তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসত যে তার কথা ভাববে, বুঝবে তা হলেই সে খুশি হত।

'কী ভাবছ তুমি ?'

সায়নের গলা পেয়ে উর্মিলা চমকে তাকাল।

'তুমি কাঁদছ ?' সায়নের গলায় বিস্ময়।

'দূর ! একনজরে চেয়ে থাকলে চোখে জল আসে।' জল মোছার চেষ্টা না করে উর্মিলা আড়চোখে দেখে নিল নন্দিনী আর কমলেন্দু খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে জল পড়া দেখছে, 'কী সুন্দর মূর্তি, না ?'

সায়ন মেরির দিকে তাকাল, 'ঠিক মানুষের মতো।'

'মানুষ ? উনি কে ছিলেন জানিস না ?'

'জানি। মানুষ ছিলেন বলেই যিশুর মা হয়েছিলেন। মানুষ ছিলেন বলেই ওইভাবে তাকাতে পেরেছেন। যিশুও তো ভগবান নন। তিনিও মানুষ ছিলেন। ভগবান যাঁরা তাঁরা অনেক দূরের হন।'

উর্মিলা সকৌতুকে তাকাল। সায়নের মুখে এমন কথা আশা করেনি সে।

সায়ন বলল, 'এই যেমন দুর্গাঠাকুর। তোমার কি কখনও তাকে নিজের বলে মনে হয় ? দশখানা হাত নিয়ে মেয়ের চেহারায় রয়েছেন। দেখে ভয়ে মা বলতে হয়, ভেতর থেকে আসে না। কালীঠাকুর, তারও বেলায় একই কথা। সরস্বতী, লক্ষ্মী সবাই কেমন সাজানো।'

'বুঝেছি। তুমি এখানে এসে খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছ !' কপট ভঙ্গি করল উর্মিলা, যদিও সায়নের কথার সঙ্গে সে একমত।

'আমি খ্রিস্টান হতে যাব কেন ? ইচ্ছে করলেই কি খ্রিস্টান হওয়া যায় ?'

'কেন ? চার্চে গিয়ে বললেই তো হয়।'

'কী যে বল ! এই যে সদুদা, সদুদা কি হিন্দু ? আমি ? হিন্দুবাড়িতে জন্মেছি বলেই হিন্দু হয়ে যাব ভাবলে খুব বোকামি করা হবে ! হিন্দু হতে হলে ধর্মটা জানতে হবে, সেইমতো জীবনযাপন করতে হবে। ঠিক একই কথা খ্রিস্টানদের সম্পর্কে।' সায়ন গলার স্বর পাল্টাল, 'আচ্ছা, টুপুর কী দুষ্টুমি করেছিল ?'

আচমকা সায়ন এমন প্রসঙ্গ তুলবে কল্পনা করেনি উর্মিলা। বলল, 'আমি ঠিক জানি না যে।'

'দ্যাখো। তোমরা সবাই একই বাড়িতে থাকো অথচ কেউ কারও খবর রাখো না। আমি ওকে লিখব ব্যাপারটা জানাতে !' ওপরের দিকে তাকিয়ে সায়ন বলে উঠল, 'যাঃ, মোমবাতিটা নিভে গেল।'

উর্মিলাও সেটা দেখেছিল। মনে মনে সে মা মেরিকে ধন্যবাদ দিল সায়নকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। টুপুরের ব্যাপারটা ওকে বলা যাবে না। যদি ও সে-সময় থাকত তা হলে আলো নিভিয়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে নন্দিনী ওকে কী বোঝাতেন তা তিনিই জানেন। কিন্তু ওর সামনে সরল মুখে মিথ্যে বলতে পারছিল না উর্মিলা।

'এই তুই কী করছিস !' চেঁচিয়ে উঠল উর্মিলা। সায়ন পাথর ধরে খাঁজে পা রেখে ওপরে উঠতে চেষ্টা করছে। সেই চিৎকার শুনে নন্দিনী ছুটে এলেন। পেছনে কমলেন্দু। নন্দিনী চিৎকার করে বললেন, 'কী হচ্ছে সায়ন ? ওপরে উঠছ কেন ? তোমার শরীর খারাপ, নেমে এসো।'

সায়ন চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'আমার শরীর ঠিক আছে মা। ওই মোমবাতিটা জ্বেলে দিয়েই নেমে আসব।'

'সর্বনাশ ! তুমি পড়ে যাবে। ডাক্তারবাবু আমাকে আস্ত রাখবেন না। আয় বাবা, নেমে আয়, কথা রাখ আমার।' নন্দিনীর গলায় কান্না মিশল।

কমলেন্দু চেঁচিয়ে উঠল, 'সায়ন, নেমে এসো। তুমি ওপরে উঠতে পারবে না। তোমার শরীর দুর্বল। কথা শোনো।'

সায়ন এসব শুনছিল না। এই সময় দার্জিলিং-এর পাহাড় থেকে যেসব গাড়ি নীচে নামছিল, তারা একের পর এক দাঁড়িয়ে গেল বাঁকে। গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভার এবং যাত্রীরা ওপরে তাকিয়ে মজা পাচ্ছিল।

নন্দিনী সায়নকে কখনওই অবাধ্য হতে দেখেননি। আজ যেন কোনও কথাই ওর কানে ঢুকছে না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল নন্দিনীর। যে-ছেলের শরীরে মৃত্যু বাসা বেঁধেছে সে ওই দুঃসাহস দেখাচ্ছে কেন ? যদি পা ফসকে নীচে গড়িয়ে পড়ে তাহলে আজই চলে যাবে পৃথিবী ছেড়ে। নন্দিনী চোখ বন্ধ করে ফেললেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, ওর বাবা বলেন মন শক্ত করো। ছেলে চলে যাবে, আজ নয় কাল। আমাদের ওর যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। কথাগুলো মনে পড়তেই নিজেকে যতটা সম্ভব নিস্পৃহ করে চোখ খুললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল তাঁর। হাওয়ার আওয়াজ, জলের শব্দ, ঝিঁঝির ডাক, কিছুই কানে যাচ্ছিল না তাঁর। ওখানে কে ? ওই পাথর বেয়ে যে উঠে প্রায় মা মেরির কাছে পৌঁছে গিয়েছে ? ও কি সায়ন ? তাঁর ছেলে ? কিন্তু তিনি তো সায়নকে দেখতে পাচ্ছেন না। অপূর্ব এক আলোকময় তরুণ ক্রমশ মা মেরির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঝুঁকে পড়ে প্রায় শেষ হয়ে আসা একটি মোমবাতির আগুন থেকে অন্য মোমবাতিগুলোকে একের পর এক জ্বালিয়ে দিল। মা মেরি তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সেই আলোকময় তরুণ মায়ের পায়ে হাত রাখল। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগল। এই নামার পথ বিলম্বিত হচ্ছে। ঠিকঠাক ধাপে, খাঁজে, পা পড়ছে না সহজে। কিন্তু সেগুলো বেশিক্ষণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল না। যেন নিজেরাই ওকে নামার জন্যে জায়গা করে দিল।

হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার চারপাশের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল। নন্দিনী দেখলেন সায়ন নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই আলোকময় তরুণ উধাও হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। কিন্তু ওপর থেকে নেমে আসা যাত্রীরা, ড্রাইভাররা উল্লাসে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে গেল সায়নের সামনে। লোকগুলো মাথা নত করে তাকে অভিবাদন জানাল। কিন্তু তাদের এড়িয়ে সায়ন ছুটে এসে নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরল, 'মা, আমি পেরেছি। মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছি। তুমি রাগ করোনি তো ?'

নন্দিনী কথা বলতে পারছিলেন না। একটু আগে তিনি যা দেখেছেন তা কি সত্যি না বিভ্রম ?

ইতিমধ্যে ভিড়ের সবাই জানতে চাইছে ছেলেটি কে ? কমলেন্দু জবাব দিচ্ছিল। এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নন্দিনীকে বলল, 'মা, আপনারা নিশ্চয়ই কাছেই থাকেন। আমার গাড়িতে উঠুন, পৌঁছে দিচ্ছি।' নন্দিনী ভাবলেন তাই ভাল।

ভদ্রলোকের গাড়িতে চেপে ওরা ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছে গেল। কিন্তু ওদের অনুসরণ করা কিছু গাড়ি তখন দাঁড়িয়ে গেল লজের সামনে। বাকিরা চলে গেল গন্তব্যস্থানে। লজের ভেতরে ঢুকে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি ওকে একটি কথা বলতে চাই, আপনি অনুমতি দেবেন ?'

নন্দিনী ঘাড় নাড়লেন।

ভদ্রলোক সায়নকে বললেন, 'তুমি আমাকে স্পর্শ করবে ?'

সায়ন অবাক হয়ে গেল, 'কেন ?'

'এটা আমার প্রার্থনা।'

'প্রার্থনা বলছেন কেন ?'

'আর কোনও শব্দ তো আমার জানা নেই।'

সায়ন কী করবে বুঝতে না পেরে হাত বাড়িয়ে দিল। একটু ইতস্তত করে ভদ্রলোক সেই হাত দুটো হাতে ধরলেন, 'আমি একজন নাস্তিক মানুষ। কিন্তু আজ আমি কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারছি না। আচ্ছা, চলি।'

কমলেন্দু বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কী হয়েছে বলো তো ?'

নন্দিনী মাথা নাড়লেন, কিছুই বলতে পারলেন না।

কমলেন্দু বলল, 'ওরা কেউ জানে না সায়ন অসুস্থ। ওকে দেখে তা বোঝাও যায় না। তাহলে ওর মোমবাতি জ্বালানো দেখে এত লোক ওরকম পাগলামি করছে কেন ?'

এইসময় একজন বুড়ো বেয়ারা ছুটে এল। সায়নের পায়ের কাছে প্রায় আছাড় খেয়ে পড়ে বলল, 'আমার মেয়েটাকে তুমি বাঁচিয়ে দাও। আমি শুনলাম তুমি সব করতে পারো। আমার মেয়ে বাঁচবে না বলেছে সব ডাক্তাররা। তুমি তাকে বাঁচিয়ে দাও।'

সায়ন হকচকিয়ে গেল, 'আমি কী করে বাঁচাব ? তুমি আরও বড় ডাক্তারকে দেখাও।'

'আরও বড় ডাক্তার ?' লোকটা বুঝতে চেষ্টা করল।

'শিলিগুড়িতে নিয়ে যাও।'

'নিয়ে যাব। তুমি যখন বলছ, নিশ্চয়ই শিলিগুড়ির বড় ডাক্তারকে দেখাব। যেখান থেকে পারি টাকা জোগাড় করব।'

নন্দিনী ছেলেকে নিয়ে ঘরে গেলেন। দুটো খাট, দুজনের জন্যে। সায়ন বলল, 'মা, তোমার সঙ্গে শোব।'

নন্দিনী আড়চোখে ছেলেকে দেখলেন, তারপর বললেন, 'অত ছোট খাটে দুজনের কি হয় ?'

সায়ন জানলার কাছে গেল। পর্দা সরিয়ে কাচের এপাশ থেকে বাইরে দেখল। বলল, 'দ্যাখো, দ্যাখো, সন্ধে নেমে এসেছে। একটু পরে রাত নামবে। তখন সব অন্ধকার। কিছুই দেখা যাবে না।'

'পর্দা ঠিক করে দে। ঠাণ্ডা আসবে।' নন্দিনী সহজ হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। প্রাণপণে।

পর্দা ঠিক করে সায়ন বলল, 'আচ্ছা মা, সবাই অমন করছে কেন ? ওই বুড়ো লোকটা আমাকে প্রণাম করল কেন ?'

'মাথা খারাপ বোধ হয়।'

এবার দরজায় শব্দ হল। ঊর্মিলা ঢুকল। সায়ন দেখল ঊর্মিলাকে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে। নন্দিনী হাসার চেষ্টা করলেন, 'এসো।'

সায়ন তার ঘরে-পরার জামা-পাজামা ব্যাগ থেকে নিয়ে পাশের বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকিয়ে ঊর্মিলা নন্দিনীর দিকে মুখ ফেরাল।

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কমলেন্দু কোথায় ?'

'ঘরে। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে।' ঊর্মিলা জবাব দিল।

'সন্ধের পর এসব জায়গায় কিছু করার নেই।' নন্দিনী অলস গলায় বলার চেষ্টা করলেন।

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?' ঊর্মিলা বলল।

নন্দিনী তাকালেন ; তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন।

'সায়ন যখন মোমবাতি জ্বালাতে ওপরে উঠেছিল তখন তুমি কি কিছু দেখেছিলে ?' ঊর্মিলা উদগ্রীব হয়ে তাকাল।

'দেখেছিলাম মানে ?' নন্দিনী মুখ ফেরালেন।

'আমি দেখলাম ও উঠে যাচ্ছে তারপর আর নেই। ভয়ে নীচের দিকে তাকালাম যদি পড়ে গিয়ে থাকে। নীচেও দেখলাম না। তারপর আবার দেখি মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে মোমবাতি জ্বালাচ্ছে। আর তখন ওকে ঠিক যিশুখ্রিস্টের মতো দেখাচ্ছিল। মনে করতেই আমার গায়ে কাঁটা ফুটছে, দেখ।' ঊর্মিলা হাত বাড়াল।

'তোমার মনের ভুল।'

'তাহলে ওই লোকগুলো চেঁচাল কেন ?'
'মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে নেমে এসেছিল, তাই।'
'তুমি কিছুই দেখনি ?'
'কমলেন্দু কি এক কথা বলছে ?'
'না। ও কিছু দেখেনি। আমাকে বলছে সবাই দিবাস্বপ্ন দেখেছে।'
'সেটাই ঠিক।'
'আমিও ভাবছিলাম। যে-ছেলেটাকে একটু একটু করে বড় হতে দেখলাম, যার মধ্যে কোনও কিছু দেখিনি, যার অমন ভয়ঙ্কর অসুখ হয়েছে সে কী করে অবতার হয়ে যাবে !'
'অবতার !' অন্যমনস্ক গলায় বললেন নন্দিনী।
'অবতারদের ওই রকম হয়। এখন টিভি-র যুগে এসব বাস্তবে তো হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মুশকিল হল তুমি আর ও কিছু দেখনি কিন্তু অন্য লোকজন আমার মতো দেখতে পেল কী করে ! কী আলো বের হচ্ছিল ওর শরীর থেকে। বললাম বলে ও বলল তোমার পেটে বায়ু বেড়েছে।'
এইসময় সায়ন বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল ? শুয়ে পড়লি যে ?'
'এমনি।'
'শরীর খারাপ লাগছে ?'
'না। আচ্ছা মা, ওই লোকটা আমার পায়ে পড়ল কেন ?'
'আবার এক কথা। অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে, কম্বলটা টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাক। তোর কি এখন ওষুধ খাওয়ার কথা ?'
'না।' সায়ন বালিশে মুখ গুঁজল।
নন্দিনী বললেন, 'চলো, আমরা বাইরে গিয়ে আকাশ দেখি।'
উর্মিলা বলল, 'বাইরে কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা।'
নন্দিনী ছেড়ে-রাখা-শালটাকে জড়িয়ে নিলেন, 'আলো নিভিয়ে দেব ?'
সায়ন বলল, 'থাক।'
দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ কানে এল। সায়নের মনে হচ্ছিল মা ঠিক বলছে না। ওই লোকটির মাথা খারাপ হলে এখানে কাজ করে কী ভাবে ? আর যেসব লোক গাড়ি থামিয়ে তাকে দেখছিল, নেমে আসার পর উল্লাসে চিৎকার করেছিল তারা তার দিকে কী অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছিল। কেউ কেউ তাকে ছুঁতে চাইছিল। এমনকী যে ভদ্রলোক তাদের লজে পৌঁছে দিয়ে গেলেন তিনি তার স্পর্শ প্রার্থনা করলেন ? প্রার্থনা তো লোকে ঈশ্বরের কাছে করে ! হঠাৎ মিস্টার ব্রাউনের কথা মনে পড়ল সায়নের। মিস্টার ব্রাউন ইদানীং তার সঙ্গে যখনই কথা বলেন তখনই খুব সমীহ করে বলেন। অত প্রবীণ মানুষ কেন ওইভাবে কথা বলবেন ? প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল তার মনে। প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছিল তার। সায়ন উঠে বসল। বসতেই টের পেল নাকের মধ্যে সুড়সুড় করছে। ও আঙুল দিতেই টাটকা রক্ত দেখতে পেল। চিৎকার করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে। তারপর ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে বাইরে বেরুবার জামা-প্যান্ট পরে নিল।
বাইরে বেশিক্ষণ থাকা যাচ্ছিল না। ঠাণ্ডা বাড়ছে। উর্মিলাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে পা দিয়ে নন্দিনী অবাক, 'কী রে ? আবার জামা-প্যান্ট পরলি কেন ?'
রুমালে নাক চেপে বসেছিল সায়ন। সেইভাবেই বলল, 'একটা গাড়ি ডাকো। আমাকে এখনই নিরাময়ে নিয়ে চলো।'
'কেন ?' ছুটে এলেন ছেলের কাছে নন্দিনী। এক হাতে কাঁধ জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে ওর হাতে-ধরা-রুমাল নাক থেকে সরিয়ে দেখলেন রক্তের ছোপ রয়েছে তাতে। মায়ের বুকে মাথা রেখে সায়ন বলল, 'আমার খুব শরীর খারাপ করছে মা। তাড়াতাড়ি করো।'
ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নন্দিনী প্রায় পাগলের মতো ছুটে গেলেন। উর্মিলাদের দরজায় ধাক্কা মেরে বললেন, 'উর্মিলা, দরজা খোলো।'

কমলেন্দু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে ?'

'সানুর নাক থেকে রক্ত বের হচ্ছে। ওকে এখনই নিয়ে যেতে হবে।' খুব উত্তেজিত গলায় কথাগুলো বললেন নন্দিনী।

উর্মিলা এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে, 'সে কী! এ কখনও হতে পারে ? ও মা মেরির আশীর্বাদ পেয়েছে।'

'কী পেয়েছে জানি না। তবে রক্ত নিজের চোখে দেখেছি, শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে ওর। তুমি একটা ব্যবস্থা করো।'

কমলেন্দু স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'যতই আধুনিক কথা বল, দেখলে তো, কীরকম কুসংস্কার তোমাকে চেপে রেখেছে।' কমলেন্দু দ্রুত বেরিয়ে গেল।

তখন সন্ধে পার হওয়া রাত। কিন্তু পাহাড়ে নির্জনতা চেপে বসেছে। রাস্তায় কোনও গাড়ি নেই। ট্যুরিস্ট লজ শহরের বাইরে বলে এদিকে মানুষজনও কম। কমলেন্দু ম্যানেজারকে বলল, 'আমার সঙ্গে যে-ছেলেটি আছে সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হেল্প করুন।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মানে সায়ন অসুস্থ ?'

'আপনি ওর নাম জানেন ?'

'জানতাম না। আজ আপনারা ফিরে আসার পর—।' ভদ্রলোক হাঁকডাক করে বেয়ারাদের নির্দেশ দিলেন ট্যাক্সি ধরে নিয়ে আসতে। টেলিফোনে ট্যাক্সি ডাকার নাকি কোনও উপায় নেই। বেয়ারারা বেরিয়ে গেলেও সেই বুড়ো বেয়ারা উদগ্রীব হয়ে পাশে এসে দাঁড়াল। ম্যানেজার বললেন, 'চিন্তা করবেন না। এখনই ট্যাক্সি এসে যাবে। কী হয়েছে ছেলেটির ?'

'ব্লিডিং হচ্ছে।'

'ব্লিডিং ? কেটে গিয়েছে নাকি ?'

'না। ওর রক্তের অসুখ আছে।'

শোনামাত্র বুড়ো বেয়ারা ছুটে গেল। দরজা খোলা, নন্দিনী ছেলেকে জড়িয়ে বসে আছেন। সায়নের নাকে রুমাল চেপে ধরে আছেন তিনি। উর্মিলা হতভম্ব হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে। রক্তাক্ত রুমালটা টেবিলের ওপর রেখে নন্দিনী দ্বিতীয় রুমাল নাকে চাপলেন। সেই সময় কমলেন্দু ছুটে এল, 'ট্যাক্সি এসে গিয়েছে। আপনি সরুন, আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি!'

প্রাপ্তবয়স্ক একটি শরীরকে কোলে তুলতে কষ্ট হচ্ছিল কমলেন্দুর। তবু সমস্ত শক্তি দিয়ে সে সায়নকে তুলে দরজার দিকে এগোতে নন্দিনী তাদের অনুসরণ করলেন। উর্মিলা সায়নের ব্যাগে জামা-পাজামা দ্রুত পুরে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল বুড়ো বেয়ারা টেবিল থেকে রক্তে ভেজা রুমালটি তুলে নিচ্ছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী করছ তুমি ?'

লোকটি হাতজোড় করল, 'লোকে বলছে ওঁর মধ্যে ভগবান আছে। ওঁর রক্ত যদি আমার মেয়ের মুখে দিতে পারি তা হলে অসুখ সেরে যাবে।'

উর্মিলা পাথর হয়ে গেল। ভারতবর্ষের অশিক্ষিত মানুষের অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে অনেক লেখা তাকে কমলেন্দু পড়িয়েছে কিন্তু চোখের সামনে এমন ঘটনা ঘটবে ভাবতে পারেনি। বুড়ো বেয়ারা দ্রুত বেরিয়ে গেলে হুঁস হল উর্মিলার। সে যখন ছুটে বাইরে এল তখন ওরা ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছে। মারুতি ভ্যানের পেছনে সায়নকে কোলে শুইয়ে নন্দিনী, সামনে কমলেন্দু। উর্মিলা সায়নের পায়ের কাছে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করলে তার মনে পড়ল কমলেন্দুর কথা। ওই বুড়ো বেয়ারা সম্পর্কে সে যা ভেবেছে ঠিক তাই কমলেন্দু তার সম্পর্কেও বলেছে। সায়ন সম্পর্কে হঠাৎ তার ভাবনা পাল্টেছিল। আসলে বাল্যকাল থেকে শুনে শুনে অলৌকিক ব্যাপার সম্পর্কে আগ্রহ মনের ভেতর লুকিয়েছিল। আজ হয়তো দেখার ভুলেই সেই লুকোনো ভাবনাকে বিশ্বাস করে ফেলেছে। কমলেন্দুর এটা হয়নি বলে তাকে অন্ধ বলে ব্যঙ্গ করতে পেরেছে। সে যদি সায়নের ব্যাপারটাকে অলৌকিক বলে ভাবতে পারে তা হলে বুড়ো বেয়ারাকে দোষ দিয়ে লাভ কী! সায়ন যে সব অর্থে মানুষ তার প্রমাণ হাতে হাতে হয়ে গেল ওর অসুস্থতায়। ভগবানের আশীর্বাদ যে পেয়েছে তার নাক

দিয়ে নিশ্চয়ই রক্ত বের হবে না। এক ঝটকায় কঠিন বাস্তবে আছাড় খেল উর্মিলা।

নিরাময়ের গেটে তালা পড়ে গিয়েছিল। হর্ন বাজিয়ে শব্দ করে তালা খোলানো হল। ছোটবাহাদুর সায়নকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেল ভেতরে। বড়বাহাদুর একটা স্ট্রেচার নিয়ে এল ভেতর থেকে। সায়নকে তার ওপর শুইয়ে কমলেন্দুর সাহায্য নিয়ে ভেতরে নিয়ে যেতেই ডাক্তার নেমে এলেন।

নন্দিনী কেঁদে উঠলেন সশব্দে, 'ওর নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।'

ডাক্তার বললেন, 'ওকে ইমার্জেন্সি রুমে নিয়ে যাও।'

সেখানে খাটের ওপর শুইয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে ডাক্তার হাসলেন, 'ওয়েল সায়নবাবু, তুমি ঠিক আছ তো?'

সায়ন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'গুড।' ডাক্তার অফিসঘরে চলে এলেন। রেজিস্টার বের করে নাম খুঁজলেন। তারপর ছোটবাহাদুরকে বললেন, 'বিষ্ণুপ্রসাদকে খবর দাও। চার্চের ওপর বাড়ি। বলবে এখনই রক্ত দিতে হবে।'

উর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে ব্লাড ব্যাঙ্ক নেই?'

'আমি টাটকা রক্ত ব্যবহার করতে চাই।'

'আমাদের রক্তে হবে না?'

'আপনার কোন গ্রুপ?'

উর্মিলা কমলেন্দুর দিকে তাকাল, 'আমি ঠিক— !'

'জেনে রাখা উচিত। প্রতিটি সভ্যমানুষের এটা অবশ্য কর্তব্য। ঠিক আছে, আসুন। আমি দেখে নিচ্ছি।'

মিনিট পাঁচেক বাদে ডাক্তারের মুখে হাসি ফুটল, 'চমৎকার। আপনার রক্ত ওর কাজে লাগবে। শুয়ে পড়ুন।'

কমলেন্দু ইতস্তত করছিল, 'ওর কিন্তু মাস ছয়েক আগে জ্বর হয়েছিল।'

'তাতে কিছু হবে না। কী রকম জ্বর? ম্যালেরিয়া? তা হলে ঠিক আছে। মাস ছয়েকের মধ্যে কাউকে রক্ত দেননি তো?'

'না, ও কখনও ব্লাড ডোনেট করেনি।'

'করা উচিত ছিল। প্রতিটি সভ্যমানুষের করা উচিত।'

রক্ত নেওয়ার পর বোতলটা উপুড় করে ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে ডাক্তার বললেন, 'মিনিট দশেক শুয়ে থাকুন। বড়বাহাদুর, মেমসাহেবের জন্যে মিষ্টি আর দুধ নিয়ে এসো। সঙ্গে একটা ডিমের পোচ।'

উর্মিলা আপত্তি করল, 'ও বাবা, আমি অত সব খেতে পারব না।'

'এখনও তো ডিনার করেননি। ভেবে নিন ডিনার করছেন। এখন বলুন তো হঠাৎই নাক থেকে রক্ত বেরিয়েছিল নাকি ও খুব পরিশ্রম করেছিল অথবা—।' ডাক্তার কথা শেষ করলেন না। নন্দিনীর দিকে তাকালেন।

'ওর এখন কিছু হবে না তো?' নন্দিনীর গলা দুর্বল।

'না। তবে প্রেসার খুব কমে গিয়েছে। প্রথম দিকে এরকম হত।' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কি কোনও বিষয় নিয়ে খুব ভাবছিল?'

'আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। ট্যুরিস্ট লজ থেকে ঝোরা পর্যন্ত। দূরত্ব খুব বেশি নয়। ও স্বচ্ছন্দে হেঁটে গিয়েছিল। ফেরার সময় এক ভদ্রলোক তাঁর গাড়িতে লিফট দেওয়ায় আর হাঁটতে হয়নি।' কমলেন্দু বলছিল, 'তবে ওখানে গিয়ে ও একটা কাণ্ড করেছিল।'

'কী কাণ্ড?'

'ঝোরার পাশে পাহাড়ের গায়ে একটি মূর্তি রয়েছে, মাদার মেরির। তার সামনে যে মোমবাতি জ্বলছিল সেগুলো বাতাসে নিভে গিয়েছিল। দু-একটা বেঁচে ছিল। আমাদের অলক্ষ্যে ও পাহাড়

বেয়ে ওপরে উঠে যায় মোমবাতি জ্বালতে।'

'সে কী ?' ডাক্তার অবাক, 'আপনারা দেখলেন না ?'

'দেখামাত্র ওকে নিষেধ করি কিন্তু ও শুনতে চায়নি। কিন্তু যখন নেমে এল তখনও ও ঠিক ছিল। একটুও অসুস্থ মনে হয়নি। লজে ফিরে আমি আমার ঘরে চলে যাই। হঠাৎ কাকিমার চিৎকার শুনে—।'

নন্দিনী বললেন, 'ও ভালভাবেই বাথরুমে গেল জামা-প্যান্ট ছাড়তে। ফিরে এসে শুয়ে পড়ল খাটে। আমরা ওকে বিশ্রাম করতে দিয়ে বাইরে এসেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে উর্মিলাকে ওর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে গিয়ে দেখি ও আবার জামা-প্যান্ট পরে তৈরি, নাকে রুমাল চেপে রেখেছে, বলল, ওকে এখানে নিয়ে আসতে।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' ডাক্তার ঘড়ি দেখলেন। তারপর বললেন, 'ব্লিডিং বেশি হয়নি। যে রুমালটা ওর নাকে ছিল সেটাই প্রথম থেকে ব্যবহার করা হয়েছে ?'

নন্দিনী মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু খাটে শুয়ে উর্মিলা বলল, 'না। এটা দ্বিতীয় রুমাল।'

'প্রথমটা কি পুরো ভিজে গিয়েছিল ?'

'না, আমি ঠিক, বুড়ো বেয়ারাটা নিয়ে গেল, আমি দেখতে পাইনি।' নিচুগলায় কথাগুলো বলল উর্মিলা।

'লোকটা নিয়ে গেল ?' ডাক্তার যেন ঠিক শুনতে পেলেন না, 'কী বললেন ? রক্তে ভেজা রুমাল কেউ নিয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'ওর মেয়ের অসুখ। কিছুতেই নাকি কাজ হচ্ছে না। ওর ধারণা সানুর রক্ত ওর মেয়ের শরীরে ছোঁয়ালে সে ভাল হয়ে যাবে।' উর্মিলা বলল।

'মাই গড!' ডাক্তার হতভম্ব। তাঁর মুখ লাল হয়ে গেল। খুব রেগে গিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি এটা অ্যালাউ করলেন ?'

'আমি কিছু বলার সুযোগ পাইনি। তার আগেই লোকটা ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল।'

'বাট হোয়াই ? কেন ? সায়নের রক্তে ওর এই বিশ্বাস হল কী করে ?'

ঘর নিস্তব্ধ হল। উর্মিলা বা নন্দিনী চুপ করে রইলেন।

ডাক্তার রেগে যাচ্ছিলেন আরও, 'আপনারা চুপ করে আছেন কেন ?'

কমলেন্দু কথা বলল, 'আমি বলছি। এরা সবাই একইসঙ্গে এক ধরনের সম্মোহনে আক্রান্ত হয়েছে। কী করে সম্ভব হল আমি জানি না। আমি ওকে খুব বকেছি। কিন্তু একলা ও নয়, যেসব গাড়ি ওপর থেকে নামছিল তাদের ড্রাইভার প্যাসেঞ্জারদের এক্সপ্রেশন ওই একই কথা বলছে। তারাই লজে এসে রটিয়েছে। সেটা শুনেই বোধহয় ওই বুড়ো বেয়ারা উদ্বুদ্ধ হয়।'

'সম্মোহন। ব্যাপারটা খুলে বলুন তো ?'

'সানু তখন মোমবাতি জ্বালতে ওপরে উঠছিল। মেরির মূর্তির সামনে পৌঁছোতেই ওর শরীর নাকি আলোয় ভরে যায়। সে আলোর সোর্স নাকি মেরির মূর্তি। অথচ মূর্তির সামনে জ্বলা মোমবাতিগুলোর অধিকাংশ নিবে গিয়েছিল।'

'আপনি দেখেছেন ?' ডাক্তার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন।

'না। আমি কিছুই দেখিনি।'

ডাক্তার উর্মিলার দিকে তাকালেন। সে তখন উঠে বসেছে, 'আপনি ?'

উর্মিলা বলল, 'আমার ভুল হতে পারে। এটা তো সম্ভব নয় জানি। কিন্তু—।'

ডাক্তার এবার নন্দিনীর দিকে তাকালেন, 'আপনি ?'

নন্দিনী সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি দেখেছি।'

'উনি যা বললেন, তাই দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

ডাক্তার বাঁ হাতে নিজের চিবুক ধরলেন, 'আমি ভাবতে পারছি না। এটা কি সম্ভব? কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে? নো। কখনওই হতে পারে না। অথচ অনেকে মিলে একই দৃশ্য দেখেছেন। তা হলে তো হয়েই গেল। ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়ে গিয়েছে ও। মানুষের চিকিৎসায় ওকে না রেখে বাড়ি নিয়ে যান। লোকে জানতে পারলে হাজারে হাজারে ছুটে আসবে। সেন্ট অথবা বাবা হয়ে যাবে আপনার ছেলে।' ডাক্তার একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, 'আশ্চর্য!'

নন্দিনী বললেন, 'আমরা ওকে নিয়ে যাব এ কথা কখন বললাম?'

'কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করছেন ওই ঘটনাটা?'

'তাও কি একবারও বলেছি!'

ডাক্তার উঠে পড়লেন, 'অদ্ভুত! এ পাড়ায় মিস্টার ব্রাউন নামে এক ভদ্রলোক আছেন। অতিশয় ভাল মানুষ। সায়নকে ভালবাসেন। কিছুদিন হল তিনিও ওর সম্পর্কে যে-আগ্রহ দেখাচ্ছেন তা মহামানবদের সম্পর্কে দেখালে মানায়। আর এই মহামানব মানে সুভাষ বসু নয়, ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট যে সব বাবা বা ওই জাতীয় গুরু আছেন তাঁরা। একটা কথা—।'

ছোটবাহাদুর এসে দাঁড়াল, 'বিষ্ণুপ্রসাদ এসেছে।'

'কে? ভাই বিষ্ণুপ্রসাদ, এদিকে এসো।' ডাক্তার ডাকলেন।

কুড়ি একুশ বছরের যুবক ঘরে ঢুকে সেলাম করল।

ডাক্তার বললেন, 'খুব কষ্ট দিলাম তোমাকে। এত রাত্রে আবার অনেকটা যেতে হবে। আপনাদের সঙ্গে তো ট্যাক্সি আছে। ওকে পৌঁছে দিতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই।' কমলেন্দু বলল।

বিষ্ণুপ্রসাদ নেপালিতে বলল, 'এখনই খুন দিতে হবে?'

'না। এখন নয়। দরকার হলে কাল সকালে তোমাকে ডেকে পাঠাব। এই দিদির রক্তে আজ কাজ চলে যাবে মনে হয়।'

'যদি রাত্রে লাগে?'

'হ্যাঁ, সেটার সম্ভাবনা অবশ্য থাকছে।'

'আমি বিছানা নিয়ে এসে এখানে শুয়ে থাকব?'

'বিছানা আনতে হবে না। তুমি খানা খেয়েছ?'

'জি।'

'ছোটবাহাদুর, তুমি বিষ্ণুপ্রসাদকে ওপরের একটা খালি ঘরে নিয়ে যাও। সেখানে খাট বিছানা আছে। ওখানেই ও থাকতে পারবে। কিন্তু তুমি এতটা কষ্ট করছ কেন বিষ্ণুপ্রসাদ? কাকে রক্ত দিতে হবে জানো?'

'জি।'

'কাকে?'

'সায়নকে। ও আমাকে দোস্ত বলে।'

ডাক্তার মাথা নাড়তেই ছোটবাহাদুর বিষ্ণুপ্রসাদকে ডাকল। ওরা চলে গেলে অবাক-হওয়া কমলেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'এরা কি রক্ত বিক্রি করে?'

'না। এরা পেশাদার নয়। আমার ডাকে সাড়া দিয়ে লোক্যাল মানুষেরা এগিয়ে এসেছে। তাদের নাম এবং ব্লাড গ্রুপ আমার কাছে রয়েছে। এদের সহযোগিতা ছাড়া আমি চিকিৎসা করতে পারতাম না। এরাই আমার কাছে ভগবান।' ডাক্তার ফ্রিজ থেকে শিশি বের করে দেখলেন। এর মধ্যেই রক্তের বিভাজন হয়ে গিয়েছে। উনি ভেতরে চলে গেলেন।

এই সময় নন্দিনী কাঁদলেন। নিঃশব্দে। কিন্তু তাঁর শরীর কাঁপছিল।

কমলেন্দু ডাকল, 'কাকিমা! কী হয়েছে?'

নন্দিনী নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলেন। কমলেন্দু বললেন, 'ভয় পাবেন না। ডাক্তার তো বললেন ভয়ের কিছু নেই।'

নন্দিনী কোনওমতে নিজেকে ঠিক করে বললেন, 'ওকে এখানে এত লোক ভালবাসে। ভাবলেই কীরকম আনন্দ হচ্ছে!' ওঁর গলা ধরে গিয়েছিল।

১৬

খবরটা কুয়াশার চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে। পাড়ার ট্যাক্সিওয়ালা ভোরবেলায় ট্যাক্সি থামিয়ে একজনকে বলছিল কথাটা, সিমির কানে গেল। খুব অবাক হয়ে নিরাময়ের দিকে তাকাল সে। ভোরের ছায়ায় শীতে কুঁকড়ে আছে বাড়িটা। এমনকী তার বাগানের গাছপালাও মাথা নামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। সায়নের মুখটা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার ব্রাউনের কথা। ব্রাউন ওকে খুব ভালবাসে। সিমি দৌড়োল। চড়াই ভেঙে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্রাউনের দরজায় পৌঁছে দেখল ভুটো দরজা আগলে বসে আছে।

ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে দেখল ব্রাউন মদের গ্লাস গুছিয়ে নিয়ে সবে বসেছেন। সে চিৎকার করল, 'তুমি এই সাতসকালে মদ গিলছ?'

ব্রাউন হাসলেন, 'আমাকে কখনও এ সময়ে খেতে দেখেছিস?'

'বুড়ো হলে লোকে সব কিছু কমিয়ে দেয় আর তুমি—! ছি ছি ছি। পাড়ার লোকজন এখনও বিছানা ছাড়েনি আর তুমি মদ গিলছ! মরে যাবে, বেশি দিন আয়ু নেই তোমার। পেট পচে মরে পড়ে থাকবে।' চিৎকার করছিল সিমি।

'আমাকে দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই। স্বয়ং ডাক্তার তামাং আমাকে এই প্রেসক্রিপশন দিয়ে গেছেন।' ব্রাউন গম্ভীর হলেন।

'ডাক্তার বলেছে ভোরবেলা উঠে মদ খেতে?'

'হ্যাঁ। বলেছে সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি শরীর ঠিক না লাগে তা হলে এক পাত্র পেটে ঢালতে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আর তারপর থেকে ঘুম থেকে উঠেই তোমার মনে হয় শরীর খারাপ, তাই তো? ওই মদো মাতাল ডাক্তারটাকে এবার আমি আচ্ছা করে দেব।'

ব্রাউন চোখ বন্ধ করলেন, 'সকালে তোর কোনও কাজকর্ম নেই?'

তখন মনে পড়ল সিমির। চেয়ার টেনে বসল সামনে, 'কাল কী হয়েছে শুনেছ? এই মাত্র আমি শুনলাম, শুনে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

'কী ব্যাপার?' ব্রাউন চোখ খুললেন।

'কাল বিকেলে ঝোরার কাছে মা মেরির মূর্তির পাশে উঠে দাঁড়িয়েছিল সায়ন। ভাবতে পারছ!'

'সায়ন! মানে—?'

'হ্যাঁ, নিরাময়ের সায়ন। তারপর নাকি ওর শরীরে অদ্ভুত কী সব হয়! সবাই দেখেছে মা মেরি ওর কাঁধে হাত রেখেছেন। আমি এই মাত্র শুনে এলাম। এই দ্যাখো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।' হাত প্রসারিত করল সিমি।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন ব্রাউন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার কাছে শুনেছিস এসব কথা?'

'জোসেফ। একটু আগে স্ট্যান্ড থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এল। ওই বলল।'

ব্রাউন খানিকক্ষণ সিমির মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ভর্তি গ্লাস বেসিনে উপুড় করে দিলেন। ভাল করে হাত ধুয়ে যিশুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। মানুষটার এমন পরিবর্তন চুপচাপ দেখছিল সিমি। জোসেফের মুখে কথাটা শুনে সে চমকে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু কোনও মানুষকে যে মা মেরি জীবন্ত হয়ে আশীর্বাদ করতে পারেন এটা সে বিশ্বাস করতে পারে না। সেই যেবার এখানকার গণেশ ঠাকুররা দুধ খাচ্ছে বলে রটে গিয়েছিল এবং

লোকে পাগলের মতো যেখানে যত গণেশ আছে দেখতে ছুটেছিল তখনও তার এ কথা মনে হয়েছিল। তারপর কাগজে যখন ও ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বের হল তখন সবাই এমন চুপ মেরে গেল যে এ নিয়ে কোনও কথাই এখন কেউ বলে না। সায়নের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই ওই রকম কিছু হয়েছে। তবে কি না ছেলেটা তাদের পাড়ায় থাকে আর মিস্টার ব্রাউনের খুব স্নেহের পাত্র তাই সে ছুটে এসেছিল এখানে।

ব্রাউন তাঁর মোটা শরীর নিয়ে নিল ডাউন হয়ে যিশুর মূর্তি সামনের বসে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এক পা বাড়িয়ে সিমির দিকে তাকিয়ে নির্মল হাসলেন, 'লেটস গো।'

সিমি প্রশ্ন করল, 'তুমি এখন ড্রিঙ্ক করবে না?'

'না। এখন নয়।'

'তুমি মদ ফেলে দিলে?'

'ওটা তুলে রাখলে পরে খেতে খারাপ লাগত।'

'বাট হোয়াই? এখন কেন খেলে না?'

'কাছে আয়, বলছি।' হাত বাড়ালেন ব্রাউন।

সিমি একটু দ্বিধা নিয়েই কাছে এল। ব্রাউন তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ধর তোর খুব জ্বর এসেছে। গা হাত কামড়াচ্ছে। তখন কেউ তোকে বলল অমিতাভ বচ্চনের সিনেমা দেখতে যাবি কি না? গাড়ি করে নিয়ে যাবে। যাবি?'

মাথা নাড়ল সিমি। না।

'কিংবা ধর, তোর ল্যাট্রিনে যাওয়ার খুব প্রয়োজন। এই সময় পৃথিবীর বেস্ট খাবার তোকে সার্ভ করা হল, তুই খেতে পারবি?'

'না।'

ব্রাউন হাসলেন, 'চল. একটু হেঁটে আসি।'

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সিমির পাশে কয়েক পা হেঁটে দাঁড়িয়ে গেলেন ব্রাউন, 'বাঃ। পৃথিবীটা কী সুন্দর!'

সিমি দেখল রোদ উঠেছে। হালকা মোলায়েম রোদ। ঝকঝক করছে। চারধার। আকাশ থেকে কুয়াশাদের কেউ যেন ঝেঁটিয়ে পার করে দিচ্ছে দূর পাহাড়ের ওপাশে। ব্রাউন বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ সিমি।'

'কেন? আমি কী করলাম!'

'তুই না এলে এমন একটা সকাল চোখের আড়ালে থেকে যেত। চেয়ে দ্যাখ, নিরাময়ের ওপর কী সুন্দর রোদ পড়েছে।'

সিমি দেখল এক ফালি রোদ্দুর যেন টর্চের আলো হয়ে নিরাময়ের ওপর নেতিয়ে রয়েছে। ব্রাউনকে হাঁটতে দেখে সে অনুসরণ করল।

গেট খোলা। প্যাসেজে পা রাখতেই ব্রাউন দেখতে পেলেন একজন মহিলার সঙ্গে মিসেস অ্যান্টনি কথা বলছেন অফিসঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখতে পেয়ে মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'গুড মর্নিং মিস্টার ব্রাউন!'

'গুড মর্নিং মিসেস অ্যান্টনি। ভাল আছেন তো?'

মিসেস অ্যান্টিনি মাথা নেড়ে সিমির দিকে তাকালেন, 'আরে তুমি। কী ব্যাপার! এই সকালে এখানে!'

সিমি বলল, 'উনি এলেন, তাই—! আপনি এত সকালে ডিউটিতে আসেন?'

'না। আসলে গত রাতে আমি বাড়ি যেতে পারিনি।'

'কেন? কেউ কি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল?' ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ। সায়ন। সায়নকে তো আপনি খুব ভালবাসেন।'

'সায়ন! সে কী! সায়ন অসুস্থ?' ব্রাউন হতভম্ব হয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ। ইনি সায়নের মা।' মিসেস অ্যান্টনি নন্দিনীর দিকে তাকালেন, 'ইনি মিস্টার ব্রাউন। সায়ন ওঁকে খুব পছন্দ করে।'

সিমি জিজ্ঞাসা করল, 'ও কখন অসুস্থ হয়েছে ?'

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'কাল রাত্রে।'

ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কেমন আছে ?'

'ভাল। কাল রক্ত দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি ঠিক আছে এখন। তবে দুদিন বিছানা থেকে নামতে দেবেন না ডাক্তার।'

ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কী করে খবর পেলেন ?'

প্রশ্নটা নন্দিনীর উদ্দেশে। তিনি বললেন, 'আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। ট্যুরিস্ট লজে আমার সঙ্গে থাকবে বলে গিয়েছিল। কী যে হল, হঠাৎ রক্ত পড়তে শুরু করল।

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'যা হোক, এখন চিন্তা করার কিছু নেই। আপনি তো সারারাত জেগে ছিলেন। এখন ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করুন।'

নন্দিনী গেটের দিকে এগোলেন। কাল রাত্রে অনেক বলে কমলেন্দুদের ফেরত পাঠিয়েছিলেন তিনি।

এই সময় ট্যাক্সিটা এল। কমলেন্দু এবং উর্মিলা নেমে এল উদ্বিগ্ন মুখে। অবস্থা জেনে ওরা নন্দিনীকে নিয়ে চলে গেল। ব্রাউন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। মিসেস অ্যান্টনি এবার কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর বাড়ি থেকে ঘুরে আসবেন। ব্রাউনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি সসঙ্কোচে বললেন, 'আপনি কি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবেন ?'

'না, না। তিনি নিশ্চয়ই এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। আচ্ছা, আমি যদি একবার চুপচাপ সায়নকে দেখে আসি তাহলে কি অনুমতি পাওয়া যাবে ?' অনুনয় করলেন ব্রাউন।

মিসেস অ্যান্টনি এক মুহূর্ত ভাবলেন। এই রকম অবস্থায় সায়নের কাছে কাউকে যেতে দেওয়া উচিত কিনা বুঝতে পারছিলেন না। ডাক্তারও কোনও নির্দেশ দিয়ে যাননি। তিনি ব্রাউনের দিকে তাকালেন। গত রাত্রের ঘটনাটা তিনিও শুনেছেন। শুনে পুলকিত হয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হয়েছিল যদি সায়ন স্বর্গীয় স্পর্শ পেয়ে থাকে তাহলে তার শরীর থেকে রক্ত বের হবে কেন ! রক্ত দেওয়ার সময় ওর পাশে বসে তিনি একদৃষ্টিতে অনেক অনেক সময় তাকিয়ে ছিলেন। কখনও এক পলকের জন্যেও তার মধ্যে কোনও অলৌকিক কিছু দেখেননি। শেষ পর্যন্ত ধন্দে পড়ে গিয়েছেন তিনি। এখন ব্রাউনের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হল যেতে দিলে সায়নের কি ক্ষতি হবে ? উনি যদি কথা না বলেন, কোনও বিরক্ত না করেন—।

এই সময় ডাক্তার নেমে এলেন। এই সকালেই স্নান করে নিয়েছেন। হেসে বললেন, 'গুড মর্নিং মিস্টার ব্রাউন। আপনার কথাই মনে হচ্ছিল। আরে, এ কী ! আপনি এখনও বাড়ি যাননি মিসেস অ্যান্টনি ?'

'এই তো, যাব ভাবছিলাম। সায়নের মা একা ছিলেন— তাই।'

'ও, উনি কোথায় ?'

'ওঁর আত্মীয়রা ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিল, উনি লজে চলে গিয়েছেন।'

'বেশ। আপনি যান। সারারাত জেগেছেন। আজ সকালে আর আসতে হবে না। লাঞ্চের পর এলেই চলবে।' ডাক্তার অফিসরুমের দরজায় পৌঁছোলেন।

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'তার দরকার হবে না। আপনি যদি ভোরবেলায় শুয়ে এখন কাজ শুরু করতে পারেন তা হলে আমিও পারব। আমি দশটার মধ্যেই চলে আসছি। বাই।' মিসেস অ্যান্টনি চলে গেলেন। সিমিও তাঁর সঙ্গ নিল।

তাঁর যাওয়া দেখলেন ডাক্তার। তারপর বললেন, 'মিস্টার ব্রাউন ঈশ্বর বলে কোনও অস্তিত্ব আমি এখনও দেখতে পাইনি। তবে কখনও কখনও কোনও মানুষের আচরণ দেখে মনে হয় ঈশ্বর আর কত ভাল হবেন। আসুন, একটু অফিসঘরে বসে চা খাওয়া যাক।'

চেয়ারে বসে ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার কথা মনে হচ্ছিল কেন ?'

ডাক্তার হাসলেন, 'আপনি সায়নকে পছন্দ করেন কারণ ওর মধ্যে আপনি আপনার একেবারে নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রকাশ দেখতে চেয়েছেন। আপনি যিশুর সেবক। যিশুই আপনার সব। সায়নকে আপনার ভাল লাগার কারণ ওর মুখের সঙ্গে যিশুর মিল হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ঠিক তো?'

ব্রাউন মাথা নাড়লেন, 'আপনি যখন বললেন এ সব আমার একেবারে নিজস্ব ভাবনাচিন্তা তখন এ নিয়ে আলোচনা করছেন কেন?'

'ওই কথায় আসি। আপনার কথা মনে এসেছিল তার কারণ—। আচ্ছা, সায়ন সম্পর্কে আপনার ওই ব্যক্তিগত ধারণার কথা আর কজনকে বলেছেন?'

'কাউকে নয়!'

'মনে করে দেখুন।'

'কষ্ট করে মনে করতে হবে না।'

'ওই যে মেয়েটি আপনার সঙ্গে ছিল, ওর নাম সিমি, তাই তো?'

'হ্যাঁ। ওকে অবশ্য বলতে পারি। তবে ঠিক মনে করতে পারছি না। কিন্তু আপনি এসব কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

'তার কারণ কথা হাওয়ার আগে ছোটে। আপনি যেমন ওর মুখের সঙ্গে যিশুর সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন তেমনি গতকাল বিকেলে ঝোরার সামনে বেশ কিছু লোক ওকে মাদার মেরির সামনে আলোকিত হয়ে দাঁড়াতে দেখেছে। পরে তারা ওকে অবতার মনে করে যে আচরণ করেছে তা ওর মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য। ফলে বেচারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমার মনে হয়েছিল আপনার কথা শুনে কারও কারও ধারণা আরও বড় হয়েছে। একটা সূত্র থেকে যেমন গুজবের ডালপালা বেড়ে যায়, তেমনই।' ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন।

ব্রাউনের চোখ বড় হল, 'আপনি বললেন ওই দৃশ্য কিছু লোক দেখেছে। একজন লোক নন। এই লোকজন কারা? তাঁদের কাছে গিয়ে নিশ্চয়ই আমি আমার ভাবনার কথা বলিনি। আর একটা কথা, ঝোরার পাশে মাদারের মূর্তির কাছে সায়নের মতো অসুস্থ ছেলে কি একাই চলে গিয়েছিল?'

'না। ওর মা এবং আত্মীয়রা সঙ্গে ছিলেন?'

'তাঁরা কিছু দেখতে পাননি?'

'ওর কাকা বলেছেন তিনি কিছুই দেখেননি, মা এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি, কাকিমা নাকি মিসেস অ্যান্টনিকে জানিয়েছেন, তিনিও ওই সব দেখেছেন।'

'তা হলে তাঁকেও আমি প্রভাবিত করেছি বলে আপনার ধারণা?'

'না। এভাবে কথাটাকে নেবেন না। আসলে ওই রকম নির্জন জায়গায় মাদারের মূর্তির পাশে ফরসা রোগা ছেলেটিকে দেখে একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল ওদের মনে। এটাকে সম্মোহন বলা যায়। আমাদের মন এ রকম কিছু ঘটানোর জন্য তৈরি থাকে। পরিবেশ অনুকূল হলেই সেই মন বাস্তবে ঘটছে বলে ভেবে নেয়।'

চা এল। নিজের হাতে কাপ এগিয়ে দিলেন ডাক্তার। নিজেরটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে মৃদু চুমুক দিয়ে বললেন, 'এসব কথা বলছি কারণ ওই অলৌকিক ভাবনা চিরকালই মানুষের ক্ষতি করে এসেছে। আপনি দেখেছেন কিনা জানি না, চৈত্র বৈশাখের পিচগলা রাস্তায় এখনও বাঙালি মেয়েরা দণ্ডী কাটতে কাটতে যায় ওই অলৌকিক কিছু প্রাপ্তির আশায়।'

'সায়নের প্রতিক্রিয়া কী?'

'ওর সঙ্গে কথা বলিনি। ও খুব সেনসিটিভ ছেলে। যদি সত্যি ওর মাথায় ঢুকে যায় মাদার ওর শরীরে হাত রেখেছেন তা হলে ওকে বেশিদিন বাঁচাতে পারব না। মাদার মেরি নিশ্চয়ই চাইবেন না একটি অসুস্থ ছেলে তাঁর স্পর্শ পেয়ে মারা যাক। অথচ ব্যাপারটা সেই রকমই ঘটতে চলেছিল।'

ব্রাউন নিজেকে সংবরণ করলেন, 'এখন কেমন আছে সে?'

'ক্রাইসিস কেটে গিয়েছে। ঠিক সময়ে রক্ত পেলে এবং সেই রক্ত যদি শরীর নিতে সম্মত হয় তাহলে পরিস্থিতি সামলে নেওয়া যেতে পারে।'

'ডক্টর। আমি কি ওকে একবার দেখতে পারি ?'

কাপ ঠোঁটে তুলতে গিয়েও থেমে গেলেন ডাক্তার, 'কেন ?'

'জাস্ট। এমনই। ছেলেটিকে আমি পছন্দ করি, তাই।'

'তাহলে আমার কিছু বলার নেই। বেশ, যান। তবে দরজা থেকে দেখে ফিরে আসবেন, কথা বলবেন না!' ডাক্তার বেল টিপলেন। বড়বাহাদুর দরজায় এসে দাঁড়ালে বললেন, 'ব্রাউন সাহেবকে ওপরে নিয়ে যাও।'

ওপরে উঠছিলেন বেশ শ্লথ পায়ে। এতক্ষণ ডাক্তারের মুখে যেসব কথা শুনছিলেন সেটা তিনিও এককালে বলতেন। যুক্তি ছাড়া কোনও কিছুকেই আমল দিতেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুক্তি এবং বিশ্বাসের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে যে মারামারি চলছে তিনি তার মধ্যে জড়িয়ে গেলেন। যুক্তি, পাল্টা যুক্তি, কথার মারপ্যাঁচ এবং শেষ পর্যন্ত যে যেখানে পৌঁছোল সেখানে শুধুই শূন্যতা। কিন্তু দেখা গেল, বিশ্বাস তা যতই অন্ধ হোক, মন তা থেকে যে আরাম সংগ্রহ করে, তা জীবনের অনেক ঝড় সামলে নিতে সাহায্য করে। একটা ছোট জীবনে এর চেয়ে বেশি চাওয়া আর কী থাকতে পারে! সেই কারণে যা সত্যি তাকে কখনও কখনও মেনে নিতে মন অস্বীকার করে। এই যে এখন, যিশুর সামনে বসলেই তাঁর মন অপূর্ব শান্তিতে ভরে যায় সেটাকে তিনি অস্বীকার করবেন কী করে।

দরজায় পৌঁছে সায়নকে দেখতে পেলেন। দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। ওর মুখ দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। এই সকালে অসুস্থ বলে ঘুমিয়ে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ব্রাউনের খুব ইচ্ছে করছিল ওব মুখ দেখতে। গত রাত্রে যাকে রক্ত দেওয়া হয়েছে তাকে এখন ঘুম ভাঙিয়ে পাশ ফিরতে বলা অপরাধ। ডাক্তারও নিষেধ করেছেন কথা বলতে। কাঁধ অবধি কম্বলে ঢাকা তবু ব্রাউনের মনে হল ছেলেটা খুব রোগা। অথচ তাঁর এত বয়স হয়ে গেল, আজ বাদে কাল কবরে যাবেন তবু শরীরে মেদ মাংসের অভাব নেই। যদি এর কিছুটা ছেলেটাকে দেওয়া যেত—।

বড়বাহাদুর পাশেই দাঁড়িয়েছিল, ইশারায় ফিরে যেতে বলল।

ব্রাউন হাত নেড়ে তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে এক পা এগোলেন। তারপর হাঁটু গেড়ে মেঝের ওপর বসে দুটো হাত বুকের ওপর ধরলেন। চোখ বন্ধ করে তিনি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন। প্রার্থনার সময় যে সব শব্দ ব্যবহার করলে মনে শান্তি আসে, এক ধরনের শক্তি অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় সেই সব শব্দ নীরবে উচ্চারণ করতে লাগলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বললেন, 'তোমার স্পর্শে কুষ্ঠরোগী সেরে গিয়েছিল, তোমার দেখানো পথে হাঁটলে অন্ধকার দূরে সরে যায়। অসম্ভব বলে কোনও কিছুই তোমার সামনে মাথা তুলতে পারে না। তাহলে আমার বিনীত প্রার্থনা ওই ছেলেটিকে তুমি সুস্থ করে দাও। আমার সমস্ত প্রার্থনার বদলে এইটুকু আমি তোমার কাছে আশা করছি। কারণ আমার বিশ্বাস হয়েছে, এই ছেলেটির দ্বারা পৃথিবীর মানুষ উপকৃত হবে। তুমি তো মানুষের উপকার করতেই চাও।' ব্রাউন পরম আন্তরিকতায় নীরবে শব্দগুলো উচ্চারণ করে চোখ খুলেই চমকে গেলেন। এর মধ্যে সায়ন কখন চিত হয়ে শুয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে তা তিনি টের পাননি। চোখাচোখি হতেই সায়ন বলল, 'গুড মর্নিং মিস্টার ব্রাউন।'

'গুড মর্নিং মাই বয়। কিন্তু তুমি কোনও কথা বোলো না। তোমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। আমি পরে আবার আসব।' ব্রাউন উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি এই ঘরে বসে প্রার্থনা করছিলেন ?'

'ওয়েল, ইয়েস, ইয়েস মাই বয়।'

'আপনি বরং আমার কপালে হাত রাখুন।'

ব্রাউন আড়ষ্ট হয়ে দরজার দিকে তাকালেন। বড়বাহাদুর ক্রমাগত তাঁকে ইশারা করে চলেছে বেরিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু ব্রাউন এগোলেন। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমার হাতে ইনফেকশন থাকতে পারে।'

মাথা নাড়ল সায়ন। না। ব্রাউন দেখলেন প্রায় কাগজের মতো সাদা মুখে কমলালেবুর মতো রোদ এক লহমার জন্যে খেলা করে গেল। তিনি দ্রুত হাত তুলে কপালে রেখেই বুঝতে পারলেন জ্বরে ওর সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে। তিনি চটজলদি বাইরে বেরিয়ে এলেন। নীচে নেমে অফিসঘরে

ঢুকে ডাক্তারকে বললেন, 'সায়নের টেম্পারেচার বেড়েছে। খুব জ্বর।'

'জ্বর। সে কী ? আমি একটু আগে দেখে এলাম— ! আপনি জানলেন কী করে ?' ডাক্তার বিস্মিত। পেছন থেকে বড়বাহাদুর বলল, 'ব্রাউন সাহেবকে সায়ন বলল কপালে হাত রাখতে।'

'ও। আপনার হাত পরিষ্কার ছিল তো ?'

ব্রাউনের মনে পড়ল এখানে আসার আগে বেসিনে মদের গ্লাস ঢেলে এসেছেন। অ্যালকোহল হাতে লাগলে ইনফেকসন হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই কমে যায়। তিনি মাথা নাড়লেন।

ডাক্তার চলে গেলেন ওপরে।

মন খারাপ হয়ে গেল ব্রাউনের। এই অবস্থায় জ্বরের ধাক্কা ছেলেটা সামলাবে কী করে ? যিশু কি তাঁর প্রার্থনায় কান দেবেন না ? তিনি ডান হাতের আঙুলগুলো দেখলেন। উত্তাপ যেন এখনও আঙুলে লেগে রয়েছে। জ্বলছে। কিন্তু মানুষের শরীরে যত উত্তাপই আসুক স্পর্শ করার এতক্ষণ পরেও এই জ্বলুনি অস্বাভাবিক। এটা স্রেফ তাঁর মনের ভুল।

ডাক্তার ফিরে এলেন হাসিমুখে, 'আপনার কী হয়েছে মিস্টার ব্রাউন !'

'কেন ?' বৃদ্ধের ভারী মুখে ভাঁজ বাড়ল।

'সায়ন একেবারে নর্মাল। ওর টেম্পারেচার আটানব্বইর বেশি কখনওই নয়। আর আপনি বললেন জ্বরে শরীর পুড়ে যাচ্ছে ! নাকি এটাও মির্যাকল ! আপনি চলে আসামাত্র সে নর্মাল হয়ে গেল ?'

'ওর শরীরে জ্বর নেই !' অবাক হয়ে গেলেন ব্রাউন।

'একদমই না।'

'কী আশ্চর্য ! আমি এখনও আঙুলে টেম্পারেচার ফিল করছি।'

'আপনি আজ বাড়িতে বিশ্রাম করুন। আপনার বিশ্রামের দরকার। আর যদি সম্ভব হয় তা হলে আজ ড্রিঙ্কটা বাদ দিন।' ডাক্তার হাসলেন।

'সায়ন কী করছে ডাক্তার ?'

'ঘুমোচ্ছে। আমি যে ওকে পরীক্ষা করলাম তা টেরই পেল না।'

'ঠিক আছে, আমি চলি।'

ব্রাউন উঠে দাঁড়াতেই কঙ্কাবতীকে নিয়ে তার মা এল। সঙ্গে একটা স্যুটকেস নিয়ে এসেছে। ডাক্তার বললেন, 'ওয়েলকাম কঙ্কাবতী।'

ব্রাউন মেয়েটিকে দেখে বুঝলেন ও অসুস্থ। এতদিন নিরাময়ে কোনও নেপালি মেয়েকে পেশেন্ট হিসেবে থাকতে দেখেননি। অর্থাৎ আর একটি মানুষের রক্তে মৃত্যু থাবা বসাতে চাইছে। মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর। নিরাময়ের গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তার পাশে খাদের ধারে পাথরের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। আকাশে কোথাও মেঘ নেই। ঝকঝকে আলোয় চারধার পরিষ্কার। এমনকী কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। সাদা হয়ে গেছে ওখানকার বরফ। কী রকম বুড়ো বুড়ো দেখাচ্ছে। বুড়ো তো তিনিও হয়েছেন। এই যে তাঁর আঙুলগুলো, কীরকম চোখের ওপর বদলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলুনিটা টের পেলেন তিনি।

এটা কী ভাবে হল! তিনি নেশা করেননি অথবা স্বপ্ন দেখেননি। ছেলেটার কপালে যখন হাত রেখেছিলেন তখন মনে হয়েছিল তপ্ত কড়ায় আচমকা আঙুল ছুঁয়েছে। ছ্যাঁক করে উঠেছিল তখন ওই অনুভূতিটা তো মিথ্যে নয়। তাহলে! আঙুলগুলো ঘষতে লাগলেন ব্রাউন। ঘষতে ঘষতে তাঁ মনে হল হয়তো এসবই তাঁর কল্পনা। না হলে ডাক্তার জ্বর দেখতে পেতেন। তিনি কি মনে মনে চেয়েছিলেন সায়ন খুব অসুস্থ হয়ে থাক আর তাঁর প্রার্থনা ওকে সুস্থ করে তুলুক? সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন তিনি। নো, নেভার। এ রকম খারাপ চিন্তা তিনি করতেই পারেন না। কিন্তু আজ সকালে ছেলেটিকে দেখে তাঁর একবারও মনে হয়নি গতকাল ওকে নিয়ে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আজ ও একদম সাধারণ ছেলে। তাহলে!

'এ দাজু!'

গলাটা কানে আসতেই ব্রাউন দেখতে পেলেন দুজন প্রৌঢ়া রমণী খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে

এরা নেপালি কিন্তু তাঁদের পাহাড়ের বাসিন্দা নয়। তিনি নেপালিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন, আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?'

'আমরা তিনধারিয়া থেকে আসছি। ওই বাড়িটাই তো নিরাময়?' একজন আঙুল তুলে বাড়িটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'ঠিকই বলেছেন।'

'আচ্ছা, ওখানে এমন একজন থাকে, এই দিদি, তুই বল না—!'

দ্বিতীয়জন বলল, 'আজ সকালে শুনলাম মা মেরি নাকি ওই ছেলেটাকে ক্ষমতা দিয়েছেন। ছেলেটা নিরাময়ে থাকে। শুনেই আমরা চলে এসেছি। নামটা এক একজন এক একরকম বলছে। আপনি নিশ্চয়ই তাকে জানেন?'

ব্রাউন এই ব্যাপারটা ভাবেননি। তিনি ভয় পেলেন। একবার নিরাময়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কী চান?'

'আমার স্বামীর ক্যানসার হয়েছে। ডাক্তার বলেছে আর বেশি দিন নেই। ও মরে গেলে—।' ডুকরে উঠলেন মহিলা মুখে ওড়না চাপা দিয়ে। অন্য প্রৌঢ়া বললেন, 'উনি যদি একবার দয়া করেন তাই আমরা এসেছি।'

'কীভাবে দয়া করবেন?'

'উনি যদি বলেন তাহলে জামাইবাবুকে নিয়ে আসতে পরি এখানে। উনি শুধু ছুঁয়ে দিলেই হবে।' মাথা নেড়ে বললেন মহিলা।

'আপনারা ভুল শুনেছেন। এটা একটা নার্সিংহোম। যারা খুব অসুস্থ তারাই এখানে চিকিৎসার জন্যে থাকে।'

'আপনি কী বলছেন! সবাই একসঙ্গে মিথ্যে কথা বলবে!'

'সবাই মানে?'

'আমরা এখানে এসে স্টেশনের স্ট্যান্ডে জিজ্ঞাসা করা মাত্র সবাই বলে দিল। ওরাও জানবে কী করে?'

'ভুল। ভুল রটেছে। যে ছেলেটি সম্পর্কে এটা রটেছে সে এখন খুব অসুস্থ। গত রাত্রে তাকে রক্ত দিতে হয়েছে। বুঝতেই পারছেন যাকে বাঁচাতে রক্ত দিয়ে হয় সে কী করে অন্যের জীবন বাঁচাবে?' কথাগুলো বলে ব্রাউন আর দাঁড়ালেন না। ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এসে দেখলেন ভুটো সমানে লাফাচ্ছে এবং চিৎকার করে চলেছে। আর তাঁর বাড়ির দরজায় গোটা দুয়েক হনুমান চুপচাপ বসে আছে। তাঁকে আসতে দেখে হনুমান দুটো কয়েক লাফে সামনের গাছে উঠে বসল। ব্রাউন দেখলেন চারটে বড় বড় স্কোয়াশ দরজার সামনে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই হনুমান দুটো পেড়ে এনেছে ওগুলো। তুলে দেখলেন সেগুলোয় ওরা দাঁত বসায়নি। রান্না করলে দিব্যি খাওয়া যাবে। ভুটোর অবশ্য নিরামিষ খাবারে বেজায় আপত্তি।

ভেতরে স্কোয়াশগুলো রেখে বেসিনে হাত ধুলেন তিনি। যে আঙুলগুলো জ্বলছিল সেগুলো জলের ধারার নীচে ধরলেন। আশ্চর্য! অস্বস্তিটা যাচ্ছে না। তোয়ালেতে হাত মুছে জুতো খুলে যিশুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মোমবাতি নিবে গেছে। নতুন একটা জ্বেলে বাতিদানে রাখতেই যিশুর মুখ আলোকিত হল। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল ব্রাউনের। কড়া গলায় বললেন, 'এসব কী হচ্ছে? তুমি কি আমার মাথা খারাপ করে দিলে! আমি তোমাকে হাজারবার বলেছি সুস্থ অবস্থায় ঘুমের মধ্যে আমাকে তোমার কাছে ডেকে নেবে। এ দিকে আমার কথা শুনে লোকে ভাবছে মাথা ঠিক নেই, বিশ্রামের দরকার। আমি ছেলেটার কপালে উত্তাপ দেখলাম। ভুল দেখলাম? তার আগে যে তোমাকে অত কথা বললাম তা কি কানে যায়নি! যাক যে, আমি চাই ছেলেটা সুস্থ হয়ে উঠুক।' বলতে বলতে ব্রাউন দেখতে পেলেন মোমবাতি তাঁর একপাশে ঢলে পড়েছে। অন্যমনস্ক হয়ে ডান হাত বাড়িয়ে সেটাকে সোজা করতে গিয়ে তাঁর আঙুলে সলতের আগুন লেগে গেল। চকিতে হাত সরিয়ে নিয়ে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। একটু পরে চোখ খুলে আঙুল প্রসারিত করলেন। না একটুও পোড়েনি, সামান্য মোম লেগেছে। গলা মোম সেঁটে গেছে। মোমটাকে

সোজা করলেন তিনি। এবং তখনই বাইরের দরজায় শব্দ হল। ব্রাউন উঠলেন।

দরজা খুলে দেখলেন বড়বাহাদুর দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখেই বলল, 'ডাকদার সাহাব আপনাকে এখনই একবার যেতে বললেন।' কথাগুলো বলল নেপালিতে।

'কেন? সায়নের কিছু হয়েছে!'

'না—না। অনেক লোক ভিড় করেছে আমাদের ওখানে। আপনি জলদি আসুন।' বড়বাহাদুর চটপট চলে গেল।

অনেক লোক ভিড় করেছে! ব্রাউন এবার কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। দরজা বন্ধ করে এগোতে গিয়ে খড়্গাবাহাদুরকে দেখতে পেলেন। খড়্গাবাহাদুর বলল, 'নমস্কার। আজ আপনার চিঠি আছে।'

'আমার চিঠি?' ব্রাউন দাঁড়ালেন।

খড়্গাবাহাদুর এই পাহাড়ের পিওন। মাসের প্রথম দিকে তাঁর চিঠি আসে। ছেলেরা লেখে। এই সময় তাদের চিঠি আসার কথা নয়। রঙিন খামটা দেখেই বুঝলেন ওটা বিদেশ থেকে এসেছে।

চিঠি নিয়ে বললেন, 'তুমি তো নিরাময়ের সামনে দিয়ে এলে। সেখানে কিছু দেখতে পেলে?'

খড়্গাবাহাদুর হাসল, 'অনেক লোক এসেছে। আপনাদের যিশু নাকি ওই নিরাময়ের ঘরে লুকিয়ে আছে। ভাগ্যিস যিশু, আমাদের হিন্দুদের কেউ হলে দেখতেন হাজার হাজার লোক এসে যেত।'

খড়্গাবাহাদুর চলে গেল। খামটাকে পকেটে ঢুকিয়ে নীচে নামতে নামতে বাঁক ঘুরতেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন, নিরাময়ের সামনে অন্তত পঁচিশ-তিরিশজন মানুষ দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসতে একটু হাঁপ ধরল। আজকাল দ্রুত হাঁটলেই এমন হয়। কাছে গিয়ে চিৎকার করলেন, 'কী ব্যাপার ভাইসব।'

চিৎকার থামিয়ে লোকগুলো তাকাল। শহরের একজন চেনা লোক তাঁকে দেখে এগিয়ে এল, 'দেখুন না, এরা গেট বন্ধ করে দিয়েছে।'

'আপনারা কী চান?'

'সায়নকে দেখতে চাই। কাল মা মেরি ওকে আশীর্বাদ করে শক্তি দিয়েছেন। আপনি কি এ কথা শোনেননি?' লোকটা চেঁচাল।

'আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?'

'কেন?'

'সায়ন একজন হিন্দু। ওর বাবা-মা হিন্দু। মাদার মেরি যদি সত্যি কাউকে আশীর্বাদ করেন তবে খ্রিস্টানকেই করবেন, হিন্দুকে করতে যাবেন কেন?'

লোকটা থমকে গেল। জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠল। অনেকের মনে হল কথাটার যুক্তি আছে। কিন্তু আর একজন বলে উঠল, 'মাদার মেরির কাছে এই ভেদাভেদ নেই। মানুষ তাঁর সন্তান। তিনি যে কোনও মানুষকেই আশীর্বাদ করতে পারেন।'

ব্রাউন বললেন, 'আশ্চর্য! কোনও হিন্দুকে গির্জায় যেতে দেখেছেন। কোনও হিন্দু মন্দিরে যিশুর উপাসনা করতে দেখেছেন? ভাই, আপনারা যখন গণেশের দুধ খাওয়ার কথা শুনেছিলেন তখন হেসেছিলেন, ঠিক তেমনই এখন হিন্দুরা হাসবে। আমি সায়নকে চিনি। সে অসুস্থ। তার লিউকোমিয়া হয়েছে। গত রাত্রে তাকে রক্ত দিতে হয়েছিল। আপনারা যদি এখানে চেঁচামেচি করেন তা হলে তারই ক্ষতি হবে। সে একজন সহজ স্বাভাবিক ছেলে। আপনারা যা শুনেছেন তা সঠিক নয়। অতএব বন্ধুরা আমি যিশুর দোহাই দিয়ে বলছি আপনারা ফিরে যান। আপনারা প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরকে ডাকুন, যিশুকে ডাকুন। দেখবেন তিনি আপনাদের মঙ্গল করবেন।'

প্রায় মিনিট পনেরো বোঝানোর পর ভিড় হালকা হতে আরম্ভ করল। শেষ পর্যন্ত দু-তিনজন নাছোড়বান্দা মানুষ খানিকটা দূরে বসে রইল। তাদের দেখে বোঝা যায় জীবনে কোথাও তাদের জন্যে কিছু অপেক্ষা করে নেই।

ছোটবাহাদুর এবার নিরাময়ের গেট খুলল। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন।

ব্রাউন বললেন, 'আশা করি আপনার মনে হয়নি আমি এদের জড়ো করেছিলাম।'

ডাক্তার ব্রাউনের হাত ধরলেন, 'আপনি আমার কথায় আঘাত পেয়েছেন বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনি যেভাবে সমস্যার সমাধান করলেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ। এ কী ঝামেলা হল বলুন তো!'

'আমি কীভাবে সমস্যার সমাধান করলাম? অত্যন্ত অন্যায় কথা বলে করলাম। হিন্দু-খ্রিস্টান সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিলাম। দেখলেন, কেউ প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু কথাটা যাদের মনে ধরল তাদের কি মানুষ বলা যায়! আমি যে কথাটা বললাম, আমি কোন ধরনের মানুষ? অথচ আমার মাথায় অন্য কোনও চিন্তা এল না, কোনও পথ পেলাম না। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে।' ব্রাউন উত্তেজিত।

'কিন্তু আপনি একটা সত্যের গায়ে মিথ্যের অলঙ্কার পরতে দেননি।'

'ডক্টর কোনটে সত্যি কোনটে মিথ্যে তাই তো আমি জানি না। আমি সায়নের কপালে প্রচণ্ড উত্তাপ দেখেছিলাম ডক্টর। আপনি সেটাকে মনের ভুল বলেছিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি মেনে নিয়েছি আপনার কথা। কিন্তু এখান থেকে বেরিয়েও হাতে সেই উত্তাপের জ্বলুনি অনুভব করেছি।' ব্রাউন হাতটা তুলতে তুলতে আবিষ্কার করলেন সেই জ্বলুনিটা আর নেই। খানিকটা অবাক হয়ে তিনি দেখলেন তখনও শুকনো মোমের প্রলেপ আঙুলে লেগে আছে।

এই সময় ট্যাক্সিটাকে উঠে আসতে দেখা গেল। নিরাময়ের সামনে ট্যাক্সি থামতেই নন্দিনী কমলেন্দু এবং উর্মিলা নেমে এলেন।

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কেমন আছে এখন?'

'ভাল। বেশ ভাল। লম্বা ঘুম দিচ্ছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন কেন আপনি? সারারাত জেগেছিলেন—!' ডাক্তার বললেন।

কমলেন্দু বলল, 'আমরা খুব বিপদে পড়েছি ডক্টর। ট্যুরিস্ট লজে প্রচুর লোক এসে জিজ্ঞাসা করছে ছেলেটা কোথায় গেল। ওদের কেউ কেউ এর মধ্যে আপনার নিরাময়ের ঠিকানাও জোগাড় করে ফেলেছে। ওদের ধারণা সানু, মানে সায়ন, মির‍্যাকল করতে পারে। এই সব অন্ধ লোককে বুঝিয়েও পারিনি। ভয় হচ্ছে, ওরা এখানে চলে আসবে।'

ডাক্তার বললেন, 'আপনারা ভেতরে আসুন।'

ওঁরা ভেতরে চলে গেলে ব্রাউন বাড়ির দিকে ফিরলেন। হঠাৎ চিঠির কথা মনে পড়তেই তিনি খামটা বের করলেন। ' ডিয়ার ব্রাউন। হঠাৎ আমার চিঠি পেয়ে তুমি খুব অবাক হবে। আমাকে তোমার মনে আছে? আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, আটষট্টি সালের শেষ, লস এঞ্জেলেসে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তোমাদের জাহাজ কয়েকদিনের জন্যে এখানে থেমেছিল। তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তুমি ঠিকানা দিয়েছিলে। আমি বলেছিলাম, আবার দেখা হবে। এতদিন সময় পাইনি। শুধু চিঠি লিখে আমি যোগাযোগ রাখতে চাইনি। এখন আমি একবারে একলা। কারও কোনও সমস্যা আমার সঙ্গে জড়িয়ে নেই। তাই ভাবছি ভারতবর্ষে যাব। আর ভারতবর্ষে গেলে তোমার সঙ্গে দেখা করব। তুমি, মনে আছে, খুব ভদ্র ব্যবহার করেছিলে। তাই—। তুমি তোমার বাড়িতেই থেকো। আমি দেখা করব। লিজা।' তারপর আর কয়েকটা লাইন। 'এই চিঠি যাকে লিখছি তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল তিরিশ বছর আগে। এমন হতে পারে তিনি আজ নেই। যদি না থাকেন, এ চিঠি যিনি পাবেন তিনি কলকাতা শহরের গ্র্যান্ড হোটেলে আমার নামে আগামী একমাসের মধ্যে একটা খবর রেখে দিলে কৃতজ্ঞ হব।'

তারিখটা দেখলেন ব্রাউন, আগামী কাল একমাস পূর্ণ হবে।

১৭

আজ সকালে নিরাময়ে পৌঁছে জীবনে প্রথমবার নিজের জন্যে, সম্পূর্ণ নিজের জন্যে, একটা পুরো ঘর পেল কঙ্কাবতী। পরিষ্কার ঝকঝকে ঘর, খাটে ধবধবে বিছানা, একটা ওয়ার্ডরোব, টেবিল চেয়ার আর দেওয়ালে জিনিস, ওষুধপত্র রাখার র‍্যাক। ঘরের লাগোয়া দরজার ওপাশে বাথরুম, টয়লেট। কঙ্কাবতী কখনও হোটেলে থাকেনি কিন্তু শুনেছে হোটেলের ঘর নাকি এই ধরনের হয়।

আজ এখানে পৌঁছোবার খানিক বাদে তাকে নানান ধরনের পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। তার রক্ত এবং ইউরিন নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তার বলে গেলেন, 'এখন থেকে এই বাড়িকে নিজের বাড়ি বলে মনে করবে। সবসময় হাসিখুশি থাকবে। ইচ্ছে হলে অন্যদের সঙ্গে গল্প করতে যেতে পারো। আর তোমার যদি কোনও বইপত্রের দরকার হয়, জানিও, এনে দেওয়ার চেষ্টা করব। তুমি ঝাল খেতে ভালবাস না মিষ্টি ?'

কঙ্কাবতী হেসে ফেলেছিল ! শেষ প্রশ্নটা যেন আচমকা এসে গেল। তারপর দুষ্টুমি করে বলল, 'না ঝাল না মিষ্টি।'

ডাক্তারও হেসেছিলেন, 'বেশ। তাই হবে।'

মানুষটিকে ভাল লেগে গেল কঙ্কাবতীর। কঙ্কাবতী বাংলা চমৎকার বলতে পারে, পড়তেও। লিখতে গেলে অবশ্য হোঁচট খেতে হয়। ওদের বাড়ির ওপর হর্স স্যু বাঁকের গায়ে সুন্দর কাচের বাড়িতে একজন ভদ্রলোক একা থাকতেন। তিনি বাঙালি। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পাহাড়ে চলে এসেছিলেন কারণ পাহাড় নাকি তাঁকে টানত। একেবারে বালিকা বয়সে তাঁর সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল কঙ্কাবতীর। ভদ্রলোক খুব পড়তেন আর টেপ চালিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান শুনতেন। ওঁর কাছে রোজ বিকেলে যেত সে। যেতে যেতে অনেকগুলো গান সেই বয়সেই শিখে নিয়েছিল। পরে যখন স্কুলে বাংলা নিল তখন ভদ্রলোক তাকে পড়াতেন। ওইটুকু তার বয়স তবু সে জেনে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর আর জীবনানন্দ দাশ নামের তিনজন বাঙালি নাকি দারুণ দারুণ বই লিখে গিয়েছেন। একদিন স্কুলে শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পটি শুনে সে কেঁদে ফেলেছিল। বাড়ি না ফিরে সোজা সেই ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে জবাবদিহি চেয়েছিল, আপনি আমাকে শরৎচন্দ্রের নাম বলেননি কেন ? ভদ্রলোক বেশ অবাক হয়ে বলেছিলেন, অন্যায় হয়ে গিয়েছে মা। রবীন্দ্রনাথের পরেই ওঁর কথা বলা উচিত ছিল।

এই মানুষটি তাকে ওই কবিতাটি প্রায়ই শোনাতেন যা প্রথম দেখায় ডাক্তার শুনিয়েছিলেন। কঙ্কা, শঙ্কা ক'রো না। শঙ্কা মানে যে ভয় সেটাও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কঙ্কাবতী কখনও ভয় পাবে না। জীবনে যত সমস্যা আসুক, মাথা সোজা করে তার সঙ্গে লড়াই করে যাবে। কঙ্কাবতীরা কখনও ভয় পায় না।

মানুষটিকে কোনওদিন ভুলবে না কঙ্কাবতী। তার জ্ঞান হওয়ার পর চারপাশে অমন কোনও মানুষকে সে দেখেনি। আসলে তাদের ওখানে অমন কারও থাকার কথাও ছিল না।

পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বাড়িগুলোতে যে আরাম ছিল না সেটা বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল। ওই ছোট ঘরগুলোতে তারা ঘুমোবার সময় ঢুকত অথবা প্রচণ্ড শীতে পাহাড় যখন কুঁকড়ে উঠেছে তখন গায়ে গা লাগিয়ে ছিঁড়ে যাওয়া কম্বলের তলায় পড়ে থাকতে হত। বাবার একটা কথা এখনও মনে আছে। কম্বলগুলো ছিঁড়ে গেছে বলে মা অনুযোগ করতে বাবা রেগে গিয়ে বলেছিল, 'গরম হওয়া নিয়ে তো কথা। ছেঁড়া কম্বলে তোমার কি কম গরম লাগছে ?'

কম্বল ছিঁড়ে গেলেও তার উত্তাপ কিছু কম হয় না। সেই উত্তাপ নিয়ে পূর্বপুরুষের মতো তাদের জীবন চলে যাওয়া উচিত ছিল। অনেকগুলো ঘর নিয়ে যে এলাকা তাকে বস্তি বলত সবাই। বস্তির সবাই সবাইকে চেনে, কোনও পরিবারের গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সে দেখেছে ঝগড়া ছাড়া কোনও পরিবারের দিন কাটে না। ঝগড়ার কারণ অভাব। ছেলেরা যা রোজগার করে তা এমনিতেই খুব কম তার ওপর একটা অংশ নেশার পেছনে উড়িয়ে দেয় বলে সমস্যা বেড়ে যায়। শিশুরা সবাই স্কুলে যাওয়া আরম্ভ করে। যাওয়াটা মজার, সেখানকার পরিবেশ

বস্তির থেকে আলাদা বলে একটা আকর্ষণ থাকে কিন্তু বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের উৎসাহটা ফুরিয়ে যায় দু-এক বছরের মধ্যেই। তাদের বাধ্য করতে অভিভাবকরা চেষ্টা করেন না। দশ-বারো বছর থেকেই ছেলেমেয়ে যদি রোজগার শুরু করে দেয় তাহলে খুশি হন তাঁরা। স্বামীর কাছে হতাশ হওয়া স্ত্রীরা ছেলেমেয়ের ওপর ভরসা করতে শুরু করেন। তাই স্কুলে যাওয়ার বদলে ওরা যদি কিছু কামাই করে তাতে আপত্তির কিছু পান না। তা ছাড়া অভাব যেখানে ময়লার মতো শরীরে জড়িয়ে, ধুয়ে ফেলার সাবান কেনা যেখানে স্বপ্নের মতো, সেখানে ছেলেকে স্কুলে পাঠানো, তার নানান প্রয়োজন মেটানো বোঝা হয়ে দাঁড়ায় অনেকের কাছে।

তার ক্ষেত্রেও এটা হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তার বয়সী আর পাঁচটা মেয়ে, ঘরে যতই অভাব থাক, দুপুরের পর যখন সেজেগুজে সিনেমা দেখতে যায় তখন তাদের হিন্দি সিনেমার নায়িকা বলে ভুল হয়। সকালে যে ছেঁড়া জামা পরে জামাকাপড় কাচে, জল তোলে, দুপুরের পর তার চেহারা আলাদা হয়ে যায়। তেরো পার হলেই ওরা দলে দলে ছেলে বন্ধু পেয়ে যায়। তাদের টাকায় ফূর্তি করতে ওদের একটুও অসুবিধে হয় না। যা ছিল স্রোতের মতো তাতে গা ভাসানোই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তার ক্ষেত্রে সে রকমটা ঘটল না। ঘটল না বলে কম কথা শুনতে হয়নি। লেখাপড়া শিখে বিদ্যের জাহাজ হবে, মেমসাহেব হয়ে চাকরি করবে ইত্যাদি টিপ্পনি শুনতে হয়েছে চারপাশ থেকে। যারা ছিল খেলার সঙ্গিনী তারা সরে গিয়েছে মানিয়ে নিতে না পারায়।

বাবার মুখটা মনে পড়লে এখনও কান্না পায় কঙ্কাবতীর। খুব নিরীহ মানুষ ছিল। মা কত মুখ করত, একতরফা কত বকাবকি করত কিন্তু বাবা জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করে বসে থাকত। আর সেইজন্যে বস্তির অন্য বউরা ঈর্ষা করত মাকে। মায়ের নাকি মহাভাগ্য। মা যা শোনায় তার সিকি শোনালে তাদের স্বামীরা মেরে হাড় ভেঙে দিত। মায়ের ক্ষেত্রে কিছুই হয় না। অথচ মা খুশি হত না। বাবা যে কিছু বলত না তাতে মায়ের রাগ বেড়ে যেত। বারংবার বলার জন্যে হুকুম করত। শেষ পর্যন্ত বাবা খুব করুণ গলায় বলত, 'আমি কী বলি বলো তো। তুমি তো সব ঠিক কথা বলছ।'

বাবার রোজগার ভাল ছিল না। বস্তিতে যারা ড্রাইভারি করে তাদের হাতে কাঁচা টাকা আসে। সংসারে না দিয়ে বাইরে উড়িয়ে দেয় যারা তাদের কথা আলাদা। কিন্তু বাবা ড্রাইভার ছিল না। স্ট্যান্ডে যেসব ট্যাক্সি দাঁড়াত তাদের হয়ে প্যাসেঞ্জার ডাকত বাবা। বালিকা বয়সে মায়ের সঙ্গে বাজারে যেতে গিয়ে বাবাকে সে চেঁচিয়ে বলতে শুনেছে, 'শিল্‌গুড়ি শিল্‌গুড়ি— আউর দো প্যাসেঞ্জার'। শেয়ারের ট্যাক্সি ভর্তি হয়ে গেলে ড্রাইভার বাবার হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে চলে যেত। এসব আন্দোলনের আগের কথা। আন্দোলনের পরে ইউনিয়ন হয়েছে। এমন কী যারা প্যাসেঞ্জার জোগাড় করে তাদের জন্যে একটা আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মা বলত, 'তুমি ড্রাইভারি শিখে নিচ্ছ না কেন ? ড্রাইভারদের সঙ্গে তোমার এত বন্ধুত্ব, শিখতে কদিন লাগবে ?' বাবা বলত, 'গাড়ির সামনে বসলেই মনে হয় খাদ আমাকে ডাকছে। আমি গাড়ি চালালে তুমি বিধবা হবে।'

'এত লোক গাড়ি চালায় তারা তো একথা ভাবে না। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা আঠারো না পেরোতেই ড্রাইভার হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি ?'

তখন কঙ্কাবতীর মনে হত বাবা ড্রাইভার হলে বেশ হত। কখনও সখনও সে বাবার গাড়িতে চেপে শিলিগুড়ি যেতে পারত। বাবা গাড়ি চালাচ্ছে, এই দৃশ্য কল্পনা করলেই বুক ফুলে উঠত। কিন্তু তাকে একা পেয়ে বাবা বলেছিল, 'ড্রাইভার হতে গেলে আমাকে দুনম্বরি করতেই হবে। ওই কাজটা আমার দ্বারা হবে না বুঝলি। তোর মা কথাটা কিছুতেই বুঝছে না।'

হ্যাঁ, ওই বাবার জন্যেই আর পাঁচটা মেয়ের থেকে তার জীবন আলাদা হয়ে গিয়েছে। একা পেলেই বাবা তাকে বলত, 'তোকে মন দিয়ে পড়তে হবে। অনেক পড়াশুনা করতে হবে। এখানে শেষ হলে দার্জিলিং-এ পড়তে যাবি। সেখান থেকে কলকাতায়। আমি যেমন করে পারি তোর পড়ার খরচ চালাব।'

'কেন ?' সে প্রশ্ন করেছিল।

বাবা দুমুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর বলল, 'ইজ্জত নিয়ে বাঁচতে হলে পেটে বিদ্যে থাকা দরকার। ইজ্জত যার আছে সে মেয়েছেলে না ব্যাটাছেলে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আমি যা পারিনি তা তোকে পারতে হবে।'

ফলে যে সময়ে মেয়েরা পড়া ছেড়ে বাড়িতে বসে যেত সে সময়ে তাকে আড়াই কিলোমিটার পাহাড়ি পথ ভেঙে স্কুলে যেতে হত। কখনও একটা রুটি আর স্কোয়াশের তরকারি জুটত, কখনও শুধুই তরকারি। ভগবান এদিকের পাহাড়ে আগাছার মতো স্কোয়াশের গাছ ছড়িয়ে দিয়েছেন যাতে গরিব মানুষগুলো তাই খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। প্রাইমারি স্কুলে ভাল রেজাল্ট হয়েছিল কঙ্কাবতীর। স্যার বাড়িতে এসে মাকে বলে গিয়েছিলেন তিনি চেষ্টা করবেন ডাউহিল স্কুলে তাকে ভর্তি করিয়ে দিতে। সেখানে না হলে অন্য স্কুল তো আছেই। মোদ্দা কথা এ মেয়েকে পড়াশুনা ছাড়ানো চলবে না। কথাটা বস্তিতে জানাজানি হয়ে গেল। আর তখনই অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড দেখল কঙ্কাবতী। যারা এত দিন মুখ বেঁকাত তারা এখন প্রশংসার চোখে তাকায়। দু-একজন বাড়িতে এসে বলে গেল মেয়েকে পড়া না ছাড়াতে। যদি প্রয়োজন হয় অল্পস্বল্প টাকা তারা দিতে পারে। এসব দেখেশুনে মা গালে হাত দিল। সামনে বসিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোর কি পড়াশুনা করতে এত ভাল লাগে?'

সে মাথা নেড়েছিল নীরবে।

'তাহলে পড়। আমার কী! আমাকেই সব কাজ করতে হবে। তবে বলি, এতই যখন পড়ার ইচ্ছে তখন সেইসব বাড়িতে জন্মালি না কেন যেখানে স্বামীরা দু পকেট ভরে টাকা নিয়ে আসে সংসারের জন্যে?'

'মানুষ কি ইচ্ছে করে জন্মাতে পারে?' সে পাল্টা জিজ্ঞাসা করেছিল।

'পুরুষমানুষরা পারে। মেয়েমানুষের সেই ক্ষমতা নেই, ভগবান দেননি।'

মায়ের কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু চারপাশের দিকে তাকালে মনে হয় মা মিথ্যে বলেনি। এই যে নরবাহাদুরের মেয়ে লীলা, বিয়ের দুমাসের মধ্যে মুখে কালসিটে নিয়ে ফিরে এসেছিল বাপের কাছে, তার বাচ্চা হল এই সেদিন। কিন্তু রিম্বিকে থাকা স্বামী ভুলেও খোঁজ নিতে আসেনি একবারও। যত দিন পেটে বাচ্চা ছিল নরবাহাদুরের বউ মেয়েকে গালাগাল করে গিয়েছে সমানে। মেয়েটার গলা শোনা যেত না তখন। বাচ্চা হওয়ার পর মেয়েটা চেঁচাতে লাগল, 'কেন আমার বরকে বিয়ের সময় যা যা দেবে বলেছিলে সেসব দাওনি। দেখেশুনে তোমরা বিয়ে দিয়েছিলে। কথা দিয়ে রাখোনি, দোষ তো তোমাদের।'

এই বস্তির ঘরে ঘরে যারা অন্যের দয়ায় বেঁচে আছে তারা মেয়ে। হয় মা, নয় বউ অথবা মেয়ে। কোনও ছেলে এমন অসহায় অবস্থায় নেই। যে বেকার, সংসারে টাকা দিতে পারে না তাকে কথা শোনালে কদিনের জন্যে উধাও হয়ে যায়। ছেলেদের কেউ বলে না সন্ধের আগেই বাড়িতে ফিরতে। তাদের ইজ্জত লুঠতে কেউ রাস্তার অন্ধকারে ওত পেতে থাকে না। মেয়েদের বেলায় থাকে। আবার যেসব পরিবারের স্বামীরা ঠিকঠাক টাকা দেয় তাদের বউদের গলা শোনা যায় না। স্বামীরা পা নাচায় আর সংসারের যাবতীয় কাজ শেষ করতে হিমসিম খায়। দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার বদলে সারা জীবনের স্বাধীনতা তারা খুইয়ে বসে আছে। এখন বড় হয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তৃতা শুনলে গায়ে জ্বালা ধরে কঙ্কাবতীর। সর্বহারার পাশে দাঁড়ানোর কথা যারা বলে, শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতদের আন্দোলনের জন্যে যারা উদ্বুদ্ধ করে তাদের কান ধরে বলতে ইচ্ছে করে, তোরা ঘরের মা বোন বউয়ের দিকে তাকা। আগে এদের উদ্ধার কর, এদের মর্যাদা দে তারপর পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের জন্যে ভাববি।

প্রাইমারি স্কুলের স্যারের চেষ্টা যে সফল হবে কল্পনাও করেনি কঙ্কাবতী। ডাউহিলের স্কুল এই জেলার প্রথম সারির নামী স্কুল। দূর দূর থেকে বড়লোকের মেয়েরা পড়তে আসে সেখানে। ভর্তি হওয়ার জন্যে তাদের অভিভাবকদের অনেক কিছু করতে হয়। ওখানে ভর্তি কবতে টাকা খরচ করতে তাঁদের আপত্তি নেই। স্কুলে হোস্টেল আছে কিন্তু সেখানে সবার জায়গা হয় না বলে আশেপাশে অনেক প্রাইভেট হোস্টেল গজিয়ে গিয়েছে। ওই স্কুলের ইউনিফর্ম বানাতে খরচ অনেক,

স্কুলের টাকাও কম নয়। তা ছাড়া স্টুডেন্টদের স্ট্যাটাসও নাকি দেখা হয়। অতএব ওখানে তার জায়গা পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে চায়নি কঙ্কাবতী। কিন্তু বাবাকে দিয়ে আবেদনপত্রে সই করিয়ে স্যার জমা দিয়েছিলেন সেখানে। কয়েক সপ্তাহ বাদে হাসিমুখে এসে বললেন, 'মারে, তোর হয়ে গেছে। ডাউহিল স্কুলের ইন্টারভিউ দিতে হবে তোকে।'

'ইন্টারভিউ ?' সে অবাক হয়েছিল।

'হ্যাঁরে। আর আমি জানি ইন্টারভিউতে তুই পাস করে যাবি।'

ইন্টারভিউ পাওয়া মানে হয়ে যাওয়া নয়, কিন্তু স্যারের মুখের ওপর কিছু বলতে পারেনি কঙ্কাবতী। বাবার কল্যাণে সমস্ত বস্তি জেনে গেল কথাটা। এই প্রথম বস্তির কোনও মেয়ে বা ছেলে এমন সুযোগ পেতে চলেছে— এই গর্ব কেমন করে সবার হয়ে গেল। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সে-ই বলছে ভাল করে ইন্টারভিউ দিতে। যেন তার সুযোগ পাওয়াতে তাদের স্বপ্ন সার্থক হবে। বাবা বলল, 'মেমসাহেবদের স্কুলে ভর্তি হচ্ছিস, কিন্তু মনে রাখিস, মেমসাহেবদের ভাল গুণগুলো শিখতে হবে কিন্তু মেমসাহেব হবি না।' মা বলল, 'খুব তো বলছ! খরচ তো দশগুণ বেড়ে যাবে। কী করে কী হবে ?'

বাবা হেসেছিল। লাজুক হাসি। তারপর বলল, 'তোমাদের বলিনি, আমি শিলিগুড়িতে গিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য টেস্ট দিয়ে এসেছি।'

'অ্যাঁ ?' মা চিৎকার করে উঠেছিল, 'তুমি সত্যি বলছ ? ড্রাইভার হবে ? কিন্তু গাড়ি চালানো শিখলে কবে ?'

বাবা বলল, 'ওটা আবার কঠিন নাকি। গাড়ি নিউট্রালে রেখে স্টার্ট দাও। তারপর ফার্স্ট গিয়ারে নিয়ে গিয়ে অ্যাকসিলেটারে চাপ দিলেই ওটা সামনে যাবে। একটু এগিয়ে সেকেন্ড গিয়ারে নিয়ে যাও। আরও জোরে গেলে থার্ড এবং ফোর্থ গিয়ার। যখনই গিয়ার চেঞ্জ করবে তখনই ক্লাচ চেপে ধরবে। এই তো ব্যাপার। এর মধ্যে হাতি ঘোড়া কী আছে।'

কঙ্কাবতী দেখেছিল, মায়ের মুখ বৃষ্টি ধোওয়া গাছের পাতার মতো সুন্দর হয়ে গেল। যেন এক মুহূর্তে সমস্ত দুশ্চিন্তা উধাও। বাবা উঠে গেলে মা তাকে বলেছিল, 'মানুষটা সত্যি ভাল রে। তবে আমার জন্যে কোনওদিন ভাবেনি কিন্তু তোর জন্যে সব কিছু করতে পারে লোকটা।'

যেদিন ইন্টারভিউ দিতে যাবে সেদিন ভাল পোশাক পরেছিল সে। বাবাই কিনে এনেছিল জামাটা। স্যার সকালেই এসে হাজির। আর কী আশ্চর্য, দুজন মহিলার সঙ্গে নরবাহাদুরের বউ এসে হাজির। হাতে পুজোর থালা। তা থেকে ফুল তুলে ওর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'তোর জন্যে পুজো দিয়ে এলাম।'

'আমার জন্যে ?'

'হ্যাঁ। আর কেউ তো নেই যার ভাল চেয়ে পুজো দেওয়া যায়।' তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুই আমার মেয়ের হয়ে একটা চিঠি লিখে দিবি ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে একবার আসিস।'

সে একটা দৃশ্য হয়েছিল বটে। একপাশে স্যার আর একপাশে বাবাকে নিয়ে সে যখন ডাউহিলের স্কুলের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তখন অন্তত জনা দশেক মানুষ তাদের সঙ্গ নিল। তারাও যাবে তাকে এগিয়ে দিতে। স্যার তাদের অনুরোধ করলেন, 'আপনাদের যাওয়ার দরকার নেই। স্কুলের ভেতরে ঢুকতে দেবে না। আপনারা প্রার্থনা করুন যাতে ওর অ্যাডমিশনটা হয়ে যায়।'

স্কুলের অফিসরুমের সামনে ওঁরা অপেক্ষা করছিলেন। কঙ্কাবতীর ডাক এল প্রায় দু ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে। এর মধ্যে সে দেখেছে সুন্দর অসুন্দর দেখতে মেয়েদের বাবা-মায়েরা কী পরিমাণ যত্ন করছে, তাদের পোশাক হাবভাব দেখেই বোঝা যায় সমাজের অর্থবান শ্রেণীর মানুষ।

'তোমার নাম ?'

'কঙ্কাবতী দেবী।'

'তোমার স্কুলের রেজাল্ট তো ভাল। কে পড়ায় তোমাকে ?'

'স্কুলের স্যার। বাড়িতে কেউ পড়ায় না।'

'তোমার বাবা কী করে ?'

একমুহূর্ত ভাবল কঙ্কাবতী, তারপর বলল, 'ট্যাক্সি চালায়।'

'আই সি।' তারপরই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবর্ষের সবচেয়ে সম্মানিত মহিলার নাম কী ?'

'মাদার থেরেসা।'

'যেখানে বাতাস নেই সেখানে পাখি উড়তে পারবে ?'

'না।'

'কেন ?'

'বাতাস যেখানে নেই সেখানে পাখি ডানা ঝাপটালেও কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। বাতাসের সঙ্গে পাখির ডানা ঝাপটানোর ফলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাই পাখিকে আকাশে ভাসিয়ে রাখে।'

'গুড। আমি দুটো বাক্য বলছি। তুমি ওদের এক বাক্যে বল। ইউ সেইড সামথিং। আই ডিড নট হিয়ার।'

কঙ্কাবতী বলল, 'আই ডিড নট হিয়ার হোয়াট ইউ সেইড।'

লিস্টে নাম উঠল। এবং সেটা প্রথম দিকে।

বাবা তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। এখন মনে হয় বাবার মতো নিঃস্ব নিঃসঙ্গ মানুষ তাকে নিয়ে ধনী হতে চেয়েছিল। পকেটে যা ছিল তাই দিয়ে মিষ্টি কিনে সবাইকে খাইয়েছিল। সেদিন বস্তিতে উৎসবের আবহাওয়া। এই লোকগুলো কী করে পাল্টে গেল কে জানে!

সে হোস্টেলের মেয়ে নয়। বাড়ি থেকেই যাবে। কিন্তু স্কুলের নিয়ম মানতে হবে। প্রথমে পোশাক। বাজারের একটি বিশেষ মারোয়াড়ির দোকানে সবাই পোশাক কিনতে যায়। তারাও চটপট বানিয়ে দেয়। স্যার তাকে নিয়ে সেখানে গেলেন। খুব ভিড় সেখানে। এক একজন কয়েক প্রস্থ পোশাকের অর্ডার দিচ্ছেন। এইসময় বাবা সেখানে এলেন। স্যারকে তিনি তাই বলেছিলেন। তাদের যখন কাউন্টারের সামনে পৌঁছোবার সুযোগ হল তখন স্যার প্রধান মালিককে বললেন, 'দুটো পোশাক হলেই চলবে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'দুটো নয়, তিনটে করিয়ে নিন।'

স্যার বললেন, 'একটু অসুবিধে আছে!'

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুকি, তুমি কোথায় থাকো ?'

কঙ্কাবতী ঠিকানা বলল।

ভদ্রলোক চোখ বড় করলেন, 'আরে! তুমিই সেই মেয়ে! প্রিন্সিপ্যাল তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন। স্যার, আপনারা দুটোর অর্ডার দিন, তৃতীয়টার জন্যে কোনও পয়সা লাগবে না। ওটা আমি ওকে উপহার দিচ্ছি।'

'সে কী ? না-না।'

'না। শুনলাম, ওকে বাতিল করার জন্য উঁচু ক্লাসের মেয়েদের যে প্রশ্ন করা হয় তাই করা হয়েছিল। অথচ ও চমৎকার জবাব দিয়েছে। আরে ভাই আমি মারোয়াড়ি। সত্যি কথা। কিন্তু এখানে জন্মেছি ষাট বছর আগে। আমার বাবা এখানে এসেছিলেন বাইশ বছর বয়সে। রাজস্থানের চেয়ে এই পাহাড় আমার অনেক আপন। নিজেকে নেপালি বলতে আপনারা আপত্তি করতে পারেন কিন্তু আমি আমাকে পাহাড়ি বলি। তাহলে এই ছোট্ট মিষ্টি গুণী মেয়েটিকে যদি তার পাহাড়ি দাদু একটা ইউনিফর্ম ভালবেসে দিতে চায় তাহলে আপনারা আপত্তি করবেন না।'

ভদ্রলোক আর একজনকে মাপ নিতে বললেন। সেসব হয়ে যাওয়ার পর স্যার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি টাকা নিয়ে এসেছেন ?'

'নিশ্চয়ই।'

কঙ্কাবতী অবাক হয়ে দেখল অ্যাডভান্স নয়, বাবা পুরো টাকাটাই দিয়ে দিল। বাড়ি ফেরার পথে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি অত টাকা কোথায় পেলে ? মা বলছিল তোমার কাছে কোনও টাকা নেই।'

বাবা বলেছিল, 'সকালে ছিল না, তাই বলে বিকেলেও থাকবে না এটা কে বলল ? তোর মা তো এসব জানে না।'

সে বলল, 'কিন্তু অত টাকা— ?'

'আমাদের কাছে অত টাকা কিন্তু দেখলি তো যারা ইউনিফর্ম বানাতে এসেছিল তাদের অনেকের কাছে ওটা কিছুই নয়।'

'কিন্তু তুমি টাকাটা পেলে কোথায় ?'

'আমি ধার নিয়েছি।'

'ধার ?'

'হ্যাঁ। শোধ করে দেব। লাইসেন্স পেয়ে গেলে ট্যাক্সি চালাব। ডেইলি যা রোজগার হবে তাতে এক মাসেই শোধ হয়ে যাবে টাকাটা।'

বাবার জন্যে তখন তার গর্ব হচ্ছিল।

আর তার পরেই তার স্কুলের ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই পাহাড়ে আগুন জ্বলল। পশ্চিমবাংলা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামল পাহাড়ের মানুষরা। পাহাড়ি রাজনীতি যাঁরা করছেন তাঁরা স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড প্রতিষ্ঠার দাবিতে মরিয়া হলেন। পুলিশের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ প্রকাশ পেতে লাগল নানাভাবে। তখন সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ। পাহাড় উত্তেজিত এবং সন্ত্রস্ত। গুলির আওয়াজে কুয়াশারাও যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

লাগাতার ধর্মঘট চলছে। ব্যাপারটা ক্রমশ যুদ্ধের চেহারা নিয়ে নিল। সেই যুদ্ধ স্বাধীনতার জন্যে। পাহাড় পাহাড়িদের জন্যে। স্বাধীন গোর্খাল্যান্ড চাই।

কঙ্কাবতী এসব ঠিক বুঝতে পারত না। কিন্তু ওই আন্দোলনের জন্যে কখনও কখনও দোকানে কিছুই পাওয়া যেত না, এমনকী গাছগুলো থেকে স্কোয়াশও উধাও হয়ে গিয়েছিল। টুরিস্ট নেই তাই বাবার রোজগারও বন্ধ হয়ে গেল। বাড়িতে এমন কিছু নেই যা বিক্রি করে কিছু কেনা যায়। কোণঠাসা হয়ে পড়া কিছু মানুষ হেঁটে নেমে যাচ্ছিল শিলিগুড়িতে। ঠিক তখন বাবা একদম পালটে গেল।

এক বিকেলে বাবা জানাল, 'অনেক হয়েছে। আর নয়। এবার আমিও আন্দোলনে যোগ দিচ্ছি। আমার জন্যে তোমরা চিন্তা কোরো না।'

মা আঁতকে উঠল, 'সে কী? আন্দোলনে গেলে তুমি মরে যেতে পারো!'

'মরবই এমন কোনও কথা নেই। আর যদি মরি তাহলে জাতভাইদের জন্যে লড়াই করে মরব। সে মরণ ঢের ভাল। এভাবে রোজ রোজ মরে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।'

মা কাঁদল, 'আমাদের বস্তির তিনজন পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে।' তাদের কথা বলে বাবাকে আটকাতে চাইল। কিন্তু বাবা কোনও কথা শুনতে রাজি হল না। পার্টি অফিসে নাকি নাম লিখিয়ে এসেছে। আজ রাত্রেই অ্যাকশনে যেতে হবে।

কঙ্কাবতী চুপচাপ শুনছিল। বাবা যখন যাওয়ার আগে তার মাথায় হাত রাখল তখন সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কি যুদ্ধ করতে যাচ্ছ?'

'যুদ্ধ? হ্যাঁ, এখন তো যুদ্ধই বলা যেতে পারে।'

'কিন্তু কেন?'

বাবা হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছিল, 'এই সব পাহাড়ে যারা থাকে তাদের চেহারা ভাষা আলাদা। পাহাড়ের অনেক ঝামেলার সঙ্গে লড়াই করে তারা বেঁচে থাকে। ব্রিটিশরা আসার আগে কোনও সমতলের মানুষ এখানে আসেনি। এরপর ওরা এসেছে এখানে ব্যবসা বা চাকরি করতে অথবা ফুর্তি করতে। এখানে যারা বাড়ি করেছে তারা এখান থেকে শুধুই নিয়েছে দেয়নি কিছু। আমাদের চাকর দারোয়ান ছাড়া কিছু ভাবেনি। আমাদের ব্যবহার করে আরামে থেকেছে ওরা। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে জোর করে আমাদের যোগ করা হয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের মানুষদের উপকারের জন্যে কিছু করেনি বাঙালিরা। এখানকার ভাল স্কুলে তাদের ছেলেমেয়ে পড়ে। সাহেবদের ছেলেমেয়ে। যে হাসপাতাল আছে সেখানে সুবিধে হয় না, চিকিৎসার জন্যে শিলিগুড়িতে যেতে হয়। বাঙালিরা আমাদের নিজের লোক মনে করে না। আমরা আর কতকাল পড়ে পড়ে মার খাব? তাই আমাদের স্বাধীন গোর্খাল্যান্ড

চাই। চাইলেই তো কেউ হাতে তুলে দেবে না। আমাদের লড়াই করে নিতে হবে। এই পাহাড়ে পাহাড়টা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এক দিন বলবে আমরাও মানুষ, কারও চাকর নই।'

বাবা চলে গেল। সেই রাত্রেই গাড়ি গাড়ি পুলিশ এল লাঠি আর রাইফেল নিয়ে। চিৎকার কান্নায় রাতের অন্ধকার বীভৎস হয়ে উঠল। প্রতিটি ঘর থেকে যুবক প্রৌঢ়দের ধরে ধরে পুলিশ মারছিল। ঘর ছেড়ে মেয়েরা পালাচ্ছিল। তাদের ঘরেও পুলিশ এল। চিৎকার করে বলল, 'এ ঘরের মরদরা কোথায়?'

মা দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'কেউ নেই। আমি মেয়েকে নিয়ে আছি।'

লোকগুলো শুনল না। জোর করে ঘরে ঢুকে খাটের তলাও খুঁজে দেখল। যাওয়ার সময় অকারণে উনুনটা ভেঙে দিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল ছেলেরা এসেছে খবর পেলেই তারা ফিরে আসবে। এসে বস্তি জ্বালিয়ে দেবে।

পুলিশ চলে যাওয়ার পর ভীতসন্ত্রস্ত নারী এবং বৃদ্ধেরাও রাগে ফেটে পড়ল। অদ্ভুত ঘৃণা জন্ম নিল সবার মনে। বেছে বেছে পুলিশ নেপালিদের ওপর অত্যাচার করছে। বাঙালি বা মারোয়াড়িদের কিছু বলছে না। পাহাড়ে গোলমাল শুরু হতেই অবশ্য বাঙালিরা নেমে গিয়েছিল। যাদের কোনও জায়গা নেই যাওয়ার তাদের বাড়ির সামনে পুলিশ প্রায়ই ঘুরপাক খেত। কিছু ছেলে এই রকম একটা বাঙালি পরিবারকে বাড়ি থেকে বের করে এনে সেখানে আগুন ধরিয়ে দিল। মজার কথা হল সেই বাঙালি পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিল এক গরিব নেপালি পরিবার।

সূর্য ডোবার আগেই রাস্তাঘাট ফাঁকা। অন্ধকার নামলেই গোলাগুলির আওয়াজ। গুজব রটছে খুব। মিলিটারি নেমেছে। অমুক দাগি পুলিশ অফিসারকে খুন করা হয়েছে। সরকারি বাড়ি, ট্যুরিস্ট বাংলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন বয়স কম। তবু তার মনে হয়েছিল বোকামি। গোর্খাল্যান্ড হলে ওই সব বাড়িগুলো আবার নিজেদের টাকায় তৈরি করতে হবে। সরকার চালাতে হলে তো বাড়ির দরকার। ট্যুরিস্টরা না এলে বাবা ট্যাক্সি চালাবে কার জন্যে?

শেষ পর্যন্ত দুদিন প্রায় অনাহারের পর মা আরও এক পরিবারের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল, এখানে থাকা যাবে না। সঙ্গে যা নেওয়া যায় তা পুঁটলিতে এবং স্যুটকেসে নিয়ে ওরা রওনা হল। সূর্য উঠলে পাকদণ্ডির পথ ধরে বাজারের অনেক নীচে পিচের রাস্তায় নেমেছিল ওরা। মাত্র তিরিশ কিলোমিটার পথ, কিন্তু এ জীবনে সেই হাটার অভিজ্ঞতা ভুলতে পারবে না কঙ্কাবতী। মায়ের হাতে স্যুটকেস, তার হাতে পুঁটলি। আগে পিছে অন্যান্য মহিলা, শিশুরা। নীচের দিকে চলতে হচ্ছিল বটে কষ্ট কম হচ্ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই ওপর অথবা নীচ থেকে গাড়ির আওয়াজ কানে আসতে লাগল। যদি বড় পাথর পাশে পাওয়া যেত তাহলে তার আড়ালে লুকিয়ে পড়ত সবাই। গাড়িগুলো হয় পুলিশের নয় মিলিটারির। কী ভয়ঙ্কর দেখতে লাগত সেগুলোকে। শব্দ মিলিয়ে গেলে আবার চলা। শিশুদের কষ্ট শুরু হল। চালু রাস্তা বলে রাতারাতি শিলিগুড়িতে পৌঁছে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল বড়দের। পথে যে কয়েকটা বস্তি পড়ল সেগুলো প্রায় ফাঁকা। যারা ছিল তাদের সঙ্গে কথা বলতে দুদণ্ড দাঁড়াতে হচ্ছিল।

ওরা শিলিগুড়িতে পৌঁছেছিল অনেক রাত্রে। এতটা পথ হেঁটেছে কিন্তু যারা আন্দোলন করেছিল তাদের কারও দেখা পায়নি। কঙ্কাবতীর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, বাবা যদি একবার তাদের দেখা দেয়। মা বলেছিল ওই পাহাড়ের কোনও খাঁজে অথবা ওপরে জঙ্গলে ওরা লুকিয়ে আছে। বাবা কি দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েছিল? শুকনা আসার আগেই সন্ধে নেমেছিল। তখন শিশুরা বড়দের কোলে. কঙ্কাবতীও হাঁটতে পারছিল না। গাড়ির আওয়াজ হচ্ছিল। পাহাড়ে আলো ছিটকে যাচ্ছে। লুকোবার জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল না। পাহাড়ে ওঠার ক্ষমতা কারও নেই। রাস্তার ধারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছাগলের মতো দল বেঁধে দাঁড়িয়েছিল ওরা। এই সময় বাঁক ঘুরে দুটো গাড়ি নেমে এল। একটা জিপ অন্যটা বড় ট্রাক। দুটোই পুলিশের। হেটলাইট জ্বালিয়েই গাড়ি দুটো দাঁড়িয়ে পড়ল। জিপ থেকে নেমে এল একজন অফিসার। মহিলা ও শিশুর দলটিকে অবাক হয়ে দেখল। তারপর হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের সঙ্গে পুরুষরা নেই?'

মা জবাব দিল, 'নেই!'

'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

'শিল্‌গুড়ি।'

অফিসার একটু ভাবল। টর্চ দিয়ে ওদের ভাল করে দেখল। তারপর টর্চের আলো ছুড়ে ট্রাকটাকে দেখিয়ে বলল, 'উঠে পড়ো। আমরা শিলিগুড়ি যাচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই আড়ষ্ট হয়ে গেল। কী করবে কেউ বুঝতে পারছিল না। একজন মহিলা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। অফিসার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে! কী হয়েছে? তুমি কাঁদছ কেন?'

মহিলা বললেন, 'আমি কোনও কসুর করিনি। আমরা গরিব মানুষ। আমাদের ছেড়ে দাও। সত্যি আমরা কোনও কসুর করিনি।'

'আমি তো একবারও বলিনি তোমরা কসুর করেছ। তোমরা মহিলা। বাচ্চারাও আছে। আমার ট্রাক খালি যাচ্ছে। তোমরা কেন কষ্ট করে অতটা হাঁটবে? যাও, উঠে পড়ো। আমি তোমাদের কোনও ক্ষতি করব না।'

একে একে ওরা ট্রাকে উঠে বসেছিল। ট্রাকটা ফাঁকা। গাড়ি চলতে শুরু করলে মনে হয়েছিল, আঃ কী আরাম। পা দুটো এত ব্যথা করছিল যে কঙ্কাবতী শুয়ে পড়ল ট্রাকের ওপর। মা বলল, 'সবাই যে খারাপ লোক হবে তা নয়। পুলিশের মধ্যে ভাল লোকও আছে।'

চিত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখল কঙ্কাবতী। পরিষ্কার আকাশ। গাছগুলোর আড়াল মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছিল আর তখন তারাদের দেখতে পাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল পৃথিবীর সব জায়গায় গিয়ে এভাবে শুলে কি একই আকাশ দেখা যাবে? ওই রকম মিটিমিটি তারাদের ভিড়। তাহলে তো পৃথিবীর সব আকাশ একই রকম। শুধু মাটির চেহারা আলাদা। কোথাও পাহাড় কোথাও সমতল। আর তাই নিয়ে কত লড়ালড়ি, যুদ্ধ। এই পৃথিবীটা যদি আকাশের মতো হত!

ঠিক সেই সময় পাহাড় কাঁপিয়ে বোমা পড়ল সামনে। প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষল গাড়ি দুটো। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বোমা এসে পড়ল জিপের সামনে। ওরা কৌতূহলী হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তৃতীয় বোমাটাকে রাস্তায় ফাটতে দেখল ওরা। বোমাগুলো উড়ে আসছে ওপাশের পাহাড় থেকে। সামনের জিপ থেকে পুলিশ নেমে গুলি ছুড়তে লাগল পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। একটা গুলি এসে লাগল ট্রাকের বনেটের গায়ে। ঢং করে শব্দ বাজল। মা বলল, 'সবাই বসে পড়ো নইলে গুলি খেয়ে মরবে।'

একজন বাচ্চা জিজ্ঞাসা করল, 'গুলি করছে কারা?'

এর উত্তর কেউ দিতে চাইল না। কঙ্কাবতীর মনে হল বাবা যদি ওদের মধ্যে থাকে! কিন্তু বাবা তো কখনও বন্দুক ধরেনি তাহলে গুলি ছুড়বে কী করে। এর মধ্যে একজন পুলিশ বলল, 'স্যার, এই মেয়েদের ওরা টোপ হিসেবে পাঠায়নি তো!' বলল হিন্দিতে।

অফিসার এগিয়ে এল ট্রাকের পেছনে, 'তোমরা কি জানতে ওরা এখানে অপেক্ষা করছে? সত্যি কথা বলো।'

কেউ কিছু বলার আগে কঙ্কাবতী উঠে দাঁড়াল, 'না, আমরা জানতাম না। আপনি আমাদের বিশ্বাস করুন।'

অফিসার চলে গেলেন সামনে। তার পরে তাঁর গলা শোনা গেল, 'আমাদের সঙ্গে তোমাদের ঘরের মেয়ে বাচ্চারা আছে। ওরা শিলিগুড়িতে যাচ্ছে। আমাদের মারতে গিয়ে তোমরা ওদের মেরে ফেলবে।' কোনও যন্ত্রের সাহায্যে কথাগুলো বলা হয়েছিল নিশ্চয়ই কারণ শব্দগুলো পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

ওপাশ থেকে কোনও আওয়াজ এল না। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে গাড়ি দুটো আবার চলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সেই পাহাড়ের নীচ দিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। শুকনা থেকে সমতল শুরু হয়ে গেল। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল গাড়িদুটো। শিলিগুড়ি শহরের মুখে গাড়ি দুটো দাঁড়াল। ওরা নেমে এল এক এক করে। অফিসার এগিয়ে এলেন। পকেট থেকে দশটা দশ টাকার নোট বের করে এগিয়ে ধরলেন, 'আপনাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। এটা নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করুন।'

সবাই পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল। অফিসার জোর করে মায়ের হাতে টাকাগুলো গুঁজে দিয়ে বললেন, 'আপনারা না থাকলে আজ হয়তো আমি মারা যেতাম। বেঁচে গেছি বলে মা-বোনকে কাছে

পেলে খাওয়াতাম। তাই ভাবুন না।'

মনে আছে, দুজনের ভাগে কুড়ি টাকা পড়েছিল। তাই নিয়ে ওরা রিকশায় চেপে হাজির হয়েছিল সেবক রোডের মাসির বাড়িতে। তাদের দেখে মাসির মুখ গম্ভীর হয়েছিল কিন্তু থাকতে দিয়েছিল তাদের। প্রায় তিন মাস ওরা থেকেছিল শিলিগুড়িতে। মাকে একটা কাজ পাইয়ে দিয়েছিল মাসি। নার্সিংহোমে আয়ার কাজ। দিনে কুড়ি টাকা রোজগার। টাকাটা মাসির হাতে তুলে দিতে হত। আর সেটা পেয়ে মাসির ব্যবহার ভাল হয়ে গিয়েছিল। তিন মাস বাদে শোনা যাচ্ছিল পাহাড়ে কিছুটা শান্তি এসেছে। ধর্মঘট ছাড়া আর কোনও যুদ্ধ নেই। তিনটে মাস সে সময় পেলেই পুরনো বই নিয়ে বসত। এগুলো সে পুঁটলিতে বেঁধে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সময় পাওয়াটাই মুশকিল হত। মাসির বাড়ির সব কাজ তাকেই করতে হত।

এই সময় মা একদিন কাজে গিয়েই ফিরে এল চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে। কিছুতেই মাকে ধরে রাখা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত জানা গেল বাবা নেই। নার্সিংহোমে ঢোকার মুখে একজন ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মায়ের। তার কাছে জানা গেছে মানেভঞ্জনের কাছে পুলিশের গুলিতে বাবা মারা গিয়েছে। মায়ের সঙ্গে সে-ও কেঁদেছিল। অনেক অনেক কান্নার পরে সে বাবার মুখ দেখতে পাচ্ছিল। এবং তখন আর শিলিগুড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। মা-ও এক কথায় রাজি।

পাহাড়ের বস্তিতে ফিরে এসে চারপাশ ফাঁকা হয়ে গেল ওদের। বাবা নেই ভাবলেই কান্না আসত। ঠিক সেই সময় পার্টির লোকজন এসে জানাল ওরা তাদের পাশে আছে। মায়ের জন্যে একটা স্কুলের আয়ার চাকরি ওরাই পাইয়ে দিল।

তারপর যখন সব শান্ত হয়ে গেল, হিল কাউন্সিল কাজ চালু করার পর আবার অফিস, স্কুল খুলতে লাগল। প্রাইমারি স্কুলের স্যার এলেন। সে ভর্তি হয়ে গেল ডাউহিল স্কুলে। বিশেষ ব্যবস্থায় তার সব কিছু মকুব হয়ে গেল। শুধু শর্ত হল তাকে ভাল রেজাল্ট করতে হবে।

এই করতে করতে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেল। তারপর একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে কেমন করে আকাশটা ঘুরতে শুরু করল। চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল কঙ্কাবতীর।

১৮

বাবার মৃত শরীর ওরা দেখতে পায়নি। মা অনেকের কাছে ঘুরেছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা কাহিনী শুনিয়েছে। কী করে বাবার শরীরে পুলিশের গুলি বিঁধেছিল সেই কাহিনী শুনতে শুনতে কঙ্কাবতীর কাছে সিনেমার মতো হয়ে গিয়েছে।

ফিরে আসার পর যে দিন গিয়েছে তার স্মৃতি ভয়ঙ্কর। পাহাড়ে কিছুই পাওয়া যেত না। মাঝে মাঝে লরি আসত রিলিফের চাল ডাল আলু নিয়ে। তার জন্যে লাইন পড়ত সারাদিন ধরে। কখনও শুনত আসার পথে সেই লরি লুঠ হয়ে গেছে। তখন রাগে জ্বলত সবাই। নিজেদের বিরুদ্ধে গালাগালির স্রোত বইত। চারপাশে কীরকম চাপা ভয় সব সময় যেন ওত পেতে বসে থাকত। তারপর একটা সময় এল যখন মানুষের মুখে হাসি ফুটল। লাগাতার হরতালের দিন শেষ। পাহাড় পাহাড়িদের জন্যে এই স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত। শেষ পর্যন্ত শোনা গেল পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড সরকার এসে গিয়েছে। স্বাধীন গোর্খাল্যান্ড। মাত্র কয়েকটা দিনে এই খবরটা পাল্টে গেল। গোর্খাল্যান্ড নয়, পাহাড়ি মানুষের উন্নয়নের জন্যে বেশ কিছু ক্ষমতা ভারত সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু মানুষ খুব হতাশ হল। এত আত্মত্যাগ, এত প্রাণের বিনিময়ে যা পাওয়া গেল তা মানতে রাজি হচ্ছিল না অনেকেই। ফলে ফাটল ধরল ঐক্যে। পাহাড়িরা বেশ কয়েকটি

দলে বিভক্ত হয়ে গেল। কিন্তু মূল ক্ষমতা হাতে নিয়ে যিনি দার্জিলিং দখল করলেন তাঁর প্রতি বেশির ভাগ মানুষের আস্থা তখনও নষ্ট হয়নি।

এ সব ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন কঙ্কাবতী নেহাতই বালিকা। তার মতামতের গুরুত্ব কারও কাছে ছিল না। সে সব দেখছে, নিজের মতো করে ভাবছে তা কারও নজরে পড়েনি। তারপর পাহাড় যখন শান্ত হয়ে গেল, প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া সরকারি অথবা বেসরকারি কর্মচারীরা যখন ফিরে এসে কাজে যোগ দিল, নেতার আশ্বাসে ট্যুরিস্টরা বেড়াতে আসা শুরু করল তখন সব কিছু আগের মতো হয়ে গেল।

সব কিছু আগের মতো এবং তা বাইরের জীবনে। স্টেশনের সামনে দোকানগুলো নতুন করে সাজানো, দার্জিলিং-শিলিগুড়ির বাসগুলো পনেরো মিনিট করে দাঁড়াতে আরম্ভ করল। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে আগের মতো হইচই হতে লাগল। শুধু যেসব পরিবারের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল আন্দোলনের তোড়ে তারা মুখ বুজে রইল। চারপাশে সবাই আছে, সবই আছে, কেবল বাবা নেই। কথাটা ভাবতেই শরীর কাঁপিয়ে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইত। তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে যেত কঙ্কাবতী। তাদের ঘরে প্রতি রাতে কান্না বাজে। বিছানায় শুয়েই মা ডুকরে ওঠে। ক্লান্তি প্রবল হয়ে যতক্ষণ ঘুম না ডেকে আনছে ততক্ষণ সেই কান্না ঘরের দেওয়ালে গুমরে মরে। দিনের বেলায় মায়ের মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় বয়স এক লাফে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। তাই মায়ের সামনে কাঁদতে পারে না কঙ্কাবতী। একজন অত কাঁদলে নিজেকে সামলে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। তারপর যখন স্কুল চালু হল, ডাউহিলের রাস্তা ধরে ফিরে আসার সময় কোনও নির্জন বাঁকে দাঁড়িয়ে দূরের সমতলভূমির দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই সে হুহু করে কেঁদে উঠত। তখন তার চোখের জলে বাবার মুখ মাখামাখি, নিচু হয়ে যাওয়া আকাশে কোনও রোদ্দুর নেই। তারপর নিজেকে সামলে যখন বস্তির পথ ধরত তখন অদ্ভুত এক শান্তি আসত মনে। খুব ভাল পরীক্ষা দিলে অথবা সারাদিন উপোস করে পুজো দেওয়ার পর মনে যে আরাম তৈরি হয় তেমনই একটা বোধ অনুভবে আসত।

হ্যাঁ, এটা ঠিক, বাবার মৃত্যু তাদের পরিবারকে আধপেটা খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বাবার মৃত্যু অত বড় স্কুলে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে। শহিদের স্ত্রী এবং মেয়ে হিসেবে যেসব প্রাপ্তি হয়েছে তা বাবা বেঁচে থাকলে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যেত। পার্টি তাদের সাহায্য করেছে খুব। মায়ের চাকরি পাওয়াটা তো তাদের সাহায্য ছাড়া সম্ভব ছিল না। তাদের পাশের ঘরের পরিবারে আন্দোলনের কারণে কোনও বিপর্যয় হয়নি। আন্দোলনের আগে যেমন অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে হত এখনও সেটাই করে যাচ্ছে ওরা। স্বামী মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরছে, প্রতিবাদ করলে গালাগালির বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। ছেলেমেয়েরা অবাধ্য হয়ে গেছে। মহিলাটি একদিন মায়ের কাছে এসে বলে ফেলল, 'আমি আর পারছি না। এর চেয়ে আন্দোলনের সময় ও যদি গুলি খেয়ে মরত তাহলে আমাদের খুব উপকার হত।' মা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল। মহিলা আরও বলল, 'তুমি বেঁচে গেছ।' মা নিচু গলায় বলেছিল, 'এভাবে আমি বাঁচতে চাইনি কখনও। এখনও চাই না।'

সব ঠিক আছে, শুধু বাবা নেই। নীচের মাটির নিঃশ্বাস, নদীর ঘ্রাণ কুয়াশা হয়ে আগের মতো উপরে উঠে আসে, হিমজড়ানো পাহাড় তেমনই ঝুম হয়ে বসে থাকে, শেষরাতে বৃষ্টি হয়ে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝকমকিয়ে ওঠে, যেমন উচিত। কোথাও কোনও খামতি নেই। একটু একটু করে বড় হওয়ার সময় কঙ্কাবতীর মনে হচ্ছিল তা হলে কেন ওই আন্দোলনটা হল ? পাহাড়ি মানুষদের অবস্থা যে আন্দোলনের পর একটুও বদলায়নি তার কি প্রয়োজন ছিল ? এই প্রশ্নটা সে করে ফেলেছিল ওই মানুষটাকে।

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নতুন যে বাড়িটা তৈরি হয়েছে তার একতলায় ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন তিনি। ফরসা লম্বা, একমাথা কাঁচাপাকা চুল। ওই বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় কানে গান আসত। টেপরেকর্ডারের বাংলা গান। তাদের বস্তিতে কেউ বাংলা গান গায় না। আন্দোলন শুরুর সময় থেকেই বাংলা বই বা বাংলা গানের প্রতি যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছিল তা

অবশ্য আন্দোলন শেষ হওয়ার পর তেমন তীব্র থাকেনি। তাদের স্কুলে পড়ানোর মাধ্যম ইংরেজি হলেও টিচারদের বেশির ভাগই ছিল বাঙালি। বাংলা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়ানো হত। ওর সঙ্গে পড়ত একটি কলকাতার মেয়ে, হোস্টেলে থাকত। মেয়েটির গানের গলা ছিল খুব ভাল। একজন বাঙালি টিচার মেয়েটিকে গান গাইতে বলতেন। মেয়েটি যে ধরনের গান গাইত সেই ধরনের গান ওই ভদ্রলোকের বাড়ির টেপে বাজত। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে সে খুব অবাক হয়েছিল। এত দিন সে যাকে বাংলা গান বলে জানত তার নাকি অনেক শাখা আছে। পুজো বা ধর্মের জন্যে গান ছাড়া আধুনিক মানুষদের ভাললাগার গান গাওয়া হয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হল রবীন্দ্রনাথের গান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম এবং কবিতা সে এর মধ্যে পাঠ্যবইতে পড়ে ফেলেছে। তিনি যে গানও বানাতেন সেটা শুনে অবাক হতে বান্ধবী হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। যেহেতু স্কুলটা ছিল ইংরেজ ঘরানার, বাংলা গানকে খুব একটা আমল দেওয়া হত না তাই সে বান্ধবীকে বলল সেই বাড়িটার কথা যেখানে নিত্য বাংলা গান বাজে।

বান্ধবী থাকত হোস্টেলে। ওদের বাইরে বের হওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন ছুটি হয়ে যাওয়ায় বান্ধবী তার সঙ্গ নিল। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে সেই বাড়ির সামনে যখন উপস্থিত হল তখন কোনও গান টেপরেকর্ডারে বাজছে না। কঙ্কাবতী এমন হতাশ হয়েছিল যে তার বান্ধবীকে বলতে হয়েছিল, 'নিশ্চয়ই এখন বাড়িতে কেউ নেই। না থাকলে ক্যাসেট বাজাবে কে? চল, ফিরে যাই।'

এইসময় সেই ভদ্রলোককে নীচ থেকে উঠে আসতে দেখল ওরা। নীচের ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে খুলতে তিনি ওদের দিকে তাকালেন। তারপর এক পা এগিয়ে এসে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি কিছু বলবে?'

কঙ্কাবতী বান্ধবীর দিকে তাকাল। বান্ধবীর মুখ আকাশের দিকে।

কঙ্কাবতী বলল, 'আমরা গান শুনতে এসেছিলাম।' বাংলায় শুরু করে নেপালিতে শেষ করল সে বাক্যটি। নিজের বাংলা সম্পর্কে সে আদৌ সাহসী ছিল না।

'গান?' ভদ্রলোক প্রথমে বুঝতে পারেননি, তারপরই হেসে উঠলেন, 'ও, তোমরা টেপের গানের কথা বলছ? বেশ তো, এসো, ভেতরে এসো।'

ভদ্রলোক ভেতরে গিয়ে জানলা খুলে দিলেন। ওরা দুজনে দরজায় পৌঁছে দেখল এমন কিছু আসবাব নেই ঘরটিতে। কিন্তু বই রয়েছে অনেক। ঘরের একটা সেলফের ওপর টেপরেকর্ডার রয়েছে। সেল্‌ফ ভর্তি ক্যাসেট।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী গান শুনতে চাও বলো?'

বান্ধবী বলল, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত।'

'বাঃ। কোন ক্লাসে পড় তোমরা?'

'সিক্স।' কঙ্কাবতী জবাব দিয়েছিল।

'উঁ।'

সেদিন ওরা চুপচাপ চারটি গান শুনেছিল। পরে কঙ্কাবতী বুঝতে পেরেছিল সেদিনের গানগুলোর নির্বাচন উনি ভেবেচিন্তেই করেছিলেন। আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়া অথবা আলো আমার আলোর মতো দ্রুত তালের গান শুনতে তার খুব ভাল লেগেছিল। গান শোনার পর ওরা উঠে দাঁড়ালে ভদ্রলোক ওদের পরিচয় জানতে চাইলেন। সব শুনে আবার সময় করে আসতে বললেন। কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এত বই কে পড়ে?'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'যতটা পারি আমিই পড়তে চেষ্টা করি।'

'আপনি?' সে খুব অবাক হয়েছিল।

'কেন? আমি পড়তে পারি না?'

'না। আপনি কি কোনও পরীক্ষা দেবেন?'

শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'মাগো, এ পরীক্ষা নিজের কাছে দিতে হয়। পৃথিবীতে কত কী বিষয় ছড়িয়ে আছে যা এক জীবনে জেনে যাওয়া সম্ভব

নয়। পণ্ডিতরা সেসব কথা তাঁদের বইতে লিখে যান। আমরা সেইসব বই পড়ে কিছুটা জানতে পারি। এ ছাড়া বই থেকে আর এক ধরনের আনন্দ আমরা পেতে পারি। সেটা বন্ধু পাওয়ার আনন্দ। বইয়ের মতো বন্ধু আর কিছু নেই। ভাল বই পাওয়া মানে একটা পরীক্ষায় পাস করে যাওয়া।'

কথাগুলো খুব ভাল লেগেছিল কঙ্কাবতীর। এর পরে আর একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে সে হাজির হল ভদ্রলোকের দরজায়। দরজা খোলাই ছিল। ভেতর থেকে গান ভেসে আসছিল, মেঘের পরে মেঘ জমেছে— ! দারুণ ! যেন চোখের সামনে ছবিটা দেখতে পেল কঙ্কাবতী।

গান শেষ হলে সে ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'আরে তুমি ? এসো এসো।' হাত বাড়িয়ে যন্ত্রটাকে থামিয়ে দিলেন। কঙ্কাবতী দেখল একটা বেতের চেয়ারে বসে গায়ে শাল জড়িয়ে বই পড়ছিলেন তিনি। বই পড়তে পড়তে কি ভাল করে গান শোনা যায় ?

'কী ভাবছ ?'

'আপনি বই পড়ার সময় গান শুনতে পারেন ?'

'হ্যাঁ। ও বুঝতে পেরেছি। আসলে এইসব গান গত চল্লিশ বছর ধরে শুনে আসছি তো, শুনতে শুনতে বুকের ভেতরে বসে গিয়েছে। এখন শুধু কথা বা সুর নয় অন্য এক অনুভূতি তৈরি হয়ে যায় গান বাজলেই। তাই কান খাড়া করে শুনতে হয় না। এই দেখো না, আমি এখন শেষের কবিতা পড়ছি। অন্তত চারবার পড়েছি এর আগে। আমার নায়ক এখন শিলংয়ের পাহাড়ে। সেখানকার আকাশে তো ঘন ঘন মেঘ জমে, চারদিক আঁধার করে আসে। এই যেমন এখানেও হয়। বই আর গানকে মিশিয়ে নিয়েছে মন।'

কঙ্কাবতী অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। ভদ্রলোকের কথাগুলোর অর্থ সে ভাল করে বুঝতে পারছিল না। বস্তিতে বা স্কুলে কেউ তার সঙ্গে ওই ভাষায় কথা বলেনি কখনও। কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে এমন সে ভান করল যাতে মনে হয় কথাগুলো বুঝে গিয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই গানটা কি আধুনিক বাংলা গান ?'

'অ্যাঁ ? না না। এটা রবীন্দ্রনাথের গান। সেদিন যাঁর গান শুনেছিলে তিনিই রচনা করেছিলেন, পরে অন্য শিল্পীরা সেসব গান গেয়েছেন রেকর্ডে। ওঁরই গান আর এই বইটাও ওঁর। তুমি কি বাংলা পড়তে পার ?'

'হ্যাঁ। তবে খুব ভাল পারি না।'

'স্কুলের পড়ার বইয়ের বাইরে কবিতা গল্প পড় ?'

মাথা নিচু করেছিল কঙ্কাবতী। তারপর বলেছিলেন, 'আমি পাইনি।'

'পাওনি ? তোমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতে নিশ্চয়ই বই আছে। সেখান থেকে নিচ্ছ না কেন ?'

'উঁচু ক্লাসে না উঠলে বাড়িতে বই নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই।'

'ও। তোমার বাবাকে বলবে মাঝে মাঝে বই কিনে দিতে।'

'আমার বাবা নেই।'

'ও।' ভদ্রলোক একটু সময় নিলেন, 'কোথায় থাক তুমি ?'

'নীচের বস্তিতে।'

'তোমার বাবার কী হয়েছিল ?'

'আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলি লেগেছিল বুকে।'

'বাড়িতে আর কে আছেন ?'

'মা। মা আর আমি।'

'তুমি বোসো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ। এই বাড়িটাকে নিজের বাড়ি বলে মনে করবে। এসেই বসে পড়বে। কেমন ? কী খাবে বলো ?'

'কিছু না।'

'তা হতেই পারে না। সেদিন যখন প্রথম এলে তোমরা বাড়িতে কিছু ছিল না। তারপর রোজ কিছু নিয়ে এসে ভাবি তোমরা হয়তো আসবে।' ভদ্রলোক উঠে ভেতরে গেলেন। খুব আড়ষ্ট হয়ে

বসেছিল কঙ্কাবতী। উনি ফিরে এলেন একটা প্লেটে পেস্ট্রি আর দুটো মিষ্টি নিয়ে। বললেন, 'একদম বলবে না আমি মিষ্টি খাই না, জিভে মিষ্টি না লাগলে মন মিষ্টি হয় না। নাও, খেয়ে নাও।'

বাধ্য হয়ে খেতে হয়েছিল। প্লেট নামিয়ে রাখতেই ভদ্রলোক বললেন, 'না, ওখানে নয়। সোজা ভেতরে চলে যাও। ডান দিকে কিচেন। বেসিনে নামিয়ে রাখো। ওখানে জল আছে, খেয়ে নাও।' প্লেট তুলে ভেতরে গেল কঙ্কাবতী। রান্নাঘরে ঢুকে তার মনে হল, কী ভাল। তাদের একমাত্র শোওয়ার ঘরটিও এর তুলনায় কিছু নয়। মা যদি এরকম রান্নাঘর পেত খুব খুশি হত। তারপরেই হাসল, দূর ? মা এটাকেই শোওয়ার ঘর বানিয়ে ফেলত। বেসিনে হাত ধুতে ধুতে তার মনে হল পৃথিবীর সব সুখ বড়লোকেরা পেয়ে থাকে। তাদের মতো, যারা বস্তিতে থাকে, গরিব-গরিব বাড়িতে বাস করে তাদের কাছে এসব স্বপ্নের মতো মনে হয়। আন্দোলন করে কী লাভ হল ? যদি অবস্থা একই থাকে তা হলে ! হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ল। কলের জলে চোখের জল ধুয়ে ফেলা বড় সহজ।

মুখ মুছে বাইরের ঘরে আসতেই ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি কার কাছে পড় ?'

'আমার আগের স্কুলের মাস্টারমশাই পড়া দেখিয়ে দেন।'

'তিনি তোমাকে গল্প কবিতার বই পড়তে দেননি ?'

মাথা নেড়ে না বলল কঙ্কাবতী।

'ভানুভক্তের কবিতা পড়েছ ?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল কঙ্কাবতী। 'আমার স্কুলের বইতে ছিল।'

'কিন্তু ওঁর যে সংকলন আছে তা তোমার পড়া উচিত।'

'আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ গান লিখতেন, গল্পও লিখতেন ? উনি তো কবি ছিলেন।'

'হ্যাঁ। উনি গল্প উপন্যাস কবিতা গান লিখেছেন। প্রবন্ধ লিখেছেন। ছবি এঁকেছেন। আবার নতুন ধরনের পড়াশুনার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।'

'শান্তিনিকেতন ?'

'বাঃ। তুমি জানো ?'

'আমাদের মিস বলেছেন। কিন্তু একজন মানুষ এত কাজ পারেন ?'

'সবাই পারেন না। যিনি পারেন তিনি অনেক বড় মাপের মানুষ।'

সেই শুরু হয়েছিল। প্রায় প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় ওঁর কাছে যাওয়া তার নেশা হয়ে দাঁড়াল। একটু একটু করে বাংলা শেখাতে লাগলেন তাকে। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কঙ্কাবতী সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে নেপালির বদলে বাংলা নিল। ছয় মাসের মধ্যে তার লেখা বাংলা পড়ে মিস অবাক। চারটে বছর যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত থেকে অনেক অনেক কবির কবিতা তিনি পড়িয়েছেন তাকে। তার কিছু সে বুঝেছে অনেক কিছুই অবোধ্য থেকে গেছে। তিনি কবিতাগুলো পড়তেন আর বলতেন, এসব এখনই তুমি ধরতে পারবে না। কিন্তু প্রায়ই যদি পড় তা হলে দেখবে মনের ভেতর বসে যাবে আর তখন মন নিজের মতো করে উপলব্ধি করবে।

এই যে আমি কঙ্কাবতী, আমার এই বড় হয়ে ওঠা শরীর এটাই শেষ কথা নয়। আমার ভেতরে একটা মন আছে, তার একটা নিজস্ব জগৎ আছে তার খবর কখনও জানা যেত না যদি তিনি না বুঝিয়ে দিতেন। তাদের বস্তিতে কেউ এ কথা ভাবতে পারে না। শরীরটা কী করে ভাল থাকবে তাই নিয়ে উদ্বিগ্ন সবাই। তার জন্যে কিছু পাওয়া গেলে সবাই খুশি হয়। তাদের মন ভাল থাকে। শরীর ছাড়া মনের কোনও আলাদা অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এক একটা গান শুনলে শরীর দূরে সরে যায়, মন বিশাল হয়ে ওঠে। উনি এক সকালে বাজাচ্ছিলেন, আজ যেমন করে গাইছে আকাশ তেমন করে গাও গো। শুনে মনে হয়েছিল, এ আবার কী কথা, আকাশ গান গায় নাকি ? কিন্তু মুখ ফেরাতেই মনে হয়েছিল, সত্যি

তো। অথৈ মায়াময় নীল গায়ে মেখে আকাশ নতুন সূর্যের আলোয় মুখ ডোবাচ্ছে, এ যদি গান না হয় তা হলে গান কাকে বলে ? এইভাবে মনের চোখ তিনি খুলে দিয়েছিলেন তার।

তাঁর একটা নাম ছিল। এস কে রায়। বাড়িওয়ালা তাঁকে মিস্টার রায় বলে সম্বোধন করত। পিওন এসে বলত, মিস্টার রায়, আপনার চিঠি।

তিনি বলতেন, 'দিদি মনে রেখো। এটা না এলে আমি খেতে পাব না।'

ওই কয় বছরে তাঁর কাছে কোনও বাঙালিকে কেউ আসতে দেখেনি। তাঁর শরীরে যৌবন যেমন ছিল না বার্ধক্যও আসেনি। কিন্তু তিনি কোনও ধরাবাঁধা কাজকর্ম করতেন না। না চাকরি না ব্যবসা। সন্ধের পরে তিনি কী করতেন তা কঙ্কাবতী জানে না। কারণ সন্ধে নামবার আগেই সে বস্তিতে ফিরে যেত। তিনি রান্না করতেন নিজেই। তাঁর শরীর অসুস্থ হয়েছে এমন দৃশ্য কোনওদিন দেখেনি সে। মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করত ওঁর ব্যক্তিগত কথা জানার কিন্তু প্রশ্ন করার সময় মনে হত এগুলো অবান্তর।

একজন বাঙালি একা থাকেন, কারও সঙ্গে মেশেন না অথচ সবার সঙ্গে দেখা হলেই হেসে মাথা নাড়েন এ নিয়ে নেপালিদের মাথা ঘামানোর সময় ছিল না। তা ছাড়া বাড়িটা ছিল একটু নির্জনে। কিন্তু ক্লাস সিক্স থেকে টেনে উঠতে না-উঠতে কঙ্কাবতীর শরীর যেই বড় হল তখন কারও কারও কৌতূহল বাড়ল। দোতলায় নতুন ভাড়াটে এল কাঠমাণ্ডু থেকে। মেয়েকে এখানকার স্কুলে পড়াবেন অথচ হোস্টেল পাননি। তাই ভদ্রলোক ফ্ল্যাটটা ভাড়া করেছেন। স্কুল কাছাকাছি হবে আবার মেয়ের মা সঙ্গে থাকতে পারবে। পাঁচ বছরের বাচ্চাকে ছেড়ে তিনি নাকি থাকতে পারবেন না বলে স্বামীকে ছেড়ে এসেছেন। স্বামী প্রতিমাসে একবার এখানে আসবেন। তাদের পাহাড়ে এ রকম অনেক পরিবার ভাড়া থাকেন।

এক সকালে যখন সে স্কুলে যাচ্ছে তখন ভদ্রমহিলাও তাঁর মেয়েকে পৌঁছোতে যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে হেসে বললেন, 'তোমাকে রোজ দেখি। কী নাম তোমার ?'

'কঙ্কাবতী।'

'বাঃ। তুমি যে বাড়িতে যাও আমি তার ওপরে ভাড়া নিয়েছি।'

'ও।'

'আমার না এখানে খুব একা লাগে, তুমি মাঝে মাঝে আসবে ?'

'আসব। কিন্তু আমার পড়ার খুব চাপ, সময় বড় কম।'

'বাঃ। নীচের ওই ভদ্রলোকের কাছে যাও কী করে তাহলে ?'

'উনি আমাকে পড়ান।'

'ও। তার মানে উনি টিচার ?' ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'তা টিচার হলেও তো পুরুষমানুষ। একা ওঁর সঙ্গে থাকতে তোমার ভয় লাগে না ?'

'না তো!' ঝট করে তাকিয়েছিল কঙ্কাবতী। এই কথাটা কোনওদিন তার মাথায় আসেনি। ভদ্রমহিলা কথাটা বললেন বলে তার খুব খারাপ লাগল। সে জোর গলায় বলল, 'ভয় করবে কেন ? উনি খুব ভাল মানুষ।'

'সেটা ঠিক। খারাপ মানুষরা অত গান শোনে না। তবে সব বাংলা গান। আমার আবার হিন্দি গান ছাড়া কিছু ভাল লাগে না।' ভদ্রমহিলা কথা বলতে বলতে প্রায়ই বাঁ হাতে কপালের ওপর নেমে আসা চুলের ভাঁজ সরিয়ে দিচ্ছিলেন পিছনে, 'তো উনি একাই থাকেন দেখেছি, বউ-বাচ্চা নেই ?'

'আমি জানি না।'

'একদিন ওঁকে নিয়ে এসো তো, আলাপ করব।'

কথাবার্তা নেপালিতে হচ্ছিল। কঙ্কাবতী দ্রুত পা চালাল তার দেরি হয়ে যাচ্ছে এই অজুহাত দিয়ে। সে জানে ভদ্রলোক কখনওই ওপরে যাবেন না। তা ছাড়া যার আলাপ করার ইচ্ছে তারই তো ওর কাছে যাওয়া উচিত। ভদ্রমহিলার কথাবার্তা তার ভাল লাগল না।

সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে সে অবাক হল। নীচের ফ্ল্যাটের দরজা জানলা বন্ধ। গানও বাজছে না। এর মানে তিনি এখন বাড়িতে নেই। এ রকমটা হলে তিনি আগেই তাকে বলে দেন

অথচ গতকাল কিছু বলেননি। হয়তো কোনও জরুরি প্রয়োজন হওয়ায় বেরিয়ে যেতে হয়েছে এইরকম ভেবে সে বাড়ি ফিরে এল।

তাকে দেখে মা অবাক, 'কী রে এত তাড়াতাড়ি ফিরলি।'

হ্যাঁ, এটা তার বাড়ি ফেরার সময় নয়। কিন্তু প্রশ্নটা শুনে তার খুব রাগ হয়ে গেল। বলল, 'কেন? অন্যায় করেছি?'

'আচ্ছা! অন্যায় বলেছি। তুই তো সন্ধের আগে ফিরিস না, সন্ধের এখনও অনেক দেরি। যাক গে, তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলে নে, একজন আসবে।'

'কে?'

'পার্টির অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি। উনি বলেছেন তুই স্কুল থেকে ভালভাবে পাস করলেই চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'তার তো অনেক দেরি! আজ আসবেন কেন?'

'আমার সঙ্গে অন্য দরকার আছে।' বলতে বলতে মা মুখ ঘুরিয়ে নিল। মায়ের সঙ্গে এখন পার্টি অফিসের লোকদের খুব ভাব হয়েছে। মায়ের চাকরি যদিও ওরাই করে দিয়েছিল যার জন্যে তাদের খাওয়াপরার অভাব হয়নি, সে-ও পড়তে পারছে। কিন্তু সময়ে অসময়ে পার্টির লোকজন বাড়িতে আসে। তারা অবশ্য ঘরে ঢোকে না, বারান্দায় বসে কথা বলে যায়। বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের যে অবস্থা হয়েছিল তা ধীরে ধীরে কেটে গেছে: কাজ আর ওইসব লোকদের সঙ্গে থেকে মা এখন সহজ হয়ে গিয়েছে। বস্তির লোকজন মায়ের কাছে সাহায্যের জন্যে আসে। কারও পার্টি অফিসে প্রয়োজন থাকলেই মাকে এসে ধরে তারা। বাবা এখন ইতিহাস।

মাকে দোষ দিয়ে লাভ কী! মানুষ কতদিন তার শোক আঁকড়ে বসে থাকবে? সেটা তো আত্মহত্যার শামিল। জীবন ঠিকই একটা বিকল্প ব্যবস্থা করে দিয়ে শোক ভুলিয়ে দেয়। এই যে সে নিজে মাঝে মাঝে বাবার মুখ মনে করে কেঁদে উঠত সে রকম কান্না কত দিন সে কাঁদেনি? কেন কাঁদেনি? না কান্নাটা ভিতর থেকে আসেনি। আসলে ওই মানুষটির সঙ্গে আলাপ করার পর থেকেই একটু একটু করে সেই কান্নাটা সয়ে গেল। কেন? উনি কি তার বাবার বিকল্প হয়ে গেছেন? জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে হেসে ফেলল কঙ্কাবতী। দূর। তা কি হয়? কেউ কি কারও বিকল্প হতে পারে! তার বাবা পুলিশের গুলি খেয়ে মরে গেলেও আসলে খুব ভিতু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সাহস করে কিছু চাইতে পারতেন না। শুধু একেবারে শেষ দিকে তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করেছিলেন। মেয়ে বড় হবে, অনেক লেখাপড়া শিখবে এই আশা বুকে নিয়ে ট্যাক্সি চালিয়ে রোজগার বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সে মেয়ে হয়ে বাবার কাছে কিছু পায়নি যা তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। শুধু ওই স্বপ্ন দেখার ইচ্ছে ছাড়া। কিন্তু এই এস কে রায় তাকে নতুন পৃথিবীর সন্ধানই শুধু দেননি, প্রায় হাতে ধরে চারপাশ চিনিয়ে দিয়েছেন। স্নেহ বাৎসল্য ভালবাসার এক অপূর্ব অনুভূতি সে পেয়ে আসছে ওঁর কাছ থেকে। বাবার বিকল্প নয়, আর এক ধরনের বাবা যে বন্ধুর মতোও বটে, এস কে রায় তার কাছে তেমনই মানুষ।

মায়ের গলা শুনতে পেল কঙ্কাবতী, 'আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য।'

পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, 'সৌভাগ্য তো আমার। আপনার হাতে চা খাব।'

মায়ের ডাক ভেসে এল, 'কঙ্কা, কঙ্কাবতী।'

অতএব ঘর থেকে বের হতে হল। লোকটাকে সে দেখেছে এর আগে। তাদের স্কুলের সামনে বক্তৃতা করছিল। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোকে হুঁশিয়ার করে বলছেন, যদি তারা নিজেদের ইচ্ছেমতন স্কুল চালাতে চায় তাহলে পার্টি হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবে। ছাত্রী ভর্তির সময় পাহাড়ের মেয়েদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

লোকটা তাকে সর্বাঙ্গে দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মেয়ে?'

'হ্যাঁ। ক্লাস টেনে পড়ে।'

'কোন স্কুল?'

মা নামটা বলল। লোকটা মাথা নাড়ল, 'ওখানে কোনও সমস্যা হলেই বলবেন। কিন্তু আপনার

যে এত বড় মেয়ে রয়েছে এটা জানতাম না।'

'ওর বয়স বেশি নয়। আর আমার বিয়ে হয়েছিল খুব অল্প বয়সে। যে বয়সে মা হয়েছিলাম তা এখন কেউ ভাবতে পারে না।' মা অকারণে হাসল।

লোকটার পাশে দাঁড়িয়েছিল অল্প বয়সী যে ছেলেটি তার দৃষ্টি একটুও সুবিধের নয়। চোখ সরাচ্ছিল না তার শরীর থেকে। মা বলল, 'আসুন আসুন, ভেতরে গিয়ে বসি। এখনই ঠাণ্ডা বাড়বে।'

লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটিকে বলল, 'তাহলে তুমি যাও। আমি চা খেয়ে পার্টি অফিসে যাচ্ছি। ঠিক আছে?'

'আপনি একা অতটা রাস্তা হাঁটবেন? আমি বরং অপেক্ষা করছি।' ছেলেটি তখনও দেখে যাচ্ছিল।

লোকটি বলল, 'আমি যা বলছি তাই করো।'

ছেলেটি দ্রুত মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল। লোকটিকে ঘরে বসিয়ে মা বলল, 'শোন, চট করে দুটো সন্দেশ নিয়ে আয় তো।' মা টাকা বের করে দিল।

কঙ্কাবতী হবাক। অন্তত বছর তিনেক মা তাকে দোকানে পাঠায় না। তাকে বলেছে 'তোমাকে আর দোকানে যেতে হবে না। তুমি বড় হয়েছ।' বড় তো অন্য মেয়েরাও হয়েছে কিন্তু তারা দিব্যি দোকানে যায়, দুপুরে সেজেগুজে শহরে গিয়ে সিনেমা দেখে। তাদের কেউ কিছু বলে না, কিন্তু পাড়ার বেকার ছেলেগুলো দোকানের সামনে বসে তাকে ইশারা করে যায়।

'আমি দোকানে যাব?'

'হ্যাঁ। এবার যা। আমি গেলে উনি একা বসে থাকবেন।'

'উনি আসবেন সেটা তো জানতে, আগে নিয়ে আসনি কেন?'

'ভুলে গিয়েছিলাম। আমি আর কৈফিয়ত দিতে পারছি না। যা।'

টাকা নিয়ে বস্তির উল্টোদিকের দোকানের সামনে যেতেই আওয়াজ কানে এল। বস্তিরই ছেলে সব। একসময় একসঙ্গে খেলেছে ওরা। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'মাস্টারনি এসে গেছে।' আর একজন বলল, 'আজ কার মুখ দেখে উঠেছি।' আর একজন চেঁচিয়ে উঠল।' 'আ মেরা কাশ্মীর কি কলি, লাভ ইন টোকিও হোগা কি নেহি?'

কান লাল হয়ে গিয়েছিল। মিষ্টি কিনে ঘুরে দাঁড়াতেই দুজন সামনের পথ আগলে দাঁড়াল। একজন বলল, 'কী রে আমরা মানুষ না?'

'আমি কি সে কথা বলেছি?'

'তোর ভাব দেখে তাই মনে হয়।'

'কী রকম ভাব করতে হবে?'

'আর সব মেয়ে যা করে। কাল সকালে স্কুলে না গিয়ে দার্জিলিং-এ চল। ক্যাপিটালে সিনেমা দেখে সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসবি।'

'আমার সময় নেই। পথ ছাড়ো।'

'তা হলে এখানকার সিনেমায় চল।'

'বলছি তো সময় নেই।'

'অ্যাই সরে যা সামনে থেকে।' গলাটা ভেসে আসতেই কঙ্কাবতী দেখল সেই ছেলেটি খানিকটা দূরে এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে দেখে এদের অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল।

একজন শুধু বলল, 'আরে ইয়ার, আমরা পুরনো বন্ধু একটু ঠাট্টা করছিলাম।'

ছেলেটি এগিয়ে এসে বলল, 'এ আমাদের পার্টির মেয়ে। কেউ এর সঙ্গে ঝামেলা পাকাবি না। মনে থাকে যেন। এসো।'

সে বাড়ির পথ ধরতেই ছেলেটি ওর সঙ্গ নিল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'দেখো, এর পর তোমাকে এরা আর বিরক্ত করবে না। তোমার নাম কী?'

'কঙ্কাবতী।'

'আমার নাম গণেশ। চাচি বলেছে তোমাদের এখানে ঘর খালি হচ্ছে। খালি না হলেও আমরা খালি করিয়ে দেব। দিয়ে এখানে চলে আসব।'

কঙ্কাবতী কোনও উত্তর দিল না। ওদের ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে থেমে গেল গণেশ। দরজা ভেজানো। ভেতর থেকে হাসির আওয়াজ ভেসে আসছিল। লোকটা হাসছে, সঙ্গে মায়ের গলা। মাকে ওইভাবে হাসতে সে কোনওদিন শোনেনি। সে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এই সময় পাশের ঘরের মাসি এসে দাঁড়াল পাশে, 'এই কঙ্কা, তুই আমার একটা উপকার কর।'

'কী ?' নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল সে।

'মানুটা বেকার বসে আছে। এক পয়সা কামাই নেই। আমার এই ছেলেটা তো অন্য ভাইদের মতো লাফাঙ্গা নয়, তুই তো জানিস। ওকে একটা চাকরি দিতে বল না।'

'কাকে বলব ?'

'আহা, ন্যাকামি করিস না। তোদের ঘরে কে এসেছেন তা বস্তির সবাই জানে। উনি চেষ্টা করলেই মানুর চাকরি হয়ে যাবে। এখন পার্টির কথা সবাই শুনতে বাধ্য।'

'আমি কী করে বলব ? আমার সঙ্গে তো আলাপ নেই।'

'তোর মাকে বল। শুনছিস না, ভেতরে কী রকম হাসাহাসি হচ্ছে।'

কথাটা শোনামাত্র রাগ হয়ে গেল কঙ্কাবতীর। সোজা এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলল সে, 'মা, পাশের ঘরের মাসি তোমাকে বলতে বলল মানুর জন্যে চাকরি করে দিতে।'

লোকটা বসেছিল খাটে, পা ঝুলিয়ে মা বসেছে একটু দূরে, টুলে। ওরা দুজনেই তার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। শেষ পর্যন্ত মা বলল, 'কী বলছিস ?'

'উনি নাকি চাকরি দিতে পারেন তাই মাসি বলতে বলল।'

'মাসি মানে ?' লোকটি বিরক্ত হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল।

'পাশের ঘরে থাকে। মানু ওর ছেলে।'

'ওরা কেউ আন্দোলন করেছে ?'

'না।' মা মাথা নাড়ল।

'চাকরি কি আমার পকেটে আছে যে চাইলেই দিয়ে দেব ?' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'এই হয়েছে মুশকিল, যেখানেই যাই পাবলিক ধান্দা ছাড়া আসে না। কোথাও গিয়ে প্রাইভেট কথা বলারও উপায় নেই।' লোকটি গজরাচ্ছিল।

মা মিন মিন করে বলল, 'দেখুন না, কোথাও যদি আর্দালি বেয়ারার কাজ থাকে। মানু ছেলেটা ভাল।'

'আরে তোমাদের ছেলেমেয়েরা আর্দালি বেয়ারার ওপর কোনও কাজের জন্যে যোগ্যতা রাখে ? তার জন্যেই নাম পড়েছে দেড় হাজার। এই এলাকায়। অথচ আমরা চাই বড় বড় উঁচু পোস্টে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা ঢুকুক। শালারা পড়াশুনাই করে না যে নাম সুপারিশ করব। দিল মুডটার বারোটা বাজিয়ে।'

মা ঝটপট উঠে এসে প্যাকেটটা নিয়ে মিষ্টি প্লেটে ঢেলে এগিয়ে ধরল লোকটার সামনে। লোকটা তার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ বেঁকাল, 'এঃ। মিষ্টি আমি খাই না। ব্লাডে সুগার আছে। মাংস-টাংস নেই ?'

'আমি জানতাম না, জানলে নিশ্চয়ই মাংস করে রাখতাম। এর পরদিন আর এই ভুল হবে না।' মা মাথা নাড়তে লাগল।

'দুর। এরপর আর এখানে আসা চলবে না।'

'না না এরকম করে বলবেন না।' মা অনুনয় করল।

'আমার ব্যাপারটা ভাবা উচিত ছিল। আজ পাশের ঘরের মাসি বলছে কাল বস্তির মানুষ বলবে। কেন বলবে না ? সবার তো অভাব রয়েছে, ওরা ভাবছে আমি এখানে মজা করতে এসেছি এই ফাঁকে চাপ দিয়ে যদি কাজটা করিয়ে নেওয়া যায়। আরে এরা তো কেউ জানে না, কী যেন নাম তোমার ?' লোকটা হাত তুলল।

মা বলল, 'কঙ্কাবতী।'

'হ্যাঁ, কঙ্কাবতী, এরা তো কেউ জানে না, তোমার বাবা আর আমি বন্ধু ছিলাম। পাশাপাশি অ্যাকশন করতাম আমরা। পাঙ্খাবাড়ির রাস্তায় আমরা পাঁচজন ছিলাম। একটা চা বাগানের ফ্যাক্টরি উড়িয়ে দেওয়ার প্ল্যান ছিল। কীভাবে করব তাই দেখতে সেদিন গিয়েছিলাম। গাড়ির আওয়াজ পেলেই আড়ালে চলে যাচ্ছিলাম। চা বাগানের কাছাকাছি পৌঁছতেই ওরা গুলি ছুড়তে শুরু করল। পুলিশগুলো যে বাঁকের পাশে চা বাগানের মধ্যে লুকিয়ে ছিল সেটা বুঝতে পারিনি কেউ। ইনফরমাররাও জানায়নি। তখন পালাবার একমাত্র পথ উল্টোদিকের জঙ্গলে ঢুকে পড়া। সে দিকে যেতে গেলেও ওদের গুলি খেতে হবে। আমরাও গুলি ছুড়ছিলাম বলে ওরা এগোতে পারছিল না। তখন তোমার বাবা বলল, "আমি গুলি ছুড়ে ওদের আটকাচ্ছি তোমরা পালাও।" আমি আপত্তি করলাম। সে মাথা নেড়ে বলল, "আমাকে কেউ মারতে পারবে না। তোমরা যাও।" আমরা পালালাম। সে গুলি ছুড়তে ছুড়তে ঠিক জঙ্গলে পৌঁছে গিয়েছিল। সেদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল সে। আমার কোনও কৃতজ্ঞতা বোধ থাকবে না ? তার মেয়ে তো আমারও মেয়ে। তাকে দেখতে এখানে আসতে পারব না ?'

চুপচাপ শুনছিল কঙ্কাবতী। লোকটা থামতেই বলল, 'বাবা কিন্তু সেদিনই মারা গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ। স্রেফ বুদ্ধুর মতো মরল। এরকম বোকামি কেউ করে ? ফিরে এসে আমরা যখন গা ঢাকা দিচ্ছি তখন সে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াল। একটাও ট্যাক্সি নেই। যাক গে, ও সব কথা থাক। আজ চলি।'

'সে কী ? এখনই যাবেন ?'

'বললাম না, মুড নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কাল একবার স্কুলে যাব। তখন কথা বলব।' লোকটা বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মা ঘুরে দাঁড়িয়ে রাগী চোখে তাকাল, 'কেন তুই ভেতরে এসে ওসব বললি ?'

'বাঃ। মাসি বলতে বলল যে!' সে প্রতিবাদ করল।

'যে যা বলে বলুক, তোর বুদ্ধি নেই ? দেখলি তো, কী রেগে গেল মানুষটা। এখন যদি আমার চাকরি চলে যায় তো হাওয়া খেয়ে থাকবি ? তোর পড়াশুনা হবে ?' মা ছটফট করছিল।

এই সময় মাসি এসে দাঁড়াল। তাকে দেখা মাত্রই মা চিৎকার শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে মাসিও গলা তুলল। কঙ্কাবতী দেখছিল দুজন মহিলার ঝগড়া দেখতে বস্তির অনেকেই সেখানে ভিড় করছে। মাসির বক্তব্য ছিল স্বামী গুলি খেয়ে মরেছে বলে সব কিছু সুবিধে একা কেন ভোগ করবে মা ? তারাও পাহাড়ি, তাদেরও অধিকার আছে। মা বলছিল, বেশ করব, একশোবার করব। মাথায় সিঁদুর পরে স্বামীকে যে মেরে ফেলতে চায় তার জিভ খসে পড়া উচিত।

শেষ পর্যন্ত কঙ্কাবতী মাকে জোর করে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে এল। মা তখন হাঁপাচ্ছিল। অনেক কষ্টে মাকে শান্ত করতে পেরেছিল সে।

তারপর যখন সব চুপচাপ হল বই নিয়ে বসতে গিয়েও ইচ্ছে করছিল না তার। এই সব ঝগড়াঝাঁটি মনটাকে একদম তেতো করে ফেলেছিল। ঠিক তখন বাইরে কেউ বলে উঠল, 'আচ্ছা, কঙ্কাবতীদের ঘর কোনটা ?'

কঙ্কাবতী সোজা হয়ে বসল। গলার স্বর তার চেনা।

১৯

প্রায় লাফিয়ে উঠে দরজা খুলল কঙ্কাবতী, খুলে দেখল এস কে রায় সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। অদ্ভুত এক অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল তার মনে, সর্বাঙ্গে। কোনওরকমে বলতে পারল, 'আপনি!'

'হ্যাঁ, আমাকে আসতে হল।' ভদ্রলোক যেন দ্বিধায় পড়েছেন।

'আসুন, ভেতরে আসুন।' সসংকোচে কঙ্কাবতী সরে দাঁড়াল দরজা থেকে। এত বছরের আলাপ, কিন্তু কখনওই উনি তার খোঁজে আসেননি। আর নিজের বাড়িতে ওঁকে আসতে বলার সাহস হয়নি তার। চারপাশে অভাব এমন হাঁ করে রয়েছে যে ওঁর মতো মানুষকে এখানে মানায় না। কিন্তু আজ যখন উনি এসেই পড়েছেন তখন সব ছাপিয়ে আনন্দ প্রবল হয়ে উঠল।

এস কে রায় বললেন, 'না। বসব না। কঙ্কাবতী, তোমাকে একটা কথা বলা জরুরি বলে মনে হল। আমি কিছুদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তুমি খুব ভাল মেয়ে। আমি প্রার্থনা করব তুমি একজন ভাল মানুষ হও। কিন্তু আমি যতদিন আছি তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে যেও না। আচ্ছা, চলি।'

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়াতেই প্রশ্নটা ছিটকে বেরিয়ে এল কঙ্কাবতীর মুখ থেকে, 'কিন্তু কেন ?'

ভদ্রলোক দাঁড়ালেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'সব কথা তোমাকে খুলে বলা সম্ভব নয়। মনে করো, আমার ভাল হবে তাই তোমাকে অনুরোধ করছি।'

কথা শেষ করে তিনি দাঁড়ালেন না। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল কঙ্কাবতী। বাবার মৃত্যুর খবর শুনে এক ধরনের শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়েছিল সে। কিন্তু মৃত্যু কী তা সে দেখেনি। আজ যেন চোখের সামনে মরণকে দেখতে পেল সে। পেয়ে অসাড় হয়ে গেল। হঠাৎ একটা চাপা গালাগাল কানে এল। কঙ্কাবতী শুনল মা বলছে, 'বেশ হয়েছে, বাপের বয়সী মানুষের সঙ্গে জড়ালে তো এমন হবেই। কোনওদিন কিছু বলিনি, ভেবেছিলাম লোকটা মাস্টারি করে, কিন্তু এসব তো মাস্টারের কথা নয়।'

'মা !' চিৎকার করে উঠেছিল সে। তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

চাপা গলায় মা বলল, 'এখন আর চেঁচিয়ে কী হবে ? পাড়াপড়শিরা এতদিন ফিসফাস করত এখন চেঁচিয়ে কথা বলবে। যে লোকটা তোর বাপের চেয়ে বড় তার সম্পর্কে কিছু না জেনে জড়াতে গেলি ? সবাই বলে, তোমার মেয়ে একদম আলাদা। বড় হচ্ছে, শরীর বাড়ছে কিন্তু বস্তির আর পাঁচটা মেয়ের মতো ছেলেদের সঙ্গে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায় না। পড়াশুনা নিয়ে থাকে। এখন মর !'

সমস্ত শরীর জুড়ে কান্নার ঢল নেমেছিল। মায়ের কথাগুলো আর কানে ঢুকছিল না। আমি যতদিন আছি তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে যেও না। কেন ? কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না সে। উনি ভাড়াটে ছিলেন। ভাড়াটেরা চিরকাল এক জায়গায় থাকে না। কোনও কারণে যদি ওঁকে চলে যেতে হয় সেটা অস্বাভাবিক নয়। দূরে চলে গেলেও তো যোগাযোগ রাখা যায়। কিন্তু যাওয়ার আগে দেখা করতে নিষেধ করলেন কেন ? তাও এই বাড়িতে এসে বলতে হল তাঁকে ? কী অন্যায় করেছে সে ?

মা বলল, 'অনেক হয়েছে, এইবার ওঠো। রাত হচ্ছে।'

কঙ্কাবতী সাড়া দিল না। দু-তিনবার বলার পর মা তার পাশে এসে দাঁড়াল, 'শোন, এখন কান্নাকাটি করে কোনও লাভ নেই। লোকটা চলে গেলে তোর কি ক্ষতি হবে ?'

ক্ষতি হবে ? সে কী করে বোঝাবে ? চুপ করে রইল সে, বালিশে মুখ গুঁজে।

'এখন চুপচাপ থাকলে পরে বিপদে পড়বি। তোর বিপদ মানে আমার বিপদ।'

'বিপদ ?' প্রশ্নটা আচমকা বেরিয়ে এল ঠোঁট থেকে।

'হ্যাঁ। পুরুষদের কী ! বয়স মানে না, মেয়েমানুষ পেলেই ফুর্তি করে নেয়। বলে গেল, কদিন বাদেই চলে যাবে। তোর সঙ্গে যদি ওসব করে থাকে তা হলে এখনই বল, ওকে আমি ছাড়ব না। পার্টির লোকজনকে বলে কান ধরে বিয়ে করতে বাধ্য করব।'

'না।' চেঁচিয়ে উঠল কঙ্কাবতী।

'বোকামি করিস না। প্রেম ভালবাসা এক জিনিস আর পেটে বাচ্চা এসে গেলে কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব আমরা ? তোর আর পড়াশুনা হবে ?'

বিছানায় উঠে বসল সে, 'তিনি আমার বাবার মতন, হয়তো, তার চেয়েও বেশি।'

'সে কী ?' মায়ের মুখটা অদ্ভুত হয়ে গেল।

‘তুমি ওসব কথা আর কখনও বলবে না।’

‘আমি না বললেও পাঁচজনে তো বলতে ছাড়বে না। কজনকে বোঝাবি লোকটা তোর বাবার চেয়েও বেশি ? বাবার চেয়েও বেশি কেউ হতে পারে বলে জানতাম না !’

কথা বলতে ভাল লাগছিল না। ইচ্ছে করছিল, তখনই, ওই রাতে তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে প্রশ্ন করতে। কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না। মা যেতে দিত না। তা ছাড়া অত রাত্রে একা সে কখনও বাড়ির বাইরে যায়নি।

রাত্রে কিছু খেল না। বিছানায় শুয়েও ঘুম এল না। এমনিতেই এখানে পৃথিবী নিঃশব্দ, তবু বস্তির লোকজনের গলা থেমে গেলে সেটা আরও ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছিল কঙ্কাবতীর। উনি চলে যাবেন, আর দেখা করতে চান না ভাবতেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসছিল তার। শেষ পর্যন্ত ঘুম এল না। মানুষের বুকে যদি কান্না ছিটকে ওঠে তা হলে ঘুম উধাও হয়ে যায়।

সকাল হল। ভোরবেলায় মা রান্না করে রেখে সাততাড়াতাড়ি স্কুলে চলে যায়। আজও গেল। মায়ের সঙ্গে কোনও কথা হল না তার। সে যে প্রতিদিনের মতো বিছানা ছেড়ে পড়াশুনা শুরু করছে না দেখেও মা চুপ করে রইল। যাওয়ার সময় শুধু শুনিয়ে গেল, ‘কাল রাত্রে উপোস দিয়েছ, খাবার ঢাকা দিয়ে গেলাম, দয়া করে খেয়ে নিও।’ সে শুনল, জবাব দিল না।

আজ রোদ ওঠেনি। ছায়া ছায়া পাহাড়ে কুয়াশারা ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। এরকম আবহাওয়া দেখলে খুব মন খারাপ হয়ে যেত কঙ্কাবতীর। আজ হল না। মন আর কত বেশি খারাপ হতে পারে !

দূর থেকে বাড়িটাকে দেখা মাত্র পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেল। উনি নিষেধ করে গিয়েছেন, যদি তাকে দেখে রেগে যান ? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, যতই রাগুন, ওঁকে প্রশ্ন করার অধিকার তার আছে। বাড়িটার কাছে চলে এসে কঙ্কাবতী দেখল জানলাগুলো খোলা কিন্তু গান বাজছে না। এই বাড়িতে উনি আছেন কিন্তু টেপরেকর্ডার বন্ধ এমন কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ল না। ওপরের জানলার দিকে নজর যেতেই সে দেখতে পেল কালকের সেই ভদ্রমহিলা যিনি কাঠমাণ্ডু থেকে মেয়েকে নিয়ে এসে এখানে ফ্ল্যাট ভাড়া করে আছেন তিনি জানলা দিয়ে নিঃশব্দে হাত নেড়ে তাকে ডাকছেন। ভদ্রমহিলার মুখের অভিব্যক্তি এবং হাত নাড়া দেখে খুব অবাক হল সে। যেন অত্যন্ত জরুরি কিছু জানাতে উনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

চট করে একতলায় ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না বলে ওপরের আমন্ত্রণে সাড়া দিল সে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি পাশে। ওপরে উঠতেই ভদ্রমহিলাকে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। এক মুখ হাসি নিয়ে কঙ্কাবতীর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন তিনি।

‘আলাপ হয়ে গিয়েছে, আমার সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছে।’ হাসি চলকে উঠল।

‘ও।’ কঙ্কাবতী গম্ভীর হয়ে গেল।

‘কী ভাল মানুষ। নেপালিও বলতে পারেন।’

‘কী করে আলাপ হল ?’

‘আর বোলো না। কাল সন্ধেবেলায় হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। ঘরে কেরোসিন নেই যে হ্যারিকেন জ্বালব। ছোট্ট একটা মোমবাতি ছিল, সেটা জ্বালিয়ে ভয় পেলাম শেষ হয়ে গেলে কী করব ! তখন ওই অন্ধকারে নীচে যেতেই দেখলাম ওঁর ঘরে আলো জ্বলছে। ওই যে ব্যাটারির আলো। সাহস করে দরজায় আওয়াজ করলাম। উনি তো আমাকে দেখে খুব অবাক। বললাম। শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটা বড় মোমবাতি দিয়ে দিলেন।’

‘তখন উনি নেপালিতে কথা বললেন ?’

‘হ্যাঁ। আর বাচ্চা একা আছে, অন্ধকারে ওপরে উঠতে হবে বলে আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আমি কত করে ওঁকে বসতে বললাম, এক কাপ চা খাওয়াতে চাইলাম, উনি কিছুতেই রাজি হলেন না। বললেন, আর একদিন আসবেন।’ কথাগুলো বলার সময় ভদ্রমহিলার মুখে খুশি উপচে পড়ছিল।

‘ভালই তো !’

ভদ্রমহিলা কঙ্কাবতীর হাত ধরলেন, 'তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। কিন্তু বুঝতেই পারছ, এখানে একদম একা থাকি, কিছুতেই সময় কাটতে চায় না, তাই ওঁর সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব হয় তা হলে বেঁচে যাই। একই বাড়িতে থাকি বলে বাইরের কেউ বুঝতে পারবে না। আমার না ওঁকে খুব ভাল লেগেছে।'

'সে কি ! আপনি তো বিবাহিতা— !'

'আহা। আমি তো বন্ধুত্বের কথা বলেছি। একা থাকলে বিবাহিতা মেয়েরও বন্ধুর প্রয়োজন হয়। আর একটু বড় হও তখন বুঝবে।'

'কথাটা তখনই তাঁকে বললে ভাল হত না ?'

'চান্স পেলাম কোথায় ? উনি যখন এই দরজায়, কিছুতেই ভেতরে ঢুকছেন না ঠিক তখন নীচে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। হর্ন শুনে উনি নীচে নেমে গেলেন। তারপর নীচে খুব চেঁচামেচি হল। আমি তো ভয়ে মরি। আধঘণ্টা বাদে দেখলাম একজন মহিলা আর একজন পুরুষ ওঁর ওখান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে গেল।'

'এটা কখন হয়েছিল ?' কঙ্কাবতী শক্ত হল।

'এই তো, সন্ধের কিছু পরে। কী ব্যাপার, তুমি জানো ?'

'আমি কী করে জানব ?'

'ওঁর আত্মীয়স্বজনকে কখনও দেখোনি ?'

'না। আচ্ছা, আমি চলি।'

'আহা, এখনই যাবে কি— ! তুমি নিশ্চয়ই ওঁর কাছে যাচ্ছ ? ওঁকে তো বলতে পারো আমার কথা। মানে, আমি তোমার দিদির মতো, আমার কাছে কোনও সঙ্কোচ যেন না করেন।' ভদ্রমহিলা কঙ্কাবতীর কাঁধে হাত রাখলেন।

'ওঁর সঙ্গে আমার এসব কথা বলার সম্পর্ক নয়।' কথাগুলো বলেই দ্রুত নীচে নেমে এল কঙ্কাবতী। দরজা ভেজানো ছিল। মৃদু শব্দ করল সে।

'খোলাই আছে।' ভেতর থেকে গলা ভেসে এল।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল কঙ্কাবতী। এই ঘরে তিনি নেই। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে তিনি এলেন। ওকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার ?'

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'কিন্তু আমি তোমাকে এখানে আসতে নিষেধ করেছিলাম।'

'আমি কি জানতে পারি কেন আপনি নিষেধ করেছেন ?'

এস কে রায় কিছুক্ষণ কঙ্কাবতীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর তোয়ালে রেখে এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে তোমার ?'

হঠাৎই সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে কান্না এল। অনেক চেষ্টায় সেটা সামলে নিতে পারল কঙ্কাবতী। তারপর কোনওমতে মাথা নেড়ে না বলল।

'তোমার মুখের অবস্থা এরকম কেন ? রাত্রে ঘুমোওনি ?'

কঙ্কাবতী কোনও জবাব না দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল।

'তুমি বোসো, এখানে বোসো।' চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন তিনি।

কঙ্কাবতী বসল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। তার শরীর কাঁপছিল। এস কে রায় বললেন, 'কঙ্কা, আমি খুব দুঃখিত, তোমাকে কষ্ট দিতে কখনও চাইনি। কিন্তু এ ছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না।'

কঙ্কাবতী মুখ তুলল না। আর একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন এস কে রায়। তারপর বললেন, 'তুমি যখন প্রথম এক বান্ধবীর সঙ্গে এখানে এসেছিলে তখন বেশ ছোট ছিলে, বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কিছুই জানতে না। প্রতিটি দিন তোমাকে আমি যা জানি তা শিখিয়ে এসেছি। নিজের মেয়েকে বাবা যেমন করে শেখায় তার চেয়ে কিছু কম আমার ইচ্ছে ছিল না। তোমার মধ্যে আগ্রহ

ছিল তাই আমার ভাল লাগত। কিন্তু আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে অনেক দুঃখে, না নিয়ে উপায় ছিল না।'

হাত না সরিয়ে কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন ?'

'তাহলে তোমাকে আমার কথা বলতে হয়। আমি কলকাতার মানুষ। ভাল চাকরি করতাম। গল্প উপন্যাস লিখতাম। লিখে নাম হল। যে নাম হলে একজন লেখককে আর কোনও চাকরি করতে হয় না, সেই রকম পর্যায়ে পৌঁছে গেলাম। তোমাকে আমি অনেকের লেখা পড়িয়েছি কিন্তু কখনও নিজের লেখা পড়তে দিইনি। আমি বিবাহিত। কিন্তু আমাদের সন্তান হয়নি। এ নিয়ে কোনও সমস্যা আমার হয়নি। স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের কয়েক বছর পর থেকেই আমার দূরত্ব বাড়ে। সেটা কার দোষে তা এখন বিচার করা যাবে না। হয়তো তাঁর কিংবা আমার। আমি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যাই, কলকাতার বাইরেও যেতে হত। নিজেকে নিয়েই থাকতাম। তিনি কলেজে পড়ান, তাঁর মতো চলেন। এই সময় আমাদের জীবনে এমন কিছু ঘটল যা তোমাকে বলা যাবে না। সেই ঘটনার জেরে আমরা দুজনে দুই মেরুর মানুষ হয়ে গেলাম। কলকাতা আমার আর ভাল লাগছিল না। এমনকী লেখালেখিতেও কোনও উৎসাহ ছিল না। জীবন সম্পর্কেই সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, বাকি জীবনটা কোনও নির্জন জায়গায় গিয়ে একাই কাটিয়ে দেব। মোটামুটি চলে যায় এমন সঞ্চয় নিজের জন্যে রেখে বাকিটা তাঁকেই দিয়ে দিলাম। আমার প্রকাশকদের বলে দিলাম তাঁর অ্যাকাউন্টে পাওনা টাকা জমা দিতে। প্রথমে গিয়েছিলাম সমুদ্রের ধারে। কিন্তু ওই যে ঢেউ-এর আসা ও ফিরে যাওয়া, একই নিয়মে, দেখতে দেখতে একঘেয়েমি এসে গেল। ওটা যেন মানুষের জীবনের মতো। অনেক উৎসাহ নিয়ে শুরু করে একটা বিশেষ সীমায় আটকে যাওয়া। চলে এলাম পাহাড়ে। এই বাড়ি ভাড়া নিলাম। একটু একটু করে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। দিনরাত পাহাড় তার চেহারা পাল্টায় নানারকমভাবে, সময়টা চমৎকার কেটে যায়। গান শুনি, বই পড়ি। যে আমি তিরিশ বছর ধরে ক্রমাগত লিখে গিয়েছি সেই আমার লেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হয় না। যেন এতদিন সেই বুড়োটা ঘাড়ে উঠে চেপে বসেছিল, চাকর-বাকর করে রেখেছিল, তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে কী আরাম লাগত না লিখে। তুমি এলে। তোমাকে পেয়ে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। এই কবছর ধরে তোমাকে শেখাব বলে কতরকম কথা ভেবেছি। আর সেটা করতে গিয়ে মাথায় লেখার ভাবনা যে আসেনি তা নয়। আমি ডায়েরি লিখে গিয়েছি। কঙ্কা, তুমি নেপালি মেয়ে, যে পরিবেশে জন্মেছ, সেই পরিবেশকে অতিক্রম করেছ। আর তার জন্যে আমার কোনও ভূমিকা আছে ভাবতে খুব ভাল লাগে।'

এস কে রায় কথা বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন জানলার দিকে। শেষের কথাগুলো বোধহয় নিজেকেই শুনিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

'তাহলে আমাকে এখানে আসতে নিষেধ করলেন কেন ?'

'কারণ আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হলে আমার যেতে কষ্ট হবে।' এস কে রায় তাকালেন।

'আমার যে শুনেই কষ্ট হচ্ছে।'

'জানি। কঙ্কা। তুই আমার মেয়ে, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওরা অন্য কথা বলছে।'

কঙ্কাবতী অবাক হয়ে তাকাল।

এস কে রায় মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'গতরাতে আমার স্ত্রী এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল কাউন্সিলের একজন। আমার স্ত্রীর ধারণা কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে আমি পাহাড়ি মেয়েদের নিয়ে এখানে মজা করছি। উনি খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছেন একটি অল্পবয়সী মেয়ে রোজ আমার কাছে আসে। মেয়ের বয়সী হলেও আমার যে ললিতা কমপ্লেক্স তৈরি হয়নি তার নিশ্চয়তা কোথায় ? পুরুষমানুষের মধ্যে নাকি একটা জন্তু সবসময় জেগে বা ঘুমিয়ে থাকে। উনি আমার বিরুদ্ধে মামলা করতে চান। আমাকে শাস্তি না দিলে তৃপ্তি পাবেন না কিন্তু কিছুতেই ডিভোর্স দেবেন না। মাননীয়

সদস্য বলে গেলেন, বিবাহিত বাঙালি যদি পাহাড়ি মেয়েদের সঙ্গে ঝুটঝামেলা করে তা হলে সেটা ক্ষমা করা হবে না। আমি সেই কারণেই তোকে আমার কাছে আসতে নিষেধ করেছি। আমার যা হয় হোক, জীবন তো ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু তোর সামনে অনেকটা পথ মা, মাথা উঁচু করে সেই পথ হেঁটে যেতে হবে তোকে।'

'কে কী বলল তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমার বাবার পক্ষে যা সম্ভব ছিল না তা আমি আপনার কাছে পেয়েছি। আপনিই তো বলেছেন যিনি জন্ম দেন তিনি যেমন বাবা তেমনই যিনি শিক্ষা দেন তিনিও। তা হলে ?'

'ওরে, এসব সত্যি। কিন্তু এইসব সত্যিগুলোকে ঘোলা করতে কিছু লোক আইনের আশ্রয় নেয়। ওরা যদি তোকেও আদালতে হাজির করে সেটা আমার ভাল লাগবে না। আর মানুষের স্বভাব হল যে কোনও নোংরা অভিযোগ উপভোগ করা। তোর ক্ষেত্রে সেটা হোক আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।'

হঠাৎ কেঁদে ফেলল কঙ্কাবতী, 'আমি তা হলে কী করব ?'

'পড়াশুনা করবি। অনেক ওপরে উঠবি। আমি তোকে একটা ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি, যে কোনও প্রয়োজনে আমাকে ওই ঠিকানায় লিখলেই আমি সেটা জানতে পারব। আর শোন, ওই টেপরেকর্ডার আর এই ক্যাসেটগুলো তুই নিয়ে যা। এগুলোর মধ্যেই আমি থাকব।'

'কী করে ?'

'যখন গানগুলো বাজাবি তখনই আমার কথা মনে পড়বে তোর।'

'আমার ওরকম মনে পড়া চাই না।'

'দুর পাগলি ! যে কোনও সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা বেঁচে থাকেন। তাজমহল দেখলে শাজাহানের কথা মনে পড়বেই। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে বা কবিতা পড়লে তিনি আমাদের কাছে বেঁচে ওঠেন। আমি সাধারণ মানুষ, স্রষ্টা নই। এই দেখ, এই আংটিটা, আমার মা দিয়েছিলেন, এটার দিকে তাকালেই মাকে মনে পড়ে। তেমনই ওই রেকর্ডারে গান শুনলে তোর ঠিক আমাকে মনে পড়বে।'

'মনে পড়ার জন্যে গান শুনতে হবে ?'

'ঠিক আছে বাবা, তোর কাছে ওগুলো থাকলে আমার ভাল লাগবে। হল ?'

'আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন ?' করুণ গলায় জিজ্ঞাসা করল কঙ্কাবতী।

'এখনও ঠিক করতে পারিনি। কলকাতায় আমি ফিরব না।'

'আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না ?' দু চোখে জল এসে গেল।

'কেন হবে না ? তোর যখন খুব প্রয়োজন হবে তখন লিখিস, ঠিক চলে আসব।' এস কে রায়ের কথা শেষ হওয়া মাত্র গাড়ির আওয়াজ কানে এল। গাড়িটা থামল বাড়ির সামনে। খোলা দরজা দিয়ে কঙ্কাবতী দেখল একজন প্রৌঢ়া মহিলা গাড়ি থেকে নেমে হনহন করে এ দিকেই আসছেন। তার খুব ভয় লাগল। সে উঠে দাঁড়াতেই ভদ্রমহিলা দরজায় পৌঁছে গেলেন। অদ্ভুত চোখে কঙ্কাবতীকে দেখে তিনি এস কে রায়ের দিকে তাকালেন, 'এই নাকি ? এ তো নেহাতই পুঁচকে !'

এস কে রায় হাসলেন, 'তা হলে বোঝো, কতখানি খারাপ চিন্তা তোমার মাথায় এসেছিল ? কে কী বলেছে তাই শুনেছ, নিজের চোখে দেখে নিশ্চয়ই লজ্জা পাচ্ছ।'

মুখ শক্ত হয়ে গেল প্রৌঢ়ার, 'মোটেই না। পুরুষদের চিনতে আমার বাকি নেই। ছেলের জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়ে নিজেই বর হয়ে বসতে চায়। যাক গে, কাল রাত্রে মনে হয়েছিল সকালে ভালভাবে কথা বলব। তোমাকে একটা সুযোগ দেওয়া দরকার। সে কারণেই এসেছিলাম। কিন্তু তোমার বালিকা-প্রেমিকাকে এই সাতসকালে এখানে দেখতে পাব তা ভাবিনি।'

এস কে রায় চিৎকার করে উঠলেন। ওই গলায় তাঁকে বলতে কখনও শোনেনি কঙ্কাবতী, 'গেট আউট, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। তোমার যদি মেয়ে থাকত তা হলে তার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে তুমি সন্দেহ করতে। তোমার মতো মেয়েরা যারা জীবনে কাউকে সুখী করতে পারে না তারা তো এমনই নোংরা হবেই।' কথাগুলো বলতে বলতে এস কে রায় কঙ্কাবতীর দিকে তাকালেন, 'মাগো, প্লিজ, তুই বাড়ি চলে যা। জীবনের এই কুৎসিত দিকটা তুই দেখিস তা আমি চাই না। যা।'

কঙ্কাবতী দু চোখে জল নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োল। তার চোখের সামনে জলের আড়াল, কোথায় যাচ্ছে কোন দিকে, ঠাওর না করেই ছুটছিল। হঠাৎ ডান পায়ের বুড়ো আঙুল কনকন করে উঠল, শরীরটা ছিটকে উঠে পড়ে গেল রাস্তার এক পাশে। এবং সেই মুহূর্তেই পৃথিবী অন্ধকার। জায়গাটা যেহেতু বাঁকের এ পাশে তাই এস কে রায়দের বাড়ি থেকে দেখা গেল না। জায়গাটা নির্জন, এই পতন দেখার জন্যে কেউ কাছাকাছি ছিল না। মিনিট খানেকের মধ্যেই চেতনা ফিরে এল কঙ্কাবতীর। ঝটপট উঠে বসতেই সে দেখতে পেল আঙুল থেকে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে। শক্ত হাতে চেপে ধরল সে আঙুলটা। অথচ রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। সঙ্গে রুমাল নেই। একটা গাঁদাফুলের গাছ দেখতে পেয়ে তার পাতা ছিঁড়ে ক্ষতমুখে চেপে ধরল সে। রক্ত কমে এল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি ফিরল সে। মা নেই। দরজা খুলে ছেঁড়া কাপড়ে আঙুল বাঁধল সে। তার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছিল। ভদ্রমহিলার মুখটা মনে পড়ল। কী ভয়ঙ্কর গলায় কথা বলছিলেন তিনি। শরীরে কাঁপুনি এল। দাঁড়াতে পারছিল না কঙ্কাবতী।

বিকেলবেলায় যখন মা এল তখন কঙ্কাবতীর ধুম জ্বর। চোখ লাল, গলার স্বরে কাঁপুনি। মা দেখল বিছানার পায়ের দিকটায় রক্তের ছাপ। রক্ত বন্ধ হয়েছে কিন্তু বিছানায় শোওয়ার পরও পা থেকে পড়েছে। মা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল, 'কী করে জ্বর বাধালি ? পা কাটল কী করে ?'

কঙ্কাবতী জবাব দিল না। জবাব দেওয়ার মতো শারীরিক ক্ষমতা তার ছিল না। মা ছুটল ডাক্তারখানায়। ট্যাবলেট কিনে নিয়ে এসে খাওয়াল। জ্বরের ঘোরে চমৎকার ঘুম এনে দিল কঙ্কাবতীকে।

জ্বর ছাড়ল ঠিক দুটো দিন পরে। রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেছে প্রথম দিনেই। ডাক্তার তামাং এসেছিলেন। জ্বরো চোখে তাঁকে দেখেছিল কঙ্কাবতী। হাসি হাসি মুখে অনেক উৎসাহ দিয়ে গেলেন। কিন্তু জ্বর ছাড়ার পর মাটিতে পা ফেলতে গেলেই মাথা ঘুরতে লাগল তার। ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে এসে মা বলল, 'পেট ভরে খেতে হবে। এখন স্কুলে যাওয়া চলবে না। শরীর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত বাইরে বের হওয়া বারণ।'

কঙ্কাবতী কোনও কথা বলল না। তার কিছুই ভাল লাগছিল না। যে মানুষটাকে সে বাবার বিকল্প বলে ভেবেছিল, তার চেয়ে বয়সে জ্ঞানে কত বড় মানুষ, তাঁকে কেন আক্রমণ করছেন মহিলা ? তার যদি ক্ষমতা থাকত তা হলে গিয়ে মহিলাকে বোঝাত। তিনি বললেন, এটা জীবনের কুৎসিত দিক। কুৎসিত মানে যদি খারাপ কদাকার হয় তা হলে জীবনের অনেক কিছুই তো সেরকম। তাদের এই বস্তিতেই জন্ম থেকে বড় হতে হতে সে এরকম অনেক কিছুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। বাবা মা ভাই বোন বন্ধুর সম্পর্কগুলো মাঝেমাঝেই এখানে বদলে যায়। তাই নিয়ে চেঁচামেচি হয়, কদিন সবাই কথা বলে, তারপর সব কিছু ঝিমিয়ে যায়। তিনি তাকে দেখাতে না চাইলেও, জানেন না, সে ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছে। ওখানে থাকলে এর চেয়ে বেশি কী দেখত ? এইটুকু ভাবতেই মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

মা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মেয়ের শরীরে জ্বর নেই। কিন্তু এত দুর্বল যে কেউ না ধরলে বাথরুমে যেতে পারবে না। ডাক্তার তামাং ওষুধ দিচ্ছেন, কিন্তু তাতে তেমন কাজ হচ্ছে না। স্কুলে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। সেসব ভাবলেই মেয়ের কান্না শুরু হয়ে যায়। অনেক প্রশ্ন করেও মা জানতে পারেনি কেন পড়ে গিয়েছিল, কেন জ্বর এল ?

এই সময় গণেশের আগমন। দিশেহারা মা যেন তাকে পেয়ে বেঁচে গেলেন। গণেশ পার্টির কর্মী। মুখে সব সময় খই ফুটছে। ডাক্তার তামাং-এর কাছে কঙ্কাবতীর খবর পৌঁছে দেয় সে। একদিন মাকে বলল, 'একজন তান্ত্রিক এসেছেন। তিব্বতি তান্ত্রিক। তিনি সব অসুখ সারিয়ে দিতে পারেন, সেখানে নিয়ে চলো ওকে।'

'কোথায় ?'

'পান্থাবাড়িতে। খুব ভিড় হচ্ছে, এমনিতে গেলে দেখা পাবে না। কিন্তু পার্টির লোক বলে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।' দাঁত বের করে হাসল গণেশ।

মা খুব উৎসাহিত হল। কিন্তু পান্ডাবাড়িতে কঙ্কাবতীকে নিয়ে যাওয়া হবে কী করে ? গাড়ি ভাড়া করতে প্রচুর খরচ হবে। গণেশ অভয় দিল, 'কিছু ভেবো না। ও হল শহিদের মেয়ে। বিনা পয়সায় গাড়ি নিয়ে আসছি। আজ রবিবার, সামনের মঙ্গলবার রেডি থেকো তোমরা।'

মা বলল, 'বাবা গণেশ, তুই না থাকলে আমাদের যে কী হত ?'

গণেশ হাসল। উত্তর না দিয়ে কঙ্কাবতীর খাটের কাছে এল, 'এই যে মেমসাব, আমার ওপর ভরসা রাখো, কোনও চিন্তা নেই।'

কঙ্কাবতী মুখ ফিরিয়ে নিল দেওয়ালের দিকে।

গণেশ বলল, 'বুঝলে চাচি, তোমার মেয়ে আমাকে পছন্দ করে না।'

'আচ্ছা, অপছন্দ করার কী আছে। এত উপকার করছ।'

'তার ওপর পার্টি থেকে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে বাস ট্যাক্সি যাতে কোনও ঝামেলা না করে তা দেখতে। ওদের ইউনিয়নের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছ এ লাইনে কামাই কী রকম ?'

'তা তো ঠিকই।' মা বলল।

'তোমার মেয়ের মুশকিল কী জান চাচি, ও মেমসাহেবদের স্কুলে অনেকটা পড়াশুনো করে ফেলেছে। ওহো, তোমার কোনও চিন্তা নেই আর চাচি।'

'কেন ?' বুঝতে না পেরে মা জিজ্ঞাসা করল।

'সেই বাঙালি বুড়োটা ভেগেছে।'

'ভেগেছে।'

'হ্যাঁ। ফ্ল্যাট খালি করে চলে গিয়েছে। তোমাকে বলেছিলাম মেমসাব যেন ওর কাছে পড়তে না যায়। তুমি শোনোনি !'

'আমি বললেই ও যেন শুনছে। বলে বাবার কাছে মেয়ে যাচ্ছে !'

'তাই নাকি ? এ দিকে লোকটার বউ এসে পার্টি অফিসে কমপ্লেন করেছে তার স্বামী চরিত্রহীন লম্পট। বাচ্চা মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে। আর একটু হলেই মেমসাব ফেঁসে যেত। লোকটাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবার আগেই যখন নিজে চলে গেল তখন আর আমরা ঝামেলা বাড়াতে চাইলাম না।'

কথাগুলো কানে যেতেই শরীর শক্ত হয়ে গেল কঙ্কাবতীর। তিনি চলে গিয়েছেন ? চলে যে যাবেন তা অবশ্য বলেছিলেন কিন্তু এমনভাবে চলে যাবেন ? কঙ্কাবতীর মনে পাথর জমল কিন্তু তার এখন আর কান্না পেল না।

মা বলল, 'বাঁচা গেছে। আপদ দূর হয়েছে। আমার মেয়ে ওর কাছে পড়া বুঝতে যেত, তার বেশি আর কী সম্পর্ক বাবার বেশি বয়সী মানুষের সঙ্গে হতে পারে। আমি তো শুনেছি ওই বাড়িতে একটা বউ বাচ্চা নিয়ে একাই থাকে। তার সঙ্গে কিছু হয়েছিল কি না কে জানে !'

গণেশ হাসল, 'না চাচি। ওই বউটা খুব ভাল। ওর স্বামী কাঠমণ্ডুতে থাকে। আমাদের অফিসে এসে ডোনেশন দিয়ে গেছে। এই তো, গতকাল গিয়েছিলাম খবর নিতে। আমাকে অনেক কিছু খাওয়াল। নীচের ফ্ল্যাটের লোকটা সম্পর্কে ওর ধারণা খুব খারাপ। বলল, অল্প বয়সী মেয়ের ওপর নাকি ওর খুব ঝোঁক ছিল। আমি অবশ্য এসব কথায় কিছু মনে করিনি। লোকে তো বানিয়ে বানিয়ে কত কথা বলে।'

কঙ্কাবতী এবার উঠে বসল, 'মা, আমি সামনের মঙ্গলবার কোথাও যাচ্ছি না।'

'যাচ্ছিস না মানে ?' মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'তান্ত্রিকরা যদি সব অসুখ সারিয়ে দিতে পারত তা হলে দেশে কোনও ডাক্তারের দরকার হত না, হাসপাতালও তৈরি হত না। ওরা সবাই ভয় দেখিয়ে ভাঁওতাবাজি করে। বোকা লোকজন সেই ভাঁওতায় ভোলে।'

'তুই সব জেনে বসে আছিস ?'

'জানি বলেই বলছি।'

'এইটুকু মেয়ে তুই আমার চেয়ে বেশি জানবি ?'

'হ্যাঁ মা, সত্যি কথাটা শোনো। তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশি জানি।'

'কী বললি ?' মা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি তোকে জন্ম দিয়েছি আর আমাকেই তুই এ কথা বললি ? শুনেছ, শুনেছ গণেশ, মেয়ের কথা শুনেছ ?'

গণেশ হাসল, 'বেশি পড়াশুনো করলে হিন্দুরা খ্রিস্টান হয়ে যায়। ওর কোনও দোষ নেই। তান্ত্রিকের দেওয়া ওষুধ খেয়ে অসুখ যখন সেরে যাবে তখন বুঝতে পারবে। ঠিক আছে চাচি, আমি এখন যাব। অনেক কাজ পড়ে আছে। ওবেলায় আসব একবার।'

গণেশের এই আসা-যাওয়া একদম ভাল লাগে না কঙ্কাবতীর। মা যখন থাকে না তখন গণেশ যেভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে তাতে খুব অস্বস্তি হয় ওর। কিন্তু মাকে বোঝালেও বুঝবে না। এস কে রায় খুব খারাপ লোক আর ওই বাড়ির ওপরের তলার বউটা বেশ ভাল, এসব শুনলে মাথা গরম হয়ে যায় কিন্তু কঙ্কাবতী বুঝে গিয়েছে প্রতিবাদ করে কোনও লাভ হবে না।

পরদিন দুপুরে একটা লোক এল। মা তখন স্কুলে। খাট থেকে নেমে দরজা খুলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। পা ফেললেই মাথা ঘুরছে অথচ শুয়ে থাকলে তেমনটা হচ্ছে না। লোকটা নেপালি, হাতে একটা বড় পিজবোর্ডের বাক্স। বলল, 'ক্যুরিয়ার সার্ভিস থেকে আসছি। কঙ্কাবতী কার নাম ?'

'আমার।'

বস্তির কয়েকজন কৌতূহল নিয়ে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। লোকটা তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'এর নাম কঙ্কাবতী ?'

ওরা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

লোকটা বাক্সটা ঘরে নামিয়ে রেখে কাগজ বের করে সই করিয়ে নিয়ে চলে গেল। পাশের ঘরের মাসি এগিয়ে এল, 'ওমা, কত বড় বাক্স! তোর নামে এল ? কে পাঠাল রে ?'

'জানি না।' নিচু স্বরে বলল কঙ্কাবতী।

'নিশ্চয়ই অনেক দামি জিনিস আছে। পার্টি থেকে দিল ?'

'বললাম তো জানি না।' বলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল কঙ্কাবতী। এইটুকুতেই শরীর কাহিল হয়ে পড়েছিল বলে সে শুয়ে পড়ল। বাক্স খোলার কথা মনেই এল না।

ঘুম ভাঙল যখন তখন মা এসে গিয়েছে। সে দেখল টেবিলের ওপর বাক্স রেখে মা সেটাকে খুলছে। তারপর মায়ের উৎফুল্ল গলা শুনল, 'বাঃ। কী সুন্দর। কে পাঠাল রে ?'

'কী ?'

'টেপরেকর্ডার। সঙ্গে অনেকগুলো ক্যাসেট!'

ঝটপট উঠে বসল কঙ্কাবতী। মা বলল, 'এত দামি জিনিস তোর নামে এল আর কে পাঠাল তা তুই জানিস না ?'

জবাব দিল না কঙ্কাবতী। কোনওমতে হেঁটে টেবিলের কাছে গেল সে। সেই টেপরেকর্ডার! উনি তো চলে গিয়েছেন এখান থেকে তা হলে পাঠালেন কী করে ? উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এল। সে বাক্সের মধ্যে ঝুঁকে পড়ল। কোনও চিঠিপত্র নেই। মা টেপটা তুলে নিয়ে প্লাগটা গর্তে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। ক্যাসেটগুলো দু হাতে তুলে নিয়ে বিছানায় চলে এল। সব রবীন্দ্রনাথের গান।

মা বলল, 'এ কী! এ যে সব বাংলা গান! হিন্দি নেই ?'

কঙ্কাবতী মাথা নেড়ে না বলল।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মা বলল, 'বুঝতে পেরেছি। সেই বাঙালিটা পাঠিয়েছে। সত্যি কথা বল। ঠিক কি না ?'

'আমি কী করে জানব ?'

'তুই জানিস না ? ওর বাড়িতে তুই এসব গান শুনিসনি ?'

'শুনেছি। কিন্তু এগুলো যে উনি পাঠিয়েছেন তা জানব কী করে ?'

মা পাশে এসে বসল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই বস্তিতে বাংলা গান বাজানোর দরকার নেই।

তা ছাড়া তোকে কেউ টেপরেকর্ডার পাঠিয়েছে শুনলে লোকে অনেক কুকথা বলবে। অভাবের সংসারে আমরা টেপরেকর্ডার নিয়ে কী করব! তার চেয়ে গণেশকে বলব এটা বিক্রি করে দিতে। তাতে দুটো পয়সা আসবে। তোর চিকিৎসার জন্যে তো টাকা লাগবে। দে, ওগুলোকে আবার বাক্সে ঢুকিয়ে রাখি।'

'না।' শক্ত গলায় বলল কঙ্কাবতী।

'না মানে?'

'এগুলো আমি মরে যাওয়ার আগে বিক্রি করতে দেব না।'

'কেন? এত টান কেন এদের ওপর।'

'মা, শোনো, একটা গান শুনে দ্যাখো, তোমার মন ভরে যাবে।' কঙ্কাবতী অনুনয় করল, 'তুমি আমার জন্যে এটা বাড়িতে রেখে দাও।'

'তুই এগুলো ওর কাছ থেকে চেয়েছিলি?'

'না। উনি নিজেই পাঠিয়েছেন।'

মা কিছু না বলে সরে গেলেন। কঙ্কাবতী ক্যাসেটগুলো দেখতে লাগল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ক্যাসেটটা প্রায়ই বাজাতেন তিনি। যেতে দাও যেতে দাও গেল যারা। তুমি যেও না, তুমি যেও না, আমার বাদলের গান হয়নি সারা। ক্যাসেটটা খুলল সে। খুলতেই খাপের ভেতরে কাগজের টুকরোটা চোখে পড়ল। এস কে রায়, কেয়ার অফ সুপ্রিয় বুকস, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা।

উনি বলেছিলেন তেমন কোনও সমস্যা হলে যোগাযোগ করতে। সেই কারণেই কি এই ঠিকানাটা পাঠিয়েছেন। আচ্ছা, যদি এই ক্যাসেটটা সে না দেখত! অদ্ভুত মন খারাপ হয়ে গেল কঙ্কাবতীর। উনি নিশ্চয়ই জানতেন এই ক্যাসেটটা সে দেখবেই।

ক্যাসেটটাকে রেকর্ডারে ঢুকিয়ে ভল্যুম কমিয়ে প্লে টিপে দিল কঙ্কাবতী। খুব আস্তে গান বাজছিল। খাটে বসে শোনা যাচ্ছিল না। কঙ্কাবতী টেপরেকর্ডারের কাছে কান নিয় গেল, 'দীপ নিবেছে নিবুক নাকো, আঁধারে তব পরশ রাখো ॥বাজুক কাঁকন তোমার হাতে/আমার গানের তালের সাথে, যেমন নদীর ছলোছলো জলে ঝরে ঝরোঝরো শ্রাবণধারা।' এখনও অনেক শব্দ স্পষ্ট মানে তৈরি করে না কঙ্কাবতীর কাছে তবু সব মিলিয়ে যে-অনুভূতিটা তৈরি হয় সেটা এই মুহূর্তেও হল। আর তখনই কঙ্কাবতী চোখ বন্ধ করল : না, সে একা নয়। কেউ তাকে ছেড়ে যায়নি।

সোমবার সকালে মায়ের স্কুলে যাওয়া হল না। গণেশ ডাক্তার তামাংকে নিয়ে এল। তিনি অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন। চোখের পাতা, আঙুলের ডগা দেখলেন। তারপর বললেন, 'ওর রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। খাওয়া-দাওয়া করে?'

'একেবারেই খেতে চায় না।' মা অভিযোগ করল।

'না খেলে চলবে কেন মা।' কঙ্কাবতীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি।

লোক এসে রক্ত নিয়ে গেল। বিকেলে মা সেই রিপোর্ট আনতে গেল। রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তার তামাংকে দেখাতে যাবে।

কঙ্কাবতী প্রায়ান্ধকার ঘরে একাই শুয়েছিল। শরীর দুর্বল, মাথা ধরে আছে আর কী রকম অস্বস্তি। সে বাক্সটার দিকে তাকাল। টেপরেকর্ডার ওর মধ্যে ঢুকিয়ে কাপড় দিয়ে আড়াল করে রেখেছে মা। কেউ দেখুক এটা চায় না।

কঙ্কাবতী ধীরে ধীরে উঠল। টেপরেকর্ডারকে চালু করতে শরীরের অনেক শক্তি খরচ করতে হল তাকে। মেঝের ওপর বসে টেপরেকর্ডারের কাছে গেল কঙ্কাবতী। জোরে বাজানো চলবে না। এ ঘরের বাইরে যেন আওয়াজ না যায়। কান পাতল সে, 'আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে/যেখানে ওই আঁধারবীণায় আলো বাজে।' আঁধারবীণায় আলো কীভাবে বাজে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিছুটা বুঝে অনেকটা না বুঝে সেদিন চলে এসেছিল কঙ্কাবতী। আজ, এখন, এই অন্ধকার হয়ে আসা ঘরে বসে তার মনে হল এই কথাটাই সত্যি, খুব সত্যি, 'এখন দিক-বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা কিসের আশায় বসে আছি অভয় মানি।' অভয় মানি, অভয় মানি। অভয় মানে ভয় নেই।

ঠিক সেই সময় রিপোর্ট দেখে ডাক্তার তামাং-এর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কঙ্কাবতীর মায়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার মেয়ের হেমোগ্লোবিন মারাত্মক নেমে গিয়েছে। আমি যে ওষুধগুলো লিখে দিচ্ছি তা আজ থেকেই খাওয়াতে আরম্ভ করুন। কয়েকদিন পরে আবার ব্লাড পরীক্ষা করব। কিন্তু ওকে এসব কিছু বলবেন না।'

২০

একটা ইউক্যালিপটাস গাছ রয়েছে। নিরাময়ের এই দোতলা ঘরের জানলার ওপাশেই। কয়েকটা পাহাড়ি টিয়া সেই গাছের ডালে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে এই ঘরের বাসিন্দাকে নজর করছিল। বিছানায় টানটান শুয়ে থাকা কঙ্কাবতীর ভারি মজা লাগছিল ওদের দেখতে। কী বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব! ওরা কি রোজ গাছটায় কিছুক্ষণ বসে! এই ঘরে তার আগে যে ছিল তাকে কি ওরা চিনত! সে নিচু গলায় ডাকল, 'এই!'

সঙ্গে সঙ্গে পাখিগুলো শক্ত হয়ে বসল। তারপর একজন উড়ে যেতেই বাকিগুলো তাকে অনুসরণ করল। গাছটা ফাঁকা। গাছের যতই প্রাণ থাকুক যতক্ষণ ফুল না ফোটে, ফল না ঝোলে অথবা পাখি না বসে ততক্ষণ তাকে জীবন্ত বলে মনে হয় না। কঙ্কাবতী চোখ ফিরিয়ে নিল। সে শুয়ে আছে কিন্তু ঘুম আসছে না। ডাক্তার তামাং-এর ওষুধ খেয়ে শরীর বল পেয়েছিল। একটু একটু করে তাদের ঘরের বাইরে যেতে পারছিল। স্কুলে যাওয়ার জন্যে মন ছটফট করত। কত কী পড়ানো হয়ে যাচ্ছে ক্লাসে অথচ সে কিছুই জানতে পারছে না। স্কুলের দু-তিনজন বান্ধবী এসে মাঝে মাঝেই তাকে খবর দিয়ে যেত। কিন্তু ডাক্তার তামাং বলল ভালভাবে সেরে উঠতে গেলে তাকে কিছুদিন নার্সিংহোমে থাকতে হবে। নার্সিংহোমে থাকতে গেলে প্রচুর টাকা দরকার। তার মায়ের সেই টাকা নেই। টাকা না থাকলে তার অসুখ সারবে না। অথচ অসুখটা ঠিক কী তাও ডাক্তার তামাং ভালভাবে বোঝাননি। বলেছেন, রক্তের লোহিতকণিকা কমে যাচ্ছে দ্রুত। টনিক দিয়ে তাকে এই মুহূর্তে বাড়ানো যাবে না। শেষ পর্যন্ত মা পার্টি অফিস থেকে ঘুরে এসে জানান, ব্যবস্থা হয়েছে। তাকে নেতারা আশ্বাস দিয়েছেন শহিদের মেয়ের জন্যে কিছু করবেন। শহিদের মেয়ে। বাবাকে শহিদ বলে ভাবতে তার ইচ্ছে করে না। যে অর্থে ভগৎ সিং, শহিদ, ক্ষুদিরাম বাঘাযতীন শহিদ বাবা কি সেইরকম শহিদ? বাবা ঠিক কোথায় মারা গিয়েছিল তাই নিয়ে দুরকম গল্প চালু আছে। মানেভঞ্জনের কাছে না এখানকার ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে? মাঝে মাঝে মনে হয়, বাবা নয়, বাবার মতো দেখতে আর কেউ হয়তো মারা গিয়েছে পুলিশের গুলিতে। হঠাৎ একদিন বাবা হাজির হয়ে বলবে কেমন আছিস! নিশ্বাস ফেলল কঙ্কাবতী।

ডাক্তার তামাং বলেছিলেন নিরাময়ের ডাক্তারকে দেখাতে। উনি রক্তের ডাক্তার। শব্দটা কী যেন, হেমাটলজি? ভাগ্যিস বলেছিলেন। নইলে গণেশকে ওভাবে জব্দ করত কে? ডাক্তারবাবুকে তার খুব ভাল লেগেছে। এস কে রায়ের সঙ্গে কিছু ব্যাপারে বেশ মিল আছে ওঁর। ডাক্তার কবিতাটা জানেন : কথা বলার ধরনে আপন আপন ভাব আছে। উনি তাকে নিজের মেয়ে হিসেবে ভেবেছেন। ভানুভক্ত আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনও তুলনা করতে সে চায়নি, শুধু এটুকুতেই তিনি তাকে ভালবেসে ফেললেন? এস কে রায় বলতেন, কবি-শিল্পীদের কখনও একের সঙ্গে আর একজনের তুলনা করতে নেই। খুব অল্পখ্যাত কোনও কবির একটা লাইন তোমার কাছে চিরজীবনের সম্পদ হয়ে যেতে পারে।

'কেমন আছ?'

কঙ্কাবতী চোখ ফেরাল, মিসেস অ্যান্টনি। সে হাসল।

মিসেস অ্যান্টনি কাছে এলেন, 'মুখটা অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

'কই, না তো!'

'না বললে হবে। একটু পরে খাবার আসবে। সেটা খেয়ে ভাল করে মুখ ধুয়ে এসো। আমি ক্রিম মাখিয়ে চুল আঁচড়ে দেব। কী সুন্দর চুল অথচ কী করে রেখেছ।'

কঙ্কাবতীর খুব ভাল লাগল। তার একটা ক্রিমের শিশি ছিল। বাবা কিনে দিয়েছিল অনেকদিন আগে। বেশি শীত পড়লে একটু একটু করে সেটা ব্যবহার করত। সেটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন বাবা নেই। মায়ের এত অভাব আর একটা ক্রিম কিনে দেওয়ার কথা বলতে পারেনি সে। নিজের চুল নিজেই বেঁধে এসেছে এতদিন। সেই কবে ছেলেবেলায় মা বকবক করতে করতে চুল বেঁধে দিত, এখন ভাল করে মনে পড়ে না।

সাজগোজ হয়ে গেলে মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। চলো, আমরা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই।' মিসেস অ্যান্টনি ওকে নিয়ে বাইরে এলেন। আশেপাশের ঘরগুলোর দরজা খোলা। ঘরের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থা নেই। মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'এই ঘরগুলোতে তোমার চেয়ে অসুস্থ ছেলেমেয়েরা রয়েছে। সবাই একটু একটু করে ভাল হচ্ছে। তোমার যখন ভাল লাগবে তখন ওদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে এসো।'

'এই যে মাদার, বাঃ, দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে।'

গলার স্বর কানে যেতেই ওরা দেখল ডাক্তারবাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। তাঁকে খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। মিসেস অ্যান্টনি হাসলেন, 'আপনার এই মেয়ে তো সত্যি সুন্দরী।'

'হুঁ। দেখছি তাই। তা কঙ্কাবতী, এখন তোমার কী অসুবিধা হচ্ছে?'

'খুব দুর্বল লাগছে।'

'সেটা তো স্বাভাবিক। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। মিসেস অ্যান্টনি, সায়নকে বলুন তো, সারাক্ষণ ঘরে শুয়ে না থেকে একটু হাঁটাহাঁটি করতে। ওর মা দু বেলা ঘরে গিয়ে গল্প করছেন, এটা ঠিক নয়।'

মিসেস অ্যান্টনি মাথা নেড়ে চলে গেলেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগছে এখানে? নিশ্চয়ই বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে?'

কঙ্কাবতী তাকাল, 'আমাদের কোনও বাড়ি ছিল না, একটা ঘর ছিল। আমার অসুখ হওয়ার পর মায়ের কষ্ট খুব বেড়ে গিয়েছিল। এখানে এসেছি বলে অনেক সমস্যা কমে যাবে। আচ্ছা, আমার চিকিৎসার জন্যে আপনার কত খরচ হবে?'

ডাক্তার অবাক হয়ে তাকালেন। অনেককাল তিনি পাহাড়ে আছেন। সম্পন্ন শিক্ষিত নেপালি পরিবারের ছেলেমেয়েদের মর্যাদাবোধের কথা জানেন। কিন্তু নীচের তলার ছেলেমেয়েদের মধ্যে অভাব আর অশিক্ষা যে প্রভাব ছড়িয়েছে তার ফলও লক্ষ করেছেন। কঙ্কাবতী বস্তিতে থাকত, পরিবারের আয় অতি সামান্য। এত অল্প বয়সে এই গলায় প্রশ্নটা একদম আশা করেননি ডাক্তার।

তিনি বললেন, 'চলো, ভেতরে গিয়ে গল্প করি।'

কঙ্কাবতীর হাঁটা লক্ষ করলেন তিনি। যে কোনওদিন মেয়েটার শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে আসতে পারে। যেদিন ও প্রথম পড়ে গিয়েছিল সেদিনই রক্তপাত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কঙ্কাবতীকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিলেন তিনি, 'টাকাপয়সার কথা জেনে তোমার কী লাভ হবে?'

'জানা থাকলে সুবিধে হয়।' মাথা নামাল কঙ্কাবতী।

'কী সুবিধে?'

'আমি চাকরি করে শোধ করতে চাই।'

'বাঃ। বাবা কি মেয়েকে ধার দেয় যে শোধ করার কথা বলছ?'

'আপনি বলছেন অনেক টাকা খরচ হতে পারে।'

'ঠিক। সেটা হবেই তা এখনই বলা যাচ্ছে না। প্রাথমিক ওষুধ যদি কাজ দেয় তাহলে খরচ এমন বেশি কিছু নয়।'

'আপনি আমাকে আগে দেখেননি। আমার কথা শুনে ভাল লেগেছে বলে মেয়ের মতো মনে করেছেন। কিন্তু আমি আপনাকে—' থেমে গেল কঙ্কাবতী। ঠিক কীভাবে বললে খারাপ শোনাবে

না তা সে বুঝতে পারছিল না।

'ঠিক আছে, আমি হিসেব রেখে দেব। যখন আমার অবস্থা খুব খারাপ হবে তখন তোমাকে বলব। বাবা-মা বুড়ো হয়ে গেলে তো ছেলেমেয়ে তাকে সাহায্য করে। কিন্তু সেদিন তোমাকে তোমার নামের মানে জিজ্ঞাসা করতেই তুমি বলে দিলে। নেপালি মেয়েদের তো এত ভাল বাংলা শব্দের মানে জানার কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি কি নিজের নামের মানে জানার আগ্রহে ওটা জেনেছ?' ডাক্তার প্রসঙ্গ ঘোরালেন।

'না। অনেকের মতো আমারও আগ্রহ ছিল না। কয়েক বছর আগে হঠাৎই জেনেছি। তারপর বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটা পড়েছি।'

'সর্বনাশ। বলো কী?' ডাক্তার আকাশ থেকে পড়লেন।

'কেন? পড়াটা কি অন্যায়?'

'আরে বাবা তা বলছি না। এখনকার ছেলেমেয়েদের অনেকে ওঁর নামই জানে না। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, তুমি বাংলা সাহিত্যের অনেকের লেখা পড়েছ?'

'কিছু কিছু।'

'এই আগ্রহ হল কী করে?'

কঙ্কাবতী তাকাল। তারপর বলল, 'রবীন্দ্রনাথের গান শুনে।'

কথাটা সত্যি। এস কে রায়ের বাড়িতে টেপরেকর্ডারে গান বাজত। সেই গান শুনেই ওরা আকৃষ্ট হয়েছিল। বান্ধবীর উৎসাহ চলে গিয়েছিল কিন্তু সে পৌঁছে গিয়েছিল এক আশ্চর্য জগতে।

ডাক্তার অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন। এটা যদি কলকাতা হত তিনি একটুও ভাবতেন না। কোনও কোনও বাঙালি মেয়ের পক্ষে এমন কথা বলা স্বাভাবিক। কিন্তু বিপরীত পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা একটি নেপালি মেয়ের মুখে এমন কথা আশাই করা যায় না।

দরজায় ছায়া পড়তেই ডাক্তার দেখলেন সায়ন এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি হাসলেন, 'এসো সায়ন। আমাদের এই নতুন বন্ধুটির সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই আলাপ হয়নি।'

দরজায় দাঁড়িয়েই সায়ন জবাব দিল, 'না, কিন্তু ওকে আমি দেখেছি।'

'দেখেছ? কোথায়?'

'আপনার অফিসঘরে।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি ছিলে সেদিন। এর নাম কঙ্কাবতী আর এ সায়ন। জানো কঙ্কাবতী, সায়ন খুব বিখ্যাত হয়ে গেছে এখানে। তার ধকল সামলাতে আমাকে হিমসিম খেতে হয়েছে। ও নীচের ঝোরার গায়ে মেরির মূর্তির পাশে উঠে মোমবাতি জ্বালিয়েছিল। তখন নাকি পথচলতি লোকজন দেখতে পায় মেরি ওকে আশীর্বাদ করছেন। ব্যস। পরদিন থেকে আমার এখানে মানুষের ভিড় হতে শুরু করল। সবাই ওকে দেখতে চায়। যে মেরির আশীর্বাদ পেয়েছে সে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। আমি যত বলি সায়ন একজন সাধারণ মানুষ তবু কেউ বিশ্বাস করবে না। যে অন্ধ হতে চায় তাকে তুমি দেখাবে কী করে? শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে ভিড় সরাল। এখনও কিছু লোক নিরাময়ের সামনে এসে অপেক্ষা করে যদি সায়নকে দেখতে পায়। জানি না তাদের ভয়ে সায়নবাবু ঘর থেকে বের হচ্ছে না কিনা।' ডাক্তার হাসলেন।

সায়ন চুপচাপ শুনছিল। তার শরীর এখনও দুর্বল। এই রক্তপাত তাকে খুব ধাক্কা দিয়েছে। একেবারে বিনা কারণে তার শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। বিকেলে যে হেঁটে অতটা দূর যেতে পারে সে নিশ্চয়ই অসুস্থ ছিল না। তাহলে রক্ত পড়ল কেন? এ ঘটনা বলে দিচ্ছে সে যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন অমনই বিনা নোটিসে শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে আসবে, অসুস্থ হয়ে পড়বে। এই সত্যিটা তাকে ক্রমশ গিলে ফেলছে। কোনও কিছু ভাবতেই আর ভাল লাগে না এখন।

'তোমার মা তো সকালে এসেছেন?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ।'

'কদ্দিন থাকছেন ওরা?'

'আগামীকাল চলে যাবেন।'

'ও, তাই তোমার মন খারাপ?'

সায়ন জবাব দিল না। মা চলে গেলে তার নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে কিন্তু তার চেয়ে বেশি খারাপ লাগছে নিজের মনের জোর চলে যাওয়াতে।

'আপনি আমাকে কোনও কারণে ডেকেছিলেন?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল।

'ডেকেছিলাম? ও হ্যাঁ, কঙ্কাবতী নতুন এসেছে, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে ডেকেছিলাম। কিন্তু তুমি তো ঘরেই ঢুকছ না।'

সায়ন কঙ্কাবতীর দিকে তাকাল, 'পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?' কঙ্কাবতী প্রথম কথা বলল।

'না। এখন ভাল আছি।' তারপর হাসল, 'আমি এখানে এতদিন আছি কিন্তু ভাল করে নেপালি বলতে পারি না। তোমার কাছে নেপালি শেখা যাবে। আচ্ছা!'

মাথা নেড়ে সায়ন চলে গেল তার ঘরের দিকে। ডাক্তার কিছু বললেন না। সায়নের এই পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো। উৎসাহ হারিয়ে ফেলা মানুষদের অসুখ চেপে ধরে। লড়াই করার ক্ষমতা দ্রুত কমে যায়। এটা ভাল নয়। কিন্তু এখনই সায়নকে প্রশ্ন করলে কিছুই জানা যাবে না।

মারুতি ট্যাক্সিটা নিরাময় পেরিয়ে ওপরে উঠতে গিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। নেপালি ড্রাইভার মুখ বের করে চারপাশে তাকাল। তারপর কাউকে না পেয়ে আবার অ্যাকসিলেটারে চাপ দিল। গাড়িটা বাঁক নিয়ে ওপরে উঠতেই ম্যাথুজের কসাইখানার সামনে পৌঁছোল। ম্যাথুজ আজ অনেকদিন পরে দোকান খুলেছে। না আজ কোনও মাংস সে কাটেনি। বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকা দোকানের নোংরা পরিষ্কার করছিল সে। ড্রাইভার তাকে নেপালিতে জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার ব্রাউনের বাড়িটা কোথায়?'

ম্যাথুজ দেখল লোকটা এই অঞ্চলের নয়। গাড়ির পেছনে একজন মেমসাহেব বসে আছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোত্থেকে আসছ?'

'বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে। কেন?'

'এদিকের ড্রাইভার হলে ওকে চিনতে।' কথাটা বলতে গিয়ে নজরে পড়ল সিমি ওপর থেকে নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে গেল ম্যাথুজ।

'খুব বিখ্যাত লোক মনে হচ্ছে। বাড়িটা কোথায়?'

ম্যাথুজ সিমির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এরা ব্রাউনের বাড়িতে যাবে, তুমি একটু চিনিয়ে দাও।' সিমি আড়চোখে ম্যাথুজকে দেখে ড্রাইভারকে ইশারা করল গাড়ি ঘোরাতে। ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিলে সে সামনে হাঁটতে লাগল। ম্যাথুজ লক্ষ করল সিমি তার দিকে তাকাল না, কথা বলা তো দূরের কথা।

ব্রাউনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিমি মাথা নেড়ে ইশারায় বোঝাল এই সেই বাড়ি। ট্যাক্সিওয়ালা মুখ ফিরিয়ে খবরটা জানিয়ে দিতেই পেছনের দরজা খুলল। সিমি দেখল একজন বয়স্কা মহিলা ট্যাক্সি থেকে নামলেন। বয়স হয়েছে কিন্তু কী সুন্দর ফিগার ভদ্রমহিলার। মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি চারপাশে তাকালেন। তাঁকে বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। এই সময় ভুট্টোর গলা শোনা গেল। ওপাশ থেকে ডাকতে ডাকতে গেটের কাছে এসে সিমিকে দেখে একটু থমকাল সে। সিমি জিভে শব্দ করল। ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন, 'তুমি ইংরেজি বুঝতে পারো?'

সিমির হাসি পেয়ে গেল। এই পাহাড়ের ক্রিশ্চান সম্প্রদায়ের জন্যে ইংরেজি বুঝতে কারও অসুবিধে নয়। অনেকেই ভাষাটা বলে ভাল। সে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

'তুমি কি জানো মিস্টার ব্রাউন এখনও এই বাড়িতে থাকেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'উনি সুস্থ আছেন তো?'

'কাল পর্যন্ত তো সুস্থই দেখেছি। আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'ইউ এস এ।'

দেশের নামটা শোনামাত্র সিমি একবার তাকাল। তারপর গেট খুলে ভেতরে ঢুকে ব্রাউনের বন্ধ দরজায় শব্দ করল। ভুটো গেট খোলা পেয়ে আবার গর্জন শুরু করেছে। ভদ্রমহিলা দূর থেকে জিভে আওয়াজ তুলে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। ভেতর থেকে ব্রাউনের ভরাট গলা ভেসে এল, 'ভুটো চুপ। চুপ কর।'

দরজা খুললেন ব্রাউন, 'ও তুমি। তোমাকে দেখে ও চেঁচাচ্ছে কেন ?'

'আমাকে দেখে নয়। একজন গেস্ট এসেছেন।'

'গেস্ট ?' ব্রাউন বেরিয়ে এলেন ঘেরা বারান্দায়। তখনই তাঁর নজরে পড়ল। চিঠিটা তাঁকে সাহায্য করল। নইলে তিরিশ বছরের ধুলো ঘেঁটে ঠিকঠাক পৌঁছোতে পারতেন কিনা সন্দেহ। সহাস্যে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে ! কী আশ্চর্য !'

ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'আমি এলিজাবেথ। ভেতরে আসতে পারি ?'

'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। হোয়াট এ সারপ্রাইজ। আমি চিঠিটা পেয়েছিলাম কিন্তু ভাবতে পারিনি আপনি সত্যি সত্যি আসবেন। দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন ব্রাউন। সিমি দেখল ভদ্রমহিলা, যিনি নিজেকে এলিজাবেথ বললেন, স্বচ্ছন্দে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসা ব্রাউনকে জড়িয়ে ধরলেন। নেপালিদের তুলনায় ব্রাউন যেমন লম্বা তেমন তাঁর ভারী শরীর। ভদ্রমহিলা ব্রাউনের কপালের কাছাকাছি। এইভাবে প্রকাশ্যে দুজন নারীপুরুষ এই পাহাড়ে কখনই আলিঙ্গনাবদ্ধ হয় না। দুজনের বয়সের কথা মনে রাখলেও ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ হল না সিমির। সে মুখ নিচু করে ওদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আলিঙ্গন মুক্ত হয়েই ব্রাউন সেটাকে লক্ষ করলেন। তিনি ডাকলেন, 'সিমি, কাম হিয়ার। লিজা, এ হচ্ছে সিমি, মাই লেটেস্ট গার্ল ফ্রেন্ড।'

এলিজাবেথ হেসে বললেন, 'ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার গার্ল ফ্রেন্ড আমাকে দেখে খুশি হয়নি।'

ব্রাউন কপটভঙ্গি করলেন, 'ইজ ইট ? না, না, সিমি খুব ভাল।' তারপর ব্রাউন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেন এলিজাবেথের জিনিসপত্র ঘরের মধ্যে এনে দিতে। এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে ফোন করলেই ট্যাক্সি পাওয়া যায় তো ?'

ব্রাউন বললেন, 'ট্যাক্সি পেতে হলে নীচের রাস্তায় যেতে হবে। আমার বাড়িতে ফোন নেই। ফোনের তো কোনও দরকার পড়ে না।'

'তাহলে ট্যাক্সিটাকে রেখে দিলেই হয়। আমি সারাদিনের জন্যে কন্ট্রাক্ট করেছি।'

'তাই নাকি ?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করে এখানকার কোনও ভাল হোটেলে চলে যেতাম।'

'এখানে তো ভাল হোটেল নেই। সেটা আছে ঘণ্টাখানেক দূরে দার্জিলিঙে। তবে এখানে একটা ভাল ট্যুরিস্ট লজ আছে। সেখানে পৌঁছোতে কোনও সমস্যা হবে না।'

এলিজাবেথ ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেন। জিনিসপত্র ভেতরে পৌঁছে দিয়ে ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি নিয়ে নেমে গেল। ঢোকার মুখে ভুটো আবার তার আপত্তি জানাল। ব্রাউন একটা চেন তুলে বেঁধে রাখার ভয় দেখাতে সে চুপ করল।

সিমি বলল, 'আমি একটু পরে আসছি।'

ব্রাউন বললেন, 'ঠিক আছে। কিন্তু একবার এসো।'

ভেতরে ঢুকে যিশুর ঘরের সামনে দাঁড়াতেই এলিজাবেথ স্থির হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে বললেন, 'বাঃ, কী সুন্দর !'

ব্রাউন বললেন, 'যিশু আপনার মঙ্গল করুন।'

এলিজাবেথ মাথা ঝুঁকিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি সবসময় আমাকে রক্ষা করেন।'

ব্রাউনের ডাইনিং কাম সিটিং রুমের চেয়ারে বসে এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনও ইন্ডিয়ানের বাড়ির ভেতর আমি এই প্রথম ঢুকলাম। আর সবাই কোথায় ?'

'ছেলেমেয়েরা যে যার জায়গায় কাজকর্ম করছে।'

'আপনার স্ত্রী ?'

'মিসেস ব্রাউন অনেক দিন আগে আমাকে ছেড়ে যিশুর কাছে চলে গিয়েছেন।'

'ওঃ।'

'আমি একাই থাকি। কোনও অসুবিধে নেই। এখন বলুন তো, আমাকে আপনি এত দিন ধরে মনে রাখলেন কী করে ?'

'ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক লাগছে, তাই না ?'

'আপনার চিঠি পেয়ে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম।'

'চিনতে পেরেছিলেন ?'

'একটু ধন্দ লেগেছিল প্রথমে, তারপর— ! হ্যাঁ, তিরিশ বছর তো কম সময় নয়।'

'আপনি অনেক মোটা হয়ে গিয়েছেন। চুল কমে গিয়েছে। কিন্তু হাসি, কথা বলার ধরন একই রয়েছে। আপনার ওজন কমানো উচিত।' এলিজাবেথ ভ্রূভঙ্গিতে হাসলেন।

ব্রাউন হেসে বললেন, 'আপনি কিন্তু একইরকম রয়েছেন। তিরিশ বছর আগে আপনার শরীর যেমন ছিল এখনও তেমন।'

'ও ভগবান !' এলিজাবেথ চোখ বন্ধ করলেন, 'পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছি কবে ! যাকে বলে বুড়ি তাই এখন আমি। আপনার কথা কেন মনে পড়ল বলুন তো ?'

ব্রাউন উৎসুক হয়ে তাকালেন।

'সেদিন টিভিতে একটা ছবি দেখাচ্ছিল। একটি আমেরিকান মেয়েকে কুমিরের হাত থেকে বাঁচাল জাপানি ছেলে। এরকম ছবি তো কতই হয়। কিন্তু সেই জাপানি ছেলেটার দিকে তাকাতেই আপনার কথা মনে পড়ে গেল। আপনার মনে আছে, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি চিনা না জাপানি ? তখন এত বোকা ছিলাম যে কোনও পার্থক্য বুঝতে পারতাম না।'

'মনে পড়েছে।'

'বলেছিলেন আপনি ইন্ডিয়ান। তবে নেপালি। নেপালিদের মুখের সঙ্গে জাপানি বা চাইনিজদের সামান্য মিল আছে। কারণ সবই মঙ্গোলিয়ান মুখ। না, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছুই মনে নেই !'

'বড় অস্পষ্ট, তবে আপনি যখন বলছেন তখন একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল সমুদ্রের ধারে।'

'কীভাবে হয়েছিল।'

'তখন সন্ধের মুখ। দুটো মেক্সিকান আপনার হাত ধরে টানছিল। আর আপনি ভয়ে হেল্প হেল্প বলে চিৎকার করছিলেন। আশেপাশের কেউ সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিল না। আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল।'

'খুব মেরেছিলেন লোক দুটোকে। তারপর আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তখন জেনেছিলাম আপনি নাবিক। নাবিকদের আমরা পছন্দ করতাম না। কারণ শুনেছিলাম প্রতিটি বন্দরে একটা করে বউ থাকে। কিন্তু পৌঁছে দেওয়ার সময় আপনি একবারও আমার হাত ধরেননি। মাকে বলতে তিনি আপনাকে বসতে বললেন। আপনারা সেই রাতটা ওখানে থাকবেন বলেছিলেন। মা তাই ডিনার খেয়ে যেতে বলেছিলেন। আপনি রাজি হননি। তখন আমি আপনার ঠিকানা চেয়েছিলাম। আপনি বলেছিলেন এই পাহাড়ের গ্রামে আপনার যে ছোট বাড়ি সেটাতে বেশি দিন থাকবেন না। তবু লিখে দিয়েছিলেন। চলে যাওয়ার সময় আমি আপনাকে একটা ফুল দিয়েছিলাম। টিউলিপ।'

'ইয়েস। মনে পড়ছে।' ঝট করে তিরিশ বছর আগে চলে গিয়েছিলেন ব্রাউন। তিনি তখন বিবাহিত। সন্তানের জনক। সুন্দরী একজন আমেরিকান মহিলাকে উদ্ধার করা কর্তব্য ছিল। ওদের আতিথ্য ভাল লেগেছিল, এই মাত্র।

এলিজাবেথ বললেন, 'খুব ভাবতাম আপনার কথা। আমার পরিচিত কোনও ছেলে অমন ভদ্র ব্যবহার করেনি। আমাকে নরম দেখলেই তারা হাত বাড়িয়েছে। পার্থক্য ছিল বলেই মনে পড়ত।

চিঠি লিখতে ইচ্ছে করত। কিন্তু আপনি কবে দেশে ফিরবেন জানতাম না। তা ছাড়া আপনি যদি বিবাহিত হন ? সেই আশঙ্কাও ছিল। তার কিছু দিন বাদে বব-এর সঙ্গে আলাপ এবং বিয়ে। তখন সব ভুলে গেলাম।'

'বব কেমন আছেন ?'

'জানি না। আমরা পাঁচ বছর ঘর করে বুঝলাম কেউ কাউকে মানতে পারছি না। আলাদা হলাম। দ্বিতীয়বার বিয়ে করি বছর খানেক বাদে। সেই বিয়ে অনেক কাল টিকল। আমার দুই ছেলে। তারা কলেজ শেষ করে যে যার মতো আছে। আমার দ্বিতীয় বরের নাম আর্নল্ড। বেচারা বছর তিনেক হল ক্যানসারে মারা গিয়েছে। তারপর থেকে আমি একা। হঠাৎ ওই ছবিটা দেখে মনে পড়ে গেল আপনার কথা। সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ডায়েরিগুলো ঘাটতে লাগলাম। প্রায় চল্লিশ বছরের চল্লিশটা ডায়েরি আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে। পেয়ে গেলাম আপনার ঠিকানা। খুব কৌতূহল হল। ট্র্যাভেল এজেন্টের কাছে খবর নিয়ে জানলাম এটা ইন্ডিয়ার ইস্টার্ন রিজিওনে পড়ে। কাছাকাছি বড় শহর কলকাতা এবং তার ভাল হোটেলের নাম গ্র্যান্ড। আমার টাকার অভাব নেই এখন। ভাবলাম বেরিয়ে পড়ি। তাই হোটেল বুক করে একটা চিঠি লিখলাম আপনাকে। আপনি বেঁচে আছেন কিনা তাই তো জানতাম না। তবু চলে এলাম।'

'এসে যদি শুনতেন আমি মারা গিয়েছি অনেক আগে।'

'তা হলে আপনার কবরের ওপর ফুল রেখে ফিরে যেতাম।'

'আপনি কি জানতেন আমি ক্রিশ্চান ?'

'বাঃ আপনার নামেই তো সেটা বোঝা যায় !'

'তা বটে।' ব্রাউন উঠলেন, 'অনেক কথা বলা হয়েছে। কী খাবেন বলুন ? চা না কফি ? কোল্ডড্রিঙ্কস আমার বাড়িতে নেই।'

'কফি। কিন্তু বানাবে কে ?'

'আমি। ব্ল্যাক না রেগুলার ?'

'ব্ল্যাক। উইদাউট সুগার।'

ব্রাউন তাঁর কিচেনে চলে গেলেন। গ্যাসে জল বসিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই নজরে পড়ল পাহাড়ের বাঁকে দোকানের পাশে ম্যাথুজ দাঁড়িয়ে আছে দু হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে। ওর মুখ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু মনে দুঃখ প্রবল না হলে মানুষ ওই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ছেলেটার কী হল ?

কফি করে একটা ট্রেতে বিস্কুটের সঙ্গে নিয়ে এলেন ব্রাউন।

এলিজাবেথ বললেন, 'ধন্যবাদ। কিন্তু আপনারটা ?'

'সরি ম্যাডাম। আমি এই বিকেলে কফি খাই না।'

'তা হলে আমার জন্যে কষ্ট করলেন কেন ?'

'এত দূরে এসেছেন, ঠাণ্ডায় কফি ভাল লাগবে। আপনাদের ওখানে তো ঠাণ্ডা পড়ে না। এখানে আমরা খুব শীত পাই।'

'সেটা এখন বুঝতে পারছি।'

'আপনি কবে কলকাতায় এসেছেন ?'

'গতকাল।'

'ওঃ। তা হলে তো আপনি খুব পরিশ্রান্ত।'

'মোটেই নয়। আই অ্যাম ফাইন।' কফির কাপে চুমুক দিল এলিজাবেথ। কফি খাওয়া হয়ে গেলে ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কত দিন এদিকে থাকবেন বলে ভেবেছেন ?'

'আই ডোন্ট নো।' এলিজাবেথ হাসলেন।

'আমি কাউকে ট্যাক্সি ডাকতে পাঠাই। একটু পরে অন্ধকার নেমে গেলে ট্যুরিস্ট লজে যেতে অসুবিধে হবে।'

'বেশ তো।'

ব্রাউন বের হলেন। আকাশ আজ পরিষ্কার। পশ্চিম দিকটায় সূর্যদেব এখনও রয়েছেন। পুবের পাহাড়গুলোয় গাঢ় নীল ছায়া জমছে। একটু বাদেই গাছগুলো সুস্থির হয়ে যাবে। এলিজাবেথ পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'বিউটিফুল'।

'হ্যাঁ। আমাদের জায়গাটা সুন্দর।'

'আচ্ছা, আপনার এখানে দ্বিতীয় শোওয়ার ঘর নেই ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তা হলে ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?'

'আপনি ট্যুরিস্ট লজে যাবেন— ?'

'আমি এখানে থাকলে আপনার কোনও অসুবিধে হবে ?'

অবাক হয়ে তাকালেন ব্রাউন, 'আমার এখানে ?'

'হ্যাঁ। এক্সট্রা বেডরুম নেই এ বাড়িতে ?'

'অবশ্যই আছে। কিন্তু আমি একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে আছি। একা থাকি, যেটুকু না হলে চলে না সেইটুকুই করি। এখানে আপনার খুব অসুবিধে হবে। মানে যে ধরনের বেডরুম এবং টয়লেটে আপনারা অভ্যস্ত— ।'

ব্রাউনকে থামিয়ে দিলেন এলিজাবেথ, 'দেখাই যাক না। অসুবিধে হলে অন্য কোথাও যাওয়া যাবে। আসলে এখানে থাকলে আপনার সঙ্গ পাওয়া যাবে। আপনি নিশ্চয়ই ওই ট্যুরিস্ট লজে থাকতে চাইবেন না।'

ব্রাউন বেশ ফাঁপড়ে পড়লেন। তিনি একা থাকেন। একজন বিদেশিনী তাঁর বাড়িতে আছেন একথা জানাজানি হলে তাঁর কিছু এসে যাবে না। লোকে তাঁকে জানে, শ্রদ্ধা করে। তা ছাড়া যে বয়সের মানুষকে নিয়ে ওসব জল্পনা তৈরি হয় সেই বয়সটাকেও তিনি পেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাঁর এই ছন্নছাড়া জীবন এলিজাবেথ থাকলে বিপন্ন হবেই। ওপাশের ঘরের লাগোয়া বাথরুমে আধুনিক সব ব্যবস্থা আছে। মুশকিল হবে ওঁর খাওয়া-দাওয়া নিয়ে। আমেরিকান খাবারের কাছাকাছি কিছু তিনি কী করে ব্যবস্থা করবেন ?

'কী ভাবছেন ?'

'আপনাকে কী খাওয়াব তাই ভাবছি।'

'কম মশলা দেওয়া যে কোনও খাবার আমার চলবে। আরে মশাই, হাজার হোক আমি একজন মহিলা। পৃথিবীর প্রথম দিন থেকেই মহিলারা পরিস্থিতির সঙ্গে আগে মানাতে পেরেছে।'

'তা হলে তো কোনও সমস্যাই রইল না।' কথাটা বলেই ব্রাউন লক্ষ করলেন সিমি উঠে আসছে। এলিজাবেথ নিচু গলায় বললেন, 'আপনার গার্ল ফ্রেন্ড !'

ব্রাউন মন্তব্য করলেন না। সিমি কাছে আসতেই তিনি বললেন, 'তোমাকে একটু উপকার করতে হবে। ইনি এখানে কিছু দিন থাকবেন। ওঁর জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি ম্যাথুজকে বলো আজকের ডিনারটা ট্যুরিস্ট লজ থেকে নিয়ে আসতে। কন্টিনেন্টাল ডিনার।' কথাগুলো ইংরেজিতে বললেন ব্রাউন।

সিমি নেপালিতে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি এখানে থাকবেন কেন ?'

ব্রাউন অস্বস্তিতে পড়লেন। এলিজাবেথের সামনে নেপালিতে কথা বলা সঙ্গত নয় জেনেও সিমি প্রশ্নটা করল। তিনি হাসার চেষ্টা করলেন, 'উনি আমার খুব পুরনো বন্ধু। আমার অতিথি।'

অতিথি শব্দটা শুনে চোখ নামাল সিমি।

এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'সিমি, তুমি কত দূরে থাকো ?'

'বেশি দূরে নয়।' সিমির মুখ এখনও গম্ভীর।

'আচ্ছা, দোকান থেকে খাবার না আনিয়ে আমরা তো বাড়িতেই কিছু বানিয়ে নিতে পারি। পারি না ?' এলিজাবেথ প্রশ্নটা করলেন।

'আপনি কী খাবেন বলুন আমি চেষ্টা করছি বানিয়ে দিতে।'

সিমি কথাটা বলতেই উচ্ছ্বসিত হলেন ব্রাউন, 'বাঃ খুব ভাল হল। সিমি যখন সাহায্য করতে

চাইছে তখন কোনও চিন্তা নেই। দাঁড়াও, আসছি।'

ভেতরে ঢুকে গেলেন ব্রাউন। আলমারি খুলে টাকা বের করলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল নিজের জন্যে তিনি কখনওই এমন ব্যস্ত হতেন না। আর একটা মানুষ এ বাড়িতে থাকলে তাঁকে ব্যক্তিগত ইচ্ছে অনিচ্ছে চেপে রাখতে হবে। এই যে একটু বাদে তিনি পান করতে বসবেন এবং সেই সঙ্গে টিভি দেখবেন সেটা কি সম্ভব হবে? ব্রাউনের মনটা ভারী হয়ে গেল।

সিমিকে টাকাগুলো দিয়ে ব্রাউন বললেন, 'তোমাকে শহরে যেতে হবে না। একটু আগে দেখলাম ম্যাথুজ ওর দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ডেকে আনো, আমি বললে ও নিশ্চয়ই বাজার করে এনে দেবে।'

সিমি তাকাল। একমুহূর্ত ভাবল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন ব্রাউন। ঠিক সেই সময়ে ম্যাথুজ ওপর থেকে নেমে আসছিল। কোটের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে গম্ভীর মুখে পা ফেলছিল।

ব্রাউন বললেন, 'গুড আফটারনুন ম্যাথুজ। তোমার কথাই বলছিলাম।'

ম্যাথুজ দাঁড়াল। কিন্তু কোনও কথা বলল না।

'এঁর নাম এলিজাবেথ। এ হল ম্যাথুজ।'

ম্যাথুজ বলল, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ।'

এলিজাবেথ মাথা নেড়ে হাসলেন।

ব্রাউন বললেন, 'তোমার দোকানটা এবার খোলো। আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। এই ভদ্রমহিলা আমার কাছে এসেছেন। ওকে ভালমন্দ খাওয়াতে এখনই শহরে যাওয়া দরকার। তোমার দোকান খোলা থাকলে চিন্তা করতে হত না।'

ম্যাথুজ বলল, 'আমি কি কোনওভাবে সাহায্যে লাগতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। সিমি রান্না করে দেবে বলেছে। ও ঠিক কী কী জিনিস চাইছে তা যদি তুমি শহর থেকে এনে দাও তা হলে আমি খুশি হব।' ব্রাউনের হাত থেকে টাকা নিয়ে ম্যাথুজ জিজ্ঞাসা করল, 'কী কী আনতে হবে?'

সিমি বলল, 'আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াও। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি।' সিমি নেমে গেল দ্রুত। ম্যাথুজ বলল, 'আমি আসছি।'

ব্রাউন বললেন, 'ফেরার সময় হাঁটার দরকার নেই। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিও।'

ম্যাথুজ ধীরে ধীরে নামতে লাগল।

রোদ চলে যাচ্ছে দ্রুত। পাহাড় ছায়ায় মাখামাখি। ব্রাউন বললেন, 'এখানে হঠাৎই অন্ধকার নামে আর তখনই ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করে। চলুন, ভেতরে যাই।'

এলিজাবেথকে যে ঘরটা দেখিয়ে দিলেন ব্রাউন সেটা একসময় তাঁর স্ত্রীর ঘর ছিল। ব্যবহার করা না হলেও সেটা দিব্যি পরিষ্কার রয়েছে। বিছানার চাদর পাল্টে লেপ বের করে দিলেন তিনি। স্যুটকেসগুলো এই ঘরে নিয়ে যেতে তাঁকে হাঁসফাঁস করতে হল। তারপর বললেন, 'একটু মানিয়ে নিন। বাথরুমে হিটার আছে। জল গরম করে নেবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ।' এলিজাবেথ দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন।

ব্রাউন চলে যাচ্ছিলেন, এলিজাবেথ ডাকলেন, 'মিস্টার ব্রাউন'।

ব্রাউন ঘুরে দাঁড়ালেন।

'আমি এখানে থেকে গেলাম বলে আপনার কোনও অসুবিধে হল না তো?'

'না-না।'

'ওই মেয়েটির মুখ বলছে ও পছন্দ করেনি।'

'ও আমার নাতনির মতো। খুব ভাল মেয়ে।'

'এই দেখুন, আপনার কুকুরটাও আমাকে অপছন্দ করছে।'

'কাল থেকেই ও আপনার ফ্যান হয়ে যাবে।'

'দেখা যাক। হ্যাঁ, একটা কথা, আপনি রোজ যেভাবে কাটান ঠিক সেভাবেই থাকুন। আমার

জন্যে নিজের কোনও অভ্যেস পাল্টাবেন না।'

'ধন্যবাদ।' ব্রাউন ঘুরে দাঁড়াতেই শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন এলিজাবেথ। এই ঘরে কোনও কার্পেট নেই। এই প্রথম মেঝেতে পা রাখলেন তিনি। একটু অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর।

প্রার্থনা সেরে যিশুর ঘর থেকে বেরিয়ে ব্রাউন দেখলেন এলিজাবেথের ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। তিনি তাঁর পানীয় নিয়ে বসলেন। আজ মনে হল এই দিশি পানীয়ে একটু বেশি রকমের টকটক গন্ধ। এলিজাবেথ নিশ্চয়ই অপছন্দ করবেন। কিন্তু কিছু করার নেই। উনি বলেছেন ওঁর জন্যে কোনও অভ্যেস না পাল্টাতে। টিভিটা খুললেন। মনীষা নাচছে। গ্লাসে চুমুক দিলেন আরাম চেয়ারে বসে। এই সময় দরজা খোলার শব্দ হল। গ্লাস হাতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই ব্রাউনের নিঃশ্বাস থমকে গেল এক লহমার জন্যে।

২১

অদ্ভুত লাজুক হাসলেন এলিজাবেথ, 'ওমা, ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন ?'

সচেতন হলেন ব্রাউন, 'না না।' মাথা নাড়লেন তিনি, 'কিছু নয়।'

'আমাকে নিশ্চয়ই খুব খারাপ দেখাচ্ছে না ?' এলিজাবেথ এগিয়ে এলেন।

'না না, নিশ্চয়ই না। কিন্তু আপনার ঠাণ্ডা লাগতে পারে। আমার এই বাড়ি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নয়। রাত যত বাড়বে ঠাণ্ডা তত।'

'দেখা যাবে তখন। আপনি টিভিতে কোনও বিশেষ প্রোগ্রাম দেখছেন ?'

'না না। জাস্ট, ওটা চালিয়ে বসে থাকি।'

এলিজাবেথ টিভির পর্দায় চোখ রাখলেন। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে কোমর দুলিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচছে। আর তার মধ্যেই ওদের পোশাক পাল্টে যাচ্ছে। এই পাহাড়ে আবার পরক্ষণেই সমুদ্রের ধারে ওরা নেচে যাচ্ছে। হঠাৎ কোত্থেকে একদল নারীপুরুষ বেরিয়ে এসে পেছনে একই ভঙ্গিতে নাচ শুরু করতেই এলিজাবেথ হো হো করে হেসে উঠলেন। ব্রাউন হকচকিয়ে গিয়ে টিভি বন্ধ করে দিলেন।

হাসি থামিয়ে এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইন্ডিয়ার ইয়ং জেনারেশন ওইভাবে নাচে বুঝি ? পাহাড় থেকে নাচতে নাচতে সমুদ্রে ? কিন্তু অত দলবল নিয়ে ওরা নাচে কেন ?'

ব্রাউন বললেন, 'ওটা সিনেমা। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি। জীবনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।'

'রূপকথার গল্প বলে তো মনে হল না ?'

ব্রাউন বাধ্য হলেন বলতে, 'এসব দেখে ইন্ডিয়াকে ভুল বুঝবেন না।'

'কিন্তু আমি ইন্ডিয়াকে বুঝতে চাই। টিভি তো তাতে সাহায্য করবে।'

'এগুলো কমার্শিয়াল ফিল্ম। আপনি বসুন।'

'বিয়ার খাচ্ছেন ?'

'বিয়ার ? না না। এটা কান্ট্রি লিকার। একেবারে দেশীয় প্রথায় তৈরি।'

'দেশীয় প্রথা ? আমি এক গ্লাস পেতে পারি ?'

'না না। আপনার খুব খারাপ লাগবে।'

'কেন ?'

'একটু টকো গন্ধ আছে।'

'একবার চেষ্টা করে দেখি।'

অগত্যা ব্রাউন আর একটি গ্লাস নিয়ে এসে ভর্তি করে এলিজাবেথকে দিলেন। গ্লাস নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে শুঁকলেন এলিজাবেথ। তাঁর মুখচোখ বিকৃত হল। অস্ফুটে বললেন, 'টেরিব্‌ল।'

'আপনি রেখে দিন।' ব্রাউন হাসলেন।

'আপনি যখন খাচ্ছেন তখন আমি একটু খেয়ে দেখি!' বলে এলিজাবেথ বাঁ হাতে নাক টিপে চোঁ চোঁ করে গ্লাসটা খালি করলেন। তারপর বমি করার মতো একটা শব্দ করে ভেতরে ছুটে গেলেন। ব্রাউন কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এই বস্তু খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীরও তীব্র আপত্তি ছিল। অথচ ডাক্তার তামাং এমন মুখ করে খান যেন অমৃত পান করছেন। এখন এটা খেয়ে যদি এলিজাবেথ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে ?

দু পা এগিয়ে গিয়ে ব্রাউন ডাকলেন, 'এলিজাবেথ ?'

কয়েক সেকেন্ড বাদে এলিজাবেথ বেরিয়ে এলেন, 'সরি! কী ভয়ঙ্কর জিনিস। আপনি ওটা খান কী করে ?'

'অভ্যেস। প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগে, পরে সেটা চলে যায়।'

'আমার কাছে সিভ্যাস রিগ্যাল আছে। ওটা দিচ্ছি আপনাকে।'

'সরি। বিদেশি মদ, মানে স্কচ আমার আলমারিতে আছে। কিন্তু ওতে আমার ঠিক সুবিধে হয় না। পাঁচ পেগ স্কচ দু ঘণ্টায় খেয়ে ফেললে নেশা হয়ে যায়। অথচ এই জিনিস তিন ঘণ্টা ধরে খেয়েও আমি প্রেয়ার করতে পারি, মৌজও হয়।' ব্রাউন হাসলেন।

এই সময় দরজায় শব্দ হল। ব্রাউন দরজা খুলে দেখলেন ম্যাথুজ দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে লিস্ট আর অন্য হাতে শপিং ব্যাগ। এখন রাত। পাহাড়ে অন্ধকার নেমে গেছে। ব্যাগটা হাত বদল করে ম্যাথুজ বলল, 'লিস্টটা দিয়ে সিমি বলল ওর শরীর খারাপ লাগছে। তাই রোস্টেড চিকেন স্যালাড আর ব্রেডরোল নিয়ে আসতে। ওর পক্ষে রান্না করা সম্ভব হবে না। আমি তাই এনেছি। আর এই লিস্টের জিনিসগুলো।'

'কী এগুলো ?'

'ড্রেসড চিকেন, কর্নফ্লেক্স, ডিম, রুটি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাথুজ।'

ম্যাথুজ মাথা নেড়ে অন্ধকারে নেমে গেল। দরজা বন্ধ করার আগে তিনি সিমির কথা আর একবার ভাবলেন। মেয়েটা এমন ব্যবহার করল কেন ?

ভেতরে এসে ব্রাউন দেখলেন ওপাশের জানলা খুলে এলিজাবেথ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, 'ঠাণ্ডা লাগবে ?'

'লাগুক। কিন্তু ফ্যান্টাস্টিক। পাহাড়ের গায়ে গায়ে হিরে জ্বলছে।'

'আপনি একটা গরম কিছু গায়ে চাপান।'

জানলা বন্ধ করে এলিজাবেথ বললেন, 'আপনি বেরসিক। ওগুলো কি ওরা নিয়ে এল ? সিমি কোথায় ?'

বস্তুগুলো নিয়ে কিচেনে যেতে যেতে ব্রাউন বললেন, 'আজ রাত্রের জন্যে চিন্তা নেই।'

সামান্য শীত লাগছে এখন, এলিজাবেথ সেটাকে গ্রাহ্য করলেন না। এই অনভ্যস্ত পরিবেশে তাঁর বেশ মজা লাগছিল। এখানে আসার কথা বন্ধুদের বললে তারা তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। ভারতবর্ষ গরিব দেশ। সর্বত্র ভাল হোটেল নেই। তা ছাড়া যে লোকটাকে তিরিশ বছর আগে কিছু সময়ের জন্যে দেখেছ, কোনও যোগাযোগ রাখনি, তাকে দেখতে এত কষ্ট করার কোনও যুক্তি নেই। ভারতবর্ষের জল খারাপ, বাতাসে অসুখ ভেসে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া যার কাছে যেতে চাইছ সে হয়তো অনেকদিন আগেই মরে গেছে।

কথাগুলো সত্যি। কিন্তু ওই একই জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন এলিজাবেথ। স্বামীর মৃত্যুর পরে যখন একটু দিশেহারা অবস্থা তখন থেকে আর এক উৎপাত শুরু হল। অল্প বয়সে তাঁকে কেউ সুন্দরী বলত না। বিয়ের পর থেকে তাঁর চেহারা ভাল হতে আরম্ভ করল। এবং তখন থেকেই নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন তিনি। মেদ জমতে দেননি, মুখের এবং গলার চামড়ায় বার্ধক্যকে ডেকে আনেননি। ফলে বয়সের তুলনায় তাঁকে অনেক কম দেখায়। তাই চল্লিশের পুরুষরা যখন ঠারেঠুরে আর কেউ কেউ সোজাসুজি প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে ফেলল তখন এলিজাবেথ

বিরক্ত হলেন। ঠিক করলেন একটা বাহানা নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। কলকাতায় পৌঁছে পরিবর্তনটা চোখে পড়ল। রাস্তাঘাট মানুষ এবং তাদের বাসস্থান সম্পর্কে যেটুকু ধারণা হোটেলে যেতে যেতে হয়েছিল তাতে বুঝলেন বন্ধুরা কিন্তু বাড়িয়ে বলেনি। অর্থাভাব এবং বেনিয়মটা এখানে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রান্ড হোটেলে তাঁর জন্যে কোনও খবর অপেক্ষা করে ছিল না।

এখন এই পাহাড়ে তাঁর কিন্তু ভাল লাগছে। ব্রাউনকে দেখে তিনি খুশি হয়েছেন। মানুষটি ভাল। যাঁকে দেখতে অত দূরে এমনভাবে এলেন তিনি সুস্থ আছেন, এটাই তো অনেক পাওয়া। কিন্তু একটু আগে জানলা দিয়ে অন্ধকারে ঢাকা পাহাড়ের বুকে যে হিরে জ্বলতে দেখলেন তার সঙ্গে আমেরিকার অনেক জায়গার কোনও পার্থক্য নেই। সূর্যের আলো যদি বাস্তবকে নগ্ন করে দেয় অন্ধকার তার শরীরে আব্রু এনে দেয়। কিন্তু অন্ধকার কি স্থানকাল ভেদে আলাদা চেহারা নেয় না ? তাঁর বাড়িতে যদি হঠাৎ অতিথি আসত এবং ফ্রিজে যদি কোনও খাদ্যবস্তু না থাকত তাহলে তিনি কি প্রতিবেশীদের মধ্যে কাউকে পেতেন যাকে বলা যেত মল থেকে বাজার করে নিয়ে আসতে ? ভাবতেই পারা যায় না। সম্পর্কের মধ্যে যে দূরত্ব তাকে তো অন্ধকারই বলা যেতে পারে। নাকি মেকি ভদ্রতার আড়াল অন্ধকারের মতো সেই দূরত্বকে আব্রু পরিয়ে রাখে।

ব্রাউন ফিরে এসে নতুন গ্লাস নিলেন, 'সিমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন এলিজাবেথ, 'তাই ?' তারপর পাশে এসে বসলেন, 'কী হল ? আমাকে দিলেন না ?'

ব্রাউন অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি এই বস্তু পান করবেন ?'

'আপনার আপত্তি না থাকলে।'

'না না। আপত্তি করব কেন ? তখন তো বুঝলেন এটা একটু নিচু মানের।'

'আপনি যখন পারছেন তখন আমি না হয় চেষ্টা করে দেখি !'

ব্রাউন গ্লাস ভর্তি করে এগিয়ে দিলেন। ঘোলাটে পদার্থটিকে অনেক কসরত করে পেটে চালান করলেন এলিজাবেথ। তারপর গ্লাস নামিয়ে বললেন, 'এটা খেলে কি নেশা হয় ?'

'এক গ্লাসে হয় না। তিন চারে একটু মেজাজ আসে।'

'তার মানে আপনি নেশা করার জন্যে পান করেন না ?'

'বলতে পারেন। এটা এখন অভ্যেসে এসে গেছে। হালকা আমেজ এল, খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের জন্যে ট্যাবলেট খেতে হল না। একা থাকি, নেশা করে মাতাল হয়ে গেলে অনেক সমস্যা, বুঝতেই পারছেন।'

এলিজাবেথ ব্রাউনের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন। ব্রাউনের অস্বস্তি হচ্ছিল। পান করতে করতে তিনি বললেন, 'আপনাদের তো সন্ধেবেলায় ডিনার খাওয়ার অভ্যেস। কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার পর আর খাওয়া হয়নি। এখন খেয়ে নেবেন ?'

'আমার কোনও তাড়া নেই।'

ব্রাউনের অস্বস্তি হচ্ছিল। একা টিভি দেখতে দেখতে পান করা এক কথা আর কেউ কথা না বলে তার দিকে তাকিয়ে আছে এটা বেশ বিরক্তিকর ব্যাপার। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'চুপচাপ কেন ? কথা বলুন !'

'আপনার এই জীবন ভাল লাগে ?'

'কিছু তো করার নেই।'

'মানতে পারছি না। আপনি শারীরিক দিক দিয়ে অশক্ত হয়ে যাননি এখনও— !'

'মনের দিক দিয়ে কিছুটা তো হয়েছি।'

'কেন ?'

'হয়তো জলহাওয়ার দোষে। ভারতবর্ষের মানুষ সত্তর পেরিয়ে গেলে নিজেদের গুটিয়ে নেয়। অবশ্য রাজনৈতিক নেতাদের কথা আলাদা।'

'আপনি যদি আবার বিয়ে কবতেন তাহলে হয়তো এমন ভাবতেন না।'

ব্রাউন হাসলেন, 'ব্যাপারটা সহজ নয়।'

'মানে?'

'এ দেশের মানুষ ষাট পেরিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে চাইলে লোকে হাসবে। বিয়ের কনে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হবে। পঁচিশ তিরিশ বছরের মেয়েরা বুড়ো বলে ঠোঁট ওল্টাবে আর পঞ্চাশ পার হওয়া মহিলারা একা থাকলেও ভিমরতি হয়েছে বলে ভাববেন। ওই বয়সে বিয়ের কথা চিন্তাও করতে পারেন না তারা। আপনাদের দেশে যেটা স্বাভাবিক এটা এখানে কল্পনার বাইরে।'

ব্রাউন গ্লাসে চুমুক দিলেন।

এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার মানে এখানকার বয়স্ক মানুষেরা স্ত্রী বা স্বামী মারা গেলে খুব একলা হয়ে যান ?'

'প্রায় তাই। আগে নাতি-নাতনিদের নিয়ে ভুলে থাকা যেত। এখন ছেলেমেয়েরা দূরে দূরে চলে গেলে অন্য কিছু করার তো থাকে না।'

রাত বাড়ছিল। সেইসঙ্গে ঠাণ্ডাও। এলিজাবেথ তাঁর ঘরে গিয়ে শীতবস্ত্র জড়িয়ে নিলেন। খাবার গরম করে ব্রাউন তাঁকে ডাকলেন। ব্রাউনের পক্ষে এই খাবার নিত্য কিনে খাওয়া সম্ভব নয়। স্যালাড দিয়ে রোস্টেড চিকেন রুটির সঙ্গে খেতে চমৎকার লাগছিল তাঁর। তিনি লক্ষ করলেন এলিজাবেথ কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন না। চুপচাপ খেয়ে নিলেন তিনি।

ব্রাউন বললেন, 'রাত্রে যদি কোনও অসুবিধে হয় তাহলে আমাকে ডাকতে দ্বিধা করবেন না। আমার ঘুম খুব পাতলা।'

'অসুবিধে মানে ?'

'নতুন জায়গা। তার ওপর আপনাদের মতো আরামদায়ক নয়। আমি একটা রুমহিটার চালিয়ে দিচ্ছি। যদি বেশি গরম লাগে বন্ধ করে দেবেন।'

এলিজাবেথ দরজা বন্ধ করলে ভুটোকে খাবার দিয়ে ব্রাউন নিজের ঘরে চলে এলেন। এই নির্জন রাত্রে একজন সুন্দরী মহিলার সঙ্গে তিনি আছেন, গত রাতেও ভাবতে পারতেন না তিনি। এলিজাবেথের যে বয়স হয়েছে সেটা চট করে বোঝা যায় না। স্টার মুভিজে যেসব ছবি দেখানো হয় তাতে এমন বয়স্কা সুন্দরীদের প্রায়ই দেখা যায়। ষাট পেরিয়েও তাঁরা তাঁদের যৌবনরেখা প্রকট রাখতে পেরেছেন। নেপালি তো বটেই ভারতীয় মহিলাদের কজন সেটা পারেন অথবা পারতে চান ? বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করলেন ব্রাউন। আজ মনে হচ্ছে যেন গত পরশু ঘটনাটা ঘটেছিল। এলিজাবেথকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গল্প করে তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন মনে হয়েছিল বিয়ে না করলে তিনি ওঁর প্রেমের জন্যে কাঙাল হতে পারতেন। আর পাঁচটা জাহাজির থেকে নিজের পার্থক্য ঠিক রাখতে তিনি খুব সংযত জীবনযাপন করতেন বলে এই ভাবনাটা দ্রুত মন থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই সামান্য আলাপের সূত্র ধরে এলিজাবেথ একা এত বছর পরে তাঁর কাছে চলে এল। শুধুই কৌতূহল ! আজ হঠাৎ ব্রাউনের বুকের বাতাস ভারী হল। অদ্ভুত অস্বস্তি। না, কারও কাছে তাঁর কোনও দায় নেই। নতুন করে জীবন শুরু করলে কারও কিছু বলার নেই। মুশকিল হল যে অর্থ সঞ্চিত আছে তার সুদে বাকি জীবনটা একা কাটিয়ে দিতে তিনি পারবেন কিন্তু আর একজনের দায়িত্ব নিতে চাইলে তো সব গোলমাল হয়ে যাবে। এই বয়সে নতুন করে রোজগার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ব্রাউন নিশ্বাস ফেললেন। ঠিক তখনই বাইরের দরজায় শব্দ হল এবং ভুটো প্রবলভাবে ডেকে উঠল। এত রাত্রে কে এল ? এখানকার সবাই জানে রাত দশটার পর তিনি পানাহার করে ঘুমিয়ে পড়েন। একমাত্র কোনও খারাপ খবর থাকলে সেটা দেওয়ার জন্যে কেউ আসতে পারে। কম্বল সরিয়ে সোয়েটার পরে ব্রাউন ঘর থেকে বেরিয়ে আলো জ্বাললেন। তারপর বাইরের ঘরে দরজায় পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ?'

'আমি।' গলার স্বর সিমির।

খুব অবাক হয়ে দরজা খুললেন ব্রাউন। ভুটো চিৎকার করে যাচ্ছিল। কিন্তু সিমিকে দেখামাত্র চুপ করে গেল। সিমির হাতে একটা ক্যাসারোল। কোনও কথা না বলে ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর সেটা রেখে বলল, 'মাংস রান্না হয়েছিল, দিয়ে গেলাম।'

'এত রাত্রে ?'
'ও, খাওয়া হয়ে গেছে বুঝি ?'
'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।'
'ও। তাহলে নিয়ে যাচ্ছি।'
'না না। কষ্ট করে নিয়ে এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কেন ? ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি। কালকে খাব আমরা।'
'ঝাল আছে। তোমার মেমসাহেব খেতে পারবে তো !'
'ওহো ! দেখা যাক।'
সিমি দরজার দিকে পা বাড়াল। ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রাত্রে তুমি একা যাবে, চলো আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'
সিমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, 'আমি তো একাই এসেছি।' বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল। সিমির কথাবার্তা, ভঙ্গি খুব অচেনা মনে হচ্ছিল ব্রাউনের। দরজা বন্ধ করে ফিরে আসতেই দেখলেন এলিজাবেথ তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছেন।
'ও, আপনারও ঘুম ভেঙে গেছে তাহলে !'
'আমার এখনও ঘুম আসেনি।'
ব্রাউন ক্যাসারোলটা ধরলেন। এখনও গরম আছে। ঠাণ্ডা না হলে ফ্রিজে ঢোকানো ঠিক হবে না। বললেন, 'মেয়েটা পাগল !'
'কেন ?' এলিজাবেথ প্রশ্ন করলেন।
'নইলে এত রাত্রে কেউ খাবার পৌঁছে দিতে আসে ?'
'ও কি আপনাকে প্রায়ই খাবার এনে দেয় ?'
'তা দেয়। ও আছে বলে মাঝে মাঝে জিভের স্বাদ বদলায়। কিন্তু এখানকার সবাই জানে এই সময় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ও কখনও আগে এ সময় আসেনি।'
'আজ এল, তাই তো !'
'হ্যাঁ। খুব অবাক হয়েছি আমি।'
'আমি হইনি।'
'কেন ?'
'কোনও কোনও ব্যাপার আছে যা শুধু মেয়েরাই বুঝতে পারে !'
'সেটা কী ?'
'বোঝানো যাবে না। মেয়েলি ইনস্টিংক্ট। ধরুন ব্যাপারটা এইরকম, মেয়েরা সন্দেহ করতে খুব ভালবাসে। মনে সন্দেহ একবার ঢুকলে তাদের টেনশন বেড়ে যায়। তখন যাচাই করার জন্যে যে কোনও একটা ছুতো ঠিক খুঁজে বের করে। আচ্ছা, গুডনাইট।' এলিজাবেথ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

রাতে একবার নিত্য ঘুম ভাঙে, টয়লেটে যান, ভুটোর সঙ্গে কথা বলেন, তারপর বিছানায় ফিরে যান ব্রাউন। আজ সেসবের কিছুই হল না। ঘুম ভাঙলে দেখলেন ঘর অন্ধকার। জানলার পর্দা সরিয়ে মরা আলো দেখতে পেলেন। ঘড়িতে এখন সাতটা। ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে টয়লেটে গেলেন তিনি। পরিষ্কার হয়ে একটু কেতাদুরস্ত পোশাকে বসার ঘরে এসে দেখলেন এলিজাবেথের দরজা খোলা।
তিনি হালকা গলায় বললেন, 'গুড মর্নিং।' কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। নিজেকে অপরাধী ভাবছিলেন ব্রাউন। এর মধ্যে চা তৈরি করে দেওয়া উচিত ছিল তাঁর। হাজার হোক অতিথি। এই সময় দেখতে পেলেন বাইরের দরজা ভেজানো এবং ভুটো নেই। তিনি বাড়ির সামনে গেটে পৌঁছে ওঁদের দেখতে পেলেন। রাস্তার বাঁকে দাঁড়িয়ে এলিজাবেথ কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে আছেন। এখানকার আকাশে এখন মেঘেরা চলাফেরা করলেও কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথাটা পরিষ্কার। এরকম ঘটনা

খুব কমই ঘটে। তার চেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার, ভুটো এলিজাবেথের পায়ের কাছ ঘেঁষে চুপটি করে বসে আছে। এত তাড়াতাড়ি ও কোনও মানুষের সঙ্গে ভাব করে না। সত্যি কথা বলতে সিমি ছাড়া আর কারও সঙ্গে ভুটোর সদ্ভাব নেই। কুকুরটার নিশ্চয়ই মহিলাদের সম্পর্কে দুর্বলতা আছে।

ব্রাউন গলা তুললেন, 'গুড মর্নিং।'

এলিজাবেথ ঘাড় ঘুরিয়ে নীচে তাকালেন, 'গুড মর্নিং। ঘুম ভাঙল ?'

'হ্যাঁ। আজ একটু দেরি হয়ে গেল। রাতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো ?'

কাঁধ ঝাঁকালেন এলিজাবেথ, 'ঠিক আছে।' তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'এরকম দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি। আপনার কাছে না এলে বঞ্চিত হতাম।'

ততক্ষণে ব্রাউন পৌঁছে গেছেন কাছে। এবার মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে। ধীরে ধীরে দৃশ্যটা আড়ালে চলে গেল। এলিজাবেথ বললেন, 'যাঃ।'

ব্রাউন বললেন, 'আজকের দিনটা ভাল যাবে না।'

'কেন ?'

'এইরকম মেঘলা থাকবে। ছায়া ছায়া। মাঝে মাঝে টুপটাপ বৃষ্টি পড়বে। একেবারে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। মন খারাপ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।'

'হয়তো। কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলসে আমরা তো এমন আবহাওয়া পাই না। আপনাদের এই জায়গাটাকে আমার খুব ভাল লাগছে।' এলিজাবেথ বললেন।

'ধন্যবাদ।'

'এই রাস্তাটা কত ওপরে গিয়েছে ?'

'অনেকটা। চার্চের পাশ দিয়ে ঘুরে উল্টোদিকের পাহাড়ে পৌঁছোনো যায়।'

'আমি একটু হেঁটে আসতে পারি ?'

'অবশ্যই। কিন্তু আপনার তো এখনও চা খাওয়া হয়নি।'

এলিজাবেথ ওপরের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলেন। এই সময় তাঁকে বেশ সুন্দরী দেখাল। ব্রাউন কথাটা বলবেন কি না ভাবছিলেন এই সময় নীচের রাস্তায় সায়নকে দেখতে পেলেন। রাস্তার ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। সঙ্গে সঙ্গে তার খেয়াল হল ওর কথা তিনি একদম ভুলে গিয়েছিলেন। সায়ন সুস্থ হয়ে বাইরে বেরিয়েছে দেখে তাঁর খুব ভাল লাগল। তিনি বললেন, 'একটু ওপাশে চলুন, আপনার সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দেব। আপনার ভাল লাগবে।'

এলিজাবেথ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তিনি ?'

ব্রাউন বললেন, 'একজন ইয়ং ম্যান। কিন্তু অন্য ধরনের ছেলে।'

এলিজাবেথ ব্রাউনের সঙ্গে হেঁটে এলেন। সায়ন ওঁদের দেখতে পেল। ব্রাউনের সঙ্গে একজন শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখে সে অবাক হল। সাদা প্যান্ট আর নীল পুলওভার পরা লম্বা মহিলাটি তার মায়ের চেয়ে বয়সে অনেক বড় কিন্তু হাঁটার ভঙ্গি অনেক বেশি স্মার্ট। কাছাকাছি আসতেই সে বলল, 'গুড মর্নিং, মিস্টার ব্রাউন।'

'গুড মর্নিং, মাই সন। তুমি এখন কেমন আছ ?'

'ভাল। আপনি ভাল আছেন ?'

'আমি তো সবসময় ভাল থাকি। যিশু আমাকে খারাপ থাকতে দেন না। এই দ্যাখো, আমার খুব পুরনো বন্ধুকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইনি এলিজাবেথ, লস অ্যাঞ্জেলসে থাকেন। আর এর নাম সায়ন।'

এলিজাবেথ হাত বাড়িয়ে দিলেন। সায়ন ওঁর হাত স্পর্শ করে উত্তাপ পেল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখানে বেড়াতে এসেছেন ?'

'এসেছিলাম মিস্টার ব্রাউনকে দেখতে। সেই সুবাদে বেড়ানোও হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি কি এখানকার বাসিন্দা ? এই পাহাড়ের ?' এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন।

সায়ন মাথা নাড়ল, 'না। আমি কলকাতা থেকে এসেছি।'

এলিজাবেথ বললেন, 'তাই বলো। আমিও এইরকম অনুমান করছিলাম।'

ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীরকম ?'

'এখানকার মানুষদের মুখের গঠন গায়ের রঙের সঙ্গে চিন বা জাপানের মানুষদের খুব মিল আছে। সত্যি বলতে কী, আপনাকে যখন প্রথম দেখি তখন জাপানি বলে ভুল করেছিলাম। এখানে এসে ট্যাক্সি ড্রাইভার, যে লোকটি কাল খাবার এনে দিল, ওই মেয়েটি, এরা সবাই আপনার মতো দেখতে। এরা যে পাহাড়ের লোক তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু একে দেখতে একেবারে আলাদা। বোঝাই যায় এখানকার মানুষ নয়। আচ্ছা, তুমিও কি ক্রিশ্চান ?'

'না। জন্মসূত্রে আমি হিন্দু।'

'হিন্দু ?' এলিজাবেথ যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করলেন।

ব্রাউন বললেন, 'আপনার একটা ভুল হচ্ছে। শরীর দেখে যাদের পাহাড়ের মানুষ বলে মনে করছেন তাদের সবাই কিন্তু ক্রিশ্চান নয়।'

'তা হলে ?' এলিজাবেথ অবাক।

'বেশির ভাগই হিন্দু। খুব অল্পসংখ্যার মানুষ ক্রিশ্চান বা বৌদ্ধ। আমাদের এই পাহাড়টায় অবশ্য ক্রিশ্চানদের সংখ্যাই বেশি। কারণ অনেককাল আগে এখানকার মানুষরা একসঙ্গে ক্রিশ্চান হয়েছিল।'

'গুড মর্নিং এভরিবডি।'

ওঁরা দেখলেন ডাক্তার তাঁর নিরাময়ের গেটে এসে দাঁড়িয়েছেন। ব্রাউন চিৎকার করে গুড মর্নিং বললেন। তারপর এলিজাবেথকে নিয়ে এগিয়ে এলেন, 'ডক্টর, ইনি এলিজাবেথ, আমেরিকায় থাকেন। গতকাল আমার বাড়িতে এসেছেন। তিরিশ বছর আগে আমাদের একটু আলাপ হয়েছিল।'

ডাক্তার এলেন, 'তাই নাকি ! বাঃ ! এখানে এসে নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে না।'

'না। এখনও নয়। আচ্ছা, আপনিও তো পাহাড়ের মানুষ নন ?'

এলিজাবেথের প্রশ্নে অবাক হলেন ডাক্তার। জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ এই প্রশ্ন ?'

'আপনাকে মিস্টার ব্রাউনের মতো দেখতে নয় বলে জিজ্ঞাসা করছি।'

'ও। হ্যাঁ। বোধহয় মঙ্গোলিয়ান ধাঁচ পাহাড়ের মানুষদের ফিচার সমতলের মানুষদের থেকে আলাদা করেছে। সেটা রক্তের সূত্রে। কিন্তু আমি নিজেকে পাহাড়ের মানুষ বলে মনে করি। আচ্ছা, আপনারা যদি আমাকে একটু চা খাওয়ানোর সুযোগ দেন তাহলে কৃতার্থ বোধ করব। কয়েক মিনিটের জন্যে ভেতরে আসুন না।' ডাক্তার হাসলেন।

ওঁরা ভেতরে ঢুকলেন। ডাক্তার ডাকলেন, 'সায়ন, চলে এসো। একটু গল্প করা যাক।' আমেরিকান মেমসাহেবের কৌতূহলে সায়নের মজা লেগেছিল। সে-ও পা বাড়াল।

অফিসঘরের চেয়ারে বসে এলিজাবেথ চারপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি কোনও ক্লিনিক ?'

ব্রাউন অল্প কথায় বুঝিয়ে দিলেন নিরাময়ে কী করা হয়। ডাক্তারের ভূমিকা কী।

এলিজাবেথ হতভম্ব হয়ে গেলেন, 'আপনি একা এসব করেছেন ?'

ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'না, না। আমি একা কী করে পারব ? আমার সহকারী আছে, প্রয়োজন হলেই শহরের ট্রেইন্ড নার্সদের সাহায্য নিই। হসপিটালের ডাক্তাররাও সাহায্য করেন। আর এখন মিসেস অ্যান্টনি এসে যাওয়ায় ছেলেমেয়েদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।'

'মিসেস অ্যান্টনি ?'

'উনি পাহাড়ের মানুষ। স্বামী মারা যাওয়ার পর সময় কাটছিল না তাঁর। নিজে থেকে আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন।'

'তার মানে এখানে ডাক্তার বলতে আপনি একা ?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেইরকমই।'

'আমার মনে হয় সেটা ঠিক হচ্ছে না। আপনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। তখন পেশেন্টদের

দেখাশোনা করবে কে ? তাদের সমস্যা হবে !' এলিজাবেথ কথা শেষ করলেন না।

'সেরকম হলে লোক্যাল ডাক্তারদের সাহায্য পাব।'

'কিন্তু আপনি একা এতখানি দায়িত্ব না নিয়ে আরও কয়েকজন স্পেশালিস্টকে সঙ্গে নিচ্ছেন না কেন। একটা টিম যদি কাজ করে তাহলে সুবিধে বেশি।'

'আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু সমস্যাটা অর্থনৈতিক। এখানে যা-কিছু করেছি তা আমার চেষ্টায় এবং সঞ্চয়ে। অন্য জায়গায় পেশেন্টরা যায় কিছুদিনের জন্য, সুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে। এখানে দীর্ঘকাল থাকতে হয়। ট্রিটমেন্টের খরচও অনেক। প্রয়োজন হলে খুব দামি ইনজেকশন দিতে হয়। এদের গার্জেনদের ওপর চাপ থাকেই। আর একজন স্পেশালিস্টকে নিতে গেলে সেই চাপ আরও বাড়াতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু আপনার ব্যক্তিজীবন ?'

'না। আমার কোনও আলাদা জীবন নেই। এই নিরাময়ই আমার প্রথম এবং শেষ কথা। স্বীকার করছি অর্থের অভাবে আমাদের সমস্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে। যেসব সংস্থা আমাদের সাহায্য করেছেন তারা না করলে চালানো সম্ভবও হত না। তবু আমি হাল ছাড়তে নারাজ। দেখাই যাক না।'

'সরকারি সাহায্য পান না ?'

'না। সরকার এটাকে ব্যক্তিগত ব্যবসা মনে করেন।'

এই সময় ছোটবাহাদুর চা নিয়ে এল। চা আর বিস্কুট। সায়ন এতক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে শুনছিল। ব্রাউনের পেছনে ছিল বলে তিনি ওকে দেখতে পাননি। ছোটবাহাদুর ঢোকায় ব্রাউন ঘাড় ঘোরাতেই ওকে দেখতে পেলেন, 'আরে ! তুমি দাঁড়িয়ে কেন ? বোসো। এখানে বোসো।'

সায়ন এগিয়ে এল। চেয়ারে বসে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি এক কাপ চা পেতে পারি ?'

'অফ কোর্স।'

চায়ে চুমুক দিয়ে সায়ন এলিজাবেথের দিকে তাকাল, 'আমেরিকায় তো অনেক দেশের মানুষ বাস করছে। এ নিয়ে সমস্যা হয় না ?'

'একেবারেই যে হয় না তা বলব না। তবে আমাদের দেশের প্রতিটি স্টেট বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়। ডিফেন্সের দায়িত্ব কেন্দ্রের। ফিনান্সের একটা অংশ রাজ্যের। এ ছাড়া স্টেট নিজের আইনমতো চলে। ফলে কোনও স্টেটের মানুষ মনে করে না কেন্দ্র তাদের ওপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে। তা ছাড়া এখানে আইন এমনভাবে তৈরি যাতে প্রতিটি মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে পারে।' কথা বলতে বলতে এলিজাবেথ বারংবার সায়নের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

এইসময় বড়বাহাদুর এসে বলল, 'আপনার মা এসেছেন।'

ডাক্তার তাকালেন, 'উনি তো আজই ফিরে যাচ্ছেন ?'

সায়ন উঠে দাঁড়াল, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে ! তুমি ভিজিটার্স রুমে ওঁকে বসাও। আমি একটু বাদে যাচ্ছি।'

সায়ন চলে গেলে এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ছেলে ?'

'না।' ডাক্তার হাসলেন।

ব্রাউন গম্ভীর গলায় বললেন, 'সায়ন এখানকার পেশেন্ট।'

'মাই গড।' আঁতকে উঠলেন এলিজাবেথ, 'ওরও লিউকোমিয়া হয়েছে ?'

'হ্যাঁ। তবে ওর অসুখটার সঙ্গে লড়াই করা যাচ্ছে।'

'আমি ভাবতেই পারছি না। ওঁরকম সুন্দর ছেলে ! হায় ভগবান !'

ব্রাউন বললেন, 'সায়ন একটু আলাদা। আমি ওর মুখের দিকে তাকালে যিশুকে দেখতে পাই। ইয়েস, আই মিন ইট।'

ডাক্তার হাত নাড়লেন, 'না মিস্টার ব্রাউন। এভাবে বলবেন না। একেই তো ওই ঘটনাটা

প্রচারিত হওয়ায় আমাদের বিপদে পড়তে হয়েছে।'

এলিজাবেথ জানতে চাইলেন, 'কী বিপদ ?'

ডাক্তার সংক্ষেপে মেরির মূর্তির সামনে সায়নের মোমবাতি জ্বালার গল্পটা বললেন। এলিজাবেথ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় মিসেস অ্যান্টনি অফিসে ঢুকলেন। ডাক্তার বললেন, 'এঁর কথাই তখন বলছিলাম। মিসেস অ্যান্টনি। আর ইনি হলেন এলিজাবেথ।'

মিসেস অ্যান্টনি হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। এলিজাবেথ সেটাকে নকল করার চেষ্টা করলেন। ডাক্তার বললেন, 'কিছু যদি মনে না করেন আমাকে একটু উঠতে হবে। আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। আপনি আমাদের এখানে কতদিন থাকছেন ?'

'আমার ফেরার টিকিট ওপেন আছে। আই ডোন্ট নো, হয়তো আজই ফিরে যেতে পারি, নয়তো কাল। কিন্তু যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চাই।'

'ও, নিশ্চয়ই। আমি খুব খুশি হব।'

এলিজাবেথ এবং ব্রাউন অফিসঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই কঙ্কাবতীকে দেখতে পেলেন। একটা হলুদ চাদর জড়িয়ে কঙ্কাবতী সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়েছিল। ব্রাউন দাঁড়িয়ে গেলেন, এই মেয়েটিকে তিনি এর আগে এখানে দেখেননি। মিসেস অ্যান্টনি এগিয়ে এলেন, 'ওর নাম কঙ্কাবতী।'

এলিজাবেথ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কি অসুস্থ ?'

মিসেস অ্যান্টনি নিচু স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ। তবে মারাত্মক নয়।'

এলিজাবেথ বললেন, 'মাই গড !'

নীচের প্যাসেজে দাঁড়িয়ে কয়েকজন মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বেশ অস্বস্তি হল কঙ্কাবতীর। সে মুখ ঘুরিয়ে সরে যাচ্ছিল কিন্তু মিসেস অ্যান্টনি তাকে ডেকে বললেন, 'গুড মর্নিং ! এখন কেমন আছ ?'

'ভাল।' শান্ত গলায় বলল কঙ্কাবতী।

'ইনি মিস্টার ব্রাউন আর উনি এলিজাবেথ।'

ব্রাউন বললেন, 'পরে আলাপ করব। আমি পাশেই থাকি। যিশু তোমার মঙ্গল করবেন। আচ্ছা, চলি।'

বাইরে বেরিয়ে এসে এলিজাবেথ ঘুরে দাঁড়িয়ে নিরাময়কে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা ভারতবর্ষের মানুষ কি আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ পায় তো ?'

'ব্যাপক হারে না হলেও বড় বড় শহরে নিশ্চয়ই পায়।'

'ডাক্তার যা বললেন এবং আমি যা বুঝলাম তাতে এই হোমে সেরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। তাহলে কেন এইসব পেশেন্টদের অভিভাবকেরা ওদের পাঠিয়েছেন ?'

'দুটো কারণ। এরা নিশ্চিতভাবে বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করাতে পারত। কিন্তু যে মেডিক্যাল তদারকি এদের ওপর প্রতিনিয়ত করা দরকার তা বাড়িতে করা একটু মুশকিল। হঠাৎ ব্লিডিং আরম্ভ হলে সমস্যা তৈরি হয়। নিরাময়ের ডাক্তার আধুনিক চিকিৎসার খুঁটিনাটি জানেন। তার ওপর পেশেন্টদের প্রতি ওঁর মমতা ভালবাসা এত বেশি যে ওরা ওঁর জন্যে মনে জোর পায়। এই কারণেই এখানে এলে ওদের ভাল লাগে।'

'এখানে থেকে কেউ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে ?'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন এই অসুখ থেকে একেবারে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে অসুখটাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়মের মধ্যে থাকলে দীর্ঘকাল বাঁচা যায়। সেরকম অনেকেই এখান থেকে ফিরে গেছে।' ব্রাউন কথা বলতে বলতে দেখলেন একটা গাড়ি নীচ থেকে উঠে আসছে। গাড়িটা সামনে আসতেই তিনি পেছনে বসা একলা মেয়েটিকে চিনতে পারলেন। হাত তুলে বললেন, 'গুড মর্নিং।'

গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। ব্রাউন বললেন, 'তুমি তো জুলি ডিসুজা। আমাকে বোধহয় চিনতে অসুবিধে হচ্ছে তোমার !'

মেয়েটি দরজা খুলে এল। সাদা জিনস আর লাল পুলওভারে ওকে চমৎকার দেখাচ্ছে। হেসে

বলল, 'দিদির অ্যাকসিডেন্টের খবর দিতে আপনি গিয়েছিলেন।'
'হ্যাঁ। ঠিক। ওহো, তোমার দিদি কেমন আছে এখন ?'
'ভাল।'
'ড্রাইভার ? তাকে তো শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'
'ও এখনও হাসপাতালে।'
'সত্যি, আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে। তালেগোলে একদম ভুলে গিয়েছিলাম।' ব্রাউন মাথা নাড়লেন, 'আমার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল।'
'এটুকু বলার জন্যে ধন্যবাদ।'
'তুমি কোত্থেকে আসছ ?'
'দার্জিলিং।'
শোনামাত্র আড়ষ্ট হয়ে গেলেন ব্রাউন। ওর দিদির সম্পর্কে লোক যে বদনাম দিয়েছে সেই একই বদনাম কি এর সম্পর্কে দেবে ? জুলিও কি একই পথে এগোচ্ছে ? এই সময় এলিজাবেথ বললেন, 'আপনাদের কথা আমি বুঝতে পারছি না। শুনেছি ইন্ডিয়াতে অনেক ভাষা চালু আছে। এটা কোন ভাষা ?'
ব্রাউন বললেন, 'নেপালি। ওহো, খুব লজ্জিত। আপনার সামনে আমাদের ইংরেজিতে কথা বলা উচিত ছিল। এর নাম জুলি ডিসুজা আর ইনি এলিজাবেথ।'
'আপনি ইংরেজ ?'
'না। আমেরিকান। তুমি যে পাহাড়ের মানুষ তা দেখেই বোঝা যায়।'
জুলি হাসল, 'আমি চলি।'
ব্রাউন বললেন, 'একদিন গিয়ে তোমার দিদিকে দেখে আসব।'
'দিদি কাঠমাণ্ডুতে চলে যাচ্ছে। আমরাও যাব। ওখানেই সেটল করব।'
কথাবার্তা ইংরেজিতে হচ্ছিল। এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাঠমাণ্ডু কোথায় ?'
'নেপালে। আমরা ওখান থেকেই এখানে এসেছি।'
'নেপাল তো ইন্ডিয়া নয়। তাহলে তুমি কি ইন্ডিয়ান নও !'
'আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আমি নেপালি এটুকু জানি।'
জুলির গাড়ি ওপরে উঠে গেলে এলিজাবেথ বললেন, 'মেয়েটার কথাবার্তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মিস্টার ব্রাউন, ইন্ডিয়ার সিটিজেন নেপালে সেটল করতেই পারে কিন্তু ও ইন্ডিয়ান কি না সেটা জানবে না কেন ?'

২২

বসেছিলেন নন্দিনী ছেলের হাত হাতে নিয়ে। কমলেন্দু এবং উর্মিলাও এসেছে। ডাক্তার বললেন, 'কোনও চিন্তা করবেন না। সায়ন এখন অনেক ভাল আছে। এর পরের বার যখন দেখবেন তখন বোধহয় অবাক হয়ে যাবেন।'
উর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম ?'
'ওর কাজকর্ম বেড়ে যাবে। আমাকে তো সাহায্য করবেই, ইচ্ছে করলে বাইরের জগতে পা রাখতে পারে। আমি এ ব্যাপারে যা করার করব।'
নন্দিনী বললেন, 'তাই যদি হয় তাহলে ও তো কলকাতায় যেতে পারে। আবার পড়াশুনা আরম্ভ করতে পারে। তাই না ?'
উর্মিলা বলল, 'ঠিকই। বিপদ কেটে গেলে ও এখানে পড়ে থাকবে কেন ?'
ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'আমি জানাব। তখন ইচ্ছে হলে ওকে নিয়ে যেতে পারবেন।'

নন্দিনী ছেলের হাত শক্ত করে ধরে একগাল হাসলেন।

সায়ন বলল, 'কিন্তু জানো মা, পাহাড়ে এসে আমি ভাল আছি। ওখানে যেমন সবসময় কষ্ট হত, এখানে হয় না।'

কমলেন্দু বলল, 'তা তো ঠিকই। ওখানে ধোঁয়াধুলো বেশি এখানে ওসব নেই। তার ওপর ঠাণ্ডা আবহাওয়া। এখানে তো ভাল থাকবেই।'

সায়ন বলল, 'আমি জানি তোমাদের অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। বেশি দিন বাবার ওপর চাপ দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু—।'

নন্দিনী বাধা দিলেন, 'এ আবার কী কথা ? টাকাপয়সা নিয়ে ভাবতে তোকে কে বলেছে ? তোর জন্যে খরচ করে কি আমরা না খেয়ে পড়ে আছি ? আশ্চর্য !'

'তাহলে বাবা কেন এল না ?' মুখ তুলল সায়ন।

নন্দিনী হকচকিয়ে গেলেন। সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন তৎক্ষণাৎ, 'ওর তো আসার খুব ইচ্ছে ছিল। বলেছিলেন, তুমি ওদের সঙ্গে যাও, আমি কাজকর্ম সামলে দুদিন বাদেই হাজির হচ্ছি। নিশ্চয়ই সেগুলো সামলে ওঠেননি।'

সায়ন হাসল, 'তুমি সত্যি কথা বলছ না মা।'

'মানে ?'

'তুমি বাবাকে আড়াল করতে চাইছ।'

'কী বলছিস তুই ?'

'আচ্ছা, এখন কটা বাজে ? সাড়ে নটা তো ? বাবা এখনও ঘুমোচ্ছে। দশটার পরে ঘুম থেকে উঠে চা খাবে, খবরের কাগজ পড়বে। লুচি তরকারি খাবে। তারপর দু-চারটে ফোন করবে। যেসব জায়গায় বাবার কমিশন বাঁধা তাদের সঙ্গে কথা সেরে স্নান করে ভাত খাবে দুপুর পার করে। তারপর ঘুমোবে। আমি ঠিক বলছি কিনা ?' সায়ন আবার হাসল, 'আসলে আমার সামনে এলে খারাপ লাগবে বলে বাবা আসেনি।'

নন্দিনী কোনও কথা বলতে পারলেন না। স্বামীর না আসা তিনি সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু যে বাড়িতে জন্মেছেন এবং যেখানে বউ হয়ে এসেছেন সেখানে স্বামীর কাজের প্রতিবাদ না করাটাই রেওয়াজ। ছেলেকে তিনি নিজের মতো করে গড়তে চেয়েছিলেন। ওই বাড়ির প্রভাব যাতে ওর ওপর না পড়ে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। স্বামীকে অলস জীবনযাপন করতে দেখেছিলেন তিনি। যেহেতু রায়বাড়িতে চাকরি করার দৃষ্টান্ত নেই তাই উনি চাকরি করেন না। পিতৃপুরুষের রেখে যাওয়া সম্পত্তি ভাঙিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলেই ওঁর শান্তি। কলকাতার বড় বড় তিনটে বিদেশি কোম্পানিতে ওঁর বাবা যেসব জিনিসপত্র সাপ্লাই দিতেন তার দায়িত্ব তিন বন্ধুকে দিয়ে কমিশন পেয়েই তাঁর ব্যবসা করার শখ মেটে। সায়নের অসুখ যে সারবে না এমন বিশ্বাস করে বসে আছেন তিনি। প্রথম দিকে যতটা ছিল-না দিনদিন সেটা বাড়ছে। ছেলের সামনে এসে দাঁড়াতে ভদ্রলোক মনের জোর পান না। তাই এবারও আসবেন বলে আসেননি। সায়ন যেটা বলল সেটা একশো ভাগ সত্যি। নন্দিনী তা জানেন কিন্তু ছেলের মুখে শুনতে এখন খারাপ লাগল।

ডাক্তার বললেন, 'টাকাপয়সা নিয়ে তুমি কেন ভাবছ সায়ন ?'

কমলেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, এসব নিয়ে তুই একদম ভাববি না। বাড়িতে মা ব্যাঘ্রবাহিনী আছেন। তিনি ঠিক রক্ষা করবেন।'

সায়ন বলল, 'তাহলে আমাকে এখানে পাঠালে কেন ?'

কমলেন্দু অবাক হল, 'তার মানে ? তোর চিকিৎসা—।'

'সেটা জানি। এসব না করিয়ে যদি মা ব্যাঘ্রবাহিনীর সামনে আমাকে শুইয়ে রাখতে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করতেন। ওষুধ ইনজেকশনের দরকার হত না।' কথাগুলো সায়ন হাসতে হাসতে বলল।

ঊর্মিলা কপট ভয়ের চিহ্ন ফোটাল চোখেমুখে, 'এ কি ছেলে রে বাবা। তুই মা ব্যাঘ্রবাহিনীকে

বিশ্বাস করিস না ? রায়বাড়িতে জন্মেছিস তো ?'

নন্দিনী বাধা দিলেন, 'থাক। ঠাকুরদেবতা নিয়ে ঠাট্টাইয়ার্কি করা আমার ভাল লাগে না। ডাক্তারবাবু, আপনি বলেছিলেন শীত বাড়লেই ওকে আমরা নিয়ে যেতে পারি— ।'

'ঠিকই।'

'তাহলে নভেম্বরের মাঝামাঝি টিকিট কাটতে বলি ?'

'বেশ।'

নন্দিনীরা ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিলেন। ফেরার পথে ট্যুরিস্ট লজ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে সোজা শিলিগুড়ি চলে যাবেন। ওঁদের তিস্তাতোর্সায় টিকিট হয়েছে। চলে যাওয়ার আগে ডাক্তার সায়নকে বললেন মিসেস অ্যান্টনিকে ডেকে আনতে। সে বেরিয়ে যেতে ডাক্তার নন্দিনীকে বললেন, 'আমি ওর সামনে বলতে চাইছিলাম না। চলে যাওয়ার সময় আপনারা ইমোশনাল হয়ে যাবেন না। রোজ যেমন লজে ফিরে যেতেন সেইভাবে যাবেন। কান্নাকাটি হলে সায়নের শরীর রি-অ্যাক্ট করতে পারে। বুঝতেই পারছেন।'

ওরা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে তখন মিসেস অ্যান্টনিকে নিয়ে সায়ন অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এল। ডাক্তার বললেন, 'মিসেস অ্যান্টনি। কাল যে প্যাকেটটা আনিয়েছিলাম ওটা যদি অনুগ্রহ করে এনে দেন— !'

মিসেস অ্যান্টনি সঙ্গে সঙ্গে, 'ও, সিওর' বলে ভেতরে চলে গেলেন। পরক্ষণেই বেরিয়ে এলেন একটা চৌকো প্যাকেট হাতে নিয়ে।

ডাক্তার বললেন, 'এইটে আপনাদের জন্যে।'

নন্দিনীর বুকের মধ্যে বরফ জমছিল। এরপর সেই নভেম্বরের আগে ছেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে না। কিন্তু এর মধ্যে যদি কিছু হয়ে যায় ! ভাবলেই শরীর ঝিমঝিম করে। কিন্তু ডাক্তার বলেছেন যাওয়ার সময় কান্নাকাটি করা চলবে না। সায়নের ভাল চাইলে সেটা করা অন্যায় হবে। কিন্তু কী করে নিজেকে সামলাবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এখন ওই প্যাকেটটাকে দেখে তিনি যেন একটা বিষয় পেয়ে গেলেন।

নন্দিনী বললেন, 'ওমা ! এসব কেন ? না, না, আপনি আমাদের লজ্জায় ফেলে দিচ্ছেন।' বেশ জোরে জোরে বলে উঠল নন্দিনী।

ডাক্তার বললেন, 'এতে লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কাছেই মকাইবাড়ি বলে একটা চা-বাগান আছে। ওদের চায়ের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। সেই চা ওই প্যাকেটে আছে। খুবই সামান্য কিন্তু আপনারা নিলে আমার খুব ভাল লাগবে।'

মিসেস অ্যান্টনি জোর করে নন্দিনীর হাতে প্যাকেট তুলে দিলেন। সায়ন বলল. 'দুটো ভাগ করবে। তোমরা আধাআধি নেবে।'

উর্মিলা বলল, 'তোকে আর পাকামো করতে হবে না।'

ওঁরা ট্যাক্সিতে উঠলেন। সায়ন ট্যাক্সি অবধি এগিয়ে এসেছিল। বলল, 'প্রত্যেক সপ্তাহে চিঠি দেবে। বাবাকে বলবে আমি ভাল আছি।'

নন্দিনী নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন। কমলেন্দু বলল, 'চলি রে।'

ট্যাক্সিটা যেই বাঁক পার হল, নিরাময় চোখের আড়ালে চলে গেল, অমনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন নন্দিনী। ভেতরের সব কান্না যেন একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইল। পাশে বসা উর্মিলা তাকে জড়িয়ে ধরল, 'শক্ত হও। সায়ন তো নভেম্বরে চলে আসছে। আর তো কটা দিন।' নন্দিনী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। এই সময় ট্যাক্সি সেই ঝোরার সামনে এল। উর্মিলা দেখল মা মেরির মূর্তির সামনে আজ কোনও মোমবাতি জ্বলছে না। সে আড়চোখে কমলেন্দুকে দেখল। কমলেন্দু গম্ভীর মুখে খাদের দিকে চেয়ে আছে। প্যাকেটটা নন্দিনীর কোল থেকে তুলে নিয়ে উর্মিলা বলল, 'এটা কলকাতায় গিয়ে খোলা হবে না। সায়ন যেদিন যাবে সেদিন খুলবে। এই চা সেদিন সবাই মিলে খাব !'

'হাই সায়ন।'

সায়ন মুখ ফিরিয়ে দেখল সিমি নীচ থেকে উঠে আসছে। আজ দারুণ সেজেছে সিমি। সাদা জিনসের ওপর লাল পুলওভার। মাথায় লাল কাপড় স্টাইল করে বাঁধা। মা চলে যাওয়ায় মন খারাপ হচ্ছিল খুব কিন্তু সিমিকে দেখে সেটা চাপা পড়ে গেল। সিমি ওর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী দেখছ অমন করে ?'

সায়ন হাসল, 'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

চোখ কপালে তুলল সিমি, 'মাই গড ! তুমিও ?'

'আমিও মানে ?'

'ছেলেদের মুখে এই কথাটা শুনতে শুনতে আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। পুরুষগুলোর স্বভাব হল মেয়েদের পটাতে তাদের সুন্দর বলে তেল মারা। এখন আর ওসব চলে না।'

'আমাকে তুমি এসব কথা বলছ কেন ?'

'কারণ আমি ভেবেছিলাম তুমি আলাদা। কত বয়স তোমার ?'

সায়নের রাগ হয়ে গেল, 'আমি যদি খুব বাচ্চা অথবা বুড়ো হতাম তাহলে তোমার মনে ওই চিন্তা আসত না, তাই না ?'

'মোটেই না। আজকালকার বাচ্চাগুলো টিভি দেখে দেখে পেকে গিয়েছে। দশ বছরের বাচ্চা কোমর দুলিয়ে গান গায়, দিল তো পাগল হ্যায়। আর বুড়োগুলো আরও শয়তান।'

'তোমাকে তেল দিয়ে আমার লাভ কী হবে ?'

সিমি তাকাল সায়নের চোখের দিকে। তার খেয়াল হল, সায়ন অসুস্থ। আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক নয়। তার ওপর মা মেরির দয়া আছে ওর ওপরে। এভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি।

সে হাত বাড়াল, 'সরি। আমি কথা উইড্র করছি। এসো, আমরা বন্ধু হই।' জোর করেই সে সায়নের হাত ধরে ঈষৎ ঝাঁকাল।

স্পর্শ পেতেই সায়নের রাগ চলে গেল। সে হেসে বলল, 'কিন্তু তোমাকে আজ সত্যি সুন্দর দেখাচ্ছে। কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ। এখান থেকে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে যাব। সেখানে কাউকে ম্যানেজ করে দার্জিলিং-এ বেড়াতে যাচ্ছি।' ঠোঁট টানটান করল সিমি।

'ও। বেড়াতে যাচ্ছ !'

'হ্যাঁ। কিন্তু ঠিক করেছি আজ যদি কোনও ভাল ছেলে আমাকে ভদ্রভাবে অ্যাপ্রোচ করে তাহলে তাকেই বিয়ে করব। সারাদিন ম্যালে থাকব। দেখি আজ আমার কপালে তেমন কোনও ঘটনা লেখা আছে কি না !' সিমি খুব গম্ভীর গলায় কথাগুলো বলল।

সায়ন অবাক হয়ে তাকাল, 'কিন্তু যদি কেউ তোমাকে বিয়ে করতে না চায় ?'

'তাহলে এই জীবনে বিয়ে করব না, হ্যাঁ।'

'মিস্টার ব্রাউন এ কথা জানেন ?'

'ওঁর কি আমার কথা শোনার মতো সময় আছে ?'

'বাঃ, উনি তো তোমাকে খুব স্নেহ করেন।'

'করতেন। কিন্তু বান্ধবী চলে আসার পর সব ভুলে গেছেন।' সিমি এক পা এগিয়ে এল, 'আমরা কেউ কোনওদিন দেখিনি একজন আমেরিকান মেমসাহেব হুট করে চলে এল ওঁর কাছে। একই বাড়িতে দুজনে রাত কাটাল। আমি যদি কোনও ছেলের সঙ্গে এক বাড়িতে রাত কাটাতাম তাহলে আর দেখতে হত না। অথচ ওঁকে কেউ কিছু বলছে না !'

'না, না। এভাবে বলা ঠিক নয়। উনি বুড়ো মানুষ। যিনি এসেছেন তিনিও বেশ বয়স্কা। তার ওপর বিদেশিনী, অতিথি—।'

'রাখো। ওই বুড়িকে এখনও দেখোনি, দেখলে বুঝবে যে কোনও ছুঁড়ির চেয়ে উনি কম যান না। আর পুরুষমানুষ ? যত বুড়োই হোক আমি বিশ্বাস করি না। রাগে শরীর জ্বলে যাচ্ছে।' মাথা নাড়ল সিমি।

'এত রাগ কোরো না। তুমি তো আমার বন্ধু হতে চেয়েছ। বন্ধুর কথা নিশ্চয়ই তুমি শুনবে। মাথা ঠাণ্ডা করো।' সায়ন বলল।

সিমি সায়নের মুখের দিকে তাকাল। ওর হঠাৎ মনে হল লোকগুলো বোধহয় ভুল দেখেনি। মিস্টার ব্রাউনও বলেন সায়নের নাক চোখের সঙ্গে যিশুর মিল আছে। সে মাথা নামাল, 'তুমি সব বুঝতে পার, না ?'

'কেউ বুঝিয়ে বললে বুঝতে চেষ্টা করি।'

'বেশ। তাহলে চলো, ওই পাথরটার ওপরে গিয়ে বসি। এখান দিয়ে লোকজন যাচ্ছে আর হাঁ করে আমাকে দেখছে।' সিমি এগিয়ে গেল। খাদের ধারে একটা বিশাল পাথর পড়ে আছে দীর্ঘদিন, তার এক ধারে গিয়ে বসল সিমি। ওখানে বসলে রাস্তা থেকে চট করে দেখা যায় না, একমাত্র যাঁরা নীচ থেকে উঠে আসবে তারাই দেখতে পাবে। সায়ন একটু দূরে বসল।

সামনে বিশাল গাছ। নীচের গাছগুলোর মাথা ঝুঁকে দেখা যায়। খাদটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাইলের পর মাইল। তারপরই পাহাড়ের পাঁচিল। তাদের মাথায় কাঞ্চনজঙ্ঘা। কিন্তু আজ মেঘেদের দিন। ঘোলাটে হয়ে আছে চারধার। হাওয়া বইছে না। কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকটা ঢাকা পড়ে গেছে মেঘে। অদ্ভুত রকমের স্যাঁতসেতে হয়ে আছে এখানকার পৃথিবী। কথা না বললে মন খারাপ হয়ে যায়।

সায়ন বলল, 'আজ দার্জিলিং-এ যেও না, বৃষ্টি হতে পারে।'

'হোক।'

'বাঃ, বৃষ্টি হলে যে ছেলেটি তোমাকে সত্যি বিয়ের কথা বলত তার দেখা পাবে না। তাই না ?'

'তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ ?'

'না। রসিকতা কেন করব ?'

সিমি ঘুরে বসল, 'তুমি আমার কথা শোনো। শুনে বলো আমি কী করব ?'

'ঠিক আছে।'

'আমি দুজনকে ভালবাসতাম। ভালবাসা বলব না, দুজনকেই আমার ভাল লাগত। কিন্তু ঠিক কাকে বিয়ে করব বুঝতে পারিনি।'

'ওরা জানে ?'

'জানে। মানে এটা জানে আমার খুব ভাল লাগে, ভাল বন্ধু। কিন্তু কাউকেই আমি বলিনি যে তাকেই ভালবাসি। দুজনেই অবশ্য আমাকে বলেছে খুব ভালবাসে। তারপর আমেরিকায় চলে গেল ওরা। যাওয়ার আগে বলে গেল আমি রাজি হলেই বিয়ে করে সেখানে নিয়ে যাবে। কিন্তু এই কয় বছরে মাত্র দুটো চিঠি লিখেছে ওরা। জানো ? আমি ওদের এখন ভুলে গিয়েছি। ঠিক করেছি কিনা বলো ?' কাতর মুখে তাকাল সিমি।

'তুমি চিঠি লিখেছ ?'

'কতবার ! উত্তর দিচ্ছে না জেনে আর লিখছি না। তোমাদের মিসেস অ্যান্টনি ওদের একজনের মা। উনিও ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন।'

'কেন ?'

'ছেলে নষ্ট হয়ে গেছে।'

কথাটা ভালভাবে বুঝতে পারল না সায়ন। আজ সিমি যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে তা নিয়ে কখনও সে কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলেনি। এমনকী ছেলেদের সঙ্গেও নয়। গল্পের বই পড়ে পড়ে নারীপুরুষের সম্পর্কের কথা জেনেছে সে। মাঝে মাঝে কৌতূহল হয় আরও জানার জন্যে। সেটা আবার মিলিয়েও যায়।

'তারপর ?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল।

'তারপর কত ছেলে আমার দিকে হাত বাড়িয়েছে কিন্তু কাউকে আমি পাত্তা দিইনি। সবাই আমার শরীরটাকেই চায়, বুঝলে ?'

'মন না পেলে শরীর নিয়ে কী হবে ?'

'যাঃ বাবা। শরীর নিয়ে যারা সন্তুষ্ট থাকতে চায় তারা মনের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। লিচু খেয়েছ ? মুখে পুরলে, শাঁসটা খেয়ে বিচি থু করে ফেলে দিলে। ওরা মেয়েদের সেইভাবে ফেলে দেয়।' বলেই মুখ ফেরাল সে, 'তুমি কোনও মেয়ের শরীর ভোগ করোনি ? কলকাতায় শুনেছি স্কুলে থাকতেই এসব হয় !'

'ভোগ করা মানে ?' আচমকা প্রশ্নটা ছিটকে বের হল।

'মাই গড। তুমি কখনও প্রেম করোনি ?'

'না।'

'কোনও মেয়েকে চুমু খাওনি ?'

'না।'

'কেন ?'

'জানি না কেন ?'

'তোমার এই অসুখটা কবে হয়েছে ?'

'বছর দেড়েক।'

'তার আগে কোনও মেয়েকে কাছে পাওনি ?'

'না।' হাসল সায়ন। তার খুব মজা লাগছিল।

'তাহলে তুমি বুঝবে না।' হাল ছেড়ে দিল সিমি।

'আচ্ছা, সিমি, তুমি বললে ছেলেরা মেয়েদের ভোগ করে ছুড়ে ফেলে দেয়, মেয়েরাও তো তাই করতে পারে !'

'জানি না। আমি একসময় ভেবেছিলাম করব। কিন্তু সাহস পাইনি। কিন্তু জানো, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কোনও ছেলেকে শরীর চাইছে। এই জন্যেই অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। যাক গে। এখন ওই ম্যাথুজ আমার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'ম্যাথুজ ?'

'মাংসওয়ালা।' থুক করে থুতু ফেলল সিমি, 'লোকটার সারা শরীরে কাঁচা মাংসের গন্ধ। কাছে গেলেই বমি আসে। এখন বোঝো, এই লোকটা নাকি আমাকে ভালবাসে। ওই বুড়ো ব্রাউন ওর হয়ে বলতে এসেছিল আমাকে। কী যে করি।'

গোরুর মাংস কেটে বিক্রি করে বলে ম্যাথুজকে প্রথম দিকে পছন্দ হয়নি সায়নের। তারপর মনে হয়েছে ওই একই দৃশ্য কলকাতার ফুটপাতের পাশের দোকানগুলোতে দেখা যায়। ছাল ছাড়ানো খাসির শরীর ঝুলিয়ে বসে আছে দোকানদার। যার যেমন প্রয়োজন কেটে বিক্রি করছে। একবার ছাল ছাড়ানো হয়ে গেলে সেটা ছাগল ভেড়া না বাচ্চা গোরুর মাংস তা বোঝা মুশকিল। এখানকার পাহাড়ি ক্রিশ্চান মানুষেরা যখন গোরুর মাংস খেতে অভ্যস্ত তখন সেটা বিক্রি করলে ম্যাথুজ কোনও অন্যায় করছে না। পরে লোকটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার। বেশ ভালই লেগেছে। লোকটাকে খুব নিস্পৃহ, কবিদের মতো উদাস মনে হয়েছে।

সায়ন বলল, 'কিন্তু ম্যাথুজ লোকটা ভাল।'

সিমি শরীর বেঁকিয়ে সায়নকে কয়েক সেকেন্ড দেখল, 'আমাকে দ্যাখো তো। আমার সঙ্গে ওকে মানাবে ? মানালে আমি নিজেই ওর সঙ্গে প্রেম করতে যেতাম না ? একই পাড়ায় থাকি, রোজ দেখছি, অথচ আমার মনে কিছুই হচ্ছে না এমন কারও মন আমার জন্যে যদি ছটফট করে তাহলে আমি কী করতে পারি ! বলো ?'

'তা ঠিক।' সায়ন মাথা নাড়ল। এসব ব্যাপার তার কাছে এখনও ধোঁয়াশা। কিন্তু শুনতে বেশ মজা লাগছিল।

'যাক। আজ আমার মন পরিষ্কার হয়ে গেল।'

'কেন ?'

'তুমি আমাকে ঠিক বলেছ।' তৃপ্তির হাসি হাসল সিমি।

'কিন্তু তুমি মিস্টার ব্রাউন সম্পর্কে ঠিক বলোনি। উনি ভাল মানুষ।'

'হতে পারে। কিন্তু ওই আমেরিকান মেমসাহেবটা কাল রাত্রে ইংরেজি ছবির নায়িকার মতো পোশাক পরেছিল কিন্তু মিস্টার ব্রাউন ওকে কিছু বলেনি।'

'শার্টপ্যান্ট ?'

'দুর ! সে তো আমিও পরি। নাইটি। এতখানি পিঠ খোলা, বুক বেরিয়ে পড়েছে অনেকটা কিন্তু কোনও হুঁশ নেই।'

'তুমি কী করে দেখলে ?'

'বাঃ, মাংস রান্না করে দিতে গিয়েছিলাম আমি। হ্যাঁ, একটু রাত হয়ে গিয়েছিল ঠিকই। আসলে টিভিতে বুড়ো ওই রকম মেয়ে দেখে তো তাই নিজের বাড়িতে দেখতে মজা লাগছে।' কথা শেষ করে সায়নের দিকে তাকাল সিমি। একটু যেন অস্বস্তি হল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমি আর এ নিয়ে কিছু বলব না।'

'আসলে মেমসাহেবকে দেখে তোমার রাগ হয়েছে।'

'কেন হবে না ?' ঝাঁঝিয়ে উঠল সিমি, 'এতদিন আমি ছাড়া বুড়োর তো আর কেউ ছিল না। দরকারে অদরকারে সবসময় আমাকে প্রয়োজন হত। এখন আমেরিকা থেকে মেমসাহেব এসেছেন, ব্যাস তাঁকে পেয়ে সব ভুলে গেলেন ? বুড়ি বেঁচে থাকলে মেমসাহেবকে রাখতে পারতেন বাড়িতে ? আমার মনে হচ্ছে ওই মেমসাহেব বুড়োকে নিয়ে ঠিক আমেরিকায় চলে যাবে।'

'কেন ?'

'তা জানি না।'

সায়ন উঠে দাঁড়াল, 'চলো, আমরা মিস্টার ব্রাউনের বাড়িতে যাই।'

'আমি যাব না।'

'কাল রাত্রে তো গিয়েছিলে। আর একবার নিশ্চয়ই যেতে পারো।'

খুব অনিচ্ছা নিয়ে হেঁটে রাস্তায় এল সিমি। সায়ন দেখল নিরাময়ের গেটে মিসেস অ্যান্টনির পাশে কঙ্কাবতী দাঁড়িয়ে আছ। মিসেস অ্যান্টনি ওর হাতটা ধরে রেখেছেন।

'আরে সিমি, কেমন আছ তুমি ?'

'ভাল। নতুন চাকরি ভাল লাগছে ?'

'খু-উ-ব। তবে চাকরি বলাটা ঠিক নয়। এটাই আমার জীবন হয়ে গিয়েছে। সায়ন, কেমন আছ ?'

'ভাল।' সায়ন হাসল, 'কঙ্কাবতী, কোথাও যাচ্ছ ?'

কঙ্কাবতী ঘাড় নাড়ল, না।

সিমি জিজ্ঞাসা করল, 'এ কে ? আগে কখনও দেখিনি !'

সায়ন নিচু গলায় বলল, 'ও নতুন এসেছে। খুব ভাল মেয়ে।'

সিমি চোখ ঘোরাল, 'ভাল ! তুমি কী করে বুঝলে ও ভাল মেয়ে ?'

'বাঃ, কথা বললে বোঝা যায় না ?'

'বাবা ! এর মধ্যে ওর সঙ্গে এত কথা বলে ফেলেছ ?'

'তুমি ঠিক বলছ না !'

'হয়তো। কোথায় বাড়ি ওর ?'

'মিসেস অ্যান্টনিকে জিজ্ঞাসা করো, উনি সব জানেন।'

ঠোঁট ওল্টাল সিমি, 'আমার বয়ে গিয়েছে।'

সায়ন গলা তুলল, 'মিসেস অ্যান্টনি, আমরা মিস্টার ব্রাউনের বাড়িতে যাচ্ছি, আপনারা কি যাবেন ?'

মিসেস অ্যান্টনি হাসলেন, 'না বাবা। অনেক কাজ পড়ে আছে। কঙ্কাবতী এসে অবধি নীচে নামেনি বলে ওকে নিয়ে এখানে এসেছি। তুমি তাড়াতাড়ি ঘুরে এসো, যে কোনও মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে।'

সায়ন আকাশের দিকে তাকাল। মেঘগুলো এখন আরও নীচে নেমে এসেছে। স্পষ্ট দেখা

যাচ্ছে ওদের শরীর। বাতাস আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সিমি পা বাড়াল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'ওই মেয়েটা যেতে চাইলে আমি ফিরে যেতাম।'

'কেন?'

'আমার ভাল লাগত না।'

'তুমি সবাইকে বন্ধু হিসেবে ভাবতে পার না?'

'না। কেন ভাবব? কেউ কি আমার কথা ভাবে?'

চড়াই ভাঙতে অসুবিধে না হলেও সাবধানে পা ফেলছিল সায়ন, ফলে সিমি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় বারে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? তাহলে ফিরে যাই চলো।'

সায়ন মাথা নাড়ল, 'না, না। আমি ইচ্ছে করেই জোরে হাঁটছি না।'

ওরা মিস্টার ব্রাউনের বাড়ির সামনে পৌঁছোতেই ভুটো তার বান্ধবীকে নিয়ে এগিয়ে এল। সিমি বলল, 'এই কুকুরটা মহা বদমাস। পাড়ার সবকটা মেয়েকুকুরের সঙ্গে ওর ভাব।'

সায়ন বলল, 'সেটা কি খারাপ? তার মানে ভুটো ঝগড়াটে নয়।'

সিমি কথাটা গ্রাহ্য না করে ধমকাল, 'এই, ভাগ্। যা এখান থেকে।'

এই সময় মিস্টার ব্রাউন বেরিয়ে এলেন, 'আরে! এসো এসো। যিশু তোমাদের মঙ্গল করুন। ওপরে উঠে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো সায়ন?'

'না মিস্টার ব্রাউন।'

'এসো ভেতরে এসো। এসো সিমি।'

সিমি যে ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকল তাতে মনে হল বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। ওরা চেয়ারে বসতেই টপটপ করে বৃষ্টি শুরু হল। মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'যাঃ।'

সিমি জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'এলিজাবেথ বললেন একটু হেঁটে আসবেন। যদি মাঝপথে বৃষ্টি পান তাহলে ভদ্রমহিলা ভিজে যাবেন। নতুন লোক, বৃষ্টিতে ভেজা ঠিক নয়।'

'এত যখন চিন্তা তখন সঙ্গে ছাতি দিলেন না কেন?'

'আমার কি সব কথা মনে থাকে?' ব্রাউন জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আকাশ কালো হয়ে গিয়েছে। বাতাস বন্ধ। বৃষ্টি পড়ছে অসাড়ে। নেমে যাচ্ছে খাদের মধ্যে ঝিম মেরে দাঁড়ানো গাছেদের মাথায়। এলিজাবেথের আজ অথবা কাল চলে যাওয়ার কথা। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর বাধালে মুশকিল হবে।

সিমি বলল, 'দুশ্চিন্তা দেখে মনে হচ্ছে ছাতি নিয়ে আমিই ওঁকে খুঁজতে বের হই। আরে বাবা, কচি খুকি নয়, ঠিক কোনও ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা বরং একটু কফি খাই।' সিমি উঠে পড়ল।

সায়ন বলল, 'আমি কিন্তু খাব না।'

সিমি একবার তাকাল তারপর কিচেনের দিকে এগিয়ে গেল। মিস্টার ব্রাউন কিছু না বলে বৃষ্টি দেখতে লাগলেন উদ্বিগ্ন মুখে। সায়ন কী করবে বুঝতে পারছিল না। ভদ্রমহিলা থাকলে কথা বলা যেত। কিছু প্রশ্ন তার মনে এসেছে। সে একটু এগিয়ে যিশুর ঘরের সামনে দাঁড়াল। মোমবাতি জ্বলছে যিশুর মূর্তির সামনে। অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ। সায়ন ভেতরে ঢুকল। যিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে তার মন ভাল হয়ে গেল। সে বাবু হয়ে বসল। মাত্র দু হাজার বছর আগে এই মানুষটা পৃথিবীতে ছিলেন। কিন্তু ঠিক এই মানুষটা কি? তখন তো ফটোগ্রাফি কল্পনার বাইরে ছিল। যিশুর মুখ কেউ এঁকে রেখেছিলেন বলে শোনা যায় না। একটা বইতে সে পড়েছে যিশু কেমন দেখতে ছিলেন সেটা নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলেছেন যিশুর কুঁজ ছিল, দেখতেও কদাকার ছিলেন। কিন্তু যিশুর এই চেহারা দেখলে মনে কী আরাম হয়। ভোরবেলায় যখন কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর সূর্যের প্রথম আলো পড়ে তখনকার ছবির সঙ্গে কোনও পার্থক্য থাকে না। অথচ এমন মানুষকে মানুষই খুন করেছিল। যিশু যদি অসুখে ভুগে মারা যেতেন তাহলে কি এতদিন এইভাবে

বেঁচে থাকতেন ? মানুষ জন্মায়, বড় হয় এবং শরীরের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী বলে মারা যায়। কারও কারও অসুস্থতা মৃত্যুর কারণ হয় অনেক আগেই। সেইসব মানুষকে কজন মনে রাখে ? যিশু তো অনেক বড় মাপের মানুষ, সুভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দকে বাঙালি কোনওদিন ভুলতে পারবে ? তাঁরা এমন কিছু করেছিলেন যা সাধারণ মানুষ করেনি। সায়নের শরীরে কাঁপুনি এল। তার শরীরে অসুখ আছে। হয়তো সেই অসুখ নামক রাক্ষসটা এখন ঘাপটি মেরে বসে আছে সুযোগের অপেক্ষায়। তার আগে তাকে কিছু করতে হবে। এমন কিছু যা মানুষ মনে রাখবে অনেক দিন। নইলে তার সঙ্গে তিন হাজার বছর আগে যে মানুষটি শুধু মরে যাওয়ার জন্যে জন্মেছিল তার কোনও পার্থক্য থাকবে না।

দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন ব্রাউন। তাঁর দিকে পেছন ফিরে যিশুর মূর্তির দিকে তাকিয়ে বসে আছে সায়ন। ওর মুখ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু বসার ভঙ্গিতে বোঝা যায় পৃথিবী ভুলে গেছে এই মুহূর্তে। ব্রাউন যিশুর মুখের দিকে তাকালেন। হাজার বার দেখা এই মুখটিতে যেন এই মুহূর্তে অপূর্ব আলো মাখামাখি। সিমি ডাকল তাঁকে, 'বাঃ, বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। কফি রেডি।'

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে ? ব্রাউন দ্রুত সরে এলেন জানলায়। কী কাণ্ড ? একটু আগে আকাশ কালো হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল অনন্তকাল ধরে বৃষ্টি চলবে। এই কয়েক মিনিটের মধ্যে আকাশের চেহারা আচমকা পাল্টে গিয়েছে। মেঘগুলোকে কেউ যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছুড়ে ফেলছে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। অন্ধকার সরে গিয়ে সবুজ আলো ছড়িয়েছে আকাশে। কী দ্রুত ছুটে যাচ্ছে টুকরো মেঘেরা। তারপরেই আলো রং পাল্টাল। আকাশে নীল ফুটছে। এমনকী কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকটায় পাহাড়ের আদল দেখা যাচ্ছে। সাধারণত এরকম হয় না। এত বছর পাহাড়ে থেকে এ অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি ব্রাউনের। তাঁর মনে যে ভাবনাটা এল সেটা বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে করছিল তাঁর। তিনি জানেন কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না তিনি।

ব্রাউন আবার ফিরে গেলেন যিশুর ঘরের দরজায়। নিচু গলায় ডাকলেন, 'সায়ন ! সায়ন, মাই বয় !'

সায়ন তাকাল, কোনও কথা বলল না।

'তুমি কি জানো, যিশুর সামনে বসে প্রেয়ার করছ বলে বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘ সরে যাচ্ছে, হয়তো রোদ উঠতে পারে !'

'না তো !' সায়ন উঠে দাঁড়াল, 'তা ছাড়া আমি তো কোনও প্রেয়ার করিনি।'

'প্রেয়ার করোনি ?' ব্রাউন অবাক।

'না তো !'

'তাহলে ওইভাবে বসেছিলে কেন ?'

'আমি ভাবছিলাম।'

ঠিক তখনই একটি গাড়ি সামনের রাস্তায় এসে থামল। ডাক্তার তামাং হইহই করতে করতে ভেতরে ঢুকলেন। ব্রাউনকে দেখে বললেন, 'কী হল, শরীর ঠিক আছে তো ?'

ব্রাউন বললেন, 'হ্যাঁ আছে।'

ডাক্তার তামাং আড়চোখে সায়নকে দেখে এগিয়ে গেলেন, 'আরে সিমি যে ! তুমি এখানে মানে নিশ্চয়ই মিস্টার ব্রাউনের জন্যে কিছু বানিয়ে এনেছ। আরে ! এটা কী ? কফি ? ছি ছি ছি ! মিস্টার ব্রাউন, আপনি এখন কফি খাচ্ছেন ?'

মিস্টার ব্রাউন থপথপে পায়ে এগিয়ে গেলেন, 'সাধারণত এই সময় আমি কফি খাই না, তবে ছোটদের অনুরোধ এড়ানো তো যায় না !'

'না না। ভাল কথা নয়। যার যা অভ্যেস তার তাই করা উচিত। চটপট শুরু করা যাক। আমাকে আবার এখনই সোনাদায় ছুটতে হবে। তোমরা বরং কফি খেয়ে নাও।' ডাক্তার তামাং বসে পড়লেন চেয়ারে।

গত রাতে দিয়ে যাওয়া মাংস ফ্রিজ থেকে বের করে খানিকটা প্লেটে ঢেলে দিল সিমি। ওঁরা যখন মদের গ্লাস নিয়ে বসেছেন তখন সিমি কফির কাপ হাতে নিয়ে সায়নকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি সত্যি

কফি খাবে না ?'

সায়ন মাথা নাড়ল, 'না। কফিটা খেয়ে নাও, আমি ফিরব।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে সিমি বলল, 'বাঃ, আকাশটা কীরকম বদলে গেল। আমার আর দার্জিলিং যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'বাঃ। খুব ভাল।'

'তুমি খুশি ?'

'হুঁ।'

'তোমার কথা আমি রাখলাম। আচ্ছা, তোমার বয়স কত ?'

'কেন ?'

'আমি কি তোমার চেয়ে বয়সে একটু বড় হব ? দুর, বয়স জেনে কী হবে ? কেউ একজন তো বড় হবেই। সায়ন, তুমি খুব ভাল। তোমার অসুখ সারিয়ে দেওয়ার জন্যে যদি আমার সব রক্ত দিলে কাজ হত তাহলে আমি দিয়ে দিতাম।' সিমি চোখ বন্ধ করল।

ওরা কথা বলছিল ভেতরের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে। সায়ন অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল। সিমিকে তার ভালমন্দয় মেশানো মেয়ে বলে মনে হত। মন্দ কারণ ও কাউকে সহ্য করতে পারে না। একটু আগে কঙ্কাবতীকে পর্যন্ত নয়। কিন্তু এখন যে কথাগুলো বলল তাতে ওর সম্পর্কে ভাবনা বদলে গেল সায়নের। সে সিমির হাত ধরে বলল, 'তুমি যে এই কথাগুলো বললে তাতেই আমি খুশি।'

সিমি চোখ খুলল, 'কেন বললাম জানো ?'

সায়ন মাথা নাড়ল, না।

'বুঝতে চেষ্টা করো, ঠিক পারবে।'

ঘরের ওপাশে মাংস খেতে খেতে ডাক্তার তামাং বললেন, 'শেষ পর্যন্ত একটি লোক্যাল পেশেন্টকে নিরাময়ে ভর্তি করা গেছে। না করলে গোলমাল হত।'

ব্রাউন কথাটা পছন্দ করলেন কিন্তু কিছু বললেন না। পেটে মদ পড়া সত্ত্বেও তাঁর মন সায়নকে নিয়েই ছিল। ডাক্তার তামাং বললেন, 'ওই ছেলেটিকে আপনি খুব পছন্দ করেন, তাই না ? কী নাম যেন ?'

'সায়ন।'

'হ্যাঁ। ওকে নিয়েই তো কী সব গুজব রটেছিল। রাবিশ !' গ্লাসে চুমুক দিয়ে পানীয় শেষ করে আবার ঢাললেন ডাক্তার তামাং, 'সোনাদায় যেতে হচ্ছে কারণ চেয়ারম্যান আজ ওখানে আসছেন।'

'আপনি তাহলে রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন।'

'না মিস্টার ব্রাউন। এটাকে রাজনীতি বলবেন না। রাজনীতি মানে এখন নোংরামি। ভারতের যত বুড়োহাবড়া মানুষ সেটা করে। দেখলেন না এক একটা ইলেকশন হচ্ছে আর তারপর গদির জন্যে কী খেয়োখেয়ি করছে। আজ বলছে বি জে পি সাম্প্রদায়িক দল কাল বলছে বি জে পি বন্ধু। যে দলের দশটা এম পি আছে তারা মন্ত্রিত্ব পাইয়ে দেবার জন্যে দর হাঁকছে। কিন্তু আমরা এখানে যেটা করছি সেটা পাহাড়ি মানুষের ভালর জন্যে। গতবার এখানে ইলেকশন বয়কট করা হয়েছিল। সামান্য কিছু লোকের ভোটকে এখানকার মানুষের রায় বলে চালানো হয়েছে। এবার সেই সামান্য ভোটও যাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরের জন্যে চিন্তা করা রাজনীতি করা নয়। ডাক্তার তামাং চুমুক দিতেই এলিজাবেথের গলা শোনা গেল বাইরে। মিস্টার ব্রাউন উঠে দাঁড়াবার আগেই এলিজাবেথ ভেতরে ঢুকলেন।

ব্রাউন বললেন, 'আপনি ভিজে যাননি তো ? আমি খুব চিন্তায় ছিলাম।'

এলিজাবেথ বললেন, 'একটু ভিজেছি। কিন্তু আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছে মিস্টার ব্রাউন। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি।'

'কী সিদ্ধান্ত ?' ব্রাউন ঠিক বুঝতে পারছিলেন না।

'আমি এখানে কিছুদিন থেকে যাব। কারণ আমার থাকা উচিত
এলিজাবেথ দৃঢ় গলায় বললেন।

২৩

ডাক্তার তামাং অবাক হয়ে এলিজাবেথকে দেখছিলেন। ভদ্রমহিলার শরীরের গড়ন, চামড়ার রং বলে দিচ্ছে ইনি বিদেশিনী। কথা বলার ধরন থেকে বোঝা যায় ব্রিটিশ নন, আমেরিকান। এরকম একজন বয়স্কা সুন্দরী এই বাড়িতে কী করে এলেন তা বুঝতে পারছিলেন না তামাং।

ব্রাউন বললেন, 'আমি আপনার কথা কিছুই—, একটু যদি পরিষ্কার করে বলেন।'

এলিজাবেথ এবার ডাক্তার তামাংয়ের দিকে তাকালেন। সিমি এবং সায়ন এগিয়ে এসেছে কাছে। এলিজাবেথকে উত্তেজিত হতে দেখে কিছুই ঠাওর করতে পারছে না।

এলিজাবেথ নিজের পোশাক দেখলেন। একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, 'একসকিউজ মি—।' তিনি দ্রুত তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

সেই যাওয়া দেখতে দেখতে ডাক্তার তামাং জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এই ভদ্রমহিলা ? এদেশের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না।'

'না।' মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'উনি আমেরিকায় থাকেন। আমার পরিচিত।'

'আমেরিকায় আপনি কবে গিয়েছিলেন ?'

'জাহাজে চাকরি করার সময়।'

'আপনার এখানেই এসেছেন ?'

'ব্যাপারটা সেইরকম ডাক্তার তামাং।'

'দেখে মনে হল একেবারে হিপি টাইপ নয়। মানে, ভাল অবস্থা—।'

'হ্যাঁ। উনি বেশ সম্পন্ন মহিলা।'

'আপনার এখানে ওঁর অসুবিধে হচ্ছে না ? আমাকে জানালে কোনও ভাল বাংলোয় ওঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিতাম। আপনার এখানে তো কাজের লোকও নেই।'

ব্রাউন বললেন, 'উনি হঠাৎ এসে পড়েছেন। আমার এ বাড়িতে যা যা অসুবিধে তা জেনেও থাকতে চেয়েছেন। অতএব এ নিয়ে কোনও চিন্তা করার দরকার নেই।'

এইসময় ভিজে পোশাক পাল্টে বেরিয়ে এলেন এলিজাবেথ। এখন সহজ দেখাচ্ছে তাঁকে। ব্রাউন পরিচয় করিয়ে দিলেন ডাক্তার তামাংয়ের সঙ্গে। করমর্দন করার পর এলিজাবেথ বললেন, 'খুব ভাল হল আপনার সঙ্গে আলাপ করে। আপনি ডাক্তার, এই কারণেই ভাল হল।'

'কেন ? আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে ?' ডাক্তার তামাং ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'না, না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনি কি স্পেশালিস্ট না—।' কথা খুঁজছিলেন এলিজাবেথ।

ব্রাউন তাঁকে সাহায্য করলেন, 'ডাক্তার তামাং এখানে খুব জনপ্রিয়। জেনারেল প্র্যাকটিস করেন। সাধারণ মানুষের সেইটাই আগে প্রয়োজন।'

'নিশ্চয়ই। আজ সকালে আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু উনি হেমাটলজিস্ট। ওঁকে ওঁর কাজ করতে দেওয়া উচিত।'

'কিন্তু আমাকে কী জন্যে প্রয়োজন তা তো বললেন না ?'

এলিজাবেথ একটু ভাবলেন। সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এলিজাবেথ বললেন, 'এখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চার্চের পাশ দিয়ে ওপাশের পাহাড়ে চলে গিয়েছিলাম। যাওয়ার সময় রাস্তার দুধারের বাড়িগুলো দেখে অস্বস্তি হচ্ছিল। সেগুলো অযত্নে তৈরি, বাচ্চাগুলো কেমন ছন্নছাড়া। চার্চটি সুন্দর। ফাদার ছিলেন না। সেখানে না ঢুকে ওই পাহাড়ে গিয়ে আমি হতভম্ব

হয়ে গিয়েছি। মানুষ যে এত কষ্ট করে শুধু জীবনধারণের জন্যে পশুর মতো বাস করতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। টিভিতে আফ্রিকার খরা এলাকার ছবি দেখেছি। ওদের কিছু নেই। চারপাশে শুধু হাহাকার। কেউ কেউ সন্দেহ করেন টিভিতে ছবি তৈরি করে বাড়িয়ে দেখায়। আমরা মাঝে মাঝে ডোনেট করেছি কিন্তু ওদের প্রত্যক্ষ করিনি। অথচ আজ ওদের ভাঙাচোরা ঘরগুলোতে দাঁড়িয়ে দেখলাম চারপাশে প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও অশিক্ষার কারণে দারিদ্র্য ওদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। একটা পাঁচ মাসের বাচ্চার মায়ের ব্রেস্ট মিল্ক নেই, ফেন খাইয়ে রাখা হয় কারণ তারা দুধ কিনতে পারে না। ভাবা যায় ? কলকাতায় এসে শুনেছিলাম এখানে নাকি কম্যুনিস্টরা সরকার চালাচ্ছে দু যুগ ধরে। কম্যুনিজম মানে তো সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে। সমানভাবে ধনবণ্টন হবে, কিন্তু একী নমুনা দেখলাম আমি ? তিরিশ বছর আগে কেনা ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে যাওয়া কম্বলে বাচ্চাগুলো ওখানে উষ্ণতা খোঁজে ? কোনও কম্যুনিস্ট নেতা কখনও ওদের কাছে পৌঁছোয়নি। শুনলাম কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসনের কিছুটা ক্ষমতা আদায় করে পাহাড়ের মানুষরা নিজেদের দেখাশোনা করছেন এখন। তাঁরাও এদের জন্যে কিছু করেননি। ওরা আমার কথা বুঝতে পারছিল না। আমি ওদের ভাষা জানি না। কিন্তু কান্নার ভাষা বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না।' কথা বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে গেল এলিজাবেথের।

মিস্টার তামাং এরকম প্রতিক্রিয়ার কারণ বুঝতে পারলেও ব্যাপারটাকে সহজ করতে চাইলেন, 'এদেশের মানুষদের বোধহয় আগে আপনি দেখেননি। অধিকাংশই খুব গরিব। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা জীবনটাকে তাদের মতো করে উপভোগ করে। বাইরে থেকে দেখে সেই ব্যাপারটা বোঝা যায় না।'

'উপভোগ করে ? যে শিশুটি দুধের বদলে ফেন খেয়ে বেঁচে আছে সে কী আনন্দ উপভোগ করছে ? ফেনের স্বাদ ? আপনি যে কথা বললেন ডাক্তার তা এককালে রোমান রাজারা বলত দুটো মানুষকে আমরণ যুদ্ধে নামতে বাধ্য করে। বলত মানুষগুলো উপভোগ করছে।' মাথা নাড়লেন এলিজাবেথ, 'মিস্টার ব্রাউন বললেন আপনি এখানকার জনপ্রিয় ডাক্তার। আচ্ছা, আপনি শেষ কবে ওখানে পেশেন্ট দেখতে গিয়েছেন বলুন তো ?'

ডাক্তারের মুখ শক্ত হল। তিনি বললেন, 'আমাকে যদি ওইসব গ্রামের মানুষ কল না দেয় তাহলে আমি যাব কী করে ! আর ওরা যখন বোঝে বাড়িতে থাকলে পেশেন্ট মারা যাবে তখনই হাসপাতালে নিয়ে যায়। যে অবস্থায় নিয়ে যায় সেই অবস্থায় বাঁচানোও শক্ত হয়ে পড়ে।'

'আপনার ফি কত ?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন ?'

'এখানে নিশ্চয়ই কাউকে দেখতে এসেছেন ?'

এবার ব্রাউন বললেন, 'না না। এদিকে কোনও পেশেন্টকে দেখতে এলে ডাক্তার তামাং খানিকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করে যান।'

'আপনি নিশ্চয়ই কাউকে দেখতে এসেছিলেন এদিকে ?'

'হ্যাঁ। সাধারণত আমি কারও বাড়িতে গেলে দেড়শো টাকা নিই।'

'এখানকার লোকেদের প্রধান খাবার কী ? রুটি ?'

'না। এখনও চালই বলা যায়।'

'চালের দাম কত ?'

'এখনও দশ টাকায় পাওয়া যায়। দশ টাকায় এক কিলোগ্রাম।'

'তার মানে আপনাকে বাড়িতে ডাকতে হলে ওদের পনেরো কিলোগ্রাম চালের দাম দিতে হবে। ওরা তো এক কিলোগ্রাম চালই জোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে যায়। তাই না ?'

'ঠিক তাই। সেইজন্যে সরকারি হাসপাতাল আছে। সেখানে গেলে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয় ওদের।'

'আপনাকে যাঁরা বাড়িতে ডাকেন তাঁরা হাসপাতালে যান না কেন ?'

'ওয়েল। প্রত্যেকের নিজস্ব কারণ আছে। যাঁরা খরচ করতে পারেন তাঁরা বারোয়ারি ব্যবস্থায় না

গিয়ে একটু স্পেশ্যাল কেয়ার চান। এই জন্যে লোকে হাসপাতালে না গিয়ে নার্সিংহোমে যায়।'

'তার মানে নার্সিংহোমে হাসপাতালের থেকে ভাল চিকিৎসা হয়?'

'তা তো নিশ্চয়ই। কারণ বেশি টাকা দিতে হয়।'

'বেশি টাকা দিতে হয় আর একদম টাকা দিতে হয় না। এটা কী করে কম্যুনিস্ট সরকারের আমলে সম্ভব?'

'দেখুন ম্যাডাম, আমি কম্যুনিস্ট নই। এ প্রশ্নের জবাব কী করে দেব?

'মিস্টার ব্রাউন, আমাকে এখানকার হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেন?' এলিজাবেথ ঘুরে তাকালেন।

ব্রাউন বললেন, 'আপনার সেখানে ভাল লাগবে না।'

'কেন?'

'এখানকার হাসপাতালগুলোর অবস্থা ভাল নয়।'

'ও। আজ যদি আমি এখানে অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে ওখানে নিয়ে যাবেন না আপনি? আমার যদি বেশি টাকা খরচ করার ক্ষমতা না থাকে?'

সায়ন চুপচাপ শুনছিল। এই বিদেশিনী মহিলা উত্তেজিত হয়ে যেসব কথা বলছেন সেগুলো যে প্রচণ্ডভাবে সত্যি তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। কিন্তু এই সত্যি কথাগুলো নিয়ে চারপাশের কোনও মানুষ ভাবে বলে তার জানা নেই। কলকাতায় ওদের বাড়ির খুব কাছেই হাসপাতাল। কিন্তু সেবার মেজজেঠুর বুকে ব্যথা হতেই সবাই অনেক দূরের নার্সিংহোমে নিয়ে গেল। যেন সেখানে নিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

এলিজাবেথ বললেন, 'মিস্টার ব্রাউন, আমি আমেরিকায় চলে গিয়ে বাকি জীবনটা যেভাবেই কাটাই এইসব মানুষগুলো প্রতিনিয়ত আমাকে তাড়া করে বেড়াবে। দামি গাড়ি, ভাল খাবার, চমৎকার বাড়িতে বসে আমি ভাবব এই মানুষগুলো কীরকম জন্তুর মতো বেঁচে আছে। জানেন, একটি দেড় বছরের শিশু আমার আঙুল ধরে কিছু একটা বলেছিল। ওর মা বলল ও আমার কোলে উঠতে চায়। ইঙ্গিতে বোঝাল আমাকে। আমি কোলে নিতেই বৃষ্টি নামল। বাধ্য হয়ে ওদের ঘরে ঢুকেছিলাম আমি। ওটাকে যে ঘর বলা যায় তা আগে কখনও ভাবিনি। কিন্তু শিশুটির শরীরের উত্তাপ আমার বুকে এখনও লেগে রয়েছে। তাই ভেবে দেখলাম, আমার এখানে কিছুদিন থাকা উচিত। আমার যেটুকু ক্ষমতা আছে তাই দিয়ে ওদের পাশে দাঁড়াতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই মিস্টার ব্রাউন।'

ব্রাউন চোখ বড় করে শুনছিলেন। বললেন, 'নিশ্চয়ই। তবে আপনি নিশ্চয়ই সব কিছু ভেবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।'

'অবশ্যই। প্রথমে আমার একটা নিজস্ব থাকার জায়গা দরকার। সেটা ওই গ্রামটির কাছাকাছি হলে ভাল হয় যাতে ওরা চট করে আমার কাছে আসতে পারে। মোটামুটি থাকা যায় এমন বাড়ি হলেই চলবে।' এলিজাবেথ বললেন।

'খোঁজ নিতে হবে। চাইলেই যে বাড়ি পাওয়া যাবে তেমন আশা করা ঠিক নয়। তবে দেখব।' বলতে বলতেই খেয়াল হল ব্রাউনের, 'ও হ্যাঁ, ডিসুজাদের বাড়ি খালি হবে। মেয়েটা বলছিল ওরা এখান থেকে চলে যাবে। তবে ঠিক কবে যাবে জানি না।'

ডাক্তার তামাং অনেকক্ষণ খালি গ্লাস হাতে নিয়ে বসে কথা শুনছিলেন। এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ঠিক কী কাজ করতে চান?'

'ওটা এখনও ভাবিনি। তবে আমাকে দয়া করে মিশনারি বলে ভাববেন না।'

'কিন্তু এখানে থেকে এসব কাজ করার জন্যে আপনাকে সম্ভবত সরকারি অনুমতি নিতে হবে। আপনি জানেন না, আগে এসব এলাকায় বিদেশিদের আসা নিষিদ্ধ ছিল। তারপর পারমিট নিয়ে আসতে হত। এখন নিয়ম অত কড়া নেই তবে তাঁরা ট্যুরিস্ট হিসেবে বেড়াতে আসতে পারেন, দীর্ঘকাল থাকতে পারেন না।'

'এরকম নিয়মের কারণ কী?'

'ভারত সরকার সীমান্তের কাছাকাছি জায়গাগুলো সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।' ডাক্তার তামাং উঠে দাঁড়ালেন, 'আজ আমি যদি আমেরিকায় গিয়ে দীর্ঘকাল এইসব করতে চাই তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদের সরকার সেটা বরদাস্ত করবে না।'

'কিন্তু যতদিন আমার ভিসার মেয়াদ শেষ না হচ্ছে ততদিন নিশ্চয়ই থাকতে পারি। আর সেই থাকার সময় যদি কারও দিকে বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দিই তাতে আপনার সরকারের আপত্তির তো কারণ নেই।' এলিজাবেথ তেজি গলায় বললেন।

এবার সায়ন কথা বলল, 'কলকাতায় অনেক বিদেশি ফুটবলার বহু বছর ধরে খেলে টাকা রোজগার করছে। তাদের ব্যাপারে কেউ কিন্তু আপত্তি করে না।'

ডাক্তার তামাং কাঁধ নাচালেন, 'হতে পারে। আমার খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। সোনাদায় চেয়ারম্যান হয়তো পৌঁছে গিয়েছেন। আচ্ছা, মিস্টার ব্রাউন, আবার দেখা হবে।'

ডাক্তার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন এলিজাবেথ শেষ মুহূর্তে তাঁকে ডাকলেন, 'ডক্টর!'

ডাক্তার তামাং ঘুরে দাঁড়ালেন।

এলিজাবেথ বললেন, 'আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সময় বলেছিলাম ভাল হয়েছে। ওখানে ডাক্তারের সাহায্য লাগবেই। আপনাকে ডাকলে আসবেন?'

ডাক্তার তামাং বললেন, 'আপনি যদি আমাকে প্রফেশন্যাল কল দেন তাহলে অবশ্যই যাব। আর যদি দাতব্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পেশেন্ট দেখতে বলেন তাহলে ভেবে বলতে হবে, আমি সপ্তাহে একটা সময় বের করতে পারছি কিনা।'

ডাক্তার তামাংয়ের গাড়ির শব্দ হতেই এলিজাবেথ বললেন, 'উনি ঠিকই বলেছেন। আসলে মানুষ যদি সরাসরি মুখের ওপর সত্যি কথা বলে তাহলে তাকে বুঝতে যেমন অসুবিধে হয় না তেমনই কাজ করতেও সুবিধে হয়।'

ব্রাউন বললেন, 'এবাব অন্য প্রসঙ্গে আসি। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি আপনার। বলুন, ব্রেকফাস্টে কী খাবেন?'

হঠাৎ সিমি বলল, 'আপনারা বসুন, আপনাদের ব্রেকফাস্ট আমি বানিয়ে দিচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই বেশি মশলা বা ঝোল খেতে চাইবেন না?'

একগাল হাসলেন এলিজাবেথ, 'হাউ সুইট। হ্যাঁ, আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না।'

ব্রাউন বললেন, 'সিমি, তাহলে সবার জন্যেই ব্রেকফাস্ট বানাও।'

সায়ন মাথা নাড়ল, 'না, মিস্টার ব্রাউন, আমি বাদ।' সিমি চলে গেল।

ব্রাউনের মনে পড়ল, 'ওহো! তোমার কি এখনও বাইরে খাওয়া নিষেধ?'

'আমি চাই না। ওই যে উনি বললেন, ঝুঁকি নিতে চাই না।'

এলিজাবেথ উঠে এলেন সায়নের কাছে, 'তুমি এখন কেমন আছ?'

'ভাল।' সায়ন হাসল।

এলিজাবেথ ওর হাত ধরলেন, 'এখানে তোমাকে আর কতদিন থাকতে হবে?'

'আমি জানি না। তবে কলকাতার থেকে এখানে থাকতে আমার ভাল লাগে।'

'কেন?'

'পাহাড়ের জন্যে। পাহাড়ি মানুষের জন্যে।' সায়ন এলিজাবেথের দিকে তাকাল, 'একটু আগে আপনি বাড়ির কথা বলছিলেন। আমি একটা বাড়ির হদিস দিতে পারি, তবে সামান্য মেরামতি করতে হবে। কিন্তু ওই গ্রাম থেকে কিছুটা দূর হয়ে যাবে।'

'কোথায়? মিস্টার ব্রাউন জানেন?'

'নিশ্চয়ই। উনিই আমাকে চিনিয়েছিলেন।'

ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন বাড়ির কথা বলছ?'

'একটু নীচে যে বাড়িতে পবন বাহাদুর পুড়ে মরে গিয়েছিল। যে বাড়িটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।'

ব্রাউন মাথা নাড়লেন, 'ওটা মেরামত করতে অনেক খরচ হবে। তা ছাড়া মিস্টার মুখার্জিদের

খুঁজে বের করে অনুমতি নিতে হবে। তার চেয়ে আমি নিমা প্রধানের সঙ্গে কথা বলব।'

এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুড়ে কেউ মারা গিয়েছিল ? কী হয়েছিল ?'

ব্রাউন বললেন, 'খুব দুঃখজনক ঘটনা। পাহাড়ের মানুষেরা আন্দোলন করেছিল তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে। ভারত সরকার তাদের বঞ্চিত করে রেখেছে। তা ওই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত চেহারা নিল, পাহাড় পাহাড়িদের জন্যে। আন্দোলনকারীদের একটা অংশকে কিছু স্বার্থান্বেষী উসকে দিল। এসব অঞ্চলে সমতল থেকে আসা প্রচুর মানুষ বহু বছর ধরে বাড়ি বানিয়ে বাস করছে। তাদের তাড়াবার জন্যে লোকগুলোকে লেলিয়ে দেওয়া হল। ওই বাড়িটিতে তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। বাড়ির মালিকরা ছিল না কিন্তু অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল। একটি নেপালি ছেলে, নাম পবন বাহাদুর, হঠকারিদের বাধা দিতে গেল। সেই পাহাড়ি ছেলেটির মনে হয়েছিল কাজটা অন্যায় হচ্ছে। বেচারাকে শহিদ হতে হয়েছিল।'

'মাই গড।' এলিজাবেথ গালে হাত দিলেন, 'বাড়িটাকে দেখতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই। প্রায় শেষ হওয়ার মুখে বাড়িটায় আগুন দেওয়া হয়েছিল। ভেবেছিলাম কাউন্সিল বাড়িটা নিয়ে কোনও জনহিতকর কাজ করবে। করেনি।'

'সমতলের মানুষদের সম্পর্কে ওই মনোভাব এখনও আপনাদের আছে ?'

'আপনাকে বললাম এটা পাহাড়ের সাধারণ মানুষের মনের কথা নয়। খুব সামান্য সংখ্যার মানুষের উগ্র মতবাদকে গ্রাহ্য করা উচিত নয়।'

ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে ঢালু পথ বেয়ে নিরাময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সায়ন। কী আশ্চর্য। এর মধ্যে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কালো মেঘের দল উধাও। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সাদাটে মেঘেরা সেঁটে আছে চুপচাপ। হালকা রোদ উঠব উঠব করছে। পাহাড় কী দ্রুত নিজের চেহারা বদলে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সিমির কথা মনে পড়ল। সিমিও কি পাহাড়ের মতো ? মিস্টার ব্রাউনের বাড়িতে যাওয়ার আগে ও কত রূঢ় কথা বলেছিল। মিস্টার ব্রাউনকে গালাগাল দিয়েছে, এলিজাবেথকে সহ্য করতে পারেনি। অনেক অনুরোধ করে ওকে নিয়ে যেতে পেরেছিল সায়ন। সিমি যাতে বর খুঁজতে দার্জিলিং-এ না যায় তাই ওই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কী হল ? সেই মেয়ে এখন কিচেনে গিয়ে মিস্টার ব্রাউন আর এলিজাবেথের জন্যে ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে ? এলিজাবেথের কী খেতে অসুবিধে হবে জেনে নিচ্ছে ? সিমির এই পরিবর্তন অবশ্য এলিজাবেথের কথায় হয়েছে। এবং সেটা হওয়ায় ভারি ভাল লাগছিল সায়নের।

নিরাময়ের গেটের সামনে যেতেই ঘটনাটা ঘটল। একটা লোক হাউমাউ করে চেঁচিয়ে সোজা সায়নের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগল, 'তুমি আমার ভগবান, তুমি আমার ভগবান।'

সায়ন কিছুতেই লোকটাকে ছাড়াতে পারছিল না। এই সময় ছোটবাহাদুর বেরিয়ে এসে লোকটাকে জোর করে সরিয়ে নিল। লোকটা তখনও কাঁদছিল। ছোটবাহাদুর তাকে ঝাঁকিয়ে জোর গলায় বলল, 'কী হচ্ছে কী ? কে তুমি ? কী চাই ?'

লোকটা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'উনি ভগবান। আমার মেয়েকে বাঁচানো যাবে না বলেছিল এখানকার ডাক্তাররা। উনি বলেছিলেন শিলিগুড়িতে নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে। ওঁর শরীরের রক্ত একটা রুমালে ছিল। সেটা মেয়ের মাথায় ঠেকিয়ে আমি শিলিগুড়িতে নিয়ে যাই। সেখানে বড় ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে মেয়ে এখন অনেক ভাল আছে। ডাক্তার বলেছে ওর আর কোনও ভয় নেই। ওষুধ খেয়ে যেতে হবে আরও তিন হপ্তা। আজ ওকে শিলিগুড়ি থেকে এখানে নিয়ে এসেছি। ওঁর জন্যেই আমার মেয়ে জীবন ফিরে পেল।'

ছোটবাহাদুর হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় থাকো ?'

'আমি ট্যুরিস্ট লজে চাকরি করি।'

এতক্ষণে মনে পড়ল সায়নের। সে চোখ বন্ধ করল। লোকটা কথা বলছিল নেপালিতে কিন্তু বুঝতে কোনও অসুবিধে হয়নি। সে এগিয়ে গেল লোকটার সামনে, 'তুমি আমার রক্তমাখা রুমাল মেয়ের শরীরে ঠেকিয়ে খুব অন্যায় করেছ। আমি একজন সাধারণ মানুষ। ভাল ডাক্তার ঠিক ওষুধ দিয়েছেন বলে তোমার মেয়ে সুস্থ হচ্ছে। যাও এখান থেকে।'

কথাগুলো বাংলায় বললেও লোকটা হতভম্ব হয়ে শুনল। সায়ন আর বাইরে না দাঁড়িয়ে প্যাসেজে পা রাখল।

নিয়মিত ওষুধ এবং পথ্য ছাড়া আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয় এটা সায়ন বুঝে গিয়েছে। ডাক্তারবাবুর কাছে যেসব মেডিক্যাল জার্নাল আসে সেগুলো তাঁর অফিসের র‍্যাকেই থাকে। দুপুরবেলায় সায়ন মাঝে মাঝেই সেখানে যায়, পাতা ওল্টায়। আজকের ডাকে আসা জার্নালে এই অসুখ সম্পর্কে অনেকটা আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞান চেষ্টা করে চলেছে প্রকৃতিকে হারাতে। এখন পর্যন্ত বোন ম্যারো পাল্টে, বারংবার রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা পেশেন্টদের সম্পর্কে আলোচনা পড়তে পড়তে চমকে উঠল সায়ন। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ। থাকেন জার্মানিতে। পাঁচ বছর ধরে ওষুধ এবং ডাক্তারের ওপর নির্ভর করেছিলেন তিনি। যখন সুস্থ থাকতেন তখন হাঁপিয়ে উঠতেন। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষ যা করছে তাই করার জন্যে ছটফট করতেন। শেষ পর্যন্ত ওইরকম সুস্থ থাকার সময়ে একদিন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সমুদ্রের ধারে চলে গিয়ে দিব্যি আছেন সেখানে। রোজ ভোরে ওঠেন। চার কিলোমিটার হাঁটেন। প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি আর সামুদ্রিক মাছ খান। নিয়মিত সমুদ্রে সাঁতার কাটেন। গত ছয় মাসে তিনি একবারও অসুস্থ হননি। পেশেন্টের মনের জোর এক্ষেত্রে রোগকে মাথা তুলতে দিচ্ছে না, এ কথা ডাক্তাররা বলছেন না। কিন্তু সেটা যে একটা কাবণ তাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

নিজের ঘরে ফিরে এল সায়ন। কোথায় যেন পড়েছিল সে জীবের জন্ম হয় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। খুব অল্প সময়ের জন্যে মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। একটা কচ্ছপ তার চেয়ে অনেক বেশি আয়ুর অধিকারী। এই বেঁচে থাকার সময়টায় কেউ কেউ এমন কিছু কাজ করে যান বলেই তাঁকে মনে রাখে পরবর্তী কালের মানুষেরা। শুধু মরে যাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় ? চট করে এলিজাবেথের মুখ মনে পড়ল তার। কোথায় আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস আর কোথায় এই পাহাড় ! ভদ্রমহিলা বেড়াতে এসেছিলেন মিস্টার ব্রাউনের কাছে। এসে এখানকার মানুষের দুর্দশা দেখে কিছুদিন থেকে যাওয়ার কথা ভেবেছেন। থেকে গিয়ে ওদের যতটা পারবেন সাহায্য করবেন ? কেন ? এদেশে প্রচুর বড়লোক আছেন, কই তাঁরা তো এমন ভাবছেন না ! ডাক্তার তামাংয়ের সঙ্গে এলিজাবেথ যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন তার প্রত্যেকটা কথাই সত্যি।

সায়নের মনে হল তার কিছু করা উচিত।

শুয়েছিল কঙ্কাবতী। এখানে আসার পরে তার শরীর খানিকটা ভাল। আজ মিসেস অ্যান্টনির সঙ্গে নীচে নেমেছিল। খুব ভাল লাগছিল তখন। কিন্তু ওপরে ওঠার সময় কাহিল হয়ে পড়ল। কথাটা মিসেস অ্যান্টনিকে না বললেও তিনি যে বুঝতে পেরেছিলেন তা কিছুক্ষণ পরে টের পেয়েছিল কঙ্কাবতী। হঠাৎ ডাক্তারবাবু এসে হাজির, 'কী ব্যাপার হে ? কেমন আছ ?'

ফ্যাকাশে মুখে ক্লান্ত গলায় কঙ্কাবতী বলেছিল, 'ভাল।'

'ভাল তো থাকবেই। এখানে এসে কেউ খারাপ থাকে না। দেখি।' ডাক্তারবাবু তার পাল্স পরীক্ষা করলেন। তারপর ঈষৎ ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী খেতে ইচ্ছে করছে ? মাছ মাংস ডিম মিষ্টি—, যা ইচ্ছে তাই বলো।'

কঙ্কাবতী মুখ ফেরাল, ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি।

ডাক্তার বললেন, 'উঁহু। তুমি না বলা পর্যন্ত এখান থেকে নড়ব না আমি।'

'আমার খেতে ইচ্ছে করে না।'

'জানি তো। তবু যদি কিছু ভাল লাগে। মুরগির স্টু না করে ঝোল করলে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। অল্প ঝাল থাকলে চমৎকার। তাই না ?'

কঙ্কাবতী তাকাল। তারপর সলজ্জ গলায় বলল, 'হাতিশাক খাব।'

'হাতিশাক ? ওহো, মাথাটা হাতির শুঁড়ের মতো হয় ? আরে এই শাক তো রাস্তার দুপাশে আগাছার মতো ছড়িয়ে আছে। আমরা বলি ঢেঁকির শাক। পেঁয়াজ দিয়ে চচ্চড়ি রাঁধলে দারুণ হয়। আমি এখনই মিসেস অ্যান্টনিকে বলছি।' কথা বলতে বলতে ডাক্তার একটা প্যাকেট খুলে

ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ বের করলেন, 'দেখি এবার হাতটা দাও। হ্যাঁ।' সিরিঞ্জে রক্ত টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লাগেনি তো ?'

'না।'

দুপুরে ভাতের পাশে হাতিশাকের চচ্চড়ি ছিল। যখন মায়ের হাতে টাকা থাকত না তখন এই শাকই ওদের পেট ভরাত। ওরা একা নয়, বস্তির সমস্ত গরিব মানুষের খাবার হল এই শাক আর স্কোয়াশ। শাকটা খাওয়ার সময় বেশ গন্ধ পেয়ে ভাল লেগেছিল কঙ্কাবতীর।

আজ বিকেলে মা এল বেশ সেজেগুজে। মাকে এমন সাজতে সে অনেকদিন দেখেনি। টিপ পরা ছেড়ে দিয়েছিল মা বাবা বেঁচে থাকতেই। আজ কপালের মাঝখানে খয়েরি টিপ পরায় মাকে কী মিষ্টিটাই না দেখাচ্ছিল। সারাজীবন মা খুব কষ্ট পেয়ে এসেছে। বাবা থাকতে এক কষ্ট, চলে যাওয়ার পর আর এক কষ্ট। তার এই অসুখটাও মাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছে। এরকম সময়ে মা যদি একটু ভাল থাকে তাহলে খুশি হওয়ারই কথা। মা তার বিছানার পাশে এসে বলল, 'ডাক্তারবাবু বলল আজ রাত্রে তোকে রক্ত দেওয়া হবে।'

'কখন বলল ?'

'এই তো, এখন। কাল শুনে গেলাম তুই ভাল আছিস, আমার কী কপাল। ভগবান কখনও একটুও সুখ দেবেন না আমাকে।'

'আমি ভাল আছি মা।'

'ভাল থাকলে রক্ত দেবে কেন ?'

'হয়তো আরও ভাল থাকার জন্যে।'

'ইস্‌স। রক্তের কত দাম জানিস ? পার্টির ভয়ে বিনা পয়সায় তোকে এখানে রেখেছে তারপর কারণ ছাড়া রক্ত দেবে বলে আমি ভাবি না। কী যে করি !'

'কেন ? কী হয়েছে ?'

'আমার যে শিলিগুড়ি যাওয়ার খুব দরকার।'

'কেন ?'

'পার্টির কাজে।'

'পার্টির কাজ ? তুমি পার্টির কাজ করছ নাকি ?'

'বাঃ। যারা তোর এত উপকার করল তারা বললে না বলি কী করে ?'

'মাসির বাড়িতে থাকবে ?'

'না। সেবার তোর মাসি যে খারাপ ব্যবহার করেছিল তা আমি কী করে ভুলব। তোকে ঝিয়ের মতো খাটিয়েছিল। ওই জন্যে তো অসুখটা হল।'

'ওই জন্যে কারও এই অসুখ হয় না মা।'

'কেন হয় ?'

'জানি না।'

মা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর ওর হাতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'তা ছাড়া কাজটা তো ঠিক শিলিগুড়িতে নয়, যেতে হবে মালবাজারের দিকে।'

'বেশ তো, যাও না।'

'কী করে যাব। তোকে আজ রক্ত দেবে। যদি শরীর খারাপ হয়ে যায় ?'

'শরীর খারাপ হলে ডাক্তারবাবু দেখবেন। তুমি থেকে তো কিছু করতে পারবে না।'

'তা পারব না।'

'তাহলে ?'

'লোকে কী বলবে ? মেয়েটাকে ফেলে চলে গেল।' মা চিন্তিত।

এই সময় মিসেস অ্যান্টনি এলেন, 'প্রাইভেট কথা হচ্ছে না তো !'

মা মাথা নাড়ল, 'আর প্রাইভেট। আচ্ছা, মেয়ের কী এমন হয়েছে যে আজ রক্ত দিতে হবে। ওষুধ খাওয়ালে ঠিক হবে না ?'

'ওষুধে যদি হয়ে যেত তাহলে ডাক্তারবাবু রক্ত দেওয়ার কথা ভাবতেন না। আর রক্ত দেওয়া হবে বলে ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'রক্তের কথা ভাবলেই আমার ভয় আসে।'

'না না। খিদে পেলে যেমন আমরা খাই তেমনই শরীরের রক্ত কমে গেলে রক্ত দিলেই কাজ হয়। আপনি এজন্যে চিন্তা করবেন না। কঙ্কাবতী মোটেই ভিতু নয়। তাই না। এই মেয়ে, দেখেছ, তোমার মাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে।' মিসেস অ্যান্টনি কথাটা বলতেই এই যৌবনের শেষ ধাপে এসেও গালে লালচে ছোপ লাগল কঙ্কাবতীর মায়ের।

লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'কী যে বলেন, কোথায় কী?'

কঙ্কাবতী বলল, 'মাকে শিলিগুড়িতে যেতে হবে। এই খবরটা শুনে কী করবে বুঝতে পারছে না। আমি বললাম, যাও, ঘুরে এসো।'

'হ্যাঁ। কাজ থাকলে চলে যান। কোনও চিন্তা করবেন না।' মিসেস অ্যান্টনি এক গ্লাস জল আর ক্যাপসুল নিয়ে কঙ্কাবতীর কাছে গেলেন, 'হাঁ করো তো।'

কঙ্কাবতী বলল, 'আমার আর ওষুধ খেতে ভাল লাগে না।

'ভাল না লাগলেও খেতে হবে মা। এই দ্যাখো না, সায়ন কীরকম হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওষুধ খায় বলেই ভাল আছে ও।' মিসেস অ্যান্টনি বললেন।

কঙ্কাবতীর মায়ের যেন কিছু মনে পড়ে গেল, 'ওর নাম সায়ন, না!'

'কার নাম?' মিসেস অ্যান্টনি ওষুধ খাইয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওই যে, মাদার মেরির সামনে যে মোমবাতি জ্বালাতে গিয়েছিল— !'

'ওহো। গল্পটা আপনিও শুনেছেন!'

'বাঃ। কে না শুনেছে। খুব ভিড় হয়েছিল এখানে?'

'তা হয়েছিল। কিন্তু যেই লোকে জানল সায়ন নিজেই অসুস্থ আর সেই অসুখটা সে সারাতে পারছে না তখন বেশির ভাগেরই উৎসাহ কমে গেল।'

'তুই দেখেছিস ওকে?' মা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ।'

কঙ্কাবতীর মা একটু ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আমি যে বাইরে যাচ্ছি তা ডাক্তারবাবুকে বলে যেতে হবে?'

'আপনি তো আমাকে বললেন, আমি বলে দেব। শুধু খুব দরকার পড়লে আপনাকে যেখানে পাওয়া যাবে সেই ঠিকানাটা যদি রেখে যান— !'

'ঠিকানা, ঠিকানা তো আমি ঠিক জানি না!' মা বলল।

'যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার কাউকে জানেন না?'

'না, মানে, পার্টির কাজে যাচ্ছি তো, ওরাই পাঠাবে। অবশ্য আমি দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসব।'

'ঠিক আছে। তেমন প্রয়োজন হলে লোক্যাল পার্টিকে জানিয়ে দেব।'

'তেমন প্রয়োজন কি হবে বলে মনে হয়?'

'না না। বললাম তো চিন্তা করবেন না। নিন, আপনারা গল্প করুন।' মিসেস অ্যান্টনি বেরিয়ে গেলেন।

মা বলল, 'এখানকার সবাই বেশ ভাল, না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি একটা কথা ভুল বলেছ।' কঙ্কাবতী বলল।

'কী?'

'এখানে আমি আছি ডাক্তারবাবুর জন্যে। উনি যদি রাজি না হতেন তাহলে তোমার পার্টি কিছুই করতে পারত না।'

'কী করে বুঝলি?'

'আমি জানি।'

মা কিছুক্ষণ মেয়ের মাথায় হাত বোলালেন, 'আমি তোকে খুব বকি, না ? আমার ওপর রাগ করেছিস ?'

নীরবে মাথা নেড়ে না বলল কঙ্কাবতী। একটু বাদে মা উঠে দাঁড়াল, 'আমি আজ চলি, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'তুমি আজই চলে যাবে।'

'হ্যাঁ।'

'শিলিগুড়িতে কার সঙ্গে যাবে ?'

'লোকজন আছে।' মা মুখ নামাল, 'চলি।'

মেয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মা চারপাশে তাকাল। করিডোরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকজন। দেখলেই বোঝা যায় এরা পেশেন্ট। মহিলা তাদের একজনের কাছে গিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'সায়ন কোথায় থাকে ?'

বালক হাত তুলে ঘর দেখিয়ে দিল।

প্রায় নিঃশব্দে চলে এল মহিলা। দরজায় পৌঁছে উঁকি মারতে দেখতে পেল একটি ছেলে চেয়ারে বসে কিছু পড়ছে, তার পেছনটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কান খাড়া করে শুনল মহিলা। নিশ্চয়ই কবিতা। 'তবুও ভোরবেলা আবছা মানুষেরা আবছা-আরও মায়াজাল খোঁজে। দগ্ধ বিনুনির গন্ধ মোছা দিন সদ্য জেগে ওঠে আলগোছে।' চটি বইটি বন্ধ করে ছেলেটি বলল, 'চৈতালী, আপনি বড় ভাল লেখেন। আঃ, আমি যদি এরকম লিখতে পারতাম !'

ছেলেটি উঠে দাঁড়াতেই সোজা হয়ে গেল মহিলা।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন। কিছু চাই আপনার ?'

মহিলা অপলকে তাকিয়েছিল সায়নের মুখের দিকে। হঠাৎ যেন মনে হল তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

সায়নের মনে হল এই মহিলাকে সে আগে দেখেছে। দেখলে এখানে এই নিরাময়েই দেখা হয়েছে। তারপরেই খেয়াল হল, ইনি কঙ্কাবতীর মা নন তো ? সেদিন এঁকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। আজ মনে হচ্ছে বয়স অনেক কমে গিয়েছে।

সায়ন ডাকল, 'মা, আপনি কিছু বলবেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল মহিলার। দ্রুত মাথা নেড়ে না বলতে লাগলেন তিনি। দরজা ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল মহিলা, 'আচ্ছা, মা মেরি তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন ?'

'না তো !'

'তুমি খ্রিস্টান ?'

'না। আমার বাবা মা হিন্দু।' সায়ন এগিয়ে গেল, 'আপনি একটু বসুন। মনে হচ্ছে আপনি অসুস্থ।'

কঙ্কাবতীর মা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসল। সায়ন কোনও কথা না বলে বিছানায় বসে মহিলাকে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মহিলা যেন নিজের মনেই বলল, 'কী করব ? আমার কী করা উচিত !'

'যেটা করলে মন ভাল থাকবে তাই করা উচিত।'

'কিন্তু সেটা করতে চাইলে আমার চাকরি চলে যেতে পারে।'

'কেন ?'

'যে আমায় চাকরি দিয়েছে তাকে অস্বীকার করতে হবে। আর তাহলেই সে রেগে যাবে। তাকে খুশি করতে আমি ইচ্ছের বিরুদ্ধে— !'

কথাটা শেষ করতে পারল না মহিলা।

'নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করা ঠিক নয় মা।'

'তুমি আমাকে মা বলছ ?'

'বাঃ। আপনি তো কঙ্কাবতীর মা। তাহলে আমার মা হবেন না কেন ? আপনার শরীর এখন

ভাল লাগছে ?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা বাবা, আসি।' উঠে দাঁড়াল মহিলা।

'আসুন। আবার দেখা হবে। আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন না মা মেরির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে কিনা ? পাথরের মূর্তি কী করে কথা বলবে ? কিন্তু আপনি মানুষ, তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম।'

কঙ্কাবতীর মা দ্রুত নীচে নেমে এলেন। অফিসঘরের দরজায় দাঁড়ানো মিসেস অ্যান্টনিকে দেখে এগিয়ে গেল, 'শুনুন, আমি ঠিক করলাম কোথাও যাব না এখন। তাই পুরনো ঠিকানাতেই আমাকে পাবেন।'

কঙ্কাবতীর মা যখন হনহনিয়ে নিরাময় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন গণেশ গেটের সামনে। মহিলা তাকে লক্ষ করেনি বুঝে মাথা নাড়িয়ে হাসল গণেশ। তারপর প্যাসেজে পা রাখল।

২৪

কঙ্কাবতীর মন ভাল ছিল না। মিসেস অ্যান্টনি হাসিমুখে জানিয়ে যাওয়ার পর মনে হল তার জন্যেই মাকে অনেক কিছু ছাড়তে হচ্ছে। যাব বলেও শেষ পর্যন্ত শিলিগুড়িতে যাচ্ছে না। তাকে যাওয়ার কথা বলে নীচে গিয়ে অন্য কথা কেন বলল সেটাই সে বুঝতে পারছিল না। অথচ মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় সে বুঝতে পারছিল যেতে পারলে মা খুশি হবে। একটা মানুষ দিনের পর দিন একই জায়গায় আটকে অভাবের সঙ্গে কতদিন লড়ে যেতে পারে ! গেলে মায়ের জীবনে বৈচিত্র্য আসত। আর এই সব ভাবতেই তার মন আরও খারাপ হয়ে গেল। সে যদি এই ধরনের অসুখে আক্রান্ত না হত তা হলে মাকে এভাবে আটকে থাকতে হত না। তার রক্তে অসুখ ঢুকেছে। সাধারণ কোনও অসুখের মতো সেটা তাড়াতাড়ি সেরে যাওয়ার নয় তা এতদিনে সে বুঝে গেছে। নার্সিংহোমে সে কিছু বই মাকে দিয়ে আনিয়েছিল। কিন্তু এখন আর সেগুলোয় চোখ বোলাতে একটুও ইচ্ছে হয় না। সে স্কুলে যেতে পারবে কিনা, পরীক্ষায় বসতে পারবে কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

হঠাৎ দরজায় কেউ এসেছে বুঝতে পেরে মুখ ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল কঙ্কাবতী। গণেশ দাঁড়িয়ে হাসছে। সে উঠে বসে চাদরটা গলা পর্যন্ত টানতেই গণেশ ঘরে ঢুকে টুলের ওপর বসল, 'বাঃ, বেশ আছ। সুন্দর ব্যবস্থা।'

'কী চাই ?' কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করল।

'তোমাকে দেখতে এলাম।' গণেশ হাসল।

'আসার দরকার ছিল না।' কঙ্কাবতী মুখ ফেরাল।

'বাঃ। আমি তোমাকে এখানে ভর্তি করালাম আর আমি আসব না ? পার্টির চাপ না থাকলে ওই শালা ডাক্তার তোমাকে বিনা পয়সায় এখানে রাখত ? কখনও না। বাঙালিরা শুধু পয়সা কামাবার ধান্দায় পাহাড়ে এসে থাকে।' গণেশ পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বের করল।

'খবরদার, তুমি এখানে সিগারেট খাবে না ?'

'কেন ? আমি তো হাসপাতালে গিয়েও খাই।'

'এখানে খাওয়া নিষেধ।'

'আচ্ছা ! ঠিক আছে, খাব না।' প্যাকেট পকেটে ঢুকিয়ে রেখে গণেশ হাসল, 'তোমার মা একটু আগে এসে কী বলে গেল ?'

'তাতে তোমার কী দরকার ?'

'এই !' মুখ শক্ত হল গণেশের, 'এত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছ কেন ? তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল বলে আসাযাওয়া করি। কোনওদিন বেইজ্জত করিনি। তোমার মা কী করছে তা

জানো ?'

কঙ্কাবতী অবাক হয়ে তাকাল।

গণেশ বলল, 'মায়ের খারাপ কাজের কথা শুনতে কোনও ছেলেমেয়ের ভাল লাগে না জানি। কিন্তু যা সত্যি তা তোমার শোনা দরকার।'

'কী বলতে চাইছ ?'

'আমি শালা তোমার সঙ্গে ধান্দা করব বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোক্যাল সেক্রেটারিকে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। যাতে তোমাদের উপকার করা যায়। লোকটা তোমার মায়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে।' হাসল গণেশ।

কঙ্কাবতীর চোখ ছোট হল।

'এসব কথা আমাকে বলে তোমার কী লাভ হবে ?'

'বলব না ? নিজের মাকে সতর্ক করো।'

'মায়ের ব্যাপার মা-ই ভাল বুঝবে।'

'বুঝতে পারলে ভাল হত। এই যে শুকনাতে যে মিটিং হচ্ছে তাতে আমরাই যাচ্ছি না তো তোমার মায়ের যাওয়ার কী দরকার ? আমি জানি মিটিং-এর পরে ওরা শিলিগুড়িতে গিয়ে কোনও হোটেলে উঠবে। তুমি জানো কি তোমার মা শুকনায় যাচ্ছে ? জানো না। এখানে অসুবিধে বলে শিলিগুড়ির হোটেলে থাকবে।'

'তুমি এই ঘরে কী করে এলে ?' কঙ্কাবতীর কণ্ঠস্বর পাল্টে গেল।

'মানে ?' গণেশ অবাক।

'এখানে আসার সময় কেউ বাধা দেয়নি ?'

'বাধা দেবে ? আমাকে ? কারও হিম্মত আছে ? হুঁঃ। জিজ্ঞাসা করতেই তোমার ঘর দেখিয়ে দিল।' হাসল গণেশ।

'তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও।'

'যদি না যাই ?'

'আমি চেঁচাব। ডাক্তারবাবুকে ডাকব।'

'হারামিটাকে ডাকো। ওর ব্যবসা করা আজই ঘোচাচ্ছি।'

এই সময় মিসেস অ্যান্টনি দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তাকে দেখল গণেশ। তারপর উঠে দাঁড়াল, 'তোমার উপকার করতে এসেছিলাম। তুমি বহুত খারাপ ব্যবহার করলে। আরে তোমার সম্পর্কে আমার মনে এক সময় ধান্দা এসেছিল ঠিকই কিন্তু এখন সেটা নেই। কেন নেই জানো ? ডাক্তার তামাং আমাকে সব কথা খুলে বলেছে। তোমার রক্তে ক্যানসার হয়েছে। বেশি দিন বাঁচবে না তুমি। যে মেয়ে বেশি দিন বাঁচবে না তার সঙ্গে প্রেম করে কী লাভ ?'

কথাটা বলেই হনহন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল গণেশ। মিসেস অ্যান্টনি খপ করে তার হাত চেপে ধরতেই সে দাঁড়িয়ে গেল। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'এসব কথা বলতে তুমি এখানে এসেছ ? বদমাইস। চলো, তোমার ব্যবস্থা করছি।'

গণেশ হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতেই মিসেস অ্যান্টনি চিৎকার করলেন, 'দারোয়ান, দারোয়ান! জলদি এসো।'

ততক্ষণে হাত ছাড়িয়ে দৌড়োতে শুরু করেছে গণেশ। কিন্তু নীচে নামার সিঁড়ির মুখে তার সঙ্গে বড়বাহাদুরের সংঘর্ষ হয়ে গেল। দু হাতে তাকে জাপটে ধরল বড়বাহাদুর। প্রচণ্ড চিৎকার করে গালাগাল দিচ্ছিল গণেশ। তাকে টানতে টানতে নীচে নামাতেই ডাক্তার বললেন, 'ওকে অফিসরুমে নিয়ে এসো।'

অফিসের সামনে কর্মচারীদের ভিড় দেখে সায়ন কৌতূহলী হল। এই নিরাময়ে এমন দৃশ্য দেখা যায় না। সে ভিড় সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই শুনল ডাক্তার বলছেন, 'তুমি চুপ করে বসে থাকো। মিসেস অ্যান্টনি, কী হয়েছে বলুন তো ?'

মিসেস অ্যান্টনি উত্তেজিত ছিলেন। তাঁর মুখ থেকে নেপালি বেরিয়ে এল। তিনি যা শুনেছেন

তা দ্রুত বলে ফেললেন। ডাক্তার গণেশের দিকে তাকালেন। গণেশ উদ্ধত ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসেছিল। ডাক্তার তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'ঠাণ্ডা মাথায় যারা মানুষের ক্ষতি করতে চায় তাদের কী শাস্তি পাওয়া উচিত ?'

'আমি কারও ক্ষতি করিনি। আপনারা কিন্তু নিজের বিপদ ডেকে আনছেন। এইভাবে আমাকে আটকে রাখার জন্যে বহুত দাম দিতে হবে, মনে থাকে যেন !'

'দাম তুমি আর কী নেবে হে !' ডাক্তার এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বড়বাহাদুরকে বললেন, 'ও যেন পালাতে না পারে। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত এই ঘরে ওকে আটকে রাখবে।'

গাড়ি বের করলেন ডাক্তার গ্যারাজ থেকে। সায়ন এগিয়ে গেল, 'আমি আপনার সঙ্গে যাব ?'

মাথা নাড়লেন ডাক্তার, 'না। তুমি এখানেই থেকো, দেখো যেন আর কোনও ঝামেলা না হয়। আর হ্যাঁ, মেয়েটার অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল নেই। ওর সঙ্গে কথা বলো। আমি এখনই ফিরে আসছি।'

যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালিয়ে ডাক্তার থানায় এলেন। থানায় লোক নেই বললেই চলে। একজন সেপাই বলল, 'চেয়ারম্যান সাহেব সোনাদা এসেছেন বলে সাহেবরা সেখানে গিয়েছেন।'

কোনও বিশেষ কারণে চেয়ারম্যান যদি ওসিকে ডেকে পাঠান তা হলে তিনি থানা ছেড়ে যেতেই পারেন। যদিও ওসির ওপর তাঁর সরাসরি কর্তৃত্ব নেই। সোনাদা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। মিনিট দশেকের মধ্যে সেখানে পৌঁছে ডাক্তার জানতে পারলেন স্থানীয় একটি স্কুলে সম্মেলন হচ্ছে এবং চেয়ারম্যান ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন। স্কুলের গেটের বাইরে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢোকার সময় ক্যাডাররা বাধা দিল। কার্ড ছাড়া ঢোকা যাবে না। এটা দলীয় সম্মেলন। বাইরের লোকদের প্রবেশ নিষেধ।

ডাক্তার বললেন, 'আমাকে দলের বাইরের মানুষ বলে কেন ভাবছ ?'

'আপ বাঙ্গালি হ্যায় না ?'

'হ্যাঁ।'

'তো !'

এর জবাবে কী বলা যায় ভেবে পাচ্ছিলেন না ডাক্তার। যে ছেলেটি তার সঙ্গে কথা বলছে তার জন্মের আগেই তিনি এই পাহাড়ে চলে এসেছিলেন।

ডাক্তার বললেন, 'ঠিক আছে। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি। তুমি যদি দয়া করে ওসি সাহেবকে খবর দাও তা হলে কৃতার্থ হব।'

'কোন ওসি ? এখানে তো তিনটে থানার ওসি হাজিরা দিয়েছে।'

ডাক্তার তাঁর এলাকার নাম বললেন।

মিনিট চারেক বাদে ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন ডাক্তার। হাসি হাসি মুখের নেপালি ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে ! ডাক্তার ! আপনি এখানে ?'

'আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।'

'নিশ্চয়ই খুব জরুরি, না হলে এখানে আসতেন না। আসুন, ভেতরে আসুন।'

'এটা দলীয় সম্মেলন। এই ছেলেটি বলছে ওখানে যাওয়ার অধিকার আমার নেই।'

ওসি ছেলেটির দিকে তাকালেন, 'কাকে কী বলছ তুমি ? ওঁকে আসতে বলো।'

ছেলেটি ইশারা করল বাঁ হাত নেড়ে ভেতরে যেতে।

লনে বেশ ভিড়। সবাই নিচু গলায় কথা বলছে। ওসি ডাক্তারকে নিয়ে একপাশে সরে এলেন, 'বলুন, প্রব্লেম কী ?'

ডাক্তার ঘটনাটা বললেন। তারপর যোগ করলেন, 'আমরা কোনও মানুষকে সুস্থ করতে পারি না, তার আয়ু যাতে বাড়ে সেই চেষ্টা করি। কিন্তু এই ছেলেটি মানসিক আঘাত দিয়ে মেয়েটির ক্ষতি করেছে। সে জানত না তার লিউকোমিয়া হয়েছে। জানি না এটা শোনার পর সে কী করবে ?'

ওসি মাথা নাড়লেন, 'ভেরি ব্যাড। ওর প্রচণ্ড শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আমার মনে হয়

পুলিশের এক্ষেত্রে কিছু করার নেই।'

'কেন ? ও অপরাধ করেছে।'

'করেছে। কিন্তু এটা এমন অপরাধ যা আইনের ফাঁক খুঁজে পাবে। ছেলে যদি বাবাকে খেতে না দেয়, অনাহারে বাবা যদি মারা যায় তা হলে পুলিশ ছেলেকে শাস্তি দিতে পারে না। অপরাধ করেও ছেলে বেঁচে যায়। হ্যাঁ, বিদেশের আইন মানসিক আঘাত দেওয়ার জন্যে ছেলেটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সক্ষম। এ দেশে শারীরিক আঘাতই প্রতিকার পায় না। ছেলেটার নাম কী ?'

'গণেশ। সে একজন রাজনৈতিক কর্মী। তার দলের সম্মেলন এখানে হচ্ছে অথচ এখানে না এসে সে একটি অসুস্থ মেয়ের ক্ষতি করতে নিরাময়ে গিয়েছে।'

'গণেশ। বুঝতে পেরেছি। ছেলেটা খুব বজ্জাত। তার অবশ্য এখানে আসার কথা নয়। এটা দলের অন্য শাখার সম্মেলন। কিন্তু ও জানল কী করে মেয়েটার লিউকোমিয়া হয়েছে ?' ওসি জিজ্ঞাসা করলেন।

'ডক্টর তামাং নাকি ওকে বলেছেন।'

ওসি বললেন, 'ডক্টর ! আপনি আমার অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করুন। একটা মেয়েকে মানসিক আঘাত দিয়েছে বলে ওকে আমি অ্যারেস্ট করলে কোর্টে জামিন পেয়ে যাবে। যদি কোর্টে না পাঠিয়ে মারধর করি তা হলে পার্টি আমার বারোটা বাজিয়ে দেবে। দলের যে কোনও ক্যাডারের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার আগে লোক্যাল কমিটির সঙ্গে কথা বলতে হয়।'

'কিন্তু ছেলেটা আমাকে শাসিয়েছে।'

'হ্যাঁ। ওর নাম গণেশ বলেই আমি আপনাকে অন্য পথে যেতে বলছি।'

'কোন পথ ?'

'আসুন আমার সঙ্গে।' ওসি এগোলেন।

ভিড় ঠেলে ওসি ভেতরে ঢুকলেন। সেখানে কয়েকজন গম্ভীর চেহারার লোকের সঙ্গে ডাক্তার তামাং কথা বলছিলেন। ওসির সঙ্গে ডাক্তারকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। ওসি তাঁকে বললেন, 'ডক্টর এসেছেন। ওঁর সমস্যা হয়েছে। কথা বলবেন !'

ডাক্তার তামাং জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার ?'

'আপনি যে মেয়েটিকে আমার নিরাময়ে ভর্তি করতে বলেছিলেন তার ট্রিটমেন্ট চলছে।'

'হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'কিন্তু আমি তাকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছি।'

'কী রকম ?'

'মেয়েটি জানত না তার লিউকোমিয়া হয়েছে। সম্ভবত ভেবেছিল অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। কিন্তু আজ একটি ছেলে এসে তাকে জানিয়ে গিয়েছে রোগটা কী!'

'মাই গড। হু ইজ হি ?'

'তার নাম গণেশ।'

'গণেশ। আপনি চেনেন ?' ওসিকে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার তামাং।

ওসি বললেন, 'চিনি। এই সংগঠনের কর্মী।'

'সে জানল কী করে মেয়েটির কী অসুখ হয়েছে ?' ডাক্তার তামাং উত্তেজিত হয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁকে অন্য রকম দেখাল।

ডাক্তার বললেন, 'ও বলেছে আপনার কাছ থেকে রোগের নাম জেনেছে।'

'আমার কাছ থেকে ? ওঃ, নো।' ডাক্তার তামাং অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, 'ওহো, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। ছেলেটি ওদের নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। দু-দুবার রক্ত পরীক্ষা করার পর যখন বুঝলাম টেন্ডেন্সি কী তখন বলেছিলাম চিকিৎসার খরচ অনেক পড়বে। ও বলেছিল পার্টির কাছে অ্যাপিল করতে। আমি একটা সুপারিশ করেছিলাম। তাতে যে অসুখটাকে সন্দেহ করছি তার নাম উল্লেখ করা ছিল। কিন্তু চিঠিটা একটা খামে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ও বলেছিল লোক্যাল কমিটির সেক্রেটারিকে দিয়ে দেবে। ওটা ওর পড়ার কথা নয়।'

'ও পড়েছে।' ডাক্তার বললেন।

'ছেলেটা কোথায়?'

'আমার ওখানে আটকে রেখেছি।'

'বেশ করেছেন। ওসি আপনি স্টেপ নিন। ওই ছেলে একটা ক্রিমিন্যাল।'

'আইনের ফাঁক থেকে যাচ্ছে ডক্টর তামাং। আমি প্রমাণ করতে পারব না ও কোনও অন্যায় করেছে। তবে ডক্টরকে শাসিয়েছে বলে ব্যবস্থা নিতে পারি।' ওসি বললেন।

ডাক্তার তামাং ওঁদের একটু অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে গেলেন। পার্টির এক বড়কর্তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর মূল ভিড়টির দিকে এগিয়ে গেলেন।

ডাক্তার কিছু বলার আগেই ওসি বললেন, 'ডাক্তার তামাং চেয়ারম্যানের কাছে গেলেন। দেখুন, উনি কী বলেন। উনি যদি গ্রিন সিগন্যাল দেন তা হলে কোনও চিন্তা নেই। ওঁর কথাই শেষ কথা।'

'এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে ওঁকে বিরক্ত করা কি ঠিক হচ্ছে?'

ওসি মাথা নাড়লেন। ঠিক কী বোঝাতে চাইলেন তা বোঝা গেল না। তিনি ঘড়ি দেখলেন, 'ডক্টর, আমাকে একটু যেতে হচ্ছে। আপনি অপেক্ষা করুন।'

ওসি চলে গেলেন। ডাক্তার লক্ষ করলেন সবাই তাঁকে দেখছে। আজ ডাক্তার তামাং-এর প্রতিক্রিয়া দেখে খুব ভাল লাগছে তাঁর। ভদ্রলোকের আগের ব্যবহার আর আজকের উদ্যোগের মধ্যে কোনও মিল নেই। একটু পরেই একজন এসে বলল, 'আপনাকে চেয়ারম্যান ডাকছেন।'

ডাক্তার এগোতেই তাঁর পোশাক পরীক্ষা করা হল। কোনও অস্ত্র নেই দেখে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল চেয়ারম্যানের কাছে। সাধারণ নেপালিদের পোশাক পরে ভদ্রলোক কথা বলছিলেন কয়েকজনের সঙ্গে। ডক্টর তামাং একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত গোর্খাদের জন্যে আলাদা রাজ্যের আন্দোলন শুরু করেছিলেন যিনি, সেই ভয়ঙ্কর পাহাড়ি যুদ্ধে যিনি স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন কি না জানা নেই কিন্তু তাঁর দাপটে দিল্লি কেঁপেছে অনেকবার, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার নতজানু হয়ে নিজের সম্ভ্রম বিকিয়ে বসে আছে অনেককাল। পশ্চিমবঙ্গের কোনও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান যা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না তা এই চেয়ারম্যান বাস্তবে সম্ভব করেছেন। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময় এই মানুষটির প্রভাব ছিল আকাশছোঁয়া। কিন্তু ক্ষমতা ও অর্থ আদায়ের পর দলে এবং আনুগত্যে ভাঙন দেখা দিল। দল এবং উপদল ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। যারা ছিল মুক্তিযুদ্ধের কাঁধ মেলানো সৈনিক তারা এখন ক্ষমতার স্বাদ না পেয়ে হয়ে গেছে বিক্ষুব্ধ। তবু এখনও, দার্জিলিং-এর এই পাহাড়ে এঁর অবস্থান সবার আগে। এঁর সামান্য ইশারায় এখানকার মানুষের জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। গত লোকসভা নির্বাচনে ইনি চেয়েছিলেন পাহাড়ের মানুষ কোনও ভোট দেবে না। কারণ কোনও দলই পাহাড়ের মানুষের অভাব দূর করার প্রতিশ্রুতি দেয়নি। আর যদি নির্বাচনের ফায়দা তোলার জন্যে দিয়ে থাকে তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েছে। পাহাড়ে ভোট পড়েনি বললে সত্যি কথা বলা হয়।

চেয়ারম্যান ডাক্তারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'নমস্তে। আপনার নার্সিংহোম কী রকম চলছে ডাক্তার?'

'সরি স্যার। আমি নিরাময়কে ঠিক নার্সিংহোম বলতে চাই না।'

'ও, হ্যাঁ। আপনি তো ব্যবসা করেন না। আপনার অ্যাপ্লিকেশন আমি পেয়েছি। মুশকিল হল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের এত কম টাকা দেয় যে আমরা অনেক কিছুই করে উঠতে পারি না। দিল্লিকে বললে তারা আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেখিয়ে দেয়। যাক গে, আপনার সমস্যার কথা বলুন।' চেয়ারম্যান খুব ধীরে ধীরে কথা বললেন।

'আমার মনে হয় ডক্টর তামাং আপনাকে সব জানিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। উনি যা বলেছেন সেটা কি কোনও নতুন সমস্যা?'

'তার মানে?'

'পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখুন, যারা বি জে পি-কে ভোট দিয়েছে, তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে তাদের কী ধরনের সমস্যার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সি পি এম। হাইকোর্ট বলেছে মাইক বাজিয়ে সভা করা চলবে না। আপনাদের জ্যোতিবাবু কী করলেন ? একজন সরকারি অফিসার হাইকোর্টের আদেশ মানতে চাইলেন বলে রেগে যা-তা বললেন। উনি যদি এমন করতে পারেন তা হলে আমার একজন ক্যাডার তা করতেই পারে। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে-দল ক্ষমতায় থাকে তাদের কর্মীরা একটু-আধটু বেপরোয়া কথা বলে থাকেই।' চেয়ারম্যান হাসি মুখে তাকালেন।

ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'আপনার কাছে এসব কথা শুনব আশা করিনি।'

চেয়ারম্যান একজনকে বললেন, 'ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁকে চেয়ার দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে একজন একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

চেয়ারম্যান বললেন, 'বসুন ডাক্তার।'

'আমি ঠিক আছি।' ডাক্তার বললেন।

'আপনাকে আমি অনুরোধ করছি বসার জন্যে।'

ডাক্তার বুঝলেন এই অনুরোধের অন্য নাম আদেশ। তিনি বসলেন।

চেয়ারম্যান কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন, 'হুগলি বলে পশ্চিমবঙ্গে একটা জেলা আছে। একটি পরিবার সেই জেলার এক গ্রামে থাকত। বর্ধিষ্ণু পরিবার, প্রচুর জমি, পুকুর। তারা কোনও পার্টি করত না। সব পার্টি চাঁদা চাইতে এলে দিয়ে দিত। চাষের সময় সাঁওতালরা আসত, তাদের দৈনিক মজুরি দিয়ে চাষ করাত, ধান কাটাত। হঠাৎ পঞ্চায়েত বলল, বাইরের লোকদের দিয়ে ওসব কাজ করানো চলবে না। লোক্যাল বেকার ছেলেদের দিয়ে করাতে হবে। যাদের তারা পাঠাল তারা জিন্দেগিতে ওসব কাজ করেনি। পরিবারটি আপত্তি জানাল। পরের দিন ওদের বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেল। নিঃস্ব করে দিয়ে চলে গেল লোকগুলো। কেউ বাধা দিতে এল না। ওরা ছুটে গেল থানায়। থানা ডায়েরি নিল না। ওরা গেল পঞ্চায়েতে। তারা বলল, যারা ডাকাতি করেছে তাদের নাম দিতে। মুখে কাপড় বাঁধা ডাকাতদের নাম তারা বলতে পারল না। ভয়ে ওরা পালিয়ে গেল কলকাতায়। তারপর লোক ধরে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের একজন বড়কর্তার চিঠি পৌঁছে দিল পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের প্রধান সেই চিঠি পড়ে ছুড়ে ফেলে দিল। ওরা গেল লালবাজারে। লালবাজার হুগলির এস পি-কে বলল তদন্ত করতে। তিনি তদন্ত করছেন। আগামী যত বছর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকবে ততদিন তিনি তদন্ত করে যাবেন। ডাক্তার, আপনি আমার কথা কি বুঝতে পারছেন ?' চেয়ারম্যান জিজ্ঞাসা করলেন।

'পারছি।' ডাক্তার মাথা নামালেন।

'অতএব আমার দলের একজন ক্যাডার যদি আপনাকে শাসিয়ে থাকে তাহলে সে শিক্ষা পেয়েছে ওদের কাছ থেকে। তাই না ?' চেয়ারম্যান হাসিমুখে বললেন।

ডাক্তার বললেন, 'মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার। আমি রাজনীতি বুঝি না। আমি ডাক্তার, মানুষের কাজে নিজেকে লাগাতে চাই। তবে আমার সামান্য বুদ্ধিতে বুঝেছি, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের কোনও জায়গা নেই। তুলনায় সি পি এম অনেক সুসংহত দল। তাদের ভাবনাচিন্তায় নিজস্বতা আছে। তারা যা করতে চায় তা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাশে কারও যদি দাঁড়াবার অধিকার থাকে তা হলে তা সি পি এমের আছে। তাদের ক্যাডাররা যা গ্রামে গ্রামে করছে তা নিশ্চয়ই আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের অনুমোদন ছাড়াই করছে। আমি এই কথা বিশ্বাস করি।'

চেয়ারম্যান বললেন, 'আপনি বললেন আপনি রাজনীতি বোঝেন না। কিন্তু যে কথাগুলো বললেন তাতে স্পষ্ট আপনি সি পি এমের সমর্থক। তাই না ?'

ডাক্তার বললেন, 'আমি কি উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি ?'

'কেন ? বসে কথা বলতে কি অসুবিধে হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। চেয়ারে বসে নিজেকে একজন অভিনেতা বলে মনে হচ্ছে।'

'বেশ। যাতে আপনি স্বচ্ছন্দ হন তাই করুন।'

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন, 'মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেস

ক্ষমতায় এল। তাদের ক্যাপিটাল ছিল গাঁধীজি। দেশ গঠনের জন্যে কোনও সঠিক পদ্ধতি তাদের আয়ত্তে ছিল না। শুধু সেন্টিমেন্ট ভাঙিয়ে তারা দীর্ঘদিন রাজত্ব করে গেছে। সেই তুলনায় সি পি এম অনেক বৈজ্ঞানিক দল। তাদের কাজকর্ম, আদর্শ, কাজ করার ইচ্ছে অনেক বেশি বিজ্ঞান এবং জীবননির্ভর। তাদের শরিক দলগুলোর কোনও অস্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গে নেই। এরা আলাদা দাঁড়ালে কেউ নির্বাচিত হবে না। এটা সি পি এম জানে। জেনেও এরা এদের বহন করে চলেছে। এইটেই সি পি এমের উদারতা। তাই না?'

'কেন?'

'এদের ছাড়াই সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করতে পারত। কিন্তু সি পি এমের সমর্থন ছাড়া এই দলগুলো মুছে যেত। যেহেতু এরা কংগ্রেসবিরোধী তাই সি পি এম এদের বহন করে চলেছে। ফলে ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। তবে আপনি হুগলির যে ঘটনার কথা বললেন তা আমি অস্বীকার করছি না। নীচের তলার কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি ওরা।' ডাক্তার ধীরে ধীরে কথা বলছিলেন।

'বাঃ। আপনি সি পি এমের সমর্থক তা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেন!'

'আপনি ভুল করছেন। আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক নই।'

'কিন্তু আপনি তো ওদের হয়ে ওকালতি করছেন।'

'নিয়মিত খবরের কাগজ পড়লে সাধারণ মানুষের যে ধারণা তৈরি হয় আমি তার কথাই বলেছি। নিরাময়ে কোনও রাজনৈতিক দলের ছায়া পড়তে দিইনি।'

'আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'পাহাড়ের মানুষের অভাব আছে। তাদের ওপর বহুদিন ধরে অবিচার করা হয়েছে। কিন্তু একজন ভারতীয় হয়ে ভারতবর্ষকে টুকরো হয়ে যেতে দেখতে চাই না।'

'বাঃ। আপনি একজন শিক্ষিত লোক হয়েও অশিক্ষিতের মতো কথা বলছেন। ব্রিটিশরা এদেশে আসার আগে ওই ভারতবর্ষ কনসেপ্ট ছিল? মোগলরাও তাদের স্বার্থে যা করতে পারেনি তা ব্রিটিশরা পেরেছিল। গায়ের জোরে সবাইকে মাথা নিচু করিয়ে ইন্ডিয়ান ছাপ দিয়েছিল। তাদের ভয়ে মানুষ দুশো বছর ধরে অনেক কিছু মেনে নিয়েছে। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর প্রায় তিরিশ বছর লেগেছে ঘোর কাটতে। এখন যে যার পুরনো দাবির কথা তুললে আপনি বললেন ভারতবর্ষ খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে? আমার কোনও নেপালি ভাইয়ের জীবনযাপন, ভাবনাচিন্তার সঙ্গে তামিল গুজরাতির সামান্য মিল আছে? আপনার কলকাতার বাঙালিরা দার্জিলিং-এ বেড়াতে এসে ভাবে না এটা তাদের বাংলা নয়? বলুন? ওই ব্রিটিশের চাপিয়ে দেওয়া ভারতবর্ষ সেন্টিমেন্ট আমি মানি না। আমি মনে করি সংবিধান পাল্টে নতুন করে রাজ্যগুলোকে গঠন করা দরকার। যে যার কালচার নিয়ে আলাদা থাকবে আমেরিকার স্টেটগুলোর মতো। ডিফেন্স থাকবে সেন্টারের হাতে। নতুন নাম হবে ইউনাইটেড স্টেটস অব ইন্ডিয়া।' চেয়ারম্যান গম্ভীর গলায় কথাগুলো বলতেই একজন নেতা এগিয়ে এসে তাঁর কানে নিচু স্বরে কোনও খবর দিলেন।

চেয়ারম্যান বললেন, 'ওয়েল, ডক্টর, আপনি মানুষের উপকার করছেন বলে আমি আপনার কোনও ক্ষতি বরদাস্ত করব না। ছেলেটি কোথায়?'

'আমার ওখানেই ওকে রাখা হয়েছে।'

'ছেড়ে দিন।' চেয়ারম্যান আর দাঁড়ালেন না।

ডাক্তার তামাং এগিয়ে এলেন, 'আপনি খুব ভাগ্যবান।'

'কী রকম?'

'চেয়ারম্যান কারও সঙ্গে এত কথা বলেন না। পছন্দ না হলে বড় মাপের ভি আই পি এলেও দেখা করেন না।' ডাক্তার তামাং মাথা নাড়লেন।

দরজায় দাঁড়িয়ে সায়ন দেখল কঙ্কাবতীকে। চুপচাপ ঘাড় বেঁকিয়ে জানলার বাইরে যে গাছটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর এই ভঙ্গিতে পৃথিবীর সব বিষণ্ণতা মাখামাখি। এই যে সে দরজায়

দাঁড়িয়ে সেটাও ওর অনুভূতিতে নেই।

সায়ন বলল, 'আসব।'

কঙ্কাবতী চমকে তাকাল। সায়ন দেখতে পেল চোখের কোণে দু ফোঁটা জল জমেছিল এতক্ষণ, মুখ ফেরাতেই তারা গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। চকিতে মুছে নিল কঙ্কাবতী। কিন্তু কিছু বলল না।

'ঠিক আছে, পরে না হয় আসব।' সায়ন ঘুরে দাঁড়াল।

'না!' কঙ্কাবতী চাপা গলায় বলল।

সায়ন অবাক হল। তারপর ভেতরে ঢুকে টুল টেনে বসল। কঙ্কাবতী মুখ নামাল। তারপর বালিশ টেনে কোলের ওপর তুলে তাতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এ ঘরে আসার আগে সায়ন ভেবেছিল কঙ্কাবতী নিশ্চয়ই খুব কান্নাকাটি করছে। মিসেস অ্যান্টনি অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে এখানে আসতে ইতস্তত করছিল। তাহলে কি এতক্ষণ কঙ্কাবতী কাঁদেনি? ওই পাতা ঝরে যাওয়া ন্যাড়া গাছটার দিকে অপলকে তাকিয়েছিল? সে দেখল কান্নার দমকে মেয়েটার পিঠ ওঠানামা করছে। সায়ন নিচু গলায় বলল, 'কে কী বলে গেল তাই শুনে ভেঙে পড়ছ কেন?'

কঙ্কাবতীর কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। একই ভঙ্গিতে কেঁদে যাচ্ছিল সে।

সায়ন বলল, 'আমাদের শরীরে রক্ত কম। ডাক্তারবাবু বলেন, একশো ফোঁটা রক্ত নিংড়ে এক ফোঁটা চোখের জল তৈরি হয়। তুমি এভাবে কাঁদলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে কঙ্কা।'

'আমি বাঁচব না। লিউকোমিয়া হলে কেউ বাঁচে না।' মুখ তুলল না মেয়েটি।

'কে বলল তোমায় লিউকোমিয়া হয়েছে?'

মাথা তুলল কঙ্কাবতী। কান্নায় ভাঙচুর হয়ে যাওয়া মুখে বলল, 'আমি জানি। ব্লাড ক্যানসার আর লিউকোমিয়া একই।'

'তোমার যে ব্লাড ক্যানসার হয়েছে তা কে বলেছে?'

'ডাক্তার তামাং গণেশকে বলেছেন।' বড় নিশ্বাস ফেলল কঙ্কাবতী, 'আমি এখন কী করব?'

'নিজের কথা ভেবে এত কাঁদছ, আচ্ছা, আমি এখানে কেন আছি কখনও ভেবেছ? আমার কী অসুখ?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল।

কঙ্কাবতী মুখ ফেরাল। সে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

'তোমার থেকে আমার শরীরে হেমোগ্লোবিন অনেক কমে যায় মাঝে মাঝে। তখন নাক আর কান দিয়ে পাতলা রক্ত বেরিয়ে আসে। তোমার কি সে রকম কখনও হয়েছে? হয়নি। তাই তো?'

ঠোঁট টিপে মাথা নেড়ে না বলল কঙ্কাবতী।

'তা হলে দ্যাখো, আমি তো তোমার মতো কেঁদে ভাসাচ্ছি না। আমি দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছি, বাইরে যাচ্ছি, আর কদিন বাদে ডাক্তারবাবু আমাকে কাজের সুযোগ করে দেবেন। চোখ মোছো তুমি।'

'কিন্তু—।'

'কোনও কিন্তু নয়। রক্তে ক্যানসার হওয়া মানেই সঙ্গে সঙ্গে মরে যাওয়া নয়। ডাক্তারবাবু বলেন ঠিকমতো চললে অনেকদিন ভালভাবে বেঁচে থাকা যায়। আচ্ছা, একদম সুস্থ মানুষ তো আচমকা অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। যায় না?'

কঙ্কাবতী মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'তা হলে?' সায়ন হাসল, 'তুমি তো কঙ্কাবতী, যে কঙ্কা শঙ্কা করে না।'

এবার সামান্য হাসল কঙ্কাবতী। তার পরেই উদাস হয়ে গেল।

'আবার কী হল?'

'কিছু না।'

'কিছু তো ভাবছ। গণেশ কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলেছে?'

'ও আমার মায়ের বদনাম করছিল।'

'কী বলেছে?'

'মা নাকি---। আমি কিন্তু রাগ করিনি। মা জীবনে কিছুই পায়নি। আমার বাবা মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিত। মা কিছু বললে মারধরও করেছে। শুধু আমায় খুব ভালবাসত বাবা। তখন বুঝেছিলাম মানুষ দুরকম হয়। একরকম দেখে বিচার করতে নেই।'

'তোমার মায়ের কী বদনাম দিয়েছে ও ?'

'মা নাকি একজনকে ভালবাসে। তার সঙ্গে শিলিগুড়ি যাচ্ছে আজ। মা আমার কাছে এসেছিল একটু আগে। বলব পার্টির কাজে শিলিগুড়িতে যেতে হচ্ছে। কিন্তু এখান থেকে চলে যাওয়ার পর মিসেস অ্যান্টনি এসে বলে গিয়েছিলেন মা কোথাও যাচ্ছে না। এখানেই আছে। অথচ তার পরে গণেশ এসে বলল মা চলে যাচ্ছে। মা যদি কারও সঙ্গে থেকে সুখী হয় তা হলে আমার খুব ভাল লাগবে। গণেশ যাই বলুক আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু মা আমার কাছে সত্যি কথা বলল না কেন ? মা কি যায়নি ? না গিয়েছে ?' কঙ্কাবতী যেন নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছিল।

সায়ন বলল, 'উনি যখন মিসেস অ্যান্টনিকে বলে গেছেন তখন নিশ্চয়ই যাননি। কঙ্কাবতী, তুমি খুব ভাল মেয়ে।'

কঙ্কাবতী অবাক হয়ে তাকাল।

সায়ন বলল, 'তুমি মায়ের ভাল চাও। নিজের কথা ভাব না।'

কঙ্কাবতী বলল, 'আমি তো মরেই যাব। আমি না থাকলে মায়ের কী হবে ? তাই মা যদি সত্যি কাউকে পায়—।'

'তুমি যদি মরে যাওয়ার কথা বল তা হলে আর আমি তোমার সঙ্গে কথা বলল না। কেন মরবে তুমি ? আচ্ছা, এই সময় তোমার শরীরে কোনও কষ্ট আছে ?'

'না।'

'তা হলে ? যতক্ষণ বাঁচবে ততক্ষণ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করব আমরা।'

সায়নের কথা শেষ হওয়ামাত্র পায়ের আওয়াজ হল। ডাক্তার তামাংকে নিয়ে ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। ডাক্তার তামাং কঙ্কাবতীর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি খুব দুঃখিত। গণেশ যা বলেছে তা সত্যি নয়।'

কঙ্কাবতী অবাক হয়ে তাকাল।

'আমি কখনও অন্য কাউকে পেশেন্টের অসুখের কথা বলি না। তোমার মাকে যখন বলিনি তখন গণেশকে কেন বলব ? আর তোমার অসুখের ঠিক অবস্থাটা কী তা যখন আমি নিশ্চিত নই তখন বলতে যাব কেন ? তুমি গণেশের কথায় কিছু ভেবে নিও না। বুঝলে মেয়ে ?'

সায়ন বলল, 'ও বুঝেছে।'

ডাক্তার কঙ্কাবতীর মাথায় হাত বোলালেন, 'কাল থেকে তুমি অফিসে বসে আমাকে সাহায্য করবে। বুঝলে ?'

ওঁরা নেমে গেলে সায়ন উঠে দাঁড়াল, 'আমি এখন চলি।'

'না।'

'তুমি বিশ্রাম নাও।'

'আর একটু।' অদ্ভুত গলায় বলল কঙ্কাবতী।

সায়ন আবার বসল। কঙ্কাবতী বাইরের দিকে তাকাল। সময় চলে যাচ্ছে। কেউ কথা বলছে না। হঠাৎ কঙ্কাবতী চমকে উঠল। বাইরের ন্যাড়া গাছে একটা পাখি এসে বসল। সঙ্গে সঙ্গে গাছটা পাতায় পাতায় ভরে গেল। পাখিটা আনন্দে শিস দিতেই আর একটা পাখি উড়ে এল সেখানে। কঙ্কাবতী উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আরে কী অদ্ভুত!' বলতেই গাছটা আগের মতো ন্যাড়া হয়ে গেল। সে বোকার মতো মুখ ফেরাতেই দেখল সায়ন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটায় অপূর্ব আরাম ছড়িয়ে পড়ল। সে মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে।'

শিয়ালদা স্টেশনে ট্যাক্সির লাইনে দাঁড়িয়ে উর্মিলা বলল, 'উঃ, আবার সেই কলকাতা!' নন্দিনী এখন অনেকটা স্বাভাবিক। পাহাড় থেকে নামার আগে কমলেন্দুকে দিয়ে এস টি ডি করিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কলকাতার লাইন পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। কবে কোন ট্রেনে ওঁরা ফিরছেন তাতে জানানো হয়েছিল। স্বভাবতই তিনি আশা করেছিলেন স্টেশনে স্বামী আসবেন। না দেখতে পেয়ে কমলেন্দু অবশ্য বলেছিল, 'আমরা পৌঁছোবার পরে টেলিগ্রাম আসবে দেখো। ওসব আজকাল গোরুর গাড়ির চেয়ে আস্তে চলে।'

কথাটা ঠিকই বলে মনে হল নন্দিনীর। নইলে টেলিগ্রাম পেয়েও ভদ্রলোক সকাল নটায় বিছানা ছাড়বেন না? একেই তো ট্রেন লেট করেছে। নন্দিনীর মনে পড়ল সায়ন বলেছিল সে জানে তার বাবা ওকে দেখতে যাবে না। এই ছেলেটা যে কখন বড় হয়ে গেল কে জানে! স্বামী সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় অভিমান তিনি কখনও কাউকে মুখ ফুটে বলেননি। ছেলেটা এত তাড়াতাড়ি বুঝে গেল কী করে?

ট্যাক্সি পেয়েও শান্তি নেই। ফ্লাইওভার থেকে নামতেই জ্যামে আটকে গেল সেটা। এখন কলকাতায় বেশ গরম। কয়েক দিন ঠাণ্ডায় কাটিয়ে গরমটা অসহ্য লাগছিল। উর্মিলা আবার বলল, 'লোকে যে কী আনন্দে কলকাতায় থাকে! উঃ!'

কমলেন্দু স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'থাকতে বাধ্য হয়। পেট তো কাব্য বোঝে না।'

'পাহাড়ে যারা থাকে তারা কাব্য করে বুঝি? আসলে মানুষের স্বভাব হল যেখানে ভিড় সেখানেই জমে যাওয়া। ভারতবর্ষে কত ফাঁকা জায়গা আছে, সেখানে গেলে এখনও আরামে থাকা যায়, কেরানিগিরি না করে ছোটখাটো ব্যবসা করেও রোজগার করা যায় সেটা ভাববে না কেউ।' গজ গজ করছিল উর্মিলা।

কয়েকদিন ফাঁকায় থেকে এখন রাস্তায় ভিড় দেখে কমলেন্দুরও অস্বস্তি হচ্ছিল। অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এই অস্বস্তি কেটে যাবে। উর্মিলা যা বলল তার অনেকটাই ঠিক। এখন মানুষ কত অভিনব উপায়ে রোজগার করে। এবারই দার্জিলিং-এ বাসস্ট্যান্ডের পাশে একটা বুথ দেখে এল ওরা। চারটে নেপালি ছেলে মিলে করেছে। ট্যুরিস্টদের হোটেলে জায়গা পেতে সাহায্য করে ওরা। কম টাকা ভাল হোটেল। টেলিফোনে বুক করে ট্যুরিস্টদের নম্বর দিয়ে দেয়। জিজ্ঞাসা করে জেনেছে ওই চারটে ছেলের দৈনিক রোজগার দু হাজার টাকার নীচে নয়। চারটে বাঙালি ছেলে ওই ব্যবসা করতে এগিয়ে যায়নি। তারা সদাগরি অফিসে দেড়-দু হাজারের চাকরি পেলেই বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে।

গেট পেরিয়ে বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামতেই অবাক হয়ে গেল ওরা। যা একদা উদ্যান ছিল, সম্প্রতি ন্যাড়া মাঠ, সেটা খাঁ খাঁ করছে। শ্বেতপাথরের সুন্দরীরা উধাও। জন্ম ইস্তক যাদের দেখে অভ্যস্ত তাদের অনুপস্থিতি চোখে লাগছে খুব।

পাঁড়েজি এগিয়ে এল থপ থপ করে, নামানো স্যুটকেস তুলতে হাত বাড়াল।

কমলেন্দু বাধা দিল, 'থাক। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এর মধ্যে মূর্তিগুলো বিক্রি হয়ে গেল!'

পাঁড়েজি মাথা নামাল। উত্তর দিল না। তার পর দুটো স্যুটকেস দু হাতে নিয়ে টলতে টলতে ভেতরের দিকে এগোল। মেয়েরা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলে কমলেন্দু দেখল ন'বাবু আসছেন।

কাছে এসে ন'বাবু বললেন, 'কী! ঘুরে আসা হল?'

'হ্যাঁ।'

'ওয়েদার কী রকম? ঠাণ্ডা এখনও পড়ে ওখানে?'

'তা তো পড়বেই।'

'কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

'না।'

'এই যে শুনি বাঙালি দেখলেই নেপালিরা ক্ষেপে যায়, মারধর করে, সেসব কিছু হয়নি তোমাদের বেলায় ? সত্যি বাঙালির হাল দ্যাখো। অসম থেকে তাড়িয়েছে, বিহার থেকে উৎখাত করেছে এখন দার্জিলিং থেকেও বিতাড়িত। অথচ গবমেন্ট কোনও স্টেপই নিচ্ছে না।' ন'বাবু মাথা নাড়লেন।

'আপনি কি এর মধ্যে দার্জিলিং-এ গিয়েছিলেন ?'

'অ্যাঁ ? না না। কেন বলো তো ?'

'তা হলে আপনি ভুল শুনেছেন। বাঙালিদের ওপর নেপালিদের কোনও রাগ নেই, অত্যাচারও করে না। এসব যারা বলছে তারা অপপ্রচার করছে। নইলে প্রতি বছর এত হাজার হাজার ট্যুরিস্ট ওখানে যেত না। ওদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই। তারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতোই আচরণ করেছেন।' কমলেন্দু বলল।

'এ যে নতুন খবর দিলে হে।'

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি পরীগুলো বিক্রি করে দিলেন ?'

'বিক্রি যখন করতেই হবে তখন দেরি করে লাভ কী। দাম মন্দ পাওয়া যায়নি। চেক দিতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি। এতগুলো শরিক, কার নামে চেক নেব। ক্যাশেই হয়ে গেল। বড় মায়ের কাছে টাকাটা রেখে দেওয়া হয়েছে। এখন আমি পড়েছি মুশকিলে।' ন'বাবু গলা নামালেন।

কমলেন্দু তাকাল।

'আমি ভেবেছিলাম বাড়িটার যা হাল হয়েছে পরী বিক্রি করে সেই টাকায় ভাল করে সারিয়ে নেওয়া যাবে। এখন টাকাটা আসামাত্র কেউ কেউ ভাবছে এত পুরনো বাড়িতে হাত দিয়ে কী হবে। তার চেয়ে জমিজমা সমেত বাড়িটা বিক্রি করে দিলে আরও বেশি লাভ।' ন'বাবু ফিস ফিস করে বললেন।

'কারা এটা চাইছেন ?'

'কাকে ছেড়ে কার কথা বলব ! আমি এটা চাইছি না। হাজার হোক বাপ-পিতামহের এই বাড়ি, বংশের ঐতিহ্য, এসবের কোনও দাম নেই ? প্রমোটারদের পায়ে সেসব বিসর্জন দিলে পূর্বপুরুষদের আত্মা শান্তি পাবে ? বলো ?'

'সেটা আমি বলতে পারছি না।'

'মানে ?'

'আত্মীয়রা ঠিক কী চাইছেন তা তো জানার কোনও উপায় নেই।'

'অ।' ন'বাবু চোখ ছোট করে দেখলেন কমলেন্দু ভেতরে ঢুকে গেল।

দরজা খুলেছিল কাজের মেয়ে। পাঁড়েজি স্যুটকেস নামিয়ে চলে যেতে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন নন্দিনী, 'বাবু বাড়িতে নেই ?'

'না। তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে স্টেশনে চলে গিয়েছেন।'

'স্টেশনে ?'

'হ্যাঁ। ওই তো টেবিলের ওপর টেলিগ্রাম পড়ে আছে।'

'কখন বেরিয়েছেন উনি ?'

'সেই সকালবেলায়।'

নন্দিনী অবাক হলেন। স্টেশনে গেল অথচ দেখা হল না কেন ? ট্যাক্সি ধরতে অনেকক্ষণ ওঁরা বাইরে অপেক্ষা করেছিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবুর শরীর ভাল আছে ?'

'হ্যাঁ। সানু কেমন আছে ?'

'ভাল।'

'সেরে গেছে ?'

উত্তরটা দিতে হল না কারণ দরজায় হেনা। নন্দিনী তাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন

'কী ব্যাপার ?'

'আমি ক্ষমা চাইতে এলাম।'

'তা তো হল, বাপের বাড়ি থেকে স্টেশনে যাওয়ার কথা ছিল, আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিলাম।' নন্দিনী বললেন।

'আমি হেরে গেলাম। কিছুতেই পারলাম না।'

'কেন ? কী হয়েছিল ?'

'এখান থেকে তোমাদের সঙ্গে স্টেশনে গেলে সমস্যা হতে পারে ভেবে বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারিনি সময়বিশেষে বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি এক হয়ে যায়। মা যেই জানল আমি শাশুড়ির অমতে দার্জিলিং-এ তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি অমনি বেঁকে বসল। বলল, জামাই বাইরে গিয়েছে, সে থাকলে এক কথা ছিল, এই অবস্থায় নাকি আমার কিছুতেই যাওয়া উচিত নয়, আমি অনেক তর্ক করেছি কিন্তু বাবা বললেন তিনি কোনও দায়িত্ব নিতে চান না। মায়ের অমতে বাড়ির বউ বাইরে গেল বলে ছেলে ফিরে এসে যদি সম্পর্ক ত্যাগ করে তা হলে তার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে।' হেনার মুখ থমথমে।

'তার মানে ?'

'এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে ও বাড়িতেও আমার জায়গা হবে না।'

'তোমার বাবা বললেন এ কথা ?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল হেনা, 'তার মতে অপরাধ আমার। আমি নাকি মানিয়ে চলতে শিখিনি। সেইদিন তোমরা যখন স্টেশনে তখন আমি এ বাড়িতে ফিরে এলাম। মুখে যত বিপ্লবের কথা বলি না কেন রাস্তায় একা নামার ক্ষমতা যে আমার নেই তা হাড়ে-হাড়ে বুঝে গেলাম।'

'তোমার তিনি এসে গেছেন ?'

'হ্যাঁ। তাকে বললাম সব। সে বলল কমলেন্দুর সঙ্গে তুমি গেলে চারপাশের লোক কুকথা বলত। আমি বললাম কমলেন্দু তার বউকে নিয়ে গেছে। সানুর মা আছেন সঙ্গে। তাতেও সন্দেহ করতে তোমরা ?' মাথা নাড়ল হেনা, 'সে বলল, তোমার দার্জিলিং যাওয়া নিয়ে তো কথা, ঠিক আছে পরে একসময় আমিই ঘুরিয়ে আনব। আচ্ছা, যেসব পুরুষ স্ত্রীর কথা শুনে চলে তাদের স্ত্রৈণ বলা হয় কিন্তু যারা সাবালক হওয়ার পর মায়ের সমস্ত অযৌক্তিক ব্যবহার মুখ বুজে মেনে নেয় তাদের কী বলে ?'

নন্দিনী হেসে ফেললেন, 'আমি জানি না।'

'হাসি তো পাবেই। কিন্তু আমি তো হাসতে পারছি না। শাশুড়ি প্রায়ই বলেন আমি নাকি ডাইনি, শরীর দিয়ে তার ছেলেকে বশ করতে চাই। ওনারও যখন শরীর ছিল তখন কখনওই সেই চেষ্টা করেননি। আমি বলতে পারি না, শ্বশুরমশাই যে ওঁর কথায় ওঠেন বসেন তা নিশ্চয়ই বুড়ো বয়সে পৌঁছে হয়নি। থাকগে, কেমন বেড়ানো হল তোমাদের ?'

'ভালই। সানু এখন অনেক ভাল আছে। তোমার কথা বলল।'

'তুমি ওকে বলোনি তো যাওয়ার কথা ছিল তবু যাইনি।'

'বলেছি কি ?' চোখ বন্ধ করলেন নন্দিনী, 'বোধহয় বলিনি।'

'ডাক্তারের সঙ্গে আলাদা কথা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ। উনি ওকে ছোটখাটো কাজে লাগাবেন বলেছেন। এই তো, সামনের শীতে এখানে কিছুদিন থেকে যাবে সানু।'

'বাঃ খুব ভাল হবে।' হেনা বলল, 'তুমি কতটা রাস্তা এসেছ আর ঢোকামাত্র আমি তোমাকে আটকে রেখেছি। চলি।'

'আরে, আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।' নন্দিনী দেখলেন কাজের মেয়েটি দু কাপ চা নিয়ে এল।

নন্দিনী বললেন, 'এখনও বাইরের জামাকাপড় ছাড়িনি, বাথরুমে যাইনি, এখনই চা করে ফেললি ? জিজ্ঞাসা করবি তো ? আচ্ছা, দে, নাও, চা এসেছে যখন তখন ওটা খেয়ে যাও।'

চায়ে চুমুক দিয়ে হেনা জিজ্ঞাসা করল, 'দেখেছ ?'

'কী ?'

'পাথরের পরীরা উধাও হয়ে গেছে, চোখে পড়েনি ?'

'হ্যাঁ। কীরকম ফাঁকা হয়ে গেছে জায়গাটা।'

'কথা ছিল ওই টাকায় বাড়ি সারানো হবে। এখন শুনছি সেটা হচ্ছে না। আজ মিটিং হবে।' হেনা কথা শেষ করা মাত্র দরজায় শব্দ হল। হেনা তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি চলি।'

নন্দিনী দেখল হেনার চা পড়ে আছে। সে আর তাকে ডাকল না। সায়নের বাবা বললেন, 'এসে গেছ। আমি আজ কী বোকামি করেছি।'

নন্দিনী তাকালেন।

'আমি ভেবেছিলাম তিস্তাতোর্সা হাওড়ায় আসে। সাতসকালে সেখানে গিয়ে বসে রইলাম। তারপর জানতে পারলাম ওটা শেয়ালদায় আসে। কী কাণ্ড! তবু শেয়ালদায় গেলাম। কিন্তু ট্রেন অনেকক্ষণ আগে পৌঁছে গিয়েছিল।'

'অনেক পরিশ্রম হল তোমার।'

'তুমি ঠাট্টা করছ ?'

'ঠাট্টা ? সে-অধিকার আমার আছে ?'

সায়নের বাবা চেয়ারে বসলেন, 'ছেলের অবস্থা কী ?'

'ভালই।'

'আরে কীরকম ভাল তা বলবে তো ?'

'এই অসুখে কীরকম ভাল থাকা যায় তা তো তোমার জানা।'

'তুমি রোজ দেখা করতে ?'

'আচ্ছা, যাকে দেখব বলে অত দূরে গেলাম তার সঙ্গে রোজ দেখা করব না এমন ভাবনা তোমার মাথায় এল কী করে ?'

'তুমি খুব রেগে আছ দেখছি। ও, আমি যাইনি, তাই ?'

'তার জন্য রাগব এত বোকা আর আমি নই। হ্যাঁ, এখনও আমি যে আশা করি তুমি তোমার কথা রাখবে সেটা আশা করতে ভাল লাগে বলেই করি। কিন্তু তোমার ছেলে তোমাকে আমার চেয়ে ভাল চিনে নিয়েছে। সে বলেছে বাবা আসতেই পারে না।' নন্দিনী শীতল গলায় বললেন।

'সানু এ কথা বলেছে ?'

'সত্যি কথাটা শুনতে তোমার খারাপ লাগছে, জানি।'

'আমি কী করব ? যাকে একটা সাপ্লাই-এর দায়িত্ব দিয়েছিলাম সে ইদানীং দুনম্বরি কারবার আরম্ভ করেছে। আমি যদি চলে যেতাম তাহলে ওই পার্টি হাতছাড়া হয়ে যেত। আমার কমিশনের ওপর রোজগার।'

'তাই বোধহয় তোমার ছেলে এর মধ্যে ভাবতে শুরু করেছে তার অসুখের জন্যে তোমার জলের মতো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এটা ওর খুব খারাপ লাগছে। বোঝো, ওইটুকুনি ছেলেও কত বুঝদার হয়েছে।'

'আশ্চর্য! তুমি ওকে এসব নিয়ে চিন্তা করতে নিষেধ করনি ?'

'আমি যা করার করেছি। দ্যাখো তো, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে নাকি ?'

'কার চা ?'

'হেনাকে দিয়েছিলাম। তোমাকে দেখে পালাল।' নিজের কাপে চুমুক দিলেন নন্দিনী। না, এখনও ঠাণ্ডা হয়নি।

'স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চা খেয়েছি। এখন ভাল লাগছে না। থাকগে, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সানুর এখনই কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। আরে, এই বাড়ি যদি বিক্রি হয়ে যায় তাহলে আমি যে শেয়ার পাব তাতে সানুর চিকিৎসা নিয়ে ভাবতে হবে না।'

'এই বাড়ি বিক্রি হবে ?'

'মূর্তিগুলো তো হয়ে গেছে, দেখেছ। ভালই পাওয়া গিয়েছে। টাকাগুলো আছে বড়মায়ের কাছে। মেরামত করতে সব বেরিয়ে যাবে। অথচ প্রত্যেকের ফ্যামিলি বড় হয়েছে। জায়গা কুলোচ্ছে না। বাড়ি সারিয়ে সেই সমস্যার সমাধান হবে না। অনেকেই চাইছে বাড়ি প্রমোটারকে দিয়ে দিতে।'

'প্রমোটার কে ?'

'ওই যারা বাড়ি বানিয়ে ফ্ল্যাট বিক্রি করে। এই আনপ্ল্যানড জীর্ণ বাড়ির তো কোনও দাম নেই। ইট আর কাঠ বিক্রি করলে কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু এতটা জমি, এর দাম তো অনেক। বাড়ি আর বাড়ির সামনের বাগান মিলিয়ে প্রায় তিন বিঘে। দু লাখ টাকার নীচে কাঠা যাচ্ছে না। দশজন শরিককে এক একটা তিনরুমের ফ্ল্যাট প্লাস পাঁচ লাখ টাকা মাথা পিছু দিতে অনেকেই লাইন দিয়ে আছে। আজ সন্ধেবেলায় এই নিয়ে মিটিং হবে।'

নন্দিনী স্বামীর মুখে নানান রঙের আলো দেখতে পেলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সমস্ত শরীরে নোংরা লেগে আছে, আমি বাথরুমে যাচ্ছি।'

সমরেন্দ্রনাথ খুব চিন্তিত। পূর্বপুরুষের তৈরি এই বাড়ি শুধু ইট-কাঠের নয়, এর সঙ্গে রায়পরিবারের অস্তিত্বও প্রবলভাবে জড়িত। আজ সন্ধ্যায় যে-মিটিং হবে তাতে তিনি কোন পক্ষে যাবেন তা স্থির করতে পারছিলেন না। অতগুলো থোক টাকা এবং পরবর্তীকালে হাত-পা মেলে থাকার মতো ফ্ল্যাট আর এই বাড়ির ঐতিহ্য, কাকে বেছে নেবেন তিনি ? এই সময় টুপুর ঘরে এল। এখন সে অনেক ধীরস্থির। আগের মতো ছটফটানি নেই। টুপুর বলল, 'বাবা জানো, সানুদার মা ফিরে এসেছে।'

সমরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক, বললেন, 'কেমন আছে সানু ?'

'জানি না। গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসব ?'

পেছন থেকে কৃষ্ণার গলা পাওয়া গেল, 'তোকে তো বললাম এখন যাওয়ার দরকার নেই। সানু যদি চিঠির জবাব দেয় তাহলে ওরা পাঠিয়ে দেবেই।'

টুপুর মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী হয়েছে ?'

'আর কী হবে ! জানোই তো সব।'

'ও নিয়ে এত ভাবছ কেন ? সবাই যা ঠিক করবে তাই মানতে হবে।'

'আশ্চর্য ! সবাইটা কে ? অ্যাঁ ? তার মধ্যে আমিও তো আছি ! তাই না ?' বিরক্ত হলেন সমরেন্দ্রনাথ।

'বড়মা তো এখনও রায় দেননি।'

'হুঁ। বলেছেন মিটিং-এর আগে জানিয়ে দেবেন।'

'এই তো আড়াইটে ঘর, কাউকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর জায়গা নেই অথচ গালভরা নাম রায়বাড়ি। এর চেয়ে সাজানোগোছানো ফ্ল্যাটে অনেক আরামে থাকা যাবে।'

কৃষ্ণা শেষ করামাত্র মনোরমা দরজায় এলেন, 'বউমা তোমার বাপের বাড়ির সবাই আলাদা হয়ে গেছে বলে তুমি তো চাইবেই ফ্ল্যাটবাড়িতে গিয়ে থাকতে। ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে কারা ? যাদের নিজের বাড়িতে থাকার ক্ষমতা নেই তারা। যত অসুবিধেই হোক তোমাকে পাঁচ জন রায়বাড়ির বউ হিসেবে যে সম্ভ্রমের চোখে দেখবে ফ্ল্যাটবাড়ির বউ হলে সেটা দেখবে ? আমি তো এতদিন জানতাম যাদের বাড়ি বানাবার ক্ষমতা নেই আবার বস্তিতে গিয়ে থাকতে পারবে না তারাই ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে।'

সমরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করলেন, 'মা, এভাবে বলা ঠিক হচ্ছে না। এখন ভাল জায়গায় একটা পনেরোশো স্কোয়্যারফিটের ফ্ল্যাটের দাম কত জানো ? পনেরো লাখ থেকে তিরিশ লাখ। এই টাকা যে খরচ করতে পারে তার পক্ষে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। এখন মানুষ ফ্ল্যাটে থেকে তার কারণ সেখানে ঝুটঝামেলা কম, পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি নয় বলে

অসুবিধে হয় না।'

মনোরমা বললেন, 'বাঃ। তাহলে তো চুকেই গেল। আমাকে আর এর মধ্যে ডাকাডাকি করা কেন। বাপ-পিতামহরা তাহলে চুলোয় যাক।'

কৃষ্ণার চোয়াল শক্ত হল। মনোরমাকে কেউ এখন ডাকেনি। অথচ—।

কৃষ্ণা বলল, 'তোমরা যাতে ভাল হয় তাই করো। আমি এর মধ্যে নেই।'

দুপুর গড়াতেই বাড়ির সামনে ট্যাক্সি এসে থামল। পাঁড়েজি অবাক হয়ে দেখল আগন্তুককে। তারপর পড়ি কি মরি করে ছুটে গেল, 'খোকাবাবু! তুমি?'

খোকাবাবু তিরিশের কাছাকাছি যুবক। ভাড়া মিটিয়ে এয়ারলাইন্সের লকেট লাগানো বিদেশি দুটো ঢাউস স্যুটকেস ডিকি থেকে নামিয়ে মৃদু হাসল, 'কেমন আছ?'

'আর আছি। এসব দেখার জন্যে রামজি আমাকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছেন?'

'কী সব দেখছ?'

'ওই দ্যাখো। তারা নেই?'

যুবক চারপাশে তাকিয়ে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। পাঁড়েজি বলে যাচ্ছিল, 'ওরা ছিল বাড়ির মেয়ের মতো। না হয় ওরা পাথরের তৈরি তবু কত রোদ জল ঝড় সহ্য করে এ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের বিক্রি করা হয়ে গেল। কেন? না, এত বড় বাড়ি সারাবার মতো টাকা নেই।'

যুবক বুঝতে পারল। তারপর বলল, 'কাউকে ডাকো। এত বড় স্যুটকেস এই বয়সে তোমাকে তুলতে হবে না।'

পাঁড়েজি চোখ মুছল, 'তুমি যাও খোকাবাবু। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

পা বাড়াবার আগে যুবক জিজ্ঞাসা করল, 'বড়মা কেমন আছেন?'

'আছেন। কিন্তু তাঁর চোখে কি আর ঘুম আসে খোকাবাবু! দ্যাখো, গিয়ে কথা বলে দ্যাখো।' উদাস হয়ে গেল পাঁড়েজি।

দুটো সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে ঠাকুরদালানে পৌঁছে গেল যুবক।

মা ব্যাঘ্রবাহিনী সামনে দাঁড়িয়ে। জন্ম ইস্তক সে এই মূর্তি দেখছে। অজান্তেই তার চোখের পাতা কয়েক মুহূর্তের জন্যে বন্ধ হল।

'আরে। নাতিবাবু না। হঠাৎ চলে এলে?'

যুবক চোখ খুলে দেখল ন'বাবু দাঁড়িয়ে। তাঁর ভঙ্গিটা এমন যেন তাকে প্রণাম করবে বলে অপেক্ষা করছেন। যুবক বলল, 'এলাম। আপনারা সবাই ভাল আছেন? টুকটুকির তো বিয়ে হয়ে গেছে!'

'হ্যাঁ। তুমি তো বিয়েতে এলে না। আচ্ছা, চলি।'

ভদ্রলোকের উৎসাহে হঠাৎ কেন জল পড়ল বুঝতে পারল না যুবক।

ইজিচেয়ারে আধশোওয়া বড়মা আবিষ্কার করলেন তাঁর বাঁ চোখ কাঁপছে। দুবার চেষ্টা করলেন, স্থির রাখতে তারপর খুশি হলেন। এখন এই বয়সে আর নতুন করে ভাল কিছু ঘটবে না। পরি বিক্রি করে শেষ হয়নি এবার বাড়ি বিক্রির দিকে সবাই এগোচ্ছে। তাঁর কী দরকার বাধা দেওয়ার! তিনি এই বংশের কেউ নন। পরের বাড়ির মেয়ে এ বাড়িতে বউ হয়ে এলেও অনেকদিন ব্রাত্য হয়ে ছিলেন। মুশকিল হল, এখনও মনে মৃত্যুর ইচ্ছে আসেনি। শরীরে জরা জাঁকিয়ে বসেছে তবু পরের দিন সকাল দেখার সাধ যায়নি। এই যেমন আজই আতরবালাকে বলেছেন কচুর শাক আনাতে। ওটা বাঙালদের খাবার। এ বাড়িতে এককালে আড়মাছ, কচুর শাক ঢুকত না। বোয়াল তো নয়ই। সেটা অবশ্য এখনও ঢোকে না কিন্তু আড় খায় কেউ কেউ। একবার এক বাঙাল রাঁধুনি এসেছিল। তার হাতের রান্না ছিল চমৎকার। সেই কচুর শাক খাইয়েছিল। এইসব খাওয়ার ইচ্ছে যার এখনও হয় সে কেন অযথা মরে যাবে?

আতরবালা দৌড়ে ঘরে ঢুকে প্রায় হামলে পড়ল, 'ও বড়মা ! বড়মা গো, এয়েছে, এয়েছে।'

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বাঁ হাতের ঝটকায় সরিয়ে দিলেন বড়মা, 'আ মলো যা ! আমার গায়ে এসে পড়ছিস, এবার দেখছি মাথায় উঠবি।'

আতরবালা রাগ করল না। ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'তোমার নাতিবাবু এসেছে।'

'কে এসেছে ?' বড়মার মাথাটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল।

'নাতিবাবু গো। বিদেশ থেকে।'

এই সময় বড়মা তাকে দেখতে পেলেন। একদম এক গোরা সাহেব এসে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হল তাঁর। ততক্ষণে সামনে এসে ঝুঁকে পড়েছে যুবক। বড়মা মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'থাক, থাক !'

'বাঃ। এতদিন পরে এলাম, প্রণাম নেবে না ?'

'আর ওসবের দরকার কী !'

'মনে হচ্ছে খুব ক্ষেপে আছ।' যুবক হাসল।

বড়মা মুখ ঘোরানো অবস্থায় বললেন, 'আতর। ভেতরে নিয়ে যা। আর গঙ্গাজল এনে আমার পা ধুইয়ে দে।'

'সে কী ?' যুবক চোখ বড় করল।

'সাতসমুদ্দর পার হয়ে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে কাটিয়ে বাইরের কাপড়ে আমার পা ছুঁয়ে দিল ! এতদিন যা শিখিয়েছি তা বাইরে গিয়ে— !' বড়মা কথা শেষ করতে পারলেন না। তাঁর গলায় বাষ্প জমল।

যুবক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ইজিচেয়ারের পাশে বসল, 'তোমার কী হয়েছে ? আমি তো রেগুলার চিঠি লিখেছি, ফোন করেছি।'

'নাতবউকে নিয়ে যেতে এসেছিস, নিয়ে যা। কথা বাড়াচ্ছিস কেন ?'

'শুধু নাতবউ কেন এই বুড়ি ঠাকুমাকেও নিয়ে যাব।'

'পাগল। তার আগে আমি গলায় দড়ি দেব।'

'ইমপসিবিল।'

'তার মানে ?'

'তোমার ওই ভারী শরীর নিয়ে এই বয়সে আর যেভাবেই মর গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারবে না। প্রথম কথা, দড়িটা সিলিং বা ফ্যানে বাঁধতে পারবে না। কেউ ধরে না তুলে দিলে চেয়ারে উঠে দাঁড়াতেও বোধহয় পারবে না। তাহলে ঝুলবে কী করে ?'

বড়মা খুব বড় নিশ্বাস ফেললেন, 'তবু এসব দেখার জন্যে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। কদিনের জন্যে আসা ?'

'মাসখানেক।'

আতরবালা বলল, 'কতদূর থেকে এয়েছে, একটু জিরোতে দাও, তারপর কথা বলো। যাও নাতিবাবু, ভেতরে যাও।'

যুবক উঠল। ততক্ষণে পাঁড়েজি লোক জোগাড় করে দুটো ঢাউস স্যুটকেস ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

পর্দা সরিয়ে যুবক তার শোওয়ার ঘরে ঢুকে দেখল পালঙ্কের ওপর পাশ ফিরে যুবতী শুয়ে আছে। এই হল বড়মার নাতবউ। একবার পেছনের দিকে তাকিয়ে নাতিবাবু পালঙ্কের পাশে নিঃশব্দে পৌঁছে আচমকা নাতবউকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খাওয়া শুরু করল। এই অবস্থায় বিভ্রম হওয়া দোষের নয়, নাতবউ চিৎকার করে উঠেই স্বামীকে দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল।

দুটো ঘরের ওপাশে দাঁড়িয়ে বড়মা গলা তুললেন, 'ও নাতবউ, কী হল, পড়ে গেলি নাকি ?'

নাতিবাবু ইশারায় জবাব দিতে অনুরোধ করায় নাতবউ গলা তুলল, 'না।'

নাতিবাবু জিজ্ঞাসা করল, 'স্পর্শে বুঝতে পার না, চেঁচাতে হল ?'

নাতবউ বলল, 'তুমি আমাকে ছোঁবে না।'

'বাপ্‌স। তোমারও গঙ্গাজলের ব্যাপার আছে নাকি ?'

'এতদিন ওদেশে আছ। সেখানকার মেয়েছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক করেছ কিনা জানি না। আগে রক্ত পরীক্ষা করাও তারপর ছোঁয়াছুঁয়ি।'

'রক্ত পরীক্ষা ?'

'হ্যাঁ। এইডস হয়েছে কিনা দেখে নেওয়া দরকার।'

'মাই গড !' নাতিবাবুর চোখ বড় হয়ে গেল, 'এসব কোত্থেকে জানলে ?'

'বই পড়ে।'

'না, কোনও মহিলার সঙ্গে আমার কিছুই হয়নি।'

'বিশ্বাস করি না। পুরুষমানুষ একা দিনের পর দিন থাকলে তার চরিত্রভ্রষ্ট হতে বাধ্য। কথায় বলে না চিতায় উঠলেও তোমাদের প্রবৃত্তি মরে না।'

'বাঃ কী সুন্দর অ্যাসেসমেন্ট ! তা তুমিও তো এখানে একা আছ, তোমার সম্পর্কে যদি এ কথা বলি তাহলে কি ভাল লাগবে ?'

'এক কথা হল না। বাইরে খাণ্ডারনি ঠাকুমা অষ্টপ্রহর পাহারায় আছেন। ওঁকে ফাঁকি দিয়ে কোনও ব্যাটাছেলে মশা পর্যন্ত এখানে ঢুকতে পারে না। যাক গে, হঠাৎ এলে ?'

'মন খারাপ করছিল। তারপর তুমি লিখলে ওদেশে যাবে না। সেটা পড়ে আরও খারাপ লাগল। কী ব্যাপার বলো তো ?'

'ওই বুড়ি মরার আগে কী করে যাব ?'

'কেন ? বুড়ি কিছু বলেছে ?'

'বলেছে। নাক ফুলিয়ে বলেছে, যাও, চলে যাও।'

'ব্যাস, চুকে গেল !'

'না। চলে যাওয়া যায় না। এই বাড়ি ওঁর প্রাণ। পরিগুলো যেদিন বিক্রি হল সেই রাত্রে একবারও চোখের পাতা এক করেননি।'

'বিক্রি হল কেন ?'

'বাড়ি মেরামতের টাকা জোগাড় করতে।'

'তারপর ?'

'এখন শুনছি সবাই চাইছে বাড়িটা বিক্রি করে দিতে।'

'এই বাড়ি ?' নাতিবাবু এমন কথা শুনবে ভাবতে পারেনি।

নাতবউ বলল, 'হ্যাঁ। বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে বড়মা অনেক টাকা পাবেন ঠিকই কিন্তু যদ্দিন ফ্ল্যাট না পাচ্ছেন তদ্দিন থাকবেন কোথায় ?'

দেবী ব্যাঘ্রবাহিনীর সামনে প্রদীপ জ্বলছিল। যদিও ঠাকুরদালানের সব কটা আলো আজ জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। এখন সন্ধে সাতটা। রায়পরিবারের সমস্ত শাখার প্রতিনিধিরা আজ এখানে সমবেত। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। গন্ধরাজের পাশে চুপচাপ বসেছিল সদানন্দ। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কিছু ভেবেছেন ?'

গন্ধরাজ হাসলেন, 'আমার তো কোনও সমস্যা নেই যে ভাবতে বসব ! একা মানুষ, কোনও পেছন টান নেই, যাওয়ার সময় তো কারও জন্যে কিছু রেখে যেতে হবে না। ভাববে তোমরা। রোজগারপাতি করছ, বিয়ে ঠিক হয়েছে ?'

সদানন্দ লজ্জা পেল, 'না-না।'

'আরে লজ্জিত হওয়ার কী আছে। শরীর উপযুক্ত হয়েছে, তাই না ?'

সদানন্দ মুখ ফিরিয়ে নিল। গন্ধরাজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দীর্ঘকাল এ বাড়িতে কানাঘুষো হয় কিন্তু তিনি যা করেন তা বন্ধ দরজার ওধারে, কেউ দেখতে পায় না। এই বাড়িতে থাকেন কিন্তু কেউ আগ বাড়িয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলেন না। সে দেখল বড়মায়ের নাতি নেমে এসে ব্যাঘ্রবাহিনীকে নমস্কার করছে। সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেল।

ন'বাবু বললেন, 'এসো, এসো। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

নাতিবাবু বলল, 'আপনারা সবাই ভাল আছেন ?'

ফুলবাবু হাসলেন, 'চলে যাচ্ছে। তুমি তো এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে বিদেশে চলে গেছ। কেমন লাগছে বিদেশ ?'

নাতিবাবু বলল, 'এখন আর বিদেশ বলে মনে হয় না। গ্রিন কার্ড পেয়ে গেছি।'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তাই নাকি ? তুমি তো তাহলে এন আর আই। এখন তোমাদের খুব কদর। জ্যোতিবাবু তোমাদের জামাই আদরে ডেকে আনছেন।'

কমলেন্দু বলল, 'আচ্ছা, এবার কাজের কথা শুরু করা যাক।'

ন'বাবু বললেন, 'হ্যাঁ। বড়মা বলেছিলেন আজকের মিটিং-এর আগে তিনি তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দেবেন। ওঁর কথার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। হ্যাঁ বাবা তিনি কি তোমাকে কিছু জানিয়েছেন ?'

নাতিবাবু মাথা নাড়ল, 'আপনারা সবাই জানেন তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এ ব্যাপারে সবাই যে সিদ্ধান্ত নেবে তাই তিনি মেনে নেবেন।'

ন'বাবুর মুখ দেখে বোঝা গেল তিনি খুব হতাশ হয়েছেন। ফুলবাবু বললেন, 'তাহলে শুরু করা যাক। আপনারা সবাই জানেন এই বাড়িতে আমাদের জায়গায় কুলোচ্ছে না। যখন ভাগ হয়েছিল তখন প্রত্যেকের পরিবার ছোট ছিল। সে সময় ঠিক কী নিয়মে ভাগাভাগি হয়েছিল তা নিয়েও কথা উঠেছে। যাক সে, এই বাড়ি রাখা মানে হাতি পোষা। আর সেই হাতির এমন বয়স হয়েছে যে নড়তে চড়তে পারে না। বাড়ির সামনে অনেকটা জমি এই বাজারে ফালতু পড়ে রয়েছে। আমরা কেউ একান্নবর্তী নই, যে যার নিজের মতো থাকি। সেই থাকাটা যাতে আরও ভালভাবে থাকা যায় তাই আমি প্রস্তাব দিচ্ছি এই বাড়ি প্রমোটারকে দিয়ে দিতে।'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'দিয়ে দিতে মানে ?'

ফুলবাবু বললেন, 'আমরা জমি বিক্রি করব না। জমি আমাদের নামেই থাকবে। প্রমোটার এই বাড়ি ভেঙে কয়েকটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং বানাবে। একটা বিল্ডিং-এ আমাদের প্রত্যেক শরিক একটা করে বড় ফ্ল্যাট পাব। সেই সঙ্গে টাকা।'

গন্ধরাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত টাকা ?'

'অন্তত লাখ পাঁচেক।'

ন'বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতদিনে ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে ? বাড়ি বানাতে যতদিন সময় লাগবে ততদিন আমরা কোথায় থাকব ?'

ফুলবাবু বললেন, 'এ নিয়ে কথা বলতে হবে। প্রথমে এই বাড়ি না ভেঙে ওপাশের মাঠে ওরা বিল্ডিং তৈরি করে আমাদের হ্যান্ডওভার করে দিতে পারে। এতে কোথাও যাওয়ার সমস্যা থাকবে না। এখন বলুন, আপনারা সবাই একমত কিনা।'

কমলেন্দু বলল, 'একমত না হলে কী হবে ?'

'কী আর হবে ? ভোট করে তো লাভ নেই, এইভাবেই থাকতে হবে।' ফুলবাবু বললেন।

কমলেন্দু বলল, 'একটা ভুল হয়েছে, প্রমোটারকে শরিকদের প্রত্যেককে একটা করে ফ্ল্যাট তো দিতেই হবে তার ওপরে একটা বাড়তি ফ্ল্যাট দিতে হবে।'

ফুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ?'

'মা ব্যাঘ্রবাহিনীর জন্যে সেটা দরকার।' কমলেন্দু বলল।

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'নিশ্চয়ই। একতলায় আমরা মায়ের জন্যে জায়গা চাইব।'

ন'বাবু বললেন, 'তোমরা চাইছ, আমি আর কী বলব। কিন্তু এই বাড়িতে আমাদের বাপ-ঠাকুরদার স্মৃতি ছড়ানো। সেটা কেউ ভাবছ না ?'

সদানন্দ বলল, 'তা যদি বলেন ভারতের মাটিতে সুভাষচন্দ্র, গাঁধীজি, রবীন্দ্রনাথ, চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেবের স্মৃতি ছড়ানো। কেউ কি এখন সে কথা ভাবছে ?'

এইসময় নাতিবাবু কথা বলল, 'ওসব সেন্টিমেন্টের কোনও মূল্য এখন নেই। এই যে আপনাদের ছেলেমেয়ে বা নাতিনাতনি, তাদের অনেকের নামই আমি জানি না। অতএব আত্মীয় বলে ভাবতেও কিছুদিন বাদে অসুবিধে হবে। বড়মা বলেছেন, মা ব্যাঘ্রবাহিনীকে যথাযথ সম্মান দিয়ে রাখলে এই

বাড়ি বিক্রিতে তাঁর কোনও অমত নেই।'

ন'বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি পারবেন সহ্য করতে ?'

'তাঁকে এসব দেখতে হবে না। আমার সঙ্গে উনিও চলে যাচ্ছেন।'

২৬

গত রাত্রে কঙ্কাবতীকে রক্ত দেওয়া হয়েছিল।

নিরাময়ের তালিকায় যেসব রক্তদাতার নাম আছে তাদের দুজনকে খবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের বদলে বিকেলবেলায় হাজির হয়েছিল শক্তপোক্ত চেহারার একটি ছেলে। সায়ন তখন অফিসঘরে। ছেলেটি দরজায় দাঁড়িয়ে নেপালিতে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ডাক্তারবাবু কোথায় ?'

সায়ন ভাঙা নেপালিতে জবাব দিয়েছিল, 'উনি একটু বেরিয়েছেন। আপনার যদি খুব প্রয়োজন থাকে তাহলে বসতে পারেন।'

ছেলেটির বসার ভঙ্গি বলে দিল ওটা তার প্রয়োজন ছিল।

গতকালের খবরের কাগজ একটু আগে এসেছে কলকাতা থেকে। সেইটে পড়ছিল সায়ন। কিন্তু সামনে কেউ বসে থাকলে কাগজ পড়ে যাওয়া অভব্যতা।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় থাকেন ?'

'এই তো, পান্থাবাড়ির রাস্তায়। আপনি ডাক্তারবাবুর কেউ হন ?'

'না। আমি ওঁর পেশেন্ট।'

'পেশেন্ট ? আপনি ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু, শুনেছি, এখানে যারা পেশেন্ট হয়ে আছে তাদের রক্তের অসুখ আছে। প্রায়ই রক্ত দিতে হয়। তাই তো!'

'ঠিকই।'

'তার মানে, আপনিও ?'

'হ্যাঁ। তবে আমি অনেক ভাল আছি। আজ একটি মেয়েকে রক্ত দেওয়া হবে। ওর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দুজন পাহাড়ি বন্ধুকে খবর দেওয়া হয়েছে।'

'জানি। ওদের একজনের বেশ জ্বর আর একজন দার্জিলিং গিয়েছে।'

'সে কী ?'

'হ্যাঁ। আমি তাই এসেছি। আমার রক্তে কাজ হবে ?'

'আমি জানি না। কঙ্কাবতীর রক্তের গ্রুপের সঙ্গে যদি আপনার রক্ত মিলে যায় আর আপনার যদি অন্য কোনও অসুখ না থাকে তাহলে হবে। সেটা ডাক্তারবাবুই বলতে পারবেন।'

'কঙ্কাবতী কি বাঙালি ?'

'না। নেপালি।' সায়ন হাসল, 'কেন ? বাঙালি হলে আপনি দেবেন না ?'

ছেলেটার মুখ কালো হয়ে গেল।

সায়ন বোঝাবার চেষ্টা করল, 'দেখুন, অসুস্থ মানুষের একটাই পরিচয়, সে অসুস্থ। তখন বাঙালি বিহারি নেপালি বলে ভাবা ভুল।'

ছেলেটি খুব বিরক্ত হল, 'জ্ঞান দিতে আপনার খুব ভাল লাগে দেখছি।'

'জ্ঞান ?'

'হ্যাঁ। আমি কী ভাবছি তা নিজেই ভেবে নিলেন ? আমি শুনেছি বাঙালিরা উপদেশ দেওয়ার সুযোগ পেলে ছাড়ে না।' ছেলেটি সোজা হয়ে বসল, 'আপনার কেন মনে হল কঙ্কাবতী বাঙালি মেয়ে হলে তাকে আমি রক্ত দেব না ? বলুন ? কলকাতা শহরের কোনও হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে

মানুষকে বাঁচাতে এখানকার মতো যেচে এগিয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েরা রক্ত দেয় ?'

'এভাবে না হলেও, দেয়। প্রায়ই ব্লাড ডোনেট করার জন্যে ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় পাড়ায় পাড়ায়। সেখানে যারা রক্ত দেয় তারা ভালবেসেই দেয়।'

'আমি জানতাম না। কিন্তু আপনার মনে বাঙালি নেপালি আলাদা এই মনোভাবটা কেন এল ?'

'এখানকার পার্টির ছেলেদের কথাবার্তা শুনে সেরকম ধারণাই হয়।'

'দুর! আপনাদের বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমেরিকান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ জানানো হয় না ? আমেরিকান প্রেসিডেন্টের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো না ? অথচ আপনাদের নেতারা ছুটি কাটাতে আমেরিকায় যান, সেখান থেকে ব্যবসাদার ধরে আনেন। এটাও সেরকম।'

'আপনি রাজনীতি করেন ?'

'রাজনীতি করা বলতে আপনি যা বোঝাতে চাইছেন তা আমি করি না। কোনও দলের সদস্য নই। কিন্তু মানুষের জন্যে কিছু করতে চাই।'

'আমার নাম সায়ন। আপনি ?'

'বিষ্ণু। বিষ্ণুপ্রসাদ। আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে আপনার ?'

'কী মনে হচ্ছে মানে ?'

'আমি তো বাঙালি নই, পাহাড়ের মানুষ।'

'আপনি নেপালি !'

বিষ্ণুপ্রসাদ হাসল, 'আমি লেপচা। আগে লেপচাদের নাম হিন্দুদের ভগবানের নামে হত না। এখন সব একাকার হয়ে গেছে।'

'লেপচা বলে একটা জাতের কথা শুনেছি। কিন্তু আপনাকে তো নেপালিদের থেকে আলাদা করা যাবে না।'

'মঙ্গোলিয়ান মুখ বলে। তবে লক্ষ করলে বুঝতে পারবেন। নেপালি, লেপচা, সিকিমিজ এবং ভুটিয়া, এদিকের এই চারটে পাহাড়ি জাতির মানুষের মুখের গঠনে পার্থক্য আছে। সিকিমিজ এবং ভুটিয়ারা অনেক বেশি লম্বা হয়। বাঙালিরা এসব খুঁটিয়ে দেখে না, ভাবেও না।' বিষ্ণুপ্রসাদ হাত বাড়াল, 'কাম অন, আমরা কেউ কারও শত্রু নই।'

সায়ন করমর্দন করতেই ডাক্তারবাবু ফিরে এলেন। সায়ন ওঁর সঙ্গে বিষ্ণুপ্রসাদের পরিচয় করিয়ে দিল। ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওদের পাওয়া যাবে না শুনে আপনি নিজে এগিয়ে এসেছেন ? ভগবান আপনার ভাল করবেন।'

বিষ্ণুপ্রসাদ হাসল, 'ভগবানের অত ক্ষমতা নেই।'

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম ?'

'আমি যদি নিজেই নিজের ক্ষতি করতে চাই তাহলে ভগবান কী করতে পারেন ?'

'তুমি বলছি। তুমি কেন নিজের ক্ষতি করতে চাইবে ?'

'জানি না। মাঝে মাঝেই মনে হয় সব ভেঙে চুরমার করে দিই।'

'কেন মনে হয় না যত্ন করে কোনও কিছু গড়ে তুলি ?'

'কারণ সেটা করলে অন্য কেউ কায়দা করে ভেঙে দেবে। দেখুন, আমার রক্তে আপনার কাজ হয় কিনা ?'

বিষ্ণুপ্রসাদকে নিয়ে ডাক্তার ভেতরে চলে গেলেন। সায়ন ওকে নিয়ে ভাবছিল। এরকম ছেলে সে কোনওদিন দেখেনি। খারাপ তো লাগছিলই না, উল্টে অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করছিল সে।

এই সময় মিসেস অ্যান্টনির গলা শুনতে পেল সে, 'আসুন। সকালে আসেননি কেন ? আজ আপনার মেয়েকে রক্ত দেওয়া হবে।'

'সে কী ? কেন ? ওর কি শরীর খুব খারাপ ?' মহিলার গলা পেল সায়ন। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল প্যাসেজে দাঁড়িয়ে মিসেস অ্যান্টনির সঙ্গে কথা বলছেন কঙ্কাবতীর মা।

'ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তার মনে করছেন এখন রক্ত দিলে ওর উপকার হবে। মুশকিল হল যাদের আসার কথা ছিল তারা আসতে পারেনি। ওদের বদলে যে ছেলেটি এসেছে তার রক্তের গ্রুপ

যদি আলাদা হয়— ।' মিসেস অ্যান্টনি কথা শেষ করলেন না।

'তাহলে কী হবে?' সায়নকে দেখতে পেলেন কঙ্কাবতীর মা। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'আচ্ছা, আমি তো ওর মা। আমার রক্তে ও তৈরি। তাহলে আমি রক্ত দিলে নিশ্চয়ই কাজ হবে।'

মিসেস অ্যান্টনি হেসে তাঁর কাজে চলে গেলেন। সায়ন বলল, 'আপনি ভেতরে এসে বসুন। ডাক্তারবাবু এখনই ফিরে আসবেন। সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আপনি ওর মা হলেও দুজনের রক্তের গ্রুপ যে এক হবে এমন কোনও নিয়ম নেই।'

কঙ্কাবতীর মা ভেতরে এলেন, 'তাই যদি হয় তাহলে তুমি ওটা এক করে দাও।'

'আমি?' চমকে উঠল সায়ন, 'আমি কী করে করব?'

'তোমাকে দেখেই আমি বুঝে গিয়েছি তুমি মানুষের মতো নও। তুমি আমাকে নরকে তলিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছ। তোমার ঘরে সেদিন যদি না যেতাম, তোমাকে যদি না দেখতাম তাহলে এই শরীরটা নোংরা হয়ে যেত। তোমাকে দেখেছি বলে আমি শিলিগুড়ি যাইনি।'

'ভাল করেছেন। ঠিক করেছেন।'

'হ্যাঁ। আমার স্কুলের চাকরি চলে গিয়েছে।' অদ্ভুত গলায় বললেন ভদ্রমহিলা।

'কেন?'

'আমি জানি না। শুনলাম গণেশ এখানে এসে নাকি মেয়ের সঙ্গে কীসব ঝামেলা করেছিল। তারপর পার্টি থেকে ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব বকে। ওকে কালিম্পং-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আজ সকালে স্কুলে গিয়ে শুনলাম আমারও চাকরি নেই। ওরা সমান বিচার করেছে।'

'সমান বিচার? আপনি কোনও অন্যায় করেননি। গণেশ এখানে এসে যা করেছে সে-তুলনায় কম শাস্তি পেয়েছে।'

'আমি জানি না। কী করে বেঁচে থাকব তাও জানি না। শুধু আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দাও তুমি। তুমি ইচ্ছে করলেই পারো।' ভদ্রমহিলা কেঁদে কেঁদে কথাগুলো এমন ভঙ্গিতে বলছিলেন যেন প্রার্থনা করছিলেন।

সায়ন প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়ল, 'আপনি এসব কী বলছেন? যা করার ডাক্তারবাবু করবেন। ওঁর ওপর ভরসা রাখুন। আমি এখানে আছি ওঁর কাছে চিকিৎসার জন্যে।'

'জানি। তুমি ইচ্ছে করে শরীরে অসুখ নিয়েছ। শুনেছি মহাপুরুষরা তাই নেন। তুমি মা মেরির আশীর্বাদ পেয়েছ। পাওনি?'

সায়ন হেসে ফেলল, 'এসব কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। আমি আপনার মতো মানুষ। না, ঠিক হল না, আপনি সুস্থ, আমি অসুস্থ।'

এইসময় ডাক্তার ফিরে এলেন। পেছনে বিষ্ণুপ্রসাদ। ডাক্তার কিছু বলার আগেই বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'হল না। মেয়েটার কাজে লাগতে পারলাম না। কপালটা দেখুন, এই জন্যে মাঝে মাঝে খুব রাগ হয়।'

ডাক্তার বললেন, 'তোমার রক্ত অত্যন্ত মূল্যবান। ওই রেয়ার গ্রুপের ব্লাড পাওয়া খুব মুশকিল। তোমার ঠিকানাটা বলো।'

সেটা লিখে নেওয়ার পর ডাক্তার মহিলার দিকে তাকালেন।

'আমার রক্ত নিন।' মহিলা বিড় বিড় করলেন।

ডাক্তার প্রথমে ওঁকে চিনতে পারেননি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি?'

সায়ন বলল, 'উনি কঙ্কাবতীর মা।'

'ওহো। সরি। আমি একটু— । হ্যাঁ, বলুন।'

'আমার রক্ত নিন।'

'আপনি কখনও এর আগে কাউকে রক্ত দিয়েছেন?'

'না।'

'আপনার গ্রুপ কী?'

'জানি না।'
'আসুন।' ডাক্তার মহিলাকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।
বিষ্ণুপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি অফিসে কাজ করেন?'
'না-না।' সায়ন বলল, 'কিছু করার নেই, বসে আছি।'
'আপনার কী অসুবিধে হয়?'
'যতক্ষণ হেমোগ্লোবিন একেবারে না কমে যায় ততক্ষণ কোনও সমস্যা নেই। ওটা একটা বিশেষ মাত্রার নীচে নেমে গেলে—!'
'ওটা তো যে কোনও সময়েই হতে পারে।'
'পারে।'
'তার মানে এই আপনি সুস্থ কিন্তু খানিক বাদেই অসুস্থ হতে পারেন?'
'ঠিক ওইভাবে বলা ঠিক হবে না। তবে কোনও নিশ্চয়তা নেই। কখনও কোনও বিষয় নিয়ে ভাবতে গিয়ে যদি মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় তখন বুঝতে পারি অসুস্থ হতে যাচ্ছি।'
'কিছু ভাবতে গিয়ে কূল না পেলে আমারও মাথায় যন্ত্রণা হয়।' চোখ বন্ধ করল বিষ্ণুপ্রসাদ।
'আপনি কী করেন?'
'চাকরি পাইনি। না, পেয়েছিলাম, মেনে নিতে পারিনি বলে চাকরি করতে পারিনি। ব্যবসা করার চেষ্টা করেছিলাম। হলদিরামের মাল কলকাতা থেকে আনিয়ে সাপ্লাই দিতাম পাহাড়ি শহরগুলোর দোকানে দোকানে। ছয় মাসেই ব্যবসা উঠে গেল।'
'কেন?'
'যারা দশ টাকার মাল নিত তারা তিন টাকা দিয়ে পরের মাল চাইত। বাকি রাখা নাকি ব্যবসার অঙ্গ। আমার টাকা ছিল না বেশি তাই বেশিদিন বাকি রাখার খেলা খেলতে পারলাম না।' বিষ্ণুপ্রসাদ হাসল, 'বুঝলাম, আমার দ্বারা ব্যবসা হবে না।
'আপনি চা খাবেন?'
'নাঃ।' বিষ্ণুপ্রসাদ উঠে দাঁড়াল।
মিসেস অ্যান্টনি এলেন অফিসঘরে। আলমারি থেকে একটা কাগজ বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'ভাল খবর। মেয়ের আর মায়ের ব্লাড গ্রুপ এক। এখনই রক্ত নেওয়া হবে। সায়ন, কঙ্কাবতীর মা তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।' মিসেস অ্যান্টনি চলে গেলেন।
বিষ্ণুপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন?'
সায়ন বেরিয়ে এল, 'আমি এর কারণ জানি না।'
ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল।
পাহাড়ে সন্ধ্যা নামে না, সায়নের মনে হয়, সন্ধ্যা ধুপ করে পড়ে যায়। এখন আকাশ দেখে মনে হল সেই পড়াটা পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে ঘটবে না। বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'এই এলাকাটা একটু আলাদা। এখানকার মানুষ খ্রিশ্চান। হিন্দুদের থেকে খ্রিশ্চানরা অনেক বেশি টিপটপ।'
টিপটপ শব্দটা কানে যেতে হেসে ফেলল সায়ন।
'ভুল বললাম?'
'না। আপনার হিন্দি নেপালি এবং ইংরেজি শব্দগুলো বেশ মজার।'
'আমি বেশিক্ষণ ইংরেজি বলতে পারি না, হিন্দি পারি কিন্তু বলতে গেলেই নেপালি বেরিয়ে আসে।'
'আপনি লেপচা, লেপচাদের আলাদা ভাষা নেই?'
'আছে। কিন্তু বড় মাছ ছোট মাছকে যেমন গিলে খায় তেমনই ধীরে ধীরে নেপালি আমাদের দখল করে নিয়েছে। এখনও পাহাড়ের কোনও কোনও ভ্যালিতে যেসব লেপচা গ্রাম আছে সেখানে গেলে শুনতে পাবেন। আচ্ছা, আমরা তো প্রায় সমবয়সী, তাহলে আপনি আপনি বলছি কেন?'
'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'
বিষ্ণুপ্রসাদ দূরের পাহাড়ের দিকে তাকাল। 'ওই দিকে দার্জিলিং। দার্জিলিং-এর আসল নাম

জানো ?'

'দার্জিলিং আসল নাম নয় ?'

'না। শব্দটা হল দার্জুলাঙ্গ। লেপচা শব্দ। দার্জুলাঙ্গের মানে হল ভগবানের বাসস্থান। অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ। পরে সিকিমের ষষ্ঠ বাজা নামগেল একটা মন্দির তৈরি করে নাম দেন দোর্জেলিঙ্গ। মানে বজ্র।'

'সে কী! খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো!' সায়ন বলল।

'হাই সায়ন।' চিৎকারটা কানে আসতেই ওরা মুখ ফেরাল।

সিমি আর এলিজাবেথ। দুজনের হাতে অনেকগুলো প্যাকেট। এলিজাবেথ নিশ্চয়ই বাজারে গিয়েছিলেন সিমিকে সঙ্গে নিয়ে।

কাছে এসে এলিজাবেথ হাসলেন, 'কেমন আছ তুমি ?'

সায়ন বলল, 'ভাল। অনেক কিছু কেনা হল ?'

'এই টুকটাক। কাজ চালাতে গেলে যেটুকু লাগে। এই মেয়েটা আমাকে খুব সাহায্য করেছে, খুব ভাল মেয়ে।'

শোনামাত্র প্যাকেট হাতে নিয়ে সিমি এমন পোজ দিল যা টিভির মডেলরা দিয়ে থাকে। সায়ন লক্ষ করল বিষ্ণুপ্রসাদ বেশ অবাক হয়েছে। সে আলাপ করিয়ে দিল, 'ইনি এলিজাবেথ, মিস্টার ব্রাউনের বন্ধু। আমেরিকায় থাকেন। আর এ হল বিষ্ণুপ্রসাদ। নিজে থেকে রক্ত দিতে নিরাময়ে এসেছিল, এখন আমরা বন্ধু হয়ে গেছি বলা যেতে পারে।'

'আপনি নিজে থেকে রক্ত দিতে এসেছিলেন ?' এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন।

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'ম্যাডাম, আপনি যদি একটু ধীরে ধীরে কথা বলেন তাহলে আমার পক্ষে বুঝতে সুবিধে হবে। আমি ইংরেজি কম জানি।'

এলিজাবেথ হাসলেন, 'ওয়েল। রক্ত দিতে এসেছিলেন বলে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' এবার বললেন যথেষ্ট ধীরে।

'এটা এমন কিছু নয়। তা ছাড়া গ্রুপ না মেলায় আমার রক্ত কাজে লাগেনি। আপনি এখানে বেড়াতে এসেছেন ?'

'তাই এসেছিলাম।'

'কেমন লাগছে ?'

'এখানকার প্রকৃতি খুবই ধনী কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ খুব গরিব। এই দুটো আলাদা বলে মনে ভাললাগা তৈরি হয় না।'

'বাঃ। চমৎকার বলেছেন।'

সিমি উসখুস করছিল, 'ম্যাডাম এখানে কিছুদিন থেকে যাবেন।'

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'ভাললাগা তৈরি না হলেও থাকবেন ?'

'ভাল যাতে লাগে তার চেষ্টা করার জন্যে থাকব। আপনি নিশ্চয়ই সমতলের মানুষ নন। আপনার পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই নেপাল থেকে এসেছিল ?'

'না। আমার পূর্বপুরুষ এখানকার মানুষ ছিলেন।'

'আপনি নেপালি নন ?'

'না। আমি লেপচা।'

'লেপচা ? ইয়েস, এই শব্দটা আমি ট্যুরিস্ট ব্যুরোর লিফলেটে দেখেছি। তাহলে আপনি সিমি অথবা মিস্টার ব্রাউন থেকে আলাদা ?'

'জন্মসূত্রে। তবে এখন ওসব নিয়ে চিন্তা করি না।'

এলিজাবেথ বললেন, 'চলো ঘরে গিয়ে গল্প করি। সায়ন, আজ রাতটা আমি মিস্টার ব্রাউনের ওখানেই থাকছি, কাল শিফ্‌ট করব।'

'কোথায় ?'

সিমি জবাবটা দিল, 'মিসেস ডিসুজা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কাঠমাণ্ডু চলে গেছেন। মিস্টার ব্রাউন

সেটা ম্যাডামের জন্যে ভাড়া করে দিয়েছেন।'

এলিজাবেথ বললেন, 'এসো। আপনিও আসুন।'

বিষ্ণুপ্রসাদ হাত বাড়াল, 'ওগুলো আমাকে দিন।'

এলিজাবেথ মাথা নাড়লেন, 'না না। এগুলো বইতে আমার একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। অনেক ধন্যবাদ।'

সায়ন একটু ইতস্তত করছিল। সন্ধে হয়ে গেল বলে। এইসময় বাইরে গেলে ডাক্তারবাবু অসন্তুষ্ট হবেন। সে বলল, 'আপনারা এগোন, আমি যাচ্ছি।'

ওরা এগিয়ে গেলে সে নিরাময়ে ফিরে এল। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে ডাক্তার মিসেস অ্যান্টনিকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সেটা শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলেটি চলে গেছে?'

'না। ওরা মিস্টার ব্রাউনের বাড়িতে গেল।'

'ওরা মানে?'

'এলিজাবেথ আর সিমি বাজার থেকে ফিরছিলেন। পরিচয় হওয়ার পর মিস্টার ব্রাউনের বাড়িতে যেতে অনুরোধ করলেন। কাল থেকে এলিজাবেথ মিসেস ডিসুজার খালি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন।'

'আচ্ছা। তুমি গেলে না?'

'না। অন্ধকার হয়ে এসেছে।'

'যেতে ইচ্ছে করছে?'

সায়ন হাসল।

'শরীর ভাল থাকলে কিছুক্ষণ গল্প করে আসতে পারো। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বললে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারবে। আফটার অল, একজন বিদেশিনী বেড়াতে এসে মানুষের উপকার করতে থেকে গেলেন। এদেশের ইতিহাসে এরকম কিছু ঘটনা এর আগেও অবশ্য ঘটেছে।'

এইসময় কঙ্কাবতীর মা নেমে এলেন। সায়নকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে হাতজোড় করলেন তিনি, 'ভগবান তোমাকে শক্তি দিয়েছেন। সেই শক্তি দিয়ে তুমি আমার মেয়েটাকে সারিয়ে দাও।'

সায়ন হঠাৎ রেগে গেল, 'আপনাকে এর আগেও বলেছি এভাবে কথা না বলতে। আমি একজন সাধারণ মানুষ। কঙ্কাবতীর ব্যাপারে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলুন।'

মহিলা হকচকিয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবু এগিয়ে এলেন, 'ভগবান সবাইকে কিছু করার শক্তি দিয়েছেন। হঠাৎ সায়নকে বলছেন কেন?'

মহিলা এবার কেঁদে ফেললেন, 'আমার শিলিগুড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। যে-লোকটা আমাকে লোভ দেখাচ্ছিল শুধু তাকে দোষী করব না, আমারও লোভ হচ্ছিল। কিন্তু ওকে দেখার পর মনটা কীরকম বদলে গেল। সেই রাত্রে গণেশ আমাকে খুব শাসিয়েছিল। বলেছিল আমাকে শিলিগুড়ি যেতেই হবে। ভেবেছিলাম যা হবার হবে কিছুতেই আমি মেয়ের কাছে সম্মান হারাব না। পরদিন শুনলাম পার্টি থেকে গণেশকে কালিম্পং পাঠিয়ে দিয়ে বলেছে এদিকে আর না আসতে। কেন দিল? আজ দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম একটা আলো আকাশ থেকে নেমে আসছে। আমি ভয় পেয়ে দৌড়োতেই পেছন থেকে শুনলাম, ভয় পাবেন না। তাকিয়ে দেখলাম ইনি দাঁড়িয়ে আছেন। ঘুম ভেঙে গেল। আজকে আমার মেয়ের রক্তের দরকার। দেখুন, আমার রক্তে ওর দরকারটা মিটে গেল। আমি যদি বলি ওঁর জন্যে সম্ভব হয়েছে তাহলে মিথ্যে বলব?'

ডাক্তারবাবু হাসলেন, 'দেখুন, এসবই আপনি ভেবেছেন। ভাবতে আপনার ভাল লেগেছে। কিন্তু সায়ন আপনার মেয়ের মতো একজন মানুষ। যে যা নয় তাকে সেটা বললে বিব্রত করা হয়। আপনি রেস্টরুমে বসুন।' ডাক্তারবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন, 'কী হল? তুমি যাও, ওঁরা নিশ্চয়ই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আর হ্যাঁ, টর্চটা নিয়ে যাও। ছোটাবাহাদুর, সায়নকে টর্চ এনে দাও।'

তখনও টর্চ জ্বালার প্রয়োজন হয়নি। হালকা আঁধার চোখের সামনে। কলকাতার শীতের শুরুতে সুতির আলোয়ানের কথা মনে পড়ল। শীত বাড়তেই সেটা বাতিল হয়ে যেত। পাহাড়গুলো আবছা, আকাশ নীল। সায়ন ভেবে পাচ্ছিল না এরা তার মধ্যে এমন কী দেখতে পাচ্ছে যা সে জানে না। অদ্ভুত ব্যাপার!

দরজা খুললেন মিস্টার ব্রাউন। খুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য! তুমি? এই সময়? যা আমি হেরে গেলাম।'

'কীরকম?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল।

'ওরা এসে বলল, তুমি নাকি পরে আসছ বলেছ। আমি বললাম, সন্ধে হয়ে আসছে, এখন সায়ন আসতে পারে না।'

'উনি বললেন কাল এখান থেকে চলে যাবেন। তাই ডাক্তারবাবুর অনুমতি নিয়েই এসেছি।'

'গুড। এই হেরে যাওয়ায় আনন্দ আছে। এসো, ভেতরে এসো।'

মিস্টার ব্রাউনের খাওয়া-কাম-বসার ঘরে বিষ্ণুপ্রসাদ একা বসেছিল। মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'আমাদের এই তরুণ বন্ধু চা খাবেন। মেয়েরা রান্নাঘরে। আমি আমার পানীয় খাচ্ছি। ওকে?'

মিস্টার ব্রাউন তাঁর বোতল নিয়ে আসার আগেই এলিজাবেথ বেরিয়ে এলেন, তাঁর হাতে একটি বিদেশি মদের বোতল, 'মিস্টার ব্রাউন, আজ আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। কাল সকালে নতুন বাড়িতে চলে যাব। এই বস্তুটি আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। যদিও আমি বেশি মদ্যপান পছন্দ করি না তবু আজ এটাকে খুলতে হবে।'

মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'স্কচ আমার ভাল লাগে না।'

'ভাল না লাগলেও অনেক কাজ করতে হয় আমাদের।'

'বেশ।'

দিশি চোলাই মদের বদলে বিলিতি স্কচ হুইস্কি খেতে হচ্ছে বলে মিস্টার ব্রাউনের মুখ করুণ হয়ে উঠল। তিনি গ্লাসে সামান্য পানীয় ঢেলে জল না মিশিয়ে একটা চুমুক দিলেন, 'স্কটল্যান্ডের গন্ধ।'

সিমি চা আর প্যাটিস নিয়ে এল, 'আমিও ভেবেছিলাম তুমি আসবে না। কিন্তু তোমার বন্ধু বলেছিল কথা দিয়েছে যখন আসবেই।'

সায়ন হাসল। ওরা একটা টেবিলের চারপাশে বসেছিল। প্যাটিসে কামড় দিয়ে এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা লেপচারাও কি নেপাল থেকে এসেছে?'

বিষ্ণুপ্রসাদ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'না ম্যাডাম। এইসব পাহাড়ে আমরা হাজার হাজার বছর ধরে আছি। এখন যেটা সিকিম এবং দার্জিলিং, আমাদের পূর্বপুরুষদের বাস ছিল এখানেই। লেপচাদের দৃঢ় ধারণা, তারা ভগবানের সন্তান। গল্প আছে, প্রথম লেপচা মানব-মানবী ফোডোংথিঙ্গ এবং ন্যাজাওঙ্গুকে ভগবান তৈরি করেছিলেন কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় যে পবিত্র তুষার জমেছিল সৃষ্টির প্রথম দিনে, তাই দিয়ে। তারপর তিনি ওদের পাঠিয়ে দিলেন কাঞ্চনজঙ্ঘার পায়ের তলার পাহাড়ে পাহাড়ে যেখানে সরল, পবিত্র জীবনযাপন করতে পারবে। এই জন্যে লেপচারা দাবি করে তারা হল ঈশ্বরের সন্তান।'

এলিজাবেথ মন দিয়ে শুনছিলেন। বিষ্ণুপ্রসাদ থামলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবান আদম ইভকে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সেটা মানুষের বিশ্বাস, ইতিহাস নয়। কিন্তু ধরে নিচ্ছি লেপচারা সিকিম এবং দার্জিলিং-এর আদি বাসিন্দা। সিকিম এখান থেকে কত দূরে?'

'খুব কাছে।'

'কিন্তু ওই গল্প ছাড়া অন্য কোনও প্রমাণ আছে?'

'নিশ্চয়ই। মানুষ যেখানে বাস করে তার নামকরণ তারাই করে থাকে। এই পাহাড়ের প্রায় প্রতিটি জায়গার নাম লেপচারা দিয়েছিল তাদের ভাষায়।'

'যেমন?'

'তার আগে একটা কথা বলা দরকার। লেপচা শব্দটা ব্রিটিশরা ভুল উচ্চারণ করায় তৈরি হয়ে যায়। আজ সবাই লেপচা বলছে আমাদের, আমরাও বলি, কিন্তু মূল শব্দটা হল ল্যাপচে। আমাদের এই নামকরণ করেছিল নেপালের মানুষরা। ল্যাপ মানে কথা, চে মানে নির্বোধ। ল্যাপচে হল যে নির্বোধের মতো কথা বলে থাকে। যদিও শব্দটা পবিত্র নেপালি পরিভাষায় আছে কিন্তু এটা ব্যবহৃত হয়েছিল ঠাট্টা করার জন্যে। লেপচারা সরল বলে বেশি কথা বলত। যেমন আমি।'

বিষ্ণুপ্রসাদ হেসে উঠতেই সবাই হাসল।

সিমি জিজ্ঞাসা করল, 'কাঞ্চনজঙ্ঘার আসল নাম কী ছিল ?'

মিস্টার ব্রাউন জবাব দিলেন, 'খাঙ্গচেন জোঙ্গা।'

বিষ্ণুপ্রসাদ মাথা নাড়ল, 'না স্যার। টিবেটিয়ানরা এদেশে এসে ওই নামকরণ করেছিল। যেমন ভুটিয়ারা বলত, কুম্ভেরা। কাঞ্চনজঙ্ঘার আসল নাম ছিল কিংসুম জ্যাওঙ্গবু ছু। যার মানে হল পবিত্র শিখরের শীর্ষবিন্দু। সূর্যের প্রথম এবং শেষ আলো যখন কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর পড়ে তখন যে লাল এবং সোনালি দ্যুতি তৈরি হয় তার দিকে তাকালে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়। লেপচারা বিশ্বাস করত এই কথা।'

এলিজাবেথ একটা ডায়েরি নিয়ে এসে শব্দটা লিখতে চাইলেন, 'বানানটা বলবেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার লেপচা নাম— ?'

মিস্টার ব্রাউন বললেন, 'যতদূর মনে হচ্ছে এইরকম, Kingtsoom Zaongboo Choo। ঠিক বললাম তো ?'

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'বানানটা ঠিক হল কিনা আমি জানি না। আমি আমার বাবার কাছে এই সব শুনেছি। কিন্তু আপনি একজন নেপালি হয়ে এই খবরগুলো রাখেন ?'

'আমার একজন লেপচা বন্ধু ছিলেন। তাঁর নাম কে পি তামসাং। তিনি একটা লেখা পড়তে দিয়েছিলেন। আচ্ছা, আমি তখন থেকে ভাবছি, তোমার নাম বিষ্ণুপ্রসাদ কেন ? লেপচারা তো এমন হিন্দু নাম রাখে না !'

'ঠিকই বলেছেন। আমাদের উপাধি হল র‍্যাপগে। আমাদের পূর্বপুরুষ ডুনো র‍্যাপগে ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে লড়াই করে নিহত হন। আমার মা মারা যান যখন আমি মাত্র পাঁচ মাসের। সেই সময় প্রতিবেশী একটি নেপালি পরিবারের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব ছিল। সেই বাড়ির একটি মেয়েকে বাবা বিয়ে করেন। সেই মা এসে আমার নামকরণ করেন বিষ্ণুপ্রসাদ। এর জন্যে আমাদের অন্যান্য লেপচা-আত্মীয়রা বাবাকে ত্যাগ করেছেন।' বিষ্ণুপ্রসাদ বলল।

এলিজাবেথ এই গল্পে উৎসুক ছিলেন তনি জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, দার্জিলিং কি নেপালি শব্দ ?'

'না ম্যাডাম। নেপালি শব্দ হওয়ার কোনও কারণ নেই। লেপচায় বলা হত দ্যার্জুল্যাং। তার মানে হল পৃথিবীর স্বর্গ। পরে সিকিমের রাজা টেন্ড্যান নামগেল চৌরাস্তার ওপর এক মনাস্টোরি তৈরি করে নামকরণ করলেন, দোরজেলিং। এর মানে হল বজ্রপাতের জায়গা।'

'বেশ। দোরজেলিং থেকেই দার্জিলিং হয়েছে ?' এলিজাবেথ লিখছিলেন।

'হ্যাঁ। কিন্তু কীভাবে হয়েছে তা অনেকেই জানে না।'

'কীভাবে ?'

'আঠারো শো সতেরো এবং আঠারো শো পঁচিশ সালে সিকিম এবং নেপালের সীমান্ত নিয়ে বিরোধ তুঙ্গেওঠে। ব্রিটিশ সরকার নাক গলায়, জে ডব্লু গ্র্যান্ট এক সাহেবকে বিরোধ মেটাতে পাঠায়। গ্রান্ট সাহেব দার্জিলিং-এ পৌঁছে এর সৌন্দর্য দেখে চমকে যান এবং ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলকে অনুরোধ করেন দার্জিলিং দখল করতে। তাঁর মতে স্বাস্থ্যাবাসের পক্ষে ওই পাহাড়ি জায়গাটি অতীব মনোহর। তা ছাড়া সিকিম তিব্বত নেপাল এবং ভুটানের ওপর ওখান থেকে কড়া নজর রাখা সম্ভব হবে। সিকিমের রাজাকে ব্রিটিশ সরকার চাপ দিতেই তিনি কোনও শর্ত ছাড়াই মাত্র তিনশো পাউন্ডের বিনিময়ে দার্জিলিং ছেড়ে দিতে রাজি হয়ে গেলেন। ভেবে দেখুন, লেপচাদের পবিত্রভূমি তাদের অনুমতি ছাড়াই সিকিমের রাজা সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রিটিশের হাতে তুলে দিলেন। ব্রিটিশ সরকার দার্জিলিং-এর অধিকার নিয়ে চৌরাস্তার মোড় থেকে মনাস্টোরি উঠিয়ে নীচের ভুটিয়া বস্তিতে পাঠিয়ে দিল। তারপর তারা লেপচা শব্দটাকে বাতিল করে নাম রাখল দার্জিলিং। এরও পরে যখন নেপালি উদ্বাস্তুরা এদেশে এল তারা নামটাকে ছোট করে বলতে লাগল, দার্লিং। যদিও এই নাম তেমনভাবে স্বীকৃত হল না।' বিষ্ণুপ্রসাদকে যেন কথা বলার নেশায় পেয়েছিল। সে বলল, 'একটু নীচে যে শহরটাকে কার্সিয়াং বলে সকলে জানে তার লেপচা নাম ছিল কার্সঙ্গ। নেপালিরা ভুল উচ্চারণ করত, খার্সাং। ব্রিটিশরা তাদের সুবিধে অনুযায়ী বলল কার্সিয়াং। কার্সঙ্গ শব্দের মানে হল, শুকতারা। অথবা সূর্য ওঠার আগে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা।

কালিম্পং শহরটার কথা ভাবুন। ওর মূল লেপচা নাম ছিল ক্যালেনপাঙ্গ। পরে নেপালিরা উচ্চারণ করল কালেবুঙ্গ। তিব্বতিরা বলল কাব্। আর ব্রিটিশরা উচ্চারণ করল কালিম্পং। পাহাড়ের নীচে দার্জিলিং জেলার সবচেয়ে বড় শহরটার নাম হল শিলিগুড়ি। শব্দটা বাংলা বা নেপালি নয়, লেপচা। মূল শব্দ হল, শ্যালিগ্রি। যার অর্থ ধনুকে ছিলা পরাও। পরে নেপালিরা উচ্চারণ করল শিলিগিড়ি, ব্রিটিশরা বলল, শিলিগুড়ি।'

সায়ন চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ধনুকে ছিলা পরাও শুনে মনে হচ্ছে ওখানে খুব যুদ্ধ হয়েছিল! তাই কী?'

'হ্যাঁ। আঠারো শো ছাব্বিশ সালে সিকিমের রাজা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ আর্মিকে পাহাড় থেকে তাড়িয়ে সমতলে নিয়ে আসে লেপচা সৈন্যরা। প্রচুর ব্রিটিশ সৈন্য মারা যায় কিন্তু লেপচাদের মাত্র একজন শহিদ হন। তিনি আমার পূর্বপুরুষ ডুনো র‍্যাপগে। ওই যুদ্ধে তিনি একা বিষাক্ত তিরের সাহায্যে প্রচুর শত্রুকে নিহত করেন। লেপচা সৈন্যরা সমতলে নেমে এসে দেখে ব্রিটিশরা আবার যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসছে। লেপচা কম্যান্ডার আদুপ দোলে চিৎকার করে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দেন, "শ্যালিগ্রি!" অর্থাৎ ধনুকে ছিলা পরাও। সেই যুদ্ধে লেপচাদের ব্রিটিশের আধুনিক অস্ত্রের কাছে হার মানতে হয়েছিল বটে কিন্তু পরবর্তীকালে আর যুদ্ধ হয়নি। যে-জায়গায় আদুপ দোলে চিৎকার করে শ্যালিগ্রি বলেছিল সেই জায়গাটাই এখন শিলিগুড়ি বলে পরিচিত।' বিষ্ণুপ্রসাদ থামল, 'এসব আমার শোনা কথা।'

মিস্টার বললেন, 'আমার মনে পড়ছে। ঠিক এই সব কথাই আমি কে পি তামসাং-এর লেখায় পড়েছিলাম।'

এলিজাবেথ বললেন, 'একটা বেসিক প্রশ্ন করছি, 'নেপালিরা তা হলে দার্জিলিং-এর আদিবাসী নন। লেপচারাই সেই দাবি করতে পারেন?'

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'ব্যাপারটা এত সরল নয়। আমি শুনেছি এখনকার বাঙালিরা পশ্চিমবাংলার আদি বাসিন্দা নয়। তারা এসেছিল বাইরে থেকে। সায়ন এ ব্যাপারে কিছু জানো?'

২৭

রায়বাড়ির সবাই যতটা উত্তেজিত ছিল পরিস্থিতি ততটা অনুকূলে গেল না। যারা ভেবেছিল প্রমোটারের সঙ্গে দ্রুত চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে, এবং পরিবিহীন মাঠে ভিত খোঁড়া হবে তারা জানল কাজটা অত সহজ নয়। প্রথম কথা যে প্রমোটারকে ঠিক করা হয়েছিল তিনি নানান ফ্যাকড়া তুলতে শুরু করলেন। ফ্ল্যাট এবং সেই সঙ্গে দেয় টাকার পরিমাণ তাঁর কাছে বেশি বলে মনে হল।

রায়বাড়ির পুরুষরা একটু কর্মবিমুখ। একমাত্র সদানন্দ ছোটাছুটি করে আরও কয়েকজন প্রমোটারের সঙ্গে যোগাযোগ করল। খবরটা কলকাতায় চাউর হতেই মারোয়াড়ি ব্যবসাদাররা এগিয়ে এল। তাদের কারও কারও প্রস্তাব হল, ফ্ল্যাট-ট্ল্যাট নয়, থোক টাকা ধরে দেওয়া হচ্ছে, মোটা টাকা, রায়বাড়ির শরিকরা সেই টাকা নিয়ে এই বাড়ি খালি করে চলে যাক। টাকার পরিমাণ শুনে কেউ কেউ আগ্রহ দেখালেন। সমস্যা হল ব্যাঘ্রবাহিনী দেবীকে নিয়ে। এই দেবীমূর্তিকে ফেলে দেওয়া যায় না আবার কেউ একজন প্রোমোটারের কাছ থেকে পাওয়া টাকায় ফ্ল্যাট কিনে সেখানে দেবীমূর্তিকে নিয়ে গিয়ে পুজো করতে নারাজ। কারণ স্থানাভাব এবং খরচ।

রায়বাড়ির শরিকরা ঘন ঘন আলোচনায় বসলেন। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে মতান্তর এবং চেঁচামেচি বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত ন'বাবু প্রস্তাব রাখলেন, বড়মায়ের কাছে যাওয়া হোক। তাঁর কোনও পিছুটান নেই। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গিয়েছে নাতি তার বউকে নিয়ে আমেরিকায় চলে যাবে। তিনি থাকবেন একা আতরবালাকে নিয়ে। তাঁর ঝামেলা কম। অতএব তিনি যদি মা ব্যাঘ্রবাহিনীর দায়িত্ব নেন তাহলে সব দিক রক্ষা হয়। সেই আলোচনায় নাতি ছিল না। সে গিয়েছে

তার স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে। কথা হল, তার মতামত না জেনে যাওয়া ঠিক নয়। নাতি যদি এই প্রস্তাব সমর্থন করে তাহলে বড়মা আপত্তি করতে পারবেন না।

বাদল খবর এনেছিল ছেষট্টি সালের একটা অ্যাম্বাসাডার বিক্রির জন্যে আছে। আজকাল বেশি পুরনো গাড়ি কিনে লাভ নেই, খদ্দের পাওয়া মুশকিল। কিন্তু বি জি এবং বি জে নাম্বারের গাড়ির বডি এবং ইঞ্জিন অ্যাম্বাসাডারের অন্য বছরের গাড়ির তুলনায় অনেক বেশি মজবুত হয় বলে সদানন্দ দেখতে যেতে রাজি হল। তারপর যখন বাদল জানাল গাড়িটি জনৈক ডাক্তারের এবং তিনি শো-রুম থেকে ডেলিভারি নেওয়ার পর এই এত বছরে হাত বদল করেননি তখন তার আগ্রহ বাড়ল।

ভদ্রলোকের বাড়ি মানিকতলার রামানন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। ডাক্তার অসুস্থ, একবার হ্যার্ট অ্যাটাক হয়েছে। প্র্যাকটিস করা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে গ্যারাজ খুলিয়ে গাড়ি দেখালেন। ইঞ্জিন চালু করলেই আওয়াজে তার স্বাস্থ্য টের পায় সদানন্দ। সেটা ঠিকই আছে। গিয়ারের কাজ আছে আর রং করতে হবে। ডাক্তারের মেয়ে বললেন, 'বাবা মাত্র একবারই রং করিয়েছিলেন।'

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা গাড়িটা বিক্রি করছেন কেন?'

'বাবা তো বের হন না, আমারও গাড়ির দরকার নেই। গ্যারাজে পড়ে থেকে নষ্ট করে কী লাভ।'

'কত দাম ধরেছেন?'

'কত পাওয়া যেতে পারে?'

'দেখুন, এত পুরনো গাড়ি, শখ করে কেউ কিনবে না। মনে হচ্ছে ইঞ্জিন কখনও করাতে হয়নি। এখন যে অবস্থা তাতে কয়েক মাসের মধ্যে ডাউন হতে পারে। তখন আর একটা বড় খরচ। সত্যি বলছি, কুড়ি হাজারের বেশি দাম হওয়া উচিত নয়, তবে ফার্স্টহ্যান্ড বলে আমি আরও পাঁচ বেশি দিতে পারি।' সদানন্দ বলল।

'পঁচিশ হাজার? এই দামে আজকাল গাড়ি পাওয়া যায়?'

'আরও পনেরো খরচ হবেই। চল্লিশ বিয়াল্লিশে দশ বছর আগের গাড়ি বিক্রি হচ্ছে। আমি কম দিচ্ছি মনে হলে বিক্রি করবেন না। আমার কার্ড রাখুন, যদি আমার দামে রাজি হন তা হলে যোগাযোগ করবেন।' পার্স থেকে কার্ড বের করল সদানন্দ।

কার্ড হাতে নিয়ে নাম ঠিকানা পড়ে মেয়েটির মুখের রং আচমকা বদলে গেল। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।'

মেয়েটি চলে যেতেই বাদল বলল, 'কী মডেল গুরু!'

'হ্যাঁ, এই মডেলের অ্যাম্বাসাডারের বডি খুব সলিড হয়। এরপর থেকেই পাত পাতলা হয়ে গিয়েছে। সামান্য ধাক্কা লাগলেই তুবড়ে যায়।' সদানন্দ বলল।

বাদল প্রবলভাবে মাথা নাড়ল, 'দুর। আমি ব্যাক গিয়ার দিয়েছি আর তুই সামনে তাকিয়ে আছিস। গাড়ির কথা কে বলেছে? যে গাড়ি দেখাচ্ছিল তার দিকে তাকিয়ে দেখেছিস?'

'তুই গাড়ি কিনতে এসেছিস না মেয়ে দেখতে?' সদানন্দ রেগে গেল।

'ঠাকুর বলতেন যা দেখার জিনিস তা প্রাণভরে দেখে নে।'

'কোন ঠাকুর?'

'নাম মনে নেই। ভারতবর্ষে কত ঠাকুর আছেন, ছিলেন। তাঁদের কেউ নিশ্চয়ই এমন কথা বলে থাকবেন। সত্যি গুরু, দেখে মন ভরে গেল।'

বাদলের কথা শেষ হতেই একটি কাজের মেয়ে এসে বলল, 'আপনাদের ডাকছে।'

বাদল বলল, 'গাড়িটা বিক্রি করবে। আমাদের কপাল ভাল।'

কোনও কোনও মানুষকে অসুস্থতার কারণে বয়েস হওয়ার আগে বৃদ্ধ দেখায়। ওরা দেখল লাঠি হাতে যে ভদ্রলোক বসে আছেন তিনি এই ধরনের। মুখের একটা দিক ঈষৎ বেঁকে যাওয়ায় তাঁকে আরও অসুস্থ দেখাচ্ছে। ঘরে আর কেউ নেই।

'এসো এসো।' ভদ্রলোকের উচ্চারণ অস্পষ্ট, 'বোসো।'

ওরা বসল। বাদল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রাজি?'

'হ্যাঁ?'

'আপনি গাড়িটা কি বিক্রি করবেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমরা রায়বাড়ির ছেলে?' কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

বাদল বলল, 'হ্যাঁ। আমি নই, এ।'

'তোমার নাম সদানন্দ রায়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমার পিতার নাম ঈশ্বর উপানন্দ রায়?'

'হ্যাঁ।'

'শুনেছিলাম তুমি ব্যবসা কর। গাড়ির ব্যবসা। তোমাদের পরিবারে এখন পর্যন্ত কেউ চাকরি করে না। তা তোমার ব্যবসা কি বাড়ি বাড়ি ঘুরে গাড়ি কেনা?'

'মন্দ কী? আপনি যদি গাড়িটাকে বিক্রি করেন আমি তার ওপর কিছু খরচ করে চেহারা বদলে যদি বেশি টাকায় বিক্রি করতে পারি সেটা তো আমারই কৃতিত্ব, তাই না?'

'তা অবশ্য। যে কোনও ব্যবসাই এই ধরনের। তবে ওই যে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে গাড়ি কেনে—শুনতে কীরকম খারাপ লাগে। যে-লোকটা পুরনো খবরের কাগজ বাড়ি থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে আর একটু বেশি দামে আড়তদারের কাছে বিক্রি করে দেয় সে-ও তো ব্যবসা করে। তাই না?'

বাদল বলল, 'আমি একজনকে জানি যার বাবা গড়ের মাঠের সমস্ত ঘাস কেনার ইজারা নিয়েছিলেন। লোক দিয়ে সেই ঘাস বিক্রি করে কলকাতায় তিন-চারটে পাঁচতলা বাড়ি তৈরি করেছেন তিনি।'

সদানন্দ বলল, 'আপনি কী জন্যে ডেকেছেন?'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'আমি ডাক্তার ছিলাম। অসুখ আচমকা আমাকে পঙ্গু করে ফেলেছে। তুমি বাড়িতে ফিরে গিয়ে তোমার মাকে আমার কথা বলবে। তিনি বোধহয় নাম বললে আমাকে চিনতে পারবেন। অথবা তোমার বাড়িতে যাঁকে সবাই বড়মা বলে ডাকে তিনি আমাদের খবর রাখেন। এইটুকুই।'

সদানন্দ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'তেমন কিছু নয়। তোমার কার্ড দেখে পরিচয় জানতে পারলাম। তা এই ব্যবসা করে তোমার মাসে কীরকম আয় হয়?'

'কোনও ঠিক নেই। গত মাসে আমরা তিরিশ হাজার রোজগার করেছিলাম। আবার এ মাসে এখন পর্যন্ত কিছু হয়নি।' সদানন্দ হাসল, 'হয়ে যাবে।'

'আমরা মানে?'

'আমরা দুজন পার্টনার।'

'ও! তার মানে অর্ধেক, অর্ধেক?'

বাদল বলল, 'সেটা আমাদের ভিতরকার ব্যাপার।'

'তোমাদের বাড়ি তো ভেঙে ফেলা হবে। প্রমোটারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে!'

'আপনি দেখছি আমাদের সম্পর্কে অনেক খবর রাখেন!'

'আমি অসুস্থ। বাড়ির বাইরে যেতে পারি না। অনেক খবর রাখব কী করে?'

'কাজের কথায় আসুন। গাড়িটা বিক্রি করবেন? সদানন্দ পাঁচ হাজার বেশি বলেছে। ওই দামে কেউ আপনার গাড়ি কিনবে না।'

'বেশ তো! ভেবে দেখি।' ভদ্রলোক সদানন্দকে বললেন, 'ফোন কোরো।'

ওরা বেরিয়ে এসে বাইকে উঠতে যাচ্ছে, বাদল বলল, 'ফোন নাম্বার জানিস?'

'না তো।'

'তাহলে ফোন করবি কাকে?'

এইসময় কাজের মেয়েটিকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। তার হাতে একটা চিরকুট। তাতে সুন্দর হস্তাক্ষরে টেলিফোন নাম্বার লেখা।

বাদল বলল, 'আই বাপ! বাপের জন্মে এমন লেখা বের হবে না আমার।'

দু-একটা কাজ সেরে বাদলকে ওর বাড়িতে নামিয়ে ফিরে আসছিল সদানন্দ। বড় রাস্তা ছেড়ে বাড়ির দিকে এগোতেই দেখল গোটা চারেক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দেখিয়ে একজন তাকে থামতে বলছে। এদের চেনে সদানন্দ।

বাইক থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

'একটু চলো, বদুদা কথা বলবে।'

বদুদা এ পাড়ার একজন রাজনৈতিক নেতা। ভদ্রলোককে কখনও কোনও কাজকর্ম করতে দেখেনি সদানন্দ। আগে ময়লা পাজামা হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি পরত এখন আদ্দির পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে, অ্যাম্বাসাডারে ঘোরে।

'উনি কোথায়?'

'সামনের সেলুনে।'

'চল যাচ্ছি।' বাইক ঘুরিয়ে বড় রাস্তার একপাশে সেলুনের সামনে পৌঁছাবার আগে ছেলেগুলো পৌঁছে গেল। সদানন্দ বুঝতে পারছিল গতিক সুবিধের নয়। কিন্তু বদুদার সঙ্গে দেখা না করাটা বোকামি হবে।

বদুদার দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছিল ছোটকা। সেলুনে আর কেউ নেই। যে ছেলেটা তাকে আসতে বলেছিল সে বদুদাকে চাপা গলায় বলল, 'এসেছে।'

'বোসো, বোসো। বসতে দাও ওকে। কী যেন নাম?'

সদানন্দ বসল না, বলল, 'সদানন্দ।'

'শুনেছি গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা কর। তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে তো কোনও গ্যারাজ করোনি?'

'না।'

'করবে কী করে। শরিকদের বাড়ি। এখানকার কোন কোন গ্যারাজে তোমার কাজ হয়? অসুবিধা হলে বলো, লজ্জা করো না। বাঙালির ছেলে কেরানিগিরি না করে খেটে রোজগার করছে, শুনলেই আনন্দ হয়। উল্টো চালা।'

নির্দেশটা ছোটকাকে। ছোটকা মিনমিন করল, 'দাড়ি পেকে যাবে।'

'চুল পেকে গেছে দাড়ি কাঁচা রেখে কি লাভ? যা বলছি তাই কর। যা বলছিলাম, তোমরা নাকি বাড়িটাকে প্রমোটারের হাতে তুলে দিচ্ছ?'

'না দিয়ে কোনও উপায় নেই।'

'খুব দুঃখজনক ব্যাপার। এইভাবে কলকাতা প্রমোটারদের গ্রাসে চলে যাচ্ছে। এরপর একদিন শুনব মুক্তারামবাবুর রাজেন মল্লিকের বাড়ি ভেঙে প্রমোটার ফ্ল্যাট বানাচ্ছে। কী রফা হল?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'সেকী তোমার বাপ নেই, ব্যবসা কর, তুমিও একজন শরিক অথচ তোমাকে না জানিয়ে প্রমোটারের সঙ্গে রফা করে কী করে?' মাঝে মাঝে কথা বলার জন্যে ছোটকা বদুদার গাল ছেড়ে দিচ্ছিল।

'এখনও কারও সঙ্গে ফাইনাল হয়নি।'

'তাই বলো। ভালই হল, শুরুর আগেই কথা বলা ভাল। শোনো, আমি আবার বেশি ধানাইপানাই করতে ভালবাসি না। এই এলাকায় যারা সিনসিয়ারলি সমাজসেবা করে, রাজনীতি করে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তারা বিনিময়ে কী পায়? কিস্যু না। এদের জন্যে কিছু কাজ দরকার। না, আমি কোনও জোরজবরদস্তি পছন্দ কবি না। শুনলাম আগে নতুন বাড়ি হবে। তারপর পুরনো বাড়ি ভাঙা হবে। তা নতুন বাড়ি করতে ইট দরকার, বালি দরকার। এ দুটো এরা সাপ্লাই দেবে। যে প্রমোটারের সঙ্গে তোমরা ফাইনাল করবে তাকে এই শর্ত মানতে হবে। আরে লোকটাকে তো বাজার থেকে কিনতেই হত। তাই না? বাজারে যে দাম তাই দেবে। তবে হ্যাঁ ওরা মাল কেনার টাকা কোথায় পাবে? বলবে অ্যাডভান্স দিতে। পেমেন্ট তো করতেই হবে, আগে আর পরে। এতে হবে কী তোমাদের বাড়িটাকে,

যেটা নতুন হবে, এদের কাছে পরের বাড়ি বলে মনে হবে না। ভাববে আমাদেরও দান আছে। ফলে গোলমাল হবে না। এ গেল ছেলে-ছোকরাদের কথা। তুমি তো ব্যবসা কর। কলকাতা, কলকাতা কেন, এখন যেখানেই বাড়ি হচ্ছে, প্রমোটাররা বানাচ্ছে, সেখানেই একটা পার্সেন্ট তারা সরিয়ে রাখে পুলিশের জন্যে। নইলে আজ মিস্ত্রিকে ধরে নিয়ে যাবে কাল সিমেন্টের লরি আটকাবে। অ্যান্টিসোশ্যালদের আড্ডা বলে কাজ বন্ধ করে দেবে। তা পুলিশের জন্যে যেমন রাখে তেমনই পাড়ায় যাতে অশান্তি না হয়, পিসফুলি বাড়িটা যাতে তৈরি হয় সেইজন্যে ঠিক ঠিক জায়গায় প্রণামী দিতে হয়। আলতুফালতু লোক গিয়ে চাপ দেবে আর ওদের টাকা গলে যাবে এটা ঠিক নয়। তুমি বলবে আমার সঙ্গে দেখা করতে। রোজ সকালে আমি এই ছোটকার দোকানে আসি। আমি আধঘণ্টা না বসলে নাকি ছোটকার বিক্রিবাটা মন্দ হয়। মোছ।'

সাবান মুছে ক্রিম লাগিয়ে বদুদা ঘুরে বসলেন, 'সব কথা হয়ে গেল। বুঝতে কোনও সমস্যা হচ্ছে?'

নীরবে মাথা নেড়ে না বলল সদানন্দ।

'গুড, বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে কথা বলেও সুখ হয়।'

'কিন্তু প্রমোটার যদি আমার কথা শুনতে না চায়?'

'তাহলে কাজ করতে পারবে না।'

'আমি বলে দেব। কিন্তু সমস্যা হবে আর কোনও দল একই প্রস্তাব নিয়ে এলে।'

'কোনও দল মানে?'

'বিরোধীদল।'

'আরে সেই জন্যেই তো তোমাকে বলা। তুমি যদি প্রথমেই কথা বলে নাও প্রমোটারের সঙ্গে তাহলে পরে যে আসবে সে তো চান্স হারাবেই।'

'তখন যদি ওরা ঝামেলা করে?'

'দেখা যাবে। আগে করুক। তোমার কাছে ওরা ওরকম প্রস্তাব দেয়নি তো?'

'আমার কাছে দেয়নি। তবে আমাদের তো অনেকগুলো শরিক। অন্য কারও কাছে দিয়েছে কিনা জানি না। আচ্ছা, চলি।'

সদানন্দ সেলুন থেকে বেরিয়ে তার বাইকে উঠল। বদুদা তার যাওয়া দেখল, 'এ মাল আমাকে চমকাবার চেষ্টা করবে রে, যদি করে কপালে দুঃখ আছে!'

আতরবালা পায়ে হাতে বুলিয়ে দিচ্ছিল। ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে শুয়েছিলেন বড়মা। অনেকক্ষণ থেকেই তিনি কথা বলছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আতরবালা না বলে পারল না, 'তুমি কি আমার সর্বনাশ করতে চাও?'

'কী হল?' বিরক্ত হলেন বড়মা।

'কথা বলছ না, কেবলই ভাবছ। গুম হয়ে আছ। যার যা স্বভাব সে যদি এই বয়সে না করে তাহলে বুকের রোগ হতে বাধ্য। তোমার যদি হঠাৎ কিছু হয়ে যায় তাহলে আমার কী হবে? কোথায় যাব আমি?'

'কেন? এখানেই থাকবি।'

'থাকতে দেবে? নাতি নাতবউকে নিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছ, তুমিও যদি মরণ ডেকে আনো তাহলে ওরা আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে।'

'আমি তো চিরকাল বাঁচব না, এই যে এতকাল বেঁচে আছি তাতেই অনেকের চোখ টাটাচ্ছে। গায়ে শ্যাওলা জমে যাচ্ছে।'

আতরবালা হাত বোলানো বন্ধ করল, 'তুমি নাতির সঙ্গে চলে যাও।'

'অবান্তর কথা বলিস না।'

'তোমার খুব সাহস।'

'বয়স যখন কম ছিল তখন সাহসের অভাব ছিল। এই তুই নিজেই দেখিস, শরীর যখন ব্যাটাছেলে না মেয়েছেলে বোঝা যাবে না তখন তুই নিজেই সাহসী হয়ে যাবি।' বড়মা হাত নাড়লেন, 'একবার

সদুর মাকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি, কথা খুব জরুরি।'

'এখনই?' আতরবালা শরীর মোচড়াল।

'কানে কম শুনছিস নাকি? ন্যাকামি করলে দূর করে দেব।'

অগত্যা আতরবালা উঠল। নিজের ঘরে গিয়ে চুল আঁচড়ে কাপড় ঠিক করে দরজা খুলল। এখন তাদের ফ্ল্যাটে কেউ নেই। বড়মাকেই দরজা খুলে দিতে আসতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে এক সেকেন্ড থমকাল আতরবালা। গন্ধ বের হচ্ছে। গন্ধরাজ এই দুপুরবেলাতেও সেবন করছেন। বছর পনেরো, তার বেশি হবে, কথাবার্তা নেই। বড়মা বলেছিলেন, 'আর যদি যাস জুতিয়ে মুখ ছিড়ে দেব।'

লোকটার যে চরিত্রদোষ আছে তা সবাই যেমন জানে তেমনই জানত আতরবালা। কোনও ঝি বেশিদিন ওখানে কাজ করত না। একা থাকা একজন মানুষের সংসারে কাজ আর কী! তবু থাকত না। যারা থাকতে চাইত তাদের যে কোনও অছিলায় বের করে দিত। ঝি-দের সঙ্গে আতরবালার দূরত্ব অনেক। সে বড়মার কাজের লোক হলেও আলাদা মর্যাদা পেয়েছে। সে কারণেই অন্য কাজের লোকদের ওপর হুকুম চালাতে সে সক্ষম। তারাও ওকে সমীহ করে। ফলে গন্ধরাজের ইদানীংকার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা নেই।

সদানন্দের মা খবরটা পাওয়ামাত্র বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ।'

'কেন গো? কী হল?'

'উনি এর মধ্যেই খবর পেয়ে গেছেন?'

'কী খবর?'

'কোনও ফোন এসেছিল।'

'মনে করতে পারছি না। চারধারে এত ফোন বাজে যে গুলিয়ে যায়।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সদানন্দর মা বড়মায়ের সামনে উপস্থিত।

বড়মা মুখ তুললেন, 'তোমার ছেলের বিয়ের কী করলে?'

'এখনও তেমন কিছু এগোয়নি।'

'একটু আগে শুনলাম পাত্রীর বাড়িতে সে বন্ধুকে নিয়ে হাজির হয়েছিল। গিয়েছিল গাড়ি কিনতে। পাত্রীর বাবা বললেন বিয়ে হলে গাড়িটা এমনি যৌতুক দেবেন। বিক্রি করবেন না। বলে দিও। যা করার তাড়াতাড়ি করো। এ আমার শেষ কাজ, আমি থাকতে থাকতে করে যেতে চাই। এরপর থেকে বাড়ি ভাঙবে, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে।'

'এই ভাঙাভাঙি বন্ধ করা যায় না?'

'কেন?'

'আমার ভাল লাগছে না।'

'তুমি আর সদু, এই তো দুটো মানুষ, তুমি তো এ কথা বলবেই। কিন্তু যাদের জায়গা কুলাচ্ছে না, ঘরের চেয়ে লোক বেশি হয়ে গিয়েছে তারা তো চাইবে বড় ফ্ল্যাটে উঠে যেতে। তুমি পাত্রীর বাপের ফোন নম্বর জানো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে ফোন করে কথা বলো। আজকাল ছেলেমেয়ের মাকেও কথা বলতে জানতে হয়। তোমার তো স্বামী নেই, সমস্যার সমাধান তোমাকেই করতে হবে। পাড়াপ্রতিবেশীদের ওপর নির্ভর করবে কেন? যাও।'

সদানন্দর মা চলে গেলে তিনি আতরবালাকে বললেন, 'তুই ঝটপট ন'বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।'

'এখনই?'

'কানের মাথা খেয়েছিস নাকি পোড়ারমুখী!'

অগত্যা যেতে হল। আবার সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সেই গন্ধ। পনেরো বছর আগে ওই গন্ধটা তার শরীরে ঢুকেছিল।

ন'বাবু ছুটে এলেন, হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। বড়মা বললেন, 'তোমার মেয়ের নাম যেন কী— ? টুকটুকি না?'

'আজ্ঞে, আপনার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। '
'আর তো কোনও শক্তি নেই, স্মৃতিই সম্বল।' বড়মা হাসলেন, 'যাক গে, ওর কী ব্যবস্থা করলে? শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে রাজি করাতে পারলে?'
'না। জামাই কিছুতেই রাজি হচ্ছে না।'
'রাজি হচ্ছে না মানে কী?'
'সে কিছুতেই ঘর করতে চাইছে না'।
'তাহলে বিয়ে করেছিল কেন? বাজারে গিয়ে আমি রুই মাছ কাটিয়ে নিয়ে এলাম। রান্নার আগে ইচ্ছে হল ইলিশ খাব, রুইওয়ালা মাছ ফেরত নেবে? আমাদের এক জ্ঞাতি আছেন বড় ব্যারিস্টার, তাঁর কাছে যাও।'
'আসলে,' হাত কচলালেন ন'বাবু, 'মামলা মোকদ্দমা করলে জানাজানি হয়ে যাবে, পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে, তাই—।'
'তাহলে কী করবে? সারাজীবন মেয়েটাকে বুকে পাথর বইতে বলবে? '
'তা নয়। আমি চেষ্টা করছি। একজন তান্ত্রিক আছেন। আত্মা চালান করতে পারেন। সামনের অমাবস্যার রাত্রে টুকটুকিকে নিয়ে পুজোয় বসবেন।
'কোথায়?'
'আমার ওখানে তো এমনিই জায়গা কম হচ্ছে। ফ্ল্যাট না হওয়া পর্যন্ত। তা ওই ভাঁড়ারঘরটাকে পরিষ্কার করে রেখেছি।'
বড়মা সোজা হয়ে বসলেন, 'এ বাড়িতে ওসব চলবে না।'
'মানে?' হকচকিয়ে গেলেন ন'বাবু।
'এই বাড়িতে মা ব্যাঘ্রবাহিনী আছেন। তাঁর মাথার ওপর তুমি তান্ত্রিককে দিয়ে মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করবে?' চিৎকার করে উঠলেন বড়মা।
'এ কী বলছেন?'
'তুমি বুঝতে পারছ না? তোমাদের পাঁচজনের সামনে তান্ত্রিক আত্মা নামাবে না। দরজা বন্ধ রাখবে। লজ্জায় মেয়ে কিছু বলতে পারবে না। তারপর যদি পেটে সন্তান আসে তাহলে তান্ত্রিক পরামর্শ দেবে জামাইকে খবর দিতে। তোমার মেয়ে মা হতে চলেছে। এসব গপ্পো আমি অনেক শুনেছি। বাপ হয়ে মেয়ের জীবনটাকে নষ্ট করে দিতে চাও কারণ পাঁচজনে কি বলবে সেই ভয়ে। তার চেয়ে ডাক্তার দেখাও। শরীরে যদি কোনও গোলমাল থাকে তাহলে ডাক্তার সারিয়ে দেবে। তাতেও যদি জামাই না মানে তখন মামলা করবে। তান্ত্রিক যেন এ বাড়িতে ঢুকতে না পারে।'
'আপনি যদি জামাইয়ের মায়ের সঙ্গে কথা বলেন—।'
'বলেছি। আমার একটা দায়িত্ব আছে। আগে ডাক্তার দেখিয়ে আমার কাছে এসো। ডাক্তার কী বলছে তা আগে শুনতে চাই। এরপর তো সব আলাদা হয়ে যাবে। আমার কথা শোনার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ! যাও।' মাথা নাড়লেন বড়মা।
ন'বাবু একটু ইতস্তত করলেন, 'একটা কথা বলতে পারি?'
'কী কথা?'
'আপনি বলেছেন মা ব্যাঘ্রবাহিনীকে সম্মান দিয়ে রাখতে পারলে বাড়ি বিক্রিতে আপনার কোনও আপত্তি নেই! তাই তো?'
'উপায় কী!'
'আপনি তো নাতির সঙ্গে বিদেশে চলে যাচ্ছেন, আর ফিরবেন না।'
'কে বলল?'
'সেদিন আপনার নাতির মুখে শুনলাম। তাই একটা প্রার্থনা আছে। আমার তো জায়গায় কুলোচ্ছে না। আপনি যদ্দিন না থাকবেন তদ্দিন আমি না হয় আপনার অংশ দেখাশোনা করব। মানে, কেয়ারটেকারের কাজ করব। নতুন ফ্ল্যাট তো এখনই উঠছে না। উঠতে উঠতেও বছর দেড়-দুই চলে যাবে। ততদিন— !'

'ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে গেলে?'

'তখনও কেয়ারটেকার হিসেবে থাকব। আপনার নাতি যখন বেড়াতে আসবে কলকাতায় তখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাট পাবে।' সতৃষ্ণ চোখে তাকালেন ন'বাবু।

'নাতিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আমার সম্মতি ছাড়া সে বলে কী করে?'

'তার মানে? আপনি যাচ্ছেন না?'

'কক্ষনও নয়। এই বাড়িতে আমার শ্বশুর, তাঁর পিতা, আমার স্বামী বাস করে গিয়েছেন। এই বাড়িতে আমার ছেলে মারা গিয়েছে। মৃত্যুর কাছাকাছি এসে এই বাড়ি ছেড়ে আমি কেন বিদেশে যাব?' চোখ বড় হল বড়মায়ের।

ন'বাবু নমস্কার জানিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, পেছনে ডাকলেন বড়মা, 'শোনো, পরিগুলোর বিক্রির টাকা কীভাবে খরচ হবে আমাকে জানিয়ে দিও।'

সদানন্দের মুখে বদুদার বক্তব্য শুনে হইচই পড়ে গেল। সমরেন্দ্রনাথ বললেন, ' এ অত্যন্ত খারাপ ব্যাপার। মগের মুলুক নাকি।'

কমলেন্দু মাথা নাড়ল, 'এটা নতুন হয়েছে। কেউ বাড়ি বানালেই হামলা করা হচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই।'

'কী রকম?' ন'বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি আমি পারব না, কিন্তু এখন যে প্রমোটারের সঙ্গে কথা বলেছি সে পারবে। ভদ্রলোক আমাদের শর্তে রাজি আছেন। মা ব্যাঘ্রবাহিনীর জন্যেও মন্দির করে দেবেন।'

সদানন্দ বলল, 'তাঁকে ব্যাপারটা বলা দরকার।'

'বলব। আগামীকাল উনি ড্রাফট পাঠাবেন। প্রত্যেককে এক কপি দেব, পড়ে কারও যদি আপত্তি থাকলে জানিয়ে দেবেন। এই প্রমোটার এক বছরের মধ্যে আমাদের নতুন ফ্ল্যাট দিয়ে দেবেন।' কমলেন্দু জানাল।

হাত তুলে তাকে থামাল কমলেন্দু, 'আমি যাঁর কথা বলছি তাঁর কাছে এইসব বদু-টদু ঘামাচির মতো। মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের সঙ্গে ওঁর অনেকদিনের বন্ধুত্ব। অতএব বুঝতেই পারছ—!'

সদানন্দ বলল, 'তা হলে বদুদা যদি আমাকে ফের ধরে তা হলে বলে দেব প্রমোটারকে জানিয়ে দিয়েছি।'

ন'বাবু বললেন, 'এ গেল একটা সমস্যা। তুমি যখন বলছ মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের বন্ধু তখন আমাদের কোনও চিন্তা নেই। আচ্ছা, বড়মা জানতে চেয়েছেন পরি বিক্রির টাকা কীভাবে খরচ হবে?'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'এখন তো এ বাড়ি মেরামত বা রং করার মানে হয় না।'

'ঠিকই।'

'তাহলে?'

'টাকাটা ভাগ করে শরিকদের দিয়ে দিলেই হয়।'

কমলেন্দু মন্তব্যগুলো শুনে মাথা নাড়ল, 'তার চেয়ে এই টাকার সুদে মা ব্যাঘ্রবাহিনীর পূজা হোক। ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে গেলে তা হলে কারও ওপর চাপ পড়বে না। এ বাড়ির টাকায় এ বাড়ির মায়ের চলে যাবে।'

প্রস্তাবটা সবাই মেনে নিল।

নাতি আর নাতবউ ফিরে এল সন্ধের পরে। হাতমুখ ধুয়ে নাতি যখন বড়মায়ের পাশে এসে বসল তখন তিনি রাতের আহার শেষ করেছেন।

'তোমরা খেয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'শোনো, তোমার বাবা যা কখনও করেননি তুমি তা করতে যেও না।'

'বুঝলাম না, বাবা কখনও বিদেশে যাননি, আমি গিয়েছি।'

'তোমার বাবা কখনও তাঁর ইচ্ছের কথা আমার মুখে বসিয়ে পাঁচজনকে বলেননি। তোমার সঙ্গে আমি বিদেশে যেতে রাজি হয়েছি?'

'হননি, হবেন।'

'কক্ষনও নয়। আমি কোথাও যাচ্ছি না। তুমি স্বচ্ছন্দে বউ নিয়ে চলে যেতে পারো। আমি তো তোমাকে বলেই দিয়েছি।'

'ও যদি চলে যায় তাহলে আপনি কার কাছে থাকবেন?'

'মা ব্র্যাঘ্রবাহিনীর কাছে।'

'এটা কোনও কাজের কথা হল না।'

'ওষুধ খাওয়ানো ছাড়া তোমার বউ আমার কোন উপকারে আসছে। এই যে আজ সারাদিন সে বাপের বাড়িতে কাটিয়ে এল, আমার কোন অসুবিধে হয়েছে?'

'একটা দিন আর বাকি জীবন এক নয়।'

'আমার আর বাকি জীবন বলতে কী আছে। এ বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট হচ্ছে। তদ্দিন বেঁচে থাকি তা হলে সেখানে চলে যাব। টাকাপয়সা বাড়িঘর সব তোমার নামে থাকবে। আমি মরে গেছি খবর পেলে এখানে এসে বিলিব্যবস্থা করে যেও।' বড়মা বললেন, 'যাও, এখন ঘুমোতে দাও।'

আড়ালে দাঁড়িয়ে আতরবালা কথাগুলো শুনল। সে আশা করেছিল বড়মা নাতিকে তার কথা বলবেন। এত বছর যে সেবা করেছে তাকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত করবেন না। কিন্তু বুড়ি সে পথে গেল না। দুপুরে যখন ন'বাবুকে মুখের ওপর না বলে দিয়েছিল তখন খুব খুশি হয়েছিল আতরবালা। এখন কী করা হায়? অত্যন্ত দুঃখ পেল সে।

রাত নামলে আতরবালাকে নিয়মিত একটা কাজ করতে হয়। মা ব্যাঘ্রবাহিনীর প্রদীপে তেল দিয়ে নমস্কার করে আসার দায়িত্ব বড়মা তাকে দিয়েছেন কয়েক বছর আগে। এতকাল কাজটা বড়মা-ই করতেন।

আজ বড়মা ঘুমিয়ে পড়ার পর চাবি নিয়ে নীচে নামল আতরবালা। সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই তার পা অবশ হল। গন্ধটা এখন জোরালো। সে নীচে নামল। তেল দিয়ে আলো নিবিয়ে প্রণাম করে আবার ওপরে উঠতে যেতেই পাশ দিয়ে কেউ দ্রুত বেরিয়ে গেল। জায়গাটা প্রায়-অন্ধকার বলে মুখ দেখতে পায়নি আতরবালা। কিন্তু এই মেয়েছেলের শরীর বেশ ভারী। এ বাড়ির শরিকদের ঘরে যে সব মেয়ে কাজ করে তাদের একজন হবে। এত দ্রুত চলে গেল কেন? আতরবালা সন্দিগ্ধ মন নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বাঁকটায় গেল। গন্ধরাজের সদর দরজা আধখোলা। আলো আসছে ভেতর থেকে, সেই সঙ্গে গন্ধ। পনেরো বছর বাদে পা বাড়াল আতরবালা।

বাইরের ঘরে কেউ নেই। গন্ধটা যেন তার রক্তের প্রতিটি কণায় ছোবল মারছে। দ্বিতীয় ঘরের খাটে শুয়ে নলে তামাক টানছে গন্ধরাজ।

'কে এসেছিল?'

প্রশ্নটা শুনে তড়াক করে উঠে বসল গন্ধরাজ। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল, 'কী সৌভাগ্য। সত্যি দেখছি না স্বপ্ন?'

'কে এসেছিল?'

'কেউ না। কেউ আর আসে না। বয়স হয়ে গেছে, এক কোণে পড়ে আছি।'

'বিশ্বাস করি না।'

'ওইটে আমার ওপর ঈশ্বরের অভিশাপ। কাউকে বিশ্বাস করাতে পারি না।' হাসল গন্ধরাজ, 'এ বাড়ির মাস্টারনি হুকুম দিয়েছিল এখানে না আসতে, তা এতকাল বাদে সেই হুকুম বদলাল নাকি?'

'না। বদলায়নি। সত্যি কেউ আসেনি?'

'আচ্ছা, কেউ না এলে অবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে?'

'কেউ এলে কথাটা বলতাম না।'

'কী কথা?'

'যেটা বলতে এসেছিলাম।'

গন্ধরাজ উঠে দাঁড়াল, 'না গো, কেউ আসেনি।'

আতরবালা তাকাল। তারপর কিন্তু কিন্তু করে বলল, 'আমার বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে। বড়মা চলে গেলে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমার কী হবে?'

'ও বুড়ি নাকি আমেরিকায় চলে যাচ্ছে?'

'জানি না। সবাইকে বলে মা ব্যাঘ্রবাহিনীর সেবার দায়িত্ব আমাকে দেবে?'

'মা ব্যাঘ্রবাহিনী কেন?' খাপ করে আতরবালার নিতম্বে পাঁচ আঙুল রাখল গন্ধরাজ, 'আমি তো আছি।'

'আঃ। কী হচ্ছে? আমার বয়স হয়েছে।' বিড় বিড় করল আতরবালা।

'এই বয়সে আর জল মেশানো দুধ খেতে ভাল লাগে না। এখন চাই জমাট দুধ। কনডেন্সড মিল্ক। মরে যায়নি কিছু, শুধু ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি রাজি থাকলে আমি ঘুম ভাঙিয়ে দেব।'

সেই রাত্রে রায়বাড়ির লোক প্রচণ্ড শব্দে জেগে উঠল ঘন ঘন বোমা ফাটছে। কারা খিস্তি করে বোমা ফাটাচ্ছে। রায়বাড়ির কেউ দরজা খুলল না। শুধু পাঁড়েজি একটা লাঠি মাথার ওপর উঁচিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। তার শীর্ণ জরাগ্রস্ত শরীর থেকে গালাগালি ছিটকে বের হচ্ছিল। মাঝে মাঝেই সে চিৎকার করছিল, 'জয় মা ব্যাঘ্রবাহিনী কি!'

যারা এসেছিল তারা হায়েনার মতো হাসতে হাসতে ফিরে গেল।

২৮

বিষ্ণুপ্রসাদের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল সায়নের। যে কথাগুলো সে কখনও ভাবেনি, শোনেওনি, তা নতুন করে ভাবতে শুরু করল। পাত্থাবাড়ির রাস্তা থেকে রোজ দুপুরের পরে বিষ্ণুপ্রসাদ চলে আসত নিরাময়ে। রাস্তার ওপাশে খাদের ধারে পাথরের ওপর বসে গল্প করত ওরা।

আলোচনার বিষয়বস্তু অনেকটা এইরকম। তিনশো বছর আগেও এখানে বাঙালিরা আসেনি। প্রথম থেকেই যেসব পাহাড়ের মানুষ এই অঞ্চলে বাস করত তাদের বলা হয়েছে লেপচা অথবা ভোট। নেপালিরা এসেছে ব্রিটিশদের হাত ধরে। বাঙালিরা তারও পরে। কিন্তু এসব ইতিহাস। বর্তমানে এই পাহাড় ভারতবর্ষের একটা অংশ। এই সত্য এখন মেনে নিতে পারছে না কিছু মানুষ।

বিষ্ণুপ্রসাদ বলেছিল, 'এক হাজার বছর আগে বাঙালি বলে কোনও জাত ছিল না। বাঙালিদের নিজেরই অস্তিত্ব যখন মেলানো মেশানো তখন তাদের সঙ্গে পাহাড়কে জুড়ে দেওয়া হল কেন?

সায়ন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ওয়েস্টবেঙ্গল মানে বাঙালির রাজ্য এ কথা ভাবছ কেন? বাঙালি ছাড়াও অনেক ভাষাভাষী মানুষ এখানে আছে।'

'তারা মাইনরিটি। এ কথা অস্বীকার করতে পারো?'

অস্বীকার করা যায় না। সায়ন মাথা নাড়ল।

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'প্রথমে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ধর্মঘটের আন্দোলন, বনধ-এর আন্দোলন। তারপর শুরু হল বোমাগুলির লড়াই। দাবিটার পেছনে যুক্তি ছিল বলে আজ চেয়ারম্যানের হাতে এত ক্ষমতা তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্ট। কিন্তু আমার আপত্তি এই গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন নিয়ে। গোর্খা মানে কী? ব্রিটিশদের সেনাবাহিনীতে নেপালের কিছু মানুষ চাকরি নিয়েছিল। ওদের গোর্খা বলা হত। তাদের নামে এত বড় একটা আন্দোলনের নাম হতে পারে না। মজার কথা হল এই আন্দোলন সিকিমে হয়নি, ভুটানে হয়নি। কিন্তু মেঘালয়, মণিপুরে যেসব নেপালি আছেন তাঁদের কাছে আবেদন করা হয়েছে। পাহাড়ের নীচে ডুয়ার্সের নেপালিরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু ক্রমশ সব যেন থিতিয়ে আসছে। পাহাড়ের মানুষ এখন কিছুটা বিভ্রান্ত। কোনও এক বিশেষ নাম ব্যবহার না করে যদি স্লোগান দেওয়া হত পাহাড় পাহাড়িদের জন্যে

তাহলে মানুষ অনেক বেশি একাত্ম অনুভব করত।'

সায়ন হাসল, 'তাতে কী লাভ হত?'

বিষ্ণুপ্রসাদ অবাক হল, 'তার মানে? আমাদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, আমরা পরাধীন। যারা আমাদের ভাষা বলে না, আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নেই তারা আমাদের শাসন করছে।'

'কিন্তু এই ভাবনা কি বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবনা নয়?'

'যুক্ত হলে তবে বিচ্ছিন্ন শব্দটা ব্যবহার করা যায়। সাউথ ইন্ডিয়ায় যাও, সেখানে হিন্দি ঢুকতে দেওয়া হয়নি। হিন্দি ছবি, হিন্দি সিরিয়াল সেখানে পাত্তা পাচ্ছে না। আমাকে একজন বলেছে একটা বড় কোম্পানি তাদের জিনিসের বিজ্ঞাপন টিভিতে দেখায় বোম্বের স্টারকে মডেল করে হিন্দিতে। কিন্তু সাউথে সেই বিজ্ঞাপনে থাকে তামিল তেলুগু স্টার, ভাষা থাকে ওখানকার। এটা বিচ্ছিন্নতাবাদ নয়?'

'তাহলে তুমি চেয়ারম্যানকে সমর্থন করছ না কেন?'

'কারণ ক্রমশ মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোক তাঁর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে পারেননি। দলের লোকদের মন রাখতে সমঝোতা করে চলেছেন। এখন শুনছি এই ইস্যুটিকে আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে যাচ্ছেন উনি। তার মানে আরও বেশি দিনের জন্যে ঝুলে যাবে ব্যাপারটা।'

'তোমরা স্বাধীনতা চাও?'

'হ্যাঁ। যে রকম স্বাধীনতা আমেরিকার রাজ্যগুলি পেয়েছে।'

'ও, হ্যাঁ। ইউনাইটেড স্টেটস অফ ইন্ডিয়া!'

'এ ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

ঘরে বসে কথাগুলো নিয়ে অনেক ভেবেছে সায়ন। স্বাধীনতার পর যখন সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল তখন মানুষের মনে দেশপ্রেম ছিল। ভারত আমার মা, আমরা সবাই ভারতবর্ষের মানুষ এই ভাবনা উত্তেজনা সৃষ্টি করত। আমাদের মধ্যে যত পার্থক্য থাকুক না কেন ভারতবাসী হিসেবে আমরা এক এই ভাবনাটাই প্রবল ছিল। যাঁরা সংবিধান তৈরি করেছিলেন তাঁরা দেশপ্রেমিক ছিলেন, কিন্তু নগ্ন বাস্তবটাকে উপেক্ষা করেছিলেন। তিনপুরুষ আগে তাদের রায়বাড়ির বড়কর্তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি পরবর্তী প্রজন্ম আর একান্নবর্তী থাকবে না। তিনি বাড়ি তৈরি করেছিলেন সবাই যাতে মিলেমিশে একসঙ্গে থাকতে পারে সেইভাবে। কিন্তু বাস্তব যখন পরবর্তী প্রজন্মকে বাধ্য করল আলাদা হতে তখন বাড়িটার গঠন ব্যবহারের পক্ষে সাহায্য করছিল না। প্রত্যেকটা শরিকের জন্য আলাদা বাথরুম রান্নাঘর তৈরি করতে হল গোঁজামিল দিয়ে। জায়গায় কুলোচ্ছিল না আর।

সংবিধান যাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁরা এ কথা ভাবেননি। ভারতবর্ষকে একত্রিত করতে যে আবেগের উপর নির্ভর করেছিলেন তা এখন বাসি হয়ে গিয়েছে। এখনও যদি নতুন সংবিধান লেখা যেত যাতে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলোকে প্রচুর স্বাধীনতা দিয়ে প্রতিরক্ষা এবং অর্থের অর্ধাংশ কেন্দ্রের হাতে রাখা হত তাহলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যেত।

মায়ের চিঠি এসেছে। মা লিখেছে রায়বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাড়ির সামনের লনে নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি উঠবে। সেখানে প্রত্যেক শরিক ফ্ল্যাট পাবে। সেখানে উঠে যাওয়ার পর পুরনো বাড়িটাকে ভেঙে ফেলে নতুন বহুতল বাড়ি তৈরি করবে প্রমোটার। এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। এই বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে, সকলের মন খুব খারাপ হয়ে আছে। সামনের মাসে যখন সায়ন আসবে তখন নিজের চোখে এসব দেখতে পাবে। সদানন্দর সঙ্গে কথা হয়েছে। ও প্রথমে পাহাড়ে যেতে চাইছিল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে। সদানন্দ গিয়ে সায়নকে নিয়ে আসবে।

চিঠি পড়ার পরেই বিষ্ণুপ্রসাদের মুখ মনে পড়ল। রায়বাড়ির মানুষজন যে সমাধানের পথ বেছে নিয়েছে তা দুঃখজনক হলেও মেনে না নিয়ে উপায় নেই। কথাটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতারা বুঝতে পারছেন না কেন?

শেষ পরীক্ষার রিপোর্ট খুব ভাল কঙ্কাবতীর। হিমোগ্লোবিন কয়েক দিন ধরে এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে যা বিপদসীমার নীচে। মিসেস অ্যান্টনি ওঁকে নীচে নামিয়ে আনলেন। বললেন, 'এখন

হাঁটাচলা করো। চারপাশে ঘুরে বেড়াও। তবে কষ্ট হবে এমন কাজ কখনও কোরো না।'

কঙ্কাবতী লজ্জা পাচ্ছিল। সে যে সুস্থ হয়ে উঠছে এটা নিজের শরীর থেকেই বুঝতে পারছিল। মিসেস অ্যান্টনিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে বাড়ি যেতে পারব?'

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'সেটা ডাক্তার বলবেন।'

'এখন তো আমার কোনও অসুখ নেই!'

মিসেস অ্যান্টনি হাসলেন।

ডাক্তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসতেই ওঁদের দেখতে পেলেন। মিসেস অ্যান্টনি তাঁকে কঙ্কাবতীর প্রশ্নটা জানালেন।

ডাক্তার বললেন, 'ভাল হয়ে গেলে এখানে কেউ থাকতে চায় না, বুঝলেন মিসেস অ্যান্টনি। এখানকার রান্না এত খারাপ, থাকবে কেন?'

কঙ্কাবতী মাথা নাড়ল, 'না, না। আমার স্কুল কামাই হচ্ছে।'

'সে তো নিশ্চয়ই। আমি ভাবছি এক সপ্তাহ তুমি এখান থেকে স্কুলে যাতায়াত করবে। যদি দ্যাখো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তখন বাড়ি চলে যেও। কি, রাজি আছ?'

'এখান থেকে স্কুল অনেক দূরে।'

'জানি। আমি তোমার কারলিফটের ব্যবস্থা করে দেব। হাঁটতে হবে না।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' মুখ নামাল কঙ্কাবতী।

ডাক্তার তাকালেন। তাঁর বুক টনটন করে উঠল। এগিয়ে এসে কঙ্কাবতীর মাথায় হাত রাখলেন, 'বাপ-মাকে ধন্যবাদ জানাতে নেই। তুমি কোনও ভাল কাজ করলে আমি সবচেয়ে আনন্দ পাব।'

'হাই ডক্টর।'

চিৎকার শুনে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার। সিমি দাঁড়িয়ে আছে। তার দু হাতে দুটো বাজারের থলে।

'কেমন আছ সিমি?'

'ভাল, খুব ভাল। সায়ন কোথায়?'

'ওর ঘরে আছে বোধহয়।'

'ঠিক আছে, ওকে জানিয়ে দেবেন আমি আর এখানে নেই।'

'এখানে নেই মানে? কোথায় গিয়েছ?'

'ওপরে মিসেস ডিসুজা ছিলেন, মনে আছে? হ্যাঁ, তাঁর খালি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন এলিজাবেথ। আমি ওঁর সঙ্গে আছি।' সিমি হাসল। তারপর বাজারের ব্যাগ দুটো হাত বদল করল।

'তাই? এলিজাবেথ তাহলে ওখানেই আছেন?'

'হ্যাঁ। আপনার কাছে এর মধ্যেই আসবেন। শি ইজ ফ্যান্টাস্টিক। আজ দুপুর থেকে আমরা কাজ শুরু করব।'

'কী কাজ?'

'এলিজাবেথ ঠিক করেছেন এই পাহাড়ের পাঁচটা গ্রাম বেছে নেবেন। আজ থেকে আমরা সার্ভে শুরু করব। প্রত্যেক গ্রামের প্রতিটি পরিবারের মান্থলি ইনকাম কত, কজন মেম্বার এইসব তথ্য নেব। আপনি তো জানেন এরা খুব গরিব। অর্ধেক দিন স্কোয়াশ খেয়ে কাটায়। এলিজাবেথ এদের বিবরণ দিয়ে আমেরিকার বড়লোকদের কাছে আবেদন করবে। তাঁদের ডোনেশন নিয়ে একটা ফান্ড তৈরি করা হবে। সেই ফান্ড থেকে গ্রামের লোকদের দিয়ে নানা রকম ব্যবসা করানো হবে যাতে কেউ আর গরিব না থাকে। ওঃ অনেক কথা বলে ফেললাম। তাহলে চলি! আরে! ওই তো সায়ন।' ওপরের দিকে মুখ তুলল সিমি, 'সব শুনলে তো! একদিন চলে এসো আমাদের ওখানে। সকাল নটা পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে পাবে। বাই!' হাত নেড়ে সিমি চলে গেল।

ডাক্তার মাথা নাড়লেন। কঙ্কাবতী তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, 'কী ভাল!'

'হ্যাঁ। কোথাকার এক মহিলা, যিনি অভাব কী তা কখনও জানতেন না, স্রেফ কৌতূহলে মিস্টার ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। এই জন্যে বলে সত্যি ঘটনা

উপন্যাসের চেয়েও বিস্ময়কর। কিন্তু এই মেয়েটা, অনেকেই ওর চালচলনের জন্যে পছন্দ করত না, হঠাৎ কীরকম বাঁক নিয়ে নিল।' ডাক্তার মাথা নেড়ে ভেতরে চলে গেলেন।

কঙ্কাবতী বাইরে বেরিয়ে এল। ঠাণ্ডা আছে। তার গায়েও যথেষ্ট গরম জামা। ভাল লাগছিল কঙ্কাবতীর। এই নীল আকাশ, দূরের পাহাড় আর সবুজ গাছপালার দিকে তাকিয়ে তার বলতে ইচ্ছা করছিল, 'আমি ভাল হয়ে গেছি। তোমরা এখন থেকে আমাকে ভাল রেখো।'

একরাশ মেঘ উড়ে এল ওপর থেকে। ধীরে ধীরে তারা কঙ্কাবতীর চুল ছুঁয়ে চলে গেল ওপাশে। কঙ্কাবতী দেখল সায়ন বেরিয়ে আসছে নিরাময় থেকে। সে চাদরটাকে আরও ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে হাসল।

'তোমাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে আজ।'

কঙ্কাবতী নতুন করে হাসল, 'ডাক্তারবাবু আমাকে স্কুলে যেতে দেবেন।'

'তাই? বাঃ! খুব ভাল হল।'

'তুমি কেমন আছ?'

'একদম ভাল। ভাবছি আজ এলিজাবেথের বাড়িতে যাব।'

'সেটা কত দূরে?'

'অনেকটা ওপরে, চার্চের কাছে।' হাত তুলে ওপরের পাহাড় দেখাল সায়ন।

সেদিকে তাকাল কঙ্কাবতী, 'শরীর খারাপ হবে না তো?'

'দূর। ওসব নিয়ে ভাবি না।'

'কেন?'

'পৃথিবীতে সবাই কত কী ভাল কাজ করছে। অসুখ-অসুখ বলে যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকি তাহলে বেঁচে থাকার কোনও মানে আছে?'

'তুমি ভাল কাজ করতে চাও?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু অসুস্থ হয়ে গেলে সেই কাজটা শেষ করবে কী করে?'

হেসে ফেলল সায়ন, 'আমার যে-অসুখ হয়েছে সেটা কখন ফিরে আসবে তা ডাক্তার আঙ্কলও বলতে পারেন না। তাই ভয়ে ঘরে বসে থাকার কোনও যুক্তি নেই। তোমার মায়ের কী খবর?'

কঙ্কাবতীর মুখে ছায়া ঘনাল, 'মায়ের খুব বিপদ।'

'কেন?'

'স্কুলের চাকরিটা চলে গিয়েছে। কোথাও কাজ পাচ্ছে না মা।'

'তাহলে কী হবে?'

'আমি ভাবছি বাড়ি ফিরে গিয়ে বাচ্চাদের পড়াব।'

সায়নের চোখের সামনে মিস্টার ব্রাউনের মুখ ভেসে উঠল। অনেকদিন ওই বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়নি। মিস্টার ব্রাউনকে যদি কঙ্কাবতীর মায়ের জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে বলা যায় তাহলে তিনি কি চেষ্টা করবেন না? সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মা কখন আসবেন?'

'বিকেলে।'

'তুমি তোমার মাকে খুব ভালবাস, না?'

কঙ্কাবতী আকাশের দিকে তাকাল, 'ভালবাসি, তবে—'

'তবে কী? বাবাকে ভালবাসতে?'

'হ্যাঁ। বাবার কথা খুব মনে পড়ে। আমার বাবা মাকে খুব যন্ত্রণা দিত। মদ খেয়ে ঝামেলা করত মায়ের সঙ্গে। কিন্তু আমাকে দেখলেই চুপ করে যেত। বাবা আমাকে একটা পারফিউম দিয়েছিল।'

'তাহলে বাবাকেই তুমি খুব ভালবাস?'

'কী জানি। তবে আর একজন ছিলেন—।'

'আর একজন? কে হন তোমার?'

'তিনি আমার চোখ খুলে দিলেছিলেন। নবজন্ম বলে যদি কিছু থাকে তাহলে তিনি আমাকে তাই

দিয়েছেন। তিনি একজন বাঙালি।'

'ও! কোথায় থাকেন তিনি?'

'এই পাহাড়েই ছিলেন। কিন্তু ওরা ওঁকে বাধ্য করেছিল পাহাড় ছেড়ে চলে যেতে। ওঁর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। তিনি আমার চেয়ে অনেক বড়, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বয়সে। আমার বাবার চেয়েও বড়। কিন্তু আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমিও।' মাথা নামাল কঙ্কাবতী।

'উনি কোথায় গিয়েছেন জানো না?'

'না। একটা ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতার। বলেছিলেন সেখানে চিঠি লিখলে উনি খবর পাবেন।'

'তুমি লেখোনি?'

'না।'

'এই অসুখের কথা লেখা উচিত ছিল।'

'না। যাকে ভালবাসি তাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে না।'

সায়ন অবাক হয়ে গেল। এতদিন সে জানত মানুষ যাকে ভালবাসে তার কাছেই সব সুখ এবং দুঃখের কথা বলে। কিন্তু কঙ্কাবতীর কথা শুনে মনে হল এই কথাটাই ঠিক। যাকে ভালবাসি, তাকে কেন দুঃখ দেব? আমার কষ্টের কথা জানলে সে-ও তো কষ্ট পাবে।

কঙ্কাবতী বলল, 'আমি যাই।'

'শরীর খারাপ লাগছে?'

'না।'

'বুঝেছি। এসব কথা তুলে তোমার মন খারাপ করে দিয়েছি।'

'না, না।'

'একটা কথা, এই বাঙালি ভদ্রলোক তোমাকে বাংলা শিখিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। ভাবতেও শিখিয়েছিলেন।'

'যেমন?'

'গাছ থেকে যে পাতা পড়ে তার শব্দ কেমন? বিকেলবেলায় ঘাসে ভোরের শিশিরের দাগ খোঁজা উচিত কি না। এসব নিয়ে কখনও ভাবতাম না। যখন কেউ খুব প্রিয় হয়ে যায় তার মধ্যে ঈশ্বর এসে যান।'

'কী রকম?'

'তুমি গীতবিতান পড়েছ?'

'গীতবিতান? দেখেছি। ভাল করে পড়িনি।'

'দেখবে গীতবিতানের কতগুলো পর্ব আছে। তার মধ্যে পূজা আর প্রেম দুটো পর্ব। ভালবাসলে এই দুটো এক হয়ে যায়। পূজায় ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে যা গাওয়া তা বিশেষ মানুষের উদ্দেশেও গাওয়া যেতে পারে। আবার প্রেম পর্বে বিশেষ মানুষকে যা বলা তা ঈশ্বরকেও বলা যেতে পারে। এইসব।' কঙ্কাবতী হাসল।

সায়নের চোখ বিস্ফারিত, একটি নেপালি মেয়ের মুখে এইসব কথা সে শুনবে কল্পনাও করেনি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি গান জান?'

'না, না।' মাথা ঝাঁকাল কঙ্কাবতী।

'তোমাকে বন্ধু বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে। তুমি একটা গান গাইবে?'

'আমি ভাল গাইতে পারি না।'

'তবু।'

কঙ্কাবতী খাদের দিকে তাকাল। হাওয়ায় তার খুচরো চুলগুলো উড়ছিল। সে মৃদু গলায় গান ধরল, 'সব যে হয়ে গেল কালো/ নিভে গেল দীপের আলো/আকাশপানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে।' এই অবধি গেয়ে আচমকা থেমে গেল সে। কঙ্কাবতীর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না সায়ন। পেছন থেকে ওর মাথা ঝোঁকানো শরীর, দলা পাকানো কুয়াশা, আকাশে ছাপ মেরে থাকা পাহাড় যেন একটা

একটা ফ্রেমে দেখতে পেল সে। এই গান সে অনেকবার শুনেছে। মায়ের মুখে, দেবব্রত বিশ্বাসের ক্যাসেটে।সে গাইবার চেষ্টা করল, 'সকালবেলায় চেয়ে দেখি/ দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি/ ঘর ভরা মোর শূন্যতারি বুকের পরে।'

গাইতে গাইতে সায়ন শুনতে পেল কঙ্কাবতী গলা মিলিয়েছে। গান শেষ হতেই ঘুরে দাঁড়াল কঙ্কাবতী। ওঁর ঠোঁটে হাসি, চোখে জল।

সায়ন অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, 'আমি গাইতে জানি না।'

কঙ্কাবতী কথা বলল না। ধীরে ধীরে নিরাময়ের দিকে চলে গেল। ভাল লাগল সায়নের। এ এক অদ্ভুত ভাল লাগা। বুকের ভেতরটা কী রকম টান টান হয়ে গেল। যেন হাজার হাজার সেতার বেজে ওঠার জন্যে তৈরি। সে ঘাড় ঘোরাল, কঙ্কাবতীকে আর দেখা গেল না।

চড়াই ভেঙে এগোতেই ভুটো ডেকে উঠল। ভুটো আজ একা, ওর বান্ধবী নেই। দূরে গাছের ধারে বাঁধানো দেওয়ালের ওপর ম্যাথুজ বসে আছে। হাত নাড়ল তাকে দেখে। তারপর নিজেই নেমে এল, 'কেমন আছ?'

'ভাল। তুমি?'

'আমি এতদিন ভাল ছিলাম না, এখন ভাল আছি।'

'কী রকম?'

গলা নামাল ম্যাথুজ। 'এলিজাবেথ মেমসাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেছে। মিস্টার ব্রাউনই আলাপ করিয়ে দিয়েছেন।'

' তার সঙ্গে ভাল থাকার কী সম্পর্ক?'

'উনি গ্রামের মানুষের উপকার করতে চান। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। পাহাড়ে যারা বিফ খায় আমি তাদের সস্তায় বিফ দেব। উনি টাকা দেবেন, আমি কোনও লাভ রাখব না।'

'তাহলে তোমার পরিশ্রম বৃথা যাবে!'

'দুর। তুমি বুঝতে পারছে না। লাভ করে আমার কী হবে? মনের শান্তি পাব! একটা মানুষ সেই আমেরিকা থেকে এসে এখানে আমাদের উপকার করছেন আর আমি তাঁকে সাহায্য করব না? সেটাই তো আমার শান্তি।'

'সিমিও ওঁর সঙ্গে কাজ করছে।'

'আমার তো সেটাই ভয় ছিল। সিমি যদি আপত্তি করে আর মেমসাহেব সেটা মেনে নেন তাহলে তো আমি কাজটা করতে পারব না। কিন্তু আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছি, বুঝলে!'

'কেন?'

'সিমি আপত্তি করেনি।'

'বরং যেসব গ্রামের মানুষদের ওরা চেনে না সেইসব গ্রামে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য মেমসাহেব সিমিকে নির্দেশ দিয়েছেন, ও মেনে নিয়েছে।'

'তার মানে তুমি আর সিমি একসঙ্গে কাজ করবে?'

ম্যাথুজ হাসল। পরিতৃপ্ত হাসি, 'আর কী চাই বলো?'

এইসময় মিস্টার ব্রাউন বেরিয়ে এলেন, 'হ্যালো সায়ন, হ্যালো ম্যাথুজ, যিশু তোমাদের মঙ্গল করুন।'

ম্যাথুজ বলল, 'আমার মনে হল আপনি ঘুমোচ্ছেন তাই এখানে অপেক্ষা করছিলাম। আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

'কী জন্য?'

'এলিজাবেথ মেমসাহেব আমাকে তাঁর কাজে যোগ দিতে বলেছেন।'

'খুব ভাল কথা।'

'এবং সিমি সেটা মেনে নিয়েছে।'

'বাঃ, আরও ভাল কথা। যিশু তোমাদের উপকার করবেন।'

'থ্যাঙ্কু। আচ্ছা চলি।'

'যাচ্ছ যাও। কিন্তু এই দোকানটা কি আর খুলবে না?'

'কী করে খুলব বলুন। গ্রামের গরিব মানুষদের জন্যে মাংস দিতে হবে। আপনি তো ইচ্ছে করলে চিকেন মটন খেতে পারেন। তাই না?' হেসে হাত নেড়ে বিদায় নিল মাথুজ।

'কী খবর বলো?' মিস্টার ব্রাউন গেট খুলে দিলেন।

'ভাল। আমি সামনের মাসে কলকাতা যাচ্ছি।'

'খুব ভাল খবর।'

'আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। বলো কী করতে পারি তোমার জন্যে?'

'আমার জন্যে নয়। আমাদের ওখানে একটি মেয়ে আছে, কঙ্কাবতী। মেয়েটি খুব ভাল। ওর অসুখ এখন অনেকটা ভাল। ওর মা চাকরি করত একটা স্কুলে। সেখানে পার্টির নেতার ইচ্ছে পূর্ণ না করার জন্যে বেচারার চাকরি গিয়েছে। ওঁর জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?'

'কী ধরনের চাকরি?'

'আমার মনে হয় স্কুলে উনি টিচার ছিলেন না। সাধারণ হেল্পার ধরনের কাজ করতেন।'

'দ্যাখো, আমি তো বাড়ি থেকে বের হই না বললেই চলে। তবু তুমি যখন বলছ—। পার্টি নেতার জন্য চাকরি চলে গেছে?'

'হ্যাঁ। মিসেস অ্যান্টনি সেইরকমই বললেন।'

'কী অন্যায় কথা। একটি ছেলে, কী নাম যেন, হ্যাঁ, গণেশ, খারাপ ব্যবহার করেছিল ডক্টরের সঙ্গে। ডক্টর চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে ঘটনাটা বলেছিলেন। সে এসেছিল তো ওই মেয়েটিকে ভর্তি করাতে। তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এদের সঙ্গে সেই ছেলের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'আমি দেখছি। তাহলে কাল শহরে যেতে হয়।'

'আপনি ওদের অনেক উপকার করবেন।'

'আমি তো কিছুই করতে পারি না। যিশু যদি ইচ্ছে করেন তাহলে সব হয়ে যাবে।'

সায়ন হাসল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন মিস্টার ব্রাউন। হঠাৎ তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার ব্রাউন, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

মিস্টার ব্রাউন চোখ বন্ধ করে নিশ্বাস নিলেন। তাঁর শরীর টলছিল। সায়ন এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল, 'মিস্টার ব্রাউন!'

বৃদ্ধের কপালে ঘাম ফুটে উঠছে। ডান হাতে বুক আঁকড়ে ধরেছেন তিনি কিন্তু চোখের দৃষ্টি সরাচ্ছেন না। সায়ন কোনওমতে ওঁকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল। ইশারায় মিস্টার ব্রাউন যিশুর ঘর দেখিয়ে দিলেন। সেখানে নিয়ে যেতে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়লেন মিস্টার ব্রাউন।

সায়ন বলল, 'আপনি একটু একা থাকুন, আমি এখনই ডাক্তার আঙ্কলকে খবর দিচ্ছি।'

সায়ন উঠে দাঁড়াতে যেতেই তার হাত চেপে ধরলেন মিস্টার ব্রাউন। বিড় বিড় করে বললেন, 'আমি জানি তুমি কে! আমাকে একটু দয়া করো। আমি যদি কারও ক্ষতি করে থাকি তাহলে তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

অবাক হয়ে গেল সায়ন, 'এসব আপনি কী বলছেন?'

'ঠিক বলছি। উঃ, কী কষ্ট! ওখানে যার মূর্তি সে কখনও কথা বলে না। কিন্তু তোমার মধ্যে তাঁকে একটু আগে দেখতে পেলাম। তুমি আমার ভগবান, তুমি আর আমায় চোখে ধুলো দিতে পারবে না যেশাস।' কথা বলতে বলতে চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল মিস্টার ব্রাউনের। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেটের কাছে যেতেই দেখতে পেল বিষ্ণুপ্রসাদ নীচ থেকে উঠে আসছে। সে চেঁচিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি ডাক্তার আঙ্কলকে ডেকে আনো। মিস্টার ব্রাউন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি।' কয়েক সেকেন্ড বুঝতে সময় নিল বিষ্ণুপ্রসাদ, তারপর দৌড়ে নীচে নেমে গেল।

যিশুর ঘরে ফিরে এল সায়ন। কার্পেটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন মিস্টার ব্রাউন। চোখ বন্ধ কিন্তু বুক ওঠা-নামা করছে। পাশে হাঁটু মুড়ে বসে সায়ন বুকে হাত রাখল, 'মিস্টার ব্রাউন!'

কোনও সাড়া নেই। সায়ন কী করবে বুঝতে পারছিল না। একটি মানুষ হঠাৎ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এই অবস্থায় কী করা যেতে পারে? ওর অনুমান হল মিস্টার ব্রাউনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ভদ্রলোক যদি মরে যান? সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল সায়নের। সে যিশুর দিকে তাকাল। মোমবাতির আলো এসে পড়েছে যিশুর মুখে। হঠাৎই, যা কোনওদিন সে করেনি, এমনকী মা ব্যাঘ্রবাহিনীর সামনেও নয়, তাই করল সায়ন। চোখ বন্ধ করে বলল, 'যিশু, ওঁকে বাঁচিয়ে দাও।'

ডাক্তার এসে গেলেন, পেছনে বিষ্ণুপ্রসাদ। প্রথমে পালস পরে স্টেথো দিয়ে বুক পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। তারপর ব্যাগ খুলে একটা ইনজেকশন বের করে ওষুধটা মিস্টার ব্রাউনের শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন। মিস্টার ব্রাউনের চোখ একটু কেঁপে উঠল। ডাক্তার বললেন, 'না, হার্ট অ্যাটাক নয়। কিন্তু ওঁকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমি গাড়ি বের করছি, তোমরা একটু হেল্প করো।'

এইসময় মিস্টার ব্রাউন চোখ খুললেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগছে?'

'ফাইন!' খসখসে গলায় বললেন মিস্টার প্রধান। তারপর উঠে বসার চেষ্টা করলেন। ডাক্তার বাধা দিলেন, 'না। আপনি এখন উঠবেন না। আমি আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।'

হাত নেড়ে না বললেন মিস্টার ব্রাউন, তারপর চোখ ঘুরিয়ে সায়নকে দেখতে পেলেন। হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

ধন্যবাদ কী কারণে বুঝতে পারল না সায়ন।

ডাক্তার আবার পরীক্ষা করলেন, 'আপনার একটা ই সি জি করা দরকার। এখনই। কি খেয়েছিলেন?'

'কিছু খাওয়া হয়নি। শুধু আমার কোটাটা শেষ করেছিলাম।'

'এম্পটি স্টমাকে থাকায় উইন্ড ফর্ম করেছে। তবু সাবধান হওয়া দরকার মিস্টার ব্রাউন। হাসপাতালে চলুন, ওখানকার ডাক্তাররা যদি বলেন তাহলে না হয় ফিরে আসবেন।'

এবার খানিকটা জোর করেই উঠে বসলেন মিস্টার ব্রাউন, 'আমার আর কোনও আফসোস নেই। যা পাওয়ার তা আমি পেয়ে গেছি ডক্টর। আমাকে আমার খাটে নিয়ে চলুন।'

অগত্যা তাই করা হল। ডাক্তার বিষ্ণুপ্রসাদকে বললেন, 'তুমি যদি একটা কাজ করো তাহলে ভাল হয়।'

'বলুন।' বিষ্ণুপ্রসাদ বলল।

'ডক্টর তামাংকে এখানে আসতে বলো। মিস্টার ব্রাউনের নাম শুনলে উনি নিশ্চয়ই চলে আসবেন। ওঁর চেম্বার কোথায় জানো?'

বিষ্ণুপ্রসাদ মাথা নাড়ল।

ডাক্তার বললেন, 'বাড়িতে রাখা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু জোর করে নিয়ে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তুমি এক কাজ করো, বড়বাহাদুরকে বলো, স্ট্রেচার নিয়ে এখানে চলে আসতে।'

'আমাদের ওখানে নিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ। এখানকার থেকে ভাল থাকবেন।'

মিস্টার ব্রাউনকে নিরাময়ে নিয়ে আসা হল। একতলার একটি খালি ঘরের বেডে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁকে। ডাক্তার একটা ওষুধ জলে গুলে খাইয়ে দিলেন। মিস্টার ব্রাউন বালিশে মাথা রেখে বললেন, 'তাহলে আমরা এখন একই বাড়িতে আছি, কী বলো?'

ডাক্তার তামাং এসে গেলেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ঘরে ঢোকার আগে তিনি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বললেন। তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যালো, ওল্ড বয়! মতলবটা কী? আমি ভাবছিলাম বিকেলবেলায় আপনার কাছে এসে দু পাত্র খেয়ে যাব আর আপনি এখানে শুয়ে আছেন?'

'আমার কিছু হয়নি। ওরা জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে ডাক্তার।'

'খুব অন্যায় কথা। এখন কিছুক্ষণ কথা বন্ধ।'

ডাক্তার তামাং বাক্স খুলে মেসিনপত্র বের করলেন। মিস্টার ব্রাউনের হাত-পায়ে তার লাগানো হল। ওঁর হৃৎপিণ্ডের আওয়াজের ছবি উঠল কাগজে। সেটা দেখে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল ভদ্রলোকের।

কাগজটা ছিঁড়ে এগিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবুর দিকে।

'কী দেখলে ডাক্তার। আমার আজকের কোটা এখনও শেষ হয়নি।'

'ওটা কাল খাবেন। মিস্টার ব্রাউন, আমার কথা শুনুন, আপনি হাসপাতালে চলুন। জাস্ট ফর এ চেক আপ।'

'আজ নয়, কাল যাব ডাক্তার।'

ডাক্তার তামাং বেরিয়ে এলেন। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাঁর কথা হল। সায়ন শুনল, একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। ই সি জি ভাল নয়। এখন নড়াচড়া করাও ঠিক হবে না। ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা ছাড়া কোনও উপায় নেই। বরং হসপিটাল থেকে একজন নার্স আর অক্সিজেন আনিয়ে নেওয়া দরকার। ডাক্তারবাবু একমত হলেন।

ডাক্তার তামাং আবার ঘরে ঢুকলেন।

'কী হয়েছে আমার?'

'নাথিং, কিছু হয়নি মিস্টার ব্রাউন। কিন্তু কোনও কথা নয়।'

'তাহলে আমি যিশুকে দেখলাম কেন?'

'যিশুকে দেখেছেন আপনি?' ডাক্তার তামাং হতভম্ব।

'ইয়েস। আমার ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা এগিয়ে এলেন। কাছে এলেন, অদ্ভুত ঘটনা। দেখে আমি অবাক। কিন্তু কিছু বলার আগেই তিনি সায়নের শরীরের সঙ্গে মিশে গেলেন। আর তখন, তোমাকে কী বলব, সায়নের মুখখানা কী রকম উজ্জ্বল, পবিত্র হয়ে গেল। আই হ্যাভ সিন হিম ডক্টর। সায়ন যে সাধারণ মানুষ নয় এই অনুভূতি আমার অনেক দিন থেকেই হচ্ছিল। আমার মন ভরে গেছে আজ।'

মিস্টার ব্রাউন যখন কথা বলছিলেন তখন ডাক্তার তামাং তাঁকে ঘুমের ইনজেকশন দিলেন। ধীরে ধীরে কথা জড়িয়ে গেল বৃদ্ধের। ঘুমিয়ে পড়লেন মিস্টার ব্রাউন।

হাসপাতাল থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার এসে গেল। নার্সদের ইউনিয়নে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা এখনই একজনকে পাঠাবে। নিরাময়ের যেসব মানুষ হাঁটাচলা করতে পারে তারা নেমে এসে জড়ো হয়েছে বারান্দায়।

ডাক্তার তামাং বললেন, 'আমি ভরসা পাচ্ছি না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু হার্টের যা অবস্থা নাড়াচাড়া করা ঠিক হবে না।'

ডাক্তার আঙ্কলকে জিজ্ঞাসা করতে শুনল সায়ন। 'উনি কী বলছিলেন?'

ডাক্তার তামাং সায়নের দিকে তাকালেন, 'তোমাকে উনি খুব ভালবাসেন। ওঁর কোনও আত্মীয়স্বজন কী এই শহরে আছেন?'

মাথা নাড়ল সায়ন, 'না বোধহয়। সিমি বলতে পারে।'

'সিমিকে বলো তাদের খবর দিতে।'

'সিমি তো মিসেস ডিসুজার বাড়িতে এলিজাবেথের সঙ্গে আছে। কাউকে সেখানে পাঠাব? এলিজাবেথ মিস্টার ব্রাউনের বন্ধু, ওঁকেও বলা উচিত।' সায়ন ছোটবাহাদুরকে ডেকে কী করবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। মিসেস অ্যান্টনি সবাইকে নিজের কাজে চলে যেতে বলছিলেন।

ডাক্তার তামাং ফিরে গেলেন মিস্টার ব্রাউনের পাশে। হঠাৎ সন্দেহ হওয়ায় পালস দেখলেন। স্টেথো দিয়ে বুক পরীক্ষা করলেন। তারপর দ্রুত বুক মালিশ করতে লাগলেন। তারপর কয়েকটা ঘুষি মেরে বুকে কান পাতলেন। ডাক্তার আঙ্কলকে এগিয়ে যেতে দেখল সায়ন। তিনিও পরীক্ষা করলেন। তারপর মাথা নাড়লেন।

ডাক্তার তামাং সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, 'গুড বাই মাই ফ্রেন্ড।'

মিসেস অ্যান্টনি কেঁদে উঠলেন। সায়ন দেখছিল। কী প্রশান্ত মুখে শুয়ে আছেন মিস্টার ব্রাউন। এখনই হেসে বলবেন, 'হ্যালো মাই বয়, কেমন আছ?'

হঠাৎ কাঁধে হাত পড়তেই মুখ ফেরাল সায়ন। ডাক্তার তামাং তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, 'আমি

বিশ্বাস করি না। কিন্তু যিনি বিশ্বাস নিয়ে চলে গেলেন তিনি আর পেছন ফিরে তাকাবেন না। তাই তুমি ওর জন্যে প্রার্থনা করো।'

সায়ন কেঁদে ফেলল।

২৯

নিরাময় থেকে মিস্টার ব্রাউনের বাড়ি কয়েক মিনিটের পথ। এই দূরত্ব তিনি অজস্রবার হেঁটে এসেছেন, আজ মানুষের কাঁধে এলেন। এখন সকাল। পিলপিল করে মানুষেরা ছুটে আসছে। এই পাহাড় থেকে নীচের বাসরাস্তায় যাওয়ার একমাত্র পথ মিস্টার ব্রাউনের বাড়ির গেট ছুঁয়ে নেমে গিয়েছে। একমাত্র মদ্যপান, খাওয়া এবং ঘুমোনোর সময়টুকু বাদ দিয়ে বৃদ্ধ তাঁর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যে মানুষই নামাওঠা করত তাকে যিশুর কথা বলতেন, যিশুর মহানুভবতার কথা বলে তার জন্যে প্রার্থনা করতেন। এই পাহাড়ের যাবতীয় তথ্য মিস্টার ব্রাউনের জানা ছিল। পাহাড়ি মানুষদের কার বাড়ির কী সমস্যা তা তিনি প্রশ্ন করে জেনে নিতেন। আকাশে মেঘ অথচ কোনও মহিলা ছাতা ছাড়া বাজারে যাচ্ছেন দেখলে সতর্ক করতেন, বলতেন তাঁর ছাতাটা নিয়ে যেতে। দৈনন্দিন জীবনে পাহাড়, কুয়াশা, লম্বা গাছের জঙ্গল, চার্চের মতো মিস্টার ব্রাউন এই পাহাড়ি মানুষদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেই মানুষটা আজ নেই খবরটা পাওয়ামাত্র কেউ স্থির থাকতে পারেনি।

মিস্টার ব্রাউনকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল বাড়ির চাতালে তাঁর ব্যবহৃত খাটের ওপরে। চোখ বন্ধ। শরীর স্থির। মাথার ওপর নিকানো আকাশ। এত নীল আকাশ অনেকদিন মাখেনি। পায়ের কাছে মাথা নিচু করে বসেছিল ভুটো। তার প্রভুর কিছু একটা হয়েছে অনুমান করে চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার তামাং বিষ্ণুপ্রসাদকে ঘিরে জনতা বাড়ছে। হঠাৎ দেখা গেল ভুটো ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মিস্টার ব্রাউনের মুখের পাশে। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত করুণ চিৎকার করল সে। ভুটো যে কাঁদছে এটা বুঝতে অসুবিধে হল না কারও। ডাক্তার তামাং বললেন, 'চুপ যা, এ ভুটো, চুপ যা।' ভুটো চিৎকার করে যাচ্ছিল। তাকে সরিয়ে দিতে সাহস পাচ্ছিল না কেউ। হঠাৎ চিৎকার কানে এল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সিমি। মিস্টার ব্রাউনের শরীরটাকে দেখে পাথর হয়ে গেল সে। আর তখনই কান্না থামিয়ে ভুটো ছুটে গেল সিমির কাছে। সিমির দুটো পা জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজে আওয়াজ করতে লাগল। সিমি ঝুঁকে ওর মাথায় হাত রাখল। এবার এলিজাবেথকে দেখা গেল ভিড় সরিয়ে আসতে, তাঁর পাশে ম্যাথুজ। এলিজাবেথ মিস্টার ব্রাউনের পাশে এসে চাতালের ওপরই বসে পড়লেন, 'ইটস নট ফেয়ার মাই ফ্রেন্ড। আমি এসেছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করে চলে যাওয়ার কথা ছিল আমার। কিন্তু আমি থেকে গেলাম আর তুমি চলে গেলে?' খুব নিচু গলায় কথা বলছিলেন ভদ্রমহিলা।

ডাক্তার তামাং কফিনের জন্যে লোক পাঠালেন। খবর পেয়ে ফাদার চলে এসেছেন। সামনের পাহাড়ি পথ মানুষের ভিড়ে এখন অচল। বয়স্ক ক্রিশ্চানরা শেষকৃত্যের ব্যাপারে কথা বলছেন। সায়ন ভেতরের ঘরে ঢুকল। যিশুর মূর্তির সামনে তখন মোমবাতি জ্বলছে না। শেষবার জ্বালিয়েছিলেন মিস্টার ব্রাউন। কী রকম মনে হল, সায়ন যিশুর ঘরে ঢুকল। তারপর সযত্নে মোমবাতিতে আগুন ধরিয়ে দিল। তার আলোয় ঝকঝক করে উঠল যিশুর মুখ। এই বাড়ি যাঁর তিনি আর কখনও মোমবাতি জ্বালাবেন না। অথচ যিশু থাকবেন তাঁর মহিমা নিয়ে।

কফিন এনে মিস্টার ব্রাউনকে স্নান করিয়ে পোশাক পরিয়ে তার মধ্যে শোওয়ানো হবে। ফাদার প্রার্থনা করবেন। তারপর শোকমিছিল কফিন নিয়ে প্রথমে যাবে চার্চে। সেখানকার বারান্দায় কিছুক্ষণ শায়িত থাকবেন মিস্টার ব্রাউন। তারপর যাওয়া হবে কবরখানায়। কিন্তু এসব করার আগে সবাই অপেক্ষা করবে মিস্টার ব্রাউনের বড়ছেলের জন্যে। ভদ্রলোক শিলিগুড়িতে একটি নার্সারি স্কুল চালায়। অন্য দুই ছেলে রয়েছে সিমলা এবং মুম্বইতে। তাদের খবর দিয়ে আনানোর সময় নেই।

এই বাড়ির সর্বত্র মিস্টার ব্রাউনের স্মৃতি তার কী হবে? কোনও ছেলের পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়। ওঁর যে ছেলে সিমলার চার্চে আছেন তিনি হয়তো যিশুর মূর্তি নিয়ে যাবেন।

ডাক্তার তামাং ভেতরের ঘরে এলেন। গতরাত থেকে এই মানুষটি সব কাজ ফেলে মিস্টার ব্রাউনের পাশে আছেন। মুখচোখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। ডাক্তার তামাং সায়নকে দেখে বললেন, 'মিস্টার ব্রাউন বলেছিলেন ওঁর কোটাটা শেষ হয়নি। আমি বলেছিলাম আমরা একসঙ্গে শেষ করব। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল মানুষ শেষ পর্যন্ত কথা রাখতে পারে না।' মিস্টার ব্রাউনের দিশি মদের পাত্রটি তুলে গ্লাসে ঢাললেন ডাক্তার তামাং। তারপর গ্লাস ওপরে তুলে বললেন। 'লুক মাই ওল্ড ফ্রেন্ড, তোমার কোটা আমি শেষ করছি।'

ঢক ঢক করে খানিকটা গলায় ঢেলে ঠোঁট মুছলেন ডাক্তার তামাং। তারপর এগিয়ে গিয়ে ফ্রিজ খুলে বললেন, 'মাই গড।'

সায়ন এগিয়ে গিয়ে দেখল একটা বড় বাটি বোঝাই মাংস রান্না করে রাখা আছে। ডাক্তার তামাং জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি এসব খাওয়া বারণ?'

সায়ন বলল, 'আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।'

মাথা নেড়ে চামচ দিয়ে একটা প্লেটে কিছু মাংস তুলে স্টিলের প্লেটটা গ্যাস জ্বালিয়ে আগুনের ওপর রাখলেন। ডাক্তার তামাং বললেন, 'তুমি কি মনে করো না আমি খাচ্ছি বলে মিস্টার ব্রাউন খুশি হচ্ছেন?'

'আপনারা তো একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন।'

'ইয়েস, অনেক বছর চলে গেল। এই পাহাড়ে এলেই আমি এসে ওই চেয়ারে না বসে ফিরে যেতাম না। আমার জীবনে এই একটি মানুষ যিনি কোনওদিন কারও নিন্দা করেননি।' মাংস গরম করে গ্লাস নিয়ে টেবিলে বসে বললেন, 'তুমি একটু আমার সামনে এসে বসবে?'

বাইরে মানুষের চাপা গলার স্বর একত্র হয়ে বেশ সরব হয়েছে। চাতালে মিস্টার ব্রাউনের শরীর ঘিরে শোকার্তরা বসে আছেন আর ভেতরের ঘরে একজন মদ্যপান এবং মাংস খাচ্ছেন. এটা কি শোভনীয় হচ্ছে?

উত্তরটা সায়ন নিজেই দিল। ডাক্তার তামাং-এর অধিকার আছে এসব করার।

সে টেবিলের উল্টোদিকে বসলে ডাক্তার তামাং তাকালেন। কয়েক সেকেন্ড এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি নিজেকে কী মনে করো?'

সায়ন অবাক হল, 'কী মনে করব? আমি একজন স্বাভাবিক মানুষ। অবশ্য আমার এই অসুখকে যদি স্বাভাবিক মানুষের অসুখ বলে মনে করা যায়!'

'মানুষ মাত্রই অসুস্থ হয়। কেউ কম কেউ বেশি। কিন্তু জানতে চাইছি তুমি কি মনে কর তোমার মধ্যে কোনও সুপার পাওয়ার কাজ করছে?'

'সুপার পাওয়ার?'

'যেটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অবাস্তব বলে মনে করি। যে-সমস্ত মহামানব পৃথিবীতে এসেছেন, যাঁদের ঈশ্বরপুত্র বলা হয় তাঁরা অনেক কিছু করেছেন যা আমরা সাধারণ মানুষরা করতে পারি না। যেমন যিশু কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করেছেন, কেউ মৃত মানুষের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব অথবা চৈতন্য সম্পর্কেও একই কথা শোনা যায়। এঁদের ঘিরে লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্র হয়েছেন। এঁদের বাণীকে জীবনের আদর্শ করেছেন যুগ যুগ ধরে। তুমি নিশ্চয়ই জানো।'

'জানি। এঁদের আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'এঁদের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করি না। কারণ এঁরা আমাদের আলোর পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু এঁদের ঘিরে যেমন মির‍্যাকলের কথা চালু আছে সেগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। একজন মানুষের উপকারের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এইটুকুই তাঁর প্রতি মাথা নত করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি বিশ্বাস না করলে কী হবে কোটি কোটি মানুষ করেন, তাঁদের বোঝালেও তাঁরা বুঝতে চাইবেন না। ওই বিশ্বাসটাই তাঁদের বেঁচে থাকার অক্সিজেন। মিস্টার ব্রাউনও এইরকম বিশ্বাস করতেন। তুমি জানো?'

'উনি ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন।'

'ঠিক। কিন্তু মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে আমাকে কী বলেছেন জানো?'

সায়ন চুপ করে রইল।

'উনি বলেছেন ওঁর কোনও আক্ষেপ নেই। কারণ তিনি যিশুকে জীবন্ত দেখেছেন। যিশুর মূর্তি থেকে বেরিয়ে এসে এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে তোমার শরীরে প্রবেশ করতে দেখেছেন। তুমি কী মনে করো?'

'আমি জানি না।'

'মিস্টার ব্রাউনের অজ্ঞান হওয়ার ঠিক আগে তুমি তোমার শরীর মনে কোনও পরিবর্তন অনুভব করেছিলে?'

'সম্ভবত না।'

'তাহলে দ্যাখো, মানুষ নিজের ভাবনাকে বাস্তবে দেখতে খুব ভালবাসে। মিস্টার ব্রাউন তোমাকে স্নেহ করতেন। তোমার মধ্যে তিনি সেই পবিত্র মহামানবকে দেখার চেষ্টা করতেন। হয়তো তোমাদের চেহারায় কিছু মিল আছে যা তাঁকে এমন ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর মৃত্যুর আগে ওই বিশ্বাস থেকে তাঁর মনে প্রশান্তি এসেছিল। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। তোমাকে নিয়ে বারংবার এমন ঘটনা ঘটছে কেন? নীচের রাস্তায় মেরির মূর্তির সামনে তোমাকে দেখে যারা বিভ্রান্ত হয়েছিল তাদের সঙ্গে তো তোমার আগে পরিচয় ছিল না।'

'আমি কী বলব বলুন।' সায়ন বলল, 'মিস্টার ব্রাউন মৃত্যুর আগে যদি কিছু বলে গিয়ে থাকেন তাহলে সেটা আর কাউকে বলবেন না।'

'কেন?' গ্লাস শেষ করলেন ডাক্তার তামাং।

'আমাকে বিব্রত হতে হবে।'

'কেন?'

'এর আগে কিছু মানুষের ধারণা হয়েছিল আমি অলৌকিক কিছু করতে পারি। আমি যে অতি সাধারণ মানুষ বুঝতে চায়নি ওরা।'

'ঠিক আছে। আমি বলব না। কিন্তু মিস্টার ব্রাউনের এমন ধারণা হল কেন?'

'আমি জানি না।'

'আমি জানি। উনি আমাকে বলেছেন এক রাত্রে স্বপ্নে দেখেছেন তোমাদের নিরাময়ের ওপর একটি তারাকে নেমে আসতে। অর্থাৎ ভদ্রলোক দীর্ঘকাল ধরে তোমাকে মনে মনে যিশুর আসনে বসিয়েছেন।'

'না। আমার সে যোগ্যতা নেই। তা ছাড়া উনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করতেন তাতে স্নেহ প্রকাশ পেত, ভক্তি নয়।'

সায়নের প্রতিবাদ শুনতে শুনতে দ্বিতীয়বার গ্লাস ভর্তি করলেন ডাক্তার তামাং। এই সময় দরজায় শব্দ হল। ডাক্তার তামাং বললেন, 'কাম ইন।'

ভেজানো দরজা খুলে একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার মধ্যবয়সী মানুষ এবং দুজন প্রৌঢ় ঘরে ঢুকলেন। প্রৌঢ়দের একজন বলে উঠলেন, 'এ কী! আপনি মদ্যপান করছেন। ছি ছি ছি। এ বাড়ির এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল, মানুষটার শরীর বাইরে শুয়ে রয়েছে, সবাই শ্রদ্ধা জানাতে আসছে আর আপনি—!'

ডাক্তার তামাং বললেন, 'তোমাকে চিনতে পারছি। এঁরা কে?'

মধ্যবয়সী মানুষটি বললেন, 'উনি আমার শ্বশুর আর ইনি ওঁর ভাই। শিলিগুড়িতে থাকেন। ডাক্তার তামাং গ্লাসে চুমুক দিলেন, 'আমি অনুরোধ রাখছি।'

মধ্যবয়সী বললেন, 'অনুরোধ?'

'যোশেফ, তোমার বাবার মৃত্যুর সময় তাঁর পাশে ছিলাম। গতকাল তাঁর কোটার মদ উনি কোনও কারণে শেষ করতে পারেননি। তাই আমাকে বলেছিলেন এখানে নিয়ে আসতে। নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। আমি কথা দিয়েছিলাম আজ শেষ করব।' আবার চুমুক দিলেন তিনি, 'ভদ্রমহোদয়গণ,

মিস্টার ব্রাউনের এই বাড়িতে আপনারা শেষ কবে এসেছেন তা দয়া করে বলবেন কী?'

যোশেফের শ্বশুর বললেন, 'বিয়ের পর একবার এসেছিলাম। আমার ভাই কখনও আসেনি। তাতে কী হয়েছে?'

'মানুষটা বেঁচে থাকার সময় আপনারা এখানে তিনি কেমন আছেন দেখতে যখন আসেননি তখন আমাকে ভর্ৎসনা করার আগে আপনাদের দুবার ভাবা উচিত ছিল।'

এই সময় ফাদার ঘরে এলেন। ডাক্তার তামাং-এর সামনে মদের বোতল ও গ্লাস তিনি যেন লক্ষই করলেন না, 'আমি আবার এক পরম বন্ধুকে হারালাম। রোজ দেখা হত না কিন্তু মনের যোগাযোগ ছিল। ডাক্তার তামাং, ওঁর ছেলে যোশেফ এসে গিয়েছে, এখন আপনারা পারলৌকিক কাজকর্মের সময়টা স্থির করুন। যদি অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কথা ভেবে অপেক্ষা করতে চান তাহলে সেটা করা যেতে পারে।'

ডাক্তার তামাং উঠে দাঁড়ালেন, 'ফাদার। আপনার সঙ্গে মিস্টার ব্রাউনের তো দীর্ঘকালের আলাপ। ওঁর কাছে কোনও আত্মীয়স্বজনকে আসতে দেখেছেন?'

'না। আমার চোখে পড়েনি।'

'তাহলে দেরি করে লাভ কী! অবশ্য যোশেফ যা বলবে তাই হবে।'

যোশেফ তার শ্বশুরের দিকে তাকাল। তিনি বললেন, 'মৃতদেহ বেশি সময় রেখে দিলে পচন ধরতে পারে। উনি কখন মারা গিয়েছেন?'

'কাল মধ্যরাত্রে।' ডাক্তার তামাং উত্তর দিলেন।

'তাহলে তো এমনিতেই বেশ দেরি হয়ে গেছে।'

ফাদার বললেন, 'তাহলে কফিন আসুক, আমরা প্রস্তুতি নিই। ওঁকে স্নান করাবার ব্যবস্থা করা দরকার।'

ডাক্তার তামাং বললেন, 'একটা কথা। মৃতের প্রিয় কোনও দামি জিনিস আজকাল কফিনে দেওয়া হয় না বটে তবে সাধারণ জিনিস নিশ্চয়ই দেওয়া যেতে পারে ফাদার।'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে বাকি মদটুকু সমেত এই বোতলটা কফিনে দিলে ওঁর আত্মা খুশি হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল যোশেফ, 'কী বলছেন আপনি?'

ফাদার বললেন, 'তোমার ব্যাপারটা ভাবতে অস্বস্তি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার বাবা মদ্যপানকে অপরাধ বলে মনে করতেন না। মদ্যপান করে কখনও ওঁকে বেসামাল হতে কেউ দেখেনি। ওটা তাঁর ভালবাসার জিনিস ছিল। তাই ডাক্তার তামাং ওই প্রস্তাব করে কোনও অন্যায় করেননি মাই সন।'

যোশেফ মুখ ঘোরাল। ডাক্তার তামাং বোতল ভাল করে বন্ধ করে বললেন, 'মাই ওল্ড ফ্রেন্ড। তোমার কোটাটা আজ ভাগ করে খাব বলে কথা দিয়েছিলাম। আমি আমার ভাগ শেষ করেছি। বাকিটা তোমার কফিনে থাকবে। ওকে!' তারপর ফাদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা যেন মনে করে দেওয়া হয়।'

'আপনি তো থাকছেন—!' ফাদার বললেন।

'না, আমি থাকছি না। একজন মৃত বন্ধুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়েছি, এবার জীবিত রুগিগুলোর কাছে যাওয়া দরকার।' ডাক্তার তামাং এক পা হেঁটে দাঁড়িয়ে গেলেন, 'ফাদার, এই ছেলেটিকে আপনি চেনেন? কখনও দেখেছেন?'

ফাদার তাকালেন সায়নের দিকে, 'নিশ্চয়ই। ও নিরাময়ে থাকে।'

'গুড।'

ফাদার বললেন, 'ডাক্তার তামাং, মিস্টার ব্রাউন আপনার বন্ধু। ওঁকে কফিনে শোওয়ানো পর্যন্ত আপনি না গেলে ভাল হয়।'

কাপড় দিয়ে জায়গাটাকে ঘিরে মিস্টার ব্রাউনের শরীরটাকে স্নান করানো হল। বয়স্করাই সেটা করলেন। যোশেফ ওঁর সেরা পোশাক বের করে দিল। মৃত মানুষকে সঠিকভাবে পোশাক পরানো সম্ভব নয়। তবু যেটুকু সম্ভব হল তাতেই ওঁকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। ইতিমধ্যে কফিন এসে গিয়েছিল। এখনই কফিনে পেরেক পোঁতা হবে না। একবার সেটা করলে আর খোলা রীতিবিরুদ্ধ। শেষ মুহূর্তে কোনও প্রিয়জন এসে গেলে তিনি মিস্টার ব্রাউনকে দেখতে পাবেন না। তাই ক্লিপের ব্যবস্থা আছে কফিনের ঢাকনাতে। একটা পাতলা বালিশের ওপর ওঁর মাথা রেখে কফিনে শুইয়ে দেওয়া হল সাবধানে।

ফাদার চোখ বন্ধ করে নীরবে প্রার্থনা করলেন। ডাক্তার তামাং বোতলটা একটা কাগজে মুড়ে কফিনের ভেতর রেখে দিলেন।

এইসব আয়োজন যখন চলছে তখন মিসেস অ্যান্টনি এসে দাঁড়ালেন সায়নের পাশে, 'তোমার স্নান খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। আজ সকাল থেকে তুমি কিছুই খাওনি, ওষুধও না।'

'ডাক্তার আঙ্কল কি যেতে বলেছেন?'

'না। তিনি একজনকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন।'

'কাকে নিয়ে?'

'কঙ্কাবতীর পাশের ঘরে যে বাচ্চা মেয়েটি থাকে, হঠাৎ তার শরীর খারাপ হয়েছে। প্রচণ্ড ব্লিডিং হচ্ছে।'

'আমি একটু পরে যাচ্ছি। প্লিজ।'

মাথা নেড়ে মিসেস অ্যান্টনি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

ঠিক এই সময় মোটরবাইকের আওয়াজ ভেসে এল। দুটো মোটরবাইক আর দুটো মারুতি ভ্যান হর্ন বাজাতে বাজাতে ওপরে উঠে আসছে। ভিড় তাদের জায়গা দিচ্ছিল না বলে তারা গালাগাল শুরু করল। ফলে রাস্তা তৈরি হয়ে গেল।

মোটরবাইকের দুজন আরোহী উঠে এল গেট খুলে। প্রথমজন বলল, 'আমার নাম সামু গুরুং। নিশ্চয়ই নামটা শুনেছেন; আমরা এই মাত্র খবর পেলাম মিস্টার ব্রাউন মারা গিয়েছেন। ওর ছেলেমেয়ে কেউ এখানে আছে?'

যোশেফ এগিয়ে গেল, 'আমি ওঁর ছেলে।'

'আপনার বাবাকে আমাদের পার্টি শ্রদ্ধা করে। উনি কীভাবে মারা গিয়েছেন এবং কখন ঘটনাটা ঘটেছে?'

'আমি এখানে ছিলাম না। শুনলাম কাল মাঝরাত্রে বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন।'

'এখানে?'

'না। ওঁকে নিরাময়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

'নিরাময় মানে ব্লাড ক্যানসার নার্সিংহোমে। কে নিয়ে গিয়েছিল ওকে ওখানে? হার্ট অ্যাটাকের ট্রিটমেন্ট কি ওখানে হয়?'

'আমি জানি না।'

'আমাদের জানা দরকার।' সামু গুরুং মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, আমরা ওঁর ডেডবডি নিয়ে সারা শহর ঘুরব। তারপর পার্টি অফিসের সামনে রাখব। মালা-টালা দেওয়া হবে। নেতাদের বেলায় যেমন হয়। কফিন রেডি?'

ফাদার বললেন, 'হ্যাঁ রেডি। কিন্তু উনি তো নেতা ছিলেন না। তা ছাড়া কবরখানায় ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেছে।'

'হোক না। আপনার কাজ প্রার্থনা করা, আপনি তাই করবেন ফাদার। ওঁর ছেলের যখন আপত্তি নেই—!' সামু গুরুং হাসল, 'আমি নিরাময় থেকে আসছি। তার পরেই ওঁকে নিয়ে যাওয়া হবে।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আওয়াজ পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে চিৎকার আর অশ্রাব্য গালাগালি। ওরা যে নিরাময়ের ওপর হামলা করছে তা বোঝা গেল। জনতা ভয় পেয়ে পালাচ্ছিল। যারা সাহসী তারা ওদের বক্তব্য শুনে মন্তব্য করছিল, 'নিরাময়ে না নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মিস্টার

ব্রাউন বেঁচে যেতেন। ওই ডাক্তার হার্টের কিছু বোঝে না বলে লোকটা মরে গেছে।' এবার আগন্তুকদের সঙ্গে এখানকার কিছু মানুষ যোগ দিল। নিরাময়ের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বড় বড় পাথর ছোড়া হচ্ছে। জানলার কাচগুলো দোতলা থেকে ভেঙে পড়ছে।

এলিজাবেথ চিৎকার করলেন, 'এসব কী হচ্ছে? এ তো গুণ্ডামি!'

তাঁর মার্কিন ইংরেজির অর্থ অনেকেই বুঝতে পারল না। এলিজাবেথ ছুটলেন আক্রমণকারীদের বাধা দিতে। উত্তেজিত কর্মীরা তাঁকে ছুটে আসতে দেখে প্রথমে অবাক হয়েছিল। তারপর বক্তব্য শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'হু আর ইউ?'

'আমি মিস্টার ব্রাউনের বন্ধু। আমেরিকা থেকে এসেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান উঠল, 'আমেরিকান দালাল তফাত যাও। আমেরিকান দালালি চলবে না চলবে না।' একজন ওঁকে এমন ধাক্কা মারল যে ভদ্রমহিলা মাটিতে পড়ে গেলেন।

সায়ন চারপাশে তাকাল। বিষ্ণুপ্রসাদকে খুঁজল। সে কাছেপিঠে নেই। এই সময় ডাক্তার তামাং বেরিয়ে এলেন ভেতরের ঘর থেকে। জিজ্ঞাসা করলেন কী হয়েছে? ফাদার ওঁকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বললেন। ডাক্তার তামাং দেখলেন সায়ন এগিয়ে যাচ্ছে নিরাময়ের দিকে। তিনি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন।

সায়ন আগে পৌঁছোল সামু গুরুং-এর সামনে, 'আপনারা অন্যায় করছেন।'

সামু ওর দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট করল, 'অ্যাই তুই তো এখানে থাকিস? বাচ্চাদের গান শেখাস। ডাক্তার শালাকে ডাক। গেট বন্ধ করে মেয়েছেলের মতো বসে থাকলে বেঁচে যাবে ভেবেছে?'

'একটি বাচ্চা মেয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তারবাবু তার চিকিৎসা করছেন। এখন ওঁর বাইরে আসা সম্ভব নয়।'

'শালা দালাল। যখনই ঝামেলা করতে আসি তখনই শুনতে হয় কেউ না কেউ অসুস্থ! বাহানা?'

'আপনারা কেন এসব করছেন?'

'তোর ডাক্তার ওই বুড়োটাকে মেরে ফেলেছে।'

'এ কথা কে বলেছে আপনাকে?'

'আমি বলছি। এই এলাকায় আমার কথাই শেষ কথা। ও শালা হার্টের কিস্যু জানে না তবু বুড়োটাকে কেন এখানে নিয়ে এল? অ্যাই, গেট ভাঙ, ভেঙে গুঁড়িয়ে দে।' চিৎকার করে আদেশ দিল সামু। মানুষগুলো উল্লসিত হল।

এলিজাবেথ মাটি ছেড়ে থরথর করে কাঁপছিলেন। সায়নকে দেখে ছুটে এলেন পাশে। ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা কী চায়? কে ওরা?'

'এরা রাজনীতি করে।'

'ওঃ মাই গড!'

এই সময় ডাক্তার তামাংকে দেখা গেল সামু গুরুং-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। সামু তাঁকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেল, 'আপনি এখানে?'

'এসব কী করছ তোমরা?'

'এই লোকটা পাহাড়িদের শত্রু। কাল যদি বুড়ো ব্রাউনকে ও এখানে না নিয়ে এসে হাসপাতালে পাঠাত তাহলে হয়তো লোকটা বেঁচে যেত!'

'তোমাকে কে বলেছে এ কথা?'

'সবাই বলছে। ওকে এখানে নিয়ে এল কেন?'

'এর জবাব আমি তোমাকে দেব। কিন্তু তার আগে তুমি তোমার এই পাবলিককে থামতে বলো। ইমিডিয়েটলি!' চিৎকার করলেন ডাক্তার তামাং।

সামু গুরুং কিছু ভাবল। তারপর হাত তুলে সবাইকে থামতে বলল। কিন্তু ভাঙার নেশা যার একবার পেয়ে বসে তাকে থামানো খুব মুশকিল। সামুর ইঙ্গিতে পাবলিক ভ্রূক্ষেপ করল না। দেওয়াল বেয়ে দোতলার কাচভাঙা জানলায় উঠে গেছে কেউ কেউ। সামু চিৎকার করল কিন্তু তাতেও কাজ

হল না।

এবার সামুর ইঙ্গিতে তার এক সহকারী শূন্যে রিভলবারের গুলি ছুড়ল। আচমকা সব চুপ মেরে গেল। সবাই মুখ ঘুরিয়ে ওই পরিচিত শব্দের উৎস খুঁজতে লাগল। ডাক্তার তামাং সামুর সামনে দাঁড়ালেন, 'তোমাকে পার্টি নির্দেশ দিয়েছে এখানে এসে হুজ্জোতি করতে?'

'এই প্রশ্নের জবাব আপনাকে দেব না।'

'দিতে হবে। তুমি জানো আমি সরাসরি চেয়ারম্যানের কাছে যেতে পারি!'

'যান না, আপনাকে কে বাধা দিচ্ছে!'

'চুপ করো। ওইভাবে আমার সঙ্গে কথা বোলো না। তুমি কি জানো মিস্টার ব্রাউনের ডেথ সার্টিফিকেটে আমি সই করেছি?'

'আপনি?'

'ওঁর শরীরের যে অবস্থা তখন ছিল হাসপাতাল দূরের কথা নীচের রাস্তা পর্যন্ত ওঁকে নিয়ে যাওয়া যেত না! আমি পাশে সারারাত ছিলাম, আমার সামনেই ওঁর মৃত্যু হয়, এ খবর তুমি পেয়েছ?'

'না।' সামুর মুখ অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিল।

'এখন আমি যদি তোমাকে একটি চড় মারি তা হলে কি অন্যায় হবে?'

'আপনি আমাকে চড় মারবেন? যত নামকরা ডাক্তার হন তারপর আপনি পাহাড়ে থাকতে পারবেন?'

'তুমি এখন গুণ্ডা নিয়ে এখানে এসেছ। আমি চড় মারলে তোমার গুণ্ডারা আমাকে গুলি করে মারবে। কিন্তু পরে এর জন্যে তোমার শাস্তি হবে।'

সামু গুরুং কাঁধ নাচাল, 'সেটা পরে দেখা যাবে। আপনি যখন ডেথ সার্টিফিকেট লিখেছেন তখন আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু ওই বুড়োটাকে বঞ্চিত করলেন আপনি। ওঁকে আর সম্মান দেখানো হবে না।'

'তোমরা চলে গেলে এই পাহাড়ের মানুষ খুশি হবে। এরাই মাথায় করে মিস্টার ব্রাউনকে নিয়ে যাবে সমাধি দিতে।' ডাক্তার তামাং পাথরটার উপর উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন, 'আপনারা আমাকে চেনেন। আমি ডাক্তার তামাং সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমাদের প্রিয় মিস্টার ব্রাউনের মৃত্যুর জন্যে নিরাময়ের কেউ দায়ি নয়। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং আমি চিকিৎসা করি। সে সময় তাঁকে কোথাও নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই সামু গুরুং আপনাদের মিথ্যে কথা বলে উত্তেজিত করেছে। আমি মিস্টার ব্রাউনের চিকিৎসক, আমি বলছি, এই ছোকরা মিথ্যেবাদী। অযথা গুণ্ডামি করতে এসেছে, এবং আপনাদের জড়িয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠল। সামু চিৎকার করল, 'এই কী হচ্ছে, অ্যাঁ? মেরে খাদে ফেলে দেব তোকে!' সে তেড়ে যাচ্ছিল ডাক্তার তামাং-এর দিকে। হঠাৎ সায়ন দৌড়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'সাবধান আর এক পা-ও এগিয়ো না।'

সামুর বিরাট শরীরটা যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ওই রকম রোগা শরীর ওইভাবে তাকে শাসাতে পারে। নিজেকে সামলে সায়নকে আঘাত করতে গেল সামু। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা চিৎকার এবং একটা পাথর উড়ে এল সামুর ওপর। সামু অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তৎক্ষণাৎ যে প্রতিক্রিয়া হল তা কেউ কল্পনাও করেনি একটু আগে। যারা একটু আগে সামুর প্ররোচনায় নিরাময়ে পাথর ছুড়ছিল তারাই ভাঙচুর করতে লাগল সামুদের আনা ভ্যান এবং মোটরবাইকগুলোকে। সামুর সঙ্গীরা রিভলবার ছুড়ল ভয় দেখাতে কিন্তু তার ফল আরও মারাত্মক হল।

জনতা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই পুলিশের দুটো জিপ নীচ থেকে উঠে এল। পুলিশ দেখে জনতা থমকে গেল। যে অফিসার নেতৃত্বে ছিলেন তিনি নেপালি। সামুর জামা ছিঁড়ে গিয়েছিল। সে দৌড়ে গেল অফিসারের কাছে, উত্তেজিত হয়ে জনতাকে দেখিয়ে অভিযোগ করতে লাগল। এক দঙ্গল পুলিশ তখন বেতের ঢাল নিয়ে মোকাবিলার জন্যে তৈরি। সামু ভ্যান এবং বাইকগুলো দেখাল। ভ্যানের কোনও কাচ আর আস্ত নেই।

সামু চিৎকার করল, 'দাঁড়িয়ে দেখছেন কী? অ্যারেস্ট করুন। থানায় নিয়ে চলুন, তারপর যা করার আমি করব।'

অফিসার ডাক্তার তামাংকে চিনতে পারলেন। এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছিল ডক্টর?'

'ওঁর কথা কী শুনছেন? আমি যা বলছি তাই করুন।' সামু ধমকাল।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে অ্যারেস্ট করব?'

ভিড় সরে যাচ্ছিল ওপরে। দোতলার জানলায় যারা ঝুলছিল তারা এবার লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশেরা তাদের ধরে ফেলল। ধরা পড়তেই তারা চিৎকার করতে লাগল, 'সামু ভাই, তোমার কথায় আমরা জানলা ভাঙতে গিয়েছিলাম। আমাদের বাঁচাও।'

সামু বলল, 'ওদের ছেড়ে দিন। ওরা আত্মরক্ষার জন্যে ওপরে উঠেছিল।'

প্রবল হইচই শুরু হল। জনতা বলতে লাগল সামু গুণ্ডামি করতে এসেছিল, নিরাময় ভেঙেছে, ওকে অ্যারেস্ট করা হোক।

অফিসার হুকুম করলেন, 'আপনারা সবাই এখান থেকে চলে যান। এখনই।'

জনতা সরে গেল। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ বাড়িটার ওপর হামলা হল কেন? এটা তো একটা নার্সিংহোম!'

সামু বলল, 'পাবলিক ক্ষেপে গিয়ে আক্রমণ করেছে। এখানে শালা বাঙালিদের ট্রিটমেন্ট হয়। নেপালিরা গরিব বলে জায়গা পায় না।'

অফিসার বললেন, 'আপনারা থানায় চলুন, ওখানে গিয়ে কথা বলব।'

ডাক্তার তামাং বললেন, 'এই গুণ্ডাটাকে যতক্ষণ অ্যারেস্ট না করছেন ততক্ষণ আমি কোনও কথা বলব না। সম্পূর্ণ বিনা কারণে ও এখানে এসে হামলা করেছে। আমি চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করব পার্টি কেন গুণ্ডা পোষে? এসব ভাঙচুর ওর দলের লোকজন করেছে, গুলি ছুড়েছে।'

অফিসার চমকে গেলেন, 'গুলি? গুলি চলেছে এখানে?'

সায়ন বলল, 'ওই দুজনের কাছে রিভলবার আছে।'

অফিসার বলল, 'দাও। রিভলবার দিয়ে দাও।'

সামু এগিয়ে গেল ভ্যানের দিকে। ভাঙচুর হওয়া সত্ত্বেও ভ্যান দুটো চালু হল। লোকজনকে দুটো ভ্যানে তুলে সামু চিৎকার করে বলল, 'মোটরবাইক দুটোকে আমাদের ওখানে দিয়ে আসবেন অফিসার।'

ভ্যান দুটো নীচে নেমে গেল।

ডাক্তার তামাং বললেন, 'আশ্চর্য! আপনি নির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ওদের অ্যারেস্ট করলেন না?'

অফিসার বললেন, 'কে সত্যি বলছে তাই তো বুঝতে পারছি না।'

'আমরা এতগুলো লোক মিথ্যে বলছি?'

'ঘটনাটা বলুন তো?'

ডাক্তার তামাং সংক্ষেপে যা ঘটেছিল বললেন।

অফিসার সব শুনে মাথা নাড়লেন, 'বুঝতেই পারছি ওদের পুরনো রাগ আছে এখানকার ডাক্তারের ওপর। উনি কোথায়?'

সায়ন বলল, 'উনি একজন সিরিয়াস পেশেন্টের কাছে আছেন।'

অফিসার বললেন, 'ঠিক আছে, ওরা তো চলে গেছে, আপনারা এ নিয়ে আর ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার প্রশ্নের জবাব আপনি দেননি অফিসার!' ডাক্তার তামাং বেশ উঁচু গলায় বললেন, 'কেন ওদের ছেড়ে দিলেন?'

'ধরলেও বেল দিতে হত। কেস হলে প্রমাণ করা যেত না।'

'আমরা এতগুলো লোক সাক্ষী দিতাম।'

'তার আগেই আমি ট্রান্সফার হয়ে যেতাম।'

'আপনি ওয়েস্টবেঙ্গল গর্ভমেন্টের অফিসার। আপনাকে ট্রান্সফার করবে একটা গুণ্ডা?' ডাক্তার তামাং ব্যঙ্গ করলেন।

'আপনি আমার চেয়ে কম জানেন না ডাক্তার।'

'অথচ আন্দোলনের সময় আপনারা পাহাড়ে নির্দয়ভাবে অত্যাচার করেছেন। নির্দোষী মানুষকে মেরেছেন। ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন।'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। মাঝে মাঝে আমি নিজেই বুঝতে পারি না যে কোন গর্ভমেন্টের চাকরি করছি। তবে আমি এই ঘটনাটা ওসি এবং এসপি সাহেবকে জানাব। ওঁরা যা চাইবেন তাই হবে।'

ওঁরা চলে গেলেন। কিন্তু যাওয়ার আগে ওসি গুণ্ডাদের দুটো মোটরবাইককে তুলে নিয়ে যেতে ভুললেন না।

ডাক্তার তামাং এবার এলিজাবেথের দিকে তাকালেন। কাছে গিয়ে বললেন, 'সমস্ত ঘটনার জন্যে আমি খুব লজ্জিত। এখানকার মানুষের হয়ে ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।'

এলিজাবেথ মাথা নাড়লেন, 'আমাদের প্রত্যেকের ক্ষমা চাওয়া উচিত এই বাড়িটার কাছে। আসুন, যদি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা যায়।'

বড়বাহাদুর গেট খুলল।

মিসেস অ্যান্টনি এগিয়ে এসে বললেন, 'ডাক্তার সাহেব এখনও মেয়েটার পাশে বসে আছেন। আমরা খবর দিয়েছি।'

ওঁরা প্যাসেজ দাঁড়িয়েছিলেন। একটু বাদেই ডাক্তার নেমে এলেন, 'ও ডক্টর তামাং এনি প্রব্লেম?'

'আপনি কিছু শোনেননি?'

'শুনেছি। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় সমস্যায় আছি আমি।'

'আপনাকে সাহায্য করতে আমার কোনও অসুবিধে নেই।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। একবার মেয়েটিকে দেখে যেতে পারেন।'

এলিজাবেথ বললেন, 'আমরা অসহায়ের মতো দেখলাম ওরা নিরাময়ের জানলা ভাঙল। ডাক্তার তামাং না থাকলে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে যেতে পারত।'

ডাক্তার হাসলেন, 'আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এলিজাবেথ, ওই কাচগুলো ভেঙেছে বটে তবে আবার সারানো যাবে কিন্তু ওই বাচ্চাটার জীবন তো ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। আসুন ডক্টর তামাং।'

বিকেলের অনেক আগে শোকযাত্রা বের হল। কাতারে কাতারে মানুষ লাইন করে চলেছে। প্রত্যেকেই নতমস্তকে হাঁটছে। কেউ কথা বলছে না। আজকের দিনটা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এত রোদ পাহাড় অনেককাল পায়নি। চার্চের দিকে যত এগোচ্ছিল তত মিছিলের শেষ প্রান্ত বেড়ে যাচ্ছিল।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সায়ন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। মেয়েটি এখন অনেকটা ভাল। ডাক্তার তামাং চলে গিয়েছেন। মিস্টার ব্রাউনের শোকমিছিলে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল সায়ন।

ডাক্তার বলেছিলেন, 'অনেকটা ওপরে উঠতে হবে, তুমি পারবে?'

'পারব?'

'জোর করে হেঁটো না। অসুবিধে হলেই থেমে যাবে। তোমার সঙ্গে কে থাকছে? আমি তো এখন নিরাময় ছেড়ে যেতে পারব না।'

'বিষ্ণুপ্রসাদ এসেছে।'

ওরা রওনা হয়েছিল। এতটা পথ অনেকদিন হাঁটেনি সায়ন? চড়াই ভাঙতে তার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। চার্চ ছুঁয়ে সমাধিস্থলে পৌঁছোল কফিন। সায়ন শুনল ফাদার প্রার্থনা শুরু করলেন। যার বাংলা করলে এমন দাঁড়াল— 'সুরক্ষা যিশুর কোলে/ তাঁর বক্ষ আশ্রয়স্থান/ তাঁর প্রেমে হইয়া মগন/ তাঁয় বিশ্রাম তথায় প্রাণ।' মাটি তার সন্তানকে কোলে পেল। যেমন পায়।

হঠাৎ সায়নের শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল।

মেয়েটির নাম সোমা। শিলিগুড়ি থেকে তার আত্মীয়স্বজন এসে পড়েছে খবর পেয়েই। মেয়েটির মা নেই। পিসি চলে গিয়েছে মেয়েটির ঘরে। তাকে এখন আর রক্ত দেওয়া হচ্ছে না, কাগজের মতো সাদা শরীরটা বিছানায় নেতিয়ে আছে।

ভিজিটার্স রুমে ওর বাবা এবং অন্য আত্মীয়রা গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। সায়ন ঢুকে দেখল ডাক্তার আঙ্কল ওঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। সে ইতস্তত করছিল কিন্তু ডাক্তার আঙ্কল তাকে দেখতে পেলেন, 'কিছু বলবে সায়ন?'

সায়ন এগিয়ে গেল, 'সোমার জন্যে রক্তের ব্যবস্থা হয়েছে।'

'কী রকম?'

'বিষ্ণুপ্রসাদ অন্তত দশজনের সঙ্গে কথা বলেছে। তারা রক্ত দিতে রাজি। নিশ্চয়ই ওদের কারও কারও রক্তের সঙ্গে সোমার ব্লাড গ্রুপ মিলে যাবে।'

'তারা কোথায়?'

'পাঁচজন এসেছে, খবর দিলে বাকিরাও আসবে।'

ডাক্তার আঙ্কল বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ।' তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর খেয়াল হতে বললেন, 'এই ছেলেটির নাম সায়ন রায়। কলকাতায় বাড়ি। আমার এখানে চিকিৎসার জন্যে এসেছিল। ওকে দেখে বুঝতেই পারছেন এখন কী রকম আছে। আমরা এখানে সবরকম চেষ্টা করি। কিন্তু কোনও কোনও ব্যাপারে মানুষ অসহায় এটা নিশ্চয়ই আপনারাও স্বীকার করবেন। আমি তো বলি, যদি সামর্থ্য থাকে তা হলে পেশেন্টকে আরও বড় জায়গায় নিয়ে যান। একটি প্রাণ যত বেশি দিন পৃথিবীতে থাকবে তত আমি খুশি হব।'

'কিন্তু এই যে রক্ত পাচ্ছেন, এসব কি পেশাদার ডোনার?'

ডাক্তার আঙ্কল হাসলেন, 'না। পাহাড়ি মানুষরা লড়াইয়ের ময়দানে খুব সাহসী এবং বীর কিন্তু শরীর থেকে রক্ত বের করে তার বিনিময়ে টাকা পেতে অভ্যস্ত নয়। এরা রক্ত দেয় নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে বাঁচানোর জন্যে।'

'কিন্তু এদের রক্তে যদি অসুখ-বিসুখ থাকে—! আপনি কি পরীক্ষা করেন?'

ডাক্তার আঙ্কলের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। 'অবশ্যই করা উচিত। আজকাল এইডস এইভাবেই সংক্রামিত হচ্ছে। আমিও চেষ্টা করি পরীক্ষা করার পর নিঃসন্দেহ হলে তবেই পেশেন্টের শরীরে রক্ত দিতে। কিন্তু বলুন তো, যেখানে প্রয়োজনটা জরুরি, পেশেন্টের শরীরে এখনই রক্ত না দিলে বিপদ হতে পারে, যেখানে পরীক্ষিত রক্ত আপনার হাতের কাছে নেই সেখানে আপনি কী করবেন? বলুন, উত্তর দিন?'

এক ভদ্রলোক বললেন, 'সে রকম পরিস্থিতি যাতে না হয় তার জন্যেই তো ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে।'

'যেখানে ব্লাড ব্যাঙ্ক নেই? অথবা যেসব লিউকোমিয়ার পেশেন্টকে ফ্রেশ রক্ত দিতে হয়, সেক্ষেত্রে? সেক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতেই হয়। খুব অল্প সময়ে যে পরীক্ষাগুলো করা সম্ভব তা নিশ্চয়ই করা যায়, কিন্তু আমার কাছে একজন পেশেন্টের প্রাণ বাঁচানো পরে অসুখ হবে কিনা ভাবার আগে অনেক জরুরি। আমাদের স্বভাব হল ক্রমাগত প্রশ্ন করে সমস্যাটাকে জটিল করে দেওয়া, তার সমাধানের পথ খুঁজতে সাহায্য না করা। আচ্ছা, আপনারা অপেক্ষা করুন। আমাকে যেতে হচ্ছে—।'

এবার মেয়েটির বাবা বললেন, 'ডক্টর। আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে চাই!'

'নিয়ে যেতে চান!' অসহায় লাগল ডাক্তার আঙ্কলের কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ। এখানে ওর দু বছর হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই ওর বাড়াবাড়ির খবর পেয়ে ছুটে আসতে হয়। ও যে কখনও ভাল হবে না সেটা মেনে নিয়েছি আমি। শিলিগুড়িতে একজন বিখ্যাত হেমাটলজিস্ট এসেছেন। তাঁর চিকিৎসায় ও থাকলে চোখের সামনে থাকবে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন!'

'পারছি।' ডাক্তার আঙ্কল জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা এখনই ওকে নিয়ে যেতে চাইলে আমি অনুমতি দেব না। আপনার সন্তান, নিয়ে যেতে চাইছেন, আমার আপত্তি করার অধিকার নেই। ও একটু সুস্থ হলে নিয়ে যাবেন।'

ডাক্তার আঙ্কল বেরিয়ে গেলেন।

সোমার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এখানে কতদিন আছ?'

সায়ন বলল, 'অনেকদিন।'

'তোমার কি সোমার মতোই—!'

'এখানে যারা আছে তাদের অল্পবিস্তর একই অসুখ। আচ্ছা চলি।'

রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল দুজনের রক্তের সঙ্গে সোমার ব্লাড গ্রুপের মিল আছে। তাদের রক্ত নেওয়া হল। লোক দুটো খুব ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু বেরিয়ে এসে হাসতে লাগল। একজন বিষ্ণুপ্রসাদকে বলল, 'দুর! এর চেয়ে অনেক বেশি রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল গুলি খেয়ে।'

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'গুলি খেয়ে!'

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলি খেয়েছিল ও। তখন ওর বয়স কুড়ি হয়নি।'

মিসেস অ্যান্টনি ওদের ডাকলেন দুধ সন্দেশ এবং ফল খেতে।

ওরা দুজনেই মাথা নাড়তে লাগল।

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'ডাক্তারবাবু তোমাদের খাওয়াচ্ছেন। এগুলো খেয়ে বিশ্রাম করে চলে যাও, শরীর ঠিক হয়ে যাবে।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'কোনও দরকার নেই। শরীর আমাদের ঠিক আছে।'

প্রথমজন হলুদ দাঁত বের করে ওকে সমর্থন করল। মিসেস অ্যান্টনি একটু জোর করলেন, 'অন্তত দুধ-সন্দেশ খাও।'

'না। আমরা রক্ত দিয়েছি এই দাদার জন্যে। কোনও কিছু খেলে মনে হবে দেওয়াটা ঠিক হল না।' লোক দুটো সায়নকে নমস্কার করে চলে গেল।

মিসেস অ্যান্টনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কী হল!'

বিষ্ণুপ্রসাদ হাসল, 'এখানকার সবাই সায়নকে ভালবেসে ফেলেছে।'

মিসেস অ্যান্টনি খুশি হলেও জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

'সেদিন সামু গুরুং-এর সামনে দাঁড়িয়ে ও প্রতিবাদ করেছিল। এ কথা সবাই জেনে গিয়েছে। ওর অসুখ করেছিল তা সত্ত্বেও ও সাহস দেখিয়েছে বলে সবাই ওর প্রশংসা করছে।'

বিষ্ণুপ্রসাদ সায়নের কাঁধে হাত রাখল।

সায়ন বলল, 'সেদিন যদি লোকটা আমাকে একটা ঘুষি মারত তা হলে মরে যেতাম।'

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'তা হলে পুলিশও সামুকে বাঁচাতে পারত না। পাবলিক ওকে ওখানেই শেষ করে দিত। ঠিক আছে, আমি চলি।'

মিসেস অ্যান্টনি মাথা নাড়লেন।

ওরা দুজনে নিরাময় থেকে বেরিয়ে এল।

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'কী ব্যাপার বলো তো? তুমি এখন এমনভাবে হাঁটাচলা করছ যে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না তোমার শরীরে অসুখ আছে।'

সায়ন হাসল, 'আমি যতক্ষণ সেটা ফিল করছি না ততক্ষণ কেন স্বাভাবিক হব না? তুমি কোথায় যাচ্ছ এখন?'

'ঘুম।'

'কেন?'

'ওখানে আমার এক মাসি থাকে। ডেকে পাঠিয়েছে।'
'ঘুম খুব সুন্দর জায়গা, না?'
'খুব। বেশ ঠাণ্ডা। যাবে?'
'ডাক্তার আঙ্কলকে না বলে যেতে পারব না।' সায়ন কথাটা বলে কান খাড়া করল। একটা অদ্ভুত করুণ কান্না কানে এল। ওটা আসছে ওপর থেকে। সে ইশারা করে ওপরের দিকে হাঁটতে শুরু করল।
দূর থেকেই ওরা দেখতে পেল। মিস্টার ব্রাউনের বন্ধ লোহার গেটের এপাশে দাঁড়িয়ে ভুটো মুখ ওপরে তুলে কেঁদে যাচ্ছে!
বাড়িটার সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ। সমাধির কাজ মিটে গেলে মিস্টার ব্রাউনের ছেলে যোশেফ বাড়িটাকে তালাবন্দী করে শিলিগুড়িতে নেমে গিয়েছে। ভুটোকে নিয়ে গিয়েছিল সিমি। নিশ্চয়ই কুকুরটা ওদের বাড়ি থেকে পালিয়ে এখানে চলে এসেছে। এখন এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই কোনও মানুষ মিস্টার ব্রাউনের জন্যে কাঁদছে না। বেচারা ভুটোর দুর্ভাগ্য ও মানুষ নয়।
সায়ন ডাকল, 'ভুটো?'
ভুটো মুখ নামাল। তারপর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ছুটে এল সায়নের কাছে। এসে ওর প্যান্টের প্রান্ত কামড়ে ধরে টানতে লাগল ওপরের দিকে। সায়ন একটু ভয় পেয়েছিল। বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'ও কী করতে চায় দ্যাখো না।'
সায়ন এগোল। লোহার গেটের সামনে ভুটো টেনে নিয়ে গেল সায়নকে। তারপর একবার গেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। আর একবার সায়নের কাছে ছুটে এসে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল। লোহার গেটটায় হুড়কো লাগানো। সায়ন সেটা খুলে দিতেই কুকুরটা চাতালে চলে গেল। এবার তার গলায় স্বাভাবিক ডাক ফিরে এল। তারপর ছুটে গেল বন্ধ দরজার কাছে। সেখানে এসে স্বাভাবিকভাবে ডাকতে ডাকতে ওর স্বর করুণ হয়ে গেল।
বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'কুকুরটা পাগল হয়ে যাবে।'
সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কী করা যায়!'
বিষ্ণুপ্রসাদ মাথা নাড়ল। 'কিস্যু করার নেই।'
সায়ন এগিয়ে গেল। ভুটোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওর মাথায় হাত রাখল, 'ভুটো, কাঁদিস না।'
বলামাত্র ভুটো মুখ ফিরিয়ে তাকাল।
সায়ন উঠে দাঁড়াল, 'কাম অন ভুটো। আমাদের নিরাময়ে চল তুই।'
সায়ন গেটের দিকে এগোতেই ভুটোকে দেখা গেল তাকে অনুসরণ করতে। ওরা রাস্তায় পা রাখল, ভুটো সায়নের পেছনে চলে এল।
বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'এটা কীরকম হল?'
'কেন?'
'মিস্টার ব্রাউন নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতেন না। তা হলে তোমার বাংলা কথা ও বুঝতে পারল কী করে?'
সায়ন বলল, 'কথা বুঝতে পারেনি। ভালবাসা বুঝতে পেরেছে।'
ওরা নামছিল। নীচ থেকে দুজন প্রৌঢ়া নেপালি মহিলা উঠে আসছিলেন। সায়নদের দেখে দুজনেই দাঁড়িয়ে গেলেন।
বিষ্ণুপ্রসাদ নেপালিতে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবেন?'
সামান্য পাকা চুল যাঁর তিনি এগিয়ে এসে সায়নের হাত ধরলেন, 'আমি যিশুর কাছে প্রার্থনা করেছি তিনি তোমাকে অনেক বছর আয়ু দেবেন।'
'কেন?'
'তুমি আমাদের মনে বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছ।'
'কীভাবে?'
'সামু গুরুং-এর মতো গুণ্ডার সামনে তুমি যখন দাঁড়িয়েছিলে তখন ওর মুখে ভয়ের ছাপ ফুটেছিল। আমরা কেউ সাহস পাইনি। ওদের অত্যাচার আমরা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু

তোমাকে দেখে আমি বুঝলাম, প্রতিবাদ করা যায়।'

'আপনি একটু বেশি বলছেন মা। ডাক্তার তামাং সেদিন একাই ওদের মোকাবিলা করেছেন। উনি না থাকলে আমরা কিছুই করতে পারতাম না।'

'ডাক্তার তামাং খুব ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁকে সবাই চেনে। ওপরমহলে তাঁর প্রভাব আছে। সামুর সাহস হত না ওঁর গায়ে হাত দিতে। এটা উনি জানেন।'

'আপনি কোথায় থাকেন মা?'

'আমার বাড়িতে তুমি যাবে?' প্রৌঢ়ার মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'এই রাস্তাটার দু নম্বর বাঁকের গায়ে আমার বাড়ি। আমার স্বামীর নাম ডেভিড গুরুং। যে কেউ বলে দেবে।'

এরা যখন কথা বলছিল তখন আরও কিছু মানুষ যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সেখানে। সবাই সপ্রশংস চোখে সায়নকে দেখছে। সবার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলার পর ওরা যখন সরে এল তখন বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'এই ভালবাসাটাকে কাজে লাগাও। প্রত্যেকটা মানুষ ভেতরে ভেতরে একা, অসহায়। কিন্তু সবাই যদি একত্রিত হয় তাহলে অনেক ভাল কাজ হতে পারে। আচ্ছা চলি।'

বিষ্ণুপ্রসাদ চলে গেল ঘুম শহরে যাবে বলে।

সায়ন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আজ রোদ নেই। কুয়াশারা পাক খাচ্ছে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে। মাথার ওপর ময়লাটে মেঘ। সে পাথরটার ওপর গিয়ে বসতেই ভুটো চলে এল পাশে। শান্ত হয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

বিষ্ণুপ্রসাদ বলে গেল ভালবাসাটাকে কাজে লাগাও। ভালবাসা কী করে কাজে লাগানো যায়? সেটা তো ভালবাসাকেই অপমান করা। যত ভাল কাজই হোক, কারও নরম অনুভূতির সুযোগ নেওয়া। আর কাজে লাগিয়ে সে কী করতে পারে? তার তো কোনও কিছু করার ক্ষমতা নেই।

ভুটো শব্দ করল। সায়ন মুখ ফিরিয়ে দেখল কঙ্কাবতী এগিয়ে আসছে নিরাময়ের গেট পেরিয়ে। ওর গায়ে একটা পাতলা চাদর। কঙ্কাবতীর কথা বেশ কিছুদিন মনে ছিল না তার। এই যে এত বড় গোলমাল হল তখনও কঙ্কাবতীকে দেখতে পায়নি সে।

সায়ন গলা তুলে বলল, 'কেমন আছ?'

'ভাল। জানলা থেকে দেখলাম তুমি বসে আছ।'

সায়ন ওপরের দিকে তাকাল। কঙ্কাবতীর ঘরের জানলার কাচ ভেঙে গেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখনও ওই ঘরে আছ নাকি?'

মাথা নেড়ে না বলল কঙ্কাবতী।

'তাই বলো। ওখানে তো এখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে।'

'আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছ মানে! তোমার তো এখান থেকে স্কুলে যাওয়ার কথা।'

'ছিল। কিন্তু যা হয়ে গেল তাতে আর ডাক্তারবাবুকে আমি সাহায্য করতে বলতে পারি না। মানুষটা আমাদের উপকার করতে এসেছিলেন অথচ আমরাই তাঁকে চরম অপমান করছি। এর চেয়ে লজ্জার কী হতে পারে!'

'ওটা একটা সাময়িক ব্যপার। হয়তো তোমার স্কুলে যাওয়ার কথা ডাক্তার আঙ্কলের মনে নেই। আসলে সোমা নামের মেয়েটার বাড়াবাড়ি ওঁকে খুব চিন্তায় ফেলেছিল। তুমি চলে যেতে চাইছ শুনলে উনি দুঃখ পাবেন।'

'না। আমাকে যেতেই হবে।'

'কেন?'

'আমার মা আর একা থাকতে পারছে না।'

'ও। সেদিন আমি মিস্টার ব্রাউনকে তোমার মায়ের চাকরির জন্যে বলেছিলাম। উনি রাজি হয়েছিলেন কথা বলার জন্যে। কিন্তু তার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেসব নিশ্চয়ই শুনেছ?'

'আমাদের কপালে এর চেয়ে অন্য কিছু লেখা নেই।'

'তুমি বাড়িতে গিয়ে কী করবে?'

'কী করব জানি না। কিন্তু মায়ের পাশে থাকতে পারব।'

সায়ন উঠে দাঁড়াল, 'কঙ্কাবতী, তুমি আমাকে দুটো দিন সময় দেবে?'

'কেন?'

'আমি চাই না তুমি এখান থেকে চলে যাও।'

'কেন?' কঙ্কাবতী আবার প্রশ্ন করল।

'তুমি চলে গেলে আমরা সবাই হেরে যাব।'

'হেরে যাবে?'

'হ্যাঁ। আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।'

'বেশ।' কঙ্কাবতী আর দাঁড়াল না। যেভাবে এসেছিল সেভাবে ফিরে গেল। এই সময় ম্যাথুজকে দেখা গেল বাজারের ব্যাগ নিয়ে উঠে আসতে। ভুটো তাকে দেখে দুবার ডাকল।

ম্যাথুজ বলল, 'কেমন আছ সায়ন? তোমার কথা একটু আগে হচ্ছিল।'

'কী রকম?'

'ম্যাডাম বলছিলেন তুমি খুব ভাল ছেলে। এই কুকুরটা দেখছি এখানে চলে এসেছে! কী করে ফিরিয়ে নেওয়া যায়? আমি এখন বাজারে যাচ্ছি।'

'ও এখানে থাকলেই মনে হচ্ছে ভাল থাকবে।'

'এখানে মানে? তোমার কাছে?'

উত্তরটা দিতে গিয়ে আটকে গেল সায়ন। নিরাময়ে একটা কুকুরকে নিয়ে তোলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারল না। ডাক্তার আঙ্কলের সঙ্গে কথা না বলে সে উত্তরটা দিতে পারে না।

সায়নকে চুপ করে ভাবতে দেখে ম্যাথুজ বলল, 'আমার মনে হয় ডাক্তার সাহেব রাজি হবেন না। ওকে কোনও ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে কিনা জানি না। যদি কাউকে কামড়ে দেয়!'

কথাটা ঠিক। সায়ন বলল, 'ঠিক আছে, তুমি ওকে নিয়ে যাও। ও মিস্টার ব্রাউনের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।'

কিন্তু মুশকিল হয়ে গেল। ভুটো কিছুতেই যেতে রাজি হল না। বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ম্যাথুজ বাজারে চলে গেল। সায়ন নিরাময়ে ঢুকল। ভুটো চলে এল পেছন পেছন। বড় বাহাদুর কুকুর ঢুকছে দেখে মুখে শব্দ করে তাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু ভুটো তাতে বিচলিত হল না।

এই সময় ডাক্তার আঙ্কলকে গম্ভীরমুখে নেমে আসতে দেখল সায়ন। কুকুরটাকে দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কী!'

'মিস্টার ব্রাউনের কুকুর। ভুটো। ও বাড়ির লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। আমাকে দেখে চলে এল।'

'এখন কী করতে হবে?'

'ম্যাথুজ বাজারে গিয়েছে। ও এলিজাবেথের সঙ্গে কাজ করে। উপরে থাকে। যাওয়ার সময় ভুটোকে নিয়ে যাবে। ততক্ষণ—!' সায়ন শেষ করল না।

ডাক্তার আঙ্কল হাসলেন, 'মানুষ যখন নিরাময় ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন অন্তত কুকুরটা থাক। অনেক বেশি বিশ্বস্ত।'

'একটা কথা বলব?'

'ইয়েস!'

'আমি একটু বাজারে যেতে পারি?'

'বাজারে? কেন?'

'একটু দরকার ছিল।'

'বাঃ, তুমি দেখছি বেশ সুস্থ হয়ে গেছ। ও কে।'

মিসেস অ্যান্টনিকে কথা দিতে হল, সে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে লাঞ্চ খাবে। কোনওরকম পরিশ্রম করবে না। তেমন বুঝলে ফিরে আসবে।

নিরাময় থেকে বেরিয়ে ঢালু পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। রাস্তাটা সুন্দর। ঢালু বলে পরিশ্রম হচ্ছে না,

শুধু হাঁটার সময় ব্যালান্স রাখতে হচ্ছে। সায়ন নেমে এল পিচের রাস্তায়। এক পাশ দিয়ে ট্রেন লাইন চলে গেছে দার্জিলিংয়ের দিকে, অন্য পাশে বিশাল খাদ, খাদের তলায় সরু নদী। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। সায়ন হাঁটতে লাগল। রাস্তাটা নেমে গিয়েছে বাজারের দিকে। তাই হাঁটতে ভাল লাগছিল।

মাঝে মাঝে গাড়ি যাচ্ছে, দু একজন মানুষ ছাড়া রাস্তাটাকে নির্জনই বলা যায়। কতদিন বাদে সে এইভাবে হেঁটে চলেছে। বাঁক ঘোরার আগেই জলের শব্দ পেল সায়ন। বেশ জোরে জল পড়ছে। বাক ঘুরতেই ঝোরাটাকে দেখতে পেল। বাঁ দিকের পাহাড় থেকে জল পড়ছে নীচের পাথরে। নেমে যাচ্ছে খাদের দিকে। খুব শীতল জায়গাটা। সে মুখ ফেরাল। খানিকটা উঁচুতে মেরির মূর্তি স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে। ওই মূর্তির কাছে সে অসুস্থ অবস্থায় উঠেছিল। সেদিন মা ছিল নীচে। গাড়ির ভিড় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওরা তার মধ্যে ঠিক কী দেখেছিল সায়নের জানা নেই। সেই একই জিনিস কি মৃত্যুর আগে মিস্টার ব্রাউন দেখে গিয়েছেন? কী আছে তার মধ্যে যা সে নিজেই জানে না!

ট্যুরিস্ট লজের পাশ দিয়ে সে যখন বাজারের কাছে চলে এসেছে তখন একজন বৃদ্ধ তাকে দেখে চিৎকার করে ছুটে এল। এসে তার হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এত দ্রুত কথা বলে যেতে লাগল যে তার নেপালির অনেকটা সায়ন বুঝতে পারছিল না। লোকটাকে দেখে অনেকেই এসে ভিড় জমাল তাকে ঘিরে।

এর মধ্যে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি খ্রিস্টান?'

মাথা নাড়ল সায়ন, 'না।'

'তা হলে তুমি যিশুকে, মেরিকে দেখতে পাও কী করে?'

'কে বলল, আমি তাঁদের দেখতে পাই?'

'আমরা সবাই জেনে গেছি। নইলে তোমার মতো এত রোগা মানুষ যে চিকিৎসার জন্যে এখানে এসেছে সে কোন সাহসে সামু গুরুংয়ের মোকাবিলা করতে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়!' লোকটা প্রশ্ন করল।

সায়ন বলল, 'একটা চড়াই পাখিও একসময় মরিয়া হয়, হয় না?'

'মরিয়া হয়ে একটা বাজপাখির সামনে দাঁড়িয়ে কী করবে?'

'বাজপাখিটা থমকাবে। দুবার ভাববে।'

'তারপর?'

'সেইসময় সব চড়াই যদি একসঙ্গে মরিয়া হয়ে ওঠে তখন বাজপাখিটা ঠিক পালিয়ে যাবে। আমি তাই চেয়েছিলাম।' সায়ন হাসল, 'আমি ডাক্তার তামাং-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কোথায় পাব তাঁকে?'

'ডাক্তার তামাং এখন আর চেম্বারে আসছেন না।'

'কেন?'

'জানি না। চেম্বারের দরজা বন্ধ। শুনেছি বাড়িতেই আছেন কিন্তু কোনও পেশেন্ট দেখছেন না।'

'ওঁর বাড়িটা কোথায়?'

ওরা ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। সায়ন দেখল ভিড়টা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। লোকজন তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেই সঙ্গ নিচ্ছে।

ডাক্তার তামাংয়ের বাড়িটা বাজার থেকে একটু ওপরে। একেবারে সাদামাটা বাড়ি। লোকটা বলল, 'ওই দরজা।'

সায়ন বলল, 'এত লোক এখানে—!'

'সবাই আপনাকে দেখতে চায়।'

'কেন?'

'ওই যে বললাম, সবাই আপনার কথা শুনেছে।'

'ওঁদের একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি কেউ নই, একেবারে সাধারণ মানুষ। ওঁরা যে যাঁর কাজে যেন চলে যান।'

লোকটা চিৎকার করে নীচে জনতার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল। তাতে কোনও কাজ হল

না।

অগত্যা সায়ন সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে বেলের বোতাম টিপল। তিনবারের মাথায় দরজা খুললেন ডাক্তার তামাং। তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি খুব নেশা করেছেন। বিরক্ত হয়ে কথা বলতে গিয়ে সায়ন এবং নীচের জনতাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার! তুমি এখানে এসেছ?'

'আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে ডক্টর,' সায়ন বলল।

'কাম ইনসাইড, ইউ অ্যালোন।'

সায়ন ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিলেন ডাক্তার তামাং, 'তুমি ওই পাহাড় থেকে কীভাবে এখানে এসেছ?'

'কেন? হেঁটে। বেশি দূর তো নয়।'

'ইউ কান্ট ডু ইট। ডাক্তার তোমাকে এভাবে হেঁটে আসতে অ্যালাউ করল?'

'এটা কোনও সমস্যা নয় ডক্টর তামাং।' গম্ভীর মুখে বলল সায়ন।

'আচ্ছা।' টলোমলো পায়ে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন ডাক্তার তামাং। সায়ন অনুসরণ করল। এ বাড়িতে আর কোনও মানুষ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে ডাক্তার তামাং গ্লাসে মদ ঢাললেন। মিস্টার ব্রাউন যে ধরনের দিশি মদ খেতেন এটা সে শ্রেণীর নয়। বোতলটির চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে বেশ দামি।

'হোয়াট ইজ ইওর প্রব্লেম?'

সায়ন লক্ষ করছিল আজ ডাক্তার তামাং বেশি ইংরেজি বলছেন। সে বলল, 'এখন আপনার সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হবে?'

'হোয়াই নট? আমাকে ড্রাঙ্ক মনে হচ্ছে?' গ্লাস মুখে তুললেন তিনি।

'আপনি স্বাভাবিক নন।'

'ঠিক। বিলকুল ঠিক। আমি রোজ মদ খেয়েছি কিন্তু নেশাকে বাড়তে দিইনি। এখন দিচ্ছি। মাঝে মাঝে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।'

'আপনি চেম্বারে যাচ্ছেন না?'

'আমার ইচ্ছে তাই যাচ্ছি না। কাউকে জবাবদিহি দেব না। এই শহরে অনেক ডাক্তার আছে, আমি একা নই।'

'আপনার কী হয়েছে, ডক্টর তামাং?'

'আমি নিজেকে আর মানুষ বলে মনে করছি না। আমার চারপাশে যাদের এতকাল মানুষ বলে চিকিৎসা করে এসেছি তারা কেউ মানুষ নয়। সব অমানুষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এখন তাই মনে করছি।'

'তা হলে তো আপনার সঙ্গে কথা বলা যায় না।'

'যায় না? বোলো না। ও হো, তুমি তো যিশুর আশীর্বাদধন্য। অ্যাঁ! মিস্টার ব্রাউন পর্যন্ত সেই বিশ্বাস নিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। অবশ্য তুমি বলেছ এসব কিছু জানো না। কী জানি। আমি ওইসব বুজরুকি বিশ্বাস করি না। মেয়েটা কেমন আছে?'

সায়ন অনুমান করল ডাক্তার তামাং সোমার কথা বলছেন। সে জবাব দিল, 'একটু ভাল, তবে বিপদ কাটেনি। কিন্তু ওর বাবা ওকে বলেছেন ওকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাবেন।'

'কেন?' চোখ বড় করলেন ডাক্তার তামাং।

'ওঁর বিশ্বাস সোমা সারবে না।'

টলতে টলতে এগিয়ে এলেন ডাক্তার তামাং, 'দ্যাখো, আমি ঠিক বলিনি? আমাদের চারপাশে কীরকম অমানুষের ভিড়। একটা মানুষ সব কিছু ত্যাগ করে লিউকোমিয়া রোগের সঙ্গে লড়াই করতে চাইলেন আর আমরা তার অস্ত্রগুলো একের পর এক কেড়ে নিচ্ছি।'

'আপনি এই কথা বলছেন?'

'ইয়েস। আমি একসময় ওঁর বিরুদ্ধে কথা বলেছি। ডাক্তার হিসেবে উনি বড় কি না জানি না মানুষ হিসেবে আমার চেয়ে অনেক বড় এ কথা মেনে নিতে মন চায়নি। তাই—!' চোখ বন্ধ করলেন

ডাক্তার তামাং, 'তুমি কোন দরকারে আমার কাছে এসেছিলে?'

'আপনি কঙ্কাবতীকে চেনেন?'

'কে কঙ্কাবতী?'

'যে নেপালি মেয়েটিকে আপনার কথায় ডাক্তার আঙ্কল নিরাময়ে চিকিৎসা করছেন তার নাম কঙ্কাবতী।'

'ওহো। হ্যাঁ। ওকে তো আমিই পাঠিয়েছিলাম। সে কেমন আছে?'

'ওর শরীর এখন আগের থেকে ভাল। কিন্তু ওর মায়ের চাকরি গিয়েছে। বেচারা একটা স্কুলে আয়ার কাজ করত। কিন্তু পার্টির এক নেতার হুকুম মানতে পারেনি বলে ওর চাকরি গিয়েছে। এখন কোনও রোজগার নেই। তাই কঙ্কাবতী চাইছে মায়ের কাছে ফিরে যেতে।'

'মায়ের কাছে ফিরে গেলে তার মায়ের রোজগার বেড়ে যাবে?'

'না। কিন্তু তার মা নাকি একা থাকতে ভয় পাচ্ছে।'

'কেন?'

'আমি জানি না।'

'অ। আমাকে কী করতে হবে?'

'আমি সেদিন মিস্টার ব্রাউনকে বলেছিলাম কঙ্কাবতীর মায়ের জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে। উনি রাজি হয়েছিলেন—!'

'চাকরি? আমি চাকরি কোথায় পাব?'

'আমার মনে হয়েছিল আপনি পারবেন।'

'মনে হয়েছিল?'

চোখ বন্ধ করলেন ডাক্তার তামাং, 'তোমার এ কথা কেন মনে হয়নি এখানকার পার্টির নেতাদের অমান্য করে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না!'

'আমি এ কথা বিশ্বাস করি না।'

'করো না?'

'যারা অন্যায় করে তাদের মানুষ বেশিদিন মেনে নেয় না। একটা সময় আসবেই যখন অন্যায়কারী হাত গুটিয়ে নেবে। সাধারণ মানুষ তাদের বাধ্য করবে সেটা গোটাতে।' সায়ন দৃঢ় গলায় বলল।

ডাক্তার তামাং অবাক হয়ে বললেন, 'তাই তুমি এত লোককে সঙ্গে নিয়ে এসেছ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে?'

'আমি কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসিনি। আমার সম্পর্কে যেসব ভুল গল্প এখানে প্রচারিত হয়েছে ওরা সেসব শুনে এসেছে।'

'আমি কী করে চাকরি দেব সায়ন?'

'আপনার সঙ্গে চেয়ারম্যানের পরিচয় আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ আছে।'

'তাঁকে বললে হয় না?'

'এত সামান্য বিষয় নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করা যায় না।'

'আপনি তো সামু গুরুংয়ের ব্যাপারটা নিয়ে ওঁর কাছে যেতে পারেন? তাই না?' সায়ন বলল।

'ওয়েল, ভেবে দেখি।'

'আপনি আবার প্র্যাকটিস শুরু করুন।'

'কেন?'

'এতে মানুষের উপকার হবে।'

'তাতে আমার কী লাভ? ওই মানুষগুলোই তো সামুদের কথায় উত্তেজিত হয়ে নিরাময়ের কাচ ভাঙবে। তাই না?'

'আবার আপনার কথা শুনে তারাই সামুদের গাড়ি ভাঙবে।'

অবাক হয়ে তাকালেন ডাক্তার তামাং। তারপর চেয়ারে বসে পড়লেন, 'টেল হার টু সি মি টুমরো

মর্নিং।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'তুমি এখন কোথায় যাবে?'

'নিরাময়ে ফিরে যাব।'

'যাবে কী করে?'

'হেঁটে।'

'ওই জনতাকে সঙ্গে নিয়ে? পাগল।'

'কিন্তু আমার আর দেরি করা ঠিক নয়।'

উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার তামাং, 'ফলো মি।'

ভেতরের ঘরের দিকে যেতে গিয়ে দুবার ধাক্কা খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলেন ডাক্তার তামাং। সায়ন দেখল বাড়িতে আর কেউ নেই। পেছনের ঘরের দরজা খুলে নীচে নামতে ডাক্তার তামাংয়ের গাড়িটা দেখা গেল। হেসে বললেন, 'গোলমালের দিন গাড়ি নিয়ে যাইনি বলে এ ব্যাটা বেঁচে গেছে। উঠে পড়ো।'

'আপনি চালাবেন?'

'তুমি কি চালাতে জানো?'

'কিন্তু এই অবস্থায় আপনি চালাবেন কী করে?'

'ভূমিকম্পের সময় প্রাণীরা যেভাবে দৌড়ে যায়, উঠে পড়ো।' ওরা উঠল। জনতা এদিকে নেই। কেউ ভাবেওনি পেছনের পথ দিয়ে ওরা বেরিয়ে যেতে পারে। পাহাড়ের বাড়িগুলোর সামনে পেছনে অনেক ক্ষেত্রে রাস্তা থাকে। ইঞ্জিন চালু হল। ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে গাড়ি বের করতে গিয়ে একটা ড্রামের সঙ্গে অকারণ ধাক্কা লাগল। ডাক্তার তামাংয়ের হাত কাঁপছে। ওই অবস্থায় বেশ জোরেই রাস্তায় উঠে এলেন গাড়ি নিয়ে।

তীব্র শব্দে হর্ন বাজাচ্ছেন, গতিও বেশ। রাস্তার এপাশ ওপাশ ছুঁয়ে গাড়ি চলছে। মানুষজন ভয় পেয়ে সরে যাচ্ছে। সায়ন চিৎকার করল, 'একটু আস্তে চালান ডাক্তার তামাং।'

'ভয় পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ।' হঠাৎ গতি কমে গেল। শান্ত হয়ে গাড়ি উঠতে লাগল ওপরে। কে বলবে একটু আগে ওরকম টালমাটাল ছুটছিল। ডাক্তার তামাং বললেন, 'এখন পোষ মেনে গেছে। মাতালের হাতে স্টিয়ারিং সেট হয়ে গেলে আর কোনও ভয় নেই।'

মেরির মূর্তির পাশ দিয়ে গাড়ি উঠে আসছিল। ডাক্তার তামাং বললেন, 'এই রাস্তায় নেমে যাওয়া সোজা কিন্তু হেঁটে উঠলে তোমার খুব কষ্ট হত। বুঝলে?'

বুঝতে পারছিল সায়ন।

'আচ্ছা, তুমি হঠাৎ কঙ্কাবতীর মায়ের জন্যে আমাকে বলতে এত দূরে গেলে কেন? তোমার কী ইন্টারেস্ট?'

'মেয়েটার আর পড়াশুনা হবে না ও যদি চলে যায়।'

'আর?'

'চিকিৎসাও হবে না।'

'হুঁ।'

বড় রাস্তা ছেড়ে ওপরে উঠতেই দেখা গেল একটা ট্যাক্সি রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার তামাং হর্ন বাজালেন। ড্রাইভার হাত দেখাল। নেপালিতে বলল, 'একজন প্যাসেঞ্জার নিরাময়ে যাবে, দয়া করে নিয়ে যাবেন? আমার ইঞ্জিন গোলমাল করছে।'

'আসতে বলো।'

ট্যাক্সির ভেতর থেকে যে বের হল তাকে দেখে সায়ন অবাক। সে চিৎকার করে উঠল, 'আরে সদুদা? তুমি?'

ব্যাগ হাতে সদানন্দ হাসল, 'আরে! তুই ভাল আছিস?'

'খারাপ থাকব কেন?'

'গুড। আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি। কাকিমা অনেক করে বললেন।' গাড়িতে উঠে পড়ল সদানন্দ। তারপর বলল, 'আমাদের পারিদের বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। নতুন বাড়ি বানাচ্ছে প্রমোটার। জানিস তো?'

৩১

নিরাময়ের সামনে গাড়ি থামিয়ে ডাক্তার তামাং হাসলেন, 'ইয়েস মাই বয়, কিছু বলবে এবার? খারাপ চালালাম।'

ওঁর গলার স্বর তখনও জড়ানো। সদানন্দ পেছনে বসেছিল, চোখ বড় করে শুনল। উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে ডাক্তার তামাং ইশারা করলেন নেমে যেতে।

ওরা নামতেই ভদ্রলোক বিপদজ্জনকভাবে গাড়ি ঘুরিয়ে নীচে নেমে গেলেন। সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা যে মাতাল। এখনই অ্যাকসিডেন্ট করবে। কোত্থেকে এলি তুই?'

সায়ন বলল, 'না, অ্যাকসিডেন্ট করবেন না। এসো, ভেতরে এসো।'

মিসেস অ্যান্টনি গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্যাসেজে। বললেন, 'তোমার লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে সায়ন। ডাক্তারবাবু শুনলে খুশি হবেন না।'

সায়ন সদানন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় উঠেছ তুমি? ট্যুরিস্ট লজে?'

'দূর! ওখানে যা চার্জ তা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি একটা ছোট হোটেলে জিনিসপত্র রেখেছি। তুই যা খেয়ে নে।'

'তুমি খেয়েছ?'

'আমার স্নান-খাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

দোতলায় উঠে নিজের ঘরের দিকে যেতে থমকে গেল সায়ন। দূরে কঙ্কাবতী দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে আছে। সে ওর কাছে গেল, 'শোনো, তোমার মা আজ বিকেলে আসবেন?'

'কেন?' কঙ্কাবতী তাকাল।

'আগে বলো আসবেন কি না নইলে খবর পাঠাতে হবে।'

'মা তো রোজ বিকেলে আসে।'

'বেশ। তা হলে ওঁকে বলবে কাল সকালে যেন ডাক্তার তামাংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। চেম্বারে না, বাড়িতে। বুঝলে?'

'কেন?'

'ডাক্তার তামাংয়ের সঙ্গে ওঁর চাকরির ব্যাপারে কথা হয়েছে।'

'উনি এসেছিলেন?'

'না। আমি গিয়েছিলাম।'

'সে কী? সে তো অনেক দূর। কার সঙ্গে গেলে?'

'কার সঙ্গে আবার। হেঁটেই গিয়েছিলাম।' হেসে ফিরে গেল সায়ন। ও বুঝতে পারছিল কঙ্কাবতী অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ঘরে ঢুকে আয়নায় নিজেকে দেখল সে। এই কদিন সে যেভাবে হাঁটাহাঁটি করেছে মাসখানেক আগেও তা করার কথা ভাবতে পারত না। তার শরীরের রক্তে মৃত্যুকণা ছড়িয়ে আছে। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু এখনও তার শরীর খারাপ লাগছে না। যতক্ষণ না করে ততক্ষণ অসুখের কথা চিন্তা করে লাভ কী।

নিরাময়ের বাইরে দাঁড়িয়ে সদানন্দ সিগারেট খাচ্ছিল। সায়নকে দেখে বলল, 'ফ্যান্টাস্টিক জায়গা। তবে দু-চারদিন থাকা যায় তার বেশি হলে মরে যাব।'

'কেন ?' সায়ন ওর বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল।

'আড্ডা মারার লোক নেই, সিনেমা থিয়েটার নেই, আমি মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারি না। তা আজ যেতে পারবি ? তুই তো ফিট হয়ে গেছিস।'

'আজ কী করে যাব ? ডাক্তার আঙ্কলকে বলতে হবে। উনি পরীক্ষা করে দেখে তবে অনুমতি দেবেন।'

'তোকে দেখে মনেই হচ্ছে না কোনও অসুখ আছে। এর আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন দেখেছিলাম তোর মুখচোখ কেমন ফ্যাকাশে। এখন সেই ভাবটা নেই। দ্যাখ না বলে, যদি ছেড়ে দেয়।'

'তোমার ফেরার টিকিট কাটা আছে ?'

'দুর ! পয়সা দিলে সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।'

'ওইভাবে আমি যাব না।'

'দুর বোকা। তুই চাইলেই বিশ-পঁচিশ দিনের মধ্যে রিজার্ভেশন পাবি নাকি ? সব ফুল। ও শালা কম্প্যুটার হওয়ার পর আরও বেশি ফুল হচ্ছে। এই দ্যাখ না আসার আগের দিন টিকিট কাটতে গিয়ে শুনলাম একশো বাইশ নম্বর ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হবে। পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে ট্রেনে উঠে দেখলাম ওয়ান থার্ড বার্থ খালি পড়ে আছে। বোঝ ?'

মাথা নাড়ল সায়ন, 'বললাম তো ওইভাবে টাকা দিয়ে আমি যাব না। তার চেয়ে আনরিজার্ভ কম্পার্টমেন্টে চলো, রাজি আছি।'

'তোকে পাগলা মশায় কামড়েছে। ওখানে কেউ উঠতে পারে ? সারারাত সোজা হয়ে বসে থাকতে হবে যদি বসার জায়গা পাস। তুই কেন, আমারই শরীর খারাপ হয়ে যাবে। তোর কি আদর্শে লাগছে ?'

'অত বড় কথা আমি জানি না। আমি ওভাবে যাব না।'

'শোন,' সিগারেটের শেষটুকু ছুড়ে ফেলল সদানন্দ, 'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয় নইলে ব্যাকডেটেড হয়ে পস্তাতে হবে। পঞ্চাশ সালে রায়বাড়ির যা নিয়ম ছিল তা এখন নেই। তখন আমাকে গাড়ির ব্যবসা করতে দেখলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। বড়মায়ের নাতি তার বউকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে পারত না। কিন্তু এখন সেটা সম্ভব হয়েছে। অন্ধদের দেশে যে চোখ খুলে চলবে সে অসহায় হয়ে পড়বে। তার চেয়ে চোখ বন্ধ করে অন্ধ সেজে থাকলে অনেক স্বস্তি। এখন কেউ ঘুষ বল বা বকশিস বল, না পেলে কোনও কাজ করে না। ওটা যাতে পাবলিককে দিতে হয় তাই সর্বত্র গেঁড়াকলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষও অভ্যস্ত হয়ে গেছে এই সিস্টেমে। বুঝলি ?'

'আমি তো অভ্যস্ত হইনি।'

'যাচ্চলে ! তুই হঠাৎ এরকম কথা বলতে শুরু করলি ? তোর মধ্যে দেখছি বেশ চেঞ্জ এসেছে। সানু, তুই বড় হয়ে গেছিস।'

'আর কতকাল ছোট থাকব বলো।' সায়ন বলল, 'ডাক্তার আঙ্কলকে বললে উনি চেষ্টা করতে পারেন। ওঁর অনেক জানাশোনা আছে।'

'ও। তাহলে তো কথাই নেই।'

'মা ভাল আছে ?'

'হ্যাঁ। সবাই এখন বেশ উত্তেজিত।'

'কেন ?'

'ওই পুরনো ভাঙা বাড়িতে আর থাকতে হবে না। আরে যতই বিশাল রায়বাড়িকে দেখতে লাগুক ভেতরটা তো ঝাঁঝরা। সেই আদ্যিকালের ব্যবস্থা এখন আর চলে না। বাইরের লোক এসে বাথরুমে যেতে চাইলে খারাপ লাগে। কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে আজকাল চৌবাচ্চা থাকে না।'

'আমরা কোথায় যাব ?'

'তোকে তোর মা লেখেনি ? প্রমোটারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে দায়িত্ব। যেখানে পরীরা ছিল সেখানে এর মধ্যেই প্ল্যান স্যাংশন করিয়ে মাটি খোঁড়া শুরু হয়ে গেছে। ওঃ, তা নিয়ে কী ঝামেলা। এ পার্টি সকালে বোম ফেলে তো ও পার্টি বিকেলে।'

'বোম ফেলেছে ? আমাদের বাড়িতে ?'

'অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটা এখন রেওয়াজ। কেউ বাড়ি বানাতে ইট ফেললেই বোম পড়ছে। পার্টির ছেলেদের কাছ থেকে ইট বালি সিমেন্ট নিতে হবে। তার জন্যে অ্যাডভান্স দিতে হবে তাদের। তিন চারটে দল একই ডিম্যান্ড করে। না দিলে টাকা দাও। তুমি বাড়ি বানাবে আর আমরা চেয়ে চেয়ে দেখব ? আমরা হলে পাগল হয়ে যেতাম। প্রমোটাররা জানে কী করতে হবে।'

'কী করে ওরা ?'

'যারা বোম ফেলে তাদের দাদাদের টাইট দেয়। একজন প্রমোটারকে লাভের হিসেব করতে হয় পার্টির দাদা থেকে ছোট ভাই, লোকাল থানার জন্যে বাজেট রেখে। দাদারা ভাইদের পাইয়ে দেয় নইলে পার্টি থাকবে না। দাদারাও তাদের অংশ নিয়ে চুপ করে যায়। যতদিন উদ্বোধনী না হবে পুলিশ পাহারা দেবে যাতে নতুন কোনও পার্টি হামলা না করে।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কী। বলছে তো বছরখানেকের মধ্যে বাড়ি কমপ্লিট হয়ে যাবে। তখন আমরা ওখানে উঠে যাব। কে কোন ফ্ল্যাট পাবে তা লটারি করে ঠিক হবে। মা সিংহবাহিনীর জন্যে নীচে হলঘর হচ্ছে।'

'এতে প্রমোটারের কী লাভ হচ্ছে ?'

'বাঃ! বাকি জমিটা। অত বিশাল ফাঁকা জমিতে অন্তত তিন তিনটে পাঁচতলা বিল্ডিং তুলবে লোকটা। মালে মালাকার হয়ে যাবে ও। আমাদের বাড়িটা ভেঙে কত কী পাবে।'

'সবাই রাজি হয়েছে ?'

'হবে না! ফ্ল্যাট প্লাস মাল পাবে। বাকি জীবনটা ওই দিয়ে কোনওমতে চালিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখছে সবাই।'

'পাঁড়েজি ? পাঁড়েজি কোথায় যাবে ?'

'যাঃ বাবা। এত লোক থাকতে ওর কথা মনে পড়ল ?'

'বাঃ ও তো বাবার জন্মের আগে থেকে রায়বাড়িতে আছে।'

'থাকবে কোথাও। ওকে নিয়ে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি! যা, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আয়। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।' সদানন্দ বলল।

'ভেতরে গিয়ে ভিজিটার্স রুমে বসবে চলো।'

'না রে। ওখানে গেলে ওষুধ ওষুধ গন্ধ নাকে আসে, শরীর খারাপ হয়ে যায়।'

ডাক্তার আঙ্কল অফিসঘরে ছিলেন। ওকে দরজায় দেখে বললেন, 'কী ব্যাপার ? শরীর কেমন লাগছে ?'

'ভাল।'

'বাজার অবধি হেঁটে গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'শুনলাম তোমাকে নিয়ে নাকি খুব হইচই হয়েছে ?'

'লোকে ভিড় করেছিল।'

'তুমি কি ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিতে চাও ?'

'না।'

'গুড। বোসো।'

সায়ন বসল, 'কলকাতা থেকে আমার এক দুঃসম্পর্কের দাদা এসেছেন। মা পাঠিয়েছেন ওঁকে। আমার যাওয়ার কথা ছিল—।'

'ও। হ্যাঁ। তাই তো। কবে যাবে ?'

'দাদা আজই ফিরতে চাইছেন।'

'আজই ?'

'হ্যাঁ। আমি বলেছি আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

'বেশ তো। তুমি যদি যেতে চাও তো যাও। তোমার তো কিছুদিনের জন্যে যাওয়ার কথা ছিল। এখন তোমার শরীর বেশ ভাল।' ডাক্তার উঠে একটা রেজিস্টার বের করলেন, 'সাধারণত পঁচিশ থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে তুমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়তে। সময়টা এসে গেছে কিন্তু তোমার মধ্যে কোনও অসুস্থতার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। আমি একবার ব্লাডটা দেখে নিচ্ছি। যদি ঠিক থাকে যেতে পারো। আর যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড় তাহলে কী কী করতে হবে তা তুমি জানো।'

'কিন্তু আমার একটা অসুবিধে হচ্ছে।'

'কী রকম ?'

'উনি ফেরার টিকিট করেননি। বলছেন, এক্সট্রা টাকা দিয়ে বার্থ নিয়ে নেবেন। ওভাবে আমি যাব না।'

ডাক্তার হাসলেন, 'তা হলে ?'

'আপনি যদি টিকিটের ব্যবস্থা করে দেন তা হলেই যাওয়া সম্ভব।'

'দ্যাখো, আজকের টিকিট এখানে পাওয়া যাবে না। আমি একটা চিঠি লিখে দিতে পারি নিউ জলপাইগুড়ির এরিয়া অফিসারকে। তাঁর হাতে যদি ভি আই পি কোটায় বার্থ থেকে থাকে তা হলে পেতে পারো। কিন্তু একটা ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। ওটা ফুল হয়ে গেলে বিপদে পড়বে।'

'তা হলে ?'

'তোমরা কাল বা পরশু যেতে পারো।'

'ঠিক আছে।'

ডাক্তার আঙ্কল ভেতরে গিয়ে সায়নের রক্ত নিলেন পরীক্ষা করার জন্যে। এখন এসবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে সায়ন। সে বাইরে বেরিয়ে এল।

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলল ?'

'আজ যাওয়া যাবে না। কাল বা পরশু চলো।'

'কেন খামোকা আমাকে বসিয়ে রাখবি।'

'তা হলে তুমি চলে যাও। আমি একা যেতে পারব।'

'তুই একা যাবি ? পাগল ? তোর মা আমাকে আস্ত রাখবে না।'

'আমি এখন অনেকটা সুস্থ এবং বাচ্চা নই। তোমার থাকতে যখন অসুবিধে হচ্ছে তখন তুমি চলে যাও।'

সদানন্দ চিন্তায় পড়ল, 'তা হয় না। ঠিক আছে, কালই যাব।'

এই সময় একটা মারুতি ভ্যান নীচ থেকে উঠে এল। সায়ন দেখল ভ্যানটা নিরাময়ের সামনে থামল। দুজন নেপালি ভদ্রলোক ভ্যান থেকে নেমে সোজা গেট পেরিয়ে ভেতরে চলে গেল।

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তোদের এখানে ঝামেলা হয়েছিল ?'

'কেন ?'

'জানলার কাচগুলো সব ভাঙা দেখছি। পাথর পড়ে আছে।'

'হ্যাঁ।'

'নেপালিরা ঝামেলা করেছিল ?'

'নেপালিরা করেনি। যেমন কলকাতার সব বাঙালি আমাদের বাড়ির সামনে গিয়ে বোম ফেলেনি। কয়েকজন রাজনৈতিক উঠতি নেতা কাজটা করেছে।'

সদানন্দ বলল, 'এখানে আর বাঙালিরা থাকতে পারবে না। অথচ শিলিগুড়ি থেকে ওপরে আসার রাস্তাগুলো বন্ধ করে দিলে এরা খেতে পাবে না। জানিস ?'

'জানি না। তবে কলকাতার সব জায়গায় বাঙালিরা থাকতে পারে ?'

'মানে ?'

'বড়বাজারে গেলে একজন সাধারণ বাঙালি বাড়ি ভাড়া পাবে ? আমি কোথায় যেন পড়ছিলাম রাসবিহারী অ্যাভিনিউর আশেপাশে বাঙালি বাড়িওয়ালা সাউথ ইন্ডিয়ান ভাড়াটে বেশি পছন্দ করে, বাঙালিকে নয়। মিথ্যে কথা ?'

সদানন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। এই সময় ছোটবাহাদুর বেরিয়ে এসে ডাকল, 'সায়নবাবু, ডাকদার সাহাব ডাকছেন।'

সায়ন ভেতরে চলে এল।

অফিসঘরে ডাক্তার আঙ্কলের সামনে ভদ্রলোক দুজন বসে আছেন। ওকে দেখামাত্রই ওঁরা উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্যে। সায়ন এসবে অভ্যস্ত নয়। সে বেশ হকচকিয়ে হাত স্পর্শ করল।

ডাক্তার আঙ্কল বললেন, 'বোসো।'

সায়ন বসলে তিনি বললেন, 'এঁরা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান বলে ডেকে আনলাম। ইনি মিস্টার সুব্বা আর ইনি মিস্টার প্রধান।'

'কী ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না।'

মিস্টার প্রধান বললেন, 'আপনাদের ওপর যে বর্বর আক্রমণ করা হয়েছে তার জন্যে আমরা লজ্জিত। আমরা শুনেছি আপনি এর প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন। আগামীকাল এর প্রতিবাদে আমরা হরতাল ডাকতে চাই।'

'কেন ?'

'আমরা প্রতিবাদ জানাতে চাই।' মিস্টার সুব্বা বললেন।

'তাতে কী লাভ হবে ? বরং ক্ষতি হবে অনেক। সাধারণ মানুষ কাজ করতে পারবেন না বলে রোজগার বন্ধ হবে, গাড়ি না চললে অনেক ক্ষতি হবে।'

'তা হবে। কিন্তু প্রতিবাদ জানানো তো উচিত।'

'একদিন হরতাল করলে যারা অন্যায় করেছিল তারা নিজেদের শুধরে ফেলবে বলে আমার মনে হয় না।' সায়ন বলল।

ডাক্তার আঙ্কল মাথা নাড়লেন, 'সায়ন ঠিক বলছে।'

সায়ন বলল, 'এর চেয়ে আপনারা যদি ওদের বোঝান তা হলে বেশি কাজ হবে। আপনাদের কিছু ছেলে অন্যায় করেছে বলে সাধারণ মানুষকে শাস্তি দেবেন কেন ?'

মিস্টার প্রধান বললেন, 'ওরা আমাদের ছেলে নয়। এই পাহাড়ে আমরা আন্দোলন শুরু করেছিলাম চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে। এখন তো ওঁর কথাবার্তায় কোনও মিল নেই। কিছুদিন আগেও উনি ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্টকে উপেক্ষা করে সেন্টারের সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলেন। যেই বি জে পি পাওয়ারে এল অমনি তিনি ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্টের সঙ্গে দোস্তি করছেন। লাস্ট ইলেকশনে উনি সাবোটাজ করেছেন বলে আমাদের কোনও ক্যান্ডিডেট দিল্লিতে গেল না। ধীরে ধীরে পাবলিক ওঁর পাশ থেকে সরে যাচ্ছে। উনি এখন আমাদের ইস্যুটা ইন্টারন্যাশন্যাল কোর্টে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। পাবলিককে বোঝাবার চেষ্টা করছেন ওদের জন্যে লড়ে যাচ্ছেন কিন্তু মামলা করা মানে দীর্ঘকালের জন্যে ইস্যুটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া এটা সাধারণ মানুষ বুঝে গেছে। আর এই কারণেই নীচেরতলার ক্যাডাররা ওঁর কথা শুনছে না। যে যার ধান্দা মেটাতে ক্ষমতাকে এক্সপ্লয়েট করছে। এর প্রতিবাদ করা দরকার।'

সায়ন কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি এখন এক দলের সদস্য নন ?'

'না। আমাদের সংগঠন এখন আলাদা।'

ডাক্তার আঙ্কল বললেন, 'মিস্টার প্রধান, একটু আগেও আমি আপনাকে বলেছি এসবের মধ্যে আমি নেই। কোনওরকম রাজনৈতিক ঝামেলায় নিরাময়কে নিয়ে যেতে আমি চাই না। এই পাহাড়ে আমি নিরাময় তৈরি করেছিলাম সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভাল

সম্পর্ক আছে আমাদের। চেয়ারম্যান এবং আপনাদের মধ্যে যে বিরোধ তাতে আমাদের জড়াবেন না।'

মিস্টার সুব্বা বললেন, 'দেখুন আপনি পাহাড়ি নন কিন্তু এতকাল এখানে থাকায় পাহাড়ের মানুষ হয়ে গিয়েছেন। আমরা আপনাকে আমাদের থেকে আলাদা বলে মনে করি না। এই যে রাজনৈতিক সমস্যা এটা তো আপনারও সমস্যা। তাই না ?'

'যখন ভোট দিতে যাব তখন এ নিয়ে ভাবব। আমার কথা আপনাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি।' ডাক্তার আঙ্কল বললেন।

'তার মানে আপনাদের ওপর যে হামলা হল তা মেনে নিচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ। এটা কলকাতা বর্ধমান অথবা ডায়মন্ডহারবারেও হতে পারত। তা ছাড়া আমাকে আরও বড় কিছু নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।'

'যেমন ?'

'ক্রমশ অভিভাবকরা আমার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। তাঁরা একের পর এক পেশেন্টকে নিয়ে যাচ্ছেন। তা ছাড়া আমিও তো বাইরের হামলা থেকে তাদের বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। অসুখের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করতে প্রস্তুত কিন্তু অসভ্যতার বিরুদ্ধে কিছু করতে অক্ষম। কারণ পুলিশ আমার পাশে এসে দাঁড়াবে না। তাই ভাবছি নিরাময় বন্ধ করে দেব।' ডাক্তার আঙ্কলের গলা ধরে এল।

'সে কী ?' মিস্টার সুব্বা অবাক হলেন।

'আমি ভাবছি। সিদ্ধান্ত এখনও নিইনি। যাক গে, ওর সঙ্গে আপনাদের আলাপ হল। সেদিন ও যা করেছে তা মানুষেরই করা উচিত, আমি খুশি।'

হঠাৎ মিস্টার সুব্বা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আজ শহরে গিয়েছিলেন ?'

সায়ন বলল, 'হ্যাঁ।'

'ডক্টর তামাং আপনাকে ওদের সঙ্গে দেখা না করতে দিয়ে পেছনের পথ দিয়ে বের করে এনেছেন ?'

'এত ভিড় হয়েছিল যে ও-ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।'

'কেন অত ভিড় হয়েছিল ?'

'আমি জানি না।'

'এখানকার মানুষ আপনাকে ভালবেসেছে। এখন ওদের পাশে দাঁড়ানো আপনার কর্তব্য। দেখুন, আমরা চাই পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসুক। কিন্তু আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে সেটা পেতে চাই না। আর এই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। আগামীকাল এখানে হরতাল ডাকতে চেয়েছি আমরা। আজ বিকেলে যদি বাজারের ওখানে মিটিং ডাকা যায় এবং সেখানে আপনি ওই অত্যাচারের বর্ণনা করেন তা হলে আগামীকাল এখানকার পাহাড়ে আর একটা নতুন শক্তির জন্ম হবে। এই শক্তি শান্তির শক্তি।'

ডাক্তার আঙ্কল বললেন, 'আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি। যার সঙ্গে আপনারা কথা বলছেন সে নিরাময়ের একজন পেশেন্ট, কোনও রাজনৈতিক নেতা নয়। রাজনীতি করতে সে এখানে আসেনি।'

'অত্যাচারের প্রতিবাদ করাকে কি রাজনীতি বলবেন ডক্টর ?'

'এক্ষেত্রে যেভাবে আপনারা ভাবছেন তাতে অন্য কিছু বলা যায় না।'

'বেশ। আগামীকাল আমরা হরতাল ডাকছি না। কিন্তু প্রতিবাদ মিছিল তো বের করতে পারি ? তাতে নিশ্চয়ই আপনারা যোগ দেবেন ?'

ডাক্তার আঙ্কল বললেন, 'সমস্ত দল মিলে করলে নিশ্চয়ই যোগ দেব।'

মিস্টার প্রধান হাসলেন, 'ক্ষমতায় যারা আছে তারা কী করে নিজেদের বিরুদ্ধে মিছিল করবে ডক্টর ?'

সায়ন বলল, 'আমি কি এখন যেতে পারি ?'

মিস্টার সুব্বা বললেন, 'তা হলে ?'
'আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না।' সায়ন উঠে দাঁড়াল।
ডাক্তার আঙ্কল বললেন, 'সেদিনের ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে লিখে চেয়ারম্যানকে জানিয়েছি, কপি দিয়েছি থানায়, এস পি-কে। ওঁরা কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন না জানা পর্যন্ত আমি কিছুই করতে পারি না।'
সায়নের পেছন পেছন ওরা বেরিয়ে এলেন বাইরে। ঘুরে ঘুরে সেদিনের ভাঙচুর দেখলেন। হঠাৎ মিস্টার প্রধান জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটা কথা, আপনি কি ক্রিশ্চান ?'
'না। জন্মসূত্রে আমি হিন্দু।'
'তা হলে লোকে যেশাসের সঙ্গে আপনাকে মেলায় কেন ?'
'যারা মেলায় তাদের জিজ্ঞাসা করুন। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমার রক্তপাত হয়, আমি মির‍্যাকল করতে পারি না। আপনারা যদি ওই কারণে আমার কাছে এসে থাকেন, তা হলে ভুল করেছেন।'
সায়নের কথায় হাসলেন ওরা। তারপর ভ্যানে চেপে ফিরে গেলেন।
সদানন্দ বসেছিল পাথরের ওপর। সিগারেট খাচ্ছিল।
সায়ন ওর পাশে গিয়ে বসল, 'তুমি বড্ড বেশি সিগারেট খাচ্ছ।'
'টেনশনে। বুঝলি।'
'কীসের টেনশন ? তোমাকে তো বললাম আজ চলে যেতে পারো।'
'দুর ! ওসব নয়। আমার বিয়ে জানিস ?'
'সত্যি ? কবে ?' হঠাৎ সব ভুলে গেল সায়ন।
সদানন্দর মুখটা আচমকা পাল্টে গিয়েছিল। বেশ লাজুক লাজুক দেখাচ্ছিল তাকে। বলল, 'মা খুব ধরেছে। একা থাকতে পারছে না। বড়মাও বললেন। আমি অবশ্য চেয়েছিলাম নতুন বাড়িতে গিয়ে যা করার করা যাবে। কিন্তু আমার কথা কে শুনবে বল !'
'তোমার বিয়ে কবে ?'
'এখনও দিন ঠিক হয়নি। তবে মাস তিনেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।'
'যাঃ। তা হলে তোমার বিয়েতে থাকা হবে না।'
'কেন ?'
'আমি কলকাতায় গিয়ে বেশিদিন তো থাকতে পারব না।'
সদানন্দ বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না তোর আর এখানে ফিরে আসতে হবে কেন ? তুই তো বেশ সুস্থ। যেসব ওষুধ এখানে খাচ্ছিস তাই যদি ওখানে খাস তা হলে কোনও সমস্যা থাকবে না।'
সায়ন হাসল, 'এখান থেকে চলে গেলেই আমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ব। আচ্ছা, এমন করলে হয় না, এখন না গিয়ে তোমার বিয়ের সময় যদি যাই— ! তিন মাসের মধ্যে তো বলছ !'
'তোর মা যে এখন যাবি বলে আশা করে আছে।'
'আমি মাকে চিঠি দিচ্ছি। এখন ওখানে গিয়ে তো আমার কিছু করার নেই, বাড়িতেই বসে থাকতে হবে। তোমার বিয়ের সময় গেলে খুব মজা করতে পারব। হ্যাঁ, সেটাই ভাল হবে।'
সদানন্দকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। সে এসেছে সায়নকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। একা ফিরে গেলে নিশ্চয়ই কথা শুনতে হবে। আবার সায়ন যে কথা বলছে তারও যুক্তি আছে। সে মাথা নাড়ল, 'না, তুই আমার সঙ্গে চল। কদিন থেকে ফিরে আসতে হলে ফিরে আসিস। তারপর আবার বিয়ের আগে যাবি।'
এই সময় বিষ্ণুপ্রসাদকে দেখা গেল ওপর থেকে দ্রুত নেমে আসতে। সায়ন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ ?'
'থানায়।' বিষ্ণুপ্রসাদ দাঁড়াল।
'কোনও সমস্যা হয়েছে ?'
'হ্যাঁ। ম্যাথুজের কাছ থেকে মাংস কেড়ে নিয়ে মারধর করেছে ওরা।' বিষ্ণুপ্রসাদ বলল।
'কারা করেছে ?'

'এখানে যারা করে। ওরা ম্যাথুজের কাছে টাকা চেয়েছিল চাঁদা হিসেবে। ব্যবসা করবে অথচ চাঁদা দেবে না এটা চলবে না। ম্যাথুজ বলেছিল সে ব্যবসা করছে না। ম্যাডাম তাকে অনুরোধ করায় ও প্রায় কেনা দামে গ্রামের মানুষদের মাংস দিচ্ছে। ওরা শুনতে চায়নি।'

'ম্যাথুজ কেমন আছে ?'

'প্রচণ্ড মার খেলে মানুষ যেমন থাকে। চললাম।'

সায়ন চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি একটু দাঁড়াও।'

বিষ্ণুপ্রসাদকে দাঁড়াতে দেখে সায়ন ভেতরে ছুটল। অনেকদিন বাদে সে দৌড়োল। একটু ঝিমঝিম করছিল মাথা কিন্তু সে উপেক্ষা করল।

অফিসঘরে ডাক্তার আঙ্কল ছিলেন না। তাঁকে পাওয়া গেল ল্যাবরেটরিতে। সায়নকে দেখে হাসলেন, 'তোমার রক্ত দেখছি আমার চেয়েও লাল।'

'তাই ?'

'হিমোগ্লোবিন চমৎকার ভাল। ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।' বলতে বলতে ডাক্তার আঙ্কলের মুখটা বদলে যাচ্ছিল।

সায়ন বলল, 'আপনার সাহায্য দরকার।'

ডাক্তার আঙ্কল বেরিয়ে এলেন, 'কী ব্যাপারে ?'

'ম্যাথুজকে ওরা মেরেছে।'

'কোন ম্যাথুজ ?'

'মিস্টার ব্রাউনের বাড়ির ওপরে যার মাংসের দোকান ছিল।'

'ও হ্যাঁ, কারা মেরেছে ?'

'পার্টির ছেলেরা। ওরা ম্যাথুজের কাছে চাঁদা চেয়েছিল। কিন্তু ম্যাথুজ এখন ব্যবসা করে না। এলিজাবেথ যে তিনটে গ্রামে কাজ করছেন সেখানে কেনা-দামে মাংস দিচ্ছিল ও। এলিজাবেথের কাজে ও যোগ দিয়েছিল। বিষ্ণুপ্রসাদ ওখান থেকে এসেছে। ও যাচ্ছে থানায়, আপনি একটা চিঠি লিখে দেবেন ?'

ডাক্তার আঙ্কলের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললেন, 'তুমি ওকে অপেক্ষা করতে বলো। আমি গাড়ি বের করছি।'

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে বিষ্ণুপ্রসাদকে পাশে বসিয়ে ডাক্তার আঙ্কল শহরে চলে গেলেন।

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'নেপালিরা মেরেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'বাঙালিকে ?'

'না, নেপালিকে। তোমার ধারণা ভুল সদুদা। যারা মারে তারা কখনও জাত দেখে না।' সায়ন বলল।

'কী জানি।' সদানন্দ বলল, 'আমার তো এসব জায়গায় এলেই মনে হয় বিদেশে এসেছি। বাংলাদেশ বলে মনে হয় না।'

'বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম সদুদা ! তুমি সে দেশের নাগরিক নও। তাই না ?'

'কথাটা ঠিক ; তবু কলকাতা বর্ধমান হাওড়াকে বাংলাদেশ বলে ভাবতে আমরা অভ্যস্ত। তাই বলে ফেলি। ঠিক আছে, পশ্চিমবাংলা বলে মনে হয় না। হয়েছে ?'

'তাহলে তো তুমি এদের আন্দোলনকে সমর্থন করছ ?'

'মনে মনে করি, মুখে করি না।'

'তোমার দোষ নেই। এই মন আর মুখের ফারাকই হল আমাদের সর্বনাশের কারণ। তাহলে সাঁওতালদের গ্রামে গেলে তোমার মনে হবে ওটা বাংলাদেশ নয়। আসলে পুরনো ভাবনাচিন্তাগুলো এখন বাতিল করে দেওয়া উচিত এটা অনেকের মাথায় ঢুকছে না। তোমার কথা মানতে গেলে পশ্চিমবঙ্গকেই চারটে টুকরো করা দরকার।' সায়ন হাসল।

'দুর ! এসব পলিটিকস আমি বুঝি না। আমি গাড়ি বুঝি। যেখানে সস্তায় গাড়ি পাব ছুটে যাব।

ইঞ্জিন ভাল থাকলে কিনে নেব। ব্যাস!' সদানন্দ বলল, 'তোর ডাক্তার তো চলে গেল, কিছু বলে গেল ?'

'হ্যাঁ। আমার রক্ত এখন স্বাভাবিক অবস্থায় আছে।'

'তবে ?' চেঁচিয়ে উঠল সদানন্দ, 'আমি তোকে দেখেই বলেছিলাম। তাহলে কালই যাওয়া যাক। বুঝলি ?'

'ডাক্তার আঙ্কলকে টিকিটের কথা বলি।'

'ইস, আগে মনে করতে পারলি না ? লোকটা নিশ্চয়ই স্টেশনের দিকে গেল। তাহলে আমি এখন চলি। একটা সিনেমা দেখব। কলকাতায় তো দেখা হয় না। কাল সকালে আসব।' সদানন্দ শিস দিতে দিতে চলে গেল।

মিসেস অ্যান্টনি মাটির দিকে মুখ করে কিছু ভাবছিলেন। সায়ন ওঁর পাশে এসে দাঁড়াল, 'কী ভাবছেন মিসেস অ্যান্টনি ?'

মুখ তুললেন মহিলা, 'আমার কপালটা খুব খারাপ জানতাম, জানাটা ভুল নয়।'

'কেন ? কিছু হয়েছে ?'

'আমি নিরাময়ে এসেছিলাম অনেক আশা নিয়ে। সত্যি বলছি, সেই আশা পূর্ণ হয়েছিল। তোমাদের সঙ্গে থেকে আমার সব একাকিত্ব ভুলে গিয়েছিলাম। আমার ছেলের কথাও মনে আসে না আর। অথচ একসময় ও ওই ব্যবহার করেছে জেনেও কষ্ট পেতাম। কিন্তু আজ একটু আগে ডক্টর বললেন, উনি নিরাময় বন্ধ করে দিতে পারেন। খুব সিরিয়াসলি ভাবছেন। এই মানুষটাকে অল্প যে কদিন দেখলাম তাতে বুঝতে পেরেছি উনি হালকা কথার মানুষ নন। নিরাময় বন্ধ হয়ে গেলে আমার কী হবে ?' মিসেস অ্যান্টনি তাকালেন।

'আমাদের কী হবে ?' সায়ন পাল্টা জিজ্ঞাসা করল।

'তোমরা চলে যাবে যে যার বাড়িতে। শুধু আমি আর ওই অভাগা মেয়েটা, কঙ্কাবতী, আমরাই বিপদে পড়ব।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, বাড়িতে চিকিৎসা করেও কাজ হচ্ছিল না বলে আমি এখানে এসেছিলাম। ওখানে ফিরে গেলে আগের অবস্থা হতে পারে।'

'না না।' মাথা নাড়লেন মিসেস অ্যান্টনি, 'কিছুতেই না। যিশু তোমার পাশে আছেন। তিনি সব সময় তোমাকে রক্ষা করবেন।'

'তাই যদি বলেন, যিশু তো আপনার পাশেও আছেন।'

মাথা দোলালেন মিসেস অ্যান্টনি। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, 'এখানে আসার আগে সেটা বুঝতে পারতাম না।' মিসেস অ্যান্টনি চলে গেলেন ভেতরে।

কীরকম ভারী হয়ে গেল মনটা। ডাক্তার আঙ্কল সত্যি নিরাময় বন্ধ করে দেবেন ? কোথায় যাবেন উনি ? কী নিয়ে থাকবেন ? ডাক্তার আঙ্কলের কোনও আত্মীয়স্বজনকে সে কখনও দেখেনি!

'বাবু!'

সায়ন দেখল বড়বাহাদুর দাঁড়িয়ে আছে।

'বাবু! নিরাময় কি বন্ধ হয়ে যাবে ?'

'কে বলল তোমাকে ?'

'সবাই বলছে!'

'আমি জানি না।'

'আপনি ডাকদার সাহেবকে বলুন যেন বন্ধ না হয়। আপনার কথা উনি শুনবেন। বন্ধ হয়ে গেলে এই বয়সে কোথায় যাব আমি ?'

'তোমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই ?'

'না। আপনারাই আমার সব। যখন নিরাময় খুলল তখন থেকে আমি এখানে আছি। আপনি একটু ডাকদার সাহেবকে বলুন।'

'আচ্ছা, ডাক্তার আঙ্কলের কাছে ওঁর কোনও আত্মীয়কে আসতে দেখেছ ?'

'না। কেউ আসেনি। উনিও আমার মতন একা।'

'ঠিক আছে। আমি বলব।'

সায়ন ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গেল। এখন দুপুর নয়। এখানে দুপুর আর বিকেলের মধ্যে তফাত খুব সামান্য। মেঘলা থাকলে তো তাপও বোঝা যায় না। সে চেয়ারে বসল। তারপর মাকে চিঠিটা লিখল। মা, আমার শরীর এখন আগের থেকে অনেক ভাল আছে। বিন্দুমাত্র চিন্তা কোরো না। সদুদা এসেছে। ফেরার রিজার্ভেশন নেই। থাকলেও এখনই আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। কয়েকটা ব্যাপারে মন ভেঙে যাওয়ায় ডাক্তার আঙ্কল নিরাময় বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছেন। এই সময় আমি চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে। উনি বন্ধ করে দিলে তো যেতে হবেই। তদ্দিন এখানে থাকি। তুমি ও বাবা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিও।'

এই সময় নীচে দুটো গাড়ির আওয়াজ হল। সেই সঙ্গে মানুষের কথাবার্তা। সায়ন নীচে নেমে দেখল মিসেস অ্যান্টনির সঙ্গে পাঁচজন মানুষ কথা বলছেন। ডাক্তার আঙ্কল নেই জানার পরেও ওঁরা প্রশ্ন করে চলেছেন! সায়নকে দেখে মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'ওর নাম সায়ন, ও সেদিন এখানে ছিল।'

দলের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষটি ভ্রূকুঁচকে তাকালেন, 'আই সি! তুমিই সায়ন। খুব খুশি হলাম তোমার দেখা পেয়ে। তোমার কথা আমি শুনেছি। ওয়েল, চেয়ারম্যান আমাদের পাঠিয়েছেন সেদিনের ঘটনায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার হিসেব নিতে। পরিষদ ক্ষতিপূরণ দিতে চায়।'

সায়ন হাসল, 'এ বাড়ির ভাঙা কাচ সারানো যেতে পারে, কিন্তু আবার যে ভাঙবে না তার কোনও গ্যারান্টি কি চেয়ারম্যান দিতে পারবেন ?'

৩২

ডাক্তার চিঠিটা পড়ছিলেন। চেয়ারম্যানের সচিব লিখেছেন চিঠিটা। নিরাময়ের ওপর যে হামলা হয়েছে তার জন্যে চেয়ারম্যান ব্যক্তিগতভাবে তাঁর দুঃখ জানাতে বলেছেন। মিস্টার ব্রাউনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সামান্য ভুল বোঝাবুঝির কারণে কিছু কর্মী উত্তেজিত হয় এবং সেই সুযোগ নেয় সেইসব সমাজবিরোধীরা যাদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। ডাক্তার নিশ্চয়ই পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার এইরকম ঘটনা ঘটতে দেখেছেন। যেসব কর্মীরা উত্তেজিত হয়েছিল তারা এখন লজ্জিত। পুলিশকে বলা হয়েছে যত দ্রুত সম্ভব সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার করতে। চেয়ারম্যান আবার মনে করিয়ে দিতে বলেছেন যে নিরাময় অথবা ডাক্তারের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা আছে। তার প্রতীক হিসেবে তিনি বিশেষ তহবিল থেকে দশ হাজার টাকার অনুদান পাঠাচ্ছেন।

চিঠির সঙ্গে একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট রয়েছে দশ হাজার টাকার। ডাক্তার সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। নিশ্চয়ই চেয়ারম্যানের পাঁচজন প্রতিনিধি ফিরে গিয়ে ভাঙচুরের যে এস্টিমেট দিয়েছেন সেইমতো ক্ষতিপূরণ করেছেন তিনি। এই টাকা না নিলে সরাসরি সংঘাতের পথে যেতে হবে। না নেওয়ার কোনও কারণ আছে? পাহাড়ে পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত সরকার যা করতে পারেন না চেয়ারম্যানের সরকার তা স্বচ্ছন্দে পারেন।

'ডেকেছেন?' সায়ন টেবিলের উল্টোদিকে বসল।

'হ্যাঁ। তোমার বাবা আমাকে চিঠি দিয়েছেন। উনি লিখেছেন তোমাকে বেশ কয়েকবার লেখা সত্ত্বেও তুমি কলকাতায় যাওয়ার বিষয়টা এড়িয়ে যাচ্ছ। ওঁরা আমাকে অনুরোধ করেছেন তোমার শরীর ভাল থাকলে যেন আমি জানিয়ে দিই, ওঁরা এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। তুমি তো এসব কথা আমাকে বলোনি?' ডাক্তার তাকালেন।

'এখানে পরপর যেসব ঘটনা ঘটে গেল তাতে যেতে ইচ্ছে করছিল না।'

'কিন্তু ওঁরা তোমার জন্যে অধীর হয়ে আছেন। আমি তো আগেই তোমাকে ছুটি দিয়েছিলাম। তাহলে আমি লিখে দিই—'

'না। আমি একাই যেতে পারব।'

'বেশ। তোমাকে কেউ এনজেপি স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে। ওঁরা শেয়ালদায় রিসিভ করবেন।'

'তারও দরকার নেই। আমিই পারব।'

ডাক্তার তাকালেন, 'আমি জানি তুমি পারবে। কিন্তু অসুখটার কথা তোমার অজানা নয় সায়ন। ঝুঁকি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

সায়ন একটু ভাবল, 'আমি যদি কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাই?'

'কাকে নিয়ে যাবে?'

'বিষ্ণুপ্রসাদকে বললে সে যেতে রাজি হবে।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়। তোমার এক দাদা এসেছিল, সে ফিরে গেছে, এ কথা আমাকে বলোনি। তোমার কি কলকাতায় যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না?'

'না।'

'কেন? সবাই তো নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে চায়।'

'আমিও চাইতাম। কিন্তু মিস্টার ব্রাউনের মৃত্যুটা দেখে আমার মন বদলে গিয়েছে। আমার আর বেঁচে থাকার জন্যে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

চোখ ছোট হল ডাক্তারের, 'কী করতে চাও?'

'কিছু একটা করতে চাই। বাবা-মায়ের মতো শুধু বেঁচে থাকতে চাই না।'

হাসলেন ডাক্তার, 'বেশ! ভাবো, কী করবে। তোমরা যাতে কালই যেতে পার তার চেষ্টা করছি। তুমি বিষ্ণুপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলো।'

সায়ন মাথা নেড়ে অফিসঘরের বাইরে এল। আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা। কুয়াশারা নেমে এসেছে রাস্তার ওপরে। ঝট করে অনেকটা দেখা যাচ্ছে না। পুলওভার পরতে হয়েছে ঠাণ্ডা বেড়ে যাওয়ায়। গেটের বাইরে এসে কুয়াশা দেখছিল সে। এখানে পৃথিবীর চেহারাটা ঘন ঘন বদলে যায় বলে সব কিছু নতুন নতুন মনে হয়, একঘেয়েমি আসে না। এখন কোথাও কোনও শব্দ নেই। সায়ন দেখল কুয়াশার বুক চিরে কঙ্কাবতীর মা এগিয়ে আসছে। হঠাৎ যেন বয়স বেড়ে গেছে মহিলার। খুব ধীরে পা ফেলছে। মাথা নিচু।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন?'

মুহূর্তেই মুখের চেহারা বদলে গেল মহিলার, হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল, 'ভাল না। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'কেন? আপনার শরীর খারাপ?'

'না। এখানে আর চলছে না। শিলিগুড়িতে গেলে একটা স্কুলে আবার চাকরি পেতে পারি। যা মাইনে দেবে তাতে পেট চলে যাবে। ডাক্তারবাবু যদি মেয়েটাকে ছেড়ে দেন তাহলে ওকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'সে কী? ওর পড়াশোনা কী ওখানে হবে?'

'হবে না। এতদূর যে হয়েছে তাই আমাদের ভাগ্য। আমাদের মতো গরিব মানুষের সংসারে পড়াশুনার কথা ভাবাই অন্যায়।' মহিলা মুখ নিচু করল।

সায়ন বলল, 'আপনি কথাটা ঠিক বললেন না মা।'

চমকে তাকাল, 'আপনি আমাকে মা বললেন!'

'বাঃ, আপনি তো আমার মায়েরই বয়সী। দেখুন, অনেক বড়লোকের ছেলের পড়াশুনো হয় না কারণ সে সেটা করতে চায় না বা পড়ে না। আবার খুব গরিবের ছেলেও অনেক কষ্ট করে বিদ্বান হয়েছে। আমার বিশ্বাস কঙ্কাবতী তা পারবে। কিন্তু আপনি যদি ওকে সাহায্য না করেন তাহলে খুব অন্যায় করা হবে।'

'কিন্তু আমি কী করে সাহায্য করব? আমি!' মহিলা চুপ করে গেল।

'আপনি ডাক্তারবাবুকে বলুন। উনি নিশ্চয়ই একটা পথ বের করে দেবেন।'

মহিলা তাকাল। তারপর বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলে সব হয়ে যায়।'

'আমি?' সায়ন অবাক।

'হ্যাঁ। আমি শুনেছি। তা ছাড়া আপনিই তো আমাকে নরকে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু আমি জানি আমার ভাগ্যে কিছু নেই, আমি হতভাগী।' কথাগুলো বলে মহিলা নিরাময়ের ভেতর চলে গেল।

মন খারাপ হয়ে গেল সায়নের। শিলিগুড়িতে গেলে কঙ্কাবতী আর বাঁচবে না। অসুখটার সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব হবে না। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে যদি ও কাজ খুঁজতে বের হয় কোনও চাকরি পাবে না। মায়ের মতো ওকে আয়ার কাজ করতে হবে। খারাপ হয়ে যাওয়া মনে রাগ এল আচমকা। যদি তার ক্ষমতা থাকত তাহলে সে এক মুহূর্তে পৃথিবীর মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিত। মিস্টার ব্রাউন তার মধ্যে যিশুকে দেখেছেন, এই মহিলা বলে গেল সে ওকে নরকবাস থেকে রক্ষা করেছে, একগাদা লোক দেখেছে মাদার মেরি তার শরীরে আশীর্বাদের হাত রেখেছেন অথচ সে নিজে এসবের কিছুই টের পায়নি। ঘুমের ঘোরে যে মানুষ হাঁটে, সে নিজে কিছুই টের পায় না। কিন্তু জেগে যাওয়ার পর সেই হাঁটাচলার কিছু প্রমাণ নিশ্চয়ই খুঁজে পায়। তার ক্ষেত্রে এটাও তো সহজ হচ্ছে না। সে যদি বলে এই কুয়াশাগুলো সরে যাক তাহলে কি কুয়াশারা সরে যাবে? যত বোকামি! লোকে যে যার নিজের বিশ্বাসকে তার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এমন অসহায় লাগে এরকম চাপ এলে মনে হয় কেন বিশ্বাসটা সত্যি হল না!

বিষ্ণুপ্রসাদকে ধরতে হলে চার্চের ওপরে উঠতে হবে। অতটা রাস্তা সে মিস্টার ব্রাউনের মৃতদেহের সঙ্গে হেঁটেছিল। সেদিন পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। আজ কি যাওয়া উচিত হবে? কিন্তু বিষ্ণুপ্রসাদকে পাওয়া দরকার। সায়ন হাঁটতে লাগল।

মিসেস ডিসুজার ছেড়ে যাওয়া বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন এলিজাবেথ। সেখানে পৌঁছে সায়ন দেখল দরজা খোলা আছে। এতটা উপরে ধীরে ধীরে উঠে এলেও শরীর এখন ঝিমঝিম করছে। ব্যাপারটাকে সে পাত্তা দিচ্ছিল না। এতটা চড়াই ভেঙে এলে সুস্থ মানুষেরও অস্বস্তি হবে। সে কলিং বেলের বোতাম টিপল। তৃতীয়বারে দরজা খুলল ম্যাথুজ। তার মাথায় ব্যান্ডেজ, হাতেও। সায়নকে দেখে হাসার চেষ্টা করল, 'তুমি? একা এসেছ? এসো এসো।'

এটা বসার ঘর। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে ম্যাথুজ। চেয়ারে বসে বলল, 'আমাকে দেখতে এত দূরে উঠে এসেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি।'

'তুমি এখন কেমন আছ?'

'ভাল। হাত ভাঙেনি। অনেকগুলো সেলাই করাতে হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাব। ওরা কেউ বাড়িতে নেই, গ্রামে গিয়েছে।'

'পুলিশ এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে যারা মেরেছিল তাদের অ্যারেস্ট করেছে?'

'না।' মাথা নাড়ল ম্যাথুজ।

'সে কী? কেন?'

'পুলিশ আমাকে এদের নাম জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি বলেছি কাউকেই চিনি না। তাই পুলিশ ফিরে গিয়েছে।'

'তুমি কাউকেই চিনতে পারোনি?'

'পারব না কেন? আমি নাম বললে পুলিশ ওদের অ্যারেস্ট করত। থানায় নিয়ে গিয়ে পেটাত। তারপর কয়েকদিন রেখে ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। ফিরে এসে ওরা আবার আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করত। কিন্তু আমি জেনেশুনেও নাম বলিনি জেনে ওরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছে। এখন একেবারে চুপ করে গিয়েছে। ম্যাডামের কাজ করতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।'

ম্যাথুজ হাসল, 'কাজ করাটাই আসল কথা, নাম বললে ওটা করা যেত না।'

সায়ন অবাক হয়ে গেল। ম্যাথুজ কসাই ছিল। কিন্তু সে সময়েও ওর হাবভাবে দার্শনিকের ভাবভঙ্গি ফুটে উঠত। এখন যেন সেটা আরও স্পষ্ট। সে জিজ্ঞাসা করল, 'বিষ্ণুপ্রসাদ কি আজ এখানে এসেছে?'

'হ্যাঁ। ও ম্যাডামের সঙ্গে গিয়েছে। কেন?'

'ওকে আমার দরকার।'

'তুমি কি ওর খোঁজেই এসেছ?'

সায়ন একটু চিন্তা করল, 'সত্যি কথা বললে তাই বলতে হয়। তুমি যে এখানে রয়েছ আমি তা জানতাম না।'

ম্যাথুজ হাসল, 'তুমি জানবে কী করে! ম্যাডাম আমাকে যেতে দিল না। বলল সাতদিন এখানে থেকে শরীর সারিয়ে যেতে। ঠিক আছে, আমি বিষ্ণুপ্রসাদকে বলে দেব তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

সায়ন বলল, 'তুমি অনেকক্ষণ কথা বলেছ। আমি যাচ্ছি, তুমি বিশ্রাম করো।'

ম্যাথুজের বোধহয় একা থাকতে ভাল লাগছিল না। সায়ন চলে যাক সে চাইছিল না। কিন্তু সায়ন ওকে দরজা বন্ধ করতে বলে বেরিয়ে এল। এখন তাকে নিরাময়ে যেতে হলে আর চড়াই ভাঙতে হবে না। নীচে নামতে কখনওই অসুবিধে হয় না। সে হাঁটতে হাঁটতে চার্চের দিকে তাকাল। এখনও রোদ ওঠেনি। কিন্তু চার্চের গায়ে কুয়াশা লেগে নেই। কোনও মানুষ ওখানে নেই, শান্ত ছবির মতো দেখাচ্ছে দূর থেকে। আর সেদিকে তাকিয়ে থাকতেই মিস্টার ব্রাউনের মুখ মনে পড়ল, যিশু কা বড়াই।

সায়ন এগিয়ে গেল সমাধিক্ষেত্রের দিকে। গেট খুলে ভেতরে যেতে প্রথমে মনে হয়েছিল খুঁজে পাবে না। চাপ চাপ কুয়াশায় সমস্ত সমাধিক্ষেত্র ঢাকা পড়ে আছে। যেন মৃত আত্মাদের চাদরে ঢেকে রেখেছে প্রকৃতি। যেখানে মিস্টার ব্রাউনকে সমাধি দেওয়া হয়েছে সেখানে এখনও কোনও বেদি তৈরি করা হয়নি। আশেপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের নাম এবং জন্মমৃত্যুর তারিখ স্পষ্ট লেখা আছে বেদির ওপর। মিস্টার ব্রাউনের কফিন যেখানে রয়েছে তার মাটির ওপরে একটি কাঠের ফলক দাঁড়িয়ে। ফলকের নীচে দুটো গোলাপ ফুল, টাটকা। বোঝাই যায় আজ কেউ রেখে গেছে!

দুটো হাত সামনে রেখে দাঁড়িয়েছিল সায়ন। মারা যাওয়ার পর মানুষের আত্মা নাকি তার কর্মফল অনুযায়ী স্বর্গ বা নরকে যায়। এই যাওয়াটা কেউ দেখেনি। মানুষই এইরকম কল্পনা করে নিয়েছে। তার চেয়ে যেটা স্বাভাবিক সেটাই ভেবে নেওয়া ভাল। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু এই পৃথিবীর মাটিতে মিশে যায়। তার অস্তিত্ব থেকে যায় যারা বেঁচে থাকে তাদের স্মৃতিতে, যতদিন থেকে যেতে পারে। মাটি এখনও কাঁচা, কুয়াশায় ভিজে কিছুটা নরম, এর নীচে কাঠের কফিনে শুয়ে আছেন মিস্টার ব্রাউন। না, মিস্টার ব্রাউন না বলে তাঁর মৃত শরীর বলাই ভাল। এই কদিনে নিশ্চয়ই সেই শরীরে বিকৃতি এসেছে। হয়তো কফিন খুললে এখন তাঁকে চেনা যাবে না।

মানুষটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল সায়ন। বড় শরীর, ফোলা ফোলা মুখে সবসময় যে হাসিটা লেগে থাকত সেটাও স্পষ্ট। দেখা হতেই বলতেন, 'হ্যালো মাই বয়।' চোখ বন্ধ করল সায়ন কিছুক্ষণ তারপর সমাধিক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এল।

ফিরে আসার সময় কাণ্ডটা হল।

রাস্তাটা পিচের নয়। মাঝেমধ্যেই দুপাশে এর ওর বাড়ির দরজা পড়ছে, কখনও কাঠের গেট, কখনও গাছগাছালি। বাঁক ঘুরতেই দেখল একটা বাড়ির সামনে বেশ ভিড়। সায়ন যখন এই রাস্তা বেয়ে উঠেছিল তখন এই ভিড় ছিল না। এই পাহাড়ে যারা সায়নকে চিনত না তারা মিস্টার ব্রাউনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে গোলমাল হয়েছিল তারপর থেকে চিনে গিয়েছে। তাদেরই একজন এগিয়ে এসে বলল, 'খুব বিপদ হয়েছে, পূর্ণ গুরুং-এর বাচ্চাটার জ্বর বেড়ে গেছে। ওর মা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইছে না।'

'কেন?'

'ওর আগের বাচ্চাটার অসুখের সময় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানেই মারা গিয়েছিল সেটা। তাই—!'

'ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ। আপনাদের ওখানকার ডাক্তারবাবু নেই, ডাক্তার তামাং-এর কাছে লোক গিয়েছে। ফিরে আসেনি এখনও। আপনি একটু দেখবেন?'

'আমি কী দেখব? আমি কি ডাক্তারি জানি?'

'তবু—।' লোকটা বলতেই আশেপাশের অনেকেই হাতজোড় করে মিনতি করতে লাগল। এইসব সরল মানুষদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারল না সায়ন। সে বাড়িতে ঢুকল। কাঠের বাড়ি। চারপাশে তাকালেই বোঝা যায় অভাবের সঙ্গে এদের নিত্য লড়াই চলছে। বৃদ্ধ এবং মহিলাদের মাঝখানে পথ করে ওকে যে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল তার জানলা বন্ধ। আলো জ্বলছে। বিশ্রী গুমোট গন্ধ পাক খাচ্ছে। তক্তপোশের ওপর অনেকগুলো কম্বলের তলায় যে শিশু শুয়ে আছে তার মুখ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। এরকম পরিবেশে থাকলে সুস্থ মানুষই অসুস্থ হয়ে যাবে।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'জ্বর কবে থেকে হয়েছে?'

একজন মহিলা জবাব দিলেন, 'দুদিন। জ্বর থাকলেও ভালই ছিল। কিন্তু আজ সকাল থেকেই শরীর শক্ত হয়ে গেছে, কথা বলছে না।'

সায়নেরই দমবন্ধ হয়ে আসছিল। সে জানলা খুলে দিতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির মা আপত্তি করল, 'ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ওর বুকে ঠাণ্ডা বসে যাবে।'

সায়ন বলল, 'ঘরে হাওয়া আসা দরকার। জানলা খুলুন।'

একজন পুরুষ জানলা খুলে দিতেই তাজা বাতাস ঘরে ঢুকল। সেই গুমোট গন্ধ দ্রুত কেটে যাচ্ছিল। শিশুটির মাথার কাছে গেল সায়ন। একে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু ডাক্তার এসে সেটা না বললে ওর মা কিছুতেই সেটা মেনে নেবে না। সে বাচ্চার কপালে হাত দিল। কপাল পুড়ে যাচ্ছে। শৈশবে তার খুব তড়কা হত। মায়ের মুখে শুনেছে জ্বর বেড়ে শরীর শক্ত হয়ে যেত তখন। সেসময় ডাক্তারের নির্দেশে তাকে নগ্ন করে সমস্ত শরীর ভেজা কাপড়ে বারংবার মুছিয়ে দিলে জ্বর কমে যেত। এই শিশুর কি সেরকম কিছু হয়েছে? টুপুরের একবার খুব জ্বর হয়েছিল। তখন টুপুরের মা ওর কপালে ভেজা কাপড় রাখতেন।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'একটা পরিষ্কার সাদা কাপড় জলে ভিজিয়ে দেবেন?'

'গরম জলে?' একজন মহিলা জানতে চাইল।

'না। ঠাণ্ডা জলে।'

অনুরোধ রাখা হল। সায়ন কাপড়টি ভাঁজ করে শিশুর কপালে রাখল। মিনিট দেড়েকের মধ্যে সেটা গরম হয়ে উঠল। কম্বল সরিয়ে দিল সায়ন। তারপর বারংবার জলে কাপড় ভিজিয়ে শিশুটির গলা বুক কপাল মুছিয়ে দিতে লাগল। মিনিট দশেকের মধ্যে শিশুটির শরীর নরম হল। এই সময়টায় ঘরের কোনও মানুষ কথা না বলে সাগ্রহে তাকিয়ে ছিল। শিশুর নিশ্বাস স্বাভাবিক হতেই গুঞ্জন উঠল।

এইসময় বাইরের মানুষজন জোরে জোরে কথা বলতে লাগল। তারা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ঘরের ভেতর এল। সায়ন তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াতেই তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি? এখানে?'

'এরা জোর করে ধরে নিয়ে এল। আমি কপাল আর শরীর যতটা সম্ভব ভেজা কাপড়ে মুছিয়ে দিয়েছি।' সায়নের গলায় দ্বিধা ছিল।

'গুড।' ডাক্তার শিশুর কপাল দেখলেন, স্টেথো দিয়ে বুক এবং পিঠ পরীক্ষা করলেন। তাঁকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'অয়েল ক্লথ আছে?'

এ বাড়িতে সেটা নেই কিন্তু পাশের বাড়ি থেকে সেটা চলে এল। ডাক্তার তার ওপর শিশুটিকে শুইয়ে ভেজা চপচপে কাপড় আপাদমস্তক বোলাতে লাগলেন। তারপর শরীরটাকে শুকনো কাপড়ে মুছিয়ে মাথাটা ধুয়ে দিলেন। দেখা গেল শিশু চোখ খুলেছে।

একটা হালকা চাদর ওর শরীরে চাপিয়ে ডাক্তার বললেন, 'এখন এর সেবা ঠিকঠাক করা উচিত। একে এখন হাসপাতালে নিয়ে যান।'

সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মা মাথা নাড়ল, 'না। ওখানে গেলে আমার এই বাচ্চা আর বাঁচবে না।'

ডাক্তার ধমক দিলেন, 'কী বাজে কথা বলছ? তোমার বাচ্চার কোনও ক্ষতি হবে না। দু-তিনদিন

রেখেই ওরা একে ছেড়ে দেবে। এখানে থাকলে ওর সেবা ঠিকঠাক করতে পারবে না তুমি।'

পুরুষরা মহিলাকে বোঝাতে লাগল ডাক্তারবাবুর কথা মেনে নিতে। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। বারংবার বাচ্চাটিকে আঁকড়ে ধরছিল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'যা ভাল হবে তাই করতে বললাম। যদি না শোনো তাহলে কেউ আমার সঙ্গে আসুক, ওষুধ দিয়ে দেব।'

মহিলা জোরে কেঁদে উঠল। তারপর উন্মাদিনীর মতো সায়নের হাত ধরল, 'তুমি ওর মাথায় হাত দিয়ে বলো ও ফিরে আসবে আমার কাছে। বলো, তাহলেই আমি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

সায়ন খুব হকচকিয়ে গেল, 'আমি বললে কী হবে?'

'তুমি বললে সব হবে। আমার বাচ্চা মড়ার মতো পড়েছিল, তুমি আসার পর ওর শরীরে প্রাণ এল। একমাত্র তুমি বললেই আমি শুনব।'

সায়ন প্রবলভাবে মাথা নাড়ছিল। মহিলা তার হাত কিছুতেই ছাড়ছিল না। সায়ন ডাক্তারবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি মাথা নেড়ে ইশারা করলেন মহিলার অনুরোধ রাখতে। খুব অবাক হয়ে গেল সায়ন। তার দ্বিধা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারবাবু শুদ্ধ বাংলায় বললেন, 'একটি ক্ষুদ্র অসত্য যদি বিরাট সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে তাহা হইলে সেই অসত্যটির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য।'

এরা বাংলা অল্পবিস্তর বোঝে। সেটা কথ্য বাংলা। ইংরিজি কিছু কিছু বোঝে সবাই। অতএব এই বাংলায় কথা বললেন ডাক্তার, সায়ন বুঝতে পারল। সে শিশুর মাথার কাছে এগিয়ে গিয়ে কপালে হাত রাখল, 'ও ভাল হয়ে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। ডাক্তারবাবুর পাশাপাশি বাইরে বেরিয়ে এল সায়ন। একজন টাকা দিতে এগিয়ে আসতেই ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে না বললেন। বাচ্চাটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করল না ওরা। একজন কোলে করে দৌড়তে লাগল। কয়েকজন তার পেছনে যাদের মধ্যে শিশুর মাও রয়েছে।

ডাক্তারবাবুর পাশাপাশি হাঁটছিল সায়ন। ঢালু পথ, অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু খুব নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল সে। মহিলা কেন শিশুর মাথায় হাত রাখতে বললেন? কেন তাকে দিয়ে কথা আদায় করিয়ে নিলেন? অর্থাৎ এরা কি এখনও তাকে ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ বলে ভাবছে?

হঠাৎ ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি তোমার অসুবিধে হচ্ছে।'

সায়ন কোনও কথা বলল না। মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগল।

'আচ্ছা, তুমি কি নিজের মধ্যে কোনও পরিবর্তন বা পার্থক্য অনুভব কর? তুমি কি নিজেকে কখনও কখনও চিনতে পার না?'

'না তো! এসব কখনওই হয় না আমার।'

'অথচ এখানকার মানুষ তোমার মধ্যে ওসব দেখতে পছন্দ করছে।'

'হ্যাঁ।ওই মেরির মূর্তির সামনে গিয়ে আমি ভুল করেছিলাম।'

'মিস্টার ব্রাউন অশিক্ষিত মানুষ ছিলেন না। অন্য কোনও বই পড়েছেন কি না জানি না বাইবেল তাঁর মুখস্থ ছিল বলে জানি। তা ছাড়া বই পড়ে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন জীবন থেকে। জাহাজে জাহাজে কত বন্দরে ঘুরে যে মানুষ, মানুষ দেখতে চান তাঁর মতো শিক্ষিত আর কে আছেন? এই মিস্টার ব্রাউন মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তোমার মধ্যে নিজের ইচ্ছে প্রয়োগ করে তুষ্ট হয়ে গেছেন। কেন?'

'আমি জানি না।'

'তুমি জানো আমি এসব বিশ্বাস করি না। এই পৃথিবীর কিছু মানুষ তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধির সাহায্যে নিজেদের আলাদা করে সাধারণ সরল মানুষদের প্রভাবিত করে গেছেন এবং যাচ্ছেন। আর সেটা করবেন বা কেন? সাধারণ মানুষই এসব খুব পছন্দ করে। তোমার বয়স কম। তা না হলে বলতাম তোমার প্রতি এদের এই আস্থাটাকে এদের উপকারের কাজে লাগাও। আমি হাজার ভয় দেখালেও কোনও কাজ হত না। মেয়েটি তার অন্ধ সংস্কার নিয়ে ওই ঘরে বসে থাকত আর শিশুটি মারা যেত। অথচ তুমি ওর কথামতো কাজ করতেই দেখলে কীরকম ছটফটিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটল। তাতেই বাচ্চাটার উপকার হল। এইটে হলে মিথ্যাচরণে কোনও আপত্তি নেই আমার।'

ওরা নেমে আসছিল ম্যাথুজের বন্ধ দোকান ছাড়িয়ে মিস্টার ব্রাউনের বাড়ির সামনে। দরজায় তালা। গেট বন্ধ। তার সামনে বসে আছে শীর্ণ ভুটো। যে-ই তাকে ডেকে নিয়ে যাক ফাঁক পেলেই ভুটো চলে আসে গেটের সামনে। তাকিয়ে থাকে বন্ধ দরজার দিকে। নড়ে না। খুব দ্রুত আরও শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে সে।

সায়ন ডাকল, 'ভুটো।'

ভুটো মুখ ফেরাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সায়নের কাছে। এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

'ভুটো, এখানে কী করছিস?'

ভুটো মাটিতে বসে পড়ে দুই থাবায় মুখ রেখে অদ্ভুত গলায় কেঁদে উঠল। সায়ন হাঁটু গেড়ে বসল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'একটু সতর্ক থেকো। মিস্টার ব্রাউন ওকে কখনও ইনজেকশন দিতে নিয়ে যাননি। গায়ে পোকা থাকাই স্বাভাবিক।'

সায়ন ভুটোর মাথার মাঝখানে হাত বোলাল, 'ডোন্ট ক্রাই ভুটো। তুই কাঁদলে মিস্টার ব্রাউন কষ্ট পাবেন। প্লিজ ভুটো!'

ভুটোর কান্না থামল। ওর লেজ নড়তে লাগল।

সায়ন উঠে দাঁড়াল, 'কাম অন ভুটো। চলে আয়।' দেখা গেল ভুটো আদেশ মান্য করল। সায়নের পেছন পেছন হাঁটতে লাগল সে।

ডাক্তাবাবু এগিয়ে গেলেন। তাঁর কাজ আছে। ভুটো এত আস্তে চলছে যে সায়নকে গতি কমাতে হল। নিরাময়ের সামনে পৌঁছে সে দেখল কঙ্কাবতী তাদের দিকে পিছন ফিরে দূরের আকাশ আর কুয়াশাভরা খাদের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ভুটোকে নিয়ে নিরাময়ে ঢুকে ছোটবাহাদুরকে দিয়ে খাবার আনিয়ে সে ওর মুখের সামনে ধরতেই কুকুরটা গোগ্রাসে খেতে লাগল। ও যে অভুক্ত ছিল তা খাওয়ার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল।

খাওয়া শেষ করে মুখ তুলে সায়নকে দেখল ভুটো। তারপর প্যাসেজের একপাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিল সায়ন। ভুটো চোখ বন্ধ করল।

বাইরে বেরিয়ে কঙ্কাবতীর কাছে চলে এল সে। এসে বুঝল কঙ্কাবতী কাঁদছে। সায়নের উপস্থিতি বুঝতে পেরে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সায়ন খানিকটা দূরত্বে পাথরের ওপর বসে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মা চলে গিয়েছে?'

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল কঙ্কাবতী। তাকাল না।

'তোমার মন শান্ত করো।'

কঙ্কাবতী বলল, 'আমি কী করব বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা যে ভদ্রলোক তোমাকে বলে গিয়েছিলেন খুব প্রয়োজন হলে তাঁকে জানাতে, তাঁকে জানাচ্ছ না কেন?'

'না। আমি কাউকে বিরক্ত করতে চাই না।'

'কেন?'

'উনি আমার ক্ষতি করে গিয়েছেন। উনি যদি আমাকে এভাবে বদলে না দিতেন তাহলে আমি আর পাঁচটা নেপালি মেয়ের মতো স্বাভাবিক থাকতে পারতাম। ওরা যেভাবে সব কিছু মেনে নেয় তাই মেনে নিতে পারতাম। আমাদের মতো ঘরের মেয়েদের তো সেটাই করা উচিত ছিল।'

'তুমি মন থেকে বলছ এই কথাগুলো?'

কঙ্কাবতী জবাব দিল না। হাঁটুর ওপর চিবুক রাখল।

সায়ন বলল, 'তোমার যে কষ্ট হচ্ছে সেটা আমারও হয়েছিল। আমিও যখন বুঝতে পারলাম আমি আর নিয়মিত কলেজে যেতে পারব না, ক্লাস করতে পারব না তখন খুব কেঁদেছিলাম। আমার শরীর তোমার চেয়েও খারাপ ছিল। সবাই ভেবেছিল আমি আর বাঁচব না। যে বাঁচবে না তার পড়াশুনো নিয়ে কেউ কি মাথা ঘামায়? কিন্তু আমি তো এখনও বেঁচে আছি। আজ দ্বিতীয়বার আমি ওই চার্চ পর্যন্ত হেঁটে গেলাম এবং এলাম। এটা কিছুকাল আগেও আমি ভাবতে পারতাম না। আমার মন

থেকে পড়াশুনো করার ইচ্ছেটা চলে গেল। এখন মনে হয় যদি কিছু একটা কাজ করে যেতে পারতাম, যতটা সময় বেঁচে থাকব ততটা সময়কে ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে—' সায়ন মাথা নাড়ল, 'আমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি তো আমার মতো অসুস্থ হওনি কখনও। তুমি কেন ভেঙে পড়বে?'

'আমি কী করব?'

'লড়াই করবে। ডাক্তারবাবু বলেন লড়াই না করে কখনও হেরে যাওয়া উচিত নয়। এখন কিছুদিন তো এখান থেকেই তোমার স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল।'

'কিন্তু এখানে আমি কতদিন থাকব? আমার মায়ের কোনও কাজ নেই। মা খেতে পাচ্ছে না অথচ আমি কত ভাল খাবার খাচ্ছি। মা আমাকে নিয়ে শিলিগুড়িতে চলে গেলে আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে, আমি জানি।' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল কঙ্কাবতী।

'না। তোমার মাকে শিলিগুড়িতে যেতে হবে না।'

এইসময় গাড়িটা উঠে এল নীচের রাস্তা থেকে। শব্দ শোনা যাচ্ছিল, বাঁক ঘুরতে তাকে দেখা গেল। ডক্টর তামাং-এর গাড়ি। ওদের দেখতে পেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, 'হ্যালো।'

সায়ন এগিয়ে গেল, 'কেমন আছেন ডক্টর তামাং।'

'ফাইন। আই অ্যাম অলওয়েজ ফাইন। তবে এখানে এলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমার সিনিয়র পার্টনার এখন ওপরে গিয়ে একা একা কোটা শেষ করছে, আমি তাকে সঙ্গ দিতে পারছি না। ওয়েল!'

'আপনি কি বাচ্চাটাকে দেখতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে?'

'আমি শুনেছি ওরা আপনাকে খবর দিতে গিয়েছিল। বাচ্চাটা এখন একটু ভাল আছে, ওকে ওরা শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।'

'বাঃ, খুব ভাল। তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে আর ওপরে উঠতে হল না। ও কে? কঙ্কাবতী না? এই যে খুকি,' ডক্টর তামাং চিৎকার করলেন, 'তোমার মায়ের কী খবর? তাঁর তো আমার ওখানে যাওয়ার কথা ছিল। চাকরি রেডি কিন্তু ক্যান্ডিডেটের পাত্তা নেই কেন?'

কঙ্কাবতী অবাক হয়ে তাকাল।

ডক্টর তামাং বললেন, 'কাল সকালে দেখা করতে বোলো। আচ্ছা সায়ন, আমি আর নামছি না। ডাক্তারকে আমার রিগার্ড দিও। বাই।' গাড়ি ঘুরিয়ে ভদ্রলোক আবার নীচে গেলেন।

কঙ্কাবতী এবার দৌড়ে এল কাছে, 'দেখলে!'

সায়ন অবাক হল, 'কী?'

'তুমি বললে মাকে শিলিগুড়িতে যেতে হবে না অমনি মায়ের এখানে চাকরি হয়ে গেল।' কঙ্কাবতী হাসল।

'দূর। আমার মনেই ছিল না, ওঁর ব্যাপারে ডক্টর তামাং আগেই বলেছিলেন।'

'তোমার মাকে তখন জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলাম। আজ বিকেলে ওঁর সঙ্গে দেখা হবে?'

চোখমুখের চেহারা বদলে গিয়েছিল কঙ্কাবতীর। ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে খবরটা দিয়ে দিও।' সায়ন আকাশের দিকে তাকাল। আজ বোধহয় সূর্য উঠবে না। এরকম ছায়া ছায়া দিন বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। সে বলল, 'কাল থেকে কদিন আমি এই পাহাড় কুয়াশা দেখতে পাব না?'

চমকে তাকাল কঙ্কাবতী, 'কেন?'

'আমি আজ কলকাতায় যাচ্ছি।'

কঙ্কাবতীর মুখের চেহারা বদলে গেল। সায়ন বলল, 'অনেকদিন যাইনি, মা খুব ব্যস্ত হয়েছে। তাই যাচ্ছি।'

'যদি ওখানেই থেকে যেতে হয়--!'

'থেকে যাব কেন? আমি তো কদিনের জন্যে যাচ্ছি।'

কঙ্কাবতী হঠাৎ নিরাময়ের দিকে হাঁটতে লাগল। তার এইভাবে চলে যাওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না সায়ন। সে কদিনের জন্যে চলে যাবে সেই খবর শুনে কঙ্কাবতীর মুখের আলো নিবে গেল কেন?

'সায়ন।'

চিৎকারটা কানে আসতেই মুখ ঘুরিয়ে সে দেখতে পেল বিষ্ণুপ্রসাদ দ্রুত নেমে আসছে। কাছে এসে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার? ম্যাডাম পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছেন। তুমি আমার খোঁজে ওপরে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী ব্যাপার?'

'আমি কাল কলকাতায় যাব। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?'

'কলকাতায়?' চিন্তায় পড়ল বিষ্ণুপ্রসাদ, 'আমি কখনও যাইনি।'

'দুজনে একসঙ্গে যাব। আমি একাই যেতে পারতাম কিন্তু তুমি সঙ্গে গেলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারব।'

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'আমি ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলি।'

'কিন্তু সময় তো বেশি নেই।'

'বুঝেছি। ম্যাডাম যদি কদিনের জন্যে ছেড়ে দেন তাহলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কাছে তো টাকা নেই।'

'সেটা তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'এখন আমাদের খুব কাজের চাপ। যদি ম্যাডাম না ছাড়েন তাহলে তুমি কিছু মনে কোরো না।' বিষ্ণুপ্রসাদ আবার ওপরের দিকে রওনা হল।

৩৩

বিষ্ণুপ্রসাদ কখনও কলকাতায় যায়নি। দার্জিলিং মেলের থ্রিটিয়ারে বসে সে একটু উদাস হয়েই প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়েছিল। নামই নিউ জলপাইগুড়ি কিন্তু শিলিগুড়ি শহরটা এই স্টেশনকে চারপাশ থেকে চেপে রেয়েছে। আর শিলিগুড়ি মানে জেলা দার্জিলিং। শিলিগুড়িতে এসে পাহাড়ের মানুষের কোনও অসুবিধা হয় না। দুপা হাঁটলেই একজন স্বজাতিকে দেখা যায়।

ট্রেনে চাপলেই অদ্ভুত উত্তেজনা হয় সায়নের। বিশেষ করে রাতের ট্রেনে। হু হু করে ট্রেন ছুটছে অন্ধকার চিরে, মাঝে মাঝে হুইসল বাজছে, জানলার বাইরে চোখ রেখে যখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না তখন ইচ্ছেমতো কল্পনা করে নাও। যা খুশি। সেই কল্পনাটাই উত্তেজনা বাড়ায়।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল, মন কেমন করছে!'

বিষ্ণুপ্রসাদ হাসল, 'নাঃ। আমি ডাকতার সাহেবের কথা ভাবছিলাম। সত্যি সত্যি যদি উনি নিরাময় বন্ধ করে চলে যান তাহলে তো তুমি আর ওখানে ফিরে যাবে না। আচ্ছা, কলকাতা তো শুনেছি খুব বড় শহর, ওখানে তোমার চিকিৎসা হয় না কেন?'

'হবে না কেন? কত লোকের হচ্ছে। কিন্তু পাহাড়ের আবহাওয়ায় ডাক্তার আঙ্কলের কাছে থেকে আমার বেশি উপকার হয়েছে। কিন্তু যা ভয় পাচ্ছ তা ঠিক না। ডাক্তার আঙ্কল নিরাময় বন্ধ করে চলে যাবেন না।' সায়ন খুব আস্থা নিয়ে কথাগুলো বলল।

ওদের উল্টোদিকে একটি পরিবার বসেছিল। তারা যে মন দিয়ে কথা শুনছে তা বুঝতে পারেনি সায়ন। পরিবারের যিনি কর্তা তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি টি বি হয়েছিল ভাই?'

'টি বি?' হকচকিয়ে গেল সায়ন।

'পাহাড়ে আর সমুদ্রের ধারে লোকে টি বি সারাতে যায়। কী বন্ধ হয়ে গেলে আর ফিরে যাবে না

বলল, তোমার অসুখ কি সারেনি?' শেয়ালের মতো মুখের গঠন, ভদ্রলোকের চোখে সন্দেহ।

সায়ন বলল, 'আপনি ভুল করছেন, আমার টি বি হয়নি।'

'অ। তা বোম্বে-টোম্বে গিয়েছিলে নাকি এই বয়সে? কী এমন রোগ যা কলকাতায় না সারিয়ে পাহাড়ে গিয়েছ চিকিৎসার জন্যে?

'বোম্বে গেলে কী রোগ হয়?'

'ওই যে কাগজে পড়েছি, সোনার দোকানে কাজ করতে গিয়ে বাঙালি ছেলেরা মৃত্যুরোগ নিয়ে ফিরে আসছে।'

'অদ্ভুত!' সায়ন জানলার দিকে তাকাতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। বিষ্ণুপ্রসাদ বাংলা বোঝে তবে শক্ত শব্দ না। মৃত্যুরোগ বুঝতে না পেরে সে নেপালিতে সায়নকে মানে জিজ্ঞাসা করল। এই কয় মাসে নেপালি ভাষার অনেকটাই আয়ত্তে এসে গিয়েছিল সায়নের। সে অর্থ এবং ইঙ্গিত বুঝিয়ে বলতেই বিষ্ণুপ্রসাদ হাসতে লাগল। তাই দেখে কর্তা তাঁর পরিবারের সদস্যদের চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন।

ট্রেনটা ভালই চলছিল। টয়লেটে যাওয়ার সময় সায়নের চোখে পড়েছিল অনেক বার্থ ফাঁকা। অথচ টিকিটঘরে গিয়ে টিকিট চাইলেই বলা হয় রিজার্ভেশন ফুল, ওয়েটিং-এ নাম লেখাতে হবে। যদি ট্রেনে জায়গা থাকে তাহলে কি ইচ্ছে করে ওসব বলে? কী লাভ?

ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই হই হই করে কয়েকটা ছেলে উঠে এল। উঠেই টয়লেটগুলোয় দখল নিয়ে নিল ওরা। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'দাদারা দিদিরা দয়া করে আধঘণ্টা আপনাদের সবকিছু চেপে রাখুন। আধঘণ্টা পরে টয়লেটে গিয়ে খালাস করবেন।' একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে পেটি উঠতে লাগল। দশ মিনিটের মধ্যে সেগুলো চোখের আড়ালে চলে গেল। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। এবার ছেলেগুলো মাঝখানের প্যাসেজে এসে দাঁড়াল। প্রত্যেকের হাতে এক একটা প্যাকেট। একজন সায়নদের কাছে এসে তাকাল। তারপর উল্টোদিকের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন দাদু?'

'বর্ধমান।'

'বাঃ। আপনার সিটের নীচে এটা রাখছি। বর্ধমান পর্যন্ত এটা আপনার সম্পত্তি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে সে কথাই বলবেন।' প্যাকেটটা ভদ্রলোকের দুপায়ের ফাঁক দিয়ে নীচে ঢুকিয়ে দিল ছেলেটা।

'কী আছে এতে?' ভদ্রলোক রেগে গেলেন।

'যাই থাক, আমরা দুটো পয়সা পাব যদি আপনি সঙ্গে নিয়ে যান। গরিব বেকার ছেলে, বুঝতেই পারছেন।'

'কিন্তু যেটা আমার নয় সেটা আমি—।'

'যা বললাম তাই করবেন। ঝামেলা করতে চাইলে বিপদে পড়বেন। দিদিমা, একটু বুঝিয়ে দিন দাদুকে।' ছেলেটি সরে গেল।

সায়ন দেখল কম্পার্টমেন্টের কেউ কিছু বলছে না। হঠাৎ আশ্চর্যরকমের শান্ত হয়ে গেছে ভেতরের পরিবেশ। ট্রেনের ছুটন্ত চাকার আওয়াজ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। নীরবতাই যেন বর্ম হয়ে গেছে যাত্রীদের।

এইসময় ওদের নেতা চিৎকার করল, ' আরে! সবাই বোবা হয়ে হয়ে গেলেন নাকি? কথা বলুন, বি নর্মাল। এতক্ষণ যেরকম গল্প করছিলেন তাই করুন।' বলতে বলতে সে এগিয়ে এল সায়নদের কাছে। বিষ্ণুপ্রসাদকে দেখে নেপালিতে জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাচ্ছে সে। বিষ্ণুপ্রসাদ জবাব দিতেই জানতে চাইল কলকাতায় চাকরি করে কি না। ভানুপ্রসাদ মাথা নেড়ে না বলে জানাল তার চাকরি নেই, বেকার।

ছেলেটা সিগারেট ধরাল। তারপর প্যাকেটটা বিষ্ণুপ্রসাদের সামনে ধরল। বিষ্ণুপ্রসাদ মাথা নাড়ল, সে সিগারেট খাবে না।

ছেলেটা বলল, 'আগে চারমিনার খেতাম, এখন উইলস খাই। যখন বেকার ছিলাম তখন কেউ চাকরি দেয়নি। শেষ পর্যন্ত বাঁচার জন্যে আমরা এই লাইনে এলাম। এসে দেখলাম সব শালা চোর।' ছেলেটা হাসল।

সায়ন চুপচাপ শুনল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কী করছেন?'

'কিছু না। আমরা ক্যারিয়ার। স্মাগলারদের মাল ক্যারি করে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছি। তার জন্যে ভাল টাকা পাই।' ছেলেটা তাকাল, 'তুমি বোধহয় ট্রেনে যাওয়া-আসা করো না। যারা করে তারা জানে, জিজ্ঞাসা করে না।"

'কিন্তু এটা তো অন্যায়, বেআইনি ব্যাপার।'

'হ্যাঁ শালা, কে ন্যায় করছে বে?' হঠাৎ ক্ষেপে গেল ছেলেটা, 'কোন হারামি আইনের পথে চলছে? এই যে মালগুলো ট্রেনে তুললাম স্টেশনের পুলিশকে পাঁচশো খাওয়াতে হল। একটু পরে ট্রেন থামলে দেখবে পুলিশের সার্চ পার্টি এসে মাল চাইবে। মালদাতে আবার আর একদল আসবে। রেলের স্টাফদের মাল দিতে হচ্ছে। এরা সবাই সরকারি স্টাফ, জনগণের দেওয়া ট্যাক্স থেকে মাইনে পায়। মাইনে পেয়ে ছোঁক ছোঁক করে ঘুষ খাওয়ার জন্যে। এদের কাছে গিয়ে অন্যায় বেআইনি শব্দগুলো বলছ না কেন?'

'তাই যদি হয়, চোখের সামনে না রেখে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মায়, তাই না। কয়েকজন জেনুইন অফিসার আছে এ লাইনে। গোটা চারেক। তারা উঠলে লাইফ হেল করে ছাড়ে। তাই তাদের ভয়ে লুকোতে হয়। অবশ্য লুকোবার জায়গা ওরা জানে। কিন্তু দামি জিনিসগুলো আমরা প্যাসেঞ্জারদের হাতে ধরিয়ে দিই। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে বাপ-দাদুর জমানো টাকা আছে। বেকার হয়ে আমাদের মতো না খেয়ে মরো, তাহলে জ্বালা বুঝবে চাঁদু।'

বুড়ো কর্তা ফ্যাসফ্যাসে গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমার সিটের তলায় যেটা রেখে গেলে সেটায় কী আছে?

ছেলেটা চোখ বড় করল, 'কিছু নেই। দেখুন দাদু, আমরা আপনাদের সঙ্গে একবারও খারাপ ব্যবহার করিনি। করেছি? তাহলে খারাপ ব্যবহার করতে বাধ্য করবেন না। শালা দেশের প্রধানমন্ত্রী চুরি করছে, মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে মাল বানাচ্ছে, পার্টির দাদারা ভিখিরি থেকে রাজা হয়ে গেল তার বেলায় দোষ নেই। আরে ভাই, ইন্ডিয়া একটা ভিখিরি দেশের নাম। কিস্যু দেওয়ার ক্ষমতা নেই এই দেশের। ভবিষ্যৎ যেখানে অন্ধকার তখন যে যেমন পারে লুটে নিলে কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারবে।'

ট্রেনের গতি কমে আসতেই ছেলেটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'পার্টনার নাম্বার টু, একশো টাকার নোট দিবি। বেশি ঝামেলা করলে আর একটা। তার বেশি নয়।'

ট্রেন থামল। জায়গাটা বিহার। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে। এর মধ্যে দরজায় শব্দ হল। বেশ জোরে জোরে। ছেলেটা চেঁচাল, 'কেউ দরজা খুলবেন না। যা করার আমরাই করব। পার্টনার টু—!'

সায়ন শুনল বাইরে থেকে ধমক দেওয়া হচ্ছে দরজা খুলে দেওয়ার জন্যে। সে উঠে এগিয়ে গেল দেখতে। কম্পার্টমেন্টের অন্য যাত্রীদের চেহারা এখন পুতুলের মতো। বাতিল পুতুল।

সায়ন দেখল আর একটি ছেলে দরজার জানলা খুলে কথা বলার চেষ্টা করছে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'পার্টনার সর্বনাশ। পাণ্ডে হারামিটা দাঁড়িয়ে আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োনো শুরু হয়ে গেল। উল্টোদিকের দরজা খুলে দুদ্দাড় করে নেমে গেল সবাই। যাওয়ার আগে শাসিয়ে গেল কেউ যেন পুলিশের কাছে মুখ না খোলে।

দরজা প্রায় ভেঙে ফেলার জোগাড়। একজন ভদ্রমহিলা উঠে দরজাটা খুলে দিতেই তাতার দস্যুদের মতো পুলিশ বাহিনী ঢুকে পড়ল কম্পার্টমেন্টে। ওদের সামনে যে অফিসারটা রিভলবার উঁচিয়ে প্রথমে উঠল সে হিন্দিতে চিৎকার করল, 'এতক্ষণ দরজা খোলেননি কেন? জবাব দিন?'

কেউ জবাব দিল না। লোকটা গালাগাল দিল, 'সবকটা হিজড়ে। কারও সাহস নেই প্রতিবাদ করার। খুঁজে দ্যাখ।'

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বাহিনী সক্রিয় হল। পুরো কম্পার্টমেন্ট খুঁজে এসে তারা জানাল আসামিরা পালিয়েছে।'

'পালিয়ে কোথায় যাবে। এই ট্রেনেই উঠেছে। মাল সার্চ করো।'

পুলিশরা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। যাত্রীদের স্যুটকেস, ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। এই

সময় সেই ভদ্রমহিলা, যিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন, পুলিশ অফিসারের সামনে গিয়ে বললেন, 'আপনারা কি অন্ধ না অন্ধ সেজে থাকতে পছন্দ করেন এটা আমি বুঝতে পারছি না।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'যেসব জিনিসের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন সেগুলো কোথায় আছে তা আপনারা জানেন না? নিরীহ মানুষদের মালপত্র নিয়ে টানাটানি করছেন?'

'কোথায় আছে?'

'আশ্চর্য। আপনি জেনেশুনেও ন্যাকামো করলে আমার কিছু বলার নেই।'

'আপনি আমার সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলতে পারেন না।'

'আপনারা যা করছেন তাতে অন্য কোনও ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে, আপনি আমাকে হেল্প করুন। কোথায় লুকিয়েছে মালগুলো?'

ঠিক সে-সময় একজন সেপাই বলল, 'টয়লেটগুলো খুলতে হবে স্যার। সাধারণত ওখানেই ওরা লুকিয়ে রাখে।'

অফিসারের নির্দেশে টয়লেটগুলোর সম্ভাব্য লুকোনো জায়গা দেখা হল। পুলিশ কিছুই পেল না।

নেমে যাওয়ার আগে অফিসার মহিলার সামনে এলেন, 'আমরা খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না। আপনি হেল্প করলে পাওয়া যেত।'

'ওরা মালপত্র নিয়ে টয়লেটে ঢুকেছিল।'

'আচ্ছা। ট্রেনের নীচে সার্চ করো।' চিৎকার করে উঠলেন অফিসার। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন চলতে শুরু করল। যেভাবে ওরা উঠেছিল সেভাবেই নেমে গেল পুলিশগুলো। সম্ভবত ওদের ডিউটি এই স্টেশনেই সীমাবদ্ধ।

ট্রেন চলছে। দেখা গেল ওপাশের দরজায় শব্দ হচ্ছে। সায়ন দেখল চলন্ত ট্রেনের দরজার বাইরে থেকে সেই ছেলেটির গলা ভেসে আসছে। ছুটন্ত ট্রেনে যখন ওরা ঝুলে আছে তখন নিশ্চয়ই অন্য কম্পার্টমেন্টে ওঠেনি। এই সময় একটি বাদামওয়ালা দরজা খুলে দিল। পরপর ঢুকল ছেলেগুলো। ওদের চেহারা দেখে আঁতকে উঠল সায়ন। ঝড়ে বিধ্বস্ত গাছেরাও এদের থেকে বিন্যস্ত থাকে। কম্পার্টমেন্টে ঢুকেই ওরা দৌড়ে গেল টয়লেটে। নিজেদের মধ্যে চিৎকার করে বলাবলি করতে লাগল মালগুলো ঠিক আছে। পুলিশ খুঁজে পায়নি। ওদের মুখেচোখে একটু স্বস্তি ফিরে এল।

যে ছেলেটি নেতা সে পুরো করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আপনাদের কাছে যেসব জিনিস আমরা জমা রেখেছিলাম সেগুলো ঠিক না থাকলে বলুন। পুলিশ কি কারও কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছে?'

কেউ জবাব দিল না। ছেলেটি বলল, 'তাহলে ধরে নিচ্ছি মালগুলো ঠিক আছে। আমরা যে স্টেশনে এই ট্রেনে উঠেছি সেই স্টেশনে এই কম্পার্টমেন্টের টি টি নেমে অন্য জায়গায় উঠেছে। সামনের স্টেশনে সে আবার ফিরে আসবে। মনে রাখবেন ওই লোকটা ডিউটিতে থাকার সময় কানে শুনতে পায় না। অতএব ওকে কিছু বললে, আপনাদের কোনও লাভ হবে না। আমি এবার দিদিমণির সঙ্গে কথা বলব।'

ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সেই মহিলার সামনে যিনি খুব উত্তেজিত হয়েছিলেন পুলিশের সামনে। সায়ন ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতেই অন্য ছেলেগুলোর একটা ধমকে উঠল, 'অ্যাই? কোথায় যাচ্ছ?'

'দেখব।' সায়ন স্পষ্ট জবাব দিল।

'আর দেখতে হবে না। বেশি দেখতে চাইলে বাবার বিয়ে দেখিয়ে দেব। শালা যেন সিনেমা দেখতে যাচ্ছে।' ছেলেটা হাত তুলল।

'তুমি এর চেয়ে ভালভাবে কথা বলতে পার না?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল। ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে ছেলেটা হাত নামাল। মুখ ফিরিয়ে নিল। সায়ন দেখল বিষ্ণুপ্রসাদ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নেতা তখন ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'আমি উঠেই বলেছি আমরা বেকার ছেলে। বেঁচে থাকার জন্যে রোজগারে নেমেছি। আমরা না করলে অনাহারে মরতাম, কিন্তু অন্য কেউ করত।

সেটা আপনার ভাল লাগেনি। আপনি পুলিশের কাছে চুকলি কেটেছেন।'

'কে বলল চুকলি কেটেছি?' ভদ্রমহিলা খুব ঘাবড়ে গেলেন।

'আপনার জন্য পাণ্ডে পরের স্টেশনে খবর পাঠাবে ট্রেনের তলা সার্চ করতে। এর জন্যে আপনাকে শাস্তি পেতে হবে।'

'তার মানে?'

'এই কম্পার্টমেন্টের কেউ পুলিশের সঙ্গে কথা বলেনি। একমাত্র আপনিই বারেবারে বলেছেন। আপনার কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ টয়লেট সার্চ করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে আপানার সঙ্গে কথা বলে ওরা উত্তেজিত হয়েছিল কিন্তু মাল বের করার সময় পায়নি। এই মাল ধরা পড়লে মালিক আমাদের কাছে ক্ষতিপূরণ আদায় করে। সেক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা কী হয় ভাবতে পারেন? আপনাকে আমি জানলা দিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। কী শাস্তি চান?'

ভদ্রমহিলা দু হাতে মুখ ঢাকলেন। তাঁর শরীর কাঁপছিল।

'আপনি উঠুন। আমরা কেউ আপনার শরীরে হাত দেব না। আপনি নিজের শাড়ি জামা খুলুন।' ছেলেটি গম্ভীর মুখে বলল।

'না!' ভদ্রমহিলা চিৎকার করে উঠলেন।

'হ্যাঁ। আমরা আপনার গায়ে হাত দিতে চাই না। খুলুন।'

'আমি খুলব না।' ডুকরে কেঁদে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

'তাহলে কথা রাখতে পারছি না। আমরা হাত বাড়ালে আপনি আরও বেইজ্জত হবেন। এই কম্পার্টমেন্টের কোনও ভেড়ুয়া আপনাকে বাঁচাতে আসবে না। বড্ড তেল হয়েছে আপনার।' খপ করে হাত ধরল ছেলেটি। ধরে এক ঝটকায় দাঁড় করিয়ে দিল।

সায়ন খুব ধীরে সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'ছেড়ে দাও।'

'অ্যাই! মাস্তানি মারাবি না। ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলে দেব।'

'তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু ওঁকে ছেড়ে দাও।'

ছেলেটি কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। হাত সরিয়ে নিয়ে অদ্ভুত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে কেন?'

সায়ন হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নাকের নীচটা মুছতেই সেখানে রক্ত লেগে গেল। বিষ্ণুপ্রসাদ ছুটে এল। সায়নকে দু হাতে ধরে বলল, 'তুমি শোবে চলো। আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছ তুমি।'

ওরা কেউ কিছু বলল না। বিষ্ণুপ্রসাদ সায়নকে ওদের বার্থে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। রক্ত বের হচ্ছে বিন্দু বিন্দু। সায়ন তার ওষুধের ব্যাগটা বের করতে বলল নিচু গলায়। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে তার। ওষুধগুলো থেকে বিশেষ ক্যাপসুলটা দেখিয়ে দিতেই বিষ্ণুপ্রসাদ সেটা খাইয়ে দিল।

ছেলেগুলো ওদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল টয়লেটের নীচ থেকে তাদের মালগুলো তুলে যাত্রীদের সিটের নীচে রাখতে। নেতা এসে দাঁড়াল সামনে, 'ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে কেন?'

বিষ্ণুপ্রসাদ তাকাল, 'ওর অসুখ আছে। লিউকোমিয়া।'

'মাই গড।' ছেলেটা চমকে উঠল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে বলল, 'ডাক্তার দরকার? দাঁড়াও।' সে চিৎকার করল, 'এই কম্পার্টমেন্টে কেউ ডাক্তার আছেন? প্লিজ উঠে আসুন।'

কেউ এলেন না। সায়ন হাত নাড়ল, দরকার নেই।

ট্রেনটা পরের স্টেশনে থামতেই কয়েকজন পুলিশ উঠে এলেন কামরায়। সঙ্গে টি টি। পুলিশ অফিসার বললেন, 'কী যে করো তোমরা। আমার ওপর অর্ডার এসেছে টয়লেটের নীচটা দেখতে। ওখানে চোরাই মাল আছে থাকলে নিয়ে যেতে আমি বাধ্য।'

নেতা বলল, 'খুঁজে দেখুন।'

ওরা খুঁজল। কিছু পেল না। নেতা বলল, 'পাননি এটা জানিয়ে দেবেন।' সে দুটো একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিল।

'আরও তিনটে দাও।' অফিসার বললেন।

ছেলেটি আর একটা যোগ করল। কোনও কথা বলল না।

অফিসার তিনটে নোট নিয়ে নিঃশব্দে নেমে গেলেন। ওঁরা নেমে গেলে টি টি লিস্ট বের করলেন। নেতা তাঁর পকেটে আর একটা একশো টাকা ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'একজন ডাক্তার দরকার।'

'কেউ উন্ডেড হয়েছে?'

'না। নেমে গিয়ে জানিয়ে দিন মালদায় ফোন করে দিতে।'

'টিকিট চেক করতে হবে যে।'

'যা বলছি তাই করুন।'

টি টি নেমে গেলেন। ছেলেটি ঘুরে দাড়িয়ে বলল, 'পার্টনাররা, তোমরা কোনও প্যাসেঞ্জারকে বিরক্ত কোরো না। সবাই দুদিকের দরজার সামনে চলে যাও।' ট্রেন ছাড়ল।

সায়ন ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিষ্ণুপ্রসাদ তার মাথার পাশে বসেছিল। উল্টো দিকের বেঞ্চিতে বসা পরিবার অদ্ভুত চোখে সায়নকে দেখছে। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী অসুখের নাম বলল?'

'লিউকোমিয়া।' বৃদ্ধ জবাব দিলেন।

'খুব খারাপ রোগ? ছোঁয়াচে?'

'বুঝতে পারছি না। শুনেছি এক ধরনের ক্যান্সার।'

'তাহলে বাঁচবে না। তোমার ছোটকাকা তো ক্যান্সারে মরেছেন।'

'চুপ করো! কার মুখ দেখে এবার বেরিয়েছিলাম!'

ট্রেন চলছে। রাত এখন প্রায় দশটা। যাত্রীরা যে যার খাবার প্রায় নিঃশব্দে খেয়ে নিয়েছে। বিষ্ণুপ্রসাদ কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে লক্ষ রাখছিল, রক্ত বের হচ্ছে না অনেকক্ষণ আগে থেকে। হঠাৎ সে দেখতে পেল সেই ভদ্রমহিলা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিষ্ণুপ্রসাদ কী করবে বুঝতে না পেরে হাসল।

'কেমন আছেন উনি?' ভদ্রমহিলা নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

বিষ্ণুপ্রসাদ ভাঙা বাংলায় বলল, 'ঘুম দিচ্ছে।'

'আমি একটু বসতে পারি?'

ভানুপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ভদ্রমহিলা সায়নের মাথার পাশে বসলেন। ঝুঁকে ওর নাক দেখলেন। বিষ্ণুপ্রসাদ দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'ঘুম দিলে ঠিক হো যায়েগা।'

'কী হয়েছে ওঁর?' ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

ওপাশের কর্তা জবাব দিলেন, 'লিউকোমিয়া, ডেঞ্জারাস ডিজিজ। বেশিদিন বাঁচে না। ইনফেকসাস কিনা জানি না।'

ভদ্রমহিলা চাপা গলায় ফোঁস করে উঠলেন, 'আপনি কি শিক্ষিত?'

ভদ্রলোকের মুখ দুমড়ে গেল। অন্য দিকে তাকালেন।

ভদ্রমহিলা বিষ্ণুপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরকম কি প্রায়ই হয়? এইভাবে রক্ত বেরিয়ে আসে?'

বিষ্ণুপ্রসাদ একটু চিন্তা করল। সায়নের দৈনন্দিন সমস্যার কথা সে জানে না। কিন্তু কিছুদিন ধরেই তো ওকে সুস্থ দেখছে সে। তাই বলল, 'নেহি। ডেইলি হয় না।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনি আপনার বার্থে শুয়ে পড়ুন। আমি ওঁর পাশে আছি।'

যে মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে সায়ন অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাঁর এই ব্যবহারে খুশি হল বিষ্ণুপ্রসাদ। কিন্তু তার খিদে পেয়ে গিয়েছিল। নিরাময় থেকে নিয়ে আসা খাবারের প্যাকেট ব্যাগে রয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা বের করে খেতে অস্বস্তি লাগল তার। সে দ্বিতীয় বাঙ্ক টেনে চেন লাগিয়ে উঠে পড়ল। ভদ্রমহিলা একটু কুঁজো হয়ে নীচে বসে রইলেন।

মালদা স্টেশনে ট্রেন থামার পর নেতা একজন ডাক্তারকে নিয়ে ওদের সামনে এলেন। ডাক্তার ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি ঠিক জানি না। তবে শুনলাম ইনি লিউকোমিয়া পেশেন্ট। ব্লিড করছিল। অনেকক্ষণ ঘুমোচ্ছেন।'

'এখন রক্ত পড়ছে?'

'না।'

'তাহলে ঘুমোক। এসব পেশেন্ট আমার আওতার বাইরে। আন্দাজে ওষুধ দেওয়া ঠিক হবে না। ঘুমই বেস্ট মেডিসিন।' ডাক্তার চলে গেলেন।

নেতা ছেলেটি গেল না। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল। ভদ্রমহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কিছু বলবেন?'

মাথা নাড়ল ছেলেটা। তারপর চলে গেল।

সারারাত ধরে যে স্টেশনেই ট্রেন থেমেছে সেই স্টেশনে হয় রেলের লোক নয় পুলিশ এসে হাত পেতেছে আর ছেলেগুলো টাকা দিয়ে গিয়েছে। যাত্রীদের মধ্যে যারা অত্যন্ত ঘুমকাতুরে তারা ছাড়া সবাই উটস্থ হয়ে সেসব দৃশ্য দেখেছে।

বোলপুর স্টেশনে যখন ট্রেন ঢুকল তখন ভোর হচ্ছে। ভদ্রমহিলা কুঁজো হয়ে বসে হেলান দিয়েছিলেন। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ অস্বস্তি হতেই তাকালেন। দেখলেন, সায়ন উঠে বসার চেষ্টা করছে। কিন্তু মাথার ওপর মধ্যের বাঙ্কটা থাকায় সে সোজা হতে পারছে না।

ভদ্রমহিলা দ্রুত বললেন, 'উঠবেন না ভাই, শুয়ে থাকুন।'

'কেন?' সায়নের ব্যাপারটা দুর্বোধ্য লাগল।

'আপনি অসুস্থ।'

সায়ন এবার মাঝখানের জায়গাটায় সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'না, আমি এখন ঠিক আছি। আপনি এখানে?'

'আমার জন্যে আপনি অসুস্থ হয়েছিলেন।'

'আপনার জন্যে হইনি। আমি অসুস্থতা সঙ্গে নিয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু ওরা কোথায়? ওরা আপনার কোনও ক্ষতি করেনি তো?'

'না। আপনার মুখে রক্ত দেখে ওরা অদ্ভুতভাবে পাল্টে গেল। নইলে তখন আমার যে কী হত ভাবলেই শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে।'

'অদ্ভুত তো।' কথাটা বলে সায়ন বিষ্ণুপ্রসাদের দিকে তাকাল। সে তখন আরামে ঘুমোচ্ছে। গতরাতে খাওয়া হয়নি, এখন খিদে পাচ্ছে। সে বিষ্ণুপ্রসাদকে ডাকতেই সাড়া পেল।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল নেপালিতে, 'কাল রাত্রে খেয়েছিলে?'

বিষ্ণুপ্রসাদ হাসল, 'আমরা কেউই খাইনি। উনিও না।' জবাবটা নেপালিতেই দিল সে।

এই সময় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো হকার দুটো চায়ের ভাঁড় জানলায় রেখে আর একটা আনতে আনতে বলল, 'দিদিমণি, চা নিন। গরম গরম চা। খেলে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।'

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনটে চায়ের দাম কত?'

হকার জিভ বের করল, 'দাম বললে দাদা আমার জিভ উপড়ে দেবে। আপনারা খেয়ে নিন দিদি।'

'তোমার দাদাটি কে?'

ছেলেটি তিনটে চায়ের ভাঁড় জানলার ওপরে রেখে সরে গেল উত্তর না দিয়ে। সায়ন বলল, 'আমি চা খাই না।'

'আমি খাই কিন্তু এই চা খেতে পারব না।'

'কেন?'

'আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে যে ছেলেটি আমাকে অপমান করেছিল সে-ই এই হকারের দাদা।' ভদ্রমহিলা বললেন।

সায়ন হাত বাড়িয়ে একটা ভাঁড় বিষ্ণুপ্রসাদকে দিতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। চলন্ত ট্রেনের ঝাঁকুনিতে জানলায় রাখা ভাঁড় থেকে চা চলকে পড়ল। ভদ্রমহিলা সেই ভাঁড় দুটো জানলার বাইরে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

ভদ্রমহিলা গজগজ করলেন, 'একে বলে জুতো মেরে গোরু দান। যাক গে, আপনার শরীর এখন কেমন আছে?'

'ভাল। কোনও প্রব্লেম নেই।'

'উত্তেজিত হলেই কি আপনার রক্তপাত হয়?'

'কখনওসখনও।'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। এই শরীর নিয়ে অমন সাহসী হলেন কী করে?'

সায়ন হাসল, 'মনে হয়েছিল প্রতিবাদ করা প্রয়োজন, তাই।'

'আপনার নাম জানা হয়নি।'

'সায়ন রায়।'

'আমি নন্দিতা। স্কুলে পড়াই। যাই, কাল সারারাত সিট ছেড়ে থেকেছি। জিনিসপত্রগুলো ঠিক আছে কিনা দেখি।' নন্দিতা চলে গেলেন।

সায়ন টয়লেটে গিয়ে দেখল দেওয়াল, প্যান ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। কোনওমতে পরিষ্কার হয়ে ফিরে এল সে। বিষ্ণুপ্রসাদের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'অসুখ বাড়েনি তো?'

মাথা নাড়ল সায়ন, 'না। এর আগে যতবার রক্ত বেরিয়েছে ততবারই শরীরে রক্ত দিতে হয়েছে। মনে হচ্ছে এবার তার প্রয়োজন হবে না।'

হঠাৎ ট্রেনটা গতি কমাল। এবার রাতের সেই ছেলেগুলো তৎপর হল। সিটের নীচ থেকে মালগুলো বের করে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করল জায়গার জন্যে। ট্রেন তখন চলতে হয় বলে চলছে। ঝপ ঝপ করে বান্ডিলগুলো ফেলতে লাগল ওরা। সেগুলো ফেলে দেওয়ার পর ওরা যাত্রীদের কাছে এল কাল রাতে গচ্ছিত রাখা দামি জিনিসগুলো ফেরত নিতে। ট্রেন তখন হুইসল দিচ্ছে।

নেতা ছেলেটি সায়নের সামনে এল, 'এখন কেমন আছেন?'

'ঠিক আছি।'

'এসব করতে আমাদের ভাল লাগে না কিন্তু না করেও উপায় নেই। আমাদের যদি ক্রিমিন্যাল বলা হয় তাহলে সেটা হতে কে বাধ্য করছে তা নিয়ে কেউ ভাবে না।'

'আপনি এত কৈফিয়ত দিচ্ছেন কেন?'

ছেলেটি হাসল, 'ঠিক। বোকার মতো ব্যাপার। চলি, দিদিমণির কাছে ক্ষমা চেয়ে এসেছি। উনি অবশ্য ক্ষমা করতে পারেন না।' ছেলেটি নেমে যাওয়া মাত্র যাত্রীরা সরব হল। ট্রেন তখন পূর্ণ গতিতে চলতে শুরু করেছে। রেল পুলিশ এবং কর্মচারীদের সঙ্গে চোরাকারবারিদের বন্দোবস্ত আছে, এ কথা সবাই সোচ্চারে বলাবলি করছিল। নইলে ট্রেনের ড্রাইভার ঠিক ওদের নেমে যাওয়ার জায়গায় গাড়ির গতি কমিয়ে দেবে কেন?

সায়ন শুনল নন্দিতা চিৎকার করে বললেন, 'আপনারা দয়া করে চুপ করবেন? ওরা যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তো ভিজে বেড়ালের মতো বসেছিলেন। এখন গলা ফাটিয়ে বীরত্ব দেখিয়ে কী লাভ?'

শেয়ালদা স্টেশনে নেমে নন্দিতা একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিলেন, 'সায়ন, এখানে আমার ঠিকানা ফোন নাম্বার লেখা আছে। তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট বলে তুমি বলছি। যদি ফোন করো তাহলে ভাল লাগবে। তুমি যা করেছ তা আমি সারা জীবন মনে রাখব।'

সায়ন হাসল। বিষ্ণুপ্রসাদ কুলি নিতে দিল না। অজস্র মানুষের ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সায়নের অস্বস্তি শুরু হল। এত মানুষ, কেউ কারও জন্যে না ভেবে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি বা বাস ধরতে। সায়ন বলল, 'দাঁড়াও, সবাই বেরিয়ে যাক, তারপর যাব।'

প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেলে বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'বাপ্‌স। কী বড় স্টেশন।' স্টেশনটাই যদি এত বড় হয় তাহলে শহরটা না জানি কত বড় হবে!'

সায়ন কথা বলল না।

ট্যাক্সি নিয়ে ওরা যখন রায়বাড়ির সামনে পৌঁছোল তখন দুপুর। এতদিন পাহাড়ের নির্জনতায় থেকে কলকাতার ভিড়, জ্যাম, গরম কাহিল করে দিয়েছিল সায়নকে। এই ট্যাক্সিটা পেতেও বাড়তি টাকা দিতে হয়েছে। বিষ্ণুপ্রসাদের কৌতূহল এত প্রবল ছিল যে কষ্টবোধ ছিল না।

বাড়ির সামনে পৌঁছে অবাক হয়ে গেল সায়ন। পরীগুলো নেই। সেই জায়গায় মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করছে কিছু লোক। সে বিষ্ণুপ্রসাদকে বলল, 'এই আমাদের বাড়ি।'

এই সময় পাঁড়েজি কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এল। ট্যাক্সি থেকে নেমে আসা সায়নকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল বৃদ্ধ, 'ও সানুবাবা, সব খতম হো গিয়া, বিলকুল খতম। ও মেরা গোপাল, তুম কাঁহা থা!'

সেই চিৎকার শুনে ওপরের জানলায় এসে উঁকি দিতেই নন্দিনীর শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। তাঁর মনে হল পাঁড়েজি এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

৩৪

ওপরে উঠে এসে সায়ন যখন তাঁকে প্রণাম করেছিল তখনও নন্দিনীর বুক কাঁপছিল। সায়নকে দেখে তাঁর ওরকম লাগছিল কেন? সায়নকে বুকে জড়িয়ে ধরেও তাঁর স্বস্তি হচ্ছিল না। সায়ন বলল, 'মা আমার সঙ্গে বিষ্ণুপ্রসাদ এসেছে।'

'বিষ্ণুপ্রসাদ কে?'

'আমাদের ওখানে থাকে।'

'তোদের ওখানে?' কথাটা মোটেই পছন্দ হল না নন্দিনীর।

'ওহো, নিরাময় নয়। ও পাহাড়ের ছেলে। খুব ভাল। ডাক্তার আঙ্কল আমাকে একা আসতে দিলেন না বলে ওকে অনুরোধ করেছিলাম।'

'কী করে সে?'

'এখন এলিজাবেথকে সাহায্য করছে, পরে সব বলব।'

সায়নের বাবার তখন সবে ঘুম ভেঙেছে। চায়ের কাপ নিয়ে বসেছিলেন। সেই কাপ হাতে বাইরের ঘরে এলেন তিনি, 'কেমন আছিস?'

সায়ন বাবার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে মনে অভিমানের মেঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে এতদিন পাহাড়ে রয়েছে অথচ বাবা সময় পায়নি দেখা করার। শেষমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিতে পারল সে। বলল, 'ভাল।'

'পথে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

'না।'

নন্দিনী বললেন, 'ওর সঙ্গে একটি ছেলে এসেছে। পাহাড়ি ছেলে। ডাক্তারবাবু সঙ্গে পাঠিয়েছেন।'

সায়ন প্রতিবাদ করল, 'না, না। ডাক্তার আঙ্কল পাঠাননি। আমি অনুরোধ করেছিলাম বলে এসেছে।'

সায়নের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কি আজই ফিরে যাবে?'

'দূর। আজ ফিরবে কেন? ও তো এর আগে কলকাতায় কখনও আসেনি। সদুদাকে বলতে হবে ওকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতে।'

নন্দিনী আর কথা বাড়াতে রাজি হলেন না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে জলখাবার খেয়ে সায়নকে বিশ্রাম নিতে বললেন তিনি।

সায়ন বলল, 'বিষ্ণুপ্রসাদকে ডাকো।'

সায়নের বাবা বললেন, 'ওর কথা চিন্তা করতে হবে না। পাঁড়েজিকে বলে দিচ্ছি, নীচেই ওর ব্যবস্থা করে দেবে।'

সায়ন বলল, 'তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না বাবা! বিষ্ণুপ্রসাদ পাঁড়েজিদের মতো নয়। ও আমাকে পছন্দ করে বলে অনেক কাজ ফেলে কলকাতায় এসেছে। মা, তুমি ওকে ওপরে আসতে বলো। আমার ঘরে অনেক জায়গা, ওখানেই বিষ্ণুপ্রসাদ থাকবে।'

সায়ন নিজের ঘরে চলে গেলে নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করব?'

সায়নের বাবার মুখ গম্ভীর, বললেন, 'দিস ইজ টু মাচ। রায়বাড়ির ইতিহাসে অবাঙালি দূরের কথা অনাত্মীয়কেই বাড়ির ভেতরে কখনও রাত কাটাতে দেওয়া হয়নি। ছেলেটা নিশ্চয়ই নেপালি। ওর ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা জানি না। হুট করে সায়নের বেডরুমে ওকে থাকতে বললে অন্য সবাই কী বলবে?'

নন্দিনী বললেন, 'আগে ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে দ্যাখো, কী রকম তা তো জানো না।'

'কথা বলে কী হবে?'

তবু নন্দিনী কাজের মেয়েকে দিয়ে নীচে খবর পাঠালেন। একটু বাদে তার পেছন পেছন বিষ্ণুপ্রসাদ উঠে এল। হাতে ব্যাগ। ঘরে ঢুকে নমস্কার করল খুব বিনীত ভঙ্গিতে।

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম বিষ্ণুপ্রসাদ?'

'জি।'

'বাংলা জানো?'

'কম কম।'

নন্দিনী হেসে ফেললেন। সায়নের বাবা গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কলকাতায় কতদিন থাকার ইচ্ছে?'

মাথা নাড়ল বিষ্ণুপ্রসাদ। তারপর হিন্দি বাংলা মিশিয়ে বলল, 'আমি জানি না। সায়ন যেমন বলবে তেমন হবে।'

'কলকাতায় কোনও আত্মীয়স্বজন নেই?'

মাথা নাড়ল বিষ্ণুপ্রসাদ, নেই। তারপরই মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'সায়নের শরীর ভাল নেই। ওকে এখনই ডাক্তার দেখান।'

নন্দিনীর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'কেন? কী হয়েছে?'

'কাল রাত্রে ট্রেনে ওর নাক থেকে রক্ত পড়েছিল।'

'সে কী? ও তো কিছু বলল না!'

'হ্যাঁ। ওষুধ খেয়ে সারারাত ঘুমোবার পর ঠিক হয়েছে।'

সায়নের বাবা বললেন, 'তা হলে নিরাময়ে থেকে তো ওর কোনও উপকারই হয়নি। আমি তোমাকে বলেছিলাম! তুমি যখন ওখানে গিয়েছিলে তখনও তো ব্লিডিং হয়েছিল!'

কথাটায় কান না দিয়ে নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বাবা, ওখানে কি ওর প্রায়ই রক্ত পড়ত?'

'না, না। ও তো আমাদের মতো হয়ে গিয়েছে। মিস্টার ব্রাউনের ডেডবডির সঙ্গে হেঁটেছে। আমাকে খবর দিতে ম্যাডামের বাড়িতে গিয়েছিল।'

'তুমি কি অনেক দূরে থাকো?'

'হ্যাঁ। নিরাময় থেকে অনেক ওপরে।' বিষ্ণুপ্রসাদ জবাব দিল।

সায়নের বাবা বললেন, 'হোয়াট ইজ দিস। ডাক্তার ওকে অ্যালাউ করল কী করে পাহাড়ে উঠতে?'

নন্দিনী বললেন, 'ঠিক আছে, এখন এ নিয়ে মাথা গরম কোরো না। ছেলেটা তো স্বাভাবিকভাবেই বাড়িতে এসেছে। তুমি আমার সঙ্গে এসো।' সায়নের বাবার অসন্তুষ্ট মুখের দিকে না তাকিয়ে নন্দিনী বিষ্ণুপ্রসাদকে নিয়ে ভেতরে গেলেন। সায়নের ঘরে ঢুকে দেখলেন বাথরুমের দরজা বন্ধ। জলের আওয়াজ হচ্ছে। বললেন, 'এই ঘরে সায়নের সঙ্গে তুমি থাকবে। আচ্ছা, ট্রেনে কি হঠাৎই ওর নাক থেকে রক্ত বেরিয়েছিল?'

মাথা নাড়ল বিষ্ণুপ্রসাদ, 'না। একটা গোলমাল হয়েছিল। কতকগুলো গুণ্ডা একজন মেয়েকে ভয় দেখাচ্ছিল। ও প্রতিবাদ করতে গেল হঠাৎই। সেই সময় রক্ত বেরিয়ে এসেছিল।'

নন্দিনী চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর বুক জুড়িয়ে গেল খবরটা শুনে।

এই সময় দরজা খুলে বের হল সায়ন। স্নান সেরে নিয়েছে ইতিমধ্যে। বলল, 'এসেছ। যাও, চান করে নাও। ভাল লাগবে। মা খিদে পেয়েছে।'

'তুই এইসময় ওখানে কী খেতিস?'

'ওখানকার কথা ভুলে যাও, বাড়িতে যা আছে তাই দাও।'

'বাঃ, ভুললে চলবে কেন? ডাক্তার নিশ্চয়ই কখন কী খাবি তার চার্ট করে দিয়েছেন। লুচি তরকারি খেতে বলেছেন?'

সায়ন হাসল, 'অনেকদিন খাইনি। তরকারি নয়, বেগুনভাজা করো লুচির সঙ্গে।'

বিষ্ণুপ্রসাদ টয়লেটে ঢুকে গেলে নন্দিনী সায়নের কাছে এলেন, 'এই, মুখ তোল, দেখি তো।'

সায়ন অবাক, 'মুখ দেখার কী হল?'

'কাল রাত্রে ট্রেনে রক্ত বেরিয়েছিল?'

'ওঃ, এর মধ্যেই রিপোর্ট পেয়ে গেছ? ও কিছু নয়।'

'তোর কী দরকার ছিল অন্যের ঝামেলায় জড়াবার?'

'বাঃ। ধরো আমি তোমাকে চিনি না, তুমি আমার মা নও। তোমাকে কতকগুলো গুণ্ডা অসম্মান করছে দেখে আমি চুপ করে থাকব?'

নন্দিনী ঢোঁক গিললেন, 'কিন্তু তুই নিজে দুর্বল, গুণ্ডাদের সঙ্গে পারবি?'

'অন্যায়ের প্রতিবাদ যে করে সে আর দুর্বল থাকে না। তখন যে অন্যায় করে সে-ই দুর্বল হয়ে যায়।' সায়ন চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, 'তা ছাড়া ওই ছেলেগুলো তো সত্যিকারের গুণ্ডা নয়।'

'তার মানে? ওরা শুনলাম একটি মেয়েকে—!'

'ঠিকই শুনেছ। কিন্তু সেটা করছিল ভয় পেয়ে। ভদ্রমহিলার জন্যে একটু হলে ওরা ধরা পড়ে যেত। আর ধরা পড়লে ওদের সামনে কোনও পথ খোলা থাকত না। ওরা স্মাগলড্ জিনিস কলকাতায় পৌঁছে দিচ্ছিল। জিনিসগুলো ওদের নয়। যদি না দিতে পারে তা হলে স্মাগলার ওদের শেষ করে দেবে। যদি দিতে পারে তা হলে সামান্য টাকা পাবে।'

'এটা অন্যায় নয়?'

'নিশ্চয় অন্যায়। কিন্তু ছেলেগুলো কেন এই অন্যায় করছে! ওদের অনেকেই পড়াশুনা করেছে। কিন্তু চেষ্টা করেও কাজকর্ম পায়নি। এই দেশের সরকার ওদের পাশে দাঁড়ায়নি। একটা লোককে দিনের পর দিন অনাহারে রাখবে অথচ তাকে সৎ হতে বলবে এটা কতদিন সে মেনে নিতে পারে?'

'কিন্তু তুই যদি আরও অসুস্থ হয়ে যেতিস? শোন, খেয়েদেয়ে একবার বাবার সঙ্গে ডক্টর দাশগুপ্তের কাছে যাবি।'

'কেন?'

'কেন আবার? কাল রাত্রে রক্ত পড়েছিল, ওরকম হলে তো আগে ব্লাড দিতে হত।'

'তখন আমি শয্যাশায়ী হয়ে যেতাম। এবার তেমন কিছু হয়েছে? সকালে ঘুম ভাঙার পর কোনও অসুবিধে অনুভব করিনি। তুমি চিন্তা কোরো না।'

রান্নাঘরে কাজের মেয়েকে কী কী করতে হবে নির্দেশ দিয়ে নন্দিনী স্বামীর কাছে গেলেন, 'কী হল তোমার?'

'তোমাদের জন্যে আমি পাগল হয়ে যাব।'

'হঠাৎ?'

'হঠাৎ নয়। চিরকালই। এই ছেলের অসুখের পেছনে কী পরিমাণ খরচ হচ্ছে তুমি জানো। তবু আমি কখনও কার্পণ্য করিনি, কিন্তু ও যদি আমার ওপর মানসিক টর্চার করে তা হলে আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আর তুমি তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছ। ওই উটকো নেপালি ছেলেটার স্ট্যাটাস কী আমরা জানি না। হয়তো ওর বাবা মালপত্র বয়, কুলির কাজ করে। তুমি তাকে আমার কথা অস্বীকার করে ভেতরে নিয়ে গেলে। চমৎকার!'

নন্দিনীর স্বামীর কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, 'আমি কোনও অন্যায় করিনি। এ বাড়িতে কোনও অল্পবয়সী মেয়ে নেই যে বাইরের ছেলেকে ভেতরে ঢোকালে সমস্যা হবে। তা ছাড়া যে নেপালি ছেলেটা আমার অসুস্থ ছেলেকে কলকাতায় পৌঁছে দিচ্ছে কোনও স্বার্থ ছাড়াই তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হব কেন? সায়ন ওকে বন্ধু বলে মনে করে। ওকে ওপরে না নিয়ে এলে তোমার ছেলে ক্ষেপে যেত। আর স্ট্যাটাস নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছ? রায়বাড়ি রায়বাড়ি করে তো অনেকদিন

কাটালে, কদিন বাদে সেই রায়বাড়ি ধুলোয় মিশে যাবে। তার বন্দোবস্ত তো নিজেরাই করেছ। আর কেন?'

'ছেলেটা কবে যাবে?'

'তুমি জিজ্ঞাসা করো।'

'বুঝতে পারছ না কেন, অন্য শরিকরা আমাকে ওর ব্যাপারে প্রশ্ন করলে কী জবাব দেব?'

'ছেলেকে দেখিয়ে দিও।'

এরকম বাড়িতে বিষ্ণুপ্রসাদ কখনও থাকেনি। এত বড় ঘর, ছাদ কত উঁচুতে। বাথরুমটা শোওয়ার ঘরের চেয়ে বড়। চৌবাচ্চা ভর্তি জল সেখানে। সায়নের পাশে বসে লুচি বেগুনভাজা মিষ্টি খাওয়ার সময় তাকে বেশ তৃপ্ত দেখাচ্ছিল।

নন্দিনী ওদের খাওয়া দেখছিলেন। সায়নকে অনেকদিন পরে তিনি স্বাভাবিক মানুষের মতো খেতে দেখছেন। ওর চোখমুখে অসুস্থতার চিহ্নমাত্র নেই। পাহাড়ে যখন গিয়েছিলেন, ছেলেকে ট্যুরিস্ট লজে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন তখনও এমন প্রাণবন্ত ছিল না।

খাওয়া শেষ হলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার পেট ভরেছে বিষ্ণু?'

'জি।'

'এখন দুজনে গল্প করো। দুপুর একটায় খেতে দেব।' নন্দিনী চলে গেলেন।

সায়ন বলল, 'এখন রেস্ট নাও। আমি সদুদাকে বলছি তোমাকে যাতে কলকাতা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেয়।'

'সদুদা কে?'

'আমার এক দাদা। তুমি টিভি দেখবে?'

এ বাড়িতে টিভি রয়েছে বাইরের ঘরে। সেখানে তখনও সায়নের বাবা বসেছিলেন। সেই ঘরে ঢুকে সায়ন বলল, 'বাবা, টিভিটা একটু খুলব, বিষ্ণুপ্রসাদ দেখবে।

সায়নের বাবা কিছু না বলে ভেতরে চলে গেলেন। টিভি খুলে একটা সিনেমার চ্যানেল ধরে বিষ্ণুপ্রসাদকে বসিয়ে সায়ন বাইরে বেরিয়ে এল। নীচে নেমে পাঁড়েজির কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল সদানন্দ বাদলকে নিয়ে সকালবেলায় বেরিয়ে গেছে।

ওপাশে মাঠের ভেতর কুলিরা কাজ করছে। ভিত শেষ। অনেক যন্ত্রপাতি আসছে। ওখানে বাড়ি উঠবে।

সায়ন ভেতরে পা বাড়াল। মা ব্যাঘ্রবাহিনী ঠিক আগের মতনই আছেন। এই সকাল পেরিয়ে যাওয়া সময়টা তাঁর পুজোয় বসেছেন ঠাকুরমশাই।

'ও কে? সানু না?'

ডাক শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে আতরবালাকে দেখতে পেল সায়ন। হাতে পুজোর থালা নিয়ে এগিয়ে আসছে। সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'বড়মা কেমন আছেন?'

'এখনও আছেন। মা ব্যাঘ্রবাহিনী যতদিন রাখবেন ততদিন তো থাকতেই হবে। তুমি কবে এলে?' আতরবালা সামনে এসে দাঁড়াল।

'আজই।'

'ওরা ছেড়ে দিল?'

'কারা?'

'ওই যে, কোন পাহাড়ের হাসপাতালে গিয়েছিলে!'

'না ছাড়লে এলাম কী করে?'

আতরবালার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। ছেলেটার চলাবলার মধ্যে অসুস্থতা দেখতে পাচ্ছিল না সে। অথচ এতদিন শুনেছে ওর মরণরোগ হয়েছে।

সায়ন সরে এল। এই মহিলাকে দেখলেই তার শাকচুন্নির ছবি মনে পড়ে। উর্মিলা কাকিমার কাছে রাজশেখর বসুর একটা বই আছে। কী যেন তাঁর ছদ্মনাম? হ্যাঁ, পরশুরাম। সেই বইয়ে আতরবালার

একটা ছবি আছে। সিঁড়ি ভেঙে সে একটা বন্ধ দরজায় পৌঁছে গেল।

দরজা খুলল কালোর মা, 'ওমা, এ যে সানুদাদা।'

'টুপুর কোথায়?'

কালোর মায়ের চিৎকার শুনে প্রথমে ছুটে এল টুপুর, 'আরে! তুমি? কখন এলে? আমার চিঠি পেয়েছ। মা, দ্যাখো, কে এসেছে!'

কৃষ্ণা দরজায় এলেন, 'ওমা, সানু, এসো, এসো।'

সায়নকে নিয়ে হইচই পড়ে গেল। টুপুর একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে। সমরেন্দ্রনাথ এবং সৌদামিনী এলেন। ওঁদের সমস্ত কৌতূহল মেটাতে হল সায়নকে। শেষ পর্যন্ত সমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওখানকার ডাক্তার কী বলছেন? আর যেতে হবে না তো?'

এই প্রশ্ন এখনও বাবা বা মা করেননি। সায়ন বলল, 'আমি এখানে কিছুদিনের জন্যে এসেছি।'

'তার মানে? তোমার অসুখ সারেনি?'

'এই অসুখ কখনও সারে না। ঠিকঠাক নিয়ম মেনে চললে বেশ কিছু দিন বেঁচে থাকা যায়।' সায়ন হাসল।

'সে কী? তাহলে ওখানে গিয়ে কী লাভ হল?' সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওখানে না গেলে হয়তো এতদিনও বাঁচতাম না।'

মুহূর্তেই পরিবেশ গম্ভীর হয়ে গেল। সেটাকে সহজ করতে সায়ন বলল, 'কোনও মানুষ কি চিরকাল বেঁচে থাকে? কেউ ষাট কেউ সত্তর কেউ আশি। আমার বেলায় হয়তো তার চেয়ে কম।'

কৃষ্ণা বললেন, 'ওষুধ-টষুধ ঠিকঠাক খাচ্ছ তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার কিন্তু তোমার চেহারা আগের থেকে অনেক ভাল লাগছে।' কৃষ্ণা বললেন, 'বোসো, একটু মিষ্টি আনি।'

'না না। আমি এইমাত্র পেটপুরে লুচি আর বেগুনভাজা খেয়েছি। পরে এসে খাব।' সায়ন হাত নাড়ল।

সৌদামিনী বা কৃষ্ণা কাজ ফেলে এসেছিলেন। তাঁরা ভেতরে চলে গেলে সায়ন সমরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই বাড়ি কবে ভেঙে ফেলা হবে?'

'ভগবান জানেন। ওরা যে গতিতে কাজ করছে তাতে নতুন বাড়ি শেষ হতে বছর দুয়েক লেগে যাবে। এদিকে দিন দিন এ বাড়িটা নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। এখন খরচা করে সারাবারও মানে হয় না।' সমরেন্দ্রনাথ কথা ঘোরালেন, 'তোমার আর পড়াশুনা হল না!'

'না। অবশ্য পড়াশুনা করেও বা কী লাভ হত।'

'কেন? এ আবার কীরকম কথা।'

'বেশিদিন তো বাঁচব না। ডিগ্রি নিয়ে কারও উপকারে লাগব না। আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ বেঁচে থাকে বেঁচে থাকার জন্যে। কেন বেঁচে আছে তারা নিজেরাই জানে না। মরে যাওয়ার পর তাদের কথা কেউ বলে না। অনেকটা গোরু-ছাগলের মতো। তাই যে যার মতো কিছু কাজ যা মানুষের উপকারে আসবে করে গেলে বেঁচে থাকার পক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়।'

সমরেন্দ্রনাথ তাকালেন। তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন, 'বোসো, কথা বলো। আমাকে আবার একটু বেরুতে হবে।'

তিনি চলে গেলে টুপুর এই প্রথম ফিক করে হেসে ফেলল।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছ যে?'

'বাবার বের হওয়ার কথা বিকেলবেলায়। তোমার কথাগুলো ভাল লাগল না বলে চলে গেল।'

সায়ন ভেবে পেল না খারাপ লাগার মতো কী কথা সে বলেছে।

টুপুরের দিকে তাকাল সায়ন। টুপুরটা যেন পাল্টে গেছে। কীরকম বড় বড় ভাব। আগে টুপুর তাকে দেখতে পেলেই গা ঘেঁষে বসত। আজ এ বাড়িতে ঢোকার সময় ওর মধ্যে সেই আগের অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই গুটিয়ে গিয়েছে। সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার খবর

কী?'

'ভাল।'

'এরকম গম্ভীর কেন?'

'মেয়েরা বড় হলে বেশি কথা বলতে নেই। লোকে ছ্যাবলা বলবে।'

'তুমি বড় হচ্ছ?'

'বাঃ। হচ্ছি না?

'কোন ক্লাস তোমার?'

'ক্লাসে ওঠা ছাড়াও মেয়েরা বড় হয়।'

'আমি জানি না।'

'কী করে জানবে! তুমি তো আর মেয়ে নও।'

সায়ন উঠল, 'আমি চলি।'

'ওমা, এই তো এলে, চলে যাচ্ছ কেন?'

'যাই, সবার সঙ্গে দেখা করতে হবে। টুপুর। তুমি মন দিয়ে পড়াশুনা করবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।'

'বাঃ। এইমাত্র বললে ডিগ্রি নিয়ে কোনও লাভ হবে না।'

'সেটা আমার ক্ষেত্রে। তোমাকে অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে। তাই না?'

টুপুর হাসল, 'ঠাকুমা বলে বিদ্যের জাহাজ হয়ে কোনও লাভ নেই। সেই তো শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে হাঁড়ি ঠেলতে হবে। যে মেয়ে বিয়ে করবে না তার পড়াশুনা করা উচিত।'

অবাক হয়ে তাকাল সায়ন। টুপুরটা কীকরম বদলে গিয়েছে। রায়বাড়ির গিন্নিরা যে গলায় কথা বলে সেই গলায় বলছে। সে বলল, 'আসছি।'

'আবার এসো কিন্তু।'

দরজা বন্ধ হয়ে গেলে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল সায়ন। তার হঠাৎ শীত শীত করতে লাগল। অথচ এখন কলকাতায় বেশ গরম। সে জোরে জোরে নিশ্বাস নিল।

উর্মিলা অবাক। দরজা খুলে সায়নকে দেখে জড়িয়ে ধরল সে। বই হাতে নিয়ে কমলেন্দু উঠে এল। হঠাৎ কার সঙ্গে কলকাতায় এল সব খুলে বলতে হল সায়নকে। সেটা শেষ হলে সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা তোমার কাছে রাজশেখর বসুর একটা বই ছিল না? ভেতরে ছবি আঁকা?'

'দুখানা আছে। কজ্জলি আর হনুমানের স্বপ্ন।' উর্মিলা হাসল, 'পড়বি?'

'শাকচুন্নির ছবি আছে না একটাতে?'

'হ্যাঁ। কেন বল তো?'

'বড়মায়ের কাজের লোক আতরবালাকে দেখে সেই ছবিটার কথা মনে পড়ল একটু আগে। কী রোগা হয়ে গেছে, না?'

উর্মিলা চোখ বড় করল, 'তুই তো ভীষণ পেকে গিয়েছিস! এরপর হয়তো আমাকে কারও সঙ্গে তুলনা করবি। কদিন থাকবি বল?'

'দেখি।'

কমলেন্দু বলল, 'তোর শরীর যদি একটু ঠিক থাকে তাহলে আর ওখানে যাওয়ার কী দরকার বল!'

'এখানে থেকে আমি কী করব?'

'বাড়িতে থাকবি, বই পড়বি। তোর মা খুশি হবে।'

সায়ন উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে এমন ভঙ্গিতে হাসতে লাগল যে কমলেন্দু আর এই প্রসঙ্গে কথা বলল না।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের ছাদে যাওয়া যাবে?'

'কেন যাবে না, চল।' উর্মিলা উঠে দাঁড়াল।

কমলেন্দু মনে করিয়ে দিল, 'এখন কিন্তু চড়া রোদ।'

সায়ন বলল, 'কষ্ট হলেই চলে আসব।'

উর্মিলার সঙ্গে ছাদে এল সায়ন। বিশাল ছাদ। এককালে এখানে কত খেলা করেছে সে। সেইসব স্মৃতি চোখের সামনে ভাসছিল।

এখন ছাদে কিছু জামাকাপড় শুকোচ্ছে। কোনও মানুষ নেই। এত বড় ছাদ খাঁ খাঁ করছে। ঝুঁকে রাস্তা দেখল সায়ন। উর্মিলা পাশে ছিল, বলল, 'নতুন বাড়িতে এত সহজে ছাদে যাওয়া যাবে না।'

সায়ন বলল, 'নতুন বাড়ির নামও কি রায়বাড়ি হবে?'

'কী জানি। নামে কী আসে যায়।'

'তোমাকে একটা কথা বলব?'

'কী কথা?'

'একটু আগে টুপুরদের ওখানে গিয়েছিলাম। ও কেমন বদলে গেছে। এখন কথা বলছে এমন ভাবে যেন দিদিমা। ওর এখন থেকেই মাথায় ঢুকে গেছে বিয়ে হবে এবং সংসার করবে। অতএব পড়াশুনোর তেমন দরকার নেই।'

'নিশ্চয়ই ওর মা ঠাকুমার মুখে ওই রকম শুনেছে', উর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, ' এতে মন খারাপ হল কেন?'

'আমি ভেবেছিলাম ও অন্যরকম হবে। চলো. নীচে যাই।'

উর্মিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নীচে নামতেই সদানন্দর সঙ্গে দেখা। হইচই করে সদানন্দ তাকে তার অফিসঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'ফেয়ার ওয়েল টু পাহাড় হয়ে গেছে?'

'না।'

'সে কী? আবার যাবি নাকি?'

'দেখি। শোনো, তুমি একটা উপকার করবে? আমার সঙ্গে একটি নেপালি ছেলে এসেছে। ওর নাম বিষ্ণুপ্রসাদ। এর আগে কখনও কলকাতায় আসেনি। ওকে তোমার বাইকে বসিয়ে কলকাতা দেখিয়ে দেবে?'

'কলকাতা দেখাব মানে?'

'ওই যে, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, প্ল্যানেটোরিয়াম, কালীঘাটের মন্দির—।'

'দূর। চিড়িয়াখানা ছাড়া আমি নিজে কিছুই দেখিনি।'

'তাহলে?'

সদানন্দ হাসল, 'হবে। এই সুযোগে দেখা হয়ে যাবে।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সায়ন, 'আজ বিকেলে যাবে?'

'আজ? আজ কেন?' সদানন্দ মাথা নাড়ল।

'ও তো বেশিদিন থাকবে না।'

'কোথায় আছে?'

'আমাদের বাড়িতে।'

চমকে উঠল সদানন্দ, 'সে কী রে! তুই দেখছি বিপ্লব করেছিস। তোর মা-বাবা রাজি হল? এ বাড়িতে তো এরকম ঘটনা এর আগে ঘটেনি। সাবাস। তাহলে তো নিয়ে যেতেই হয়। ঠিক আছে, তিনটের সময় রেডি থাকতে বলিস। তুই যাবি না?'

'না। তা ছাড়া তোমার বাইকে তিনজনের অসুবিধে হবে। ও হ্যাঁ, তোমার বিয়ে কবে?' সায়ন হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখটা কালো হয়ে গেল সদানন্দের, ঠোঁট কামড়াল।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে সদুদা!'

'আমি খুব প্রব্লেমে পড়ে গেছি সানু। তুই তো বড় হয়েছিস, তোকে বলা যায়। কিন্তু আর কাউকে বলিস না।' সিগারেট নেবাল সদানন্দ, 'যার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়েছে, ওর মা আমার মা এগিয়ে গেছে, দিন ঠিক হওয়ার মুখে, তোকে তাই বলে এসেছিলাম, মনে আছে?'

'আছে।'

'সেই মেয়েটি আর একটা ছেলেকে ভালবাসে।'

'সেকী?'

'অবাক হওয়ার কী আছে? ভাল তো বাসতেই পারে। তা মেয়েটি আমাকে আলাদা জানিয়েছে। বলেছে জানার পরেও যদি আমি তাকে বিয়ে করি তাহলে সে বাধ্য হয়ে বিয়ে করবে কারণ গুরুজনদের অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ সেই ছেলেটা, বুঝলি, বেকার। চাকরি করে না। করলে তাকে বিয়ে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। আমি আর বাদল ছাড়া এ ঘটনা কেউ জানে না, আজ তুই জানলি।'

'তারপর?'

'তারপর বাদল পরামর্শ দিল বিয়েটা যে কোনও ছুতোয় কিছুদিন পিছিয়ে দিতে। ওই ছেলেটার সঙ্গে দেখা করে আমাদের গাড়ির লাইনের ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিয়েছি। শিক্ষিত ছেলে তো, চটপট কাজ বুঝে নিয়েছে। এই তো গতকাল একটা মারুতির ডিল করিয়ে দিল, হাজার দশেক পাবে। বলেছি, মাস ছয়েকের মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যেন বিয়ে করে ফেলে।'

'মাস ছয়েক?'

'হ্যাঁ। মাকে বলেছি তার আগে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না। যাক গে, তুই ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিবি। তিনটের সময়।'

সায়ন বলল, 'সদুদা, তুমি এত ভাল!'

'দূর। আমার মাথায় এসব ঢুকত নাকি? বাদলের পরামর্শে—, ঠিক আছে।'

চাতালের পাশ দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল সায়ন। সে যখন এখানে থাকত তখন এই সিঁড়িটা প্রায় নিষিদ্ধ এলাকা ছিল। একমাত্র বিজয়া দশমীর সন্ধেবেলায় যেতে হত প্রণাম করতে।

সিঁড়ির মাঝখানে মিষ্টি তামাকের গন্ধ নাকে এল। গন্ধরাজ। সামনেই তাঁর দরজা। মায়ের নিষেধ ছিল ওই দরজা পার হওয়ার। শুধু সে কেন, এ বাড়ির কোনও ছেলেমেয়ে গন্ধরাজের ঘরে গিয়েছে কিনা সন্দেহ।

দরজা খুলল আতরবালা। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

'বড়মায়ের সঙ্গে দেখা করব।'

'ওঁর শরীর ভাল নেই, শুয়ে আছেন।'

'ও। ঠিক আছে।'

এইসময় ভেতর থেকে কাঁপা গলা ভেসে এল, 'কে? কে রে আতর?'

আতরবালা মাথা নাড়ল, 'হয়ে গেল! আর কী হবে ; এসো ভেতরে এসো। নইলে আমার মাথার পোকা বের করে ফেলবে।'

আতরবালার পেছন পেছন ঘরে ঢুকল সায়ন। সেইসব প্রাচীন আসবাব, ঘর সাজানোর জিনিসগুলোকে এখনও দেখতে পেল সে। বড়মা শুয়ে আছেন ইজিচেয়ারে। পেছনে এবং দুপাশে বালিশ, পা দুটো খাটো টেবিলের ওপর ছড়ানো। শুয়ে থাকা মানুষকে প্রণাম করতে নেই।

'আমি সায়ন, চিকিৎসার জন্যে পাহাড়ে গিয়েছিলাম, আজ ফিরে এসেছি। আপনাকে নমস্কার করতে এলাম।'

'কে পাঠাল?' চিঁচি করে জানতে চাইলেন বড়মা।

'কেউ না।'

'অসুখ শুনেছিলাম সারবার নয়, সারল কী করে?'

'এখনও সারেনি।'

'ছোঁয়াচে নাকি? মুখ দিয়ে রক্ত পড়া তো ছোঁয়াচে রোগ।'

'আমার নাক এবং কান দিয়েও পড়ে।' সায়ন হাসল, 'আপনি কি এখন একা আছেন এ বাড়িতে?'

হঠাৎ বড়মা দু হাতে মুখ ঢাকলেন, 'ও আতর, ও মুখপুড়ি, ওকে এখান থেকে যেতে বল। এই বয়সে আমার রাজরোগ হলে মরে যাব। হুঁ হুঁ হুঁ।' অদ্ভুত নাকি কান্না জুড়ে দিলেন বৃদ্ধা। সায়ন দেখল ওঁর হাত কাঁপছে। চামড়া ঝুলে গিয়েছে এখন, তাতে অজস্র কুঞ্চন, শরীর থলথলে। এখন বোধহয়

হাঁটতেও পারেন না।

আতরবালা এগিয়ে এল, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী করবে? চলো।'

ঠিক সেইসময় ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল গন্ধরাজ। ঢুকেই নাক টেনে নস্যি নিল, 'ওরে বাবা! তুমি আবার কোত্থেকে হাজির হলে? রোগ সারাতে পাহাড়ে গিয়েছিলে না?'

সায়ন দেখল বৃদ্ধের ভাঙচুর হয়ে যাওয়া মুখের সঙ্গে কালো কলপ লাগানো চুল একদম বেমানান। ঠিক তখনই চিৎকার করে উঠল বড়মা, 'আবার এসেছে, শকুনটাকে আবার ঢুকতে দিলি কেন আতর?'

গন্ধরাজ ধমকাল, 'শকুন? আমি শকুন? এই আমি না থাকলে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে মুখাগ্নি করবে কে? নাতি তো তার বউকে নিয়ে ভাগলবা। কৃতজ্ঞতা বলে কোনও বোধ নেই?' তারপর গলার স্বর অদ্ভুতরকমের মোলায়েম করে বলল, 'ও আতর, আতরবালা, একটু আমার ঘরে আসবে, দরকারি কথা আছে।'

আতরবালা চোখ ঘোরাল, 'মরণ!'

তাই দেখে খুব খুশি হলেন গন্ধরাজ। টস করার মতো আঙুল বাজিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সায়ন এগিয়ে গেল বড়মায়ের সামনে। 'যাই।'

বড়মা চোখ মেললেন। খুব ক্লান্ত দৃষ্টি। হঠাৎ সেই দৃষ্টি পাল্টে গেল। চোখ বিস্ফারিত হল। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'ঠাকুর ঠাকুর! গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।'

আতরবালা জোর করে সায়নকে বাইরে পাঠিয়ে দিল। দ্রুত নীচে নেমে সদানন্দ আর বাদলকে দেখতে পেল সায়ন, 'সদুদা, বড়মার শরীর বোধহয় খারাপ হয়েছে। চোখ মুখ কেমন করছে।'

সদানন্দ কান পাতল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আতর নেই ওখানে?'

'আছে।'

'তাহলে কিছু হয়নি। গোলমাল হলে আতর কানের পর্দা ফাটাত।'

'তবু চলো না।' সায়ন প্রায় জোর করেই সদানন্দকে নিয়ে ওপরে উঠল আবার। দরজা ভেজানো। আতরবালা কোথাও নেই। বড়মায়ের মাথাটা কাত হয়ে রয়েছে একদিকে। শরীরে প্রাণ নেই।

৩৫

সদানন্দ এগিয়ে গেল, 'বড়মা! বড়মা।'

কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। নাকের তলায় আঙুল দিয়ে মাথা নাড়ল, 'যাঃ, রায়বাড়ির ওল্ডেস্ট লেডি মরে গেল। সবাইকে খবর দিতে হয়।'

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'আতরবালা কোথায় গেল?'

'ঠিক। এখানে ছিল দেখে গিয়েছিস তুই?'

'হ্যাঁ।'

'চল তো, ওই ঘরগুলো দেখি।'

ভেতরের কোনও ঘরেই সে নেই। সদানন্দ চাপা গলায় বলল, 'বুড়ি মরে গেছে দেখেও চিৎকার না করে আতর গেল কোথায়?'

এই সময় বাইরের ঘরে শব্দ হল। গন্ধরাজের গলা ভেসে এল, 'দরজাটা বন্ধ করে দাও। কেউ ডাকলে বলবে বুড়ি ঘুমোচ্ছে, দেখা হবে না।'

আতরবালার গলা শোনা গেল, 'আমার খুব ভয় করছে।'

'আমার ওপর ভরসা রাখো। পাবলিক জানলে তুমি বা আমি এক পয়সাও পাব না। এ বাড়ির অন্য শরিকরা দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেবে। বুঝতে পারছ? এখন হচ্ছে মাল গোটানোর সময়। কিন্তু তার আগে দেখে নিতে হবে বুড়ি ঠিকঠাক পটল তুলেছে কিনা।'

সায়ন দেখল সদানন্দ তাকে ঠোঁটে আঙুল চেপে চুপ করে থাকতে বলে দরজার পাশে ভারী পর্দার আড়ালে চলে গেল। সুতরাং তাকেও সঙ্গী হতে হল। সায়ন বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ বাড়ির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ মারা গিয়েছেন অথচ এরা কাউকে খবরটা জানাচ্ছে না?

'হ্যাঁ। আউট। ক্যাশ কী আছে? কোথায় আছে?'

আতরবালা গন্ধরাজকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। সদানন্দ বলল, খুব নিচু স্বরে প্রায় না শুনতে পাওয়ার মতো করে, 'এই তো জীবন কালীদা!'

'কালীদা কাকে বলছ?' সায়ন ওই গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'ও তুই বুঝবি না।'

গন্ধরাজের গলা পাওয়া গেল, কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে, 'দ্যাখো আতরবালা, এখন প্রতিটি মুহূর্ত খুব ইম্পর্টেন্ট। বুড়ি মরে গেছে এটা ডিক্লেয়ার করার আগে যতটা সম্ভব হাতিয়ে নিতে হবে।'

'কিন্তু তোমাকে আমার বিশ্বাস হয় না!'

'ওঃ, এখন ওসব ভাবলে চলবে না। বিশ্বাস-টিশ্বাস করার কী দরকার? মালগুলো সামনাসামনি দুভাগ করে নাও।' গন্ধরাজ দাঁড়াল, 'বিশ্বাস করো না বললে, তা বুড়ি চোখ বন্ধ করামাত্র আমার কাছে ছুটে গেলে কেন?'

সায়ন ওদের দেখতে পাচ্ছিল না। আতরবালার গলা শুনতে পেল। 'কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না।'

'ঠিক করেছ। এখন বলো বুড়ির মাল কোথায় আছে?'

'ওরা যদি জানতে পারে?'

'কেউ জানতে পারবে না। এই যে তোমার যৌবনের সময়ে আমার সঙ্গে কত আনন্দ করেছ তা কি কেউ জেনেছে? এই বুড়ির কানেও কথাটা যায়নি!'

'তারপর যেই একটু পুরনো হলাম অমনি ছুড়ে ফেলে দিলে।'

'উঃ, ওসব কথা এখন কেন? ওটা জীবনের ধর্ম।'

'এ বাড়ির যত কাজের মেয়ে এসেছে তাদের কাউকে ছেড়েছ তুমি?'

'সেটা তারা বলতে পারবে। কিন্তু আমার ঘরের বাইরে গিয়ে তারা কেউ মুখ খোলেনি। খুললে অন্য শরিকরা আমাকে ছিঁড়ে ফেলত। চলো—!'

'এরপরে আমি কোথায় যাব?'

'আশ্চর্য! তুমি যখন এ বাড়ির কাজে এসেছিলে তখন আমায় বলেছিলে টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি নিয়ে দেশে চলে যাবে।'

'কার কাছে যাব? সেখানে কেউ নেই।'

'দ্যাখো, এ তোমার সমস্যা!'

'ব্যাটাছেলের চরিত্র এই। স্বার্থপর। নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। মেয়েমানুষ ধরবে, কদিন ভোগ করবে তারপর ছুড়ে ফেলে দেবে।'

'দ্যাখো আতরবালা, তুমি আমার মেজাজ গরম করে দিও না।' বেশ জোরে বলল গন্ধরাজ, 'আমি একা ভোগ করেছি, না? তুমি করোনি? তুমি আনন্দ পাওনি? সাততাড়াতাড়ি নিজের শরীর চেলাকাঠ করে ফেলেছ তো আমি কী করব। যে গোরু আর দুধ দিতে পারে না তার সংসারে সন্ন্যাসিনীর মতো থাকা উচিত। এতদিন বুড়িটাকে আগলে ছিলে, চুপি চুপি কত সরিয়েছ সেই হিসেব কি আমি চাইছি?'

'মাইরি বলছি, কিছুই সরাইনি আমি। সরাবার কথা মাথায় আসেনি কখনও। নড়াচড়া করতে না পারলেও ওঁর চোখকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব ছিল। গন্ধবাবু, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।' আতরবালার গলা একেবারে অন্যরকম শোনাল।

'মুশকিল। ঠিক আছে, ভেবে দেখছি।'

'কথা দাও।'

'আঃ। বললাম তো!'

'আমাকে ছুঁয়ে বলো।'

'হঠাৎ এত পিরীত গজিয়ে উঠল কেন আতরবালা। চলো, কোথায় আছে?'

'ওই ঘরে।'

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে সদানন্দ বলল, 'নিঃশব্দে বেরিয়ে আয়!'

সায়ন সদানন্দকে অনুসরণ করল। ওপাশের ঘরের আলমারি খোলার আওয়াজ হল। সায়ন দেখল সদানন্দ দ্রুত সেই ঘরের দরজা টেনে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে দরজার কাছে ছুটে গেল। তারপর দুটো হাত মুখের দুপাশে নিয়ে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'সবাই চলে আসুন, বড়মা মারা গিয়েছেন। বড়মা মারা গিয়েছেন।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে বাড়িতে সোরগোল পড়ে গেল। যিনি যেমনভাবে ছিলেন ছুটে এসেছেন। বাইরের ঘরটা এখন মানুষ গিজগিজ করছে। সবাই দেখছিলেন ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন বড়মা।

কমলেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কখন হল?'

সদানন্দ বলল, 'সানু এসেছিল দেখা করতে। এই দৃশ্য দেখে ও আমাকে খবর দেয়। আমি এসে বুঝলাম উনি আর নেই।'

কমলেন্দু পরীক্ষা করে মাথা নাড়ল। ন'বাবু বললেন, 'শেষ হয়ে গেল। রায়বাড়ির ঐতিহ্য যিনি ধরে রেখেছিলেন তিনিও চলে গেলেন।'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'একজন ডাক্তারকে খবর দাও। ডেথ সার্টিফিকেট দরকার। আর আমেরিকায় জানাতে হবে।'

কমলেন্দু মাথা নাড়ল, 'আতরবালা কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?'

সদানন্দ বলল, 'ওঁরা ওই ঘরে আছেন।'

ন'বাবু বললেন, 'ওই ঘরে? ওঁরা কারা?'

সদানন্দ বলল, 'বড়মা মারা যাওয়ামাত্র ওঁর টাকাপয়সা গয়নাগাঁটির দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে আতরবালা গন্ধরাজকে ডেকে এনেছিল। আমি এসে দেখলাম ওঁরা ওইসব নিয়ে ব্যস্ত তাই দরজাটা শেকল তুলে দিয়েছি।'

ন'বাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'সে কী? কী বলছ তুমি?'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তুমি ঠিক দেখেছ?'

'আমি আর সানু, দুজনেই দেখেছি।'

'ছি ছি ছি। কী চরিত্র! আত্মীয় বলে ভাবতেও লজ্জা হয়। শেষ পর্যন্ত একটা ঝি-এর সঙ্গে? খোলো দরজা, ডাকো ওকে!' ন'বাবু কয়েক পা এগিয়ে গেলেন।

কমলেন্দু বলল, 'দাঁড়ান।'

ন'বাবু দাঁড়িয়ে গেলেন। কমলেন্দু বলল, 'সারাজীবন লোকটা এই কাজ করে গেল অথচ আপনারা কেউ মুখ খোলেননি। আজ নতুন করে বলে কী হবে? দরজা খোলার পর ওদের নিয়ে কী করবেন তাই আগে ভাবুন।'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আতরবালাকে চলে যেতে বলা হোক।'

কমলেন্দু বলল, 'গন্ধরাজকে কী বলবেন? তিনিও তো একই অন্যায় করেছেন।'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ওকে তো তাড়িয়ে দিতে পারি না। এই বাড়ির শরিক ও। আমরা বয়কট করতে পারি।'

কমলেন্দু বলল, 'আমরা তো ওর সঙ্গে মেলামেশা করি না। বয়কট করলে ওর তো কোনও ক্ষতি হবে না।'

সদানন্দ বলল, 'ওঁরা এখন ওই অবস্থায় থাকুন। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি। আপনারা সবাই ভাবুন কীভাবে সৎকার করবেন।' সদানন্দ চলে গেল।

বড়মায়ের কথা যেন সবাই ভুলে গিয়েছিল। মেয়েরা এসে গেলেন একের পর এক। আতরবালা এবং গন্ধরাজের কাহিনী তাঁরাও শুনেছেন। কিন্তু পুরুষের সামনে কেউ মুখ খুলছিলেন না। তাঁরা

বড়মাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ উর্মিলা কথা বলল, 'এতকাল আতরবালা বড়মাকে সেবাযত্ন করে এসেছে, আমরা কেউ আসিনি। আজ ও যদি অন্যায় করার জন্যে শাস্তি পায় তা হলে দুজনকেই শাস্তি দিতে হবে।'

সায়ন বলল, 'আমাদের উচিত পুলিশকে খবর দেওয়া।'

সবাই ওর দিকে তাকাল। ন'বাবু বললেন, 'পুলিশ!'

'ওরা বড়মার মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে টাকাপয়সা গহনা চুরি করতে চেয়েছিল। এটা পুলিশের ব্যাপার।' সায়ন বলল।

'কিন্তু তার তো কোনও প্রমাণ নেই।'

'আমরা দেখেছি।'

'ঠিক। কিন্তু ওকে পুলিশে দিলে রায়বাড়ির ইজ্জত মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। পুলিশ মানেই ঝামেলা। কোর্টে কেস উঠলে কার সময় আছে রোজ ধর্না দেওয়ার? ওঁর নাতি তো আমেরিকা থেকে সেটার জন্যে আসবে না।' সমরেন্দ্রনাথ খোলাখুলি বলে ফেললেন।

উর্মিলা বলল, 'কিছু মনে করবেন না, এটা ঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। একই দোষে দোষী দুজনের বিচার আলাদা হওয়া ঠিক নয়।'

কমলেন্দু বলল, 'ঠিক আছে। এসব করার সময় পরে অনেক পাওয়া যাবে। বড়মায়ের মৃতদেহকে সামনে রেখে করলে নিজেরাই ছোট হয়ে যাব। দরজা খুলে দিয়ে ওদের বলুন এখান থেকে চলে যেতে।'

কয়েক সেকেন্ড সবাই চুপচাপ। কেউ এগিয়ে দরজা খুলছে না। শেষ পর্যন্ত উর্মিলাই এগোল। শেকল নামিয়ে দরজা ঠেলতেই দেখা গেল আতরবালা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আঁচলে মুখ গুঁজে কাঁদছে।

ন'বাবু প্রথমে ঘরে ঢুকলেন। সবাই দরজায় দাঁড়াল। ঘরে গন্ধরাজ নেই। ন'বাবু বলে উঠলেন, 'কই? কেউ তো নেই এ-ঘরে।'

সমরেন্দ্রনাথ এবং কমলেন্দু ঢুকল। ভাল করে খুঁজে দেখা হল। গন্ধরাজ নেই।

ন'বাবু বললেন, 'সদু কোথায়? কী দেখতে কী দেখেছে সে?'

কমলেন্দু বলল, 'কিন্তু সায়ন তো দেখেছে?'

ন'বাবু ডাকলেন, 'এদিকে এসো বাবা। তোমরা ঠিক দেখেছিলে তো?'

সায়ন বলল, 'হ্যাঁ। আমাদের ভুল হওয়ার কোনও কারণ নেই। ওই দেখুন, বড় আলমারিটা খোলা।'

আলমারির গায়ে চাবি ঝুলছে। পাল্লা ঈষৎ খোলা। ন'বাবু ছুটে গেলেন। দেখা গেল লকারের পাল্লা বন্ধ রয়েছে। সেটা খেলা হয়নি।

ন'বাবু আতরবালার সামনে এগিয়ে গেলেন, 'এখানে কী করছিলে?'

আতরবালা জবাব দিল না, একই ভঙ্গিতে কাঁদতে লাগল।

'তোমার সঙ্গে কেউ ছিল?'

আতরবালা জবাব দিল না। ততক্ষণে কমলেন্দু গরাদহীন জানলার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। এখান থেকে যে পালাতে চাইবে তাকে অনেকটা লাফিয়ে একটা দেওয়ালের ওপর গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এই বয়সে কি গন্ধরাজের পক্ষে সেটা সম্ভব? কিন্তু ওরা যদি ঠিকঠাক দেখে থাকে তা হলে লোকটা তো হাওয়া হয়ে যেতে পারে না। এই পথ দিয়েই যেতে হয়েছে তাকে।

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'দ্যাখো আতরবালা, তুমি যদি সত্যি কথা বলো তা হলে তোমাকে আমরা পুলিশে দেব না। বড়মায়ের দেখাশোনার ভার ছিল তোমার ওপর। তিনি মারা যেতেই এ কী কাণ্ড করলে! ছি ছি ছি! যা ঘটেছে তা স্পষ্ট খুলে বলো। আমি কথা দিচ্ছি—!'

'আমি কিছু জানি না।' মাথা ঝাঁকিয়ে কান্না জড়ানো গলায় বলল আতরবালা।

'তুমি যদি কিছু নাই জানো তা হলে ওরা এ ঘরের শেকল তুলে দিল কেন?'

'আমি জানি না।'

কমলেন্দু এগিয়ে এল, 'খামোকা সময় নষ্ট করছেন আপনারা। এই অবস্থায় ও যদি স্বীকার না করে তা হলে কোনও প্রমাণ পাবেন না এটা ও ভাল করে জানে। আতরবালা, শুধু একটা কথা বলো, বড়মায়ের কোনও সম্পত্তি কি এর মধ্যে এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে?'

মাথা নেড়ে না বলতে গিয়েও আতরবালা বলল, 'জানি না।'

ডাক্তার নিয়ে ফিরল সদানন্দ। তিনি বড়মায়ের চিকিৎসা আগেও করেছেন। পরীক্ষা করে প্রফুল্ল মুখে বললেন, 'সিম্পলি হার্ট অ্যাটাক। এত দিন যে বেঁচেছিলেন সেটাই অনেকখানি।' প্যাড খুলে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিলেন ভদ্রলোক। কমলেন্দু সেটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার—!'

'ওটা উনি চেম্বারেই দিয়ে এসেছেন। বুঝতেই পারছেন ডেডবডির সামনে বসে তো টাকা নেওয়া যায় না।' ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

এই সময় নীচে চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল। তারপর হাউমাউ করতে করতে ভিড় ঠেলে দরজায় এসে দাঁড়ালেন গন্ধরাজ। চিৎকার করে বললেন, 'কখন হল? কী সর্বনাশ! বড়মা চলে গেলে? ও সমরেন্দ্র, সত্যি উনি চলে গেলেন? আমি শুনে বিশ্বাস করিনি কথাটা।'

পুতুলের মতো এগিয়ে গেলেন গন্ধরাজ ইজিচেয়ারে শায়িতা বড়মায়ের শরীরের দিকে। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'তুমি পুণ্যবতী, সতীসাবিত্রী। আমাদের রায়বাড়ির শেষ বাতি ছিলে তুমি। তুমি আমাদের অনাথ করে চলে গেলে মা। যখন বেঁচে ছিলে তখন কত কষ্ট দিয়েছি, ঝগড়া করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও মা।'

সমস্ত ঘর যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে দেখছিল গন্ধরাজকে। সত্যিকারের শোকগ্রস্ত মানুষ যেমন আচরণ মাঝে মাঝে করে গন্ধরাজ এখন তাই করছিল।

কমলেন্দু এগিয়ে এল, 'আপনি উঠুন। বড়মাকে তৈরি করবেন মেয়েরা।'

'সে কী? এখনই নিয়ে যাবে তোমরা? এই তো গেলেন!'

'হ্যাঁ। দেরি করে লাভ তো নেই।'

গন্ধরাজ উঠে দাঁড়াল, 'আহা। প্রতিমা ছিলেন উনি। তোরা তো জানিস না, আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। এত বড় বাড়িটাকে দু হাতে আগলে রেখেছিলেন। এই যে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল, ভাঙা হবে, এ নিশ্চয় উনি সহ্য করতে পারছিলেন না। আঃ! নাও, তোমরা ওকে সাজাও। দেখে যেন মনে হয় মহারানি স্বর্গে যাচ্ছেন।' গন্ধরাজ চারপাশে তাকাল, 'সে কোথায়? আতরবালা? আতরবালা নেই? ও আতরবালা?'

ওপাশের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল আতরবালা, নিঃশব্দে।

গন্ধরাজ বলল, 'তুমি ওখানে কেন? বড়মার দামি কাপড়-চোপড় বের করে দাও। এঁদের সাহায্য করো। আমি আমার ঘরে আছি। এ বাড়ি থেকে ওঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় একটু খবর দিও কেউ।'

গন্ধরাজ চলে যাচ্ছিল। সদানন্দের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ সে নিচু হয়ে গন্ধরাজকে প্রণাম করল। গন্ধরাজ খেঁকিয়ে উঠল, 'এ কী? প্রণাম করছ? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? মৃতদেহের সামনে কাউকে প্রণাম করতে হয় নাকি? যত্ত সব!'

গন্ধরাজ চলে গেল। এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে সায়ন নাটক দেখছিল। তার চেয়ে অনেক বড় মানুষগুলো ওই নাটকটাকে মেনে নিল। কারও মুখ থেকে একটা কথাও বের হয়নি। কেউ প্রশ্ন করেনি গন্ধরাজকে। আগের ওই ঘটনাটা মিথ্যে, এটাই সত্যি, স্বাভাবিক, এমন একটা ভঙ্গি করে দাঁড়িয়েছিল সবাই। গন্ধরাজ চলে যেতে গুঞ্জন আরম্ভ হল। কেউ কেউ বলতে লাগল কত বড় শয়তান অভিনেতা হলে এমন কাণ্ড করতে পারে। আবার উল্টোটাও বলল কেউ, হয়তো ভুল দেখেছে ছেলেরা। মানুষমাত্রই তো ভুল হয়?

সদানন্দকে প্রণাম করতে দেখে সায়নের ভাল লেগেছিল। এই প্রণাম যে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে নয়, নেহাতই ব্যঙ্গ করার জন্যে সেটা স্পষ্ট। সে সদানন্দর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ছেড়ে দিলে কেন?'

'কী করব? সবাই তো কোনারকের মূর্তি হয়ে গিয়েছে।'

'কিন্তু আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত।'

'করলাম তো। দেখলি না?'

'দুর। ওতে কোনও কাজ হবে না। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে?'

'আছি।'

আতরবালা ভেতর থেকে দামি শাড়ি জামা বের করে আনল। সৌদামিনী পুরুষদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন।

সবাই চুপচাপ নেমে যাচ্ছিল। এখন ব্যাঘ্রবাহিনীর সামনের চাতালে ভিড় জমছে। নামতে নামতে সদানন্দ বলল, 'এখন শ্মশানে যেতে হবে। তোর ওই নেপালি ছেলেটাকে নিয়ে কলকাতা দেখাতে যাওয়া হল না।'

বিষ্ণুপ্রসাদের কথা খেয়ালে ছিল না। কথাটা শুনে মনে হল বিষ্ণুপ্রসাদ নিশ্চয়ই সমস্যাটা বুঝতে পারবে। তা ছাড়া ও তো আজই ফিরে যাচ্ছে না।

নীচের ভিড়ে গন্ধরাজকে নিয়ে তেমন আলোচনা হচ্ছিল না। বড়মায়ের সঙ্গে রায়বাড়ির সম্পর্কই ঘুরে ফিরে আসছিল। মানুষটি ছিলেন, ইদানীং আর হাঁটাচলা করতে পারছিলেন না কিন্তু এই ফাটল ধরা বাড়িটার মতো ওঁর অস্তিত্ব স্বাভাবিক ছিল। তিনি আজ হঠাৎই আর নেই।

অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের খবর দেওয়া চলছিল। এই সময় কেউ একজন এসে জানাল পাঁড়েজি মাটিতে বসে পড়েছে, কথা বলছে না। কথাটা শুনে ন'বাবু বললেন, 'ওর শোক জেনুইন।' সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'সে তো হবেই, কতকাল আগের মানুষ। নিজের সব কিছু ছেড়ে এই বাড়ি আঁকড়ে পড়ে আছে।' সদানন্দ ভিড় ছেড়ে এগিয়ে গেল সদরের দিকে। সায়ন তার সঙ্গী হল।

বাড়ির বাইরে, দরজার ওপাশে পাঁড়েজি বসে আছে। শরীরটাকে দ-এর মতো দেখাত কিন্তু মাথাটা হাঁটুর ওপর ঝুঁকে পড়ে থাকায় সেটা দেখাচ্ছে না।

সদানন্দ কাছে গিয়ে ডাকল। 'ও পাঁড়েজি?' শরীরটা একটু নড়ল মাত্র। সদানন্দ বলল, 'আরে, এমন করছ কেন? বড়মায়ের কত বয়স হয়েছিল। এতদিন যে বেঁচেছিলেন তাই আমাদের ভাগ্য।' বলতে বলতে ঈষৎ ঠেলতেই পাঁড়েজির শরীরটা একেবারে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। তার মুখের চেহারা, বুকের ওঠানামা দেখে ভয় পেয়ে গেল সদানন্দ। সে চিৎকার করে বলল, 'সানু, পাঁড়েজির অবস্থা খারাপ। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি, তুই এখানে থাক।' কথাগুলো বলতে বলতে সদানন্দ ছুটে গিয়ে ওপাশে দাঁড় করানো বাইকে উঠে বেরিয়ে গেল সশব্দে। সদানন্দর চিৎকার ভেতরেও পৌঁছেছিল। একটু একটু করে ভিড়টা তৈরি হয়ে গেল পাঁড়েজিকে কেন্দ্র করে। পাঁড়েজির চোখ বন্ধ। বৃদ্ধর বুকের খাঁচা খুব দ্রুত ওঠা-নামা করছে। দুটো গাল জলে ভেজা। পাঁড়েজি যে কাঁদছিল সেটা কাউকে বলে দিতে হবে না। কমলেন্দু বলল, 'আপনারা একটু সরে দাঁড়ান, হাওয়া আসতে দিন।'

ন'বাবু যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, 'মরে যাবে নাকি?'

সায়ন লোকটির সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছিল। খুব ছেলেবেলায় পাঁড়েজিকে তারা ভয় পেত। লাঠি হাতে বিশাল গোঁফ নিয়ে পাঁড়েজি রাতের বেলায় হুঙ্কার ছাড়ত। মাঝেমাঝেই সেই পেতল বাঁধানো লাঠির খটখট আওয়াজ শোনা যেত। কে যেন বলেছিল পাঁড়েজি সারারাত ভূতপ্রেত তাড়িয়ে বেড়ায়। এটা শোনার পর আর কাছে ঘেঁষতে চাইত না সায়ন।

কিন্তু যখন প্রথম তার অসুখ ধরা পড়ল তখন থেকেই তার চোখে পাঁড়েজির চেহারা বদলে গেল একটু একটু করে। সে যখন পাহাড়ে গিয়েছিল তখন রামজির কাছে প্রার্থনা করেছিল পাঁড়েজি।

সদানন্দ ডাক্তার নিয়ে এল। সেই একই ডাক্তার। তিনি গম্ভীর মুখে পাঁড়েজিকে পরীক্ষা করলেন। তারপর চোখ বন্ধ করে বললেন, 'সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক। বাঙালি হলে এখনই ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিতে হত। ওষুধ দিয়ে কোনও লাভ হবে না। কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার।'

সদানন্দ বলল, 'এই যে শুনেছি যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ! ডাক্তাররা সেই আশা ছাড়েন না।'

এই সময় পাঁড়েজি জড়ানো শব্দ উচ্চারণ করল। ডাক্তার দুপা সরে এসে ঝুঁকে দেখলেন, 'শুরু হয়ে গেছে!'

সায়ন পাঁড়েজির বুকে হাত রাখল। একটা মানুষের বুকে এত কষ্ট হয়! বৃদ্ধের চোখের পাতা

নড়ছিল। ধীরে ধীরে চোখ খুলল। কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে তাকাল পাঁড়েজি। ডাক্তার বললেন, 'ভিশন নেই। কিছুই দেখছে না, বুঝলেন।'

হঠাৎ পাঁড়েজির চোখের তারা বিস্ফারিত হল। তার হাত দুটো কাঁপতে লাগল। সায়ন আরও এগিয়ে গেল, 'পাঁড়েজি।'

পাঁড়েজি সায়নের মুখ থেকে চোখ সরাচ্ছিল না। শীর্ণ, চামড়া কুঁচকে যাওয়া হাত দুটো দুপাশ থেকে কোনওমতে তুলে নিয়ে এল বুকের ওপর। হাত দুটোয় নমস্কারের মুদ্রা ফুটে উঠল। সেই অবস্থায় সায়নের দিকে তাকিয়ে পাঁড়েজি অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করল। জড়ানো হলেও দ্বিতীয়বারে সেটা শুনতে পেল কাছে দাঁড়ানো মানুষেরা, 'জয় রামজি।' বৃদ্ধের শুকিয়ে যাওয়া মুখে চোখের জলের আস্তরণ কিন্তু সেখানে ফুটে উঠল এক অলৌকিক আনন্দ। কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হল সেটা। তারপর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আরও একবার বললেন, 'ইটস মির‍্যাকল। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। ওই অবস্থায় দুটো হাত জড়ো করে প্রণাম করা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তারপর ওই রামজি উচ্চারণ। ব্রেন এত কাজ করতেই পারে না।'

কমলেন্দু বলল, 'কিন্তু আমরা সবাই দেখলাম ঘটনাটা।'

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিল তো—।'

ডাক্তার বললেন, 'ওই যে কথাটা আছে, যেখানে জিজ্ঞাসা থেমে যায় সেখান থেকেই দর্শন শুরু হয়। ভুল বললাম বোধহয়। কিন্তু মনে থাকবে ঘটনাটা।'

কমলেন্দু সায়নের দিকে তাকাল। পাঁড়েজির প্রতিক্রিয়া সে চোখের সামনে দেখেছে। আর দেখার পরেই মনে পড়েছে পাহাড়ে মা মেরির মূর্তির সামনে দাঁড়ানো সায়নের কথা। সেদিন কি বেশির ভাগ মানুষ ভুল দেখেছিল? অসুস্থ হওয়ার পর ওর মধ্যে কোনও অলৌকিক শক্তি জেগে ওঠে? এসব বিশ্বাস করতে অস্বস্তি হয়। কিন্তু আজ পাঁড়েজি শেষমুহূর্তে ওর মধ্যে কী দেখেছিল?

সায়ন বসে আছে পাঁড়েজির মৃতদেহের পাশে। বাদল এসে গিয়েছে। বড়মায়ের মৃতদেহ যেভাবে নিয়ে যাওয়া হবে পাঁড়েজি নিশ্চয়ই সেই সম্মান পাবে না। তা হলে পাশাপাশি নিয়ে যাওয়া শোভন নয়। একই শ্মশানে দুজনকে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা তাই নিয়ে মতবিরোধ হচ্ছিল। বড়রা সিদ্ধান্ত নিল পাঁড়েজির মৃতদেহের দায়িত্ব হিন্দু সৎকার সমিতিকে দিয়ে দেওয়াই ভাল। মূল্য ধরে দিলে তাঁরাই যত্ন করে সৎকার করে দেবেন। পাঁড়েজির কোনও আত্মীয়ের কথা কারও জানা নেই। এক্ষেত্রে এটাই ভাল ব্যবস্থা। এতকাল মানুষটা এ বাড়িকে সেবা করেছে, তার জন্যে এতটুকু না করলে নয়। বড়মায়ের জন্যে ফুল দিয়ে সাজিয়ে লরি আনার ব্যবস্থা করা হল। সদানন্দ বাদলকে বলল, 'তুই হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়িতে শ্মশানে যা। একটু দেখাশোনা করিস। বড়মাকে নিয়ে বের হতে দেরি হবে। তার আগে যদি পাঁড়েজির কাজ হয়ে যায় তাহলে অন্য শ্মশানে যাওয়ার দরকার নেই। বুঝলি?' বাদল মাথা নেড়ে জানাল সে বুঝেছে।

সায়ন উঠে দাঁড়াল, 'আমিও বাদলদার সঙ্গে যাব।'

'তুই যাবি?'

'হ্যাঁ। পাঁড়েজির মুখাগ্নি বাইরের লোক করবে কেন আমরা থাকতে? ওটা আমি করব।' সায়ন বলল।

কমলেন্দু এগিয়ে এল, 'সায়ন তোর শরীর খারাপ।'

'কে বলল? এখন আমি ঠিক আছি।'

এই সময় কাজের লোক এসে সায়নকে জানাল নন্দিনী ডাকছেন। সায়ন ওপরে তাকিয়ে জানলায় মায়ের ঘোমটা দেওয়া মুখ দেখতে পেল। সে চুপচাপ ওপরে উঠে এল। বাইরের ঘরে বিষ্ণুপ্রসাদ বসে আছে। সে আসার পরেই এই বাড়িতে দু দুটো মানুষ মরে যাওয়ায় বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই শ্মশানে যাবি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন।'

মাথা নিচু করল সায়ন, 'তুমি আপত্তি কোরো না।'

নন্দিনী কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন, 'তোর শরীর যদি খারাপ হয়?'

'না গেলে বেশি খারাপ হবে।'

'কী করে বুঝলি?'

'তুমি দেখোনি মা, ঠিক প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়ার আগে পাঁড়েজি আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যে আমার মনে হয়েছিল ওর আর কোনও কষ্ট নেই। যেন আমার ওপর খুব ভরসা করছে।'

নন্দিনী মাথা নাড়লেন, 'তাহলে যা। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি। বিষ্ণুপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে যা।'

ভানুপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি এসে গেল। পাঁড়েজির মৃতদেহ যখন ওরা গাড়িতে তুলছে তখন গন্ধরাজকে দেখা গেল বেরিয়ে আসতে। কমলেন্দুরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে গিয়ে গন্ধরাজ বলল, 'শোনো, পাঁড়েজির সৎকার করতে যা খরচ হবে সেটা আমি দেব। এখন হাজার টাকা দিচ্ছি। শ্মশানে এতেই হয়ে যাবে। কে যাচ্ছে সঙ্গে?'

প্রথমে কেউ কথা বলল না। তারপর কমলেন্দু বলল, 'সবাই মিলে খরচটা দেওয়া হচ্ছে। আলাদা করে দেওয়ার কী প্রয়োজন?'

গন্ধরাজ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগে সায়ন এগিয়ে গেল, 'আপনার কি মনে হচ্ছে টাকাটা খরচ করলে সবাই অন্যায়টা ভুলে যাবে?'

'অন্যায়? কী অন্যায়?' নিরীহ মুখ করে জিজ্ঞাসা করল গন্ধরাজ।

'আতরবালার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বড়মায়ের টাকাপয়সা গয়না চুরি করতে গিয়েছিলেন আপনি। দরজায় শেকল তুলে দেওয়ার পর জানলা দিয়ে পালিয়ে যান। তারপর আবার সামনের দরজা দিয়ে ফিরে এসে এমন নাটক করেন যেন কিছুই জানেন না। আত্মা বলে কিছু আছে কিনা জানি না, আপনার টাকায় সৎকার হলে পাঁড়েজিকে অসম্মান করা হবে।'

গন্ধরাজ হাঁ হয়ে শুনছিল। এবার বলল, 'তুমি অসুস্থ, তাই না? রক্তের অসুখ। সেটা যে মাথাও খারাপ করে দেয় তা তো আমি জানতাম না। এইটুকুনি ছেলে উন্মাদের মতো গুরুজনের সঙ্গে কথা বলছ? ছি ছি ছি।'

'আপনাকে তো আমি আমার গুরুজন বলে মনে করি না।'

'হ্যাঁ।' গন্ধরাজ চোখ বড় করে হাত ওল্টাল।

'আপনি আমার চেয়ে আগে জন্মেছেন বলেই গুরুজন হতে পারেন না। একজন মানুষ মরে যাওয়া মাত্র যে তার সম্পত্তি চুরি করার চেষ্টা করে তাকে গুরু বলে ভাবার কোনও কারণ নেই।'

গন্ধরাজ চিৎকার করল, 'কী আস্পর্দা? শুনছেন আপনারা? ওর কথা শুনছেন? নেহাত ব্লাড ক্যানসারের পেশেন্ট নইলে এক চড়ে মাথা ঘুরিয়ে দিতাম।'

'সেটা করার চেষ্টা করলে আপনার খুব দুরবস্থা হত।' সদানন্দ এগিয়ে এল, 'আপনি বারংবার ওর অসুখের কথা বলছেন। আপনি নিজে কী?'

'মানে?'

'আপনার মতো একটা লম্পটকে এ বাড়ির লোক এতদিন সহ্য করে এসেছে বলে ভেবেছেন চিরদিন তাই চলবে? যান। নিজের ঘরে চলে যান। পাঁড়েজি বা বড়মায়ের কাজে আপনাকে আমরা দেখতে চাই না। যান এখান থেকে।' সদানন্দ শক্ত গলায় বলল।

'সদু!' গন্ধরাজ কাতর গলায় বলল।

'আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত ছিল। জানলা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে গেছেন। যান এখান থেকে।' গলা তুলল সদানন্দ।

মাথা নিচু করে ফিরে গেল গন্ধরাজ। ন'বাবুদের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল এই ঘটনায় তারা খুব খুশি হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে গন্ধরাজকে তাঁরা সহ্য করে এসেছেন কারণ প্রতিবাদ করার জোর

পাননি। পরের প্রজন্ম সেটা করায় তাদের খুব স্বস্তি হচ্ছে।

আজ শ্মশানে মৃতদেহ নেই। এর আগে কখনও শ্মশানে আসেনি সায়ন। কিন্তু বাদল এ ব্যাপারে যে অভিজ্ঞ তা বোঝা গেল। খাতাপত্রের কাজ সেরে একটা পুরোহিত জোগাড় করে পারলৌকিক কাজকর্ম শুরু করে দিল সে। মুখাগ্নি কে করবে পুরোহিত জানতে চাইলে সায়ন এগিয়ে গেল। প্রথমে চালকলার পিণ্ডি গেলাতে হয়। সায়ন মাথা নাড়ল, 'পাঁড়েজি তো মারা গিয়েছে। মৃতদেহ খেতে পারে না। ওটা কেন করব?'

পুরোহিত বলল, 'ওর আত্মাকে খাওয়াতে হয়।'

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'ওর আত্মা কোথায়?'

পুরোহিত বিরক্ত হল, 'তুমি কি হিন্দু নও? জানো না আত্মা কোথায় থাকে? এখানে কেউ কেউ এমন ঝামেলা করে!'

'আমি জানি না আত্মা কোথায় থাকে।'

বাদল এগিয়ে এল। আদেশটা সেই পালন করল। এবার দুটো পাটকাঠিতে আগুন ধরিয়ে পুরোহিত বলল, 'ওর মুখে চেপে ধরো।'

'এটাকে কি মুখাগ্নি করা বলে?' সায়ন জানতে চাইল।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমার পক্ষে মুখাগ্নি করা সম্ভব নয়। বাদলদা, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তুমি করতে পারো।' সায়ন পিছিয়ে গেল।

ইলেকট্রিক চুল্লির গহ্বরে মৃতদেহ চলে গেলে বাদল বলল, 'তুই ফিরে যা। এখনও ঘণ্টাখানেক লাগবে। আমি আছি।'

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'বাদলদা, এইসব নিয়ম যখন চালু হয়েছিল তখন ইলেকট্রিক চুল্লি ছিল?'

'কী করে থাকবে! ইলেকট্রিক তো অনেক পরে এসেছে।' বাদল বলল, 'আগে তো কাঠের চিতায় পোড়ানো হত। এখনও হয়। সবার সামনে শরীর পোড়ে।'

'এখন যখন চোখের আড়ালে দাহ হয়ে যাচ্ছে আর সবাই সেটা মেনে নিয়েছে তখন এই নিষ্ঠুর নিয়মগুলো কি পাল্টানো যায় না? কী ভয়ঙ্কর।' সায়ন বলল।

বাদল অবাক হয়ে তাকাল। আজ হঠাৎ এই কথা শুনে তারও মনে হল নিয়মগুলো সত্যি নিষ্ঠুর। সে বলল, 'তোর শ্মশানে আসা উচিত হয়নি।'

সায়ন মাথা নাড়ল, 'না। এখানে এসে ভাল হয়েছে। আমি মাকে বলতে পারব তোমার সৎকার করতে পারব না।'

৩৬

বড়মায়ের সৎকার সেরে সবাই বাড়ি ফিরেছিল বিকেলবেলায়। লোহা আগুন ছুঁয়ে যে যার এলাকায় চলে গিয়েছিল। এখন থেকে অশৌচ শুরু হল। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে অশৌচের সঙ্গে সায়নের পরিচয় হয়নি। ন'বাবু মুখাগ্নি করেছেন বলে নিয়মনিষ্ঠ হয়েছেন। বাকিরা খালি পায়ে ঘুরবে, দাড়ি কাটবে না এবং মশলা না দেওয়া নিরামিষ খাবে। পেঁয়াজ রসুনও পড়বে না।

সায়নের বাবা শ্মশানে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে স্নান সেরে ছেলেকে ডাকলেন। সায়ন ঘরে ঢুকে দেখল বাবা গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসে রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাকছ?'

'তুমি পাঁড়েজির মুখাগ্নি করেছ?'

'না।'

'কেন? তুমি তো সেই কথাই বলে গেলে!' ভদ্রলোক যেন স্বস্তি পেলেন, 'সবাই এই নিয়ে কথা বলছে। বাবা-মা বেঁচে থাকতে কেউ অন্যের মুখাগ্নি করে না। তুমি হয়তো এ কথা জানতে না।'

নন্দিনী শুনছিলেন। হেসে বললেন, 'ও বলেছে আমাদের মুখাগ্নিও করবে না। ওর কাছে ব্যাপারটা শুনে আমিও বলেছি, করিস না।'

'সে কী? তুমি ওকে এই পরামর্শ দিয়েছ? হিন্দুর ছেলে বাপ-মায়ের মুখাগ্নি করবে না? তোমরা কি উন্মাদ হয়ে গেলে?' চেঁচিয়ে বললেন ভদ্রলোক।

'মুখাগ্নি করলে কী লাভ হবে?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল।

'তোমার মায়ের কাছ থেকে জেনে নিও কেন মুখাগ্নির প্রয়োজন? কিন্তু তুমি কেন পাঁড়েজির মুখাগ্নি করলে না? কেউ নিষেধ করেছিল?'

'না। আমার মনে হয়েছে এটা একটা বীভৎস ব্যাপার। এককালে বিধবাদের পুড়িয়ে মারার সময় মানুষ আনন্দ পেত। এখন সেটা সম্ভব নয় বলে মুখ পুড়িয়ে দিয়ে কিছুটা মিটিয়ে নেয়। বাবা, তুমি বলবে এটাই হিন্দুদের রীতি। কিন্তু সব কিছু তো সময়ের সঙ্গে বদলে যায়। এটাও বদলানো উচিত।'

'তুমি সমাজসংস্কারক হবে নাকি?'

'এ বাড়ির বাইরে সমাজের কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা আমার জানা নেই। আমি আমার মতে যেটা উচিত কাজ সেটাই করব।'

বাবা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সায়নের দিকে, 'পাহাড়ে তুমি কাদের সঙ্গে মিশছ? এখানে যখন ছিলে তখন তো এসব কথা বলতে না। তুমি ছেলেমানুষ, এখনও জীবন, ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানো না।'

'কিন্তু কোনটা খারাপ কোনটা ভাল তা বোঝার বয়স আমার হয়েছে।'

'একটু বেশি হয়েছে। আজ সবার সামনে তুমি তোমার জ্যাঠামশাইকে যেভাবে অপমান করেছ সেটা ওই বেশি বোঝার কারণে। বাড়ির সব চেয়ে বয়স্কা মহিলা মারা গেলে লোকে শোকে স্তব্ধ হয়ে থাকে। আর তখন তুমি— !'

'তুমি জ্যাঠামশাই কাকে বলছ?'

'তুমি জানো না?'

'জানি। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তোমরা কেউ আমাকে বলোনি ওকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকতে; উল্টে বারংবার নিষেধ করেছ ওর ঘরে না যেতে, ওর সঙ্গে কথা না বলতে। তোমাদের কথাবার্তায় আমি বুঝেছিলাম লোকটা খুব খারাপ। আজকে হঠাৎ উল্টো কথা বলছ কেন?'

'উল্টো কথা আবার কী। খারাপ-ভাল বিচার করার বয়স তোমার হয়নি। সম্পর্কের সূত্রে উনি তোমার জ্যাঠামশাই হন। এ বাড়ির রক্ত ওঁর শরীরে। তাঁকে তুমি যেভাবে ছোট করেছ তাতে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি।'

'বড়মায়ের মারা যাওয়ার খবর পেয়ে আতরবালার সঙ্গে লোকটা যে ভাষায় কথা বলছিল তা তোমরা কেউ শোনোনি। সদুদা শুনেছে। মৃতদেহের সম্পত্তি চুরি করতে আতরবালাকে ও যা বলেছিল তা শুনে আমি লোকটাকে জ্যাঠা বলে ভাবতে পারি না। শুধু জ্যাঠা কেন, যদি দেখতাম তুমি বড়মায়ের ঘরে ঢুকে আতরবালার সঙ্গে ওই ষড়যন্ত্র করছ তাহলে তোমাকেও আমি বাবা বলে আর ডাকতাম না। আমি যাচ্ছি।'

স্তব্ধ মানুষ দুটোর সামনে থেকে চলে এল সায়ন। ওর মাথা ঝিমঝিম করছিল। ডাক্তার আঙ্কল তাকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করেছেন। ঘরে ঢুকে দেখল বিষ্ণুপ্রসাদ টিভির সামনে বসে আছে। টিভি চলছে কিন্তু শব্দ হচ্ছে না। ওটা একেবারে কমিয়ে দিয়েছে বিষ্ণুপ্রসাদ।

তাকে দেখামাত্র বিষ্ণুপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ।' চেয়ারে বসল সায়ন।

'কিন্তু তোমার মুখ লাল হয়ে গেছে।'

সায়ন কথা বলল না।

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'তোমার এখানে ভাল লাগছে না, না?'

সায়ন হেসে ফেলল, 'তোমার কেমন লাগছে?'

'ঠিক হ্যায়? আমরা কবে ফিরব?'

'বুঝতে পারছি না।'

'তুমি যদি বেশি দিন থাকো তাহলে আমি চলে যাই।'

সায়ন কিছু বলার আগে নন্দিনী ঘরে ঢুকলেন, 'তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। মাথার তো ঠিক নেই। তোর ডাক্তার ফোন করেছিলেন।'

'কখন?' সায়ন অবাক হল।

'তুই যখন শ্মশানে গিয়েছিলি। ভালভাবে পৌঁছেছিস কিনা উনি জিজ্ঞাসা করলেন। আমার কাছে বড়মায়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে বললেন, কদিন নিরামিষ খেতে পারিস কিন্তু অন্য কোনও নিয়ম মানা চলবে না। আমি বললাম কোনও নিয়মই তোকে মানতে হচ্ছে না। তুই তোর মতো থাকবি।' নন্দিনী ছেলের মাথায় হাত রাখলেন, 'অত উত্তেজিত হওয়া ঠিক না।'

'আমি তো উত্তেজিত হয়নি।'

'তুই কখনও বাবার সঙ্গে ওইভাবে কথা বলিসনি।'

'প্রয়োজন হয়নি।'

'প্রয়োজন হলেও লোকে ভদ্রতা করে এড়িয়ে যায়।'

'আমি তো আগ বাড়িয়ে কথা বলিনি। বাবাই আমাকে ডেকে প্রশ্ন করছিল। আমি যা সত্যি তাই বলেছি।'

'না বললে হত না?'

'তাহলে তো নিজের সঙ্গে প্রতারণা করা হত।'

নন্দিনী প্রসঙ্গে ঘোরাতে চাইলেন। 'মাঝখান থেকে এই ছেলেটা কী বিপদে পড়ল। প্রথমবার কলকাতায় এসে বাড়িতে বন্দী হয়ে রইল।'

বিষ্ণুপ্রসাদ মাথা নাড়ল, ' না, না, ঠিক আছে।'

সায়ন বলল, 'বিষ্ণুপ্রসাদ চলে যেতে চাইছে।'

'ওমা! কেন?' নন্দিনী অবাক।

'ওর এখানে ভাল লাগছে না।'

'বাড়ি থেকে বের হলে ভাল লাগবে। এসেছ যখন কদিন থেকে যাও। তোমাকে শহর দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে।' নন্দিনী চলে গেলেন।'

সায়ন উঠল। এখন শরীর কিছুটা ভাল লাগছে। ঝিমঝিম ভাবটা কেটেছে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে ছাদের দরজায় গেল। দরজা খুলে বাইরে তাকাতেই বড় ছাদটা নজরে এল। এখন অন্ধকার। ছাদে কেউ নেই। আজকের ঘটনার পর কেউ হয়তো ছাদে আড্ডা মারতে আসেনি। এলেও অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেছে।

সায়ন কয়েক পা এগোল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল দূরে কার্নিশের ওপর কেউ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। নারীমূর্তি। এই আধা-অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কে ওখানে?

সায়ন একটু এগোল। সেই সময় নারীমূর্তি সোজা হল। বিস্মিত গলা ভেসে এল, 'সানু।'

'হেনা কাকিমা!'

'কেমন আছিস তুই? এসেছিস সে-কথা শুনেছিলাম।'

'তুমি এই সময় ছাদে কী করছ?'

হেনা কাকিমা হাসল, 'শুনলে তুই হাসবি। আগে বল, তোর শরীর কেমন আছে?'

'আমি এখন ভাল আছি।'

'দেখি, কাছে আয়।'

সায়ন এগিয়ে গেল। হেনা কাকিমাকে খুব রোগা লাগছে, অস্পষ্ট হলেও সায়ন সেটা বুঝতে পারল। হেনা কাকিমা জিজ্ঞাসা করল, 'পাহাড়ের আবহাওয়া ভাল?'

'কখনও ভাল, কখনও খারাপ।' সায়ন বলল, 'এবার বলো, আমি হাসব না।'

হেনা কাকিমা আকাশের দিকে তাকাল, 'শুনেছি কেউ মারা গেলে শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর আত্মা বাড়ি ছেড়ে যায় না। ওই মায়া কাটিয়ে দিতে শ্রাদ্ধ-শান্তি করা হয়। আজ এ-বাড়িতে একসঙ্গে দুজন

মারা গিয়েছে। সে ক্ষেত্রে তো ওঁদের এখানে থাকার কথা।'

'তুমি এসব গল্প বিশ্বাস করো?'

'জন্ম থেকে শুনে আসছি, লোকে মিথ্যে বলবে কেন? তুই বলবি আমি দেখেছি কিনা? না, আমি দেখিনি। আমি তো ভগবানকেও দেখিনি। তাই বলে যদি বলি ভগবান নেই লোকে হাসবে না?'

'ঠিক আছে, তারপর?'

'আত্মারা আলোয় আসতে পারেন না। অন্ধকারেই তাঁরা স্বস্তি পান। এই ছাদে তো আলো নেই। এখানে আসাই তাঁদের পক্ষে সুবিধে, তাই না?'

সায়ন চারপাশে তাকাল। হঠাৎ ছাদটাকে রহস্যময় বলে মনে হল। সে বলল, 'তোমার কথা যদি সত্যিও হয় তাহলেও তাঁদের তুমি দেখবে কী করে? শরীর তো ছাই হয়ে গিয়েছে।'

'দুর। আত্মারা ইচ্ছে করলে যে কোনও রূপ ধারণ করতে পারে। এই যে আমি এতক্ষণ এখানে একা দাঁড়িয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল বাতাসে ফিসফিস শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

সায়ন হেনা কাকিমার পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। তার খেয়াল হল আজ সে হেনা কাকিমাকে তাদের বাড়িতে আসতে দেখেনি। অথচ মায়ের সঙ্গে হেনা কাকিমার খুব ভাব ছিল। তখন কথায় কথায় হেনা কাকিমা প্রতিবাদ করত। এ বাড়ির নানান ত্রুটি মেনে নিতে পারত না। মা ওকে বোঝাত। সে যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল তখন হেনা কাকিমা মায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেবা করেছিল। তখন অন্য রকম ছিল হেনা কাকিমা।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওঁদের দেখতে চাইছ কেন?'

'কাউকে বলবি না, কথা দে।'

'ঠিক আছে।'

'বড়মাকে দেখতে পেলে জিজ্ঞাসা করব আপনি এতদিন কী সুখে বেঁচে ছিলেন? আর পাঁড়েজিকে পেলে জানতে চাইব এখন তার কেমন লাগছে?'

'এসব কথা জেনে তোমার কী লাভ হবে?'

হেনা কাকিমা জবাব দিল না। আবার আকাশের দিকে তাকাল।

'হেনা কাকিমা?' সায়ন ডাকল।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল হেনা কাকিমা। ওব শরীর কাঁপছিল। কোনওমতে নিজেকে সামলে বলল, 'আমি একটুও ভাল নেই রে সানু।'

'কেন?'

'আমি সহ্য করতে পারছি না। এত নিষেধ, এত শাসন অথচ আমি আর মেনে নিতে পারছি না। তোকে দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে ওরা আমাকে আটকে দিল। কথায় কথায় সন্দেহ করে এরা। শাশুড়ির সঙ্গে এখন স্বামীও যোগ দিয়েছে। মাঝে মাঝেই মনে হয় আত্মহত্যা করি। কিন্তু ভয় হয়। সেই জগৎটার কিছুই জানি না, সেটা যদি আরও খারাপ হয়!' হেনা কাকিমা নিচু স্বরে বলল।

'তাই তুমি আত্মাদের জিজ্ঞাসা করতে চাও?'

জবাব পেল না সায়ন। হেনা কাকিমা অন্য দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সায়ন হাসল, 'তুমি যখন সহ্য করতে পারছ না তখন বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছ না কেন? সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বলো।'

'বলেছি। ওরা শোনেনি। বলেছে বিবাহিতা মেয়ের উচিত শাশুড়ির সঙ্গে মানিয়ে চলা! এক এক সময় মনে হয় দূরে কোথাও চলে যাই। কিন্তু কোথায় যাব? হ্যাঁ রে, তোদের পাহাড়ে গেলে আমি থাকতে পারব?'

'তুমি এ বাড়ির অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বলো।'

'কোনও লাভ নেই। একমাত্র উর্মিলা ছাড়া কারও সাহস নেই। এই দ্যাখ টুকটুকিটার কী অবস্থা! শুনেছিস?'

'না।' সায়ন ঘাড় নাড়ল।

'তুই ছোট বলে তোর মা তোকে বলেনি।'

'কী হয়েছে?'

'টুকটুকিকে ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরত দিয়েছিল। কারণ কী? না বিয়ের পর ওদের বউকে পছন্দ হচ্ছে না। ন'বাবু অনেক অনুরোধ করেছিলেন তারা শোনেনি। বদমায়েসের ঝাড়। কিছুদিন পরে আর একটা বিয়ে দিয়ে রোজগার করতে চেয়েছিল। জামাইয়ের মন ফেরাতে ওরা কত কী করেছিল। যজ্ঞ, তান্ত্রিক কত কিছু। মেয়েটাকে কারও সঙ্গে মিশতে দিত না। শেষ পর্যন্ত কী করে জানি না জামাইকে একদিন এ বাড়িতে নিয়ে এল। আমরা সবাই জানলাম গোলমাল মিটে গেছে। বিকেলে খুব সেজেগুজে টুকটুকি ছাদে এল। খুশিতে ওকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। পরদিন জামাই চলে গেল। আর সেই যে গেল আর এল না। এদিকে বেচারা টুকটুকি মা হতে চলেছে। ওর শ্বশুর বলেছে যে বাচ্চাটা আসছে সেটা নাকি ওদের বংশের নয়। শোনামাত্র টুকটুকি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে বিছানা থেকে নামতে পারছে না। মেয়েটাকে জেনেশুনে বলি দেওয়া হল।' নিশ্বাস ফেলল হেনা কাকিমা।

মন খারাপ হয়ে গেল সায়নের। ঠিক এই সময় ওপাশের দরজা খুলে গেল। আলো পড়ল ছাদে। সায়ন দেখল একজন সাদা থান পরা বৃদ্ধা টুকটুক করে এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে বললেন, 'ওমা, তুমি? তুমি সানু না?'

'হ্যাঁ।' এই বৃদ্ধা হেনা কাকিমার শাশুড়ি। খুব কম দেখেছে সে। ভদ্রমহিলা ঝগড়া করেন বলে ওদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করত না।

'অ বউমা! তুমি এত রাত্তিরে এখানে কী করছ?'

'কথা বলছিলাম। গম্ভীর গলায় জবাব দিল হেনা কাকিমা।'

'কথা বলার আর জায়গা পেলে না? কাছে না এলে ভাবতাম কোনও ব্যাটাছেলে এখানে এসে জুটেছে বুঝি।'

'মা!' চেঁচিয়ে উঠল হেনা কাকিমা।

'তা আমাদের সানুও বেশ বড়সড় হয়ে গেছে। গাল ভর্তি দাড়ি গজিয়েছে। শুনতে পাই কমলেন্দুর বউয়ের সঙ্গে খুব ভাব। তা দেওর-বউদির মধ্যে একটু ভাব হতেই পারে কিন্তু কাকিমা তো মায়ের মতো। তাই না? '

হেনা কাকিমা চাপা গলায় বলল, 'সানু তুই চলে যা।'

বৃদ্ধা বললেন, 'ও চলে গেলে তোমার আর থাকার কী দরকার? আমার ছেলে বাইরে গেছে বলে তুমি সাপের পাঁচ পা দেখতে পারো না।'

হেনা কাকিমা জবাব দিয়ে হনহন করে চলে গেল আলোকিত দরজার দিকে। বৃদ্ধা বলল, 'যাও। এবার ঘরে যাও।'

সায়ন হাসল, 'এখানে থাকতে ভাল লাগছে। আপনিও থাকুন না।'

'আমার কি থাকার জো আছে। কত কাজ!'

'আজ বড়মা মারা গেলেন। আপনাকে ওখানে দেখলাম না তো!'

'বুড়ি আমাকে কম জ্বালিয়েছে। এতকাল যে ঝি চোখের মণি ছিল তার কেচ্ছা কাজের লোকের মুখে শোনার পর আর যাওয়ার প্রবৃত্তি হল না।' বৃদ্ধা বললেন, 'বেঁচে থাকতেই যেতাম না ওই মুখের জন্যে, মরে মুখ বন্ধ হয়েছে বলে স্মৃতিটা তো মরেনি।'

সায়ন বলল, 'আস্তে। কথা বলবেন না।'

বৃদ্ধা হকচকিয়ে গেলেন, 'তার মানে?'

'মনে হচ্ছে ছাদে কেউ এসেছে।' ফিসফিসিয়ে বলল সায়ন।

বৃদ্ধা চারপাশে উদ্বিগ্ন মুখে তাকালেন, 'কই, কাউকে দেখছি না তো। আর কেউ এখানে ছিল নাকি?'

'ছিল এবং আছে।'

'কে?' বৃদ্ধার গলায় সন্দেহ।

'মানুষ মারা গেলে শ্রাদ্ধ-শান্তি না পাওয়া পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে যায় না, তাই না? আমার মনে হল

পাঁড়েজিকে দেখলাম।'

বৃদ্ধা দ্রুত সরে এসে সায়নের হাত ধরলেন, 'ওমা! রাম রাম রাম। এই ভর সন্ধেবেলায়—, রাম, রাম, রাম, রাম।'

'আপনি একটু আগে হেনা কাকিমাকে বললেন "এত রাত্তিরে"।'

'ওই হল আরকী! চলো, আমাকে দরজা অবধি পৌঁছে দাও।'

'দাঁড়ান না। পাঁড়েজি আমাদের কোনও ক্ষতি করবে না। আপনার যদি কোনও কিছু জানতে হচ্ছে করে জেনে নিন।'

এই সময় জোরে বাতাস বইল। বৃদ্ধা চোখ বন্ধ করে কাঁপতে লাগলেন।

সায়ন বলল, 'বড়মা থান পরতেন, একটা সাদা থান দেখতে পাচ্ছি। উনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করুন।'

'আমার দরকার নেই। আমি তো এখন মরছি না।' বলতে বলতে বৃদ্ধা এগিয়ে যেতেই সায়ন ইচ্ছে করে ওঁর আঁচল ধরে টানল। সঙ্গে সঙ্গে হাঁউমাউ করে চিৎকার করে বসে পড়লেন মহিলা। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না।'

সায়ন ওঁকে তুলে ধরে কোনওমতে দরজায় নিয়ে যেতে পারল। ওকে আঁকড়ে ধরেছিলেন বৃদ্ধা। সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখন যেতে পারবেন?'

'তুমি?'

'আমি একটু ছাদে থাকব। ওঁদের সঙ্গে কথা বলব।' সে ছাদে ফিরে এসে মুখ ঘুরিয়ে দেখল বৃদ্ধা আর দাঁড়িয়ে নেই।

হাওয়া বইছে। আজ আকাশ পরিষ্কার থাকায় তারারা জমজমাট। কোথাও কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপাব নেই। বড়মায়ের অংশ তালাবন্ধ করে দিয়েছে সদুদারা। আতরবালাকে বলা হয়েছে গন্ধরাজের ওখানে থাকতে। এটা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে যতদিন সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয় ততদিন আতরবালা গন্ধরাজের কাজ করে দিয়ে সেখানে খাওয়া-দাওয়া করবে কিন্তু ব্যাঘ্রবাহিনীর সামনে এসে শোবে। গন্ধরাজকে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছে।

মানুষ মরে গেলে কি আত্মা হয়ে ঘুরে বেড়ায়? তার মা, বাবা এবং সে যখন মরে যাবে তখন আত্মা হয়ে ঘুরবে? যাদের শ্রাদ্ধ-শান্তি হয় না তাদের আত্মার কী অবস্থা হয়? হিন্দু মুসলমানের অথবা খ্রিস্টানদের আত্মা কি আলাদা নিয়মে চলে? মরে যাওয়ার পরও কি তাদের ধর্মীয় অনুশাসন মানতে হয়? বড়মা ভাল করে হাঁটতে পারতেন না। মরে যাওয়ার পর তাঁর আত্মা কি দ্রুত ছোটাছুটি করতে পারবে? এখন কি পাঁড়েজির সঙ্গে তাঁর দেখা হচ্ছে?

প্রশ্নগুলো মাথায় পাক খাচ্ছিল। সায়ন চারপাশে তাকাল। এই আধা অন্ধকারে সে কাউকেই দেখতে পেল না। আত্মা যদি না থাকবে তাহলে পৃথিবীর সব দেশে ভূতের গল্প বা ঘোস্ট স্টোরিজ লেখা হয়েছে কেন? নাকি মানুষ কল্পনা করতে ভালবাসে বলে এদের সৃষ্টি করেছে। কোথায় যেন পড়েছিল, ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টি। মানুষ ছাড়া অন্য কোনও প্রাণী ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে না। প্রেতের ক্ষেত্রেও তাই। মানুষ ভয় পেতে ভালবাসে। হঠাৎ মনে হল, শুধু ভয় নয়, মানুষ দুঃখ পেতে ভালবাসে। না হলে টুকটুকির বাবা জেনেশুনে দুঃখকে ডেকে আনলেন কেন? ডাক্তার আঙ্কল বলেছিলেন, 'ভগবানের প্রয়োজন হয়েছিল কারণ তাঁকে কেন্দ্র করে মানুষ একটা শৃঙ্খলা তৈরি করতে চেয়েছিল। যেখানে যুক্তি সমাধান এনে দিতে পারত না সেখানে অসহায় হয়ে না থেকে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণে সুখ পাওয়া যেত।'

সায়ন নিশ্বাস ফেলল। এই বৃদ্ধা কী ভয়ঙ্কর। তার হঠাৎ মনে এল এই বাড়িটাও তাই। গন্ধরাজ, আতরবালা, ন'বাবু, এমনকী টুপুরটা পর্যন্ত ওই ভয়ঙ্কর পথে পা বাড়াচ্ছে। নিজেদের বাইরে পৃথিবীর অন্য মানুষের জন্যে এদের কোনও চিন্তা নেই। তার বাবার মনেও ওসব ভাবনা কখনও আসবে না। এই বাড়ি, এই বংশ আর নিজের স্বার্থ, এই নিয়েই সবাই খুশি। ব্যতিক্রম সদানন্দ অথবা কমলেন্দু-উর্মিলা। কিন্তু সেই ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও ওরা এ বাড়ির বাইরের মানুষ নয়। যার সঙ্গে বিয়ে হওয়াব কথা তার বন্ধুকে কাজ পাইয়ে দিয়ে সদানন্দ নিজেকে অনেক মহৎ করেছে কিন্তু এই বংশের বিরুদ্ধে

বাইরের কেউ কথা বললে সে সহ্য করতে পারে না। একবারও ভাববে না এই বংশের চেহারাটা ঠিক কী রকম? কমলেন্দু-ঊর্মিলারা সামনে এই বাড়িতে থাকতে চায় গা বাঁচিয়ে। বিদ্রোহ করে এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না কখনও।

ঘরে ফিরে এল সে। প্যাসেজের মাঝখানে মায়ের সঙ্গে দেখা হল। নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই ছাদে গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'এমনি।' তারপর বলল, 'হেনা কাকিমার সঙ্গে দেখা হল।'

'ও।'

'আচ্ছা মা, শাশুড়ি আর স্বামী ওঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে অথচ তোমরা কেউ কিছু বলছ না কেন?'

'আমরা বললে ওরা শুনবে কেন?'

'কেন? এই বংশ এই বাড়ির তো তোমরাও শরিক।'

'কিন্তু যার যার পরিবার আলাদা।'

'ধরো তোমার শাশুড়ি বেঁচে আছেন এবং তিনি তোমার ওপর ওইরকম অত্যাচার করছেন। তুমি তো মেনে নিতে, তাই না?'

'জানি না কী করতাম। যদি এই হত তাহলে কী করতে—, পারিস বাবা। আয় জলখাবার খাবি।' নন্দিনী বললেন।

'আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।' সায়ন বলল।

'আশ্চর্য! সেই কখন খেয়েছিস, বিষ্ণুপ্রসাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।'

লুচি আর বেগুনভাজা অনেকদিন পরে খেল সায়ন। বেগুনভাজা খেয়ে বিষ্ণুপ্রসাদ খুব খুশি। নন্দিনী বেগুন ভাজার আগে একটু চিনি ব্যবহার করেন। ফলে স্বাদটা পাল্টে যায়।

বিষ্ণুপ্রসাদ চা খেল। সায়ন এক কাপ হরলিকস।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা খায়নি?'

'ওর খাওয়া অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। যা তোরা ঘরে গিয়ে টিভি দ্যাখ। সাড়ে নটা নাগাদ রাতের খাবার দেব।'

'এখন যা খেলাম তাতে আমার পেট ভরে গেছে। তুমি বরং বিষ্ণুপ্রসাদকে খাইয়ে দিও।'

'সারারাত না খেয়ে থাকবি?'

এইসময় নীচে চিৎকার শুরু হল। কোনও কথা বুঝতে না পেরে সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে মা?'

নন্দিনী বললেন, 'ওই প্রমোটারদের লোকের সঙ্গে পাড়ার মস্তানদের ঝামেলা লেগেই রয়েছে।'

ওদের কাজের মেয়েটি দরজায় এসে দাঁড়াল, 'মাগো, কী কাণ্ড! একলাবাবু মায়ের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাকে বাধা দিয়েছে আতরদি। সবাই ওখানে জড়ো হয়েছে। কিন্তু একলাবাবু কারও কথা শুনবেন না, আত্মহত্যা করবেনই।'

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'একলাবাবু কে?'

'মেজজ্যাঠা।'

'ওঃ, গন্ধরাজ। হঠাৎ আত্মহত্যার ইচ্ছে কেন?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সায়ন। তার খুব কৌতূহল হচ্ছিল।

নন্দিনী আপত্তি করলেন, 'থাক। তোকে আর ওদিকে যেতে হবে না। মা ব্যাঘ্রবাহিনীর সামনে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে না।'

'কেন? মা কি তাঁর সবকটা হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দেবেন?' সায়ন হাসল, 'চলো না, একটু দেখি। নাটক দেখতে তোমার ভাল লাগে না?'

নীচের ঠাকুরদালানে তখন উত্তেজনা তুঙ্গে। সমস্ত শরীর পেট্রোলে ভিজিয়ে গন্ধরাজ মায়ের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। পেট্রোল দ্রুত উবে যাচ্ছিল। তাকে জড়িয়ে ধরে আছেন সমরেন্দ্রনাথ, 'কী করছ দাদা? আত্মহত্যা মহাপাপ। তুমি মায়ের মূর্তির সামনে আত্মহত্যা করে মহাপাপ করতে চাও?'

'বেশি জ্ঞান দিস না আমাকে। মহাপাপ! আমার বেঁচে থাকাই তো মহাপাপ। সারাদিন ধরে আমি মাকে ডেকেছি, মা একটা বিহিত করো। পাঁচ পাবলিকের সামনে ওরা আমার ইজ্জত লুটে নিল। আঃ। না, তুই আমাকে ছেড়ে দে। ছেড়ে দে।' সমরেন্দ্রনাথের বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন গন্ধরাজ। ধ্বস্তাধ্বস্তি চলল।

কমলেন্দু এগিয়ে গেল. 'কী পাগলামি করছেন আপনি? ওই প্রদীপের আগুন একবার জামায় লাগলে আর দেখতে হবে না!'

'ও! আমি পাগলামি করছি। আতরবালাকে জড়িয়ে আমার নামে যে কুৎসা রটাল তার কোনও প্রমাণ এরা দিতে পারবে? বড়মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমি ওঁর ঘরে গিয়েছিলাম চুরি করতে? তোরা কেউ আমাকে সেখানে দেখেছিস? প্রমাণ চেয়েছিস ওদের কাছে?'

ন-বাবু বললেন, 'মাথা গরম করে লাভ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। বাড়িতে এখন শোকের ছায়া!'

'রাখো শোক। আমি কারও সাতে নেই পাঁচে নেই, কারও পাকা ধানে মই দিই না। বিয়ে-থা করিনি, একা থাকি, আতর মাখি। তাতে তো তোদের সবার বুক জ্বলে। ঠিক আছে বাবা, আমায় ছেড়ে দে, আমি মায়ের সামনে আত্মাহুতি দিই। সব ল্যাটা চুকে যাক।'

কমলেন্দু বলল, 'ঠিক আছে, আপনার অভিযোগগুলো নিয়ে আমরা অশৌচ শেষ হলে আলোচনায় বসব।'

'নো। নেভার।' চিৎকার করলেন গন্ধরাজ, 'হয় এখনই নয় কখনও নয়। এ বাড়ির ছেলে হয়ে ছোকরা মিস্ত্রিগিরি করে তা তোরা মেনে নিয়েছিস। বংশের মুখে কালি দিচ্ছে। তার এত সাহস আমার গায়ে হাত তোলার কথা বলে। ডাক ওকে। ডাক।' গন্ধরাজ এবার স্থির।

সদানন্দ একটু দূরে ছিল, কমলেন্দু বলল, 'আফটার অল ওঁর বয়স হয়েছে। অশৌচের সময় আর ঝামেলা কোরো না।'

সদানন্দ কয়েক পা এগোতেই গন্ধরাজ বলল, 'অ্যাই, তুই আমাকে চুরি করতে দেখেছিস? বল, সবার সামনে বল।'

সদানন্দ চুপ করে রইল।

সমরেন্দ্রনাথ বললেন, 'সদু, তোমার কাছে তো প্রমাণ নেই। মানুষটা আহত হয়েছে, ক্ষমা চেয়ে নাও!'

গন্ধরাজ চিৎকার করল, 'ক্ষমা? ওখান থেকে ক্ষমা চাইলে তো হবে না। এখানে এসে আমার পা ধরে বলতে হবে ক্ষমা চাইছি।'

এবার সকলেই সদানন্দকে অনুরোধ করতে লাগল গন্ধরাজ যা বলছেন তাই করতে। বোঝা গেল সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সদানন্দ এগোল। তারপর গন্ধরাজের পা ছুঁয়ে বলল, 'ক্ষমা চাইছি।'

গন্ধরাজ মাথা নাড়লেন, 'অদ্ধেক হল। সে ছোঁড়া কোথায়?'

সদানন্দ উঠে ঠাকুরদালান থেকে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখছিল সায়ন। সদানন্দ যে এভাবে ক্ষমা চাইবে তা সে কল্পনা করতে পারেনি। সে দেখল তার বাবা হাতজোড় করে এগিয়ে গেল, 'দাদা, তুমি আর রাগ কোরো না।'

'না না। রাগ তো আমি করিনি। অপমানে জ্বলে মরছি। তোর ছেলে যার এখনও দুধের দাঁত ভাঙেনি সে আমাকে...আমাকে...উঃ!'

'আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি দাদা।'

'তুই বলেছিলি ব্লাড ক্যানসারের পেশেন্ট, তাই কিছু বলিনি আমি। কিন্তু এত সাহস পেল কী করে? শুনলাম আবার পাহাড় থেকে স্যাঙাত নিয়ে এসেছে সঙ্গে। এ বংশের কুলাঙ্গার।'

'ঠিক আছে তুমি ক্ষমা করে দাও। জামা খোলো।'

'হ্যাঁ, আমি ওর বাপের বড়, ক্ষমা না করে উপায় কী, কিন্তু তুই ক্ষমা চাইলে তো হবে না। তাকে এখানে এসে ক্ষমা চাইতে হবে।'

সায়ন দেখল বাবা মাথা নেড়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন। সে নীচে এল। তারপর স্পষ্ট গলায় বলল, 'আমি কোনও অন্যায় করিনি। তাই ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।'

সায়নের বাবা হকচকিয়ে গেলেন। গন্ধরাজ সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দেখলি কী আস্পর্দ্ধা।'

'আমি তোমাকে বলছি ক্ষমা চাইতে।' বাবা বললেন।

'তুমি অন্যায় কিছু করতে বললে আমাকে সেটা করতে হবে!'

'ন্যায় অন্যায় বোঝার বয়স তোমার হয়নি।' ধমকে উঠল বাবা।

'নিশ্চয় হয়েছে। আমি আর ছেলেমানুষ নই। আমি আর সদুদা ওকে আতরবালার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি খুঁজতে দেখেছি। আমরা দরজায় শেকল তুলে দিয়েছিলাম কিন্তু ভাবিনি জানলা দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে। ওই দ্যাখো, ওর পায়ে ব্যাণ্ডেজ, নিশ্চয়ই কেটে গেছে পালিয়ে যাওয়ার সময়।' সায়ন বলল।

'কিন্তু সদু তো ক্ষমা চেয়েছে।' কমলেন্দু বলল।

'দেখলাম। এ বাড়িতে থাকতে হবে বলে সবার কথা মেনে নিয়েছে।'

গন্ধরাজ চেঁচাল, 'কেন? তুই এ বাড়িতে থাকবি না?'

'এরপর এ বাড়িতে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।'

'সানু।' চিৎকার করে উঠল বাবা, 'তোমাকে আমি কালই পাহাড়ে পাঠিয়ে দেব। অসুস্থ বলে যা ইচ্ছে বলতে পারো না তুমি?'

'আমি যা ইচ্ছে তাই বলছি না। তুমি যদি সত্যি আমাকে পাহাড়ে যেতে দাও তাহলে আমি খুশি হব। এই লোকটা কখনওই আত্মহত্যা করত না। ও প্ল্যান করে তোমাদের ব্ল্যাকমেল করছে। পাহাড়ে আর যে ধরনের মানুষ থাক এরকম অমানুষ থাকে না।'

সায়ন এগিয়ে গেল গন্ধরাজের দিকে।

গন্ধরাজের চোখ ছোট হয়ে এল। সায়ন মা ব্যাঘ্রবাহিনীর পাশে গিয়ে জ্বলন্ত প্রদীপ তুলে নিতেই গন্ধরাজের মনে হল মায়ের শরীর জ্বলছে। আর সেই জ্বলন্ত শরীর তার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রচণ্ড আর্তনাদ করে গন্ধরাজ দৌড়োল সিঁড়ির দিকে।

সায়নের বাবা ছুটে এসে ছেলের হাত থেকে প্রদীপ কেড়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী করছিলে তুমি? পুড়িয়ে মারছিলে?'

'না। কিন্তু তোমরা দেখলে প্রদীপ হাতে নিতেই লোকটা কেমন ভয় পেয়ে গেল। যাক, আমরা কাল দুপুরের ট্রেনে ফিরে যেতে চাই।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ভিড় কাটিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই উর্মিলা তাকে জড়িয়ে ধরল। সেখানে মেয়েরা জড়ো হয়েছিল। উর্মিলার পাশে দাঁড়িয়ে হেনা কাকিমা। দু হাতে তার মুখ ধরে হেনা কাকিমা বললেন, 'তুই আমাকে শক্তি দিয়ে গেলি রে সানু। আমি আর ভয় পাব না।'

শুধু নন্দিনী আঁচলের প্রান্ত দাঁতে চেপে পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিলেন।

৩৭

নন্দিনীর অনেক কিছু বলার ছিল কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে তিনি কখনও কথা বলেননি। বিয়ের পর বায়বাড়িতে এসে এক দিকে যেমন ঐতিহ্য, বংশগৌরব এবং রীতিনীতির কথা শুনেছেন তেমনই আর এক দিকে মেয়েবউদের চাপা অসন্তোষের সাক্ষী হয়ে থেকেছেন। সেই অসন্তোষ কখনই সীমা ছাড়াতে পারেনি, সেই সাহস কারও হয়নি। স্বামী অলস প্রকৃতির, পিতৃপুরুষের রেখে যাওয়া ব্যবসার কমিশন পেয়েই খুশি, এযাবৎকাল তিনি এই ছবি দেখতেই

অভ্যস্ত। শ্বশুর শাশুড়ি চলে যাওয়ার পর যখন সংসারের দায়িত্ব নিতে হল তখন আবিষ্কার করলেন স্বামী তাঁর ওপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছেন না কিন্তু একটা প্রচ্ছন্ন লক্ষ্মণগণ্ডি চারপাশে এঁকে দিয়েছেন। সেই গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন নিজেকে, এ বাড়ির অনেক বউ তো ওইটুকু স্বাধীনতাও পায়নি।

সায়ন যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল তখন পৃথিবীটা টলে গেল। ছেলে যখন অ্যাসেম্‌বলি অফ গড চার্চ হাসপাতালে তখন দুবেলা যাতায়াত করতে হত নন্দিনীকে। বিকেলে স্বামী সঙ্গে যেতেন। সকালে পাড়েজি ট্যাক্সি ডেকে এনে ড্রাইভারের পাশে বসত। এই যে প্রয়োজনে বেরুতে হবে তা কখনও ভাবেননি নন্দিনী, স্বামীর পক্ষেও মেনে না নিয়ে উপায় ছিল না। ছেলের জীবন নিয়ে যে টানাপোড়েন চলছিল তা অনেক রক্ষণশীলতার শেকড় আলগা করে দিল। সেই কারণে পরে, অনেক পরে, ছেলেকে দেখতে যখন পাহাড়ে গিয়েছিলেন তিনি তখন কোনও আপত্তি হয়নি। অথচ এই হঠাৎ পাওয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার করেননি নন্দিনী। রায়বাড়ির বউয়ের তথাকথিত আব্রু তিনি বজায় রেখে চলেছেন।

কিন্তু একটু আগে সায়ন বলে গেল সে আগামীকাল চলে যাবে। এ বাড়িতে যে ঘটনা ঘটে গেল তারপর ছেলেকে আটকে রাখার কোনও ইচ্ছে তাঁর হচ্ছে না। অথচ ছেলে চলে গেলে খুব কষ্ট হবে তাঁর। ওর বাবা প্রচণ্ড রেগে আছেন। হয়তো তিনি নরম গলায় কথা বললে ছেলে মত বদলাতে পারে। সায়ন এখন আর কিশোর নয়। আর এবার ওকে যত দেখছেন তত অচেনা মনে হচ্ছে নন্দিনীর। একটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের মতো ব্যবহার করছে মাঝে মাঝে। সায়নের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকালে বুকের ভেতরটা সিরসির করে ওঠে তাঁর। ওর কথার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হয় না। আজ দুমড়ে যাওয়া মন নিয়ে নন্দিনী স্বামীর কাছে গেলেন।

সায়নের বাবা বিছানায় শুয়েছিলেন টানটান হয়ে। একটা হাত ভাঁজ করে চোখের ওপর রাখা। নন্দিনী স্বামীকে দেখলেন। কীভাবে শুরু করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। খাটের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

'তোমাকে একটা কথা বলছি। ওর হয়ে কোনও সুপারিশ করবে না তুমি।' চোখের ওপর থেকে হাত না সরিয়ে কথা বললেন সায়নের বাবা।

'আমি কারও হয়ে সুপারিশ করতে আসিনি।'

'তাহলে কেন এসেছ?'

'এটা আমারও ঘর, এ ঘরে আসতে পারব না?'

'আমি তোমাকে চিনি।'

'কতটা চেন তুমি আমাকে?'

'এ নিয়ে তর্ক করতে আমার একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না। আমার মাথা খুব গরম হয়ে আছে, আমাকে দিয়ে কথা বলিও না।'

'তাহলে তুমি চাও কাল সানু চলে যাক।'

'এ বাড়িতে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ঔদ্ধত্য দেখানোর চেয়ে সেটাই ভাল।'

'ওর পক্ষেও যুক্তি আছে। তুমি কথা বলে দ্যাখো।'

সায়নের বাবা উঠে বসলেন, 'আমি ওর সঙ্গে কোনও কথা বলতে চাই না। ওইটুকুনি ছেলে আজ আমার মাথা হেঁট করে দিয়েছে। বাপের বয়সী একজনকে চূড়ান্ত অপমান করেছে। রায়বাড়ির মর্যাদাকে ধুলোয় নামিয়েছে।'

'কিন্তু ওই ভদ্রলোকও তো সৎ নন।'

'কে সৎ বা অসৎ তার বিচারের অধিকার ওকে কেউ দেয়নি। কই, সদু পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল সব। আর ও কালকের যোগী দুদিন পাহাড়ে থেকে কালাপাহাড় হয়ে গেল?'

কালাপাহাড়ের তুলনাটা যে খাটে না তা স্বামীকে মনে করিয়ে দিতে গিয়েও থেমে গেলেন নন্দিনী। বললেন, 'তাহলে যাক।'

সায়নের বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, যাক। আর একটা কথা, ওর খরচ বেশিদিন টানা আমার পক্ষে সম্ভব

নয়। আমি এখনই সেটা বন্ধ করে দিচ্ছি না। কিন্তু তিন চার মাসের পর আর পারব না।'

'সে কী?' আঁতকে উঠলেন নন্দিনী, 'এ কী বলছ তুমি?'

'এটাই আমার সিদ্ধান্ত।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? ও অসুস্থ, কী ভয়ঙ্কর রোগের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে, তুমি ভুলে গেলে?'

'না। আমি ভুলিনি। প্রথম যখন রোগ ধরা পড়েছিল সেদিনের কথা তোমার মনে আছে? ডাক্তার যখন বলল লিউকোমিয়া তখন তুমি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলে। ও বেশিদিন বাঁচবে না জেনে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলে। তারপর ডাক্তার দত্ত যখন লড়াই করার আশ্বাস দিলেন তখন আমরা ভাবলাম যে কদিন বাঁচে সে কদিনই আমাদের লাভ। আমরা চিকিৎসার কোনও কার্পণ্য করিনি যদিও জানতাম ও কখনও সুস্থ হবে না। কিন্তু তার প্রতিদানে ও যা করল তাতে মনে হচ্ছে ভস্মে ঘি ঢেলে কী লাভ!'

'ভস্মে ঘি ঢালছ?'

'নয়তো কী? ছেলেবেলায় একটা ইংরেজি সিনেমা দেখেছিলাম। প্রচণ্ড বরফের মধ্যে আটকে পড়ে স্বামী-স্ত্রী শীতে কাঁপছে। একটা দেশলাই আছে কিন্তু আগুন জ্বালাবার মতো কিছু নেই। একটা কাঠ বা খড়কুটো, কিছুই না। হঠাৎ স্বামীর মনে পড়ল তার পকেটে কিছু টাকা আছে। সে সেই টাকা বের করে আগুন জ্বেলে স্ত্রীর সামনে ধরতে লাগল। কিন্তু অত অল্প আগুনে শীত যাচ্ছিল না। একে একে সব টাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ভোরের আগে স্ত্রী ঠাণ্ডায় মরে গেল। আলো ফুটলে স্বামী দেখল তার সামনে স্ত্রীর মৃতদেহ আর অনেক টাকার ছাই। স্ত্রীর সৎকার করতে যে টাকা লাগবে তা আর ওর কাছে নেই।'

'বাঃ। তোমার আজই মনে হল ওর পেছনে যে টাকা ঢালছ তা নেহাতই অপচয়। এমন কথা তুমি ভাবতে পারলে?'

'ও আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে। দু-এক বছর পর ও পৃথিবীতে থাকবে না। কিন্তু আমি থাকব, রায়বাড়ির বংশমর্যাদা থাকবে। যাও, আমাকে আর বিরক্ত কোরো না।'

'তুমি এত নিষ্ঠুর আমি জানতাম না।'

'বেশ তো, নতুন শিক্ষা হল।'

'সেবার তুমি ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে পাহাড়ে যাওনি ওকে দেখতে।'

'এখন তুমি অনেক কিছু গবেষণা করে বের করতে পারো। আমার যা বলার তা স্পষ্ট বলে দিয়েছি।' সায়নের বাবা বললেন, 'অনেক কিছু আমাদের খারাপ লাগে কিন্তু খারাপ লাগছে বলেই বিদ্রোহ করব এ কেমন কথা। আর ওর আচরণের সঙ্গে যখন আমার মানসম্মান জড়িয়ে আছে তখন ভাবা উচিত ছিল না? ন'বাবু বললেন, আহা, ক্যানসারের পেশেন্ট তো, মাথা গরম করে ফেলেছে, কদিনই বা বাঁচবে, হয়তো নতুন বাড়ি দেখে যেতে পারবে না। ভাল লাগল এসব কথা শুনতে?'

অতএব নন্দিনীর কিছু করার নেই। অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ-এর ডাক্তার বলেছিলেন, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। ও যখন ফ্যাটাল পেশেন্ট নয় তখন লড়াই করার সুযোগ থাকছে।

সেই লড়াইটাই চলছিল। কিন্তু এখন কোথা থেকে কী হয়ে গেল!

আর একটু রাত বাড়লে নন্দিনী ছেলের ঘরে গেলেন। তাঁর মন বলছিল সায়ন যদি বাবার সঙ্গে নরম গলায় কথা বলে তাহলে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে অবাক হলেন। বিষ্ণুপ্রসাদ নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে কিন্তু সায়ন বিছানায় নেই, টয়লেটের দরজা আধা ভেজানো, আলো জ্বলছে না।

ছ্যাঁত করে উঠল বুক। নন্দিনী তড়িঘড়ি অন্য ঘরগুলো দেখলেন। কোথাও না পেয়ে ছাদের দরজার দিকে ছুটলেন। দরজা খোলা। অন্ধকার ছাদে এখন সামান্য তারার আলো। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সায়ন। মুখ আকাশের দিকে। নন্দিনী দ্রুত ছেলের পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'এখানে কী করছিস?'

সায়ন তাকাল। তারপর হাসল, 'তারা দেখছিলাম। পাহাড়ে আমি যত তারা দেখি এখানে তাদের অনেকেই দেখা দিচ্ছে না।'

'তুই এত রাতে তারা দেখতে এসেছিস?'

'তুমি কবে শেষবার তারা দেখেছ? একটু তাকিয়ে দ্যাখো, ভাল লাগবে।'

ছেলের কথায় নিতান্ত অনিচ্ছায় নন্দিনী মুখ তুললেন। ঠিক নীল আকাশ নয় কিন্তু প্রচুর তারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। কোনওটা বেশি উজ্জ্বল, কোনওটা নিষ্প্রভ। এই তারাদের ভিড়ে চোখ রাখতে রাখতে নন্দিনী ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। একটা আলোর রাস্তা যেন আকাশে সাঁটা হয়ে আছে। ওটা কী? আকাশগঙ্গা? এটা যে কালপুরুষ তা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তিনি। কালপুরুষ দেখা কি ভাল? অমঙ্গল হবে না তো! নন্দিনী ঝট করে ছেলের বাজু আঁকড়ে ধরলেন।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'ঘরে চল।'

'আর একটু দাঁড়াও না!'

'সানু, সত্যি কাল তুই চলে যাবি? এই অশৌচের সময় যেতে নেই।'

সায়ন কথা বলার আগেই প্রচণ্ড শব্দ হল। তারপরই বিকট চিৎকার। সায়ন দৌড়োল ছাদের আর এক প্রান্তে। শব্দটা ভেসে এসেছিল সেদিক থেকেই। কার্নিশের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে দেখল বেশ কিছু ছেলে আধা অন্ধকারে চেঁচাচ্ছে। যেখানে তাদের পাথরের পরিগুলো ছিল, যারা সরে যাওয়ায় নতুন বাড়ি উঠছে ছেলেগুলো সেখানে বোমা মারতে লাগল। ঘনঘন সেই শব্দে আশেপাশের গাছগুলো থেকে ঘুমন্ত পাখিরা ভয়ে চেঁচামেচি করে ডানা মেলল। সায়নের কানে এল একটা গলা, 'আয় শালা, নেমে আয়, দেখি কী করে বাড়ি বানাস। উড়িয়ে দে, জ্বালিয়ে দে।'

পাশেই সাজানো ইঁটের সাময়িক ঘরে শ্রমিকরা শুয়েছিল। ওরা সেখানে বোম মারতেই কান্নার রোল উঠল। বাঁচাও, বাঁচাও, মর গিয়া মর গিয়া চিৎকার করে ছুটে পালাতে লাগল শ্রমিকরা। নন্দিনী চাপা গলায় বললেন, 'সরে আয় সানু, ওরা তোকে দেখে ফেলবে।'

'দেখে ফেললে কী হয়েছে?' হাত ছাড়াতে চাইল সায়ন।

'এ বাড়ি থেকে একটু প্রতিবাদ হলেই ওরা এদিকে বোম ছুড়বে।'

'আশ্চর্য! ওরা অন্যায় করছে অথচ বাড়ির কেউ প্রতিবাদ করছে না?'

'কী করে করবে? ওদের হাতে বোমা রিভলবার আছে, ওরা গুণ্ডা!'

'ওরা গুণ্ডা বলে ওদের অন্যায়কে মেনে নেবে সবাই?'

'তুই ভেতরে চল, এ নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

সায়ন হাত ছাড়িয়ে নিল জোর করে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল নিরাময়ের ওপর আক্রমণের দৃশ্য। ওখানে যারা আক্রমণ করতে এসেছিল তাদের ভুল বোঝানো হয়েছিল। পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে সমতলের মানুষের বিরোধ তৈরি করা হয়েছিল। ঠিক যেভাবে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধানো হয় সেইভাবে ওই আবেগে পাহাড়ি মানুষদের অন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এরা কারা? পয়সার লোভে হামলা করতে এসেছে কিছু পেশাদার গুণ্ডা। আর তাদের ভয়ে সবাই জানলা দরজা বন্ধ করে বসে আছে।

সায়ন ঘুরে দাঁড়াল, 'আচ্ছা মা, ওরা যদি এ বাড়ির ওপর হামলা করে, মেয়েদের গায়ে হাত দিতে চায় তাহলে বাবা কাকা জ্যেঠারা কী করবে? ওদের হাতে বোমা আছে এই ভয়ে লুকিয়ে থাকবে?'

'আমি জানি না।' খুব ঘাবড়ে গেছেন নন্দিনী।

'তখন রায়বাড়ির বংশমর্যাদা অটুট থাকবে? এখন যদি ওখানে কেউ খুন হয় তাহলে রায়বাড়ির কৌলীন্য বাড়বে?'

প্রশ্নের জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে হনহন করে ছাদ পেরিয়ে দরজার ভেতর চলে গেল সায়ন। কয়েক সেকেন্ড পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন নন্দিনী। তাঁর মাথা কাজ করছিল না। সংবিত ফিরতেই তিনি দৌড়োলেন।

দরজা খুলে নীচে নেমে আসতেই সায়ন দেখতে পেল ঠাকুরদালানের সামনে সদানন্দ এবং বাদল চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে। এ বাড়ির সদরদরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তাকে দেখে সদানন্দ বলল, 'এই এক ঝামেলা শুরু হয়েছে। ওরা এসে বোমা মারবে, খিস্তি করবে আর তার এক

ঘণ্টা বাদে পুলিশ যখন আসবে তখন ওরা হাওয়া হয়ে গেছে।'

বাদল বলল, 'পাঁচ মিনিট আগে উঠলেই আমি বেরিয়ে যেতে পারতাম। এখন পুলিশ না ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আটকে থাকতে হবে।'

সদানন্দ বলল, 'তোকে তো বলছি আজ এখানেই থেকে যা।'

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কী চাইছে?'

বাদল বলল, 'মাল্লু। অপোনেন্ট পার্টি প্রমোটারের কাছ থেকে মাল্লু পেয়ে গেছে বলে ওরা ঝামেলা করছে।'

'মাল্লু মানে তো টাকা?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল।

বাদল হাসল, 'হ্যাঁ। তোকে এসব ভাষা বলা ঠিক হয়নি।

'ওরা কেন টাকা চাইছে?'

'কোনও কারণ নেই। তুমি বাড়ি বানিয়ে লাভ করবে একা তা হতে দেব না, আমাদেরও কিছু দাও—এই আর কী!'

'তাহলে তো কাল কোনও দোকানে গিয়ে বলতে পারে তুমি ব্যবসা করে একা লাভ করতে পার না, আমাদেরও কিছু দাও।'

বাদল বলল, 'পারে মানে? করছে তো। দোকানে দোকানে তোলা তুলছে না? কোথায় আছিস?'

'তোমরা এর প্রতিবাদ করছ না কেন?'

'দ্যাখ, ওদের পেছনে পার্টি আছে, পুলিশ আছে, আর আমাদের পেছনে কাকা জ্যেঠারাও নেই। বীরত্ব দেখানোর কোনও মানে হয় না।' সদানন্দ বলল।

সায়ন নীচে নেমে এল, 'আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব।'

'পাগল!' সদানন্দ চেঁচিয়ে উঠল।

'তুমি একটা কথা ভুলে গেছ সদুদা!' সায়ন শক্ত গলায় বলল।

সদানন্দ বাধা দিল, 'তুই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না—।'

'আমরা তো অনেক কিছুই বুঝতে পারি না। আমার যে অসুখ হয়েছে তাতে এতদিন এভাবে বেঁচে থাকাটা অনেকের কাছে বোঝার বাইরে, তাই না? তা ছাড়া আমি ওদের সঙ্গে মারপিট করতে চাইছি না, কথা বলতে যাচ্ছি।' সায়ন নেমে এল। সদানন্দ হঠাৎ গুটিয়ে গেল। সায়নের বেঁচে থাকাটা তার কাছেও বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। প্রথম প্রথম সে এই নিয়ে মাথাও ঘামিয়েছে। কিন্তু পরে স্বাভাবিক বলে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছিল। আজ সায়ন প্রসঙ্গ তুলতেই তার মনে সঙ্কোচ এল।

এই সময় চিৎকারটা ভেসে এল, 'সদু, ওকে আটকাও। ওকে যেতে দিও না।'

সায়ন ঘুরে দাঁড়াল, 'মা, তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ, আমার কিছু হবে না।'

দরজা খুলল সায়ন এবং তখনই আবার বোম পড়ল সামনে এবং হল্লা শুরু হল। রায়বাড়ির দরজা খুলতে হয়তো আলো বেরিয়েছিল বাইরে, সেটা চোখে পড়া মাত্র আচমকা চিৎকার থেমে গেল। রায়বাড়ি থেকে যে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে এ সময় তা বোমবাজরা ভাবতে পারেনি। সায়ন কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখার চেষ্টা করল। ঝাপসা দেখাচ্ছে সামনের দিকটা। কেউ একজন চিৎকার করল, 'কে বে?'

এই বে শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ামাত্র গাড়ির আওয়াজ হল। বড় রাস্তা ছেড়ে রায়বাড়ির গেটের সামনে একটা জিপ হেডলাইট জ্বালিয়ে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। জিপের দিকে দুটো বোম ছুড়ল ওরা। সায়ন অনুমান করল ওটা পুলিশের জিপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এবার জিপটা এগোল। হেটলাইটের আলো এসে পড়ল রায়বাড়ির ওপরে, সায়নের মুখে। জিপগাড়িখানা আচমকা ব্রেক কষল সায়নের পাশে এসে। দুটো সেপাই জিপের পেছন থেকে লাফিয়ে নেমে শক্ত করে সায়নের দু হাত ধরে টানতে লাগল। জিপ থেকে নেমে অফিসার বলল, 'সব শালা পালিয়েছে এ ব্যাটা থেকে গিয়েছে। বীরত্ব দেখানো হচ্ছে? চল, আজ তোর বীরত্ব বার করছি।'

টানাহ্যাঁচড়ায় মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল সায়ন, একজন সেপাই তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিতেই রায়বাড়ির দরজা পুরো খুলে গেল। পিল পিল করে বেরিয়ে আসতে লাগল ছেলেরা। ন'বাবু কাতর গলায় অফিসারকে প্রায় প্রতি রাতের অত্যাচার বন্ধ করার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন। কমলেন্দু বলল, 'আপনি এলেন আর ওরা পালিয়ে গেল। কেন পালাতে দিলেন?'

অফিসার মাথা নাড়লেন, 'এক ব্যাটা ধরা পড়েছে। ওই একজনই বলে দেবে বাকিদের কোথায় পাওয়া যাবে। কোনও চিন্তা করবেন না।'

সদানন্দ জিপের পেছনে চলে এসেছিল। তার চোখে পড়তেই সে চিৎকার করে উঠল, 'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন ওকে। ও আমাদের ছেলে।'

'আপনাদের ছেলে মানে?' অফিসার এগিয়ে গেলেন।

ততক্ষণে ন'বাবুরা হইচই শুরু করে দিয়েছেন। অফিসারের নির্দেশে সায়নকে ছেড়ে দিল সেপাইরা। অফিসার খিঁচিয়ে উঠলেন, 'এ আপনাদের বাড়ির ছেলে?'

কমলেন্দু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আপনারা যখন দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে সিনেমা দেখছিলেন তখন এ কেন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল? হোয়াই?' গর্জন করলেন অফিসার, 'অ্যাই, তুমি ওদের চেনো? ওদের দলে তুমিও আছ মনে হচ্ছে!'

সদানন্দ জবাব দিল, 'ও এখানে থাকে না।'

'এখানে না থাকলে যে যোগাযোগ থাকবে না এই জ্ঞান আপনাকে কে দিল?'

'না। ও অসুস্থ, পাহাড়ে এক নার্সিংহোমে থাকে।' কমলেন্দু বলল।

'অ। শুনুন, এই অ্যান্টিসোশ্যালদের তো পুলিশ সবসময় হাতের কাছে পাচ্ছে না। আপনাদেরও প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে।' অফিসার বললেন।

ন'বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কী করে প্রতিরোধ করব? ওদের হাতে অস্ত্র আছে, আমরা কি ওদের সঙ্গে কখনও পেরে উঠব?'

'তাহলে আপনাদের প্রমোটারকে বলুন। তিনি একটা দলের সঙ্গে ব্যবস্থা করে আর একটা দলকে বঞ্চিত করবেন এটা তো ঠিক কথা নয়।'

সায়ন চুপচাপ শুনছিল। টানাহ্যাঁচড়াতে তার শরীরে কিঞ্চিৎ ব্যথা হচ্ছিল। অফিসারের কথা শেষ হওয়ামাত্র সে এগোল, 'তার মানে এর পরে যদি আর একটা দল এখানে বোমাবাজি করতে আসে তাহলে একই কথা বলবেন?'

পুলিশ অফিসার খুব বিরক্ত হয়েছেন সেটা তার মুখ দেখে বোঝা গেল, 'দ্যাখো ভাই, তোমার বয়স অল্প, তুমি এসব বুঝবে না।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি সত্যি বুঝতে পারি না কেন পুলিশ অ্যান্টিসোশ্যালদের প্রশ্রয় দেয়। ওদের পাইয়ে দিতে চায়।'

'কী? কী বললে তুমি? আই উইল অ্যারেস্ট ইউ। আমার সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশের নামে বদনাম করছ?' চিৎকার করে উঠলে অফিসার।

'বদনাম তো আপনারা ইচ্ছে করে নেন। একটা চোর চুরি করে লুকিয়ে-চুরিয়ে, আপনাদের তো সেই চক্ষুলজ্জাও নেই। ওরা এখানে বোমাবাজি করছে। আপনি এসে ওই দূরে গেটের সামনে জিপ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেন আপনি চটজলদি ওখানে চলে গেলেন না। গেলে ওদের সবাই পালিয়ে যেতে পারত না। আপনি যাননি কারণ ওদের ধরার কোনও ইচ্ছে আপনার ছিল না। আবার এখন ওদের পাইয়ে দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করছেন? চমৎকার!' সায়ন একটানা বলে গেল।

অফিসার হাসলেন, 'বিষদাঁত কী করে ভাঙতে হয় চাকলাদার জানে। অ্যাই, ওকে জিপে তোল।'

হুকুম পাওয়ামাত্র দুজন সেপাই সায়নকে চ্যাংদোলা করে জিপে তুলল। অফিসার ড্রাইভারের পাশে উঠে বসামাত্র জিপ চালু হল। সদানন্দরা চেঁচামেচি শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই জিপ মুখ ঘুরিয়ে ছুটল গেটের দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেটা চোখের আড়ালে চলে গেল।

জিপে বসেছিল সায়ন দুই সেপাইয়ের মধ্যে প্রায় চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে। রাস্তা ফাঁকা, কোথাও কোনও

শব্দ নেই। হঠাৎ একটা সেপাই ফিসফিস করে বলল, 'ভাগনে মাংতা?'

সায়ন অবাক হয়ে গেল, 'কেন?'

'শ রুপিয়া নিকালো, জিপ রুখনেসে ভাগ যানা।'

'আমার কাছে টাকা নেই।'

সেপাই দুটো মুখ ঘুরিয়ে নিল চটপট।

সায়নকে ওরা যেখানে ঢুকিয়ে দিল সেখানে আরও কয়েকজন বসে বা শুয়েছিল। অফিসার চিৎকার করে বললেন, 'এই নে নয়া মুরগি, দোস্তি কর, হা হা হা।' বলে চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

লোকগুলো পিটপিট করে সায়নকে দেখল। একজন বলল, 'লাইনে নতুন মনে হচ্ছে। কখনও দেখিনি আগে, ভদ্দরলোকের চেহারা, কেস কী?'

সায়ন সোজা ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'তোমাদের কি বিনা দোষে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে না সত্যি অন্যায় করেছ?'

লোকগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর ওদের একজন বলল, 'বুঝতে পেরেছি বাবু, আপনি পার্টি করেন। যান, ওপাশে গিয়ে বসুন, কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

সায়ন লোকটাকে দেখল, তারপর খানিকটা তফাতে গিয়ে বসল।

ঘরটা স্যাঁতসেঁতে, দুর্গন্ধে নিশ্বাস নেওয়া কষ্টকর। মেঝে স্যাঁতসেঁতে। মিনিট দশেক কোনওমতে সেখানে থাকার পর সায়ন উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল। তার চিৎকার শুনে একজন সেপাই এগিয়ে এল। সায়ন তাকে বলল, 'অফিসারকে ডাকো, এখানে কোনও মানুষ থাকতে পারে না।'

সেপাই হাসল, 'ওরা মানুষ না?'

সায়ন রেগে গেল, 'যা বলছি তাই করো। অফিসার কোথায়?'

সেপাই ফিরে গেল। মিনিট দুয়েক বাদে অফিসারকে দেখা গেল, 'চ্যাংড়ামো হচ্ছে? আমি তোমার বাপের চাকর যে ডাকলেই চলে আসব? তোমাকে গোলাপের বিছানায় শুইয়ে রাখতে হবে, অ্যাঁ। অ্যাই, তোদের বলে গেলাম আর তোরা কিছু করিসনি?'

সেই লোকটা বলল, 'ইনি পার্টি করেন, কিছু করলে মরে যাব।'

'পার্টি করে? এই যে বলল, অসুস্থ, নার্সিংহোমে থাকে! যত্ত দু-নম্বরি কথা। অ্যাই তুমি কোন পার্টি কর?'

'আপনি দরজাটা খুলুন।'

'মামার বাড়ি? আগে বিষদাঁত ভাঙি তারপর দরজা খুলব।' লোকটা অকস্মাৎ ক্ষেপে গেল, 'আমার নামে বদনাম!'

'ঠিক আছে। যদি কেউ বলে আপনি ঘুষ খান না, সাধারণ মানুষের ওপর যেসব মাস্তান অত্যাচার করে তাদের ধরে ধরে শাস্তি দেন, কেউ চাপ দিয়েও আপনাকে ন্যায়ের পথ থেকে নড়াতে পারে না তাহলে আপনার কেমন লাগবে? খুশি হবেন?' সায়ন হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে যেন চুপসে গেলেন অফিসার, 'রসিকতা হচ্ছে?'

'তাহলে দেখুন, দুটোই আপনার খারাপ লাগছে।'

অফিসার দরজা খুললেন। তারপর ডান হাত বাড়িয়ে সায়নের কলার ধরলেন। এবং ধরামাত্র তাঁর মনে হল বুকের বাঁদিকের পাঁজরের তলায় ব্যথা হচ্ছে। ব্যথাটা প্রবল হয়ে উঠছে। তিনি কোনওমতে বলতে পারলেন, 'ব্যথা, খুব ব্যথা, বাঁচাও।'

সায়ন হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কোথায় ব্যথা?'

'বুকে! ও, মা—!'

সায়ন দ্রুত অফিসারের বুকে মালিশ করতে লাগল। ভদ্রলোকের মুখে ঘাম জমছিল। হঠাৎ শব্দ করে ঢেঁকুর তুললেন তিনি। তারপর এক বুক নিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্কু। আঃ।'

'ভাল লাগছে?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে উইন্ড হয়েছিল। এই শালা হরিপদর পরোটা মাংস খাওয়া ছাড়তে হবে।

অ্যান্টাসিড ছাড়া খেলেই—!' দ্বিতীয় ঢেঁকুর তুললেন তিনি। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন।

'আমি কি বাইরে যেতে পারি?'

'ঠিক আছে।'

অফিসার ওকে বাইরের ঘরে নিয়ে এসে বসতে বললেন। নিজে টেবিলের উল্টোদিকে বসে বললেন, 'তোমাকে একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। শোনো, আমরা পুলিশরা খারাপ মন নিয়ে চাকরি করতে আসি না। আসার পর আমাদের খারাপ করে দেওয়া হয়। ছেলেবেলায় আমি ঘুষ নেওয়াকে পাপ বলে মনে করতাম। কেউ ঘুষ নিলে এড়িয়ে যেতাম তাকে। এখন আমার ছেলেমেয়ে জানে কী করে টাকা আসছে, জেনেও কখনও প্রশ্ন করে না। কারণ এই চাকরিতে ঘুষ না নিলে চাকরি থাকবে না অথবা পানিশমেন্ট পোস্টিং হয়ে যাবে। তোমাদের প্রমোটারের কাছে আমরা প্রথমে যাইনি, তিনিই এসেছিলেন। মিউচুয়াল করার সময় বলে গেলেন যারা ঝামেলা করবে তাদের তিনিই ম্যানেজ করবেন। এখন একটা দলকে তিনি ম্যানেজ করে অন্য দলকে পাত্তা দেননি। দোষ কার?'

'এ সব কথা আমাকে কেন বলছেন?'

'আই ডোন্ট নো। তুমি যখন বুকে হাত বোলালে তখন একটা অন্যরকমের অনুভূতি হচ্ছিল। আই কান্ট এক্সপ্লেইন, একটা সুপার ন্যাচরাল অনুভূতি। আমার বোধহয় ভুল হচ্ছে, ওয়েল, চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।' সায়ন দেখল মানুষটার মুখ একদম বদলে গেছে।

'আপনার উচিত এখন একজন ডাক্তার দেখানো।'

'না, না, ঠিক আছি। নো প্রব্লেম।' মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, 'শুনলাম তুমি অসুস্থ, নার্সিংহোমে ছিলে। তাই?'

'হ্যাঁ।'

'কী হয়েছিল?'

'আমার রক্তে লোহিতকণিকা খুব কমে গেছে।'

'সে কী? অ্যানিমিক?'

'তার চেয়েও কম।'

'মাই গড ! তার চেয়ে কম হলে কী বলে যেন, কী বলে—!'

'লিউকোমিয়া।'

'হ্যাঁ, সে কী? তাই?'

'হ্যাঁ।' সায়ন হাসল, 'তাতে অবশ্য আমার অসুবিধে হয় না।'

অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, 'সর্বনাশ। আগে বলবে তো? কিছু যদি করে ফেলতাম তাহলে মানবাধিকার কমিশন আমাকে শেষ করে দিত!'

'অন্যায় যে করেনি তার সঙ্গে কিছু করবেন কেন?'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারি না! চলো ভাই, পৌঁছে দিচ্ছি।'

সায়নকে জিপের সামনের সিটে বসালেন ভদ্রলোক, 'আসলে কী জানো, আজকাল আমি সবসময় কমপ্লেক্সে ভুগি। মন্দ কাজকেও ভাল বলে ভাবতে চেষ্টা করি। কোনও উপায় নেই।'

হঠাৎ রাস্তা দিয়ে কয়েকজনকে হেঁটে আসতে দেখা গেল। কাছাকাছি হলে সায়ন চিনতে পারল, বাবা, সদানন্দ, কমলেন্দু এবং আরও কয়েকজন। সায়ন বলল, 'জিপ থামান। আমার বাড়ির লোকজন আসছে।'

জিপ থামিয়ে অফিসার বললেন, 'আপনাদের থানায় যেতে হবে না। আমি ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। ফিরে যান।'

চুপচাপ রায়বাড়ির সামনে চলে এল জিপ। এখন রায়বাড়িতে কিছু আলো জ্বলছে। জিপ থেকে সায়ন নামতে অফিসারও নামলেন, 'একটা কথা, ডাক্তার কী বলছে?'

'কী ব্যাপারে?'

'অসুখের— মানে—।'

'লড়াই করে যেতে হবে।'

অফিসার মাথা নাড়লেন। হঠাৎ সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনি এমন আচমকা বদলে গেলেন কেন বলুন তো?'

অফিসার মাথা নাড়লেন, 'বুঝতে পারছি না। আমার মা অনেককাল আগে মারা গেছেন। ছেলেবেলায় অসুখ করলে মা বুকে হাত বুলিয়ে দিত। আজ এতদিন বাদে ঠিক সেইরকম স্পর্শ, দুর, আমি এসব ভাবলে পাগল হয়ে যাব। আচ্ছা, আসি ভাই।' অফিসার গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

রায়বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়াতেই নন্দিনী ছুটে এসে সায়নকে জড়িয়ে ধরে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। মায়ের পেছনে আর যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে হেনা, উর্মিলা, কৃষ্ণাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

কৃষ্ণা বললেন, 'বলিহারি সাহস তোমার, পুলিশের সামনে বীরত্ব দেখাতে হয়? ভয়ে আমার হাত পা কাঁপছিল।'

উর্মিলা বলল, 'সাহস দেখাল বলে পুলিশ ওকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।'

হেনা কাকিমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে তোকে মারধর করেনি তো?'

নন্দিনীর কান্না কমে এসেছিল। সায়ন বলল, 'মারার আগে ভদ্রলোকের বুকে এত ব্যথা শুরু হয়ে গেল যে সুযোগ পেলেন না।'

হেনা কাকিমা বললেন, 'হবেই তো, অধর্ম করলে হবে না?'

নন্দিনী অদ্ভুত চোখে ছেলের দিকে তাকালেন, 'বুকে কষ্ট শুরু হয়ে গিয়েছিল? তারপর?'

'তারপর আর কী! কমে গেল।'

'কমে গেলে রাগ চলে গেল?'

'তা নয়। আমি বুকে মালিশ করে দিয়েছিলাম বলে বোধহয় আর মারতে পারল না।' সায়ন হাসল।

নন্দিনী কোনও কথা না বলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। আর তখনই ছেলেরা ফিরে এল। সদানন্দ কমলেন্দু বারংবার কী কী ঘটনা ঘটেছিল তা জানতে চাইছিল। অফিসারের ব্যবহারের এই পরিবর্তনের কারণ নিয়ে জল্পনা শুরু হল।

সায়নের বাবা বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। শোবে চলো।'

নিজের ঘরে ঢুকে সায়ন দেখল বিষ্ণুপ্রসাদ ঘুমাচ্ছে। এই যে এত কাণ্ড হল ও টের পায়নি, কেউ ডাকেনি ওকে। চুপচাপ পোশাক পাল্টে শুয়ে পড়ল সায়ন। অফিসারের মুখ চোখের সামনে চলে এল। হয়তো আজকের রাতটা, কাল থেকে আবার নিজের জগতে ফিরে যাবেন ভদ্রলোক।

সায়নের মনে হল এ বাড়ির ভেতরে যে নীতিহীনতা, স্বার্থপরতা তার চমৎকার প্রকাশ এ বাড়ির বাইরেও। পাহাড়ে থেকে তার চোখ খুলে না গেলে হয়তো সে এই চেহারা দেখতে পেত না। এইভাবে বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয়?

দুটো ঘর ওপাশে সায়নের বাবা বলছিলেন, 'না, আমার মনে এখন আর কোনও কষ্ট নেই নন্দিনী, সানু ওখানেই ফিরে যাক, যে কদিন থাকবে ভালভাবে থাকতে পারবে তাহলে!'

নন্দিনী আবিষ্কার করলেন তাঁর বুকের ভেতরটা হঠাৎ হালকা হয়ে গেল।

৩৮

ঝাপসা, সব ঝাপসা। চোখ টান করে দেখার চেষ্টা করল সায়ন। কিন্তু চোখের পাতা দুটো আকর্ষণ করল পরস্পরকে। সামনে তখন অন্ধকার আর সেই অন্ধকারে কেউ যেন হু হু করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। মাধ্যাকর্ষণের এলাকায় ঢুকলে যেমন হয়। সেই অনুভূতিটাও কয়েক মুহূর্তের, তারপর আর কিছু নেই।

দ্বিতীয় বার যখন চোখ খুলল সায়ন তখন আকাশটা ঘরের মধ্যে। ঘরে কোনও দেওয়াল নেই,

কয়েক হাত দূরেই আকাশ। এবার ঝাপসা নয়, নোংরা লেগে থাকা মেঘেরা চলে গেল সেই আকাশ থেকে। স্বচ্ছন্দে হেঁটে এলেন মিস্টার ব্রাউন। ঠিক যেভাবে হেঁকে বলতেন, 'গুড মর্নিং মাই বয়', ঠিক তেমনই তাঁর ঠোঁট নড়ল। কেমন আছেন মিস্টার ব্রাউন? প্রশ্ন শুনে আরও হাসলেন ভদ্রলোক, ভাল নেই মাই বয়, একটুও ভাল নেই।

সে কী? আপনি যিশুর কাছে গিয়েছেন, ভাল না থাকার তো কথা নয়।

আমি এখন পরমপিতার আশ্রয়ে। সর্বত্র তিনি বিরাজমান। কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না, অনুভূতিতে নিতে হয়। পৃথিবীতে তিনি আলোর মতো, বাতাসের মতো। এখানে আমি তাঁর কাছে, খুব কাছে। যেন কারও ঘরে এসেছি, ঘরটা তাঁর বুঝতে পারছি, তিনি কোনও কাজে বাইরে গেছেন। অথচ যিশু ছিল আমার সঙ্গে যখন পৃথিবীতে ছিলাম। এখানে কেউ নেই, খুব একা লাগে মাই সন। যিশু আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছেন কিন্তু আমি তাঁকেই দেখতে পাচ্ছি না।

আকাশটা কেঁপে গেল। মিস্টার ব্রাউনের ছবি ঝট করে মিলিয়ে গেল ঠিক যেভাবে টিভিতে লোডশেডিং হয়।

তৃতীয়বার যখন চোখ খুলল সায়ন তখন দৃষ্টি পরিষ্কার। চোখের সামনে ডাক্তার আঙ্কল। তাঁর মুখে হাসি, 'কেমন লাগছে এখন?'

'ভাল।'

'টেক রেস্ট। কথা বোলো না আর।'

'আমি এখন কোথায়?'

'নিরাময়ে।' ডাক্তার আঙ্কল সরে গেলেন সামনে থেকে। সায়ন মাথা ঘোরাল। হ্যাঁ, এটা তো নিরাময়ের জানলা। জানলার পর্দা টানা। কিন্তু সে নিরাময়ে কী করে পৌঁছোল? বিষ্ণুপ্রসাদ কোথায়? আহা, বেচারা কলকাতায় গেল অথচ কলকাতা দেখতে পেল না। কিন্তু কলকাতায় বাইরের লোক গিয়ে কি দেখে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, পাতাল রেল, কালীঘাট? ওগুলো দেখা কি কলকাতাকে দেখা? রায়বাড়িতে এই কয়েকদিনে যা ঘটে গেল সেটাই এখন কলকাতার আসল ছবি। তার কিছু দেখেছে বিষ্ণুপ্রসাদ, কিছুটা ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে দেখতে পায়নি।

মিসেস অ্যান্টনি ঘরে ঢুকলেন, 'হ্যালো, গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং। এখন তাহলে সকাল? আমি জানতাম না।'

'কী করে জানবে? তুমি তো তিন দিন ধরে ঘুমিয়ে ছিলে।'

'আমাকে কে নিয়ে এল এখানে?'

'সবাই। তোমার বাবা, মা, বিষ্ণুপ্রসাদ। কিন্তু আর কথা বোলো না।'

'মা, বাবা?'

'হ্যাঁ। তাঁরা আছেন। ওঁদের বিকেলবেলায় আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।' কীরকম হালকা হয়ে গেল মনটা। সায়নের মনে হল সে নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। মিসেস অ্যান্টনি তাকে একটা ক্যাপসুল খাইয়ে দিলেন। সায়ন তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তুমি খুব ভাল।'

মিসেস অ্যান্টনি একটু কেঁপে উঠলেন। সায়ন চোখ বন্ধ করতেই ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। তারপর সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ নেমে আচমকা শরীর কাঁপিয়ে কান্না এল তাঁর। নীচের প্যাসেজে হেঁটে যাচ্ছিল ছোটবাহাদুর। ওপরে তাকিয়েই ছুটে এল কাছে, নেপালিতে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?'

কান্নাটা কোনও মতে গিলে ফেললেন মিসেস অ্যান্টনি। বললেন, 'এমনি।'

ভিজিটার্সদের জন্যে নিরাময়ে একটা সময় ঠিক করে দেওয়া আছে। তার অনেক আগেই নন্দিনী স্বামীর সঙ্গে চলে এসেছিলেন। ডাক্তারের চেম্বারে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। ডাক্তার ঘরে ঢুকে বললেন, 'এ যাত্রায় আমরা চিন্তামুক্ত।'

'ওঃ, ভগবান।' চোখ বন্ধ করলেন নন্দিনী।

সায়নের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেন্স ফিরেছে?'

'হ্যাঁ। তবে কথা কম বলাবেন।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' হাসলেন সায়নের বাবা।
ডাক্তার হঠাৎ অন্য গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওখানে কিছু হয়েছিল?'
'মানে?' সায়নের বাবা থমকে গেলেন।
'কোনও মানসিক প্রব্লেম?' ডাক্তার সরাসরি তাকালেন।
'হ্যাঁ।' ভদ্রলোক মাথা নিচু করলেন।
'ও। তাহলে ওকে কলকাতা থেকে এত দূরে নিয়ে এলেন কেন?'
'ও ইনসিস্ট করছিল এখানে আসার জন্যে।' সায়নের বাবা বললেন,
নন্দিনী যোগ করলেন, 'তা ছাড়া আপনার ওপর আমার ভরসা বেশি।'
'আশ্চর্য! কোনও মানুষ এরকম অসুস্থ হলে তখনই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। আমি পির বা সন্ন্যাসী নই যে মরা মানুষ বাঁচিয়ে দেব। অবশ্য তাঁরা যে কাজটা করতে সক্ষম তা আমি বিশ্বাস করি না। ওকে কলকাতার কোনও নার্সিংহোমে ভর্তি করানো উচিত ছিল, তাহলে হয়তো এতটা সাফার করত না।' ডাক্তার কথা বলতে বলতে পেপার ওয়েটে হাতের চাপ দিচ্ছিলেন।
সায়নের বাবা বললেন, 'কিন্তু আপনি বললেন ওর বিপদ কেটে গেছে।'
'হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা ঝুঁকি নিয়েছিলেন।'
এইসময় দরজায় এসে দাঁড়াল কঙ্কাবতী। তার শরীরে স্কুলের ইউনিফর্ম। ডাক্তার তাকে দেখতে পেয়ে হেসে বললেন, 'কেমন হল স্কুল?'
কঙ্কাবতী যে তৃপ্ত তা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। মাথা হেলিয়ে বলল, 'ভাল। সবাই আমাকে হেল্প করবে বলেছে। সায়ন কেমন আছে?'
'ভাল। অনেক ভাল।'
'আমি একবার দেখা করতে পারি?'
'পারো। কিন্তু দুটোর বেশি কথা বলবে না।'
কঙ্কাবতী মাথা নেড়ে চলে গেলে সায়নের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?'
ডাক্তার কঙ্কাবতীর পরিচয় দিলেন, 'আজ দুদিন হল ও আবার স্কুলে যাওয়া আসা শুরু করেছে। সেটা করতে পেরে ওর বিমর্ষ ভাবটা প্রায় চলে গেছে, কিন্তু—' ডাক্তার কথা শেষ করলেন না।
'কিন্তু?'
'মিস্টার রায়, আমি একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে রয়েছি। আমি এই নিরাময় শুরু করেছিলাম শুধু পেশেন্টদের চিকিৎসা করে জীবনে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে নয়। কারণ এই অসুখ কখনওই কাউকে চিরকালীন সুস্থতা দেবে না। আমি একটু অন্যরকম ভেবেছিলাম। যে কোনও মানুষকেই জন্মাবার পর মুহূর্ত থেকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়। খুব বেশি হলে কেউ একশো বছর বাঁচেন, কেউ আশি নব্বুইতে যাত্রা শেষ করেন। আবার চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে এমন মানুষের সংখ্যাই সম্ভবত বেশি। আমি ধরে নিচ্ছি একটি মানুষ ষাট বছর বেঁচে থাকবে। তাকে যা করার তা এর মধ্যেই করে যেতে হবে। ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিন, আমরা প্রত্যেকে তো আমাদের বাবা অথবা ঠাকুদারকে দেখেছি। তাঁরা ছিলেন, কাজকর্ম করতে দেখেছি, এখন তাঁরা নেই। অতএব আমারও ভবিতব্য একই। নিরাময়ে যারা মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে তাদের খানিকটা সুস্থতা এনে দিতে যদি সক্ষম হই তাহলে এখানে থেকেই তারা তাদের মতো বাঁচতে পারে। একজন স্বাভাবিক মানুষের আয়ু যদি ষাট হয় তাহলে আমার পেশেন্টদের হয়তো পনেরো অথবা কুড়ি। এটা এমন কী কম সময়?' ডাক্তার নিঃশ্বাস নিলেন। 'কিন্তু আমি একেবারেই সক্ষম হইনি। এখানে চিকিৎসার জন্যে যারা এসেছে তাদের অভিভাবকরা আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেননি। একথা ঠিক কেউ অসুস্থ হলে, সে নিজের সন্তানও যদি হয়, মানুষ উদ্বিগ্ন হয়, প্রাণপণ চেষ্টা করে সুস্থ করতে কিন্তু অসুস্থতা দীর্ঘকাল ধরে চললে একটা গা-ছাড়া ভাব এসেই যায়। আর এক্ষেত্রে তো জানাই আছে কোনওদিন রোগমুক্ত হবে না। আমি তাই কোনও অভিভাবককে জোর করতে পারি না। এখানে রেখে চিকিৎসা করানোর জন্যে যে খরচ তা যদি দীর্ঘকাল তাঁরা বহন করতে অক্ষম হন আমি সেটা মেনে নিতে বাধ্য। আমার সমস্যা এখানেই। এতকাল আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি। একমাত্র সায়ন ছাড়া আর

কারও মধ্যে অসুস্থতাকে অতিক্রম করে জীবনের কাছে পৌঁছোতে দেখিনি। এই মেয়েটির মধ্যে সেই সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমার পক্ষে তো আর নিরাময়কে ধরে রাখা সম্ভব নয়।'

ঘরের আবহাওয়া আচমকা ভারী হয়ে গেল। সায়নের বাবা কথা খুঁজলেন। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সরকারি সাহায্য পান না?'

'হিল কাউন্সিল সামান্য অর্থ দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিরাময়কে একটা নার্সিংহোম ছাড়া কিছু মনে করে না। আমি আশা করেছিলাম বাইরে থেকে সাহায্য পাব। একটি প্রতিনিধি দলের এখানে আসার কথা ছিল। কিন্তু তারাও সরে দাঁড়িয়েছে। আমি যদি নিরাময়কে একটি সাধারণ নার্সিংহোমের পর্যায়ে নিয়ে যাই তাহলে অর্থের অভাব হবে না। প্রচুর ধনবান পাহাড়ি পরিবার আমার পেট্রন হয়ে যাবেন। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই সেটা করতে চাইনি। এই যে মেয়েটিকে দেখলেন, আবার স্কুলে যাচ্ছে, ওর মুখের হাসি মিলিয়ে যাবে, সামনে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখবে না যদি আমি নিরাময় বন্ধ করে দিই। কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমার ক্ষমতা কতটুকু?'

ডাক্তারের কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল এলিজাবেথ প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে আসছেন। ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন, 'গুড আফটারনুন।'

'গুড আফটারনুন ডক্টর। সায়ন কেমন আছে?' এলিজাবেথ ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন। ওঁর পেছনে বিষ্ণুপ্রসাদ। সে সায়নের বাবা মাকে নমস্কার করল।

'ভাল। বিপদ চলে গেছে।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ওই মেয়েটি স্কুলে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ। বসুন এলিজাবেথ। এঁরা সায়নের বাবা মা।'

এলিজাবেথ নন্দিনীর হাত ধরলেন, 'আমি আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু চিন্তা করবেন না, ডক্টর তো বললেন সায়ন এখন বিপদ মুক্ত।'

নন্দিনী সঙ্কোচে পড়লেন, ইংরেজিতে কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত নন।কেউ ধীরে ধীরে বললে সামান্য বুঝতে পারেন। তিনি মাথা নাড়লেন।

এলিজাবেথ বোধহয় অনুমান করলেন। হেসে বললেন, 'সায়ন বহুৎ আচ্ছা—।'

ডাক্তার হাসলেন, 'বাঃ, আপনি এর মধ্যেই বেশ হিন্দি বলছেন।'

'আই ক্যান স্পিক নেপালি বেটার।' এলিজাবেথ বাচ্চা মেয়ের মতো মুখ করলেন, 'একটা ভাল খবর দিচ্ছি। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আমার ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছে।'

'বাঃ। এ তো, খুব ভাল খবর।'

'ডক্টর। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'বলুন।'

'হ্যাঁ। এই জন্যে আমি ডক্টর তামাংকেও এখানে আসার জন্যে অনুরোধ করেছি। অবশ্যই আমি ক্ষমা চাইছি আপনার অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে।'

'সেটা ঠিক আছে। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো।'

'ডক্টর তামাং এসে পৌঁছোন, তারপর—।'

ডাক্তার বুঝলেন। নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা এখন ছেলের কাছে যেতে পারেন। কিন্তু ওকে বেশি কথা বলতে দেবেন না।'

সায়নের বাবা মাথা নেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ওঁদের যাওয়া দেখে এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা কি সায়নকে দেখতে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ। আপনি যাবেন?'

'না না। ওঁরা যাচ্ছেন, সায়ন ওঁদের সঙ্গে কথা বলবেই। তার ওপর আমি গেলে কথা বলা বেড়ে যাবে। এখানে এসে আমি বেশি কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। বরং আমার ইচ্ছে ওই মেয়েটি, হ্যাঁ, কঙ্কা, কঙ্কার সঙ্গে একটু কথা বলব।' এলিজাবেথের কথা শেষ হতেই গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। ডাক্তার তামাংকে দেখা গেল প্যাসেজ দিয়ে আসতে। এলিজাবেথ বললেন, 'উনি এসে গিয়েছেন!'

ডাক্তার তামাং হাত তুলে নিঃশব্দে হাসলেন। তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল আজ একটু বেশি

পরিমাণেই পান করেছেন। এলিজাবেথ বললেন, 'আমরা কি আপনার অফিসঘরে বসেই কথা বলব?'

ডাক্তার বললেন, 'কোনও অসুবিধে নেই।'

তিনজনে বসার পর এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডক্টর তামাং, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন তো?'

'একশোবার।' ডাক্তার তামাং-এর গলা ঈষৎ জড়ানো।

এলিজাবেথ একটু ভাবলেন। তারপর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আমাকে বলেছিলেন যে নিরাময়কে বাঁচিয়ে রাখা আপনার পক্ষে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আপনি কি এখনও সেইরকম ভাবছেন?'

ডাক্তার হাসলেন, 'এর চেয়ে বড় সমস্যা আমার সামনে নেই।'

'কেন কঠিন হচ্ছে?'

'প্রথম কারণ অর্থ। মূলত পেশেন্টদের গার্জেনের টাকায় আমাকে চালাতে হত। সেই টাকা ঠিক সময়ে পাওয়া যেত না, গেলেও খরচ অনেক বেশি হত। সেই বেশি খরচটা আমার সঞ্চয় থেকে মেটাতাম। বাইরে থেকে যা সাহায্য পেয়েছি তা না পেলে অনেক আগেই নিরাময় বন্ধ হয়ে যেত। এখন বাইরের সাহায্য আর পাচ্ছি না। আমার সঞ্চয়ও প্রায় শেষ। দ্বিতীয়ত, শুরুর দিকে আমি যত পেশেন্ট পেয়েছিলাম এখন তা পাই না। একটু সুস্থ হলেই অথবা সুস্থতা না এলে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পেশেন্টদের ফেরত নিয়ে যান। ফলে কমতে কমতে এখন পেশেন্টের সংখ্যা এত কমে গেছে তাদের জন্যে যে টাকা আসে তাতে খরচ কমানো যাচ্ছে না। তৃতীয়ত, আমি নিরাময় করেছিলাম যে উদ্দেশ্যে তা প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছে। আমি চেয়েছিলাম যে-কয় বছর এরা বাঁচবে সেই কয় বছর এরা যেন বিছানায় পড়ে না থাকে। সত্যি কথা বলতে কি সায়ন ছাড়া সেই উদ্যম আমি কারও মধ্যে দেখিনি।' ডাক্তার কথা শেষ করলেন।

এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? কঙ্কাবতী?'

ডাক্তার তাকালেন, 'ঠিকই। ও স্কুলে যেতে চাইছিল, যাচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ওর অসুখ সায়নের পর্যায়ে কখনও যায়নি।'

ডাক্তার তামাং এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে শুনে যাচ্ছিলেন, এবার চোখ খুললেন, 'যেটা সরকারের করা উচিত সেটা একজন ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে হাসপাতালগুলোয় হয়তো এই অসুখের চিকিৎসার জন্যে বিভাগ খোলা আছে কিন্তু তাদের নব্বুই ভাগই অকর্মণ্য। শুধু ওদের জন্যে কোনও হাসপাতাল বা নার্সিংহোম এদেশে হয়েছে বলে শুনিনি। ডাক্তার যে একা এতদিন লড়াই করে গেলেন এটা কম কথা নয়।'

ডাক্তার বললেন, 'কী হবে লড়াই করে যদি হেরে সরে যেতে হয়।'

এলিজবেথ বললেন, 'আমরা এক্ষেত্রে ডাক্তার তামাং-এর সাহায্য চাইতে পারি না?'

ডাক্তার তামাং তাকালেন।

এলিজাবেথ বললেন, 'নিরাময়কে আমরা দুটো ভাগে যদি ভাগ করি তা হলে কেমন হয়? একভাগে আপনার পেশেন্টরা থাকবে আর অন্য ভাগ জেনারেল পেশেন্ট যারা নার্সিংহোমে ভর্তি হতে চায় তাদের জন্যে। এই শহরে হাসপাতাল আছে কিন্তু নিতান্ত বাধ্য না হলে সেখানে কেউ যেতে চায় না। যারা মরিয়া হয়ে শিলিগুড়ি বা দার্জিলিঙে যায় তাদের উপকার হবে এতে আর নিরাময়ের অর্থসমস্যা অনেক কমে যাবে।'

'কিন্তু সেটা নার্সিংহোম হয়ে যাবে, নিরাময় থাকবে না।' ডাক্তার বললেন।

'কেন? আপনি চান না, একজন মহিলা এখানে এসে নিশ্চিন্তে সন্তান প্রসব করুন? আপনি চান না, কোনও হার্টের পেশেন্ট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরুন?'

'নিশ্চয়ই চাইব। কিন্তু নিরাময় হয়েছিল সেই সব মানুষের জন্যে যারা সীমাবদ্ধ জীবন পেতে পারে।' ডাক্তার মাথা নাড়লেন।

'ঠিক। তাতে তো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।'

'মানে।'

'আপনার যদি আর্থিক অসুবিধে না থাকত তা হলে এখন যে কজন পেশেন্ট এখানে আছে তাদের নিয়েই কাজ করতেন। বাকি ঘরগুলো খালি পড়ে থাকত। তাই তো?'

ডাক্তার এলিজাবেথের দিকে তাকালেন। এলিজাবেথ হাসলেন, 'আমি যদি বলি ঘর খালি থাকা সত্ত্বেও পেশেন্ট না নিলে সেটা বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয় তা হলে কী জবাব দেবেন?'

'কিন্তু তা হলে নিরাময়ের কোনও চরিত্র থাকবে না।'

এলিজাবেথ মাথা নাড়লেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নিরাময় মানে কী? জানলাম ওই শব্দটার মানে রোগমুক্তি।'

এই সময় ডাক্তার তামাং কথা বললেন, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এই সব কথার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

এলিজাবেথ তাকালেন, 'সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে ডাক্তার। আমি এই কয়েক মাস ধরে এখানকার গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিশেছি। অসুখ ওদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু কার কী অসুখ হয়েছে তা তারা নিজেরাই জানে না। শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশি। আগে নাকি সরকারি মেডিক্যাল ইউনিট গ্রামগুলোতে যেত এখন সেটাও বন্ধ। আর হাসপাতালের নাম শুনলেই ওরা আঁতকে ওঠে। গেলে নাকি ফিরে আসা যাবে না, মরতে হলে গ্রামের মাটিতে মরাই ভাল।'

ডাক্তার তামাং বললেন, 'ব্যাপারটা আপনার চোখে নতুন মনে হলেও এশিয়া এবং আফ্রিকাতে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা।'

সোজা হয়ে বসলেন এলিজাবেথ, 'আমি আমার সীমিত সামর্থ্যে একটু অন্যরকমভাবে সমস্যার সমাধান করতে চাই আর তাই এখানে এসেছি।'

'কী রকম?' ডাক্তার তামাং যেন জিজ্ঞাসা করতে হয় তাই করলেন।

'আমেরিকায় কয়েকটা সংস্থা আছে যারা মানুষের জন্যে কাজ করে। তাদের কাছে আমি একটা প্রপোজাল পাঠাই। ওদের একটা সংস্থার সঙ্গে আমি কিছুটা জড়িত। তারা আমার কথায় বিশ্বাস করে দু-লক্ষ ডলার অনুমোদন করেছে একটা শর্তে যে সমান পরিমাণ অর্থ আমাদেরও জোগাড় করতে হবে। ওরা প্রথমে পঞ্চাশ হাজার দেবে। তারপর কেমন কাজ হচ্ছে দেখার জন্যে লোক পাঠাবে। তার রিপোর্টে সন্তুষ্ট হলে বাকি টাকাটা পাঠাবে।'

'আপনার প্রপোজাল কী ছিল?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই পাহাড়ি মানুষদের জন্যে একটি আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা যেখানে তারা সহজেই আসতে পারবে।' এলিজাবেথ হাসলেন।

'হাসপাতাল?' ডাক্তার তাকালেন।

'না। স্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রতিটি গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ এখানে এসে কার্ড নিয়ে যাবে। তাদের পরিবারের সদস্যদের নাম বয়স সেখানে উল্লেখ করা থাকবে। কেউ অসুস্থ হলে ওই কার্ড নিয়ে এলেই চিকিৎসা করা হবে।' এলিজাবেথ বললেন, 'ওই একটা কার্ড ওদের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দেবে।'

ডাক্তার তামাং বললেন, 'মাপ করবেন। আপনার কথা আমার কাছে অস্পষ্ট। আপনি বললেন দু লক্ষ ডলার পাওয়া যাবে যদি ওই পরিমাণ টাকা এখান থেকে জোগাড় করা যায়। দু লক্ষ ডলার মানে প্রায় পঁচাশি লক্ষ টাকা।'

'হ্যাঁ। এখন আপনারা বলুন এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকায় কি এই রকম স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা সম্ভব?' উদগ্রীব মুখে তাকালেন এলিজাবেথ।

ডাক্তার বললেন, 'ঠিক কী ধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবে তা না জানলে বলা মুশকিল। কিন্তু ওই পঁচাশি লক্ষ টাকার ব্যবস্থা কীভাবে হবে?'

এলিজাবেথ নিচু গলায় বললেন, 'ওটা নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না।'

ডাক্তার তামাং চমকে তাকালেন। এলিজাবেথ একটু যেন বিব্রত হলেন, 'আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। এই টাকায় বিশাল কিছু না হোক সাধারণ মানুষের কিছু প্রয়োজন যদি মেটানো যায় সেই চেষ্টাই না হয় আমরা করি।

ডাক্তার বললেন, 'আপনার প্রস্তাব শুনে খুব খুশি হলাম। এখানকার গরিব মানুষদের জন্যে আপনি এতটা ভেবেছিলেন, ওদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছেন, এ থেকে আপনার মনের পরিচয় আমি পাচ্ছি। কিন্তু এলিজাবেথ, এর সঙ্গে নিরাময়ের-সম্পর্ক কোথায়? এখানে ঘরের সংখ্যা অল্প, জায়গাও কম। আপনি যা চাইছেন তা তো এখানে হবে না।'

এলিজাবেথ বললেন, 'ঠিকই। কিন্তু নিরাময়কে একপাশে রেখে আমরা যদি নতুন বাড়ি তৈরি করে নিই তা হলে তো স্থানাভাব হবে না। ওপাশে অনেকটা জায়গা খালি পড়ে আছে। এই বাড়ির মালিকানা নিয়ে সমস্যা থাকলে তার সুরাহা করা যেতে পারে।'

ডাক্তার তামাং চুপচাপ শুনছিলেন। এবার বললেন, 'আপনার ইচ্ছেকে আমি সম্মান জানাচ্ছি। কিন্তু একটা প্রশ্ন, নতুন বাড়ি যদি তৈরি করা হবে তবে সেটা এখানে কেন? শহরের মধ্যে জায়গা দেখে করাই তো ভাল, যাতে যোগাযোগের সুবিধে পাওয়া যায়, তাই না?'

এলিজাবেথ বললেন, 'তাতে শহরের মানুষের সুবিধে হতে পারে, কিন্তু যাদের কথা ভেবে এই পরিকল্পনা সেই পাহাড়ের মানুষরা বঞ্চিত হবে। ওই গ্রাম থেকে নেমে শহরে গিয়ে যদি চিকিৎসা করাতে আপত্তি না থাকত তা হলে ওরা হাসপাতালেই যেত। আসলে মানুষের মনে কোনও কোনও ব্যাপারে যুক্তিহীন জড়তা জন্মে যায়। গ্রামের মানুষের পক্ষে এখানে আসা সহজ এবং স্বাভাবিক হবে। গ্রাম এবং শহরের ঠিক মাঝখানে বলে আমরাও কিছু সুবিধে পাব। তা ছাড়া, আপনার সম্পর্কে এখানকার মানুষের মনে দুর্বলতা আছে, আপনাকে ওরা সন্ন্যাসীর মতো মনে করে। আমি নিরাময় নামটার সুযোগ নিতে আপনাদের অনুরোধ করছি।'

'সুযোগ!' ডাক্তার অবাক হলেন।

'নিরাময় নাম রাখলে ওদের মানসিক জড়তা চলে যাবে। হ্যাঁ, ডক্টর তামাং, আপনি তো মিস্টার ব্রাউনের বন্ধু ছিলেন। আপনি মদ খাওয়া পছন্দ করেন কিন্তু এখানকার সাধারণ মানুষ সেটাকে উপেক্ষা করে। আপনার ওপর গভীর আস্থা না থাকলে ওরা কেউ মদ খেয়ে থাকা ডাক্তারের কাছে অসুস্থ হয়ে যেত না। শুধু এই কারণেই আপনি যদি ওঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে এই নতুন নিরাময় তৈরি করেন সেই উদ্দেশ্যেই আমি এসেছি।' এলিজাবেথ বললেন।

ডাক্তার তামাং ঠোঁট কামড়ালেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। কেউ যদি দশ পা এগিয়ে ভাবতে পারে তা হলে আমি এক পা এগোব না কেন? কিন্তু এই দুই প্রৌঢ়ের পক্ষে কত রোগী দেখা সম্ভব?

'আপনারা দুজনে মিলে স্থির করুন মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন কী এবং সেই বিভাগগুলো খুলবেন। একটা অনুরোধ, প্রতিটি বিভাগে উপযুক্ত এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যেন ভারপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর পরামর্শ নিয়ে যেসব ডাক্তার পেশেন্টদের সঙ্গে কাজ করবেন তারা যেন পাহাড়িদের ভাষা জানেন, সেটা আগে দেখতে হবে।'

'পাহাড়িদের ভাষা সমতল থেকে পাশ করা খুব কম ডাক্তারই জানেন। সে ক্ষেত্রে তাদের ট্রেনিং দিয়ে ভাষা শেখাতে হয়।' ডাক্তার তামাং হাসলেন, 'আপনার বক্তব্য আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি চাইছেন না গ্রামের গরিব মানুষগুলোর কোনও কমিউনিকেশন প্রবলেম যেন না থাকে; তারা স্বচ্ছন্দে মনের কথা বলতে পারে, তাই তো?'

'ঠিক। এটা খুব জরুরি।'

'আজকাল পাহাড়ের অনেক ছেলেই ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছে। আমরা তাদের কাছে আবেদন করতে পারি।'

'হ্যাঁ। কিন্তু অন্য জায়গায় চাকরি করলে তারা যা পেত এখানে তার চেয়ে কম পেলে হয়তো অনুগ্রহ দেখাতে পারে এবং সেটা আমাদের কাম্য নয়। আমরা চেষ্টা করব ঠিকঠাক পারিশ্রমিক দিতে। এখন বলুন, আমাদের এই পরিকল্পনা কতদিনে বাস্তব চেহারা নেবে?'

ডাক্তার তামাং বললেন, 'অন্তত তিন-চার বছর।'

'ওঃ নো।' প্রচণ্ড জোরে মাথা দোলালেন ভদ্রমহিলা, 'আমাদের টার্গেট এক বছর। তার জন্যে অল-আউট যাব আমরা। ডাক্তার, আপনি কিছু বলছেন না?'

ডাক্তার এতক্ষণ শুনছিলেন। এবার বললেন, 'আমার কিছু বলার নেই এলিজাবেথ। আপনি যা

চাইছেন তাই হবে। আমার এতদিনের ভাবনাচিন্তা আপনার প্রস্তাব শোনার পর আমি পাল্টে ফেলতে রাজি আছি।'

এলিজাবেথ উঠে দাঁড়ালেন, 'আজ এই পর্যন্ত। ডক্টর তামাং-এর ওপর দায়িত্ব থাকবে সাধারণ অসুখের চিকিৎসা দেখার। আপনি বাকিটার দায়িত্ব নেবেন। মিউনিসিপালিটির অনুমতি, নতুন নিরাময়ের নির্মাণের জন্যে ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথাবার্তা যদি ডক্টর তামাং বলেন তাহলে ভাল হয়। টেন্ডার চেয়ে কাজ শুরু করতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে যাঁরা যোগ্য তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করুন। আর হ্যাঁ, নতুন নিরাময়ের চূড়ান্ত দায়িত্বে আমরা তিনজন থাকছি যদি অনাবাসী আইন প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। ডাক্তার তামাং, আপনার সঙ্গে আবার কখন কথা বলা যেতে পারে?'

'চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিন। আমরা যদি প্রতিদিন এই সময় নিরাময়ে মিলিত হই তাহলে কাজ করতে সুবিধে হবে।' ডাক্তার তামাং বললেন।

এলিজাবেথ মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেলেন দ্রুত, সঙ্গে বিষ্ণুপ্রসাদ। ডাক্তার তামাং ঘুরে দাঁড়ালেন, 'এরকম কখনও ভাবতে পেরেছেন?'

ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'না।'

'ভদ্রমহিলা এসেছিলেন স্রেফ কৌতূহলে। বহু বছর আগের দেখা একজন মানুষের কাছে। এসে থেকে গেলেন। আমি শুনেছি রাত্রে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা ঘুমোন। কখনও অলস সময় কাটান না। মিস্টার ব্রাউনের বাড়িতে যে মহিলাকে আমি সেদিন দেখিছিলাম তার সঙ্গে আজকের এঁর কোনও মিল নেই।'

ডাক্তার বললেন, 'এদেশে এসে বিদেশিনীরা এমন কর্মকাণ্ড অনেক করেছেন ডক্টর তামাং। আমরা তাঁদের জন্যে গর্ব অনুভব করি। এলিজাবেথ সেই তালিকাটা বাড়ালেন। কিন্তু এবার থেকে নতুন নিরাময়ের জন্যে আমাদের সক্রিয় হতে হবে।'

'ইয়েস। জানেন ডাক্তার। ক্রমশ নিজেকে ঘোলা জলের মতো মনে হচ্ছিল। জীবন সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলাম। এই উদ্যোগ আমাকে প্রচণ্ড সাহায্য করবে। উনি যে আমার কথা মনে রেখেছেন এ জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।' ডক্টর তামাং বললেন।

কেউ কথা বলছিল না। বিছানার পাশে বসে নন্দিনী ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। সায়নের চোখ বন্ধ। সম্ভবত মায়ের স্পর্শে যে সুখ তা সমস্ত শিরায় শিরায় উপভোগ করছিল সে। সায়নের বাবা বসেছিলেন জানলার ধারে। জানলা ঠাণ্ডার কারণে বন্ধ।

নন্দিনী বললেন, 'অনেকদিন তো হয়ে গেল, এবার যেতে হবে বাবা।'

চোখ বন্ধ করেই সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কবে যাচ্ছ?'

নন্দিনী বললেন, 'তোর বাবা আজ টিকিট কাটতে দেবেন।'

'ডাক্তার আঙ্কলকে বললে টিকিট পেয়ে যাবে।'

'তোর শরীর কেমন আছে এখন?'

'ডাক্তার আঙ্কল তো তোমাকে বলেছেন, ভাল আছি।'

সায়নের বাবা বললেন, 'সম্পূর্ণ ভাল কী করে হবে? সেটা নয় বলেই ডাক্তারবাবু কম কথা বলাতে বলেছেন।'

'সম্পূর্ণ ভাল আমি কখনওই হব না বাবা।'

'তবু—।'

চোখ খুলল সায়ন, 'তোমরা টিভিতে ফুটবল খেলা দেখেছ? নব্বুই মিনিট ধরে হয়, তার পরে *এক্সট্রা টাইম, তারপর টাইব্রেকার আর তাতেও সুরাহা না হলে সাডেন ডেথ, গোল করলেই খেলা শেষ। এসব সাধারণ মানুষের জন্যে।* আমাদের জন্যে ওয়ান ডে ক্রিকেট। পঞ্চাশ ওভার খেলার কথা ছিল, বৃষ্টির জন্যে কমিয়ে পঁচিশ। আমার কুড়ি ওভার চলে গেছে। পাঁচ ওভার পরে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে হবেই। মা, এসব নিয়ে তুমি একটুও চিন্তা কোরো না।'

সায়নের বাবা মাথা নিচু করলেন, অনেক চেষ্টায় নন্দিনী নিজেকে সামলালেন। এই সময় দরজায় এসে দাঁড়াল কঙ্কাবতী। ওঁদের দেখে দুটো হাত কপালে তুলে নমস্কার করল। এখন তার পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম নেই। নন্দিনী ডাকলেন, 'এসো।'

কঙ্কাবতী ধীরে ধীরে সায়নের সামনে এল। তাকে দেখে সায়ন হাসল, 'আমি একটু মায়ের আদর খেয়ে নিচ্ছি, তুমি তো রোজ খাও।'

কঙ্কাবতী হাসল, তারপর খুশি খুশি গলায় বলল, 'আমি আবার স্কুলে যাচ্ছি। আমার যে কী ভাল লাগছে তা বোঝাতে পারব না।'

নন্দিনী বললেন, 'বাঃ, পড়াশুনা করতে তোমার ভাল লাগে বুঝি?'

'হ্যাঁ, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। আমি ভেবেছিলাম আর কোনওদিন স্কুলে যেতে পারব না। কিন্তু সায়ন বলত নিশ্চয়ই পারব। তাই না সায়ন?' কঙ্কাবতী যেন আচমকা পাল্টে গেছে। শামুকের মতো মুখ লুকোনো মেয়েটা আজ ঝরনার মতো উজ্জ্বল।

সায়নের বাবা উঠে দাঁড়ালেন, 'এবার যেতে হয়।'

ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন নন্দিনী। তারপর কঙ্কাবতীর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। মিসেস অ্যান্টনি উঠছিলেন তরতরিয়ে। ওঁদের দেখতে পেয়ে বললেন, 'একটা খুব ভাল খবর আছে। আমাদের নিরাময় আরও বড় হচ্ছে।'

সায়নের বাবা বললেন, 'সেকী? একটু আগে যে অন্য কথা শুনলাম।'

'সেটা আমরাও শুনেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর যখন যেমন ইচ্ছে করেন পৃথিবীতে তেমন ঘটনা ঘটে।' মিসেস অ্যান্টনি বললেন।

কথাটা খাটে উঠে বসা সায়নের কানে পৌঁছোল। সে গলা তুলল, 'তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডিক্টেটারের নাম ঈশ্বর।'

মিসেস অ্যান্টনি গালে হাত দিয়ে নন্দিনীকে বললেন, 'শুনলেন, আপনার ছেলের কথা শুনলেন!'

নন্দিনী মাথা নাড়লেন, 'ওকে অমন কথা বলতে নিষেধ করে দেবেন।'

মিসেস অ্যান্টনি হাসলেন, 'পাগল! ওকে নিষেধ করার ক্ষমতা আমার নেই। ওর মুখের দিকে তাকালেই সব গোলমাল হয়ে যায়। মিস্টার ব্রাউন যাওয়ার আগে কী যে ঢুকিয়ে দিলেন মনে!' ওপরে উঠে গেলেন মিসেস ব্রাউন।

হোটেলের পথে যেতে যেতে নন্দিনীর মনে হল তাঁর আর কিছু করার নেই। ছেলের সম্পর্কে এই যে এত ভেবেছেন তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সায়ন এখানে ওর মতো ভাল থাকবে।

আচ্ছা, প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও মনে ভাবনা আসে কেন?

৩৯

বাসনা যদি তীব্র হয় এবং উৎসাহ প্রবল তাহলে কোনও বাধাই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। নতুন চেহারার নিরাময় নির্মাণের কাজ তাই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। মূলত ডাক্তার তামাং বেশি সময় দিচ্ছিলেন। নতুন বাড়ির প্ল্যান তৈরি করিয়ে অনুমতি নেওয়া থেকে শুরু করে ঠিকাদার নিয়োগ করার দায়িত্ব তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। এতকাল নিরাময়ের যে চেহারার সঙ্গে স্থানীয় মানুষ পরিচিত ছিল সেটা বদলে যেতে লাগল। এলিজাবেথ রোজ সকালে একবার আসেন, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেন, তারপর নিজের কাজে চলে যান। নব-নিরাময়ের পরিচালনা সমিতিতে তিনি নিজেকে যুক্ত করেননি। দুই ডাক্তারের সঙ্গে স্থানীয় পৌরসভার চেয়ারম্যানকে রাখার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। ভারতবর্ষের নাগরিক নন বলেই নিজেকে সরাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একজন রাজনৈতিক নেতাকে সমিতিতে নেওয়ার ব্যাপারে ডাক্তার তামাংয়ের আপত্তি ছিল। শেষ পর্যন্ত পরিচালন সমিতি গঠিত হয়েছে দুই ডাক্তার, চার্চের ফাদার এবং স্থানীয় দুই ব্যক্তিকে নিয়ে যাঁদের বিরুদ্ধে কারও কিছু অভিযোগ নেই।

কী কারণে নিরাময়ের চেহারা বদলে যাচ্ছে সেটা প্রচারিত হয়েছিল। আর তারপরেই অভিনব ঘটনা ঘটল। প্রথমে দুজন স্থানীয় পাহাড়ি মানুষ এগিয়ে এল। তখন সকালবেলা। এলিজাবেথ নিরাময়ে এসে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওরা এসে নমস্কার করে সামনে দাঁড়াল। একজন বিনীত গলায় বলল, 'আমরা কাজ করতে চাই।'

ডাক্তার জানতে চাইলেন, 'কী কাজ করবে তোমরা?'

'আপনারা আমাদের উপকারের জন্যে হাসপাতাল বানাচ্ছেন শুনলাম। আমাদের জন্যে যখন হচ্ছে তখন আমরা চুপচাপ বসে থাকব কেন?'

ডাক্তার বললেন, 'খুব ভাল কথা। কিন্তু ভাই, আপনারা কী বাড়ি বানাবার কাজ এর আগে করেছেন? করলে কন্ট্রাকটারকে আপনাদের কথা বলতে পারি।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'না, আমরা একাজ কখনও করিনি।'

'সেক্ষেত্রে তো কন্ট্রাকটার রাজি হবেন না। আমরা ওঁর ওপর দায়িত্ব দিয়েছি বাড়ি তৈরি করার জন্যে। উনি অভিজ্ঞ লোক ছাড়া নেবেন কেন?'

প্রথমজন বলল, 'ইট বইতে অভিজ্ঞতা লাগে নাকি? আমরা মিস্ত্রির কাজ চাইছি না, হেল্পার হয়ে কাজ করতে চাই।'

এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কী কাজ করেন?'

দ্বিতীয়জন হাসল, 'আমরা দুজনে আগে সরকারি চাকরি করতাম এখন রিটায়ার করেছি। হেল্পার হিসেবে যাদের নেওয়া হবে তারা তো টাকা ছাড়া কাজ করবে না। আমরা বাড়িতে বসে আছি, নিজেদের হাসপাতালের জন্যে কাজ করতে ভাল লাগবে।'

এলিজাবেথ মন দিয়ে শুনছিলেন। এই কয়েক মাসে তিনি স্থানীয় ভাষা অনেকটাই বুঝতে পারছেন, বলতে পারেন না স্বচ্ছন্দভঙ্গিতে। এখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি কাজ করে টাকা নেবেন না?'

লোক দুটো একসঙ্গে প্রবলভাবে মাথা নাড়ল। দ্বিতীয়জন বলল, 'আমাদের জন্যে হাসপাতাল তৈরি করছেন আপনারা, শহরের হাসপাতালের মতো নয়, আর আমরা চুপচাপ বসে থাকব? আমাদের জন্যে হাসপাতাল হচ্ছে আমরা তাই কাজ করব, কোনও টাকাপয়সা আপনাদের দিতে হবে না।'

এলিজাবেথ ডাক্তারের দিকে তাকাল। এরকম প্রস্তাব যে অযাচিতভাবে আসবে তা ডাক্তার কল্পনাও করেননি। তিনি এক পা এগোলেন, 'আপনারা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করবেন?'

'হ্যাঁ, যতদিন শরীর পারবে করব।'

এলিজাবেথ ওদের সঙ্গে করমর্দন করলেন, 'আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনারা যাতে কাজ করতে পারেন সে ব্যাপারে আমরা উদ্যোগী হব।'

লোক দুটো নমস্কার করে চলে যাওয়ার আগে বলে গেল ওরা আবার এসে খবর নেবে কবে কাজ শুরু করতে হবে। ওরা ওপরে উঠে যাচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার।'

এলিজাবেথ হাসলেন, 'অদ্ভুত কেন বলছেন? আপনার নিরাময়ের ব্লাড ব্যাঙ্কে যেসব স্থানীয় মানুষ ডোনেট করে তারা কেউ কি পয়সা নিয়েছে?'

ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'না নেয়নি। কিন্তু রক্ত দিয়ে ওরা ভাবে যে একটা ভাল কাজ করল, মানুষের প্রাণ বাঁচাল। মারা যাওয়ার পর ঈশ্বর এই ভাল কাজটার কথা মনে রেখে স্বর্গে থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু দিনের পর দিন একটা পয়সা না নিয়ে কেউ পরিশ্রম করতে আসবে, এটা আমি ভাবতে পারিনি।'

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কেমন লাগছে?'

'ভাল। মানুষের ওপর বিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছে।'

এইসময় সায়ন বেরিয়ে এল নিরাময় থেকে। এখন তাকে বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে। তার পরনে প্যান্ট, পুলওভার, মাফলার এবং স্নিকার।

এলিজাবেথ বললেন, 'গুড মর্নিং সায়ন।'

'গুড মর্নিং। আপনি কেমন আছেন?'

'খুব ভাল। জানো, এইমাত্র দুজন স্থানীয় মানুষ নিরাময়ের জন্যে ভলান্টারি সার্ভিস দেবে বলে জানিয়ে গেল।' এলিজাবেথ হাসলেন।

'বাঃ। বাড়ি তৈরির কাজ কবে শুরু হবে?'

ডাক্তার বললেন, 'আর দিন পাঁচেক পরেই। তুমি কোথাও যাচ্ছ?'

'আমার আর ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

'তোমাকে তো বলেছি, একটু হাঁটাহাটি করতে পারো।' ডাক্তার এলিজাবেথের দিকে তাকালেন, 'আচ্ছা। আমাকে একটু শহরে যেতে হবে।'

এলিজাবেথ মাথা নাড়তে ডাক্তার ভেতরে ঢুকে গেলেন। এলিজাবেথ হাঁটা শুরু করলে সায়ন তাঁর সঙ্গী হল। এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন শরীরে কী কী অসুবিধে হচ্ছে?'

সায়ন মাথা নাড়ল, 'তেমন কোনও অসুবিধে নেই। মাঝে মাঝে ক্লান্তি লাগে।'

ওপর থেকে দুজন মানুষ নেমে আসছিল। তাদের একজন সায়নকে দেখে মাথা নাড়ল, 'যিশু মহান।'

সায়ন বলল, 'যিশু মহান।'

ওরা দাঁড়াল না কিন্তু সায়ন দাঁড়িয়ে গেল। সামনেই মিস্টার ব্রাউনের বাড়ি। বাড়ির সব দরজা জানলা বন্ধ। আশ্চর্য, ভুটো কোথাও নেই। নিজের অসুস্থতার কারণে ভুটোর কথা ভুলেও গিয়েছিল সে। ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেন মিস্টার ব্রাউন। এই পথ দিয়ে যারাই যাওয়া আসা করত তাদের যিশুর গুণকীর্তন করে কুশল জিজ্ঞাসা করতেন তিনি। আজ সেই মানুষটা পৃথিবীর কোথাও নেই।

সায়নের দৃষ্টি অনুসরণ করে এলিজাবেথ আন্দাজ করলেন, 'ওঁর ছেলেরা কেউ আসেনি বলে মনে হচ্ছে।'

সায়ন তাকাল 'শুনছিলাম মিস্টার ব্রাউনের ছেলেরা এই বাড়ি বিক্রি করে দেবে। এটা তো নিরাময়ের খুব কাছে, এখানে মিস্টার ব্রাউনের নামে ডিসপেন্সারি করা যায় না? করলে খুব ভাল হত।'

'নিশ্চয়ই ভাল হত।' হাঁটতে আরম্ভ করলেন এলিজাবেথ, 'আমি জানি না ওরা কত দাম চাইবে। নতুন নিরাময় তৈরি করতে যে খরচ হচ্ছে তা সামলে এই বাড়ি কিনে নেওয়া সম্ভব হবে কিনা জানি না।'

রাস্তাটা মাঝে মাঝে খাড়াই উঠে গেছে। দুপাশের বাড়িগুলোর সামনে বাচ্চারা, মেয়েরা দাঁড়িয়েছিল। এলিজাবেথ যে তাদের বেশ পরিচিত তা হাসিতে বোঝা যাচ্ছিল। সায়ন সেই বাড়িটার সামনে পৌঁছোতেই দেখতে পেল এক মহিলা এগিয়ে আসছে। একেবারে সামনে এসে হাতজোড় করে বলল, 'আপনি আমার কাছে ভগবান। আপনার দয়ায় আমি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।' বলতে বলতে গলা ধরে এল তার।

সায়ন প্রতিবাদ করল, 'ছি ছি। আপনি এসব কথা বলবেন না। আমি ভগবান হতে পারি? আমি সাধারণ মানুষ। অসুখ বাড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। আপনি রাজি না হয়ে ভুল করছিলেন। নিয়ে গিয়েছিলেন বলেই আপনার ছেলে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে।'

মহিলা মাথা নাড়লেন। 'ওটা হাসপাতাল নয়, নরকে যাওয়ার স্টেশন। দশজন গেলে আটজন ফেরে না। আমার আগের বাচ্চাও ফেরেনি। কিন্তু আমাদের আর চিন্তা নেই। এই মেমসাহেব শুনছি আমাদের জন্যেই হাসপাতাল বানাচ্ছেন। কথাটা কি সত্যি মেমসাহেব?'

এলিজাবেথ হাসলেন, 'আপনি ঠিক শুনেছেন।'

ইতিমধ্যে ওদের ঘিরে ভিড় জমে গিয়েছিল। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে গেলে আমাদের কত টাকা দিতে হবে?'

এলিজাবেথ বললেন, 'কাউকে কোনও টাকা দিতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেককে একটা কার্ড করাতে হবে আগে থেকে। তার জন্যে লাগবে একটা টাকা। সেই কার্ড দেখালে হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়া হবে। তবে হ্যাঁ, আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব চিকিৎসা করার তা করা হবে। বুঝতেই পারছেন,

আমাদের ক্ষমতা বেশি নয়।'

মহিলা হাত তুলে সায়নকে দেখাল, 'উনি থাকবেন তো?'

এলিজাবেথ মাথা নাড়লেন, 'নিশ্চয়ই থাকবে।'

ভিড় ছাড়িয়ে চার্চের কাছে উঠে এসে এলিজাবেথ বললেন, 'সায়ন আমি শুনেছিলাম এবং দেখলাম, এখানকার সাধারণ মানুষ তোমাকে খুব ভালবাসে। কেউ কেউ নাকি তোমার মধ্যে ঈশ্বরের ছায়া দেখতে পায়। তুমি নিশ্চয়ই জানো।'

সায়ন হাসল, 'হ্যাঁ, একদিন কিছু শহরের গুণ্ডা নিরাময়ের ওপর হামলা করতে এসেছিল, আমি বাধা দিতে চেয়েছিলাম। তাই দেখে অনেকেই আমাকে খুব পছন্দ করে। কিন্তু আমার মধ্যে ঈশ্বরের ছায়া যারা দেখতে পায় তাদের কী করে বোঝাই অসুস্থ হলে আমার শরীরে কোনও শক্তি থাকে না।'

'ঠিক। হয়তো কোনও প্রচার, কোনও গুজব তোমাকে নিয়ে ছড়িয়েছিল এবং কেউ কেউ সেটাকে বিশ্বাস করে বসে আছে। কিন্তু আমি বলছিলাম...'

এলিজাবেথ থেমে গেলেন। চার্চের ভেতর থেকে ফাদার বেরিয়ে আসছেন। তাঁর পেছনে দুজন লোক। তারা ফাদারকে কোনও কিছু অনুনয় করে বলে যাচ্ছেন হাঁটতে হাঁটতে আর ফাদার ক্রমাগত মাথা নাড়ছেন। এদের দেখতে পেয়ে ফাদার বললেন, 'গুড মর্নিং, কেমন আছেন আপনি? কেমন আছ সায়ন?' ওরা দুজনেই গুড মর্নিং বলে জানিয়ে দিল ভাল আছে। ফাদার বললেন, 'ডক্টর তামাং ফোন করেছিলেন। চেয়ারম্যান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাদের উদ্যোগকে সমর্থন করবেন। এটা খুব ভাল খবর।'

এলিজাবেথ বললেন, 'ওঁর সমর্থন পেয়ে মনের জোর বেড়ে গেছে।'

ফাদার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সঙ্গে চেয়ারম্যানের পরিচয় আছে?'

এলিজাবেথ মাথা নাড়লেন, 'না। তবে শুনেছি আমার বিরুদ্ধে কেউ কেউ ওঁকে কিছু বলেছেন। আসলে বিদেশি বলে অনেকেই আমাকে সন্দেহের চোখে দ্যাখেন।'

এইসময় লোক দুটোর একজন নিচু গলায় কিছু বলতে ফাদার ঘুরে দাঁড়ালেন, 'দেখুন, আপনাদের আমি অনেকবার বলেছি এ ব্যাপারে চার্চের কিছু করার নেই।'

দ্বিতীয় লোকটি বলল, 'তাহলে আমরা মরে যাব ফাদার।'

এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

ফাদার বললেন, 'এরা দুই ভাই। বাড়ি বাঁধা রেখে কারও কাছে টাকা ধার করেছিল এবং যথারীতি সেটা শোধ করতে পারেনি। সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে সেই লোক বাড়ির দখল নিতে চাইছে। ওদের তিনদিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছে। ওরা পার্টি অফিসে গিয়েছিল। তারা বলেছে এ ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই। এখন আমার কাছে এসে অনুরোধ করছে যেন চার্চ থেকে ওদের সাহায্য করি।'

সায়ন চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা টাকা ধার নিয়েছিলেন কেন?'

লোক দুটো পরস্পরের দিকে তাকাল। ওদের একজন ফাদারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় কিছু জিজ্ঞাসা করতেই ফাদার মাথা নাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা প্রায় দৌড়ে এসে সায়নের পায়ের ওপর পড়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। এমন বিব্রত সায়ন কখনও হয়নি। সে চেষ্টা করেও লোকটাকে ছাড়াতে পারছে না। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় লোকটিও যোগ দিয়েছে। ওরা কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, 'আমাদের কেউ নেই। যার কেউ না থাকে তার ভগবান থাকে। আমার ছেলেটার পেটে ক্যানসার হয়েছিল। তাকে সারাবার জন্যে আমরা কলকাতায় গিয়েছিলাম, ভেলোর গিয়েছিলাম। চিকিৎসার জন্যে বাড়ি বাঁধা রেখে টাকা ধার করতে হয়েছিল। কিন্তু ছেলেটা বাঁচল না আর এখন বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আপনাকে মা মেরি নিজের হাতে আশীর্বাদ করেছেন। আপনি চাইলে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আপনি আমাদের লাথি মারুন তবু আপনার কৃপা আমরা চাই।'

ফাদার খুব ধমক লাগালেন তবু লোক দুটো সায়নের পা ছাড়ছিল না। শেষ পর্যন্ত সায়ন রুক্ষ গলায় বলল, 'আপনারা যদি সরে না দাঁড়ান তাহলে আমি রাগ করব।'

এবার যেন ভয় পেয়েই ওরা সরে দাঁড়াল কিন্তু দুজনের হাত বুকের ওপর নমস্কারের ভঙ্গিতে

রয়েছে, মাথা নিচু, গলায় চাপা কান্নার সুর। সায়ন দেখল এলিজাবেথ তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি মা মেরির আশীর্বাদ পেয়েছি কিনা তা জানি না। অন্তত আমি টের পাইনি। তা ছাড়া তিনি খৃস্টানদের আরাধ্য, খামোকা হিন্দু ছেলেকে আশীর্বাদ করতে যাবেন কেন? আপনাদের কি লক্ষ্মী, নারায়ণ, শিব, দুর্গা আশীর্বাদ করেন?'

এমন কথা ওরা কখনও শোনেনি। এই নামগুলো এলিজাবেথেরও অজানা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এঁরা কারা?'

ফাদার বললেন, 'হিন্দুদের দেবদেবী।'

সায়ন আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি যদি শোনেন কোনও কালীমন্দিরে গিয়ে পুজো দিলে বা কোনও মসজিদে গিয়ে প্রার্থনা করলে আপনার সমস্যার সমাধান হবে তাহলে কি সেটা করবেন?'

প্রথমজন বলল, 'কখনও করিনি কিন্তু——।'

'আমি তো খ্রিস্টান নই। আমার কাছে সাহায্য চাইছেন কেন?'

'মাদার মেরির সবাই সন্তান।'

'তাহলে মাদার মেরির কাছে গিয়ে প্রার্থনা করুন।'

'আমরা করেছি। কিন্তু আমরা অত্যন্ত সাধারণ লোক, তিনি শুনতে পাননি।'

'তিনি কোনওদিন শুনতে পাবেন না। আপনারা সমস্যা তৈরি করবেন আর তাঁকে যদি সেই সমস্যার সমাধান করে যেতে হয় তাহলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। আপনাদের সমস্যার সমাধান আপনাদেরই করতে হবে।'

'কী ভাবে?'

'কাজ করে। যে মানুষ কাজ না করে শুধু প্রার্থনা করে সমস্যার সমাধান চান তাকে যিশু, মেরি, ভগবান, আল্লা কেউ পছন্দ করেন বলে আমার মনে হয় না। এই দেখুন, ফাদার প্রার্থনা করেন, আপনাদের উপাসনার সময় পরিচালনা করেন কিন্তু কারও কোনও বিপদ হয়েছে জানতে পারলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাতের পর রাত জেগে সেবা করেন মৃত্যুপথযাত্রীকে।' লোক দুটো পরস্পরের দিকে তাকাল।

দ্বিতীয়জন বলল, 'আপনাদের সাধুরা তো শুধু ভগবানের পুজো করে, কাজকর্ম করে না।'

সায়ন মাথা নাড়ল, 'তারা কোনওদিন ভগবানের কাছে পৌঁছোতে পারে না।'

প্রথমজন বলল, 'কিন্তু আমরা কী কাজ করলে বাড়িটাকে বাঁচাতে পারব?'

এবার ফাদার বললেন, 'বাড়িটার বিনিময়ে ওরা ষাট হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। দিনরাত কাজ করলেও ওরা তিন বছরের মধ্যে টাকাটা জমিয়ে শোধ করতে পারবে না।'

'আপনাদের আরও ছেলেমেয়ে নিশ্চয়ই আছে?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। তাই তো আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছি।' দ্বিতীয়জন বলল।

'দেখুন, এই সমস্যার সুন্দর সমাধান আছে। আপনারা যদি কারও কাছে ষাট হাজার টাকা ধার করে বাড়ি ছাড়িয়ে নেন তাহলে আগামী তিন বছর কঠিন পরিশ্রম করে টাকাটা শোধ করতে পারেন, তারপরে সুদও দিতে হতে পারে। এই তিন বছর আপনাদের ছেলেমেয়েদের সব দিক থেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য হবেন আপনারা। ঠিক তো? তাই বাড়িটার মায়া ছেড়ে দিন। আপনারা আর একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে চলে যান। পরিশ্রম করুন। যা রোজগার করবেন তার সিকিভাগ জমান বাকিটা পরিবারের সবার জন্যে খরচ করুন। ওই সিকিভাগ জমানো টাকায় দশ বছর পরে দেখবেন আপনাদের নিজেদের জন্যে বাড়ি কিনতে পারবেন।' সায়ন হাসল।

প্রথমজন মন দিয়ে শুনছিল, বলল, 'এ কেমন কথা। এই বাড়ি আমাদের ঠাকুরদা কিনেছিল। পৈতৃক বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেলে তাকে অপমান করা হবে। ওই বাড়ির সঙ্গে আমাদের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে।'

'আপনাদের ঠাকুরদা যার কাছ থেকে কিনেছিলেন সেটা তো তারও পৈতৃক বাড়ি ছিল। তিনি যার কাছে কিনেছিলেন—হয়তো কেনেননি, জমি পড়ে ছিল, বাড়ি বানিয়ে নিয়েছেন। এই পৃথিবীর সমস্ত জমি এক অর্থে আমাদের পৈতৃক জমি। ভবিষ্যতে যে জমিতে আপনারা বাড়ি বানাবেন সেটাও

পৈতৃক জমিতেই তৈরি হবে। আমার কথা শুনুন, আপনারা সর্বনাশ থেকে বেঁচে যাবেন। এতে মা মেরি খুশি হবেন।' সায়ন বলল।

'আপনি বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

ওরা বেশ ধন্দে পড়েছে বোঝা গেল। তারপর নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে চলে গেল। ফাদার হাত বাড়ালেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ সায়ন, তুমি আমাকে অন্তত একটা সমস্যা থেকে রক্ষা করলে। কিন্তু তুমি এ কী কথা বললে? খ্রিস্টানরা যাঁকে আরাধনা করে তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন না বলতে পারলে?'

সায়ন হাসল, 'আপনি যদি মার্জনা করেন তো একটা কথা বলব।'

'নিশ্চয়ই।'

'কলকাতায় কোনও রাজনৈতিক সভায় কম্যুনিস্টরা যখন বক্তৃতা করে তখন এমন এমন শব্দ বলে যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। ওই শব্দগুলো শুনলেই নেতাদের বিদেশি বিদেশি বলে ভাবতে শুরু করে তারা। ওই শব্দগুলো কম্যুনিজমের তত্ত্বের কথা। ইদানীং ইংরেজির বাংলা অনুবাদ হয়েছে সেগুলো। আজন্ম যা শোনেনি এখন সেটা শুনলে হজম করা মুশকিল। তাই কম্যুনিস্ট নেতারা সেই সব নির্বাচিত শব্দ ব্যবহার না করে তার অর্থ জনসাধারণের পরিচিত শব্দে বুঝিয়ে বললে অনেক বেশি কাজ দিত। তেমনই এখানকার অনেক মানুষ আমার সম্পর্কে যখন ভুল বিশ্বাস লালন করে তখন দেখেছি আমি হিন্দু বললে তারা হকচকিয়ে যায়। পৃথিবীতে যেন একটাই নিয়ম, যিশু মা মেরি খ্রিস্টানদের আশীর্বাদ করবেন, আল্লা মুসলমানদের আর হিন্দুদের দেবদেবী হিন্দুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন।'

ফাদার বললেন, 'চমৎকার। তোমার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হল না। তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না মা মেরি শুধু খ্রিস্টানদের কথাই ভাবেন!'

সায়ন ফাদারের দিকে তাকাল, তারপর মাথা নাড়ল।

তার অর্থ বুঝতে না পেরে ফাদার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল?'

'আমার কথা আপনার পছন্দ হবে না ফাদার।'

'সেটা আমার ব্যাপার, তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পারো।'

'দেখুন, মৃত্যুর পর কেউ বেঁচে থাকে না। মৃত্যুর আগে তিনি যে উপদেশ দিয়ে যান সেটাই বেঁচে থাকে। সেই উপদেশে মানুষ যদি তার পথ খুঁজে পায় তাহলে তাঁকে স্মরণ করে। অর্থাৎ মানুষই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে। মৃত্যুর পরে কোথাও যখন তাঁর অস্তিত্ব নেই তখন তিনি কী করে মানুষের কথা ভাববেন? আমাদের হিন্দুদের দেবদেবীরা কল্পনায় তৈরি, কোথাও তাঁদের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু তবু কিছু মানুষ নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে তাঁদেরই শরণাপন্ন হন আর ভাবেন অলৌকিক কিছু হয়ে যাবে। এইসব অন্ধদের চোখ কোনওদিন খুলবে না। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ, যিশু খ্রিস্ট অথবা মা মেরি পৃথিবীতে ছিলেন। আমি জানি না মা মেরি কোনও অলৌকিক কাণ্ড করেছেন কি না। তবে যেহেতু তিনি অলৌকিক উপায়ে যিশুকে গর্ভে ধারণ করে জন্ম দিয়েছেন তাই তাঁকে মাদারের সম্মান দেওয়া হয়েছে। যিশু মানুষকে ভালবেসেছিলেন। ভালবাসতে বলেছিলেন। মানুষের উপকার করতে চেয়েছিলেন এবং এই কারণে তাঁকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শরীর মাটিতে মিশে যাওয়ার পর তাঁর অস্তিত্ব শুধু তাঁর বাণীতে, করে যাওয়া কাজে। এখন তাঁর মূর্তির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করলে তিনি কী করে শুনতে পাবেন? কিন্তু তবু মানুষ তাই করছে। যেভাবে শিবদুর্গার সামনে হিন্দুরা করে।'

ফাদার একটু গম্ভীর হলেন, 'তার মানে তুমি গির্জার বিরুদ্ধে?'

'শুধু গির্জা বলছেন কেন, মন্দিরের কথাও বলুন। আমি এর বিরুদ্ধে নই। কারণ এইসব উপাসনালয় মানুষকে একত্রিত করে, শৃঙ্খলাপরায়ণ করে। তাদের একটা মানসিক অবলম্বন দেয়। এই পর্যন্ত।'

'তার মানে তুমি ঈশ্বরের প্রতি অনুগত নও?'

সায়ন হাসল, 'তিনি কোথায় আছেন জানি না, কীভাবে অনুগত হব? ঈশ্বরকে তো আমরাই সৃষ্টি করেছি। ভাবুন তো ফাদার, পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণী সৃষ্ট হয়েছে শুধু বিবর্তনের মাধ্যমে এমনকী মানুষও। তখন কি ঈশ্বর এখানে ঘুরে বেড়াতেন? বাঘ ভাল্লুক অথবা হরিণরা কি তাঁর মহিমা প্রচার করত? আপনি বিবেকানন্দের লেখা পড়েছেন ফাদার?'

ফাদার মাথা নেড়ে না বললেন।

'এই যে ইনি, আমেরিকা থেকে এখানে এসে থেকে গেলেন। এঁর জন্যে শুনেছি পাহাড়ি গ্রামগুলোর মানুষ একটু ভালভাবে বাঁচতে পারছে. এঁর জন্যে নিরাময় নতুন চেহারা নিচ্ছে, এঁর এই কাজটাই হল ঈশ্বরের কাজ।'

ফাদার হাসলেন, 'আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারতাম। কিন্তু সেই তর্কের মীমাংসা হত না। আবার মজার কথা হল, আমাদের দুজনের লক্ষ্য একই। সাধারণ মানুষ অন্ধকারে চলার সময় একটা আলোর সাহায্য চায়। মনের আলোয় পথ দেখার শক্তি তো সবার থাকে না। আচ্ছা, অনেক দেরি করিয়ে দিলাম। চলি।'

ফাদার চলে গেলে বিস্মিত এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তুমি এত কথা শিখলে কী করে?'

'আমি তো শিখিনি কিছু। অসুস্থ হওয়ার পর বই পড়েছি আর ভেবেছি। আমি যা বললাম তা অনেক মানুষ আগেই বলে গেছেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, তুমি মন দিয়ে যে কাজটা করবে তার মধ্যেই ঈশ্বর থাকবেন। এই কথাটা আমার খুব ভাল লেগেছে।'

ওরা আবার হাঁটা শুরু করল। দূর থেকে দেখা গেল এলিজাবেথের বাড়ির সামনে একটা ছোটখাটো জটলা। বিষ্ণুপ্রসাদ আর ম্যাথুজ তাদের কিছু বোঝাচ্ছে। ওরা দূর থেকে এলিজাবেথকে দেখতে পেয়ে চুপ করে গেল। কাছে গিয়ে এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

লোকগুলো সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল। একসঙ্গে সবাই কথা বলায় কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। এলিজাবেথ একটুও বিরক্ত হলেন না। বিষ্ণুপ্রসাদ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে এলিজাবেথ ভাঙা ভাঙা ভাষায় বললেন, 'না। তুমি বলবে না। আমি ওর মুখ থেকে শুনতে চাই। হ্যাঁ ভাই কী হয়েছে?'

এবার সামনে যে দাঁড়িয়েছিল সে অদ্ভুত গলায় বলল, 'আমার ভাই কোনও দোষ করেনি। ও এতদিন জ্বরে ভুগছিল। মাদাম তাকে ওষুধ দিয়েছিলেন। আজ সকালে পুলিশ এসে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ধরেছে কিছু বলেছে?'

'না। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তো শাসিয়েছে আমাদেরও ধরবে।'

'তোমরা থানায় গিয়েছিলে?'

'না।'

'কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই একসঙ্গে হতাশাজনক শব্দ তুলল। লোকটা বলল, 'থানায় গেলে ওরা আমাদের সঙ্গে কথাই বলবে না।'

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'আমি ওদের বলেছিলাম পঞ্চায়েতের কাছে যেতে। প্রধান থানায় গেলে পুলিশ নিশ্চয়ই তার সঙ্গে কথা বলবে।'

লোকটা বলল, 'প্রধান তো এখন বেশির ভাগ সময় শহরে থাকে। থানা থেকে আমরা তার বাড়িতে গিয়ে শুনলাম সে নেই।'

এলিজাবেথ ম্যাথুজকে ডাকলেন, 'তুমি গিয়ে কথা বলবে?'

ম্যাথুজ ঘাড় নাড়ল, তার যেতে আপত্তি নেই। এইসময় সিমি ওপর থেকে নেমে আসছিল। এত লোকজন, উত্তেজনা এ সবের তোয়াক্কা না করে সায়নকে দেখতে পেয়ে সে ছুটে এসে হাত জড়িয়ে ধরল, 'আরেব্বাস, তুমি, ওঃ, কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম। শুনেছিলাম তুমি নাকি আবার অসুস্থ হয়েছিলে?'

সায়ন ওব এই উত্তাপে একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'আমার অসুস্থতা তো মেঘ কিংবা রোদের মতন, কখন কে থাকবে বলা যায় না।'

ম্যাথুজ লোকগুলোকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল সায়ন তাকে দাঁড়াতে বলল। তারপর এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি ওদের সঙ্গে যেতে পারি?'

'স্বচ্ছন্দে। কিন্তু থানা তো অনেক দূরে। তোমার কষ্ট হবে না?'

'না। আর একটা কথা, আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই।'

'বাঃ, খুব ভাল কথা। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা পরে কথা বলব।' এলিজাবেথ বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন।

সিমি উচ্ছ্বসিত হল, 'তুমি সত্যি কাজ করবে?'

'হ্যাঁ। আমি কিছু করতে চাই।'

'খুব খুশি হলাম। তোমাকে সব সময় দেখা যাবে।'

'এত খুশি হচ্ছ অথচ আমাকে দেখতে নিরাময়ে যাওনি!'

'কী করে যাব? ওখানে গেলেই মানুষটার কথা মনে পড়ে যায়। এত কষ্ট হয় যে কী বলব। তার ওপর ভুটোটা এখন আমার কাছে আছে। ওকে দেখতে হয়।'

'ভুটো তোমার কাছে আছে?'

'হ্যাঁ। একজন এসে বলল ভুটো নাকি মিস্টার ব্রাউনের কবরের পাশে চুপচাপ বসে আছে। শুনে আমি গিয়ে নিয়ে এলাম।'

সিমির আরও কথা বলার ইচ্ছে ছিল কিন্তু লোকগুলো অসহিষ্ণু হয়ে ওঠায় ম্যাথুজ নিচু গলায় তাড়া দিল। অতএব সায়নকে বিদায় নিতে হল। লোকগুলো আগে আগে হাঁটছিল। পেছনে ম্যাথুজ আর সায়ন। সূর্য মেঘের আড়ালে চলে যাওয়ায় পৃথিবীটা ছায়াচ্ছন্ন। এখন পথ শুধু নীচে নেমে যাচ্ছে। শরীরের ওজন পেছনের দিকে রাখলে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না হাঁটতে।

সায়ন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, ব্যবসা বন্ধ করে তোমার অসুবিধে হচ্ছে না?'

'আমি ব্যবসা বন্ধ করিনি। যে দামে মাল কিনি তার সঙ্গে খরচ যোগ করে কেজিতে দু টাকা লাভ রেখে বিক্রি করি গ্রামে গ্রামে।'

'তাহলে তো তোমার লাভ খুব কম হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি খুশি। ম্যাডাম আমাকে শিখিয়েছেন অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে। কারও উপকার করলে যে আনন্দ হয় তা টাকা জমিয়ে পাওয়া যায় না।'

সায়ন কিছু বলল না। ম্যাথুজ কসাই। গোরুর মাংস বিক্রি করে। ওর মনে মাঝখানে নির্লিপ্তি এসেছিল। কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু লোকটাকে তার ভাল লাগে। সিমিকে পছন্দ করত ম্যাথুজ। সিমি করত না। এখন ওদের সম্পর্কটা কীরকম জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হল।

ওরা নিরাময়ের সামনে দিয়ে হেঁটে এল। সায়ন দেখল ডাক্তার তামাংয়ের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

সে প্রসঙ্গ ঘোরাল, 'আচ্ছা, পুলিশ কেন ছেলেটাকে ধরেছে?

'আমি জানি না।'তবে ছেলেটাকে ভাল বলে মনে হয়। ও যে অসুস্থ ছিল, মাদাম ওষুধ দিয়েছেন, এ সবই সত্যি।' ম্যাথুজ বলল।

'কী নাম ছেলেটার?'

'সূরজ।'

বাজারের পাশ দিয়ে যে-রাস্তাটা নীচে নেমে গিয়েছে সেটা ধরে একটু এগোলেই পুলিশ স্টেশন। বাইরে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ও দুটো না থাকলে থানা বলে বোঝার উপায় নেই। ওরা সিঁড়ির কাছে পৌঁছোতে ভেতর থেকে একজন সেপাই বেরিয়ে এল, 'কী চাই?'

লোকগুলো ওদের দিকে তাকাতে ম্যাথুজ বলল, 'বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলব।'

'বড়বাবু থানায় নেই। কী কথা আমাকে বলো।'

'তোমাকে বলে কী হবে? বড়বাবু কখন আসবেন?'

'তোমরা কোথাকার লোক? অ্যাঁ? তোমরা চাইলেই বড়বাবুর সময় আছে তোমাদের সঙ্গে দেখা

করার?' সেপাই শব্দ করে হাসতেই ভেতর থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি একজন অফিসার, 'কী হয়েছে?'

সেপাই বলল, 'এরা বড়বাবু ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলবে না।'

অফিসার বললেন, 'অ। আপনারা তাহলে বাড়ি চলে যান। এখানে ভিড় বাড়াবেন না। যান, চটপট।'

এবার লোকগুলোকে পিছিয়ে যেতে দেখে সায়ন এগিয়ে গেল, 'নমস্কার। বড়বাবু যখন নেই তখন আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি কি?'

'আপনার পরিচয়?'

'আমার নাম সায়ন রায়।'

'নামটা খুব চেনা লাগছে। কিন্তু বাঙালি হয়ে এদের সঙ্গে কী করে এলেন?'

'আমি ওদের সঙ্গেই আছি।'

'বলুন।'

'আজ সকালে পাহাড়ের ওপরের গ্রাম থেকে আপনারা সূরজ নামের একটি ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছেন। ছেলেটির অপরাধ কী?'

'ও, এই ব্যাপার। গতকাল চেয়ারম্যানের কনভয়ের বিরুদ্ধে যারা বিক্ষোভ দেখিয়ে ছিল তার মধ্যে ছেলেটি ছিল। ওরা পাথর ছুড়েছিল।'

'আপনাদের খবর ভুল। ছেলেটি অসুস্থ ছিল, বাড়ি থেকে বের হয়নি।'

'আপনি গিয়ে দেখেছিলেন?'

'না। কিন্তু সাক্ষী আছে।'

'তাদের আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে বলবেন। এবার চলে যান।'

'কিন্তু অফিসার, এরা গরিব মানুষ, আদালত এদের কাছে অনেক দূরের পথ। সূরজ নিরপরাধ। আপনারা ভুল করে ওকে ধরে নিয়ে এসেছেন।'

'অসম্ভব। ওর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। আপনারা একটা সমাজবিরোধীর হয়ে ওকালতি করতে দলবেঁধে থানায় এসেছেন?' চিৎকার করলেন অফিসার। আর সেই চিৎকার শুনে আরও কিছু পুলিশ লাঠি হাতে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে।

এই সময় সূরজের দাদা সজোরে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেল অফিসারের সামনে, 'আমার ভাই ভাল ছেলে, ও কোনও অন্যায় করেনি।'

তার ছুটে আসার ভঙ্গিতে ভয় পেয়ে অফিসার জোরে ধাক্কা দিতেই লোকটা ছিটকে পড়ে গেল একপাশে। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সেপাইটা লাফিয়ে নেমে এসে লাঠি চালাতে লাগল ওর ওপর, 'মারনে আয়া? শালা পুলিশ অফিসারকো মারনে আয়া! এতনা হিম্মত?'

সায়ন চিৎকার করে ছুটে গেল লোকটাকে বাঁচাতে। এবার লাঠির আঘাত পড়ল তার কাঁধে, কপালে। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত নামল গালে। রক্ত দেখে সেপাইটা থেমে গেল। সায়ন বাঁ হাত দিয়ে রক্ত মুছতেই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। সেপাইটা লাঠি ফেলে লুটিয়ে পড়ল সায়নের সামনে। তার কান্নাকে প্রায় আর্তনাদের মতো শোনাল। সেই অবস্থায় লোকটি কেবলই প্রার্থনা করে যাচ্ছে যেন তাকে ক্ষমা করা হয়। অফিসাব এগিয়ে গেলেন তার কাছে, 'এই, তুমি এসব কী বলছ? কী হয়েছে?'

লোকটি মাথা তুলল, 'আমি মহাপাপ করেছি। না জেনে আমি ভগবানের গায়ে হাত তুলেছি। উনি মানুষ নন, আমি দেখলাম সমস্ত শরীরে রক্ত মেখে স্বয়ং যিশু মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।'

অফিসার ঘুরে তাকালেন, 'আপনি কি নিরাময়ে থাকেন? মা মেরি তো আপনাকেই আশীর্বাদ করেছিলেন। এঃ, আগে বলবেন তো! আসুন, আসুন, আপনাকে ফার্স্ট এইড দেওয়া দরকার। ভেতরে চলুন।'

সূরজের দাদা উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। রুমালে কপালের রক্ত মুছে শান্ত গলায় সায়ন বলল, 'সূরজকে ছেড়ে দিন। ও কোনও দোষ করেনি।'

মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। যাঁরা কাজ করেন তাঁদের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভুল ধরিয়ে দিলে সেটা শুধরে নেওয়ার নাম মনুষ্যত্ব। থানার দ্বিতীয় অফিসার এইসব কথা বলে সূরজকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি আরও উদ্যোগী হয়ে সায়নের কপালে ব্যান্ডেড লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

যেসব খবরে মানুষ বিস্মিত হয়, বিশ্বাস করতে পারে না অথচ অবিশ্বাস করলে মন খচ খচ করে সেইসব খবর হাওয়ারা দ্রুত চারপাশে ছড়িয়ে দেয়। ফলে থানার সামনের প্রাঙ্গণে ভিড় জমছিল, গল্প ডালপালা মেলছিল।

থানার ভেতরে চেয়ারে বসিয়ে সেকেন্ড অফিসার বিনীত গলায় বললেন, 'না, না, আমি কোনও আপত্তি শুনব না, আপনাকে এক কাপ কফি খেতেই হবে।'

সায়ন মাথা নাড়ল, 'আমাকে ডাক্তার কফি খেতে নিষেধ করেছেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন কোন অসুখের জন্যে আমি নিরাময়ে এসেছি!'

'শুনেছি। কিন্তু আপনার সম্পর্কে যা কানে আসে তাতে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারিনি। অবশ্য বড়বাবু বলেন, যিশুখ্রিস্টকে লোকে পেরেক ঠুকে মেরে ফেলেছিল, বুদ্ধদেবকেও অসুখের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে, আমাদের রামকৃষ্ণদেবও গলার ক্যানসারে মারা যান, এগুলো থেকে তাঁরা ইচ্ছে করলেই মুক্তি পেতে পারতেন কিন্তু মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে করেননি।' সেকেন্ড অফিসার হাসলেন।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'এবার সত্যি কথাটা বলুন তো, সূরজকে কেন ধরেছিলেন।'

'সবই তো আপনার জানা আছে স্যার, কেন জিজ্ঞাসা করে লজ্জা দিচ্ছেন!'

'আমি কিছুই জানি না।'

'গতকাল চেয়ারম্যানের কনভয়ের সামনে কিছু লোক বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। দিনকে দিন ওঁর বিরোধী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ক্ষমতায় থাকলে এমন হয়। কেউ কেউ হয়তো দু-একটা পাথর ছুড়েছিল। আমাদের ওপর হুকুম হল তাদের খুঁজে বের করতে হবে। চেয়ারম্যানের লোকজন যে লিস্ট দিয়েছিল তার মধ্যে সূরজের নাম ছিল।' অফিসার মাথা নাড়লেন।

'কিন্তু সূরজ বেশ কয়েকদিন অসুস্থতার কারণে বাড়ি থেকে বের হয়নি। আপনারা ভুল করে একই নামের আর একজনকে ধরে আনেননি তো?'

'হতে পারে। ওই যে বললাম যে কাজ করে তার ভুল হতেই পারে। আমরা যদি কাজ না করে থানায় বসে এফ এম শুনতাম তাহলে আমাদের কোনও ভুল হত না। আপনি এসেছেন, আমি নিজের দায়িত্বে ওকে ছেড়ে দিয়েছি, যদি বিপদ হয় তাহলে আপনার শরণ নেব।' অফিসার হাত জোড় করলেন।

'বিপদ হবে কেন?'

'যতই আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী হই এখানে চেয়ারম্যানকে মানতেই হয়।'

'তিনি অন্যায় করলেও মানতে হবে?'

'ছোটখাটো অন্যায়কে অন্যায় বলে ধরা হয় না।'

'কিন্তু উনি তো এই জেলার একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান। বাংলায় যাকে বলা হয় পৌরাধিপতি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ওঁর সমমর্যাদার অনেক চেয়ারম্যান আছেন। তাঁদের ছোটখাটো অন্যায়কেও কি আপনারা অন্যায় বলে ধরেন না?'

'দুর! কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন? মেদিনীপুর বাঁকুড়া বা জলপাইগুড়ির চেয়ারম্যানের সঙ্গে কি আমাদের পুলিশমন্ত্রী বৈঠক করতে ছোটেন? মুখ্যমন্ত্রী কি তাদের সময় দিয়ে ধন্য হন? আমাদের অনেক মন্ত্রী এখানে এসে ওঁর দেখাই পান না কারণ উনি খুব ব্যস্ত। কুচবিহারের চেয়ারম্যানের এই সাহস হবে?' অফিসার হাসলেন, 'উনি রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে যে আবেদন করেছিলেন তা অন্য কেউ করলে দেশদ্রোহিতার অপরাধে জেলে যেতে হত। উনি নিজেকে শুধু দলের বা পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে ভাবেন না, নিজেকে তামাম পাহাড়ি জাতির চেয়ারম্যান বলে ঘোষণা করেছেন।'

'তাহলে বিক্ষোভ হচ্ছে কেন?'

'যারা সঙ্গে থেকেও কিছু পায়নি অথবা যারা ওর মত পছন্দ করছে না এই দুটো দল কেন চুপ করে বসে থাকবে!' অফিসার কথা শেষ করতে একজন সেপাই এসে তার কানে কানে কিছু বলল।

অফিসার মাথা নাড়ল, 'না, আপনাকে এমনি যেতে দেওয়া যায় না। পাবলিক ছিঁড়ে খাবে। আমাদের জিপ আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

'জিপে এত লোক ধরবে?'

'এত লোক মানে?'

'আমরা আট দশজন এখানে এসেছিলাম।'

'ও। সবাইকে নিয়ে ফিরতে চান?'

'হ্যাঁ। সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'ও। তাহলে কষ্ট করে ভ্যানে বসে যেতে হবে।'

'আপনি আমাদের উপকার করছেন, কষ্ট হবে কেন?'

মিনিট তিনেকের মধ্যে ওরা সবাই ভ্যানের ভেতর উঠে বসল। বাইরে তখন বিপুল জনতা। সবাই সায়নকে দেখতে চায়। ভ্যানের গায়ে কিল চড় পড়ল, সবাই তাকে একবার স্পর্শ করতে চায়।

কিন্তু পুলিশের ভ্যানের চেহারায় একধরনের ভীতিপ্রদ ব্যাপার আছে, যা সাধারণ গাড়ির মধ্যে নেই। ভ্যান এগোতে আরম্ভ করলে পথ খুলে গেল।

সায়ন সূরজকে দেখল। ওর দাদাকে জড়িয়ে ধরে ভ্যানের এক কোণে বসে আছে। সূরজের দাদা মার খেয়েছে খুব। পরে সেপাইটি ওর হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে কফি খাইয়েছে। সায়ন দেখল সূরজ ছেলেটা আর পাঁচজন পাহাড়ি ছেলের মতো নয়। ও যে অসুস্থ ছিল তা চেহারায় পরিষ্কার কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট।

চলন্ত ভ্যানে ঘটনাটা ঘটল। হঠাৎ সূরজের দাদা চিৎকার করে উঠল, 'তখন থেকে বলছি চুপ করে থাক। তোর মায়ের কথা, আমাদের কথা একবার ভাব। উনি না গেলে পুলিশ তোর সবকটা হাড় ভেঙে টুকরো করে দিত, মনে রাখিস! গায়ে এক ফোঁটা জোর নেই মুখে বড় বড় কথা।'

সবাই ওদের দিকে তাকাল। সায়ন ম্যাথুজকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

ভ্যান এখন ওপরের দিকে উঠছে বলে ব্যালান্স রাখা মুশকিল হচ্ছিল। তবু ম্যাথুজ হাসল, 'ছেড়ে দাও, যত সব ছেলেমানুষি।'

তবু আগ্রহী হল সায়ন, 'কী রকম?'

'সূরজ ওর দাদার ওপর খুব রেগে গেছে। সে চায়নি পুলিশের হাত থেকে এভাবে মুক্তি পেতে। আসলে, মারটার খেয়ে বের হলে পাঁচজনের চোখে বীর হয়ে যেত, ওর দাদার জন্যে সেটা হল না, তাই আফসোস।'

'ও কি রাজনীতি করে?'

'আমি জানি না। শুনিনি।'

'তাহলে?'

ম্যাথুজ জবাব না দিয়ে ডাকল, 'এই সূরজ, এদিকে এসো।'

ওর দাদা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'যা। গিয়ে ওঁর পা ধরে কৃতজ্ঞতা জানা। লোকে অন্তত জানুক তুই বেইমান নোস।'

সূরজ যেন বাধ্য হয়ে উঠে এল। ম্যাথুজ তাকে বসার জায়গা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি রাজনীতি করতে?'

'রাজনীতি মানে কী?' সূরজ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'কোনও পার্টির হয়ে কাজ করা, বিক্ষোভ দেখানো।' ম্যাথুজ বলল।

'তাহলে আমি কখনও রাজনীতি করিনি।' সূরজ জবাব দিল।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'মনে হচ্ছে তোমার রাজনীতি সম্পর্কে অন্য ধারণা আছে?'

'না। কথাটাকে কেন রাজনীতি বলা হয় তাই আমি বুঝতে পারি না। রাজা নেই অথচ রাজনীতি

আছে। অদ্ভুত।'

'তাহলে শব্দটা ঠিক কী হওয়া উচিত?'

'জননীতি।'

'বাঃ। তুমি এসব নিয়ে খুব ভাব?' সায়ন অবাক হল।

সূরজ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, আমি ভাবি। একা থাকলেই এইসব ভাবনা আমার মাথায় আসে। আমি কাউকে বলি না। যখন আন্দোলন হয়েছিল তখন আমি ছোট ছিলাম। শুনেছি অনেক মানুষ মারা গিয়েছে সেসময়। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না কেন তখন আন্দোলন হয়েছিল? আন্দোলন হওয়ার আগে এবং এখন, কী এমন পার্থক্য হয়েছে? চেয়ারম্যান মাঝে মাঝে মিথ্যে স্তোক দিতেন, আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র হব। আমার ওঁকে দুটো প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, কেন হব? কীভাবে হব?'

সায়ন ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সাধারণ চেহারার এই তরুণ সম্ভবত পড়াশুনা বেশি করেনি। কিন্তু মূল প্রশ্নটি ওর মনে এসে গেছে। কেন হব? কীভাবে হব? পাহাড়ের মানুষদের মনে যত বিক্ষোভ জমা হোক, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা ঘোষণা করা অসম্ভব ব্যাপার। একমাত্র ভারত সরকার যদি দয়া করে তাদের স্বাধীনতা দিয়ে দেয় তাহলেই এরা স্বাধীন হতে পারে। যেভাবে একজন পৌরপিতাকে প্রায় মুখ্যমন্ত্রীর সম্মান দিয়ে চলেছে রাজ্য সরকার তাতে তেমন ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বলেই ব্রিটিশ সরকার স্বাধীন ভারতের জন্ম দিয়ে গিয়েছিল!

'তুমি কখনও রাজনীতি বা জননীতি করনি, তোমার শরীরও সুস্থ নয়, তোমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, তুমি কেন জেলে যেতে চাইছিলে? যে কাজটা তুমি করোনি তার দায়িত্ব নিতে মিথ্যে কথা বলতে চেয়েছিলে কেন?' সায়ন ওর কাঁধে হাত রাখল।

সূরজ মাথা নিচু করল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আমি কখনও পাথর ছুড়তে পারতাম না। কিন্তু কেউ একজন ছুড়েছিল। তার জায়গায় জেলে গেলে সে বেঁচে যেত, আমার নাম হত, সবাই চিনত।'

'কিন্তু তোমাকে ওরা অ্যারেস্ট করতে গেল কেন? পার্টি থেকে তোমার নাম পাঠিয়েছিল কেন? পুলিশ আমাকে এই কথা বলেছে।'

'কাল দুজন পার্টির লোক গ্রামে এসেছিল। কারা কারা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তার খোঁজ নিচ্ছিল। আমি ঘরের বাইরে একা বসেছিলাম। ওদের একজন এসে আমার সঙ্গে কথা বলছিল। আমি তখন তাকে বলেছি যে পাথর ছুড়েছে তার মনে নিশ্চয়ই জ্বালা আছে। বোধহয় সেটা শুনেই ওরা পুলিশের কাছে আমার নাম বলেছে।'

ভ্যানটা থেমে যেতে একজন সেপাই দরজা খুলে দিল। একে একে ওরা নেমে দাঁড়াতেই দেখতে পেল পিলপিল করে মানুষ ছুটে আসছে। গ্রামের মানুষরা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সূরজ ফিরে এসেছে এত তাড়াতাড়ি। লাঠির ঘায়ে ফুলে যাওয়া মুখ নিয়ে সূরজের দাদা চিৎকার করে বলতে লাগল কার অনুগ্রহে তার ভাই এত তাড়াতাড়ি মুক্তি পেল! কার মুখে রক্ত দেখে মারমুখো সেপাইটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল!

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগল জনতা। সূরজের দাদা যখন বলল, 'উনাকে মা মেরি আশীর্বাদ করেছেন বলে শুনেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ বুঝলাম সেই আশীর্বাদ না পেলে হিংস্র সেপাইটাকে বশ করা যেত না।'

এইসময় পুলিশ ভ্যান মুখ ঘুরিয়ে নীচের দিকে চলে গেল। সায়নের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। আবার এক নাটক। সে যা নয় তাই এরা তাকে করে দিতে চাইছে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল। জনতা শব্দ করে তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে নমস্কার করতে লাগল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল সূরজের দাদাও।

সায়ন চিৎকার করল, 'আপনারা সবাই উঠে দাঁড়ান। আমি আপনাদের মতোই একজন মানুষ। আমার মধ্যে কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই।

মানুষগুলো গুঞ্জন করল কিন্তু কেউ নড়ল না। সায়ন অসহায় চোখে ম্যাথুজের দিকে তাকাল। তার পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাথুজ মিটিমিটি হাসছিল। সূরজ আর একটু পেছনে। ম্যাথুজ এবার চিৎকার করল, 'আপনারা যদি এভাবে বিব্রত করেন তাহলে সায়ন হয়তো কলকাতায় চলে যাবে। আপনারা তাই

চান?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ উঠল। সূরজের দাদা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'না। আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন।'

ম্যাথুজ বলল, 'তাহলে আপনারা যে যার কাজে চলে যান।'

কিন্তু কেউ গেল না। ভিড় করে সায়নকে দেখতে লাগল। হঠাৎ এক বৃদ্ধা এগিয়ে এসে সায়নের হাত ধরল, 'বাবা, আমি রাত্রে ঘুমোতে পারি না। রাত নামলেই আমার কাশি শুরু হয়ে যায়। বুক ব্যথায় ভরে আছে। তুমি আমার ঘুমের ব্যবস্থা করে দাও।'

সায়ন মাথা নাড়ল, 'আপনি ডাক্তার দেখান।'

ম্যাথুজ সায়নকে হাত ধরে নিয়ে হাঁটতে লাগল। জনতা কী করবে বুঝতে পারছিল না। খানিকটা নীচে নামার পর নির্জন জায়গা দেখে ম্যাথুজ দাঁড়াল। 'কী ব্যাপার বলো তো? এরা তোমাকে ভগবানের দূত বলে ভাবছে কেন?'

'আমি জানি না। এরা আমাকে পাগল করে দেবে!' সায়ন বিরক্ত হল।

'তুমি এসবে বিশ্বাস কর?'

'একদম না। মনের জোর যাদের নেই তারাই অলোকিকত্বে বিশ্বাস করে।'

'তার মানে তুমি বলবে মানুষ মরে গেলে আর বাঁচে না?'

'আশ্চর্য। মরে যাওয়ার পর কী করে বাঁচবে?'

'তা হলে যিশুর পুনর্জাগরণ হয়নি?'

'দ্যাখো, এক্ষেত্রে যিশুকে যখন সমাধি দেওয়া হয়েছিল তখন তাঁর শরীরে প্রাণ ছিল। কোনও অদ্ভুত উপায়ে তিনি শক্তি পেয়েছিলেন উঠে আসার।'

'না। যিশুর শরীরে প্রাণ ছিল না।'

'সেটা যাঁরা পরীক্ষা করেছেন তাঁরা সাক্ষী দিতে আসবেন না। যিশুর পিঠে কুঁজ ছিল, তিনি দেখতে বেশ কুৎসিত ছিলেন। এরকম মত চালু আছে। কিন্তু আমরা যে যিশুর মূর্তি দেখি তিনি সুন্দরের প্রতীক। যিশু হিসেবে এঁকে দেখতেই আমাদের ভাল লাগে। কুৎসিত চেহারায় যিশু পৃথিবীর মানুষকে ভালবেসেছিলেন, ভালবাসতে বলেছেন। মানুষকে সেবা করেছেন। সুন্দর চেহারার যিশুও তাই করেছেন। যিশুকে সুন্দর ভেবে নিলে ক্ষতি কী! উল্টে লাভ অনেক। তেমনি মৃত্যুর পরেও তিনি মাটির নীচ থেকে উঠে এসে কাজ করেছেন, কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করে তাকে রোগমুক্ত করেছেন এসব জানলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। এই কারণেই অলৌকিকত্ব ওঁর উপর আরোপ করা হয়েছে।'

'হিন্দুদের দেবদেবীরা—।'

থামিয়ে দিল সায়ন। 'হিন্দুদের দেবদেবীরা যা খুশি করতে পারেন কারণ তাঁদের জন্ম ভক্তদের কল্পনায়। বাস্তবে তাঁরা কোথাও ছিলেন না, নেই। কিন্তু তার পরে যেসব সাধক বা অবতারের কথা বলা হয়েছে তাঁদেরও একই পথে বিখ্যাত করার জন্যে সাধারণ মানুষ অলৌকিকত্ব খুঁজতে চেয়েছে এবং বুদ্ধিমানরা সেটা পূর্ণ করেছে। কিন্তু বিবেকানন্দ কোনও অলৌকিক ম্যাজিক দেখাননি। তাঁকে রামকৃষ্ণদেব মা কালীকে দর্শন করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছিল। যেভাবে মরুভূমিব মরীচিকাকে মানুষ জল হিসেবে কল্পনা করে। নইলে বাকি জীবনে তিনি কেন যুক্তির বাইরে কথা বললেন না? কেন গলায় স্পর্শ করে রামকৃষ্ণদেবের ক্যানসার সারালেন না?'

ওরা কেউ লক্ষ করেনি এর মধ্যে সূরজ এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সে এগিয়ে এসে সায়নের হাত ধরল, 'আমরা আজ থেকে বন্ধু হতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' সায়ন হাসল। তারপর ম্যাথুজকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো আজ থানায় আমার সঙ্গে ছিলে। সেপাইটা প্রথমে ওর দাদাকে মারছিল। আমি বাধা দিতে গিয়ে আমাকেও কয়েক ঘা মেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সেই সময় তুমি কি আমার মধ্যে কোনও পরিবর্তন লক্ষ করেছ?'

'না। দেখিনি। শুধু তোমার কপালে রক্ত ছিল।'

সায়নের মনে পড়ল কলকাতায় যাওয়ার সময় চোরাকারবারি দলের নেতা তার রক্ত দেখার পর

একদম বদলে দিয়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আর কেউ কি কিছু দেখেছে?'

'না। কেউ দেখেছে বলে জানায়নি। সেপাইটার কান্নাকাটি থেকে বোঝা গিয়েছিল সে দেবদূতকে দেখেছে।'

'ব্যাস? সঙ্গে সঙ্গে সবাই বিশ্বাস করে ফেলল আমি দেবদূত?'

'আমি জানি না। লোকে এর আগে শুনেছে তুমি মা মেরির আশীর্বাদ পেয়েছ। নিরাময়ের ওপর হামলা করতে এসে পার্টির ছেলেরা তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে। শুনেছি তুমি নাকি একটি মৃত্যুপথযাত্রী শিশুর মাকে কথা দিয়েছিলে বলে সে মারা যায়নি। তাই সেপাইটার কথা শুনে সবাই বিশ্বাস করে ফেলল।' ম্যাথুজ বলল।

'তোমার নিজের কী মনে হয়?'

'আমি এসব ঠিক বুঝতে পারি না।' ম্যাথুজ হাসল।

সায়ন সূরজের দিকে তাকাল, 'তুমি বিশ্বাস করো?'

সূরজ বলল, 'আমি তো নিজের চোখে এসব দেখিনি। তবে একটা কথা, ওই সেপাইটা ঠিক কী দেখেছিল? কিছু না দেখলে ওর ওইরকম পরিবর্তন হবে কেন? আবার ও যা দেখেছে তা অন্য কেউ দেখতে পেল না কেন?'

এইসব প্রশ্নের উত্তর সায়নের নিজেরই জানা নেই। সে আর কথা বাড়াল না। ওরা হাঁটতে লাগল। কিন্তু সায়ন বুঝতে পারছিল তার অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছে। সে যা নয় তাই এই মানুষগুলো দেখছে কী করে?

নিরাময়ে ফিরে এল সায়ন। আসার পথে এলিজাবেথের বাড়িতে গিয়ে দরজায় তালা ঝুলতে দেখেছে। অর্থাৎ সিমিও সেখানে নেই।

ডাক্তার তামাং-এর গাড়ি চলে গিয়েছে। নিরাময়ের পাশের জমিতে কিছু লোক ফিতে নিয়ে মাপজোক করছে। সায়ন গেট পেরিয়ে ঢুকতেই হঠাৎ বড়বাহাদুর তাকে হাতজোড় করে নমস্কার করল। সায়ন অবাক। এই বয়স্ক মানুষটি কখনই এই আচরণ করেনি। সে জিজ্ঞাসাবাদ করল। 'কী হল?'

বড়বাহাদুর সজোরে মাথা নাড়ল, 'কিছু হয়নি।'

'তা হলে হঠাৎ নমস্কার করছ কেন?' প্রায় ধমকে উঠল সায়ন।

পেছন থেকে ডাক্তার আঙ্কলের গলা ভেসে এল, 'সায়ন, এদিকে এসো। বড়বাহাদুর তোমাকে নমস্কার করেছে কারণ ওর পক্ষে ওটা করাই স্বাভাবিক।'

'আমি বুঝতে পারলাম না।'

'আজ থানায় নাকি তোমাকে ঘিরে কিছু ঘটেছে এবং সেই খবর এখানেও পৌঁছেছে। এলিজাবেথ তোমার জন্যে অফিসরুমে অপেক্ষা করছেন।'

ডাক্তারের সঙ্গে অফিসঘরে ঢুকতেই এলিজাবেথ হাসলেন, 'ধন্যবাদ।'

'কেন?'

'বাঃ, তুমি থানায় গিয়ে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে আনলে, তাই!'

'আমি আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা!' এলিজাবেথ মাথা দোলাল।

ডাক্তার বললেন, 'মনে হচ্ছে তুমি খুব ডিস্টার্বড!'

'হ্যাঁ। আমি যা নই তাই আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাতে ক্ষতি কী হয়েছে?'

'কী বলছেন? যা আমি বিশ্বাস করি না—।'

হাত তুলে থামিয়ে দিলেন এলিজাবেথ, 'তোমাকে বিশ্বাস করতে কেউ বলেনি। তুমি তোমার মতো থাকো।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এরা আমাকে থাকতে দিচ্ছে না।'

ডাক্তার বললেন, 'তুমি যখন কলকাতায় গিয়েছিল তখনও কি এমন সমস্যা হয়েছিল?'

'না। কলকাতায় হয়নি। তবে যাওয়ার পথে ট্রেনে একজন সমাজবিরোধীর ব্যবহার আচমকা বদলে যায় আমার মুখে রক্ত দেখে। অবশ্য তার সঙ্গে অলৌকিক কোনও ব্যাপার নাও থাকতে পারে।'

'তুমি এখন বেশ সুস্থ। নিয়মিত ওষুধ খেলে এবং প্রয়োজনের সময় রক্ত পেলে কিছুকাল কোনও সমস্যা হবে না। এখানে যখন সমস্যায় পড়েছ তখন তুমি কলকাতায় ফিরে যেতে পারো।'

'অসম্ভব।'

'কেন?'

'কলকাতায় আমি থাকতে পারব না। আপনি কি আমাকে নিরাময় থেকে চলে যেতে বলছেন?' সোজাসুজি প্রশ্ন করল সায়ন।

ডাক্তার হাসলেন, 'এ কথা তোমার মনে হল কেন? হ্যাঁ, আমি যদি নিরাময় বন্ধ করে দিতাম তা হলে তোমাকে তাই বলতে বাধ্য হতাম। তুমি এখন অনেকটা ভাল আছ। এখানকার লোকজন তোমাকে নানান সমস্যায় ফেলছে। কলকাতায় গেলে এই সমস্যাগুলো তোমাকে বিব্রত করত না।'

'কিন্তু কলকাতায় গিয়ে দেখলাম নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ওখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। নিজের স্বার্থ ঠিক রাখার জন্যে সবাই মরিয়া। কলকাতার মানুষ কেন বেঁচে আছে তা তারাই জানে না। ওখানে থাকতে হলে আমাকে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকতে হবে। এখানে ওই অলৌকিক ব্যাপারটা যদি না থাকত—।' সায়ন চোখ বন্ধ করে জোরে নিশ্বাস ফেলল।

এলিজাবেথ চুপচাপ শুনছিলেন। এবার বললেন, 'তুমি আমার কথা শোনো।'

'বলুন।'

'এখানকার মানুষ যে কোনও কারণেই হোক তোমাকে শ্রদ্ধা করে। এই ব্যাপারটাকে তুমি কাজে লাগাও।'

'কী ভাবে?'

'তোমার মধ্যে কোনও অলৌকিক ব্যাপার আছে কি নেই তা নিয়ে ওর মাথা ঘামাক। তোমার কী দরকার সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর? ওরা যদি তাই বিশ্বাস করে খুশি হয়, হোক। তোমার এই জনপ্রিয়তাকে তুমি কাজে লাগাও। আমি এখানকার গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেছি এখনও কুসংস্কার বা অন্ধ ধারণা থেকে এরা মুক্ত নয়। বেঁচে থাকার সামান্য সুযোগ যে এদের পাওয়া উচিত সে ব্যাপারে কোনও ধারণা নেই। আমরা বললে যে কাজ হচ্ছে তা খুবই সামান্য। তুমি বললে অনেক দ্রুত হবে। তুমি বলেছিলে আমার সঙ্গে এদের জন্য কিছু করতে চাও। তাই তো?'

সায়ন মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা প্রতারণা হবে না?'

'সাধারণ মানুষের উপকার করতে যদি অভিনয়ের প্রয়োজন হয় তা হলে তাকে কিছুতেই প্রতারণা বলা যাবে না।'

সায়ন সোজা হয়ে বসল, 'আমি জানি এখানকার গরিব গ্রামের মানুষদের ভালর জন্যে আপনি অনেক কাজ করছেন। কিন্তু কাজগুলো কী সে-ব্যাপারে আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই।'

এলিজাবেথ বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই আজ খুব ক্লান্ত। কাল সকালে যদি আমার ওখানে চলে আসো তবে এ ব্যাপারে আমরা কথা বলতে পারি।'

'বেশ। আমি সকাল-সকাল চলে যাব।'

এলিজাবেথকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই কঙ্কাবতীকে বারান্দায় দেখতে পেল সে। অদ্ভুত চোখে কঙ্কাবতী তার দিকে তাকিয়ে আছে। সায়ন হাসল, 'কী খবর?'

কঙ্কাবতী জবাব না দিয়ে মাথা দোলাল।

'তোমার কি শরীর খারাপ?'

'না।'

'তাহলে এইভাবে কথা বলছ কেন?'

কঙ্কাবতী মুখ নামাল। তারপর অদ্ভুত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আমি কতদিনে একদম ভাল

হয়ে যাব?'

সায়ন আবার হাসল, 'নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে। তোমার অসুখ তেমন মারাত্মক জায়গায় পৌঁছোয়নি। ডাক্তার আঙ্কল তো তোমাকে স্কুলে যাওয়ার মতো তৈরি করে দিয়েছেন। এ নিয়ে চিন্তা করছ কেন?'

কঙ্কাবতী মুখ নামিয়ে থাকল, কথা বলল না।

সায়ন এক পা এগোল, 'তোমার নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে?'

এবার কঙ্কাবতী মুখ তুলল, 'আমি কাল চলে যাব।'

'কোথায়?'

'মায়ের কাছে। মা তো এখন ডক্টর তামাং-এর কাছে কাজ করছে। এখানে হাসপাতাল হয়ে গেলে মায়ের চাকরি এখানে হবে। এখন আমার কোনও কষ্ট নেই, তাই মা আমাকে নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ। মিছিমিছি এখানে থাকলে ওঁদেরও তো অসুবিধা।'

সায়নের মনে হল কথাটা ঠিক। ডাক্তার আঙ্কল এতদিন ওকে এখানে রেখে চিকিৎসা করেছেন কোনও অর্থ না নিয়ে। সেটা দেওয়ার সামর্থ্য ওদের ছিল না। শরীর যখন একটু স্বাভাবিক হয়েছে তখন কেন উনি ওকে রাখবেন? এসব ঠিক কথা কিন্তু সায়নের ভাল লাগছিল না। এই মেয়েটা কি ওই দরিদ্র পরিবেশে গিয়ে সুস্থ থেকে লড়াই করতে পারে?

তারপরেই খেয়াল হল কঙ্কাবতীর দেখা চাইলেই পাওয়া যাবে না। এটা মনে হওয়ামাত্র অন্য রকম কষ্ট তৈরি হল।

'তুমি বললে আমার অসুখ সেরে যাবে।' ধীরে ধীরে বলল কঙ্কাবতী।

'আমি বললে অসুখ সারবে? আমি কি ডাক্তার?'

'ডাক্তাররা তো সবসময় অসুখ সারাতে পারে না।'

'তা হলে আমি কী করে পারব?'

এই সময় মিসেস অ্যান্টনিকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে এসে তিনি সায়নের হাত ধরলেন, 'এ কী শুনলাম? তুমি নাকি আগামীকাল এখান থেকে চলে যাবে?'

'কে বলল?' অবাক হল সায়ন।

'বড়বাহাদুর।' মিসেস অ্যান্টনি বললেন, 'ও তোমাদের কথা শুনেছে।'

'চলে যাওয়ার কথা হয়নি। আমি সকালবেলায় এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করতে যাব। ওঁর সঙ্গে কাজ করতে চাই।'

'তা হলে তো হয়ে গেল। অত দূরে গিয়ে কাজ করলে তুমি রোজ এখানে ফিরে আসতে পারবে? অসম্ভব। আচ্ছা; তোমার এসব করার কী দরকার। এই সেদিন কলকাতা থেকে ওরকম অসুস্থ হয়ে ফিরে এলে। আবার অসুখ ডেকে না আনলেই নয়?' মিসেস অ্যান্টনি উত্তেজিত।

'বিছানায় শুয়ে মরে যাওয়ার থেকে কাজ করতে করতে যাওয়া ভাল।'

'অ। তা হলে আমাদের কী হবে?'

'মানে?'

'তুমি কাছে আছ বলে মনে জোর পাই। এই মেয়েটা কাল মায়ের কাছে চলে যাবে। ওকে বলেছি কোনও ভয় নেই, সায়ন আছে, কিছু হলে ওকে ডাকবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সায়ন হাত ছাড়িয়ে নিল, 'কী যা তা বলছেন?'

'তুমি আর কতদিন অস্বীকার করবে? আজ থানায় যে ঘটনা ঘটেছে তা আমরা শুনেছি। খোদ বড়বাবু এসেছিলেন তোমার সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চাইতে।' মিসেস অ্যান্টনি জানালেন।

'সেকী। থানার বড়বাবু এসেছিলেন এ কথা ডাক্তার আমায় বললেন না তো?'

'উনি ভেতরে ঢোকেননি। বড়বাহাদুরের মুখে তুমি নেই শুনে ফিরে গেছেন। ডক্টর সাহেবের হয়তো মনে ছিল না। সে যাই হোক, পৃথিবীতে এমন ঘটনা কখনও সখনও ঘটে। যেশাস তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। তাঁর আশীর্বাদ তিনি তোমার মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। সেই তুমি আমাদের কাছের মানুষ। তুমি চলে গেলে আমরা অসহায় হয়ে যাব।' মিসেস অ্যান্টনি

বললেন।

'আমি এখন কোথাও যাওয়ার কথা ভাবিনি।'

'সত্যি। আঃ। কী আনন্দ হল কথাটা শুনে।' আবার হাত জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিলেন মৃদু। তারপরই মিসেস অ্যান্টনি উল্লসিত হলেন, 'দ্যাখো, দ্যাখো, আমার সমস্ত শরীরে কী রকম কাঁটা ফুটে উঠেছে।' সায়ন হাত সরিয়ে নিতে প্রৌঢ়া এগিয়ে গিয়ে কঙ্কাবতীকে জড়িয়ে ধরলেন, 'তুই আর মন খারাপ করিস না রে। সায়ন তো এখানেই থাকবে।'

হঠাৎ কঙ্কাবতী বলল, 'আমি মন খারাপ করেছি তা কে বলল?'

'সায়নের জন্যে তোর মন খারাপ হয়নি?'

'না। কিছুদিন আগে আমি একজনকে চিঠি লিখেছিলাম। সেই চিঠি গতকাল ফেরত এসেছে। যাকে লিখেছিলাম তিনি নেই।' কঙ্কাবতী বলল।

মিসেস অ্যান্টনি জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'একজন মানুষ যিনি আমাকে—! একজন লেখক!' গলা বুজে এল তার।

সায়ন অবাক হল, 'নেই মানে? মারা গিয়েছেন?'

'জানি না। তিনি ওই ঠিকানায় নেই। আর আমাকে বলেছিলেন ওটাই একমাত্র যোগাযোগের ঠিকানা। সেখানে নেই মানে আর যোগাযোগ করা যাবে না। আমি যে কেন লিখতে গেলাম।'

সায়ন বলল, 'আমি একসময় তোমাকে বলেছিলাম ওঁকে চিঠি লিখতে তখন তুমি রাজি হওনি। তা হলে পরে লিখলে কেন?'

'তখন আমি অসুস্থ ছিলাম। সে-অবস্থায় ওঁকে বিব্রত করতে চাইনি। একটু সুস্থ হলে মনে হয়েছিল এত বড় ঘটনাটা ওঁকে জানানো দরকার।'

'তুমি ওঁর নাম বলোনি। উনি যখন একজন বিখ্যাত লেখক তখন চেষ্টা করলেই জানা যাবে কোথায় রয়েছেন।'

'সেই চেষ্টাটা আমি করতে চাই না।' শক্ত গলায় বলল কঙ্কাবতী।

মিসেস অ্যান্টনি আবার সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলেন।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওঁকে খুব ভালবাসতে?'

কঙ্কাবতী জবাব দিল না, হাসল।

সায়ন এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করল, 'আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি।'

সায়ন বলল, 'তুমিও তো উত্তর দাওনি।'

'আমার উত্তরটা তুমি জানো। কিন্তু তুমি নাকি ইচ্ছে করলে আমাকে সারিয়ে দিতে পারো। পারো না?'

'কঙ্কাবতী, বিশ্বাস করো, এসব মিথ্যে, বানানো। আমার মধ্যে কোনওরকম অলৌকিক ক্ষমতা নেই। ওরা যে কেন এসব বলছে আমি জানি না।' একেবারে ভেতর থেকে কথাগুলো বলল সায়ন।

'তাই?'

'হ্যাঁ। আমি তোমার বন্ধু। তুমি আমাকে বন্ধু ভাব না!'

কঙ্কাবতী তাকাল। তারপর কোনও জবাব না দিয়ে দ্রুত ফিরে গেল তার ঘরের দিকে।

নিজের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে সায়নের মনে হল এলিজাবেথের কথাটাই ঠিক। তাকে অভিনয় করতে হবে। সে অভিনয় করলে যদি মানুষ খুশি হয় তা হলে তার সেটাই করা উচিত। কিন্তু কঙ্কাবতীকে সে বুঝতে পারছে না। আর ওর চলে যাওয়ার দৃশ্যটা যত মনে আসছে বুকের ভেতরটা খালি হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে যাদের নামে প্রবাদ আছে তাদের কোনও বন্ধু ছিল না। কেউ তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় না। তা হলে কি সারিয়ে দেওয়ার অনুরোধটা ভান ছিল? কঙ্কাবতী অভিনয় করেছিল?

এলিজাবেথের সঙ্গে কাজ শুরু করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সায়ন। একজন বিদেশিনী এই কয়েক মাসের মধ্যেই এই অঞ্চলের পাহাড়ি মানুষদের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে যে-ভাবনাচিন্তা করছেন তা ওঁর আগে কেউ ভেবেছে বলে শোনা যায়নি। এলিজাবেথের বসার ঘরের দেওয়ালে একটা ম্যাপ টাঙানো রয়েছে। ওটা তিনি নিজের হাতে এঁকেছেন। ওই ম্যাপে কাছাকাছি দশটি গ্রামের অবস্থান, তাদের লোকসংখ্যা ইত্যাদি সুস্পষ্ট বলা আছে। ভারতবর্ষের বেশির ভাগ মানুষের সঙ্গে এদের কোনও পার্থক্য নেই। বেশির ভাগই অক্ষরজ্ঞানহীন, রোজগার নামমাত্র এবং জন্মহার খুব বেশি। এদের কোনও গৌরব করার মতো অতীত নেই, আনন্দে থাকার মতো বর্তমান অথবা আশা করার মতো ভবিষ্যৎ নেই। পাহাড়ে যখন আন্দোলন শুরু হয়েছিল তখন এরা প্রাথমিকভাবে নিরুত্তাপ থাকলেও পরে চাপে পড়ে কেউ কেউ সেই আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। পুলিশের সঙ্গে সেই সশস্ত্র সংঘাতে যেসব আন্দোলনকারী মারা গিয়েছে তাদের বেশির ভাগই এইসব গ্রামের মানুষ। কিন্তু পরবর্তীকালে যারা গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে পেরেছিল তারা ছাড়া বাকিদের জীবন একই খাতে বয়ে চলেছে। এদের গ্রামে শহরের নেতাদের আনাগোনা হলে বুঝতে হবে ভোট আসছে। তখন ওদের আকাশ ফুলে ভরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি শোনানো হয়। ভোটের আগের দিন যারা নিয়ন্ত্রণ করতে আসে তাদের ভয়ে এরা লাইনে দাঁড়ায় এবং হুকুম পালন করে নিঃশব্দে। করে ভাবে, স্বস্তি পাওয়া গেল।

এলিজাবেথ এদের সাক্ষর করতে চান। পৃথিবীর খবর এদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অভিলাষ তাঁর। যতটা সম্ভব স্বনির্ভর করতে আগ্রহী তিনি। আর জন্মহার কমাতে বদ্ধপরিকর। এই তিনটে কাজ করা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু সায়ন লক্ষ করছিল এইসব মানুষেরা এলিজাবেথকে গ্রহণ করেছে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে। কোনও ভারতীয় মহিলা হলে হয়তো এতটা সম্ভব হত না। এলিজাবেথের সাদা চামড়া, কথায় কথায় হাসি, বন্ধুর মতো ব্যবহার ওদের আকর্ষণ করে।

কাজ শুরু করার আগে এলিজাবেথ সায়নকে নিয়ে বসেছিলেন। ম্যাপটা দেখিয়ে গ্রামগুলোর অবস্থান জানিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাকে একটা কথা বলছি। তুমি কাজ করতে চাইছ, এর চেয়ে আনন্দের কথা কিছু নেই। ঈশ্বর তোমাকে সবসময় সাহায্য করবেন। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তোমার পার্থক্য আছে। তোমার শরীরে যে-অসুখ রয়েছে তা অতিরিক্ত পরিশ্রমে মাথাচাড়া দিতে পারে। তাতে যদি তুমি অসুস্থ হয়ে পড় তাহলে তোমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হবে না। অতএব এমন পরিশ্রম কখনওই করবে না যা তোমাকে অসুস্থ করবে। ঠিক আছে? আমরা এখানে তিনটে দলে নিজেদের ভাগ করেছি। আমি, সিমি এবং আরও কয়েকজন মেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেয়েদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বোঝাবার চেষ্টা করছি। এই কাজটা ছেলেদের পক্ষে সম্ভব নয়। মেয়েরা শুনতে চাইবে না।'

সাক্ষর করার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে। একটু-আধটু লেখাপড়া জানে এমন কয়েকজনকে বেছে নিয়ে সকাল দুপুর সন্ধেবেলায় গ্রামে গ্রামে ক্লাস শুরু হয়েছে। এলিজাবেথ বললেন, 'অবাক হওয়ার ব্যাপার, বাচ্চাদের থেকে বয়স্করাই ওইসব ক্লাসে আসতে আগ্রহী বেশি। তাদের জন্যেই সন্ধেবেলায় ক্লাস করতে হচ্ছে।'

'কিন্তু ওদের জন্য কি স্কুল করা সম্ভব?'

'না, না। স্কুলের কথা আমি একদম ভাবছি না।' এলিজাবেথ বললেন, 'স্কুল তৈরি করার মতো সঙ্গতি আমাদের নেই। আমরা শুধু কতগুলো গ্রুপে ওদের জমা করে অক্ষরপরিচয় করিয়ে দিতে চাই।'

'এই কাজটার দায়িত্ব আমি নিতে পারি।'

'খুব ভাল কথা। কিন্তু তোমাকে আমি আর একটু বড় দায়িত্ব দিতে চাই। আমাদের তিন নম্বর কাজ হল ওদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা। এই দশটা গ্রামের মানুষের সংখ্যা আট হাজার তিনশো তিরিশজন। মাত্র আটশো তিনজন মানুষ যা হোক কিছু রোজগার করে নিয়মিত। বাকিদের কেউ কেউ কখনও-সখনও রোজগার করে আর বেশিব ভাগই বেকার। চাষাবাদ পাহাড়ে খুব কম হয়। যা হয়

তাই বিক্রি করে বাঁচার চেষ্টা করে। অভাবের জন্যে এদের কিছু ছেলেমেয়ে ষোলো-সতেরো বছর বয়স হলেই বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। যাদের চেহারা সুন্দর সেইসব মেয়েদের লোভ দেখিয়ে নরকের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারটা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার।'

'পুলিশ জানে?'

'জানে। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান না হলে এটা বন্ধ কী করে হবে? পুলিশের পক্ষে তো দিনরাত পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। তুমি দিনসাতেক সময় নাও। এই গ্রামগুলো ঘুরে ওদের সঙ্গে কথা বলে দ্যাখো ওরা কী করতে পারে। আমি ডেয়ারি ফার্ম, পোলট্রি ফার্ম ইত্যাদির কথা ভেবেছি। তুমি যদি অন্য কোনও প্রস্তাব দাও তাহলে সেটা নিয়েও ভাবা যেতে পারে। সাতদিন পরেই আমরা কাজ শুরু করব।'

সায়ন উদ্বুদ্ধ হল। ম্যাপ দেখে সে ঠিক করে নিল কবে কোন গ্রামে যাবে। এই গ্রামগুলোতে পৌঁছোতে তাঁকে বিস্তর হাঁটাহাটি করতে হবে।

ম্যাথুজ বলল, 'দু-একদিন সায়ন তার সঙ্গে যেতে পারে। ও প্রতিদিন দুটো গ্রামে মাংস বিক্রি করতে যায়।'

সায়নের কপালে ভাঁজ পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি যে মাংস বিক্রি করতে যাও, কেনে কারা?'

'কেন? গ্রামের মানুষজন?'

'ওদের হাতে মাংস কেনার মতো টাকা থাকে?'

'বাঃ, ম্যাডাম তো অনেক কম দামে মাংস বিক্রি করতে বলেছেন!'

'যত কম দাম হোক, টাকা পায় কোথায়?'

মাথুজ মাথা নামাল, 'সবাই দাম দিতে পারে না। আসলে আমাকে মুশকিলে ফেলেছেন ম্যাডাম, এটা ওঁকে বোঝাতে পারি না।'

'কীরকম?'

'উনি বলেছিলেন গ্রামে ঢোকার পর যারা প্রথমে মাংস কিনবে তাদের কম দামে বিক্রি করতে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যদি দেখি অনেকেই কিনতে চাইছে কিন্তু টাকার অভাবে পারছে না তাহলে তাদের ধারে মাংস দিতে।' পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে মুখের সামনে নাড়ল ম্যাথুজ, 'সবকটা পাতায় ওদের নাম আর মাংসের ওজন লিখে রেখেছি। এটা শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই দেখলাম যাদের সামর্থ্য আছে তারাও আর টাকা না দিয়ে ধার নিচ্ছে। সবাই বুঝে গিয়েছে জীবনে শোধ দিতে হবে না।'

'শোধ না দিলে মাংসের দাম উঠবে কী করে?'

'উঠবে না।'

'তাহলে তো তোমার প্রচণ্ড ক্ষতি।'

'না, আমার পরিশ্রমটাই যাচ্ছে, টাকা যাচ্ছে না। ম্যাডাম দিচ্ছেন।'

'কিন্তু এই ব্যাপারটাকে সমর্থন করা যায় না।'

'ম্যাডামকে বলেছি। তিনি বলেন আরও একটু দেখতে। ওঁর আশা ওরা নিশ্চয়ই মাংসের দাম শোধ করে দেবে।' হতাশ গলায় বলল ম্যাথুজ।

'তুমি সাধারণত কতটা মাংস নিয়ে যাও?'

'আগে বেশি নিতাম, এখন কুড়ি পঁচিশ কেজির বেশি নিই না।'

'আগামীকাল পাঁচ কেজি সঙ্গে নেবে।'

'কেন?'

'কাল কাউকে ধার দেবে না। পাঁচ কেজির বেশি কি ওরা নগদ দাম দিয়ে তোমার কাছ থেকে কেনে?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল।'

'পাঁচ? এখন ওরা একশো গ্রামের টাকাই দেয় না।'

ম্যাডামের বাড়ি থেকে ফিরছিল সায়ন। এতদিন বাদে একটা কাজের সঙ্গে সে যুক্ত হতে যাচ্ছে

বলে মন ভাল লাগছিল। এইসময় দুটো মোটরবাইক নীচ থেকে উঠে আসছিল পাশাপাশি। সায়নকে দেখে ওরা নিজেদের মধ্যে কিছু কথা বলে দুপাশে দাঁড়িয়ে গেল আচমকা।

'নমস্কার। আপনি তো সায়নবাবু?' ডান দিকের আরোহী জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। আপনারা?'

'আমরা লোক্যাল ছেলে। বেকার।' বাম দিকের আরোহী জবাব দিল।

'কী চান আপনারা?'

'চাই তো অনেক কিছু। ভাল মেয়েছেলে, প্রচুর টাকা, দেবেন আপনি?'

'ওসব আমি কী করে দেব?'

'বাঃ। পাবলিক বলে আপনার মধ্যে নাকি যিশু মাঝে মাঝেই চলে আসে। আপনি চাইলে সব হবে।'

'আপনারা ভুল শুনেছেন। আমার কোনও ক্ষমতা নেই। আর আমার মধ্যে যিশু কেন, কোনও ভগবানই কখনও ঢোকেননি। তাঁদের অন্য কাজ আছে।'

'তাহলে থানা থেকে আপনি সুরজকে ছাড়িয়ে আনলেন কী করে?'

'সুরজ কোনও দোষ করেনি। পুলিশকে বুঝিয়ে বলতে ওরা ছেড়ে দিল।'

কথাটা শুনে দুজনেই হো হো করে হাসতে লাগল। তারপর হাসি থামিয়ে ডান দিকের আরোহী বলল, 'এ কথাটা কোনও বাচ্চাও বিশ্বাস করবে না। যাকগে. আপনি এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন? গির্জায়?'

'না। আমি ম্যাডামের ওখান থেকে আসছি।'

'আচ্ছা! আপনার সঙ্গে ওই সি আই এ এজেন্টের পরিচয় আছে?'

'উনি সি আই এ-র এজেন্ট?'

'নিশ্চয়ই। নইলে আমেরিকা থেকে সব ছেড়েছুড়ে এই পাহাড়ে গরিবদের নিয়ে কেউ থাকে? লোকের উপকার করা সব বাহানা, আসল ধান্দা হল পাহাড়ের আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া।'

সায়ন হাসল, 'আপনারা আমার থেকে দেখছি অনেক বেশি জানেন। আমি যতক্ষণ প্রমাণ না পাচ্ছি ততক্ষণ এসব বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আপনি তো এখন সুস্থ। কলকাতায় কবে যাবেন?'

'কেন?'

'আপনার বাড়ি কলকাতায়। এখানে নয়। ফালতু এখানে পড়ে থাকবেন কেন?'

'আমি ভারতবর্ষের মানুষ। ভারতবর্ষের যে কোনও জায়গায় আমি থাকতে পারি, তাই না? আচ্ছা, আমি চলি।'

সায়ন পা বাড়াতেই ডান দিকের আরোহী হাত বাড়াতে যাচ্ছিল কিন্তু বাম দিকের আরোহী তাকে পাহাড়ি ভাষায় নিষেধ করল।

এতক্ষণ মনে যে ভাল লাগাটা ছিল তা আচমকাই চলে গিয়েছিল। এরা কারা? পার্টির লোক? পাহাড়ে যারা স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিল তারা এখন নানান দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এরা কোন দলের? যে দলেরই হোক এরা ম্যাডামের বিরুদ্ধে নোংরা প্রচার শুরু করেছে। যে কোনও বিদেশিকে সি আই এ-র এজেন্ট বলা খুব সহজ ব্যাপার। যে শুনবে তারই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করবে। ভাগ্যিস যিশুখ্রিস্টের সময় আমেরিকা ছিল না, নইলে তাঁকেও হয়তো সি আই এ-র এজেন্ট বলা হত।

মিস্টার ব্রাউনের বাড়ির সামনে পৌঁছে সায়ন দেখল একটা বড় ট্রাক রাস্তার অনেকটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে প্রচুর মালপত্র তোলা হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন শ্রমিক বিছানাপত্র নিয়ে এল বাড়ির ভেতর থেকে।

এইসময় মিস্টার ব্রাউনের ছেলেকে দেখতে পেল সায়ন। যে গেটের সামনে মিস্টার ব্রাউন দাঁড়িয়ে সবার কুশল জিজ্ঞাসা করতেন সেখানে এসে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। বাবার মৃত্যুর পর ইনিই এসেছিলেন।

সায়ন এগিয়ে যেতে ভদ্রলোক হাসলেন, 'বাড়িটা বিক্রি করে দিলাম।'

'ও।'

'আসলে এখানে এসে তো কেউ থাকবে না, মিছিমিছি বাড়িটাকে ফেলে রেখে লাভ কী। শিলিগুড়ি থেকে তো আমি কখনও চলে আসব না।'

'আপনি কি নিরাময়কে বিক্রি করলেন?'

'না না। ওরা আমার কাছে জলের দরে বাড়িটা চেয়েছিল। হ্যাঁ, আমি মানছি ওরা গরিব মানুষের উপকার করতে হাসপাতাল করছে, এই বাড়ি ওদের কাজে লাগত। কিন্তু আমার তো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার কোনও ইচ্ছে নেই। আমি কাঠমাণ্ডুর এক ভদ্রলোককে বিক্রি করে দিলাম।'

'কাঠমাণ্ডু?'

'হ্যাঁ। পার্টি থেকেই ঠিক করে দিল। নিরাময় যা অফার করেছিল তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি।' হাসলেন ভদ্রলোক।

'এই বাড়িতে মিস্টার ব্রাউন থাকতেন। ওঁর স্মৃতি আর থাকবে না!'

'স্মৃতি? আরে ভাই মানুষটাই যখন নেই তখন স্মৃতি নিয়ে কী হবে? কিন্তু আমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছেন ফাদার যোশেফ।'

'কীরকম?'

'যিনি বাড়িটা কিনেছেন তিনি হিন্দু। বাবার উপাসনার ঘরে তিনি তাঁর দেবতাদের রাখবেন। এই যিশুর মূর্তিটাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে রাখার মতো জায়গা আমার বাড়িতে নেই। আমি তাই ফাদারকে বলেছিলাম মূর্তিটাকে চার্চে নিয়ে যেতে। কিন্তু ভদ্রলোক এত দেরি করছেন!' বেশ উদ্বিগ্ন মুখে তিনি রাস্তার দিকে তাকালেন।

'ওই মূর্তিটি আপনার বাবার খুব প্রিয় ছিল!'

ভদ্রলোক তাকালেন, কিছু বলতে গিয়ে বললেন না। এইসময় শ্রমিকরা এসে জানাল সমস্ত মালপত্র গাড়িতে তোলা হয়ে গেছে।

হঠাৎ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি খ্রিস্টান?'

হেসে ফেলল সায়ন, 'কেন?'

'তাহলে মূর্তিটাকে আপনার কাছে রেখে যেতাম। আপনি পরে ফাদারকে দিয়ে দিতেন।'

'আপনি আমাকে স্বচ্ছন্দে দিয়ে যেতে পারেন।'

ভদ্রলোক যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। দ্রুত ভেতরে চলে গিয়ে একটা বিশাল পিজবোর্ডের বাক্স শ্রমিকের কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে এলেন। সায়ন লোকটিকে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

নিরাময়ের গেটে পৌঁছে বাক্সটাকে নামাতে বলল সে। বড় এবং ছোটবাহাদুর সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সায়ন তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তার আঙ্কল কি ভেতরে আছেন?'

'হ্যাঁ। কঙ্কাদিদির খুব শরীর খারাপ। রক্ত দেওয়া হচ্ছে।'

অবাক হয়ে গেল সায়ন। কঙ্কাবতীকে রক্ত দেওয়া হচ্ছে। এইসময় সে পদমকুমার এবং আর একটি ছেলেকে দেখল নিরাময় থেকে বেরিয়ে যেতে। যাওয়ার সময় পদমকুমার তাকে নমস্কার করে গেল। সায়ন দেখল সমস্ত মালপত্র সংগ্রহ করে মিস্টার ব্রাউনের ছেলের ট্রাক নীচের দিকে নেমে গেল। সে ছোটবাহাদুরকে বলল, 'বাক্সটাকে নিয়ে ভিজিটার্স রুমে চলো।'

ভিজিটার্স রুমে একটা বড় টেবিল আছে দেওয়াল ঘেঁষে। বাক্স থেকে মূর্তি বের করে টেবিলের ওপর রাখতেই বড়বাহাদুর এবং ছোটবাহাদুর ভক্তিভরে নমস্কার করল। ছোট বাহাদুর জিজ্ঞাসা করল, 'এখন থেকে এখানেই উনি থাকবেন?'

মাথা নাড়ল সায়ন, 'না, ফাদারকে পৌঁছে দিতে হবে। তিনি চার্চে নিয়ে যাবেন।'

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সায়ন ভাল করে মূর্তিটাকে দেখল। মিস্টার ব্রাউনের আরাধনার ঘরে মোমবাতি জ্বলত মূর্তির সামনে। তার আলোয় যিশু যেরকম অলৌকিক হয়ে উঠতেন এখন সেরকম মনে হচ্ছে না। ভিজিটার্স রুমের নিওন বাতির আলোয় যিশুকে একজন সাদামাটা সুন্দর চেহারার মানুষ ছাড়া কিছু মনে হচ্ছে না। একজন সহজ মানুষ হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন। ধর্মপ্রচারক বা ঈশ্বরের অবতার নন, এ সময় ওঁকে বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যাবে না।

সায়ন যিশুর মুখের দিকে তাকাল। মিস্টার ব্রাউন এই মূর্তির মুখের গড়নের সঙ্গে তার মুখের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তার চিবুকের মাঝখানে একটা ছোট্ট খাঁজ আছে। খুবই সামান্য। সায়ন দেখল মূর্তিটিরও একই চেহারা। সে চোখের দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল সায়নের। ওই কৌতুকমাখানো চোখ দুটোয় কি সম্মোহনীশক্তি আছে?

'প্রার্থনা করো সায়ন। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।'

গলাটা কানে যেতেই ধাতস্থ হল সায়ন। ডাক্তার আঙ্কল পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সে অবাক হয়ে তাকাল।

ডাক্তার বললেন, 'ঘণ্টা তিনেক আগে হঠাৎই কঙ্কাবতী অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওর নাক কান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। ওর শরীরের লক্ষণ দেখে মনে হয়েছিল এখনই বিপদের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কেন যে এমন হল আমি বুঝতে পারছি না। ওকে আমি ছেড়ে দেব বলে ভেবেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পদমকুমারকে পাওয়া গিয়েছিল বলে রক্ত দিতে পেরেছি। এখন ব্লিডিং বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু শি ইজ নট আউট অফ ডেঞ্জার।'

'কেন?'

'যে পরিমাণে রক্তপাত হয়েছে তা শুধু নাক কান ছাড়া অন্যত্রও হতে পারে। শরীরের ভেতরে হলে বিপদ হবেই। তাই আমাদের প্রার্থনা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। এইসব সময়ে আমরা সত্যিই হেল্পলেস।'

সায়ন বড় নিশ্বাস ফেলল। ডাক্তার আঙ্কল বললেন, 'আমি মির‍্যাকলে বিশ্বাস করি না। কিন্তু আজ এই সময়ে যিশুর মূর্তি নিরাময়ে এল। কীরকম কাকতালীয় ব্যাপার। অথচ দ্যাখো, মনে জোর পাচ্ছি।'

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কঙ্কাবতীর মা এসেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি ডক্টর তামাংকে খবর দিয়েছি। জুনিয়ার ব্রাউন কি যিশুর মূর্তি তোমাকে দিয়ে গেলেন?'

'না। চার্চে দিতে বলে গেলেন।'

'ও। ভদ্রলোক বাড়িটাকে আমাদের কাছে বিক্রি করতে রাজি হলেন না।'

এইসময় ফাদার যোশেফকে দরজায় দেখা গেল। ডাক্তার বললেন, 'আসুন ফাদার।'

সায়ন বলল, 'মিস্টার ব্রাউনের ছেলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ওঁর পক্ষে যিশুর এই মূর্তি শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। উনি আপনাকে দিতে চেয়েছিলেন চার্চে রাখার জন্যে। আপনাকে না পেয়ে আমাকে বলেছেন দিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু ফাদার, আমরা কি এখানে মূর্তিটিকে কয়েকদিন রাখতে পারি?'

ফাদার মাথা নাড়লেন, 'যতদিন ইচ্ছে রাখতে পারো।'

সায়ন বলল, 'আমি একটা কথার জবাব ওঁকে দিইনি। উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি খ্রিস্টান কিনা? আমি সেটা এড়িয়ে গিয়ে মূর্তিটিকে রাখতে চেয়েছি।'

'ঠিকই করেছ। পিতার স্মৃতির প্রতি যে সন্তান সম্মান জানাতে পারে না তার কোনও ধর্ম নেই। সে হিন্দু মুসলমান অথবা খ্রিস্টান নয়। আর যে খ্রিস্টান যিশুর মূর্তিকে দায় বলে মনে করে তার কাছে সত্য গোপন করলে কোনও পাপ হয় না। কিন্তু ডক্টর, আমি শুনলাম আপনার একজন পেশেন্ট খুব অসুস্থ?'

'হ্যাঁ। আমি আপনাকে অনুরোধ করব ওর জন্যে প্রার্থনা করতে।'

'নিশ্চয়ই করব। কয়েকটা মোমবাতি পাওয়া যেতে পারে?'

মোমবাতি এল। ফাদার সযত্নে সেগুলোকে জ্বালিয়ে যিশুর মূর্তির পাশে বসিয়ে দিলেন। সেই মোমবাতির নরম আলো যিশুর চিবুকে কপালে ছড়িয়ে পড়তেই সায়নের মনে হল তিনি অলৌকিক হয়ে উঠলেন। ফাদার সেই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। ডাক্তার আঙ্কলের মাথাও নীচের দিকে। সায়ন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল।

কঙ্কাবতীর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখতে পেল সে। মিসেস অ্যান্টনি মাথার পাশে বসে,

পায়ের কাছে ওর মা। ঝোলানো বোতল থেকে টুপ টুপ করে রক্তের ফোঁটা নলের ভেতর দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ চিত হয়ে শুয়ে আছে কঙ্কাবতী। চোখ বন্ধ। রক্ত যাচ্ছে তার শরীরে। ওকে কি ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে? সায়ন চোখ বন্ধ করল। তারপর মনে মনে বলল, 'কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।'

রাতটা কেটে গেল। সকাল হতেই সায়ন চলে এল কঙ্কাবতীর ঘরে, এসে খুশি হল। কঙ্কাবতী বালিশে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে। একটা চাদর তার বুক অবধি টানা। ওর মা ঘরে নেই কিন্তু মিসেস অ্যান্টনি আছেন। এই ভদ্রমহিলা গতরাতে বাড়ি যাননি নাকি? সায়ন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না।

মিসেস অ্যান্টনি কঙ্কাবতীর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। ডক্টর বলেছেন আর তোমার কোনও বিপদ নেই।'

কঙ্কাবতী তাঁর দিকে তাকাল, 'কিন্তু আমার অমন হল কেন? আমি তো সেরে গিয়েছিলাম তাহলে আমার রক্ত বের হল কেন?'

'ওরকম হয়। তুমি এসব নিয়ে একটুও ভাববে না।'

'কিন্তু আমার পেটে ব্যথা করছে।'

'কাল থেকে টয়লেটে যাওনি তো, তাই। ডক্টর ওষুধ দিয়েছেন, টয়লেট হয়ে গেলে ব্যথা চলে যাবে।' কথা বলতে বলতে মিসেস অ্যান্টনি সায়নকে দেখতে পেলেন, 'আরে এসো এসো। গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং। কেমন আছ কঙ্কা?'

'ভাল না। আমার পেটে ব্যথা করছে।' অদ্ভুত গলায় বলল কঙ্কাবতী।

'ওটা সামান্য ব্যাপার।'

'তোমার শরীর থেকে যখন রক্ত বের হয় তখন কি পেটের ব্যথা শুরু হয়?' কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করল।

না। সায়নের সেরকম কখনও হয়নি। সে মাথা নাড়ল, না।

'তাহলে আমার কেন হচ্ছে?' বলতে বলতে জানলার বাইরে তাকাল কঙ্কাবতী। সেখানে নিষ্পত্র গাছটিকে সে দেখতে পেল না। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওমা, গাছটা কোথায় গেল? ওখানে গাছ ছিল।'

মিসেস অ্যান্টনি তাকালেন, 'নতুন হাসপাতাল হচ্ছে, বোধহয় কন্ট্র্যাকটরের লোকজন কেটে ফেলেছে। আমাদের নিরাময় তো আরও বড় হবে।'

'তাহলে আমি আর পাখি দুটোকে দেখতে পাব না।'

'কোন পাখি?'

'ওই গাছের ডালে এসে বসত।'

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে সরে এল সায়ন। তার ভাল লাগছিল না। আজ কঙ্কাবতীর কণ্ঠস্বর একদম অন্যরকম শোনাচ্ছে। কীরকম ছেলেমানুষের মতো যার মধ্যে শুধুই অস্থিরতা।

ম্যাথুজ এবং বিষ্ণুপ্রসাদ অপেক্ষা করছিল। সায়ন শুনতে পেল ম্যাডাম এবং সিমি সাতসকালেই বেরিয়ে গেছেন। ম্যাথুজের হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ, সম্ভবত তার মধ্যেই মাংস আছে। সে বলল, 'আজ আমার হাঁটতে কষ্ট হবে না।'

'কুড়ি পঁচিশ কেজি মাংস নিয়ে রোজ হাঁটতে?'

'উপায় কী! প্রথম প্রথম যখন তারও বেশি নিয়ে যেতে হত তখন একটা খচ্চর ভাড়া করতাম। কিন্তু আমি ভাবছি জানতে পারলে ম্যাডাম রেগে যাবেন।'

'না রাগবেন না। আর যদি রেগে যান তাহলে আমি বুঝিয়ে বলব।'

ওরা তিনজন কথা বলতে বলতে হাঁটছিল। এখন আর পিচ বা পাথরকুচির রাস্তা নেই। হেঁটে হেঁটে মানুষ পাহাড়ে সরু পথ তৈরি করে ফেলেছে, খানিকটা উঠে বেশ কিছুটা নীচে নামতেই জঙ্গল দেখতে পেল ওরা। জঙ্গলের গায়েই গ্রাম। এই গ্রাম বেশি বড় নয়। মুরগি ডাকছে ওখানে।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'এই গ্রামের অবস্থা কীরকম?'

'একটু ভাল।' বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'কয়েকজন শিলিগুড়ি লাইনে ট্যাক্সি চালায়, খালাসির কাজ করে। কিছু লোক মিলিটারিতে গিয়েছে, তাদের টাকা আসে। আর এদিকটায় খুব ভাল স্কোয়াশ আর কলা হয়।'

গ্রামে ঢুকে কিন্তু সায়নের মনে হল না বিষ্ণুপ্রসাদের বক্তব্য ঠিক। চারপাশে অভাবের হাঁ-মুখ, এদের পোশাক, চেহারায় তার ছাপ স্পষ্ট। গ্রামের মাঝখানে একটা বড় পাথরের ওপর মাংসের থলি রেখে ম্যাথুজ চিৎকার করল, 'টাটকা মাংস, নরম মাংস, ম্যাডাম দাম কমিয়ে দিয়েছেন বলে আপনারা খুব সস্তায় পেয়ে যাচ্ছেন, আড়াইশো পাঁচশো এক কিলোর প্যাকেট আছে, ফুরিয়ে যাওয়ার আগে জলদি নিয়ে যান।'

সায়ন দেখল মাত্র চার পাঁচজন লোক বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ম্যাথুজের কথা শুনছে। একই কথা ম্যাথুজ বারংবার বলে যাচ্ছিল কিন্তু কেউ কিনতে এগিয়ে আসছিল না।

সায়ন নিচু গলায় ম্যাথুজকে বলল, 'টাকা না দিলে কাউকে মাংস দেবে না আজ। বলবে ধারবাকি বন্ধ।' ম্যাথুজ মাথা নাড়ল।

বিষ্ণুপ্রসাদকে নিয়ে গ্রামটাকে ঘুরে দেখল সায়ন। তারপর কয়েকজন যুবককে ডেকে একজায়গায় জড়ো করল, 'আপনারা কি কোনও কাজকর্ম করেন?'

'ক্ষেতি করি।' একজন বলল।

'তাতে আপনাদের সংসার ভালভাবে চলে?'

সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়ল, না।

'তাহলে কী করে চালান?'

নিজেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে শেষ পর্যন্ত একজন বলতে পারল, 'চলে না। তখন ইসখুস খেয়ে বেঁচে থাকি।'

'ইসখুস?'

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'স্কোয়াশকে ইসখুস বলা হয়।'

'তোমরা শহরে গিয়ে কাজ করো না কেন?'

'গিয়েছিলাম, কাজ পাইনি।'

'তোমাদের গ্রামের অনেকেই তো পেয়েছে।'

'ওরা আমাদের পাত্তা দেয়নি।'

কথা বলার সময় দু-একজন করে শ্রোতার সংখ্যা বাড়ছিল। সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা এখন লেখাপড়া করছ?'

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'এরা আসে না। আমি এই গ্রামে পড়াতে আসি। আসে মেয়েরা আর বুড়োরা। আমি এদের বলেছি সই করতে না জানলে সবাই তোমাদের ঠকাবে। কোথাও চাকরি করতে পারবে না। কিন্তু এদের কানে ঢুকছে না।'

'ঠিকই। কী করে লিখতে হয় আর কী করে পড়তে হয় তা তোমাদের শিখতে হবে। এটা খুব জরুরি।' সায়ন বলল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? আমার বাপঠাকুরদাও তো জানত না।'

'তারা কখনও ব্যবসা করেনি। তোমরা যদি ভালভাবে বেঁচে থাকতে চাও তাহলে তোমাদের ব্যবসা করতে হবে।'

'আমরা ব্যবসা করব?' খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল একজন।

'হ্যাঁ। তোমাদের কেউ চাকরি দেবে না। তাই সবাই মিলে একসঙ্গে ব্যবসা করা ছাড়া তোমাদের বাঁচার কোনও উপায় নেই। ব্যবসায় হিসেব লেখা খুব প্রয়োজন। লিখতে জানলে সেটা করতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

'আমরা কী ব্যবসা করব?'

'তোমরা যখন চাষবাস করো তখন কী করলে আরও বেশি ফসল ফলানো যায় তার রাস্তা আমরা

দেখিয়ে দেব। সেই ফসল তোমরাই বাজারে বিক্রি করবে। আমরা তোমাদের মুরগির বাচ্চা এনে দেব। এই গ্রামের প্রত্যেক মানুষের মাথা-পিছু একটা বাচ্চা। তোমরা তাদের বড় করবে। সেই মুরগির ডিম বিক্রি করতে পারবে। তাদের বাচ্চা বড় হলে সেগুলোর জন্যে ভাল দাম পাবে। কীভাবে মুরগির চাষ করতে হয়, ডিম ফোটানোর জন্যে কী কী যন্ত্র লাগে, ওদের কী খাওয়াতে হয় এসব ম্যাডাম তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে লোক পাঠাবেন। কিন্তু তোমাদের খুব পরিশ্রম করতে হবে। রাজি আছ?'

'আমাদের টাকা দিতে হবে না?'

'না। তোমাদের পরিশ্রম আর চেষ্টা থাকলেই হবে। কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

সবাই তাকাল সায়নের দিকে।

'যখনই তোমরা মুরগি থেকে রোজগার শুরু করবে তখনই একটু একটু করে ম্যাডামকে তাঁর টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। রাজি?'

পঞ্চাশ ষাটজন মানুষ একসঙ্গে চিৎকার করল, 'রাজি।'

'দ্যাখো, আমরা মানুষ। গোরু ভেড়া মুরগি নই। একটা ছাগলকে তুমি যা দেবে তা সে খেয়ে নেবে কিন্তু সে কিছু ফিরিয়ে দেবে না। আমরা মানুষ হয়ে শুধু যদি হাত পেতে নিই, ফিরিয়ে দেওয়ার কথা না ভাবি তাহলে আমাদের সঙ্গে ছাগলের পার্থক্য থাকবে না। দাম শোধ করতে হবে না ভেবে যারা ধার নেয় তাদের আর যাই বলা যাক মানুষ বলা যাবে না। ম্যাডাম তোমাদের ধার দেবেন, তোমরা যদি তা শোধ করে দাও তাহলে তাঁকে সম্মান জানানো হবে। আর এই জন্যে তোমাদের হিসেব রাখতে হবে। তাই অক্ষর চিনতে শুরু করো।' সায়ন কথাগুলো শেষ করতেই দেখল প্রতিটি মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

একজন বলল, 'আমাদের এখন চাষ নেই। কবে থেকে ব্যবসা শুরু করব?'

'দিন সাতেকের মধ্যে জানতে পারবে। কিন্তু তার আগে বলো তোমাদের গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান কে?'

একজন প্রৌঢ় এগিয়ে এলেন। সায়ন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার এই প্রস্তাবে আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?'

'মনে হচ্ছে ভালই হবে কিন্তু পার্টিকে জানাতে হবে।'

'কোথায় গিয়ে জানাবেন?'

'শহরে।'

'তারা যদি নিষেধ করে?'

সঙ্গে সঙ্গে জনতা চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাল।

সায়ন বলল, 'আপনাদের কষ্টের দিনে পার্টি যদি কোনও সাহায্য না করে তাহলে তাদের নিষেধ করার কোনও অধিকার নেই। আপনি নিজে পঞ্চায়েত প্রধান। এই গ্রামের মানুষদের জন্যে কী করেছেন?'

'আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই।'

'কেন? আপনাদের হাতে সরকারের দেওয়া টাকা আসে না?'

'না। আমি একবার শহরে গিয়ে টিপসই করে দিই। ওরা আমাকে টাকা দেয় না। বলে, আরও বড় কাজে টাকাটা লাগবে।'

'আপনার পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যরা আপত্তি করে না?'

'ওরা কেউ শহরে যায় না।'

'এখন দেখছেন আপনার গ্রামের মানুষ চাইছে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকতে। এদের দাবি মেনে নিন। আপনারা একটা সমিতি তৈরি করুন যাদের হাতে ব্যবসা চালাবার দায়িত্ব থাকবে। এই ব্যবসার আয় যেন প্রত্যেকটি পরিবার পায় সেটা লক্ষ রাখবেন।'

প্রধান হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতদিনে ব্যবসা থেকে টাকা পাওয়া যাবে?'

'মুরগিগুলো বড় হয়ে যতদিন না ডিম পাড়বে ততদিন অপেক্ষা করতে হবে। আমি সাতদিন পরে

আবার আসব।' সায়ন বলল।

ম্যাথুজ তার জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। সায়নকে ডেকে বলল, 'আজও কেউ কিনতে আসেনি। আসবে না, জানতাম।'

সায়ন এবং বিষ্ণুপ্রসাদের পেছনে ছেলেগুলো আসছিল।

সায়ন বলল, 'চলো, পাশের গ্রামে যাই।'

এই সময় একজন বৃদ্ধ এগিয়ে গেল ম্যাথুজের সামনে, 'চলে যাচ্ছ?'

ম্যাথুজ বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমাকে পাঁচশো গ্রাম ধার দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল ছেলেগুলো। উত্তেজিত গলায় কথা বলতে বলতে জবরদস্তি বৃদ্ধকে সরিয়ে নিয়ে গেল। বৃদ্ধ সম্ভবত ভাবতেই পারছিল না সে কী অপরাধ করেছে।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে ম্যাথুজ জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী করে হল?'

বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'আমিও অবাক। সায়নের বক্তৃতায় যে এমন কাজ হবে তা ভাবতেও পারিনি। রাতারাতি লোকগুলো মানুষ হয়ে গেল?'

ম্যাথুজ বলল, 'তোমার মধ্যে সত্যি ক্ষমতা আছে সায়ন।'

সায়ন কিছু না বলে হাঁটছিল। ছেলেগুলোর আচরণে সে খুব খুশি। ভারতবর্ষের নব্বুইভাগ মানুষ আত্মসম্মানহীন অবস্থায় বেঁচে থাকে? এই ছেলেগুলোর মতো তারা সবাই যদি আত্মসম্মানবোধটা ফিরে পেত!

সন্ধ্যায় এক শরীর ক্লান্তি নিয়ে নিরাময়ে ফিরে এসে সায়ন শুনল, কঙ্কাবতীর অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে।

৪২

কঙ্কাবতীকে ঘিরে তখন তিনজন মহিলা দাঁড়িয়ে। তাঁরা ওকে বোঝাচ্ছিলেন কিছুই হয়নি, ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন, সেরে যাবে। এঁদের মধ্যে কঙ্কাবতীর মা-ও রয়েছে। ওই মহিলাদের সায়ন এর আগে দেখেনি। কথাবার্তায় অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল ওঁরা কঙ্কাবতীর মায়ের পরিচিতা।

কঙ্কাবতী শুয়েছিল বিছানায়। একেবারে শিশুর মতো ছটফট করছিল পেটে হাত চেপে। হঠাৎ সায়নকে দেখতে পেয়ে সে ককিয়ে উঠল, 'আমি মরে যাব, আমাকে বাঁচাও। খুব কষ্ট।'

সায়ন এগিয়ে যেতেই মহিলারা সরে দাঁড়াল। চাদরের ঢাকা থাকলেও বোঝা যাচ্ছিল কঙ্কাবতীর পেট ফুলে উঠেছে। এই সময় মিসেস অ্যান্টনি ঘরে ঢুকলেন, 'ওর মা ছাড়া সবাই অনুগ্রহ করে বাইরে চলে যান!'

মিসেস অ্যান্টনির হাতে কিছু যন্ত্রপাতি। সায়ন দেখল অনিচ্ছাসহকারে বাকি দুজন মহিলা বেরিয়ে গেলেন। সে কঙ্কাবতীর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ভয় পেও না।'

নীচে নেমে অফিসঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে ডাক্তার তামাংকে দেখতে পেল। খুব মনোযোগ দিয়ে তিনি একটা এক্সরে প্লেট দেখছেন। টেবিলের উল্টোদিকে ডাক্তার আঙ্কল বসে আছেন গম্ভীর মুখে, চোখ বন্ধ করে।

সেই অবস্থায় ডাক্তার আঙ্কল বললেন, 'না ডক্টর তামাং, অপারেশন ছাড়া আর কোনও পথ আমাদের সামনে খোলা নেই।'

ডাক্তার তামাং সোজা হয়ে বসলেন, 'কিন্তু মেয়েটার শরীরের যে অবস্থা তাতে অপারেশন করা—।'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক।'

'তা ছাড়া অপারেশন করবেন কোথায়? নিরাময়ে এত বড় অপারেশনের ঝুঁকি নেওয়া কি উচিত হবে? খারাপ কিছু হয়ে গেলে অ্যান্টি প্রোপাগান্ডা হবে।'

'আমি অ্যান্টি প্রোপাগান্ডায় ভয় পাইনা, মেয়েটার জীবন নিয়ে ভাবছি। নিরাময় আর লোক্যাল হাসপাতালের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। কলকাতা বা শিলিগুড়িতে নিয়ে গেলে কিছু বাড়তি ফেসিলিটিস পাওয়া যেত—।'

সায়ন ঘরে ঢুকতেই ওঁরা তাকালেন। সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কঙ্কাবতীর অবস্থা কতটা খারাপ? ওর পেটে ব্যথা হচ্ছে কেন?'

ডাক্তার তামাং বললেন, 'এরকম কেসে এমন ঘটনা এর আগেও হয়েছে। ব্লিডিং যখন হয় তখন নাক বা কান দিয়ে যদি রক্ত বেরিয়ে যায় তাহলে ভয়ের কিছু থাকে না। কিন্তু শরীরের ভেতরে যদি রক্তক্ষরণ হয় তাহলে বিপদ বেড়ে যায়। মেয়েটির ক্ষেত্রে ওর নাক কানের সঙ্গে পেটেও ব্লিডিং হয়েছে। এবং সেই রক্ত জমাট বেঁধে বেশ বড় ডেলা হয়ে রেক্টামের মুখ ব্লক করে দিয়েছে। এর ফলে ওর স্টুল বের হতে পারছেনা। ওকে জোলাপ দেওয়া হয়েছে, গ্লিসারিন সাপোজিটারি ব্যবহার করা হয়েছে, আজ ডুস দেওয়া হয়েছে কিন্তু ওই রক্তের শক্ত ডেলাকে সরানো যাচ্ছে না। একটা পাইপের মুখে শক্ত কিছু আটকে গেলে যা হয় ওর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এই জন্যে ওর পেট ফুলে যাচ্ছে, পেটে বাতাস জমছে এবং সেই কারণে যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'এখন কী করবেন?'

'ওই ডেলাটাকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। এবং এর জন্যে আমরা বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারি। তারপর ওকে আর বাঁচানো যাবে না।'

'কেন?'

'পেট আরও ফুলে যাবে, যন্ত্রণা বাড়বে, নতুন করে ব্লিডিং হতে পারে—।'

এতক্ষণ ডাক্তার আঙ্কল চুপচাপ ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছিল সিদ্ধান্ত নিতে তিনি দ্বিধা করছেন এবং তার জন্যে বেশ কষ্ট পাচ্ছেন। এসময় মিসেস অ্যান্টনি দরজায় এসে দাঁড়ালেন, 'ডক্টর, কোনও কাজ হল না।'

ডাক্তার আঙ্কল মাথা নাড়লেন, 'ডক্টর তামাং, এবার আপনার অভিমত চাই।'

ডাক্তার তামাং বললেন, 'ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'নিশ্চয়ই।' ডাক্তার আঙ্কল মিসেস অ্যান্টনিকে বললেন, 'কঙ্কাবতীর মাকে একটু এখানে আসতে বলুন। জরুরি কথা আছে।'

মিসেস অ্যান্টনি বেরিয়ে গেলে সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'অপারেশনের ব্যাপারে আপনারা এত চিন্তা করছেন কেন?'

ডাক্তার তামাং বললেন, 'ওর রক্তে হেমোগ্লোবিন এত কম যে ঝুঁকি নিতে সাহস হচ্ছে না। ওর শরীর খুব দুর্বল। অপারেশনের ধকল সহ্য করতে পারবে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। অথচ অপারেশন না করলে ওকে বাঁচানো যাবে না।'

'তাহলে তো ঝুঁকি নেওয়াই উচিত।'

'হ্যাঁ উচিত।' ডাক্তার আঙ্কল বললেন।

সায়ন বেরিয়ে এল। ওপর থেকে মিসেস অ্যান্টনির সঙ্গে নেমে আসছে কঙ্কাবতীর মা। সে গেস্টরুমে ঢুকল। যিশুর মূর্তির সামনে মোমবাতি জ্বলছে। কী পবিত্র অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে মনে, ওই মুখ দেখলে। উনি ঈশ্বরেব পুত্র ছিলেন কি ছিলেন না তা নিয়ে যারা তর্ক করে তারা করুক কিন্তু মানুষ যদি ওঁর সামনে এসে শান্তি পায় তাহলে মানুষের শেষদিন পর্যন্ত উনি থাকবেন।

সন্ধের পর পাহাড়ে স্বাভাবিক মানুষেরা বাধ্য না হলে চলাফেরা করেনা। চারপাশ চুপচাপ, এমনকী রাতজাগা পাখিরাও আজ ডাকছে না। রাত্রে নিরাময়ের অতিথিদের নিজের ঘরে থাকাই নিয়ম। সায়ন খাওয়া-দাওয়ার পর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। আজ রাত্রে কঙ্কাবতী যাতে ঘুমোতে পারে তাই ওকে কড়া ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কয়েকজন নিশ্চয়ই ঘুমোবেন না। ডাক্তার তামাং ফিরে

গেছেন অপারেশনের ব্যবস্থা করতে। আগামীকাল কঙ্কাবতীর অপারেশন হবে।

হঠাৎ কষ্ট হতে লাগল সায়নের। এই কষ্ট অন্য রকমের। শরীরে নয় অথচ সমস্ত শরীরে এক অসাড় যন্ত্রণা। কঙ্কাবতীর সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তা পৃথিবীর অন্য কোন মানুষের সঙ্গে হয়নি। অথচ আজ সেই মেয়েটা একেবারে অন্য গলায় কথা বলছে। সেই শান্ত মিষ্টি ছবিটার সঙ্গে কোনও মিল নেই। এই মেয়ে এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। অপারেশন টেবিলেই যদি ওকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয় তাহলে আর কোনওদিন কথা বলা হবে না।

অনেক রাতে নীচে মানুষের কথাবার্তা হচ্ছে বুঝতে পারল সায়ন। সে আর পারল না। পুলওভার গলিয়ে নীচে নেমে দেখল ডাক্তার আঙ্কল আর পদমকুমার কথা বলছেন। ডাক্তার আঙ্কল বললেন, 'আমি যদি নিজে গিয়ে ওদের অনুরোধ করি তাহলে কি কাজ হবে?'

পদমকুমার মাথা নাড়ল, 'না ডাক্তার সাহেব। ওরা এত ভয় পেয়েছে যে কিছুতেই আসতে রাজি হবে না। কাল বললে দেরি হয়ে যাবে তাই আজ এসে বললাম'।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?

'তুমি এখনও জেগে আছ? নো নো সায়ন। তুমি ভুলে যেও না কয়েকটা নিয়ম মেনে না চললে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে।' ডাক্তার বিরক্ত হলেন।

'আমার ঘুম আসছিল না। পদমকুমার এখন এসেছে কেন?'

'ব্লাড ডোনারদের লিস্টে যাদের নাম ছিল তারা আগামীকাল আসতে অস্বীকার করেছে। কাল কঙ্কাবতীর অপারেশন, ওর গ্রুপের ব্লাড যাদের শরীরে আছে তাদের খবর পাঠিয়েছিলাম। পদম বলছে ওরা কেউ আসবে না।'

'কেন?'

'ওদের শাসানো হয়েছে রক্ত দিতে এলে কেউ বাড়ি ফিরে যাবে না।'

'কারা শাসিয়েছে?'

'শহরের কয়েকজন গুণ্ডা।'

'গুণ্ডারা কেন এভাবে শাসাতে যাবে?'

মাথা নিচু করল পদমকুমার। ডাক্তার আঙ্কলকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন, 'এখনই ডক্টর তামাংকে জানাতে হবে। রক্ত না পেলে কাল অপারেশন করা যাবে না। ওকে তাহলে আজই শিলিগুড়িতে নামিয়ে নিয়ে যেতে হয়।'

সায়ন বলল, 'এর আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি।'

ডাক্তার আঙ্কল বললেন, 'বুঝতেই পারছি এটা কয়েকজন গুণ্ডার কাজ নয়। এর পেছনে অন্য কোনও শক্তি সক্রিয়। আমাকে চেয়ারম্যান কথা দিয়েছিলেন যে কখনওই নিরাময়কে বিপদে ফেলা হবে না।'

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কাল কখন অপারেশন করবেন?'

'ভেবেছিলাম সকাল দশটায়—, কিন্তু এখন তো ভেবে কোনও লাভ নেই।' ডাক্তার আঙ্কল বললেন, 'কাল বিকেলের মধ্যে অপারেশন না করতে পারলে চোখের সামনে মেয়েটাকে মরে যেতে দেখতে হবে। নো, আই কান্ট ডু দ্যাট। আমি ওকে এখনই শিলিগুড়ি নিয়ে যাব।'

ডাক্তার আঙ্কল ছোটবাহাদুরকে ডেকে কিছু বলে ভেতরে চলে গেলেন। সম্ভবত, বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হতে। পদমকুমার অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল একপাশে। এই ছেলেটি ইতিমধ্যে রক্ত দিয়েছে নিরাময়ের অতিথিদের বাঁচাতে। ওর কোনও স্বার্থ নেই, কোনও দায় নেই, কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছে অপরাধটা যেন ও নিজেই করেছে।

সায়ন নীচে নেমে এগিয়ে গেল পদমকুমারের কাছে, 'তোমার তো কোনও দোষ নেই, তুমি মন খারাপ কোরো না।'

'খুব খারাপ, খুব খারাপ।' বিড়বিড় করল পদমকুমার। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে উজ্জ্বল চোখে সায়নকে দেখল। সায়ন অবাক হল, 'কী দেখছ?'

' তুমি পারো। তুমি কেন চুপ করে আছ?'

'আমি পারি?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল।

'বাঃ, সবাই বলে তোমার মধ্যে যিশু মাঝে মাঝে দেখা দেন। মা মেবি তোমাকে আশীর্বাদ করেন। তোমাকে দেখে পুলিশ ভয় পেয়ে সুরজকে ছেড়ে দিয়েছে। এরকম ঘটনা এর আগে কখনও হয়নি।'

'কিন্তু বিশ্বাস করো পদমকুমার, আমার কোনও ক্ষমতা নেই।'

' তুমি বলছ কিন্তু লোকে অন্য কথা বলে।' মাথা নাড়ল পদমকুমার।

হঠাৎ একটা কাঁপুনি শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। সায়ন চোখ বন্ধ করল। নিজের সঙ্গে অনেকবার কথা বলেছে সে, এদের ভুল ভাঙাবার জন্যে প্রচুর চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেউ বুঝতে চায়নি সে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই একজন। সে মেনে নেয় না। সাধারণ মানুষকে একটুও উৎসাহিত করে না বলে এরা তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না কিন্তু তার কথা মন দিয়ে শোনে। আজ গ্রামে গিয়ে সে অত সহজে কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল এই কারণেই।

'আমি অনুরোধ করলে ওরা রক্ত দিতে আসবে?' সায়ন জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই আসবে। ওরা না এলে অন্য লোকজন আসবে।'

'ঠিক আছে, চলো, আমি রাজি আছি। পদমকুমার, আমি সাধারণ মানুষ, কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু আমার কথায় যদি একটি মেয়ের জীবন রক্ষা পায় তাহলে আমি সেটা করতে রাজি আছি।'

পদমকুমার বলল, 'কিন্তু এত রাত্রে তুমি কোথায় যাবে?'

'তোমাদের গ্রামে!'

'যারা ওই গ্রুপের রক্ত দেবে তারা তো সবাই এক গ্রামে থাকে না! তোমাকে অনেকগুলো গ্রামে যেতে হবে। এত রাত্রে তুমি কি সেটা পারবে?'

'আমাকে পারতে হবে। কিন্তু যারা ঘুমিয়ে পড়েছে তাদের—।'

'আমি বলি কি, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

এই সময় ডাক্তার আঙ্কল তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন, 'তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও শুয়ে পড়ো। আচ্ছা, পদমকুমার, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এতদিন ধরে অনেক উপকার করেছ তুমি।'

'আমি কিন্তু ভয় পাইনি। আপনি আমাকে ছয় মাসের মধ্যে রক্ত দিতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু দরকার হলে আমি দিতে পারি।'

পদমকুমারের কাঁধে হাত রাখলেন ডাক্তার, 'বাঃ, খুব ভাল। আমি এখন ওকে নিয়ে শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছি। ওখানে ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে, আশা করি কোনও সমস্যা হবে না।'

এই সময় সায়ন বলল, 'কিন্তু এখানেই যদি রক্তের ব্যবস্থা হয়ে যায় তাহলে এত রাতে ওকে নিয়ে যাওয়ার দরকার কী!'

'রক্তের ব্যবস্থা কী করে হবে?'

'আপনি আমাকে এক সময় বলেছিলেন কোনও ভাল কাজের জন্য মিথ্যের ভান করলে অন্যায় হয় না। আজ আমি সেটা করতে চাই।'

সায়ন কথাগুলো বলা মাত্র পদমকুমার বলল, 'কিন্তু আমি বলছি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। গ্রামে অনেক মানুষ এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।'

ডাক্তার আঙ্কল বললেন, 'আমি তোমাদের কথা বুঝতে পারছি না।'

পদমকুমার বলল, 'সায়ন যদি অনুরোধ করে তাহলে মানুষ রক্ত দিতে আসবেই।'

ডাক্তার আঙ্কল মাথা নাড়লেন, 'আমি জানি না। যদি না আসে!'

পদমকুমার বলল, 'আপনি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

ডাক্তার আঙ্কল সায়নের দিকে তাকালেন। তারপর ভেতরে চলে গেলেন।

পদমকুমার বলল, 'আমি যাই। এখনই যাদের দেখা পাব বলব কাল সকালে এখানে আসতে। তোমার নাম করে বলব।'

'এখানে আসতে বলবে কেন?'
'বাঃ! রক্ত তো এখানেই দিতে হবে।' পদমকুমার চলে গেল।

ঘুম আসছিল না। খাটে কম্বলের নীচে শুয়ে ছটফট করছিল সায়ন। কঙ্কাবতী মরে যাবে? অসম্ভব! ওকে বাঁচাতে যা করার তা করতে হবে। কিন্তু যদি পদমকুমারের কথায় কেউ রাজি না হয়, নিরাময়ের সামনেটা কাল সারা সকাল যদি এমনি সুনসান থাকে তাহলে? ডাক্তার আঙ্কলের তাড়াহুড়োর সময়টা নষ্ট করা হবে আর কে বলতে পারে এর জন্যে কঙ্কাবতীর চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে না!

এতদিন সে বিরক্ত হত, মজাও পেত। কেউ তার মধ্যে যিশুর ছায়া দেখছে, মাদার মেরিকে আশীর্বাদ করতে দেখেছে। এগুলোকে সে উড়িয়ে দিয়েছে অবহেলায়। মিস্টার ব্রাউন ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। যিশু ছাড়া তিনি কিছু ভাবতে পারতেন না। ওই মূর্তির মুখের সঙ্গে তার সামান্য মিল খুঁজে পেয়ে তিনি আবেগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের কাছে খটকা লাগে দুটো জায়গায়। একটা ট্রেনে ঘটেছিল। ওই চোরাকারবারিদলের নেতা হঠাৎ কী দেখেছিল তার মধ্যে? দ্বিতীয়টা এখানকার থানায়। পুলিশ আচমকা ওরকম আচরণ করল কেন? তাহলে তার অজান্তে এমন কিছু ব্যাপার ঘটে যা সে নিজে জানতে পারে না, কেউ কেউ দেখে। ট্রেনের অন্য যাত্রীরা দেখতে পায়নি, থানায় উপস্থিত জনতা জানতে পারেনি। শুধু যে জানলে পরিস্থিতি পাল্টে যাবে সে-ই জেনে যায়। আজ বিছানায় শুয়ে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল সায়নের। ডাক্তার আঙ্কল বলেছেন বেশি টেনশন না করতে। কিন্তু এখন সে নিশ্চিন্তে ঘুমোবে কী করে? হঠাৎ মনে পড়ল ম্যাডামের কথা। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হত। ম্যাডামের সঙ্গে তো অনেকে আছে। ওদের কারও কারও রক্তের গ্রুপ তো কঙ্কাবতীর সঙ্গে মিলে যেতে পারে! পদমকুমারের কথামতো ঝুঁকি না নিয়ে ওঁর কাছে যাওয়া উচিত ছিল!

সায়ন বিছানা ছেড়ে নামল। পুলওভার, মাফলার, মাঙ্কিক্যাপ এবং প্যান্ট জুতো পরে দরজা খুলল নিঃশব্দে। নিরাময় এখন নিঃশব্দ। আলো জ্বলছে কিন্তু কোনও মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। এখন রাত দুটো।

দরজা ঈষৎ ফাঁক, বারান্দায় নজর, সায়ন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। সে এখন নিরাময়ের আইন ভাঙতে যাচ্ছে। অশ্বত্থামা নামক এক হাতির কথা ভেবে যুধিষ্ঠির যদি মিথ্যাচারণ করতে পারেন তাহলে! পায়ের শব্দ হল। বারান্দায় কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। তারপরই চাপা কান্নার আওয়াজ কানে এল। সায়ন বুঝতে পারল ইনি কঙ্কাবতীর মা। খানিকটা কেঁদে মহিলা আবার মেয়ের ঘরের দিকে চলে গেলেন। সায়ন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে দেখল প্যাসেজের আলো নেবানো। অর্থাৎ বড় এবং ছোট বাহাদুর এখন ঘুমোচ্ছে দরজা বন্ধ করে। অফিসঘরে আলো জ্বলছে। তার মানে ডাক্তার আঙ্কল জেগে আছেন। হঠাৎ আর একটা অনুভূতি প্রবল হল।

কে কঙ্কাবতী? প্রায় নিঃস্ব একটি পাহাড়ি মেয়ে যে রক্তের অসুখে ভুগছে। চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা নেই। এখানে এসেছিল পার্টির সুপারিশ নিয়ে। কিন্তু এখন কী ঘটছে? পার্টি কোথায়? তারাই গুণ্ডাদের দিয়ে মেয়েটির মৃত্যুকে ডেকে আনতে সাহায্য করছে। যার কাছে কোনও স্বার্থ নেই, কোনও পাওয়ার আশা নেই তার জন্যে একজন মানুষ রাত জাগছেন, তাকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। শুধু পকেট ভরানোর জন্যে, বড়লোক হওয়ার জন্যে যেসব ডাক্তারের কাহিনী শোনা যায় সেগুলো এক নিমেষে ম্লান হয়ে যায় এরকম কিছু মানুষের জন্যে। সায়নের মনে হল, লোকে তার ভেতর যিশুকে দেখে, আসলে ওদের সেটা দেখা উচিত ছিল ডাক্তার আঙ্কলের মধ্যে। যিনি যিশু নন, কিন্তু কখনও কখনও তাঁকেও অতিক্রম করেন।

সায়ন ধীরে ধীরে প্যাসেজে এসে দাঁড়াল। ডাক্তার আঙ্কল তাকে দেখলে নিশ্চয়ই রেগে যাবেন। ওঁকে না জানিয়ে যেতে হবে। অফিসঘরের দরজা এড়িয়ে কয়েক পা যেতেই গেস্টরুম নজরে এল।

হঠাৎ মনে পড়তেই সে ভেতরে ঢুকল। ঘর অন্ধকার। যিশুর মূর্তির সামনে জ্বালানো মোমবাতিগুলো এখন ছোট হয়ে নিবে যেতে বসেছে। অনেক নীচ থেকে তাদের নিবন্ত আলোর প্রান্ত যিশুর চিবুকে ঠেকেছে। চোখমুখে অন্ধকারের ছায়া। অদ্ভুত দেখাচ্ছে যিশুকে। যেন একটা চাপা ক্রোধ ঠিকরে উঠেছে চোয়ালে। সায়ন চোখ বন্ধ করল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ পেরিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলল।

খোলা আকাশের তলায় এসে ঠাণ্ডা কতখানি তীব্র টের পেল সায়ন। দুপকেটে হাত ঢুকিয়ে সে হাঁটছিল। মিস্টার ব্রাউনের বাড়ির সামনে দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সে পরিষ্কার আকাশ দেখতে পেল। মর্তলোকের সব তারা আজ এই মাঝরাতে আকাশে নিজেদের মধ্যে আড্ডা জমিয়েছে।

এখন মানুষেরা যে যার বিছানায়। আলো জ্বলছে না কোথাও। অন্ধকার বেশ পাতলা কারণ তারারা তাতে আলো মিশিয়েছে। হঠাৎ একটা কুকুর চিৎকার করে উঠল। যে বাড়ির ভেতর থেকে কুকুরটা ডাকছে তার সামনে পৌঁছে সায়ন চাপা গলায় বলল, 'ঠিক আছে, চুপ কর।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা গলা ভেসে এল, 'কে? কে ওখানে?'

সায়ন দাঁড়াল, 'আমি। কোনও ভয় নেই।'

এবার আলো জ্বলল। দরজা খুলছে দেখে দাঁড়াতে হল সায়নকে। কুকুরটা সমানে চিৎকার করে চলেছে। বারান্দায় বেরিয়ে এসে লোকটা চেঁচাল, 'কে তুমি?'

'আমি সায়ন, নিরাময়ে থাকি।'

'সায়ন! আরে! আপনি? এত রাতে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'ওপরে। আমাদের একজনের অপারেশন হবে। ওকে বাঁচাতে গেলে রক্ত দরকার।'

'রক্ত?' লোকটা হতভম্ব।

'চলি।' সায়ন হাঁটতে লাগল।

লোকটা চিৎকার করল, 'দাঁড়ান দাঁড়ান। আমার রক্ত কাজে লাগবে?'

'আমি জানি না। ডাক্তারবাবু ঠিক করবেন।'

হঠাৎ লোকটা আরও জোরে চেঁচাতে লাগল, 'আরে ভাই, তোমরা সবাই ঘুম থেকে ওঠো। একজনের অপারেশন হবে, রক্ত দরকার।'

লোকটা সরল, না পাগল?

এত ঠাণ্ডা বলেই হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল না। জোরে হাঁটায় ঠাণ্ডা কম লাগছিল। বাড়িটার সামনে পৌঁছে বেল টিপল সায়ন। তৃতীয়বারে আলো জ্বলল। কাচের জানলার পাশে এসে সিমি জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'আমি সায়ন।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। খুব অবাক হয়ে সিমি জিজ্ঞাসা করল, 'এ কী? তুমি? এত রাতে এখানে? কী হয়েছে?'

'ম্যাডামকে ঘুম থেকে তোলা যাবে?'

'ম্যাডাম তো বাড়িতে নেই।' সিমি দরজা বন্ধ করল।

'সে কী', খুব মন খারাপ হয়ে গেল সায়নের।

'হ্যাঁ। বিদেশ থেকে প্রচুর সাহায্য এসেছে। সেগুলো ছাড়াতে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট গিয়েছেন আজ বিকেলে, কাল সকালে ফিরবেন।' সিমি বলল, 'তুমি এই ঘরে এসে বোসো। ইস, ঠাণ্ডায় তোমার হাত একেবারে বরফ হয়ে গেছে।'

সায়নের হাত ধরেছিল সিমি। সেইভাবেই পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটের উপর বসাল। এটা বোধহয় ওর ঘর।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'আর সবাই কোথায়?'

'কেউ নেই। ম্যাথুজ আর প্রসাদ ম্যাডামের কথা শুনে সন্ধের পর রওনা হয়ে গিয়েছে। ম্যাডামের একার পক্ষে অত মালপত্র নিয়ে আসা সম্ভব হবে না। তুমি তো সারাদিন ওদের সঙ্গে ছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি উঠি সিমি।'

'কেন?'

'আমার হাতে সময় কম।'

'কী হয়েছে এখনও বলনি!'

'কঙ্কাবতীর কাল অপারেশন হবে। রক্তের দরকার। যারা এতদিন রক্ত দিতে আসত তাদের গুণ্ডারা ভয় দেখিয়েছে বলে আসছে না। আমি ভেবেছিলাম ম্যাডামের সাহায্য নেব। রক্ত না পেলে ওবে· বাঁচানো যাবে না।'

'তুমি কঙ্কাবতীকে খুব ভালবাস, না?'

'ও ভাল মেয়ে ভালবাসব না কেন?'

'আমি ভাল নই বলে—!'

'কী আশ্চর্য! তুমি ভাল নও কে বলল?'

'তাহলে কেন আমাকে তুমি ভালবাসার কথা বলনি!'

সায়ন হাসল, 'আমি কঙ্কাবতীকেও ভালবাসার কথা বলিনি।'

'সত্যি?'

'আমি উঠি।'

'আমি তো রক্ত দিতে পারি, পারি না?'

'তুমি রক্ত দেবে?' উঠে দাঁড়াল সায়ন।

'হ্যাঁ। ম্যাডাম ফিরে এলেই আমি যেতে পারি।'

'ঠিক আছে। এসো।' সায়ন বেরিয়ে এল বাইরে। দরজা বন্ধ করল সিমি। হাঁটতে হাঁটতে চার্চের সামনে এসে দাঁড়াল সায়ন। চার্চ এখন অন্ধকার।

ভোরের কিছু আগে কি পৃথিবীর চেহারাটা কিছুক্ষণের জন্যে ঘোলাটে হয়ে যায়? অন্তত, এখানে এই পাহাড়ে তেমনই দেখাচ্ছিল। অনেক নীচের খাদ থেকে কুয়াশারা সাপের মতো গুঁড়ি মেরে ওপরে উঠে আসছিল। ঝট করে মনে হচ্ছিল মাটি তার অতৃপ্তি একটু একটু করে উগড়ে দিচ্ছিল এখন। চার্চের সামনে দাঁড়িয়েছিল সায়ন। তার এখন কিছু করার নেই। পদমকুমার যে আশ্বাস দিয়েছে তা যদি সত্যি হয় তাহলেই কঙ্কাবতীর জন্যে রক্ত জোগাড় করা সম্ভব হবে। সে নিরাময়ের জন্যে পা বাড়াতে যাচ্ছিল হঠাৎ চার্চের পাশের বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল এবং শব্দ করে দরজা খুলে গেল। যে মানুষটি বের হলেন তাকে দূর থেকেই চিনতে পারল সায়ন, ফাদার। ফাদার যোশেফ।

টর্চের আলোয় পথ দেখতে দেখতে ফাদার এগিয়ে আসছিলেন। সায়নের ওপর আলো পড়তেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ওখানে?'

'আমি সায়ন।'

'সায়ন! কী ব্যাপার? তুমি এই সময়ে?'

'ম্যাডামের কাছে গিয়েছিলাম। ওঁরা কেউ নেই। কঙ্কাবতীকে বাঁচাতে রক্ত দরকার। যারা ভালবেসে দিত তাদের গুণ্ডারা ভয় দেখিয়েছে বলে আসতে চাইছে না।'

'সে কী!'

'কঙ্কাবতীর কী হয়েছে?'

'ওর শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। কাল অপারেশন না করলে বাঁচবে না।'

'আমি রক্ত দিতে পারি।'

'অনেক ধন্যবাদ ফাদার। কিন্তু আপনার গ্রুপের সঙ্গে ওর গ্রুপ যদি না মেলে তাহলে কাজ হবে না। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমি পাশের গ্রামে যাচ্ছি। ওখানে এক বৃদ্ধের অন্তিম সময় এসে গেছে। কাল সন্ধেবেলায় আমি কথা দিয়ে এসেছি যে ভোরের আগেই তার পাশে উপস্থিত হব।'

'আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু ওখানে পৌঁছোতে আধঘণ্টা লাগবে।'

'লাগুক। ওখানকার মানুষের কাছে আমি কঙ্কাবতীর জন্যে আবেদন করব।'

ওরা হাঁটছিল, কুয়াশা এখন ওদের চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। টর্চের আলো এখন কোনও কাজে আসছে না। ফাদার কোনও কথা বলছেন না। ওরা অনেকটা চড়াই উতড়াই ভাঙার পর গ্রামে ঢুকল।

এইসময় গ্রামের মানুষের ঘুমোনোর কথা। কিন্তু সায়ন অবাক হয়ে দেখল আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে মানুষগুলো একটা বাড়ির সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ফাদারকে দেখে কয়েকজন এগিয়ে এল। ফাদার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী খবর?'

'এখন আর কথা বলছেন না। বোধহয় আপনি পাশে গেলেই—।'

ফাদারের সঙ্গে ঘরের দরজায় পৌঁছে গেল সায়ন। ঘরের ভেতর কিছু আধাঘুমন্ত মানুষ মাথা নিচু করে বসেছিল। একটা চারপায়ার ওপর কম্বল চাপা দিয়ে যাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে তিনি জীবিত কি মৃত তা বোঝা যাচ্ছিল না। ফাদারকে দেখে সবাই গুনগুন করে উঠল। ফাদার চারপায়ের পাশে যেতেই একজন একটা বসার জায়গা এগিয়ে দিল। ফাদার সেখানে বসে লোকটির কপালে হাত রাখলেন, তারপর কবজি তুলে নাড়ি দেখলেন।

সায়ন চুপচাপ দেখছিল। দরজার ওপাশে তখন মানুষের ভিড়। ফাদার বাইবেল বের করে নিচুস্বরে পড়তে লাগলেন। সায়ন অনুমান করল মানুষের শেষ সময়ে এটা শেষ প্রার্থনা। মুহূর্তেই একটা অন্যরকম আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেল ঘরের মধ্যে। খানিক বাদে মানুষটির বুক ওঠানামা করতে লাগল। এবং সেই অবস্থায় একটি শীর্ণমুখ ব্যাকুল চোখে চারপাশে তাকাতে লাগল। হঠাৎই সেই চোখ সায়নের ওপর পড়তেই মানুষটি স্থির হয়ে গেলেন। কয়েক সেকেন্ড যাওয়ার পর ফাদার পড়া থামিয়ে নাড়ি পরীক্ষা করলেন। তারপর মাথা নেড়ে কপাল এবং দুই বুকে আঙুল ছুঁইয়ে মৃতের চোখের পাতা টেনে বন্ধ করে দিলেন।

কিছু মানুষ ডুকরে কেঁদে উঠলেন। মেয়েদের গলাই বেশি। সায়ন বাইরে বেরিয়ে আসতেই ঘরের একজন মানুষ এগিয়ে এসে তার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াল, 'নমস্কার! আপনাকে শেষসময়ে দেখে উনি চলে গেলেন। আপনি এসেছেন বলে আমরা কৃতজ্ঞ।'

সায়ন অনেক কিছু বলতে পারত, বলল না। এই সময় এক বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দুহাত বাড়িয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে ওঁর কাছে পাঠিয়ে দাও। তুমি আমাকে ছুঁয়ে যিশুকে বলো যিশু তোমার কথা শুনবেন।'

এই সময় ফাদার বেরিয়ে এলেন, 'তোমরা ওকে বিরক্ত কোরো না। ও খুব সমস্যায় আছে।'

প্রথম লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'কী সমস্যা ফাদার?'

'নিরাময়ে একটি নেপালি মেয়ে খুব অসুস্থ। কাল তার অপারেশন হবে কিন্তু রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। সায়ন তোমাদের কাছে এসেছে রক্ত দেওয়ার অনুরোধ জানাতে। না হলে মেয়েটাকে আর বাঁচানো যাবে না,' ফাদার বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্মিলিত আওয়াজ উঠল। সবাই রক্ত দিতে চায়। সেই বৃদ্ধা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। এবার কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি রক্ত দিতে পারি। যে চলে গিয়েছে তার জন্যে তো সারা জীবন কাঁদব কিন্তু আর একজন যদি আমার রক্ত পেয়ে বেঁচে যায়!'

তাঁকে কথা শেষ করতে দিল না সায়ন। দুহাতে জড়িয়ে ধরে সায়ন বলল, 'মা, আপনি যে বলেছেন তাতেই আমরা খুশি। আপনার এই বয়সে রক্ত দেওয়া উচিত নয়। আপনি এখানেই থাকুন।'

সায়ন যখন বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরেছে তখন জনতা চেঁচিয়ে উঠল উল্লাসে, যেন তারা এক স্বর্গীয় দৃশ্য দেখল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জনা কুড়ি মানুষ রওনা হল পাহাড়ের পথে। ফাদার থেকে গেলেন মৃতের কাছে। কয়েকজন চলে গেল অন্য গ্রামগুলোতে খবর দিতে। ওরা যখন মিস্টার ব্রাউনের বাড়ির সামনে পৌঁছোল তখন আকাশ লাল। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আকাশের গায়ে পাহাড়ের রেখাগুলো চমৎকার আঁকা হয়ে গেছে। অন্ধকার ক্রমশ সরে যাচ্ছে গাছের মাথায়। বাঁক ঘুরতেই সায়ন অবাক হয়ে গেল। নিরাময়ের সামনে প্রচুর মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সেই লোকটি যাকে ম্যাডামের বাড়িতে যাওয়ার সময় সায়ন বলেছিল সমস্যার কথা, যাকে পাগল বা সরল বলে মনে হয়েছিল সে দৌড়ে এল

সামনে, 'আমরা এসে গেছি। যত রক্ত চাও নাও, মেয়েটাকে বাঁচাও।'

ভিড়ের মধ্যে যে পথ তৈরি হয়েছিল সেই পথ ধরে নিরাময়ের গেটে পৌঁছোতেই ডাক্তার আঙ্কলকে দেখতে পেল সায়ন। তাকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। ফিস ফিস করে বললেন, 'আমি তোমার জন্যে গর্বিত। ডাক্তার তামাংকে খবর দেওয়া হয়েছে। তিনি এসে গেলেই আমরা ব্লাড গ্রুপ ঠিক করে নিয়ে রক্ত নেব। তুমি ওদের বলো আর একটু সময় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে।'

সায়ন আবেদন জানাল। একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সে জনতাকে ধন্যবাদ জানাল এই ভোরে রক্ত দিতে আসার জন্যে। যাকে বাঁচাবার জন্যে এত চেষ্টা সেই পাহাড়ি মেয়েটির কথাও বলল সে। মেয়েটি পাহাড়ের জেনে জনতার উল্লাস আরও বাড়ল। জনতা জানল, সবাইকে রক্ত দিতে হবে না। যাদের রক্তের সঙ্গে মেয়েটির রক্ত মিলবে তাদের কয়েকজনকেই শুধু ডাকা হবে।

এর মধ্যে একজন মহিলা এগিয়ে এলেন, 'আমার বুকে সবসময় ব্যথা করে বাবা। হাসপাতালের ওষুধ খেয়েও ঠিক হয়নি। এখানকার ডাক্তার তো আমার চিকিৎসা করে না। তুমি আমার বুকে হাত বুলিয়ে দাও, আমি ঠিক ভাল হয়ে যাব।'

'সেটা কি সম্ভব? আপনি ডাক্তার তামাংকে দেখান।'

'না না, কোনও ডাক্তার আমাকে ভাল করতে পারবে না। তুমি আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিলেই আমি সেরে যাব।'

'এতে আপনি কিছুতেই সারতে পারেন না।'

'না। আমি স্বপ্ন দেখেছি। আমি খ্রিষ্টান নই। কিন্তু একজন সাধু স্বপ্নে আমাকে তোমার কাছে আসতে বলেছেন। আমার বুকে হাত রাখলে তোমার তো কোনও ক্ষতি হবে না বাবা।' মহিলা কাতর গলায় বললেন।

সায়ন দেখল জনতা চুপ করে তাকে লক্ষ করছে। তার ইচ্ছে করছিল মহিলাকে তিরস্কার করতে, ওঁর ভুল ভাঙিয়ে দিতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, সেটা করলে এই জনতার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হবে। হয়তো ওরা এখান থেকে চলে যেতে পারে। পদমকুমার পাশে এসে দাঁড়াল, 'ও যা বলছে তাই করো।'

সায়ন হাত তুলল। মাথার ওপর দিয়ে মহিলার বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করো মা।'

হাত সরিয়ে নিতেই মহিলা চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক মানুষ প্রায় একসঙ্গে ছুটে এল তাদের সমস্যা নিয়ে। সবাই সায়নের কাছে সাহায্য চায়। পদমকুমাররা কোনও মতে সায়নকে নিরাময়ের মধ্যে নিয়ে যাওয়া মাত্র ডাক্তার তামাং-এর গাড়ি পৌঁছে গেল।

আটজনকে নির্বাচন করে তাদের রক্ত নেওয়ার পর কঙ্কাবতীর অপারেশনের তোড়জোড় শুরু হল। তার আগে ডাক্তার আঙ্কেল সায়নকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তুমি আজ সারাদিন বিছানা থেকে উঠবে না। এখনই ঘরে চলে যাও।' বাইরে তখনও মানুষের ভিড়, সায়ন নির্দেশ অমান্য করতে সাহস পায়নি। কিন্তু খাটে শুয়েও তার ঘুম আসছিল না।

আজ এ কী করল সে? মহিলাকে স্তোক দিল? তাহলে কেউ তাকে প্রশ্ন করল না কেন, এতই যখন ক্ষমতা তখন কঙ্কাবতীকে সে সারিয়ে দিচ্ছে না কেন? কেন তাকে রক্তের জন্যে আবেদন করতে হচ্ছে!

একটু বাদেই অপারেশন হবে। কিন্তু কঙ্কাবতীকে দেখতে যাওয়ার সাহস হচ্ছিল না তার। চোখ বন্ধ করে সে প্রার্থনা করতে লাগল, মেয়েটা যেন বেঁচে যায়। এই প্রার্থনা কোনও দেবদেবী বা তাঁদের অবতারের কাছে নয়, সে যেন নিজের কাছেই প্রার্থনা করছিল।

সকাল দশটায় অপারেশনে সাহায্য করার জন্যে শহরের ডাক্তার এবং নার্সেরা পৌঁছে গেলেন। তার আগেই মিসেস অ্যান্টনি কঙ্কাবতীকে তৈরি করে রেখেছিলেন। ডাক্তার আঙ্কল এবার সাহায্যকারী ডাক্তারদের সঙ্গে কঙ্কাবতীর কেস নিয়ে আলোচনা করে নিলেন। গত রাতেই তাকে প্রয়োজনীয় ইনজেকশনগুলো দেওয়া হয়েছিল। অপারেশন থিয়েটারে যখন কঙ্কাবতীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঠিক তখন তিনটে ম্যাটাডর ভ্যান ধীরে ধীরে নিরাময়ের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল চার্চের দিকে। তিনটে ম্যাটাডর ভর্তি হয়ে আছে বড় বড় বাক্সে। যারা তখনও নিরাময়ের সামনে বসেছিল তারা অবাক হয়ে গাড়িগুলোকে দেখল। শেষ ভ্যান গতি কমাতেই বিষ্ণুপ্রসাদকে নেমে পড়তে দেখা গেল। সে দ্রুত নিরাময়ে চলে এল। নীচে কাউকে দেখতে না পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সায়নের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল সে ঘুমোচ্ছে।

বিষ্ণুপ্রসাদ ঘরে ঢুকে সায়নকে একবার ডাকতেই সায়ন উঠে বসল। খুব উত্তেজিত হয়ে বিষ্ণুপ্রসাদ বলল, 'প্রচুর জিনিস এসেছে। গুঁড়ো দুধ, শুকনো খাবার, গরম জামা, আরও কত কী। তিন তিনটে ম্যাটাডর ভাড়া করতে হয়েছে ওসব আনতে। ম্যাডাম বলেছেন আজ দুপুর থেকে গ্রামগুলোতে যাওয়া হবে ওগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। তোমায় খবর দিতে বললেন। তুমি কি অসুস্থ?'

সায়ন মাথা নাড়ল, 'না।'

'তাহলে চলে এসো। আমি একবার বাড়ি ঘুরে ম্যাডামের কাছে চলে যাচ্ছি।' বিষ্ণুপ্রসাদ বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কাবতীর কথা মনে পড়ল সায়নের। কঙ্কাবতীর অপারেশন কি হয়ে গেছে! কেমন আছে ও!

খাট থেকে নামতেই ছোটবাহাদুর ঘরে ঢুকল। তার হাতের প্লেটে মিষ্টি আর গ্লাসে দুধ, 'খেয়ে নাও। আর সায়নবাবু, তোমার বন্ধুরা এভাবে ঘরে চলে আসছে জানতে পারলে ডাক্তারবাবু আমাদের খুব বকবেন!'

'কঙ্কাবতী এখন কোথায়?'

'অপারেশন রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'অপারেশন হয়ে গেছে?'

'এত তাড়াতাড়ি? মিসেস অ্যান্টনি বললেন এখনও অনেক দেরি। কী সব পরীক্ষা হবে আগে তারপর সব ঠিক থাকলে অপারেশন হবে।' কথাগুলো বলে ছোটবাহাদুর একটু থামল, 'তুমি ঘুমোচ্ছিলে তাই কিছু জানো না।'

'কী হয়েছে?'

'কয়েকজন গুণ্ডা এসে পদমকুমারকে এমন মার মেরেছে যে ওকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যেতে হয়েছে। ডাক্তার তামাং সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

'পদমকুমারকে মেরেছে? কারা?' হতভম্ব হয়ে গেল সায়ন।

'গাড়ি করে এসেছিল। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথে ওকে ধরেছিল।'

'ওর সঙ্গে কেউ ছিল না?'

'ছিল। কিন্তু তারা ভয়ে পালিয়েছিল। রক্ত দেওয়ার জন্যে লোক জড়ো করেছিল বলে বেচারা শাস্তি পেল।'

'পুলিশ আসেনি?'

'এসেছিল। দুজন সেপাই নীচে পাহারা দিচ্ছে।' ছোটবাহাদুর চলে গেল।

পদমকুমারের মুখ মনে পড়ল। কী দোষ করেছিল ও? সায়নের চোয়াল শক্ত হল। কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে দুধ-সন্দেশ খেয়ে নীচে নামল সে। আজ সকালে ওষুধ খেতে একটুও ইচ্ছে হল না।

অপারেশন যে ঘরে হবে তার দরজায় লাল আলো জ্বলছে। এই ঘর সচরাচর ব্যবহার করা হয় না।

কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর মনে হল দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। তার কিছু করার নেই শুধু প্রার্থনা করা ছাড়া। কিন্তু কার কাছে প্রার্থনা করবে? যেখানে পদমকুমারদের ওপর আক্রমণ হয় সেখানে প্রার্থনা করে কী লাভ! যার কিছু করার নেই সে নিজের সান্ত্বনার জন্যে, নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার জন্যে প্রার্থনা করে।

সায়ন বেরিয়ে এল নিরাময় থেকে। সেপাই দুটো তাকে দেখে কপালে হাত ছোঁয়াল গদগদভাবে। সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'যারা আজ পদমকুমারকে মেরেছে তাদের কি আপনারা ধরতে পেরেছেন?'

লোক দুটো নিজেদের মুখ চাওয়াচায়ি করল। একজন বলল, 'আমরা তখন ডিউটিতে ছিলাম না। ধরা ঠিক পড়বেই, কোথায় যাবে!'

দ্বিতীয়জন মাথা নাড়ল, 'সেটা ঠিক বলা যায় না।'

সায়ন আর দাঁড়াল না।

বাক্স খুলে মালপত্র বের করা হয়ে গিয়েছিল। এগুলো ম্যাডাম পেয়েছেন তাঁর আমেরিকান বন্ধুদের কাছ থেকে অনুদান হিসেবে। সায়নকে দেখে খুশি হলেন তিনি, 'কনগ্রাচুলেশন। কাল তুমি একদিনেই যে কাজ করেছ তাতে আমি খুব খুশি। আমি বলেছিলাম তুমি ওদের উদ্বদ্ধ করতে পারবে। হ্যাঁ, মেয়েটা কেমন আছে?'

'অপারেশনের জন্যে সবাই তৈরি।'

'ঈশ্বর নিশ্চয়ই ওর মঙ্গল করবেন। শুনলাম কাল রাত্রে তুমি রক্তের জন্যে এখানে এসেছিলে। তারপর প্রচুর মানুষ গিয়েছিল রক্ত দিতে। তাই তো!'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে দ্যাখো, গুণ্ডাদের ভয়ে মানুষ ঘরবন্দী হয়ে থাকে না।'

'কিন্তু যে ছেলেটি উদ্যোগ নিয়েছিল তাকে গুণ্ডারা এমন মেরেছে যে শিলিগুড়িতে নিয়ে যেতে হয়েছে বাঁচাবার জন্যে।'

ম্যাডামের মুখ বিমর্ষ হয়ে গেল! নিচু গলায় বললেন, 'কর্তৃত্ব হারাবার ভয়ে মানুষ কী নিষ্ঠুর হয়ে যায়।'

ঠিক হল, দুধের প্যাকেটগুলো সমানভাবে ভাগ করে গ্রামগুলোতে পৌঁছে দেওয়া হবে প্রথমে। তারপর একে একে অন্য জিনিসগুলো। দুধ শিশুদের জন্যে, তাই ওটার ব্যবস্থা করা জরুরি।

ম্যাডাম অনুমান করতে পারেননি। সায়ন যখন এসেছিল তখনও সে কাউকে দেখেনি কিন্তু তারপরই এক একজন করে মানুষ এসে দাঁড়াতে লাগল ম্যাডামের বাড়ির সামনে। ম্যাথুজ বাইরে বেরিয়ে কথা বলে এসে জানাল ওরা জেনেছে ওদের জন্যে খাবার এসেছে তাই সেগুলো এখনই হাতে হাতে চায়।

ম্যাডাম বিরক্ত হলেন। ম্যাথুজকে বললেন, 'ওদের বলো জিনিসগুলো ওরাই পাবে কিন্তু সেটা যে যার গ্রামে দাঁড়িয়ে নেবে। এখানে আমরা বিতরণ করব না। প্রত্যেককে শৃঙ্খলা মানতে হবে।'

ম্যাথুজ বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল কিন্তু জনতা অত ধৈর্য ধরতে রাজি নয়। একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাদের নাম করে আনা জিনিস তোমরা বিক্রি করে দেবে না তার কী বিশ্বাস আছে?'

ম্যাথুজ ঘাবড়ে গেল, 'বিক্রি করে দেব?'

'তাই তো দেয়। সেবার ভূমিকম্পের পর দেশবিদেশ থেকে কত সাহায্য এসেছিল আমরা তার কটা হাতে পেয়েছি? সবই তো কর্তারা চোরাবাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। কি ভাই দেয়নি?' সবাই সমস্বরে সমর্থন জানাল।

ম্যাথুজ চেঁচাল, 'ম্যাডামকে তোমরা চেন। তিনি তোমাদের জন্যে জিনিস এনে বিক্রি করে দিতে পারেন না। এই সামান্য টাকার লোভে তিনি এখানে পড়ে নেই। তিনি আমাদের ভালবেসে উপকার করতে চান, ওঁকে সন্দেহ করলে অপমান করা হয়।'

জনতা চুপ করে যেতেই দেখা গেল দুটো মোটরবাইক নীচ থেকে উঠে আসছে। জনতা ওদের

জায়গা করে দিতেই ম্যাডামের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল, 'অ্যাই, মেমসাহেব কোথায়?'

ম্যাথুজ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'কৈফিয়তটা তোকে দেব নাকি শুয়োরের বাচ্চা। ডাক তোর মেমসাহেবকে।'

গলাটা ভেতর থেকেও শোনা যাচ্ছিল। ম্যাডাম বাইরে বেরিয়ে এলেন।

'এই যে, আপনি ভেবেছেন কী? যা ইচ্ছে তাই করবেন?'

'আপনাদের উত্তেজনার কারণ জানতে পারি?'

'তিনটে ম্যাটাডোরে কী কী মাল এসেছে এখানে?'

'কেন?'

'ওগুলো স্মাগলিং গুডস কিনা দেখতে হবে।'

'পুলিশ নিয়ে আসুন। কাগজপত্র দেখাব।'

'জিনিসগুলো কী?'

'গুঁড়ো দুধ, শুকনো ফল, বিস্কিট, জামাকাপড়।'

'ওগুলো কাদের জন্যে?'

'এদের জন্যে। এদের গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হবে।'

'গুঁড়ো দুধ। সেই দুধ খেয়ে যদি এদের বাচ্চারা মরে যায় তাহলে আপনি কি ক্ষতিপূরণ দেবেন?'

'মরে যাবে? মানে?'

'এসব জিনিস যারা পাঠায় তারা বাতিল হয়ে যাওয়া মালই পাঠায়, আর সেটা পেটে গেলে বাচ্চারা অসুস্থ হতে পারে।'

'না হবে না।' সজোরে বললেন ম্যাডাম।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমাদের দেশে খারাপ খাবারের কথা কেউ ভাবতে পারে না।'

'তার মানে আমাদের দেশে ভাবে? এই দ্যাখো ভাই, এই বুর্জোয়া আমেরিকান পাহাড়ের মানুষকে অপমান করছে।'

জনতার মধ্যে থেকে যে লোকটা প্রথমে চেঁচিয়েছিল সে এবার প্রতিবাদ করে উঠল, 'উনি অপমান কোথায় করলেন? তোমরাই তো পায়ে পা লাগিয়ে ঝামেলা করছ। তোমরা এখান থেকে যাও তো, আমাদের ব্যাপার আমরাই বুঝে নেব।' কথাগুলো শেষ হওয়ামাত্র সমবেত জনতা তাকে সমর্থন করল। ছেলে দুটো তৎক্ষণাৎ বাইক ঘুরিয়ে নেমে গেল নীচে।

ম্যাডাম বললেন, 'আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আপনারা এখন দয়া করে যে যার গ্রামে ফিরে যান। আপনাদের জিনিস আপনাদের কাছেই পৌঁছে দেব আমরা। শুধু প্রত্যেক গ্রাম থেকে চারজন করে মানুষকে এখানে পাঠান জিনিসগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

ম্যাডাম ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর মুখে কালো ছাপ, চোখ বন্ধ। সায়ন পেছন থেকে সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছিল। সে উল্টোদিকের চেয়ারে বসে বলল, 'ম্যাডাম, আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'আমি জানি আমার মনে করা উচিত নয়। কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমি যে আমেরিকান এটা আমার অপরাধ নয়। উল্টে আমেরিকান বলে আমি গর্বিত। আমি যদি আফ্রিকার গরিব দেশের মানুষ হতাম, আমি যদি পোল্যান্ড যুগোস্লাভিয়ার মহিলা হতাম তাহলে এখানে এসে একদিন থাকাও বিলাসিতা ছাড়া কিছু ভাবতে পারতাম না।'

'এদের কথায় কান দেবেন না। এরা ভারতবর্ষের মানুষ নয়।'

'ভারতবর্ষ? কই, ওরা বলল বুর্জোয়া আমেরিকান পাহাড়ের মানুষকে অপমান করছে, বলল না ভারতবর্ষের মানুষকে অপমান করছে।'

'সেটা বলার মতো মানসিকতা ওদের নেই।'

'সায়ন, মাঝে মাঝেই মনে হয় এখান থেকে আমার চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু যে কাজটা শুরু করেছি তা শেষ না করে গেলে বাকি জীবনটা আমি কী নিয়ে বাঁচব? কী কৈফিয়ত দেব নিজেকে?'

ম্যাডাম উঠে দাঁড়ালেন।

গতকাল যে গ্রামে সায়ন গিয়েছিল সেখানেই প্রথমে যাওয়া হল। ওই গ্রামের চারজন মানুষ বাক্সগুলো মাথায় নিয়ে এল, বিষ্ণুপ্রসাদ এবং ম্যাথুজও হাত লাগাল। বাচ্চা বা বৃদ্ধ আছে এমন পরিবারকে দুধের প্যাকেট দেওয়া হল। একটা প্যাকেট খুলে কী করে দুধ গুলতে হবে দেখিয়ে ম্যাডাম প্রথম গ্লাসটা খেলেন। সায়ন অনুমান করল এটা ওই ছেলে দুটোর কথার প্রতিক্রিয়া। সবার সামনে দুধ খেয়ে ম্যাডাম বোঝাতে চাইছেন যে অসুস্থ হলে তিনিও বাদ পড়বেন না। শিশু এবং বৃদ্ধ না থাকায় যেসব পরিবার দুধ পেল না তারা বিমর্ষ হল।

দ্বিতীয় গ্রামে যাওয়ার পথে ম্যাডাম বললেন, 'খারাপ লাগছে কিন্তু কিছু করার নেই। যাদের বেশি প্রয়োজন তাদের কথা আগে ভাবতে হবে। এতে যদি কেউ অসন্তুষ্ট হয় তো কী করা যাবে!'

দ্বিতীয় গ্রামে তেমন ঝামেলা হল না। উল্টে তাদের দুজন মহিলা রুটি আর তরকারি নিয়ে এল ম্যাডাম এবং সায়নের জন্যে। সেগুলো বিষ্ণুপ্রসাদ এবং ম্যাথুজের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন ম্যাডাম।

খেতে খেতে একটু আলাদা হয়ে ম্যাথুজ লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, 'তোমাকে একটা ভাল খবর দেব।'

'তাই? কী খবর?'

'সিমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।'

'বাঃ! এ তো খুব ভাল খবর!'

আরও লজ্জা পেল ম্যাথুজ, 'আমার মনে হয় ম্যাডামই ওকে রাজি করিয়েছেন। সিমি যে খুব জেদি মেয়ে তা তো তোমার জানা।'

সায়ন খুব খুশি হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সিমি তার কাছে খবরটা চেপে গেল কেন? রাত্রে যখন তাকে বসতে বলল তখন তো এসব ব্যাপারের কোনও ইঙ্গিত দেয়নি! তবু মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তার দুই পরবাসী বন্ধুর কথা ভুলে ম্যাথুজকে গ্রহণ করতে পারছে, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হতে পারে!

কঙ্কাবতীর ব্লাড গ্রুপের রক্ত পর্যাপ্ত নিয়ে ফ্রিজে বোতলের মুখ উল্টো করে রাখা হয়েছিল। এখন কঙ্কাবতী অপারেশন টেবিলে শুয়ে আছে। ডাক্তাররা শেষবার তার এক্স-রে প্লেট দেখে নিয়ে জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ডের অবস্থান শরীরের ঠিক কোন জায়গায় তা বুঝে নিলেন। যিনি অজ্ঞান করাবেন তিনি নিচু গলায় বললেন, 'হিমোগ্লোবিন এত কম যে ভয় হচ্ছে।'

ডক্টর তামাং বললেন, 'কোনও উপায় নেই। ব্লাড প্রেসার কীরকম আছে?'

নার্স বললেন, 'বেশ কম। নাইনটি বাই সিক্সটি।'

ডক্টর তামাং বললেন, 'সামান্য বেড়েছে। আপনি কি আর একটু অপেক্ষা করতে চান ডক্টর?'

ডাক্তার আঙ্কল মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

অ্যানেসথেসিস্ট বললেন, 'আমি আর একবার চেক করে নিচ্ছি।'

তখন অপারেশন থিয়েটারের বাইরে কয়েকটি মানুষ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। কঙ্কাবতীর মা, মিসেস অ্যান্টনি এবং দুই বাহাদুর। হঠাৎ মিসেস অ্যান্টনির খেয়াল হতে তিনি বড়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সায়ন এখনও ফেরেনি?'

বড়বাহাদুর মাথা নাড়ল। না। মিসেস অ্যান্টনি যেন নিজের সঙ্গেই কথা বললেন, 'আমরা সবাই এখানে দাঁড়িয়ে কী করছি? অ্যাঁ? ডাক্তারবাবুরা যা করা উচিত তাই করছেন, আমরা আমাদের কাজে যাই, বুঝলে!'

পরের গ্রামেও গিয়ে কোনও সমস্যা হল না। সবাই এসে হাসিমুখে বাচ্চা এবং বৃদ্ধদের জন্য গুঁড়ো দুধ নিয়ে গেল। একটু আলাদা দাঁড়িয়ে ম্যাডাম বললেন, 'এখানে স্কোয়াশের ফলন কোনও যত্ন ছাড়াই পাওয়া যায়। কলকাতায় তোমরা স্কোয়াশ খাও?'

সায়ন মনে করতে পারল না। বাড়িতে মা শাকসবজি রান্না করেন। আলু পটল বেগুন মুলোর

অস্তিত্ব বোঝা যায়। লাউ বা চালকুমড়ো হলে তা নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু স্কোয়াশের কথা শুনেছে বলে স্মরণে আসছে না।

সে বলল, 'বোধহয় ওখানে পাওয়া যায় না বলেই খাওয়া হয় না।'

ম্যাডাম খুশি হলেন, 'সেই কথাই আমি ভেবেছি। যে জিনিসটা এখানে প্রকৃতির খেয়ালে প্রচুর পরিমাণে হয় তার চাষে যদি একটু যত্ন নেওয়া যায় তাহলে কোয়ালিটি ভাল হতে বাধ্য। সেই স্কোয়াশ রপ্তানি করে তো এরা ভাল টাকা রোজগার করতে পারে। অন্য শাকসবজিতে প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু স্কোয়াশের বেলায় এদের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।'

'কিন্তু সেটা করতে তো, আপনি কি বিদেশের কথা বলছেন?'

'আরে না না। এখান থেকে কলকাতা দিল্লিতে পাঠানোর কথা ভাবছি। যে পদ্ধতিতে অন্য সবজি ওসব জায়গায় যায় সেই একই পদ্ধতিতে যাবে। সেটার ব্যবস্থা করতে আমাদের কাউকে ওখানে যেতে হবে।'

সায়ন মাথা নাড়ল, 'কলকাতার মানুষ ঝিঙে খায়! স্কোয়াশ খেতে একটুও আপত্তি করবে না। এখানে যে জিনিস পাহাড় জঙ্গলে অবহেলায় পড়ে থাকে তা আমরা ঝিঙের চেয়ে কম দামে দিতে পারব।'

'গুড। তুমি এ ব্যাপারে কাগজকলমে একটা খসড়া করে ফেল। আমরা এখানকার কৃষিবিভাগের সাহায্য চাইব। ওঁরা নিশ্চয়ই ভাল পরামর্শ দেবেন। আসল সমস্যা হল এখান থেকে কোথায় কার কাছে কীভাবে পাঠাতে হবে। ব্যবসায়ীরা যদি লাভের গন্ধ পায় তাহলে দেখবে সমস্যার সমাধান এক মুহূর্তে হয়ে যাবে।'

ভদ্রমহিলার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল সায়নের। এখানকার মানুষকে তীব্রভাবে ভাল না বাসলে তাদের উপকারের পথগুলো ওর মনে আসত না। উনি বাইরে থেকে সাময়িক সাহায্য দিয়ে ওদের আরও অলস করতে চাইছেন না। ওরা যাতে নিজেদের পায়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সেটাই ওঁর কামনা। গোরু, মুরগি অথবা স্কোয়াশের চাষের পরিকল্পনায় হয়তো অভিনবত্ব নেই কিন্তু পর্বতের মূষিক প্রসবের চেয়ে এটা ঢের কাজের হবে।

দুপুর কয়েক পা হাঁটলেই হঠাৎ বিকেল হয়ে যায় এখানে। আলোর চেহারা বদলাতে আরম্ভ করে। ম্যাডাম ম্যাথুজদের ডেকে বললেন অন্য গ্রামগুলোতে গিয়ে খবর দিতে যাতে কাল সকালে তারা লোক পাঠায়। ম্যাথুজ এবং বিষ্ণুপ্রসাদরা রওনা হয়ে গেল। সন্ধের মধ্যে তাদের ফিরতে হবে।

ম্যাডাম বললেন, 'চলো, আমরা ফিরে যাই। কিন্তু এখান থেকে আমাদের বাড়িতে সোজা পথে অনেকটা হাঁটতে হবে। ওপাশে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, ওটা দিয়ে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যায়। যাবে?'

'বেশ তো, চলুন।' হাসল সায়ন।

'ওহোঃ না। মাঝে মাঝে খাড়াই উঠতে হবে। তোমার পক্ষে সেটা ঠিক হবে না।'

মাথা নাড়ল সায়ন, 'না না। আমি এখন ঠিক আছি। চলুন।'

পায়ে চলা পথ ধরে ওরা হাঁটতে লাগল। এসব পাহাড়ে গ্রাম ছাড়ালেই পৃথিবীটা নির্জন হয়ে যায়। অল্পস্বল্প গাছগাছালি, কিছু পাখি আর পড়ে থাকা গভীর খাদের পাশ দিয়ে ওঠানামা।

হঠাৎ সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাডাম, আপনি আর কতদিন এখানে আছেন?'

ম্যাডাম হাসলেন, 'যতদিন ভারত সরকার আমাকে ভিসা দেবে।' তার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে বললেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় এসব করার কোনও মানে হয় না। আমাকে সবাই বাইরের লোক বলে মনে করে। এই যে ছেলেগুলো গালাগাল দিয়ে গেল, আমি ভারতীয় হলে দিতে পারত না।'

'না ম্যাডাম। আপনি ভারতীয় হলে ওরা অন্য গালাগাল দিত।'

'কেন?'

'কারণ এ দেশের গরিব মানুষগুলোকে কেউ নিঃস্বার্থ সাহায্য করুক তা কোনও রাজনৈতিক দল চায় না। মানুষগুলোকে হাতছাড়া করবে না ওরা আবার তাদের পায়ের নীচে মাটি দেবে না।'

ম্যাডাম কথা বললেন না। সায়ন লক্ষ করল ভদ্রমহিলার হাঁটাচলার মধ্যে বয়সের কোনও ছাপ

নেই। কত বয়স হবে ওঁর? পঞ্চাশের আশেপাশে হয়তো। এখানে আসার পর সাজগোজ প্রসাধন একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। এখনও মনে পড়ে প্রথম যেদিন মিস্টার ব্রাউনের বাড়িতে ওঁকে দেখেছিল তখন যথেষ্ট সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল। এঁকে দেখে ঈর্ষান্বিতা হয়েছিল সিমি। কোনও কারণ নেই, হয়তো মেয়েরা অন্য কোনও সুন্দরীকে মনে মনে গ্রহণ করতে পারে না বলেই সিমির মধ্যে ভাবান্তর হয়েছিল। সেই সিমি এখন ম্যাডামের প্রিয়জন। সেই ম্যাডামের সঙ্গে এই মহিলার পোশাক এবং চেহারার বিপুল পার্থক্য এসে গিয়েছে। এই ম্যাডাম যদি আমেরিকায় যান তাহলে ওঁর বন্ধু আত্মীয়রা দেখে চমকে উঠবেন।

হঠাৎ ম্যাডাম দাঁড়িয়ে পড়ল, সূর্য এখন পশ্চিম আকাশে। আর সেই আকাশে এখনই রং জমতে শুরু করেছে। পাহাড়গুলো এখনও স্পষ্ট। ম্যাডাম সেদিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'বিউটিফুল। ঈশ্বর আমাদের জন্যে কী সম্পদ সাজিয়ে দিয়েছেন।'

সায়ন তাকাল। এত পরিষ্কার আকাশ এখানে সচরাচর দেখা যায় না। অস্তে যেতে এখনও অনেক দেরি কিন্তু এর মধ্যেই তার আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। এরকম একটা ছবির সামনে তাকালে মন কীরকম হয়ে যায়!

আবার হাঁটা শুরু হল। মাঝে মাঝে এত খাড়াই ভাঙতে হচ্ছিল যে সায়ন শরীরে কষ্ট বোধ করছিল। অথচ ম্যাডাম বেশ স্বচ্ছন্দ। সায়নের মনে পড়ল ডাক্তার আঙ্কল বলেছিলেন, আমাদের যতটুকু সামর্থ্য ঠিক ততটুকুই করা উচিত। মুশকিল হল সামর্থ্য কতটুকু তা আমরা নিজেরাই জানি না।

ম্যাডাম একটা পাথর দেখিয়ে বললেন, 'চলো, এখানে একটু বসি।'

বসতে পেরে ভাল লাগল সায়নের।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ম্যাডাম বললেন, 'আমার মন বলছে মেয়েটা ভাল হয়ে যাবে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওর অপারেশন হয়ে গেছে, কী বলো?'

সায়ন চুপচাপ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। তারপরেই খেয়াল হল এই অপারেশনের ফলে কঙ্কাবতী হয়তো এখনকার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে। রক্তের শক্ত হয়ে যাওয়া ডেলা তুলে নিলে শারীরিক অস্বস্তি দূর হবে কিন্তু মূল রোগ তো কোনওদিন সারবে না। ভাল হওয়া ওর কখনও হবে না।

সে ম্যাডামের দিকে তাকাল। শিরদাঁড়া সোজা রেখে বসে আছেন উনি, মুখ ঈষৎ ওপরের দিকে তোলা। এই বয়সের বাঙালি মেয়েরা কেন এমন ভঙ্গি রাখতে পারে না? কেন এঁদের মতো শরীর বা শারীরিক ক্ষমতা থাকে না?

হঠাৎ ম্যাডাম বললেন, 'জানো সায়ন, তোমাদের এখানে এসে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল ছেলেবেলার কথা। আমার মায়ের বাবা থাকতেন ইয়োলো স্টোন নামের এক শহরের কাছে। প্রতি গ্রীষ্মে মায়ের সঙ্গে আমি তাঁর কাছে যেতাম। শহর থেকে দূরে তাঁর বিশাল খামারবাড়ি ছিল। এই রকম ভ্যালি, গাছগাছালি, কী সুন্দর হাওয়া। আমার খুব ভাল লাগত। চলে আসার সময় মন খারাপ হয়ে যেত। একটা ছোট্ট লেক ছিল, তাতে নৌকা বাইতাম আমি। দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি সেখানে গিয়েছি প্রতি গ্রীষ্মে। তারপর আর যাইনি।'

'কেন?'

'দাদুর এক কর্মচারী খামারবাড়ির নির্জনে একা পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তাকে আমার ভাল লাগছে কিনা তার তোয়াক্কা না করে প্রেম নিবেদন করেছিল। আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কাউকে বলিনি, এমনকী মাকেও নয়। যে কদিন ছিলাম আর বাড়ি থেকে বের হইনি। তখন তো আমার দশ বছর বয়স, যখন ভয় বেশি বেশি পেতাম।' ম্যাডাম হাসলেন।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'সেই ছেলেটার খবর আর পাননি?'

'না। দাদু মারা যাওয়ার পর খামারবাড়ি বিক্রি করে দেওয়া হল। ওখানকার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। এখানে এসেই চট করে সেসব স্মৃতি মনে পড়ল।'

'ভাগ্যিস আপনি এখানে এসেছিলেন—।'

মুখ ফিরিয়ে হাসলেন এলিজাবেথ, 'আমার আসার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, না?'

'তা কেন? মিস্টার ব্রাউন আপনার বন্ধু ছিলেন, তাঁর কাছে আসতেই পারেন।'

'না, না, যাকে বলে বন্ধু তা আমরা কখনওই ছিলাম মা। একজন ইন্ডিয়ান সেইলার আমার উপকার করেছিল, তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে চা খাইয়েছিলাম, ব্যাস এতটুকু, কিন্তু ওই প্রথমবার কোনও মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল একে কোনও পাপ স্পর্শ করেনি। ও যে পাহাড়ি, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে পাহাড়িদের চেহারার কোনও মিল নেই, এসব জানতাম না। উল্টে ব্রাউন যে আমাকে প্রেম নিবেদন করেনি তা ভেবে খারাপ লেগেছিল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী! চিঠি লিখলে আমি জবাব দিতাম। তার পর তো সংসারে জড়িয়ে পড়লাম। সে-দীর্ঘ সময়। তারপর যখন সব দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল তখন ভাবলাম মানুষটা কেমন আছে দেখে আসি।' ম্যাডাম হাসলেন, 'আমার এই ভাবনাটাকে লোকে পাগলামি ছাড়া কিছুই বলবে না জানি।'

'কেমন দেখলেন?'

চোখে চোখ রাখলেন এলিজাবেথ। তারপর বললেন, 'তুমি বয়সে অনেক ছোট। সব কথা তোমাকে বলতে অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু তুমি তো অ্যাডাল্ট, তাই না?'

সায়ন জবাব না দিয়ে হাসল।

এলিজাবেথ আবার একটু নীচে নেমে যাওয়া সূর্যের দিকে তাকালেন, 'মিস্টার ব্রাউন খুব ভদ্রলোক ছিলেন। স্ত্রী মারা যাওয়ার পরেও এই যে তিনি ছেলেদের কাছে না গিয়ে একা থাকা পছন্দ করতেন এর ব্যাখ্যা কী হবে? উনি কারও সঙ্গে মানাতে পারতেন না, নাকি নিজের প্রাইভেসি নষ্ট হোক সেটা চাইতেন না? আমার মনে হয়েছে উনি নিজের জগৎ তৈরি করে নিয়ে শামুকের মতো থাকাটাই পছন্দ করতেন। আর এই তৈরি করার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যেশাস। যেশাসকে অবলম্বন করে দিব্যি কাটিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।'

'এই কথাগুলো বলতে আপনার অস্বস্তি হচ্ছিল?'

'না। আমি বলতে চাই, পুরুষরা যখনই মনে করে তাদের বয়স হয়ে গেছে তখনই তারা নিজেকে অথর্ব দেখতে পছন্দ করে। তাই অল্প বয়সে ওর মুখ দেখে আমার যা মনে হয়েছিল বার্ধক্যে সেটা হয়নি।'

অবাক হয়ে গেল সায়ন, 'আপনি বললেন প্রথম দেখায় ওঁর মুখ নিষ্পাপ বলে মনে হয়েছিল আপনার। এখন সেটা মনে হয়নি?'

নীরবে মাথা নাড়লেন এলিজাবেথ, 'হ্যাঁ, মনে হয়নি। আত্মপ্রতারকরা কখনওই মুখ নিষ্পাপ রাখতে পারে না। চলো, এবার হাঁটা যাক।'

ম্যাডাম আগে হাঁটছিলেন। সরু পায়ে চলা পথ। দুপাশে জঙ্গল আর পাহাড়। গাছের ছায়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। মিস্টার ব্রাউন সম্পর্কে ম্যাডামের ব্যাখ্যা একদম পছন্দ হচ্ছিল না সায়নের। ওঁর মুখ দেখে কখনওই পাপীর কথা মনে হয়নি। অবশ্য পাপ কাকে বলে, পাপী কতরকমের হয় এসব তার ভাল জানা নেই।

ওরা যেখানে পৌঁছেছিল সেখান থেকে ওপরের বড় রাস্তাটা দেখা যায়। ঘুরে গেলে অন্তত মিনিট পনেরো লাগবে ওখানে পৌঁছতে। ম্যাডাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো সায়ন?'

সায়ন বলল, 'একটুও না।'

ঠিক তখন একটা গাড়ির আওয়াজ হল। সায়ন দেখল একটা জিপ উল্টোদিক থেকে আসছে। অর্থাৎ গাড়িটা নীচের বাজার থেকে উঠে আসেনি, গ্রাম থেকে ঘুরে আসছে। হঠাৎ জিপটা দাঁড়িয়ে গেল। ম্যাডাম সেটা লক্ষ করলেন, 'কার গাড়ি? তবে কি মিস্টার স্মিথ এসেছেন?'

'মিস্টার স্মিথ কে?'

'ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের একজন বড় অফিসার। আমি ওঁদের অনুরোধ করেছিলাম আসার জন্যে, উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।'

'উনি কী জন্যে এলেন?'

'এইসব মানুষের উপকারে লাগবে এমন অনেক কাজ করেন ওঁরা। চলো, তাড়াতাড়ি ওঠা যাক।

ভদ্রলোক বোধহয় আমাকে খুঁজতে গ্রামের দিকে গিয়েছিলেন।' ম্যাডামের কথায় বেশ ফুর্তির ভাব লক্ষ করল সায়ন।

ঘুরপথেই ওরা উঠছিল। জায়গাটা আর নির্জন নেই। পৃথিবীর সমস্ত পাখি যেন এখানকার গাছে গাছে জড়ো হয়ে প্রাণপণ ডেকে যাচ্ছে। ম্যাডাম বললেন, 'এদের আজ খাবার জোটেনি নাকি, বড্ড চেঁচাচ্ছে!'

সারারাত ঘুমোবার আগে ওরা এইভাবে চেঁচিয়ে নেয় এ কথা ম্যাডামেরও জানা আছে। সায়ন হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'এবার এদের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করবেন নাকি আপনি?'

ম্যাডাম জোরে হেসে উঠলেন আর তখনই ওদের দেখা গেল।

রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে চারজন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। এই চারজনের দুজনকে সায়ন চেনে। মোটরবাইকে করে মাঝে মাঝেই এদিকে আসে। তার সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝামেলা করার চেষ্টা করেছিল।

ম্যাডাম নিচু গলায় বললেন, 'ওরা ওখানে কেন?'

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'ওদের আপনি চেনেন?'

'দুজনকে চিনি। আজ ওরা আমার বাড়িতে এসে আমাকে আমেরিকান বলে গালাগাল করেছিল। ওখানে ওরা কী করছে?'

'চলুন, আমরা পাশ কাটিয়ে চলে যাব।'

ওরা এগোল। ক্রমশ দূরত্বটা কমে আসছিল। সায়ন দেখল ওরা চারজন এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে যেতে হলে পথ ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে হয়।

একেবারে সামনে পৌঁছে ম্যাডাম বললেন, 'তোমরা এভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন? পথ ছাড়ো, আমাদের যেতে দাও।'

চারজনের কেউ জবাব দিল না।

ম্যাডাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মতলবটা কী বলো তো?'

এবার একজন পাহাড়ি ভাষায় কথা বলল, 'তোকে দেখব।'

সায়ন প্রতিবাদ করল, 'তোমরা ম্যাডামকে তুই বলে কথা বলছ?'

চারজনেই সায়নকে দেখল। দ্বিতীয়জন বলল, 'অ্যাই, তুই আধামুর্দা, চুপচাপ থাক। আসুন মেমসাব, চলে আসুন।'

ওদের বলার ধরনে এমন কিছু ছিল যে ম্যাডাম সায়নের দিকে তাকালেন। সায়ন কী করা উচিত বুঝতে পারছিল না। কিন্তু দ্বিধা সরিয়ে ম্যাডাম এগোলেন। ওঁকে আসতে দেখে মাঝখানের দুজন এক পা পিছিয়ে গেল। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ম্যাডাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন. 'তোমরা কী চাও?'

'তোকে দেখতে চাই।' প্রথম ছেলেটাই জবাব দিল।

'তোমরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না?'

'না।' হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ছেলেটা ম্যাডামের জামার বোতামের জায়গা ধরে জোরে টান দিতেই সেটা ছিঁড়ে গেল অনেকটা, ম্যাডাম হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

সায়ন চিৎকার করে উঠে ছুটে যেতেই একজন সজোরে লাথি চালাল। তলপেটে আঘাত পেয়ে ককিয়ে উঠল সায়ন এবং তার শরীরটা ছিটকে নীচে গড়িয়ে পড়ে একটা পাথরে আটকে গেল। ওর চোখের সামনে তখন অন্ধকার, সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কোনও মতে চোখ খুলতেই সে দেখতে পেল ম্যাডাম একটি ছেলেকে সজোরে ঠেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হায়েনার মতো চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকি তিনজন। ম্যাডাম পড়ে গেলেন মাটিতে। কয়েকমুহূর্তেই ওরা ম্যাডামের শরীর থেকে শেষ সুতোটাও খুলে নিয়ে হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল। সম্পূর্ণ নগ্ন ম্যাডাম উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করতেই পড়ে যাওয়া ছেলেটা এগিয়ে গেল, 'আরে ব্বাস। কী চিজ হ্যায়। এহি হ্যায় আসলি আমেরিকান চিজ।' বলতে বলতে সে ম্যাডামের শরীরে হাত দিতে গেল। ম্যাডম চকিতে স্পর্শ বাঁচিয়ে চিৎকার করলেন, 'তোমরা এসব কেন করছ? আমি তোমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তোমরা আমার ছেলের মতো।'

৫

ওরা বিকট হাসি হাসল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাডামের ওপরে। সায়ন সমস্ত শক্তি জড়ো করে উঠে বসল। তার মাথা ঘুরছে। ম্যাডামের শরীরটাকে তিনজনে ধরে রেখেছে মাটিতে চেপে, চতুর্থজন ওঁর শরীরের ওপরে। সে নেমে পড়তেই আর একজন সেই কাজের দায়িত্ব নিল। সায়ন উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। তারপর টলতে টলতে এগিয়ে গেল ওপরে। ওদের একজন ওকে দেখতে পেয়ে একটা পাথর তুলে ছুড়ল। আঘাতটা এড়াতে পারল না সে।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন ওরা কেউ নেই। কোনওমতে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ম্যাডামের শরীরটার কাছে পৌঁছে সে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। ম্যাডামের সমস্ত শরীরে ক্ষতচিহ্ন। হায়েনার দাঁত বসে গেছে সেখানে। শরীর স্থির কিন্তু ঠোঁট নড়ছে। চোখের সামনে শরীরটা কিন্তু আচমকা আর দেখতে পেল না সায়ন। তার নাক কান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে নামছে নীচে। শরীর টলছে। তবু গাড়ির আওয়াজ কানে এল। এবং সেইসঙ্গে কথাবার্তা।

ছেলে চারটে দৌড়ে নামল নীচে। ম্যাডামের শরীরটাকে এক ঝটকায় তুলে নিয়ে গেল ওপরে যেখানে গাড়িটা দাঁড়িয়ে। গাড়ির সিটে শরীরটাকে ফেলে ওরা ঘুরে দাঁড়াতেই খুব ঘাবড়ে গেল। রক্তাক্ত একটা শরীর এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। পা টলছে, হাত দুপাশে বাড়ানো। ওরা এবার ভয় পেল। ঝটপট ক্যান থেকে পেট্রোল জিপের সিটে ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে ওরা দৌড়োল।

সায়ন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না কিন্তু প্রচণ্ড শব্দে যখন জিপটা জ্বলছিল তখন আগুনের অস্তিত্ব বুঝতে পারল। সে জ্বলন্ত জিপের দরজা খুলতে চেষ্টা করতেই তার শরীর আগুনের আলিঙ্গনে ধরা পড়ল।

তখন চরাচরে বিষণ্ণ আলো। সূর্যদেব বিদায় নিচ্ছেন। তবু রাতের চেয়ে বড় আতঙ্ক সামনে দেখে পাখিরা বোবা হয়ে গেল। জ্বলন্ত অবস্থায় সায়ন কোনওমতে ম্যাডামের পা স্পর্শ করতে পারল। জ্বলন্ত পা।

জ্বলন্ত আগুনের সেই রথ ক্রমশ আকাশ অধিকার করতে ওপরে, আরও ওপরে উঠে যাচ্ছিল। ঈশ্বর বলে কেউ যদি কোথাও থাকেন তাহলে তিনি বিপন্ন বোধ করছিলেন অবশ্যই। এই আগুন যদি আরও দীর্ঘতর হয় তাহলে তাঁর স্বর্গের অস্তিত্ব লোপ পাবে।

নিরাপদে ফিরে গিয়ে ছেলে চারটে মশগুল ছিল। ছিনতাই করা একটা জিপ তাদের আড়াল করতে অনেক গল্প সাজাবে। ওরা কেউ পেছনে তাকায়নি তাই অগ্নিরথ দেখতে পায়নি। ওরা কেউ সামনে তাকাবে না তাই লক্ষ লক্ষ অগ্নিরথের অস্তিত্ব টের পাবে না।
